DEPT. LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA Serial No. 2024
P29474

গল্পলহরী

"বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশ সিন্ধু গঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্যা-ক্ষেত্র.....সাঙ্খ্যসূত্র প্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়।..... চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-মার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষার প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী-সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ("পুষ্পাঞ্জলি")

সপ্তম খণ্ড | সপ্তম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩২২ | প্রথম সংখ্যা।

আলোচনা

১। বিজয়াদশমী

বাঙ্গালায় কয়েক দিনের জন্য হাসি ফুটিয়াছিল। ক্ষুধা, রোগ এবং মৃত্যুর কশাঘাত বাঙ্গালী এই কয়টা দিন ভুলিয়া গিয়াছিল। শারদকৌমুদীবিধৌত রজনীতে পূজার আরতির বাদ্য তাহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। পূজার তিন দিনের "দীয়তাং" "ভুজ্যতাং" রব, ঢাকঢোল, সানাই, কাঁশর, ঘণ্টার ধ্বনি বঙ্গের নিরানন্দ পল্লী হর্ষকোলাহলে মুখরিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী এই কয়টা দিন জন্মভূমির সত্তা অনুভব করিতে পারে। তাহার প্রাণ পূজার

আগেই পিতৃপিতামহের স্মৃতিমণ্ডিত পল্লী-ভবনের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। বঙ্গভূমি বাস্তবিকই যে আমাদের "সকল সহা, সকল বহা স্নেহময়ী মা"—এই প্রাণমাতান, প্রাণ-জাগানো চিরমধুর, চির-সরল সত্যটী হৃদয় ভরিয়া বুঝিবার সুযোগ এই মহাপূজার কয়দিন। প্রকৃতির শুভ্রহাস্ত শারদজ্যোৎস্নায়, কুমুদকহ্লারের, কমলশেফালিকার অনিন্দ্য-শোভায় উছলিয়া পড়িতেছে। শুভ্র-মাত শরদিককুলের বোধন, পূজা আরতির ভিতর দিয়া দেশের সনাতন ভক্তির স্রোত সহস্রধারায় অসংখ্য হৃদয় উদ্বেল করিয়া ছুটিয়াছে। উপেক্ষিত পল্লী আবার জন-সমাগমে আনন্দকলরবে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অভাব ও বিলাসে হিন্দুর রুদ্ধ-প্রায় হৃদয় আবার জননীর স্নেহস্পর্শে সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া, হীন স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া পূজার আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু নিঃস্বার্থ ভাবের উপাসনায়, বহুপ্রসারী প্রেমের দীক্ষায় হৃদয় খুলিয়া দিয়াছে। হিন্দু মায়ের সন্তান, মায়ের সাধক, মা নামে মাতোয়ারা। বঙ্কিমচন্দ্র এই সারা বাঙ্গালা জোড়া ভাবের মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব 'দুর্গোৎসব' লিখিয়াছিলেন। প্রাণ খুলিয়া ভাবের সাগরে ডুব দিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর, বাঙ্গালী, দুর্গোৎসবে মাতৃপূজার সন্ধান পাইবে। বরাভয়-প্রদায়িনী, অশুভ-সংহারিণী, চির কল্যাণময়ী জননী আমাদের পূর্ব্ব-পিতৃগণের বরণীয়া মাতৃভূমি, বহু শোভা ও শক্তি-সম্ভার বুকে লইয়া তিনি যে আমাদেরও মা, তাঁহার অসীম, অনন্ত মাতৃস্নেহ যে সুপুত্র কুপুত্র নির্ব্বিচারে তাঁহার বহুকোটী সন্তানের উপর অজস্রধারায় বর্ষিত হইতেছে এ কথা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। দুর্গোৎসব যথার্থই এক বিরাট জাতীয় উৎসব। এমন করিয়া সব ভুলাইয়া, প্রাণ মাতাইয়া যে উৎসব জাতির হৃদয় সরসতায়, নবীনতায় সজীব এবং সুন্দর করিয়া তোলে তাহার ঐশ্বর্য্য ও মহিমা স্বতঃই হিন্দুর কাছে সত্য এবং সুস্পষ্ট।

তাহার পর বিজয়াদশমী। ইহা "বিজয়ের" উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া "বিজয়া"। শক্তি-মন্ত্রার আত্মপ্রসাদ, জয়ের উল্লাস, চরিতার্থতার আনন্দ দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছে, নিখিল হিন্দুজাতিকে আন্দোলিত করিয়াছে। এই বিজয় গর্ব্বের, এই আনন্দের মহামিলন—বিজয়া। হিন্দুর প্রত্যেক ব্যষ্টি সে দিন এক বিরাট অখণ্ড সমষ্টির অবিচ্ছেদ্য-অংশ। উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী নির্ধন, সুহৃৎ শত্রু, আত্মীয় অপরিচিত সেদিন তাহার নিবিড় সৌভ্রাত্রের, সর্ব্বপ্লাবী প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। এমন প্রাণ খোলা আশীর্ব্বাদ, বুক ভরা কোলাকুলি, এমন বিনয়পূর্ণ প্রণাম নমস্কার, এমন মিষ্টকথা, মিষ্টমুখ, মিষ্টপ্রাণ যে মহোৎসবের দান, অমর হউক সে উৎসব, অক্ষয় হউক তাহার শক্তি। হিন্দু তাহার জাতির সার্ব্বভৌম ঐক্যের ও মিলনের খোঁজ পায় বিজয়ায়। তাহার দেশ, তাহার জাতি এমন করিয়া মিলনের জন্ত প্রাণ খুলিয়া দিয়াছে। নিখিল হিন্দুস্থান এক মহামিলনের বিরাট ভাবে উদ্বুদ্ধ! সবাই আত্মীয়, সকলকে কোল দিতে হইবে। যে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, সে এ মহামিলনের স্রোতে হৃদয় ঢালিয়া বুঝিতে পারিবে, কত বড় প্রেমের ঐক্য এই বিজয়া। ধন্ত সেই পুণ্য-শ্লোক পিতৃগণ, যাঁহারা সমস্ত বাহ্য অবস্থার উপরে সমগ্র দেশের হৃদয়ের এই অখণ্ড, উদার মহামিলনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ধন্ত

হইব আমরাও—যদি আমরা তাঁহাদের অনাগত সন্তানসন্ততিগণের জন্য এই জাতীয় মহামিলনধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি, আর ইহাকে আমাদের ঐকান্তিকতার চেষ্টায় ও সাধনায় বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে পারি।

* *
*

২। সাহিত্যে দুর্নীতি

আর মুখ বুজিয়া থাকা চলে না। বাণীর পবিত্র পীঠে রাশি রাশি আবর্জ্জনা আসিয়া জমিতেছে। উহার সাত্ত্বিক সামগান এই দেশের সাহিত্য আশ্রয় করিয়া বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশের উপনিষদ্, গীতার অধ্যাত্মবাদের নিকট আজ জগৎ সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইতেছে। ভারতীয় সাহিত্যের শুভ্র, সৌম্য জ্যোতিঃ এখনও প্রাণের মলিনতা দূর করিয়া দেয়। ভারতীয় কাব্য চিরদিন মহৎ চরিত্র, মহৎ ভাব, মহৎ অবদানে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। অভিজ্ঞান শকুন্তল ভারতীয় প্রতিভার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। কিন্তু এখনকার সাহিত্য সেই সকল মুছিয়া ফেলিয়া উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল মূর্ত্তিতে সমাজের বুকে আপনার ভার চাপাইতেছে। ইউরোপের যথাযথচিত্রণমূলক উপন্যাসের (realistic novel) দোহাই দিয়া বঙ্গসাহিত্যে কি বিষম দৌরাত্ম্যই না চলিতেছে! রক্তমাংসের ক্ষুধা শিষ্টতার আবরণ দূরে ফেলিয়া, কলা চাতুর্য্যের (art) বিবিধ বর্ণে বিচিত্র ভঙ্গীতে চিত্রিত হইয়া, অবাধে নিঃসঙ্কোচে আমাদের মন্দিরের জীর্ণ কবাট ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আয়োজন করিতেছে। ইহার চক্ষে আকাঙ্ক্ষার তীব্র বহ্নি, অঙ্গের প্রতি লোমকূপে সম্ভোগলিপ্সার বীভৎস উত্তাপ। জগৎ ইহার কাছে বাসনার ক্ষেত্র, ভোগ-বিলাসের, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের অফুরন্ত উৎস। প্রৌঢ়ের লেখনী ইহার তাড়নায় মানুষের চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিবার জন্য অলঙ্কার, উপমা, ভাষা, ভাব নিঃশেষ করিয়া, আর্টের সংযমের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, মদিরার তুফান ছুটাইয়াছে। দেশের উপদেষ্টা, স্বজাতির হিতকামী সাহিত্যরথী আজ ইহার আবেগে আত্মহারা। উদ্ভ্রান্ত দেশবাসী এখন তাঁহার সুবর্ণকলসের অপূর্ব্ব মদিরা পান করিয়া realistic artএর চরণে গড়াগড়ি দিবে। জানিনা কি ভাবিয়া প্রবীণ সাহিত্যরথী সমাজে এই লালসার বান ডাকাইতেছেন। যদি সাহিত্য-সাধনার বলে ভগীরথের মত ভস্মীভূত সমাজে শক্তির, মনুষ্যত্বের, দেবত্বের গঙ্গাস্রোত আনিতে পার, কৃতজ্ঞদেশ প্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিবে, প্রসন্ন পিতৃপুরুষ আনন্দাশ্রু মোচন করিবেন। এই রক্তমাংসের ক্ষুধা আর জাগাইও না। নির্জ্জীব সমাজ এখনও প্রাচীন সংযমের অবশেষটুকু ভর করিয়া কোনও মতে বাঁচিয়া আছে। আর কেন ইহাকে উদ্ভ্রান্ত করিতেছ? শক্তি থাকে ইহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা কর। নূতন আদর্শে, নূতন ভাবে ইহার মনুষ্যত্ব যাহাতে জাগিয়া উঠে, ইহার সনাতন সংযম, নিষ্ঠা, শুচিতা আর অপচিত না হয়, হে সাহিত্যরথি! আজ সেই সাধনায় অগ্রসর হও। বহু যুগের অবসাদ, আলস্য ও মোহ ইহার শক্তির অনেকটাই ত নিঃশেষ করিয়াছে। যেটুকু এখনও নিঃশেষিত হয় নাই তাহার উপর তুমি ঘরের ছেলে হইয়া আর এমন নির্ম্মম চিত্তে ডাকাতি করিও না। এই অস্তিত্ব সঙ্কটের দিনে তাঁহারই সাহিত্যসাধনা ধন্য, যিনি আমাদের কল্যাণের পথ, বাঁচিবার উপায় বলিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার শুভশঙ্খনিঃস্বনে আমাদের সুপ্ত

মনুষ্যত্ব, মোহাভিভূত দেবত্ব আবার জাগিয়া উঠিবে। এই আপদ্‌কালে আর কেন রক্ত-মাংসের বীভৎস ক্ষুধা বাড়াইয়া তুলিতেছ? একবার স্বদেশীয় সভ্যতার, স্বধর্ম্মের মর্ম্মস্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখ। সন্তানের মত, ভক্তের মত একবার মায়ের ব্যথা বুঝিও; নিরন্ন, নিষ্ক্রীব, নিরাশ দেশবাসীর অবস্থা ভাবিয়া দেখিও। আমাদের ভিতের ইট আল্‌গা হইয়া পড়িতেছে; বিলাস-লালসার দুর্ব্বার স্রোত আমাদিগের বিরাট সৌধের তলদেশ কোঁপরা করিয়া ফেলিতেছে। আর কেন লালসার অগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপ কর? ভোগায়তন দেহের, সম্ভোগলিপ্সাতুর ইন্দ্রিয়-গণের তৃপ্তির জন্য সবাই ত আজ তাহাদের আত্মাকে বিকাইয়া দিতে বসিয়াছে। সমগ্র জাতি এখন ভোগ সুখের কাঙ্গাল। আর তোমার আর্টের কুহক সৃষ্টি করিয়া দেশ মজাইও না, সমাজ বিভ্রান্ত করিও না, দানবী ক্ষুধার সম্মুখে সম্ভোগের তিলোত্তমার মূর্ত্তি ধরিও না। যাহারা ঘরে আছে, যাহাদের কুলধর্ম্মবোধ এখনও মরিয়া যায় নাই, সংযমের বিরুদ্ধে যাহারা পুরাপুরি বিদ্রোহী হইয়া উঠে নাই, তাহাদিগকে আজ সেই সনাতন পবিত্রতা, শুচিতা ও সংযমের ভগ্নদুর্গে ঘরের মাঝেই থাকিতে দাও। বাহিরের বিলাস কোলাহলের, হুড়াহুড়ির, উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝ-খানে তাহাদের টানিয়া আনিয়া আর মজাইও না। এই যে তোমার কলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, ভাষা, অলঙ্কার ও উপমার শোভা, ইহাও সেই উপকথার প্রেতিনীর কুহকসৃষ্ট সৌন্দর্য্য। কামনার যে বহ্নি জ্বালাইয়াছ, তাহাতে ইতি-মধ্যেই দলে দলে পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যদি পার—এই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে শান্তিবারি নিক্ষেপ কর। খুঁজিয়া দেখ পূর্ব্বপুরুষগণের কমণ্ডলুর শান্তিজল এখনও নিঃশেষিত হয় নাই।

* *
*

৩। সাহিত্যের সমাজ-সেবা

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের তিনটী মহান্ অভাব। শাস্ত্রে বলে মানুষ চতুর্ব্বর্গ লাভ প্রয়াসী। মানুষের মত জাতিরও বর্গ-লাভ ঘটে। তবে উহার সংখ্যা ৪ না হইয়া ছয়। সমাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও অর্থ এই ষড়বর্গ লাভ হইলে জাতির মুক্তি হয়। মুক্তি অর্থে, বাধা হইতে, ভয় হইতে, অজ্ঞান হইতে, দুর্ব্বলতা হইতে উদ্ধার। বাধা হইতে গতিতে, ভয় হইতে অভয়ায়, দুর্ব্বলতা হইতে শক্তিতে, ও অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে যে অবস্থান্তর তাহাই জাতির মুক্তি। এই ছয়টী সম্বলের অভাবেই জাতির মৃত্যু বা অধঃপতন।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ছয়টীরই কমবেশী অভাব ঘটিয়াছে, তবে সমাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই তিনটীরই অভাব আমরা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিতেছি, আর মনে হয়, এই তিনটীর অভাব পূর্ণ হইলে বুঝি আমরা একটু মানুষের মত হইতে পারিব, পাঁচজনের নিকট একটী জাতি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারিব। সমাজ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাগত অভাবের বর্ত্তমান অবস্থা ও কিরূপে উহাদের প্রতিবিধান হওয়া উচিত তাহার আলোচনা আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রধান আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

আবার সেই কথা! সাহিত্য কি তবে, সমাজ সমস্যা শিক্ষা বিধান ও স্বাস্থ্যরক্ষা লইয়া ব্যস্ত থাকিবে? তার আর কোনও কাজ নাই? উচ্চ ভাবের সহিত, অতীন্দ্রিয়ের সহিত, তার

কারবার বন্ধ করিতে হইবে? এই সকল প্রশ্ন লইয়া অধ্যাপক রাধাকমল বাবু ও রবীন্দ্রনাথের তর্ক আরম্ভ হইয়াছিল সে তর্কের এখনও শেষ হয় নাই। আমরা রবীন্দ্রনাথের কথায় তার উত্তর দিতে পারি। স্বদেশী আন্দোলন যখন প্রবল বন্যায় ছুটিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ নিজ কবি প্রতিভাকে দেশের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং এই উপলক্ষ্যে apology স্বরূপ তিনি বলিয়াছিলেন "আমি যখন বাঁশি বাজাইতেছি, তখন সাপে তাড়া করিলে, বাঁশিকে লাঠির কার্য্যে নিয়োজিত করিলে কেহ দোষ দিতে পারে না।" ঠিক কথা; কেহ দোষ দেয় নাই, দিতেও পারে না; কবিকেও সাহিত্যিক যদি নিজের প্রতিভার দ্বারা দেশের ও দশের সেবা করেন তবে তাঁর প্রতিভার চরম সার্থকতা তাহাতে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা লোচনীয়। কি সমাজ কি স্বাস্থ্য, কি শিক্ষা, কি অর্থ, কি ধর্ম্ম, সবই লক্ষ্যহীন, দুর্ব্বল, দোষযুক্ত। চারিদিকে আমাদের বন্ধন, অজ্ঞানের বন্ধন, ভয়ের বন্ধন, দৌর্ব্বল্যের বন্ধন, দারিদ্র্যের বন্ধন, কুশিক্ষার বন্ধন, কুসংস্কারের বন্ধন, কদাচারের বন্ধন। এই নাগ পাশের সহস্র বন্ধন কাটিতে পারিলে তবে আমরা পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিব, চলা ত পরের কথা। এ দুঃসময়ে যদি সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পী, ভাবিবেন না, বা ভাবাইতে শিখাইবেন না। উচ্চ সুরনাদে মহামন্ত্র প্রচার করিবেন না তবে লোকে জানিবে, শিখিবে, ভাবিবে বা বুঝিবে কিরূপে?—জাতীয় জীবনের সমস্যা পূরণসাধন যদি জাতীয় সাহিত্য না করিবে তবে আর উদ্বোধনের বিজয় সংগীতের জন্য কোন প্রতিভার নিকট দ্বারস্থ হইবে?—তবে কথা আছে, যে যেমন সে তেমনি উপায়ে এ চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিবেন। কবি বা শিল্পী, Text-book লিখিবেন না Statistics তৈয়ারী করিবেন না, বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন না।—শিল্পের ভিতর দিয়া তাঁর বক্তব্য বা উপদেশ প্রকাশ করিবে সাক্ষ বক্তব্যও বলা হইবে, শিল্পও বজায় থাকিবে এরূপ সাহিত্যিক চেষ্টার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি সব দেশের সাহিত্যেই পাওয়া যায়।

আমাদের এখন অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। দেশের লোক খাদ্য ও পানীয় অভাবে মৃতপ্রায়, শিক্ষা অভাবে অজ্ঞানমূঢ়, অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন অর্দ্ধাভাবে একাশনে, চীরধারী।—জ্বর জরা, মড়ক দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে,—বাল্যবিবাহ, বালবৈধব্য, বরপণের ভীষণ তাড়না, লোককে বিড়ম্বিত করিতেছে, দারিদ্র্যে, শিক্ষাভাবে, অনশনে জীবনযুদ্ধ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে, এখন কি চাঁদের সুধা, ফুলের মধু, কোকিল কুহন প্রেম, পূর্ব্বরাগ বিরহ মিলন লইয়া কবি শিল্পী ও সাহিত্যিকের ব্যস্ত থাকিলে চলিবে? উচ্চ ভাব? অতীন্দ্রিয় বিষয়? দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন, ভীতকে অভয় দান, অজ্ঞানকে শিক্ষাদান, অন্ধকে আলোক দান, ইহাপেক্ষা সাহিত্যিকের বিষয়-গৌরব আর কি আছে? যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয় বলি তাহার মধ্যেই যে অতীন্দ্রিয় আছে ইহা দেখান বুঝান ত উচ্চ দরের সাহিত্যিকের কাজ? পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যে art with a Proposeএর ধুয়া উঠিয়াছে উহার ভিত্তি ত এই সমাজ-সেবায়। যখন আমরা মানুষ হইব, ধনে, মানে, জ্ঞানে বড় হইব তখন উচ্চ ভাব ও অতীন্দ্রিয় বিষয় লইয়া কবি ও শিল্পীরা নিমগ্ন থাকিবার অবসর পাইবেন।

৪। "দরিদ্রের ক্রন্দন"

ইতিপূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্যের সমাজসেবা ও যুগধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার "দরিদ্রের ক্রন্দনে" শুধু কর্ম্মনিষ্ঠ জনহিতব্রত পল্লীসেবক ও শিল্প প্রচারককে যে আহ্বান করিতেছে তাহা নহে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে তিনি এক নূতন আন্দোলনকে আহ্বান করিতেছেন

দেশের চারিদিকে দরিদ্রের ক্রন্দন এখন মর্ম্মস্পর্শী হইয়া পড়িয়াছে। নিরক্ষর, কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবিগণের ক্রন্দনের রোলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদিগেরও রোদনধ্বনি মিশিয়াছে। নানাকারণে ইহাঁদিগের দারিদ্র্য আরও পীড়াদায়ক। ইহাঁদিগের হৃদয় বিদারক কষ্ট কিন্তু ইহাঁরা মুখ ফুটিয়া তাহা সমাজকে বলিতে চাহেন না। অস্ফুট বেদনায় তাঁহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সমাজে চিরকালই দারিদ্র্য থাকে; কিন্তু এক্ষণে আমাদের সমাজের দারিদ্র্য অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকার না করিলে জাতির ধ্বংস সম্ভবীন।

বাস্তবিক দারিদ্র্য সমস্যাই আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা। আমাদের সমস্ত আন্দোলনেই নিরর্থক হইবে যদি আমরা শীঘ্রই দারিদ্র্য নিবারণের জন্য একটা বিপুল আয়োজনে ব্রতী না হই।

দেশে বিবিধ কৃষিশিল্প ব্যবসায় অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করিবার জন্য এক্ষণে জনহিতব্রত কর্ম্মনিষ্ঠ শিল্প-প্রচারক ও পল্লীসেবকের প্রয়োজন। ইহাঁরা এই প্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া আমাদের পল্লী সমাজের দুর্গতি প্রতিকারে ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায় হইবেন, শিল্প ও ব্যবসায় অনুষ্ঠানের ধুরন্ধর হইয়া মধ্যবিত্তদিগের অন্নসংস্থানের সুযোগ বিধান করিবেন, এবং জনসাধারণের জন্য উপযোগী ও কার্য্যকরী যথোচিত আয়োজন করিয়া জনসমাজকে নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত এবং নূতন বিজ্ঞান বিদ্যায় কর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া তুলিবেন। দারিদ্র্য-পীড়িত সমাজের আশার কথা শুনাইয়া নূতন আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত ও নূতন কল্যাণ-কর্ম্মে ব্রতী করিবার জন্য তাঁহাদিগের ভাবুকতা চাই। দরিদ্রের ক্রন্দনে নিজে কাঁদিয়াও পরকে কাঁদাইয়া এই জননায়কগণ সমগ্র দেশকে এক কঠোর সাধনায় নিযুক্ত করিবেন। এই সাধনায় সিদ্ধি—দেশের দারিদ্র্য-মোচন। দেশের ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া আসিলে আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য অবলম্বন সার্থক হইবে। বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের সম্মিলন সম্ভবপর হইবে। হিন্দু সমাজ ভোগবিধ জর্জ্জরিত বিপর্য্যস্ত পাশ্চাত্য জগৎকে যে বাণী প্রচার করিবার জন্য এত দুঃসহ বেদনা অসম্মান ভোগ করিয়াও এখনও জীবিত হইয়াছে তখন সে বাণী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে দিগ্বলয় নিনাদিত করিয়া জগতে যুগান্তর আনিয়া দিবে।

সমগ্র সমাজ যাহাতে এই বিপুল দারিদ্র্য নিবারণ কার্য্যে অদম্য উৎসাহে ব্রতী হয় তাহার জন্য ঘরে ঘরে এক্ষণে দরিদ্রদের ক্রন্দন ও নিরন্নের হাহাকার, দরিদ্রদের অভাব অভিযোগ আর্ত্তের কথা সর্ব্বদাই প্রচার করিতে হইবে, কাব্যের ভিতর, উপন্যাসের ভিতর, নাটকের ভিতর, গান গল্প গুজবের ভিতর, দেশের সমগ্র সাহিত্যের ভিতর যাহাতে সমাজের গভীর মর্ম্মবেদনা যেন গুমরিয়া উঠিতে থাকে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জন সমাজের অভাব ও আদর্শ অল্পই স্থান পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "বঙ্গের কৃষক" ও দীনবন্ধু তাঁহার "নীলদর্পণে" দরিদ্রের করুণ আর্ত্তনাদ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট করিয়া দেশে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজ কালকার কোন সাহিত্যিক সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেরূপ কোন আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছেন না। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়! দরিদ্রের অবস্থা কি পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে? তাহা ত হয় নাই। বরং ক্রমশঃ মন্দই ত হইতেছে। তবে আমরা এখনও তাহাদিগের প্রতি উদাসীন কেন? তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমাদিগের সমাজ কি কখনও উন্নত হইতে পারে?

ভুল করিলে চলিবে না, যে অবনত দরিদ্রেরাই দেশের মর্ম্মস্থল। জনসাধারণ যদি ক্রমশঃ হীনবল ও অবনত হইতে থাকে, তবে সাহিত্যের জীবন কয়দিন? সুতরাং অচিরেই সমাজ ও সাহিত্য-জীবনের সেই মর্ম্মস্থল অবনত দারিদ্র্য-পীড়িত এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মূক বেদনা সাহিত্যের ওজস্বিনী ভাষায় প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে হইবে।

দরিদ্রের আকুল ক্রন্দন ভগীরথের শঙ্খধ্বনির মত বহুদিন হইতে সাহিত্য-সেবিগণকে আহ্বান করিতেছে। আপনাদের হৃদয় হইতে আন্দোলনের পবিত্র ধারা ভাগিরথীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া কি পতিত জনসমাজকে এখনও বঞ্চীবিত করিবে না?

* *
*

৫। কলেজ পত্রিকা

আজকাল প্রায় প্রতি কলেজেরই পত্রিকা বাহির হইতেছে। কলেজ যাহাতে ছাত্রজীবনে একটা জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে কতকটা সুস্পষ্ট চিন্তা বা ভাব ভাল করিয়া বুঝে, কলেজের জ্ঞাতব্য ঘটনাগুলি সকল ছাত্রই জানিবার সুযোগ পায় এবং বিবিধ বিষয়ে যাহাতে ছাত্রদিগের মধ্যে রচনার উৎসাহ জন্মে, মুখ্যতঃ ইহাই বোধ হয় কলেজ পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য। পত্রিকাগুলি সাধারণতঃ বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। কয়েকজন প্রতিনিধি ছাত্র মিলিয়া মিশিয়া একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ চালাইবার শিক্ষা ধীরে ধীরে এইরূপ অনুষ্ঠানের সাহায্যে লাভ করা যাইতে পারে। কলেজে চিন্তার ও ভাবের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এই পত্রিকাগুলি কিছু কাজ করিতে পারে। তবে সাহিত্য বিষয়ক সাধারণ আলোচনা ও প্রবন্ধের বাহুল্য অপেক্ষা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটাইবার উপযোগী সারবান্ রচনা এবং facts ও figures সমন্বিত স্বাস্থ্য, অর্থনীতি; সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞ অধ্যাপকের রচিত প্রবন্ধ ও তদ্বিষয়ে ছাত্রগণের আলোচনা থাকিলে পত্রিকাগুলির উপকারিতা সমধিক বৃদ্ধি পাইবে। পিতৃপ্রেরিত অথবা শ্বশুরনিষ্পেষিত অর্থে আমাদের দুলালগণ অনেকেই কলেজজীবনের খরচ চালান। বহু বিড়ম্বনার বিভীষিকা বক্ষে ধরিয়া নির্ম্মম ভবিতব্য যে কি করাল মূর্ত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ ছাত্রদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবে সে কথা কলেজে হোষ্টেলে থাকিবার সময় অনেকেই বুঝিতে পারে না। অনেক বিষয় যাহা অন্য দেশে নিতান্তই সাধারণ এবং সুবিদিত, আমাদের দেশে পাঠ্য পুস্তকে লেখা না থাকিলে জনকতকের মাত্র বিদিত। জীবনে উচ্চশিক্ষা

প্রাপ্ত ছাত্রের কয়েকটী অবশ্য পালনীয় নীতি (principle) মানিয়া চলা উচিত সেইগুলি আমাদের বোধ হয় এখনও অধিগত হইতে বিলম্ব আছে। ঘটনাপ্রবাহ আমাদিগকে যে দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, আমরা সেই দিকেই ভাসিয়া যাই। কলেজে আমরা পরীক্ষায় পাশ করিবার উপযোগী notes পাই, কিন্তু এই বহু দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত দেশে ও সমাজে অস্তিত্ব পরীক্ষার উপযোগী কোন সহায়তা কলেজে লাভ করি বলিয়া বোধ হয় না। কলেজের কোন গভীর, উদার, মনুষ্যোচিত শিক্ষার ছাপ (stamp) আমাদের চরিত্রে পড়ে না। তাই কলেজ পত্রিকাগুলির এক একটা কল্যাণকর সুর (healthy tone) দেখিতে চাই। নচেৎ নিতান্তই সাধারণ মাসপঞ্জী এবং ইংরাজী পুস্তক ও প্রবন্ধের প্রতিধ্বনিতেই কোনরূপ সার্থকতার সম্ভাবনা নাই। কলেজ বিশেষের যদি বিশেষ কিছু নিজস্ব শিখাইবার থাকে তবে পত্রিকার সাহায্যে তাহা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার সুবিধা হইতে পারে। নচেৎ এক এক কলেজের এক এক খানা ছাপা এবং ছবিওয়ালা রচনার বই কয়েকটা টুকরা খবর জোড়া দিয়া ছাপাইলে তাহাতে আর সার্থকতা কি ?

* *
*

৬। চুক্তিবদ্ধ "কুলী"

প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল সভ্যজগৎ হইতে দাসব্যবসায় লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আজও বিভিন্ন আকারে ঐ প্রথার প্রচলন রহিয়াছে। ট্রিনিডাড্, ব্রিটিশ গিয়ানা, সুরিনাম, ন্যাটেকা, ফিজি প্রভৃতি ব্রিটিশ-অধিকৃত উপনিবেশগুলিতে প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ হইতে কুলী চালান হইয়া থাকে। এ দেশে নানা স্থানে বেতনভোগী কুলী-সংগ্রাহকের অনেকগুলি আড্ডা আছে। তাহারা বিদেশের ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য মজুর সংগ্রহ করিয়া থাকে। অজ্ঞ, নিরক্ষর, দুর্ব্বলচিত্ত কৃষকগণ—তাহাদের প্রলোভনে ভুলিয়া বিদেশের টাকার স্বপ্ন দেখে। দেশে অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম নহে দেখিয়া তাহারা বিদেশে যাইতে স্বীকৃত হয়, এবং কুলী-সংগ্রাহকের দাদন লইয়া অঙ্গীকার পত্রে চুক্তি করিয়া দেয়। এই অঙ্গীকার পত্র অনুসারে তাহাদিগকে পাঁচ বৎসরের জন্য বিদেশে বণিক-প্রভুর অধীনে থাকিতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যাহারা সাধারণতঃ কুলী হইয়া বিদেশে যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয় দুর্ব্বল, মন নিস্তেজ। যাহাদের হৃদয়ে উৎসাহ আছে, এবং যাহারা মনের বলের কিছুমাত্র ধার ধারে, তাহারা সহজে আড়কাটীর প্রলোভনে বিশ্বাস করে না। এই দুর্ব্বলমতি হতভাগ্যগণ যখন "সোনার দেশে" যাইয়া দেখে, তাহাদের সমস্ত আশা বিফল, তখন তাহাদের অনেকেরই বুক ভাঙ্গিয়া যায়, এবং পরিশেষে কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়ায়।

আইন আছে যে ১০০ জন পুরুষ মজুরের সঙ্গে ৪০ জন স্ত্রী মজুর চালান দিতে হইবে। যে ব্যবস্থায়, গৃহ হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে বিদেশে অজানা স্থানে প্রতি ৩ জন পুরুষের সহিত ১ স্ত্রী কুলী পাঠান হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে ? ম্যাকনীল ও চিমনলাল মহোদয়গণ রিপোর্টে প্রস্তাব করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা ৫০ করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু এই সামান্য পরিবর্ত্তনে মজুরগণের মধ্যে নৈতিক উন্নতি আশা কিরূপে করা যাইতে পারে ?

হিন্দু স্ত্রী সহজে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিতে চাহে না। আড়কাটী তাহা ভাল করিয়া বুঝে। তাই তাহারা স্ত্রী মজুর সংগ্রহের জন্য নানারূপ বৈধ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা কখন কখন স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক স্বামীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যায়; কখন বা পথে একাকী পাইলে নানারূপ মিথ্যাবাক্যে প্রলুব্ধ করে; কখন কখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ক্ষণিক মনোমালিন্য ঘটিলে সেই সুযোগে স্ত্রীকে প্রলোভন দ্বারা ভুলাইয়া লইয়া যায়। এই সকল কুলবধূ শীঘ্রই কর্ম্মস্থানে কুলটাগণের সহিত মিশে। যে স্থান গৃহের কল্যাণ প্রভাব হইতে সহস্র ক্রোশ দূরে, যেখানে ১০০ জন পুরুষের সহিত ৪০ জন স্ত্রীলোককে অল্পপরিসর কুলী-নিবাসে বাস করিতে হয়, সেইরূপ স্থানে স্ত্রীলোকগণ বা পুরুষগণ কিরূপে আপনাদের চরিত্র রক্ষা করিবে? স্ত্রীপুরুষের নৈতিক স্বাস্থ্য ত সেখানে স্বভাবতঃই দূষিত হইয়া উঠিবে। তাই তাহারা সেখানে পশুর মত জীবন যাপন করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত ম্যাক-নীল ও শ্রীযুক্ত চিমনলালের রিপোর্টে প্রকাশ, স্ত্রীলোকগণের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র বিবাহিত স্বামীর সহিত বাস করে। বাকী দুই-তৃতীয়াংশের বেশীর ভাগ কোনও রূপ বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধের সম্পর্ক রাখে না। কেহ কেহ ঘৃণিত গণিকা-জীবন যাপন করে। ১৯১৪ সালে মার্চ্চ মাসে কলোনিয়াল অফিস (colonial office) পার্লামেণ্টকে (Parliament) যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা বেশ বুঝা যাইতে পারে।

	যুবক	যুবতী
ট্রিনিডাড্ ও টোব্যাগো	৩১৯৮৯	১৭১৫৯
ব্রিটিশ গিয়ানা	৪৩০৮৩	৩৪৭৭৯
জ্যামেকা	৭১৩৭	৪৭৭৫
ফিজি দ্বীপ	২০০৬২	৮৭৮৫

সার হেনরী কটন বলেন, স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার এই অস্বাভাবিক অনুপাতের ফলে নানারূপ কদর্য্য কলহ ও ঈর্ষ্যা বশতঃ প্রতি বৎসর যে কতশত নরহত্যা, আত্মহত্যা চলি-তেছে, তাহার বিবরণ এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। তবে ফিজি দ্বীপে জনসংখ্যার তুলনায় যত অধিক লোকের ফাঁসী হয়, এরূপ বোধ হয়, ব্রিটিশ শাসিত অন্য কোন দেশে হয় কি না সন্দেহ। প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত লোকের মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষের হতভাগ্য কুলী! আর হতভাগ্যগণের অনেকেরই অপরাধ দূষিত প্রণয়ের ঈর্ষ্যা ও কলহের ফল।

বিদেশে চুক্তিবদ্ধ কুলী চালানের আর একটি বিষময় ফল—আত্মহত্যা। ফিজি, জ্যামেকা প্রভৃতি উপনিবেশগুলিতে—যেখানে বৎসর বৎসর মজুর পাঠান হইয়া থাকে—আত্মহত্যা-ব্যাধি যেরূপ প্রবল, এরূপ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নহে। ফিজি দ্বীপের বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে, গত ৫ বৎসরে আমদানী মজুরের মধ্যে প্রতি ১০ লক্ষে ৯২৬ জন আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু যে সকল ভারতবাসী সে স্থানে স্বাধীন-ভাবে বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে আত্ম-হত্যার হার প্রতি ১০ লক্ষে ১৪৭ জন। গত ১৯১২ সালে উক্ত দ্বীপে আমদানী কুলীর প্রতি ৮৫৩ জনের ভিতর ১জন আত্মহত্যা করিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রমজীবি উপনিবেশগুলিতে যায়। কিন্তু ১৯০৮ সালের গণনা হইতে দেখা যায়—এই প্রদেশে প্রতি ২২৮৭৩ জনে ১ জন লোক আত্মঘাতী হইয়াছিল। দেশে

যতদিন বাস করে—ততদিন আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি খুব কম থাকে, আর বিদেশে যখন কুলীরূপে রপ্তানি হয় তখনই তাহাদের মধ্যে এই দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে—ইহার কারণ কি? কেনই বা ভারতীয় মজুরগণ বিদেশে যাইয়া এরূপভাবে আত্মহত্যা করিয়া থাকে? ম্যাকলীন ও চিমনলাল বলিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের ঈর্ষ্যা ও গৃহস্থালী-সংক্রান্ত বিবাদই ইহার মূল কারণ। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য কারণ আছে। যে দেশের অবস্থা যত শোচনীয় সেই দেশের আত্মহত্যার সংখ্যাও তত অধিক। আত্মহত্যার হার দ্বারা—দেশের দুর্দ্দশার পরিমাণ করিতে পারা যায়। দুর্ব্বল-মতি, নিরক্ষ মজুরগণ নানা প্রলোভনে ভুলিয়া অর্থের আশায়, গৃহ, স্বজন ত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিয়া দেখে—সেখানে প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ নিদারুণ নিষ্ঠুর, টাকার স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন—তখন তাহাদের সব আশায় ছাই পড়ে। তখন তাহারা গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হয়, অবশেষে মানসিক কষ্ট সহিতে না পারিয়া কেহ কেহ আপনার আশাহীন, আনন্দহীন, অত্যাচারক্লিষ্ট জীবন বিনাশ করিয়া থাকে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, দাদন দিয়া কুলী সংগ্রহের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথার শৈশবকাল অতীত হইয়াছে। সুতরাং ইহার পরীক্ষার অবস্থা এখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলাফল সম্বন্ধে এখন সকলে নিশ্চিত। ইহার প্রচলনে কিরূপ দাসত্ব ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। স্যর হেনরীকটন্, শ্রীযুক্ত সি এফ্ এণ্ড্রুজ, শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন প্রভৃতি ইংরাজগণ এবং ভারতের শিক্ষিত সমাজ আজ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এই ঘৃণিত কুপ্রথার একমাত্র প্রতিবিধান—ইহার লোপসাধন। একজন ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন—শ্রমজীবিগণকে যথেচ্ছনিয়োগ হইতে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। অতএব যদি চুক্তিবদ্ধ কুলী সংগ্রহ প্রথা আইন দ্বারা তুলিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা বোধ হয় বর্ত্তমান যুগের ভাবের বিরোধী কাজ হইবে না।

আমরা ঘরের কথা লইয়াই মগ্ন থাকি। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশ হইতে চুক্তিবদ্ধ মজুর প্রেরিত হয় না। সুতরাং এই বিষম সমস্যায় বাঙ্গালী উদাসীন। কিন্তু বাঙ্গালী কি এখন তাহার হতভাগ্য ভারতবর্ষীয় ভাইবোনদের কথা ভাবিবে না? দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে গান্ধী মহোদয়ের চেষ্টায় এক একবার আমাদের চোখ পড়িয়াছিল। যাহারা চোখের জলে বুক ভাসায়, তিল তিল করিয়া মরে, প্রতিদিন পশুত্বের অতল গহ্বরে নামিতে থাকে, যাহাদের জীবনে আত্মহত্যা, ফাঁসি একটা ব্যাধির মত চিরস্থায়ী উপদ্রব, সেই আশাহীন, শক্তিহীন নিরক্ষর ব্যথিত ভাইবোনগুলির কথা বাঙ্গালী এক একবার ভাবিও। তাহাদের দুঃখে সমবেদনা জানাইতে ভুলিও না। যতটুকু প্রতীকার তোমার চেষ্টায় হইতে পারে ততটুকু করিতে পরাঙ্মুখ হইও না। বাঙ্গালী! তুমি যে ভারতবাসী। মহাভারতবর্ষ যে তোমার জননী।

* *
*

জগতের একজন পরলোকগত সুসন্তান

সরল, নির্ভীক, সত্যের উপাসক, বিশ্বমানবের অকৃত্রিম সুহৃৎ কেয়ার হার্ডি মহোদয় আর মরজগতে নাই। জীবনের কর্ম্মরাশি

প্রাণপণে অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মবীর কেয়ার হার্ডি জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন। ইনি শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। বাল্যে নিজে মজুরের কাজ করিয়া অধ্যবসায় ও চরিত্রবলে জগতের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে একজন অসাধারণ কর্ম্মীরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধিরূপে তিনি যে নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রীয়জীবনে একটা নূতন শক্তিস্রোতের ধাক্কা লাগিয়াছিল। সেই শক্তির নূতন স্রোত—শ্রমজীবি-সম্প্রদায় অর্থাৎ মজুরের দল। সত্যের খাতিরে, ন্যায়ের অনুরোধে তিনি কখনও মানুষকে ভয় করিতে শিখেন নাই। যাঁহার আপাদমস্তক মনুষ্যত্বে বলিষ্ঠ, যিনি আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া সামান্য মজুর হইতে বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধাস্পদ আসনে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন যে একটা তেজের আগ্নেয়গিরির মত প্রতিভাত হইবে তাহা ত স্বাভাবিক। ইংলণ্ডের জীবনীশক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয়—মজুরের দল হইতে একজন বিশ্ববরেণ্য কর্ম্মবীর উঠিতে পারে। শ্রমজীবি সম্প্রদায় ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি নূতন শক্তি। কিন্তু এই শক্তি শৈশবেই যেরূপ তেজস্বিতা ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে আর দ্বিধা থাকিতে পারে না যে মানবের ভবিষ্যৎ উপেক্ষিত নিম্নস্তরের জনসাধারণের মনুষ্যত্বের জাগরণের গৌরবে ও কর্ম্মে ধন্য হইবে। কেয়ার হার্ডি মহোদয়ের স্বদেশপ্রেম কোনও দিন বিশ্বহিতের বিরোধী হইয়া উঠে নাই। স্বজাতির উদরপূর্ত্তি ন্যায়ধর্ম্ম পদদলিত করিয়া ছুটিবে—এ কথা এই মজুরনেতার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধর্ম্মের প্রতিকূলে তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়া জগতের লোক তাঁহার চরণে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ঢালিয়া দিয়াছে। মানুষ অন্য কিছুর সহায়তা না লইয়া শুধু মনুষ্যত্বের বলে কতবড় হইয়া উঠিতে পারে, মানুষের সত্য সাধনা তাহাকে কিরূপ শক্তিমান করিয়া তোলে, মজুরের বুকে কি প্রকাণ্ড বীর হৃদয় প্রচ্ছন্ন থাকা সম্ভব, তাহা কেয়ার হার্ডি মহোদয়ের জীবনবৃত্ত হইতে মানুষ শিখিতে পারিবে।

নিজে মানুষ বলিয়াই মানুষ, মানুষ বলিয়াই বড়, ধনী বলিয়া বড় নহেন, এমন নরোত্তমের মনুষ্যত্বগৌরব বিরাট মূর্ত্তি যাঁহারা, তাঁহারা বিশ্ববাসীর পরমাত্মীয়। তাঁহাদের মাতৃভাষা যে দুর্ব্বল, নিষ্পেষিত, উপেক্ষিত মনুষ্যসমষ্টিকে ডাকিয়া বলে, "উঠ, তোমরা মানুষ। শক্তি বাহিরের জিনিষ নহে, ভিতরে খুঁজিয়া দেখ, আপনার মাঝে অনুসন্ধান কর দেখিতে পাইবে কি বিপুল শক্তির অধীশ্বর তোমরা। তুমি মজুর, তুমি দরিদ্র; কিন্তু তুমি যে মানুষ। বিলাস-বিভব, সুযোগ-সুবিধা তোমাকে তাহাদের প্রসন্ন হাস্যে অভিনন্দিত করে নাই। কিন্তু বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান মনুষ্যত্ব যে তোমাদের জন্মলব্ধ অধিকার। সেই সম্পদের গর্ব্বে বুক বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। তোমাদিগকে পঙ্গু ও অক্ষম করিবার জন্য দায়ী তোমরা নিজেরা। নিরাভরণ মনুষ্যত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব মুকুট। সেই অক্ষয় গৌরবের উপযোগী হইবার নিমিত্ত মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তোল।" কেয়ার হার্ডির মত মানুষ বিশ্বমানবের জাতি। দেশ, কাল, ধর্ম্ম, সমাজ নির্ব্বিচারে ইহাঁরা মানুষের আত্মীয়। ব্যথিতের বেদনা সহস্র ক্রোশ দূরেও ইহাঁদের বুকে বাজে। লাঞ্ছি-

তের আর্ত্তনাদ এইরূপ মহাপ্রাণ কর্ম্মবীরের জীবন শান্তিহীন করিয়া তোলে। আজ তাই এমন মানুষের মৃত্যুতে পৃথিবী দরিদ্র। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় তিনি একবার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন; দুইদিনের ভবঘুরের মত ফটোর ক্যামেরা ঘাড়ে করিয়া আসেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন একটা প্রকাণ্ড শক্তিশালী হৃদয় লইয়া। ভারতবর্ষ সেইজন্য তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রেমের অর্ঘ্য পাইয়াছিল ভারতবাসী এই পুরুষসিংহের পরিচয় পাইয়া মনুষ্যত্বের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। কেয়ার হার্ডি মহোদয়ের মৃত্যুতে তাই আজ ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করিতেছে।

* * *

৮। সমাজ-শাসন

আমরা "উপাসনার" লেখক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত বি, এ মহাশয়ের নিকট সামাজিক ব্যাধি ও প্রতিকার সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ আলোচনা পাইয়াছি। এ বিষয়ে সমাজের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মন দেওয়া কর্ত্তব্য। সমাজে শাস্ত্র অথবা নব্য শিক্ষার দোহাই দিয়া যে উচ্ছৃঙ্খলতা এখন দেখা গিয়াছে, তাহা এখনি দূর করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয়ত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হইবে।

* * *

বাঙ্গালায় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের প্রধান দোষ হইয়াছে দলাদলি। একদল গোঁড়া সেকেলে হিন্দু, আর একদল নব্য একেলে হিন্দু। এই উভয় দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটা ভণ্ডামির ভাব আবালবৃদ্ধ বনিতাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া বা অনিচ্ছায় লোক মাত্রেই বিকৃত বা নিষিদ্ধাচারে দূষিত হইতেছে। সমাজের ভয় মুখে আছে, কিন্তু ভণ্ডভাবে সমাজ-নিন্দিত আচারের অনুষ্ঠান হইতেছে। স্থবির সমাজের বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে অন্ধভাবে মানিয়া চলাতে প্রাচীনদল একেবারে অচল, নব্যদল সেই সব বিধিনিষেধ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে না মানাতে অত্যন্ত বেগশীল।

(১) সমাজের এক অঙ্গ একেবারে অচল, অন্য অংশ অত্যধিক বেগে মাত্রাধিক পরিমাণে সচল। ফলে উভয় অঙ্গের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী (Organic) সম্বন্ধ থাকা কঠিন হইয়াছে। সমাজ থাকিলেই এইরূপ দুইটা দল থাকিবে, দুইটা দল থাকা নিন্দনীয় নহে, দূষণীয় হইতে উভয় দলের মধ্যে প্রতিরোধী ক্রিয়া। এই দুই দলের মধ্যে আচার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বুঝা পড়া হইলে সমাজে এ ভণ্ডামি, মিথ্যাচার তিনভাগ কমিয়া যায়। প্রাচীন দলকে বুঝিতে হইবে অতীত গৌরবজনক হইলেও অতীতের প্রতি অন্ধানুরাগ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। সমাজ-যন্ত্র জীব-যন্ত্রের মত বর্দ্ধনশীল, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনে উহার নব নব প্রয়োজন ঘটে, সকল নব নব প্রয়োজন অতীতের আচার ও নিয়মে পূরণ করা যায় না।—দেশ কাল ও অবস্থানুসারে সমাজের পুনঃসংস্কার প্রয়োজন হয়। মনুর সময় মনুই প্রবল, রঘুনন্দনের সময় রঘুনন্দন প্রবল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নূতন মনু ও নূতন রঘুনন্দন প্রয়োজন। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সবই বর্দ্ধনশীল ও চলনশীল, আর মানুষের সমাজ কি তাহার নিয়মের বাহিরে? নব্যদলেরও বুঝা উচিত, সংস্কারের দোহাই দিয়া যে উচ্ছৃঙ্খলের অবতারণা তাহাতে গৌরব ও মঙ্গল কিছুই নাই। শত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও জাতির একটা জাতীয়ত্ব আছে, সেই জাতীয়ত্ব একটা সনাতন Type এর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকে

বজায় রাখিতে হইবেই। বৈদেশিক নিষ্ঠা বা পরানুকরণপ্রিয়তা, প্রাচীনের প্রতি বিরাগ, সংস্কার নহে, পরন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার। উহার মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় খুব সোজা কথা নহে যেমন Ethiop তাহার চামড়া ও Leopard তার Spot বদলাইতে পারে না তেমনি কোন ব্যক্তি তার জাতীয়ত্ব বদলাইতে পারে না। বাহ্যিক পরাচার ও পরানুষ্ঠানে এক জাতীয়ত্ব গিয়া অন্য জাতীয়ত্ব আসে না। যদি কেহ বংশানুক্রম মানেন তিনি বুঝিবেন হাজার হাজার বৎসরের অভ্যস্ত মানসিক, আধ্যাত্মিক অভ্যাস যাহা হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছে তাহা বদলায় না। বদলাইবার চেষ্টা করিলে জাতির বৈরূপ্য ও বৈকল্য আসে, কোন মতে একটা নূতন জাতি হয় না। আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া যে বিধি ব্যবস্থায় ও সংস্কারে ও ভাবে গঠিত হইয়াছি সেই ভাবে গড়িয়া উঠাই আমাদের প্রকৃতি। উহাই আমাদের প্রকৃতিগত বীজ। যে আবহাওয়ায় বা যে মাটীতেই রোপণ করা যাক ঐ বীজই অঙ্কুরিত হইবে। সনাতন আদর্শেই পুনর্গঠিত হইয়া উঠাই আমাদের পক্ষে সহজ। সুতরাং সনাতন ভিত্তি বজায় রাখার দরকার। তবে নূতন মাল মস্‌লা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করায় দোষ নাই বরং মঙ্গলজনক। চিত্র শিল্প সম্বন্ধে আমাদের দেশে এই ভাবটা ফিরিয়া আসিয়াছে।

দাঁড়াইতেছে এই যে প্রাচীন বিধিনিষেধের মধ্যে কোনও কোনটা মানিতে হইবে, কতক বদলাইয়া নূতন বিধিনিষেধ চালাইতে হইবে। কথা হইতেছে কে বলিয়া দিবে কে স্থির করিবে কোন্ বিধি মানা উচিত কোন্ বিধি তুলিয়া দেওয়া উচিত! সমস্যা দুই (১) কোন্ বিধিনিষেধ পালনীয়, কোনটা বা অপালনীয় (২) এবং পালনীয় ও অপালনীয় কে ইহা স্থির করিয়া দিবেন?

আমার বোধ হয় জাতীয় উন্নতির অন্তরায় যে বিধি-নিষেধ তাহা কোন মতেই পালনীয় নহে। কোন্ বিধিনিষেধ জাতীয় উন্নতির অনুকূল ও প্রতিকূল ইহা বিচার কে করিবে? কতকটা নিজে কতকটা জনসাধারণ করিবে। সহজ জ্ঞানে মোটামুটী তার একটা ধারণা হয়। আবার অনেক সময় তার মীমাংসাও কঠিন হয়। রঘুনন্দন যখন নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন তখন সমাজ ও সনাতন ধর্ম্মের অনুকূলতা প্রতিকূলতাকে বিধিনিষেধের চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছিলেন।

তখন সমাজ জীবিত ছিল, শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ অনায়াসে সদর্পে অন্যান্য অঙ্গকে চালিত করিয়া ছিলেন, এখন শীর্ষ, পদ, হস্ত, উদর সব অঙ্গই স্ব স্ব প্রধান, কে কাহার কথা শুনিবে? ব্রাহ্মণ-সমাজ জীবিত থাকিলে, বর্ত্তমান শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের কেহ না কেহ নূতন রঘুনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইতেন এবং বিংশ উনবিংশ শতাব্দীর ভারতকে নূতন উদার নৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা চালিত করিতেন এখন "নদে যদি মত দেন, ভাটপাড়া দেবেন না" এইরূপ অবস্থা আর "পিসে যদি ঘরে নেন, মেসো নেবেন না"। বঙ্গদেশের যাবতীয় প্রধান কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচন প্রথানুসারে উদার নৈতিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে মিলিত করিয়া একটা ধর্ম্ম-মহামণ্ডল গঠিত করিয়া সমাজ ব্যবস্থার ভার দিলে কেমন হয় জানি না। এই সকল পণ্ডিতের বিদ্যাসাগরের মত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবে সমপুষ্ট হওয়া দরকার। শিক্ষিত জনসমাজ এই সভার পশ্চাতে থাকিয়া বল সঞ্চার করিবেন। এই-ই যে

উপায় আর প্রকৃষ্ট উপায় তাহা বলিতেছি না। পাঁচজনে যেমন একটা উপায় আন্দাজ করেন আমিও তাই করিতেছি, ইহার সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে। কথা হইতেছে একজন শাসক ও ব্যবস্থাপক (রাজাই হউন বা সভাই হউন) নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তদভাবে, প্রাচীনের অচলনশীলতা ও নবোর উচ্ছৃঙ্খলতা এই উভয়ের বিরোধ ও সামাজিক অন্যান্য দোষের কোন প্রতিকার নাই। বঙ্গদেশীয় একজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে (বয়স প্রায় ৬০.৬৫) একবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছি—বক্তৃতাকালে তিনি ধর্ম্মাভাব, মিথ্যাচার, স্বেচ্ছাচার, শাস্ত্রহীনতা লক্ষ্য করিয়া নব্যদিগকে ঘোরতর গালি দিয়াছিলেন। আমি কেবল বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ইনি কেন ৫০ উর্দ্ধে বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়া ৬০,৬৫ বৎসর বয়সে বিষয়াসক্তির চরম দেখাইতেছেন? কে ইহার উত্তর দিবে?

উচ্ছৃঙ্খল উভয়েই, শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন, ও অশাস্ত্রজ্ঞ অর্ব্বাচীন! কালধর্ম্মই প্রবল, শাস্ত্র ধর্ম্ম নহে। উভয়ে কাল-ধর্ম্মের কবলগ্রস্ত। তথাপি সময়োপযোগী ও অবস্থা উপযোগী সংস্কার করিব না।

(২) সমাজের দ্বিতীয় ব্যাধি প্রধান প্রধান বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে বহু শ্রেণী বিভাগ। ফলে বিবাহের ক্ষেত্র পরিসরের সঙ্কীর্ণতা। বহু বৎসর ধরিয়া কায়স্থদিগের মধ্যে কুলীন, মৌলিক ভেদ, ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে, মেল বন্ধন। এই ক্ষেত্রকে এতই অল্প পরিসর করিয়াছে যে Free intermixture of blood হইতে না পাইয়া জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ না চলিত হউক, প্রধান বর্ণের মধ্যে শ্রেণী বিচার তুলিয়া দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। যে জাতীর বিবাহ বন্ধন প্রথা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল তাহারই এখন অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে! কৌলীন্য প্রথা ইহারই চরম ফল। সৌভাগ্য বলে উহা প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে।

(৩) বিবাহের বরপণ প্রথা যে কি পরিমাণ অনিষ্টজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইতে হয় না। সম্প্রতি ইহার চরম পরিণতি অবিবাহিতা কুমারীদিগের আত্মধ্বংসে দাঁড়াইয়াছে। কঠিন জীবন সংগ্রাম, অর্থাভাবে ক্রমশঃ কঠিনতর দাঁড়াইতেছে। তাহার উপর ভীষণ কন্যাদায় শিক্ষিত, মধ্যবিৎ সম্প্রদায়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে! ইহার প্রতিকার কি? মানুষ স্বার্থপর, দরিদ্র মানুষ আরো স্বার্থপর, পতিত অধীন জাতীয় দরিদ্র মানুষ ততোধিক স্বার্থপর। প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করাইয়া ইহার প্রতিবিধান নাই। আর "সমাজ" নামে যে অলক্ষ্য অস্পর্শ অরূপ অবায় শক্তি তিনি কন্যাদায়গ্রস্তের বন্ধু নহেন, শত্রু, কেননা, কন্যাদায় গ্রস্ত যদি অর্থাভাবে সৎ-পাত্রে দিতে না পারায় যদি সে কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখে তবে তখন "সমাজ" সশস্ত্র, স্বরূপ ভীষণ ভ্রূকুটী সহকারে তাহার জাতি নষ্ট করিতে উদ্যত।

ইহার প্রতিকার কি? আর্ত্ত রক্ষকের শরণ লয়। যখন সমাজ-রক্ষক ছিলেন আর্ত্ত আশ্রয় লইত অভয় পাইত। এই কন্যাদায়-গ্রস্ত দীন ব্যক্তি কার কাছে শরণ লইবে? রাজা পরধর্ম্মী ভারতীয় প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সমাজ-শাসক কে আছে? এই আর্ত্তকে অভয় দেয়? মুসলমানকে ছুঁইলে স্নানাস্নান করিতে হয় বিধান্ করিয়া-

ছিলেন কে জানি না; কিন্তু তাঁর নিষেধ এখনও কোটী কোটী বাঙ্গালী নতমস্তকে পালন করে; এমন কেহ কি এখন নাই যিনি অমিত প্রতাপে বিধি ব্যবস্থা করিতে পারেন "যে কন্যার পিতার কাছে পুত্র বিক্রয় করিয়া অর্থ লইবে তাহার এই এই প্রায়শ্চিত্ত" এবং সকলে সেই নিষেধ সভয়ে মানিয়া চলিবে?

৪। বাল্য বিবাহ।—বালক ও বালিকাদের বিবাহ কতদিন চলিয়া আসিতেছে জানি না। অতি প্রাচীন যুগে (সে সময়ের শাস্ত্র বিধানের দোহাই পদে পদে দেওয়া হয়) কিন্তু এ প্রথা ছিল না। বাঙ্গালা দেশে কতদিন হইতে ইহা প্রচলিত তাহা জানি না; তবে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক কমিয়াছে, বিশেষতঃ উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিতদের মধ্যে শৈশব বিবাহ নাই, তবে বাল্য বিবাহ আছে। এখনো যে পরিমাণে আছে তাহাও রোগের প্রধান মূল। অধ্যয়নাবস্থায় সে কালের ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা ছিল, অধ্যয়নই এ বয়সের একমাত্র যোগসাধনা ছিল। বিবাহের বয়স আলাদা ছিল। এখন তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। অধ্যয়নাবস্থাতেই বিবাহ দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে পিতামাতাই ১৬ আনা দোষী। গৌরীদান ফললাভ, অর্থলাভ, পৌত্রমুখদর্শন সুখলাভ এই ত্রিবিধ লাভ পিপাসাই বাঙ্গালীকে এই বংশ হত্যায় নিয়োজিত করিয়াছে। 'বংশরক্ষা' নহে 'বংশহত্যা'। অপরিপুষ্ট দেহে পুত্রোৎপাদন করিয়া, অপরিপুষ্ট, চিররোগী সন্তান সন্ততির জন্মদান, অর্থাভাবে যাবজ্জীবন তাহাদের পরিমিত আহার ও শিক্ষাদানে অসমর্থতা বশতঃ ভবিষ্যতে তাহাদিগকে অক্ষম ও উপায় হীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া—ইহা যদি বংশ হত্যা না হয় তবে বলে?

শিক্ষা শেষ করিয়া অর্থোপার্জ্জন ক্ষমতা লাভের পূর্ব্বে ২।৪টী সন্তান সন্ততির জন্ম। প্রথমটী যদি কন্যা হইল, তাহা হইলে অর্থোপার্জ্জন করিবার পূর্ব্বেই 'কন্যাদায়' তারপর স্বপ, তারপর অর্দ্ধাশন, তারপর অনশন! মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যুবকের শতকরা ৮০ জনের এই পরিণাম! তবু পিতামাতা পুত্রদিগের অল্প বয়সে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক! উদ্দেশ্য হয়, পুত্র বিক্রয়ে অর্থলাভ, না হয় অত্যন্ত নির্ব্বোধ ইচ্ছা, বংশরক্ষা; অধ্যয়ন শেষ পূর্ব্বে যৌন সম্বন্ধে বদ্ধ হওয়া পাপ ইহা কোন সমাজশাসক বিধিবদ্ধ করিবেন? অপরিপুষ্টাঙ্গ ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার গর্ভে হীনবীর্য্য ১৯।২০ বৎসর বয়স্ক যুবকের ঔরসে বাঙ্গালায় যে ভবিষ্য বংশ জন্মিতেছে তাহাই কি জাতীয় উন্নতির সূচনা?

এ ঘোরতর জাতিধ্বংসকর কুপ্রথার বিরুদ্ধে কার বজ্রগম্ভীর স্বর উঠিবে, কার নিষেধতর্জ্জনী সদর্পে উত্থাপিত হইবে।

বালিকা বধূ দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামী হারা হইয়া চিরজীবনে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে আর জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তৃতীয় পক্ষে পৌত্রী বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তার জীবনের সমস্ত সুখসাধের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে এ বিচিত্র ব্যাপারের কোন প্রতিকার কি হয় না? যে বয়সে বৃদ্ধ ভগবৎ চিন্তায় চিত্ত সমর্পণ করিবে, সেই বয়সে সে পুনর্ব্বার ঘৃণিত ভোগসুখে রত হইবে, আর যার ভোগ সুখের বয়স, সে সেই বয়সে ভোগসুখে বঞ্চিত থাকিয়া প্রবৃত্তির সহিত ঘোর সংগ্রাম করিয়া হয় কুপথে যাইবে, না হয় মানুষ গৌরব হীন দগ্ধজীবন নির্ব্বাহ

করিবে এ বিষয়ে আচারের বিরুদ্ধে শাসন-দণ্ড তুলিবার কে আছে ?

তাই বলিতেছি আমাদের সমাজের প্রধান অভাব একজন সমাজ-শাসকের। সমাজ-শাসক বলিয়া যাঁহাদের গর্ব্ব আছে তাঁহারা সমাজ-শাসক, সমাজ-নিয়ন্তা নহেন, এককালে ছিলেন বটে। নূতন অভাব বুঝিয়া, নূতন প্রয়োজনানুসারে, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নূতন বিধি বিধান করিয়া থাকেন। বিধান করিবার ও শাসন করিবার কে আছে ? কেহ না থাকিলে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় সমাজ উচ্ছৃঙ্খলভাব অবলম্বন করিবে। দূষণীয় প্রথা ও আচারের প্রাবল্য বাড়িবে, জাতীয় জীবন শক্তিহীন থাকিয়া যাইবে।

আমার বিশ্বাস এই ব্রাহ্মণ জাতিই সমাজ-শাসকের পদে থাকিবেন। এখনও ভারতের শতকরা ৯০ জন ব্রাহ্মণকে সমাজগুরু বলিয়া মানে না। কাজেই ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন জাতির কর্তৃত্ব ভারতবাসী সহজে মান্য করিবে না। নবযুগের কর্ণধার নূতন ব্রাহ্মণ ভারতে কবে দেখা দিবেন ?

মার্কিণ রাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল্ কেন্দ্র

(১১১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

ফেডার‍্যাল্ দরবারের রাষ্ট্র-কেন্দ্র

(১১) তথাকথিত মন্‌রো নীতি

ভারতবর্ষের চরমপন্থী রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-কারিগণ রব তুলিয়াছেন "ভারতবর্ষ ভারত-বাসীদিগেরই একচেটিয়া কর্ম্মক্ষেত্র থাকিবে—বিদেশীয় জনগণের কর্ত্তৃত্ব কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।" বিদেশীয় দ্রব্যাদিবর্জ্জন বয়কট বা বহিষ্কার এই আন্দোলনের এক অঙ্গ। সর্ব্বতোমুখী বহিষ্কারের নীতিকে ইংরাজীতে বলা হয় "India for the Indians." সেইরূপ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আজকাল এশিয়ার রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ রব তুলিতেছেন—"Asia for the Asiatics" অর্থাৎ এশিয়ায় কোন ইয়োরোপীয় অথবা আমেরিকান জাতির প্রভুত্ব থাকিতে পারিবে না—এশিয়ার বৌদ্ধ মুসলমান ও হিন্দুজনগণ তাহাদের নিজ নিজ সমস্যা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মীমাংসা করিবে।" এইরূপ বহিষ্কার-নীতি ইয়াঙ্কিস্থানেও একটা আছে। সেই কুখ্যাতিকে বলা হয় Monroe Doctrine. ঊনবিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে মন্‌রো যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ছিলেন। ইনি উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জকে বয়কট করিবার জন্য এক সূত্র প্রচার করেন। সেই নীতি ইয়াঙ্কিরা এখনও প্রচার করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের যেখানে সেখানে মন্‌রো-নীতির উল্লেখ হয়। স্বদেশের কথা ছাড়িয়া বিদেশের কোন কথা তুলিলেই ইয়াঙ্কিরা এই সূত্র আওড়াইয়া থাকে। ইহাই যুক্তরাষ্ট্রের Foreign Policyএর (পর-রাষ্ট্র-নীতির) প্রধানতম স্তম্ভ।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটার্লুর সমরে নেপোলিয়নের অবসান হয়। তাহার পর ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় সীমাগুলি কিছুকালের জন্য স্থির থাকে। এই সময়ে ইয়োরোপীয় নরপতিবর্গ সম্মিলিত হইয়া একটা দরবার স্থাপন করেন। কোন দেশের জনসাধারণকে বিদ্রোহী অথবা প্রজাতন্ত্রশাসনের পক্ষপাতী হইতে না দেওয়াই ইঁহাদের সমবেত স্বার্থ ছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব হইতে ইয়োরোপে যে তাণ্ডব সৃষ্ট হয় তাহার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করাই সেই যুক্ত দরবারের উদ্দেশ্য। এই সম্মিলনীর নাম Holy Alliance (ধর্ম্মসম্মিলন)। রাজারা বুঝিয়াছিলেন,—"প্রজারা democracy, constitution, স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদির জন্য বিপ্লব সৃষ্টি করিলে দেশের সর্ব্বত্র অধর্ম্ম ও দুর্নীতি প্রসারিত হইবে। সয়তানের প্ররোচনায়ই জনসাধারণ

এইরূপ রাজদ্বেষী হইতেছে। রাজভক্তিই ধর্ম্মসঙ্গত—বিপ্লবসাধন অধর্ম্মের কথা। অতএব সমাজে ধর্ম্মরক্ষার জন্য রাজাদিগের ব্রতবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এইরূপ হইলেই ইয়োরোপে রাজতন্ত্রশাসন (monarchy) রক্ষা পাইবে—প্রজাবৃন্দকে দাবিয়া রাখা যাইবে—বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই নষ্ট করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইবে।" বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্র-শাসন খর্ব্ব করিয়া রাজ-শক্তিকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য নৃপতিগণ 'ধর্ম্ম-সম্মিলন' প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এ দিকে আমেরিকার নরনারীগণ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজয়ের সনন্দ লাভ করিয়াছে। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইয়াঙ্কিরা একটা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র-শাসনাধিষ্ঠিত যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। জগতে প্রজা-তন্ত্রশাসনের প্রতিষ্ঠা এই প্রথম। ফরাসীরা তখনও বিপ্লব সুরু করে নাই। কাজেই ইয়াঙ্কিদিগকে জগতে প্রজাতন্ত্রশাসনের সুফল দেখাইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইত। ইংরাজেরা ইয়াঙ্কিদিগকে জব্দ করিবার উপায় সর্ব্বদাই খুঁজিতে লাগিলেন। ইয়োরোপের অন্যান্য রাজারাও এই অভিনব বিপ্লবকারীদিগের কাজকর্ম্ম ও রাষ্ট্রপরিচালনা দেখিয়া ভীত হইলেন। তাঁহাদের ভয় পাছে আর্য্যাণ, ইতালীয়, রুশ ইত্যাদি লোকেরা ইয়াঙ্কিদের দৃষ্টান্তে রাজদ্বেষী হইয়া পড়ে। ইয়াঙ্কি প্রজাতন্ত্রশাসন বাস্তবিকই ইয়োরো-পীয় রাজগণের নিকট একটা উৎপাত স্বরূপ ছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজে ইয়াঙ্কিতে পুনরায় যুদ্ধ বাধিল—ইংরাজেরা পুনরায় হারিলেন—প্রজাতন্ত্রশাসন টিকিয়া গেল। কাজেই যখন "ধর্ম্ম-সম্মিলন" প্রতিষ্ঠিত হইল ইয়াঙ্কিরা বুঝিলেন "ইয়োরোপীয় রাজাদের মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে—ইহারা নিতান্তই বাড়াবাড়ি করিতেছেন।" কিন্তু ইয়াঙ্কিরা তখনও অতি দুর্ব্বল—ঘর সামলা-ইতেই পুরাপুরি সমর্থ নন—কাজেই কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া দূর হইতে দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনের অধোগতি ঘটে। সেই সুযোগে স্পেন-সাম্রাজ্যের দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে থাকে। স্বাধীনতা লাভ করিয়াই জনগণ প্রজাতন্ত্রশাসনের পক্ষ-পাতী হয়। একে বিপ্লব, তাহার উপর স্বাধীন শাসন (republic বা ডিমক্রেসী)। কাজেই "ধর্ম্মসম্মিলনে"র চিন্তায় সয়তানের আস্ফালন এবং ইয়াঙ্কিদের বিবেচনায় কতকগুলি মিত্র-লাভ। স্পেন Holy Alliance এর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন—"বিদ্রোহী উপনিবেশ-গুলিকে আমার সাম্রাজ্যের বশে আনিয়া দিন।" "ধর্ম্মসম্মিলন" হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। ইয়াঙ্কি সভাপতি মনরো গম্ভীরভাবে বলিলেন, "খবরদার—আমেরিকা ভূখণ্ডে কোন ইয়োরোপীয়ান হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ইয়োরোপের মামুলি রাষ্ট্র-নীতি আমেরিকায় প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না। আমেরিকার লোকেরা আমেরিকার উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ প্রান্তের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ। আজ পর্য্যন্ত যে সকল ইয়োরোপীয়ানের সম্পত্তি এই নবভূখণ্ডে রহিয়াছে তাহা ভবি-ষ্যতেও থাকিবে। কিন্তু এই মহাদেশের আর এক ছটাক জমিও কোন ইয়োরোপীয়ান্ জাতি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারিবেন না।" এই ইয়োরোপীয়-বহিষ্কার-ঘোষণাই মনরো-নীতি। নানা কারণে "ধর্ম্মসম্মিলন"

স্পেনের সাহায্য করিতে অসমর্থ ঘটনাচক্রে ইংরাজও কতকগুলি স্বকীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ইয়াঙ্কিদের কথাই সায় দিলেন। মোটের উপর মনরোর জয় হইল। ইয়াঙ্কিরা প্রকারান্তরে সমগ্র আমেরিকাখণ্ডের অভিভাবক হইলেন। ইয়োরোপীয়েরা দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলি ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইবার অবসর এখনও পায় নাই। "The Republics of Central and South America" নামক গ্রন্থের Foreign Relations and commerce অধ্যায়ে Enock বলিতেছেন—"There is little doubt that the partition of various territories of Latin America by certain European powers, would have taken place were it not for the restraining influence of the United States."

ইয়াঙ্কিরা ইয়োরোপ হইতে দূরে থাকিতে ভাল বাসিতেন। যুক্তরাষ্ট্রের পিতাস্বরূপ জর্জ্জ ওয়াশিংটনও ইয়াঙ্কিদিগকে ইয়োরোপ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"ইয়োরোপের সঙ্গে ব্যবসায় চালাইবে। কিন্তু কোন ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন প্রকার সন্ধিস্থাপন করিবে না। ইয়োরোপীয়েরা বড় কূটজ্ঞী—উহাদের গোলযোগের ভিতর একবার প্রবেশ করিলে বাহির হওয়া কঠিন হইবে। আমরা শিশুজাতি—আমাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার জন্য সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাহা ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রশাসন-প্রণালী জগতে নূতন। পুরাতন সভ্যতার অধিকারীরা এ তত্ত্ব বুঝিবে না। কাজেই উহাদের সঙ্গে আমাদের না মেশাই ভাল।" ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ ওয়াশিংটন জনগণকে বিদায় বক্তৃতায় বলেন—

"The nations of Europe have important problems which do not concern us as a free people. The causes of their frequent misunderstandings lie far outside of our province, and the circumstance that America is geographically remote will facilitate our political isolation, and the nations who go to war will hardly challenge our young nation, since it is clear that they will have nothing to gain by it."

সভাপতি জেফারসনও এইরূপ মতই পোষণ করিতেন। পরে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে Holy Alliance-এর কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া সভাপতি মনরো কংগ্রেসকে লিখিয়া পাঠান—

(১) "We should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety.

(২) We could not have any interposition for the purpose of oppressing governments on this side of the water whose independence we had acknowledged or controlling in any manner their destiny by any European power, in any other light than as a manifestation of an unfriendly disposition toward the United States."

ইয়াঙ্কিদের এই চোখ রাঙানি দেখিয়াই ইয়োরোপীয়েরা হতভম্ব হইয়া যায় নাই। ইয়োরোপীয়েরা নিজ নিজ গৃহবিবাদ মিটাইতে ব্যস্ত ছিল—এজন্য দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার নূতন দেশগুলির ভিতর স্বকীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বেশী নজর দিতে পারে নাই। ১৮২৩ সালের পর ইয়োরোপের ভিতর তিন চারিটা বড় বড় বিপ্লব সাধিত হইয়া গিয়াছে। সেই সকল সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারা সহজ কথা নয়। ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ, ইতালীয়, হাঙ্গারীয়ান, স্লাভ এবং অন্যান্য জাতীয় নরনারী ল্যাটিন আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছে। এশিয়া হইতে জাপানীরাও ল্যাটিন আমেরিকায় উপনিবেশ বসাইতেছে। ল্যাটিন আমেরিকার ২০ স্বরাজে এই সকল বিদেশীয় বসতি হইতে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় গোলযোগ উপস্থিত হইবে। "মন্‌রো-নীতি"র দোহাই দিয়া ইয়াঙ্কিরা ইয়োরোপীয়ান অথবা এসিয়াটিক পীতজাতিকে হঠাইতে পারিবেন না। সেনাবল এবং নৌবল সাহায্য না করিলে একমাত্র বাক্যবলে জার্ম্মাণ বা জাপানীকে ল্যাটিন আমেরিকা হইতে বিতাড়িত করা অসম্ভব হইবে। মন্‌রো-নীতির বুজরুকি ইয়াঙ্কি ভিন্ন আর কোন জাতি বর্ত্তমান কালে সম্মান করে না। ইয়োরোপীয়ান এবং জাপানী বলিতেছে :—

(১) "প্রজাতন্ত্র-শাসন বা স্বরাজ ইয়াঙ্কি-স্থানে আবিষ্কৃত এবং প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু এই শাসন-প্রণালীর সুফল আজকাল জাপান, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ইতালী ইত্যাদি প্রায় সকল সভ্য-দেশেই জনগণ ভোগ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া সুইজর্ল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে ত স্বরাজ আছেই। সুতরাং আজ-কাল কুশাসনের কথা বলিয়া ইয়াঙ্কিরা এশিয়া ও ইয়োরোপকে নিন্দা করিতে পারেন না। অষ্টাদশশতাব্দীতে আমাদের অসম্পূর্ণতা ছিল স্বীকার করিতেছি। তাহা ছাড়া আর একটা কথাও বুঝা উচিত। ল্যাটিন আমেরিকার যে সকল তথাকথিত স্বরাজ বা republic স্থাপিত হইয়াছে তাহাদিগকে সত্যসত্যই কি স্বরাজ বলা চলে? ওগুলি ত অরাজ বা anarchy-এর নামান্তর মাত্র! একটা কথার মারপ্যাঁচে সভ্যতর জাতিগুলিকে অসভ্য জন-পদের কর্ত্তৃত্ব হইতে বহিষ্কৃত করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

(২) আমরা না হয় নবভূখণ্ডের দেশ দখল করিতে অগ্রসর হইব না। আমেরিকার কোন রাষ্ট্রীয় গোলযোগে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না। কিন্তু ইয়াঙ্কিরা কেন পুরাতন ভূখণ্ডের রাষ্ট্রমণ্ডলে নাক গুঁজিতেছেন? চীনে গোলযোগ বাধিল—তাহাতে ইয়োরোপী-য়ানদিগের সঙ্গে ইয়াঙ্কিরা যোগ দিলেন! ফিলিপাইন দ্বীপের দেড় কোটি নরনারীকে ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ইহা কি মন্‌রো-নীতির প্রতিকূল আচরণ নয়? যদি আমাদিগকে আপনাদের মণ্ডল হইতে বাহিরে রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র হইতেও আপনাদের বাহিরে থাকা উচিত। কিন্তু দেখিতেছি ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র আজ কাল এশিয়া ও ইয়োরোপের সকল রাষ্ট্রব্যাপারেই একজন অগ্রণী।"

ইয়াঙ্কিদের আধুনিক Imperialism বা সাম্রাজ্য-নীতি সমালোচনা করিয়া অনেকেই বলিতেছেন—"আর মন্‌রো-নীতির কথা তুলিবেন না। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রও যে বস্তু ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র ও সেই বস্তু—এক্ষণে পেয়া-নার পেয়ানায় কোলাকুলি চলিবে।" তার-

পর, ল্যাটিন আমেরিকার সমস্যাগুলিও বড় সহজ নয়। কথার চটকে বিদেশীয়গণকে ল্যাটিন আমেরিকার স্বরাজ্যগুলি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া অসম্ভব মেক্সিকো হইতে চিলি পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রই ইয়োরোপ হইতে টাকা ধার লইয়া থাকেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশীয় লোকের কোটি কোটি টাকা এই সকল দেশে খাটিতেছে অথচ টাকা আদায় করিবার সুবিধা পাওয়া যায় না—কারণ গবর্মেণ্টগুলি প্রায়ই দেউলিয়া থাকে। অধিকন্তু এই সকল দেশে বিপ্লব লাগিয়াই আছে। কাজেই বিদেশীয় ধনী জনগণের জীবন ও ধনসম্পত্তি সর্ব্বদা সুরক্ষিত হয় না। অশান্তি ও অরাজকতার ফলে অনেক সময়েই টাকা মারা যায়।

এই জন্য মনরো-নীতির বিরুদ্ধবাদী ইয়োরোপীয়েরা ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্রকে বলিতেছেন—"আমরা ত গায়ে পড়িয়া তোমাদের ল্যাটিন স্বরাজে যাই না। স্বরাজের শাসনকর্ত্তারা এবং জনগণ আমাদের টাকা ধারেন। আমাদিগকে ঐ সকল দেশে লইয়া যাওয়া উঁহাদেরই প্রধান স্বার্থ। অথচ ইঁহারা সহজে টাকা শোধ দিতে পারেন না। আমরা কি কোন বন্ধক না লইয়াই টাকা ধার দিব? আমাদের ব্যবসায়ীরা কি এতই বেকুব? কাজেই আমাদের রাষ্ট্রসমূহ ল্যাটিন স্বরাজগুলির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। যাহাতে ঘনঘন বিপ্লব উপস্থিত না হয়, যাহাতে দেশের ভিতর সর্ব্বদা শান্তি বিরাজিত থাকে তাহার প্রতি-দৃষ্টি রাখা আমাদের রাষ্ট্রসমূহের কর্ত্তব্য। এইখানেই বুঝিতেছেন যে, ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্য্য। যদি ইয়াঙ্কি যুক্ত-রাষ্ট্র আমাদের জনগণের জীবন ও ধন সম্পত্তি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রসমূহ ল্যাটিন আমেরিকায় আর হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইবে না। আপনারা ত মনরো-নীতি জারি করিয়া কাগজে কলমে ল্যাটিন আমেরিকার অভিভাবক এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে অভিভাবক হউন—উঁহাদের দেশে শান্তি ও সুশাসনের ব্যবস্থা করুন—উঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় টাকা ধার দিতে প্রস্তুত হউন—এবং আমাদের টাকা শোধ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তবেই বুঝিব মনরো-নীতি রক্ষা করিবার ক্ষমতা আপনাদের আছে। তাহা না পারিলে বৃথা বাক্যাড়ম্বর করিবেন না। দুনিয়ার অন্যত্র যেরূপ হইয়াছে ল্যাটিন আমেরিকায়ও সেই রূপই হইবে—যথাসময়ে ভাগবাটোয়ারা সুরু হইবে।"

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান কালে মনরো-নীতি বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র। "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।" ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব আদৌ চাহে না। এই অভিভাবকত্বের ফলে ল্যাটিন আমেরিকা নিরাপদে শৈশব কাটাইয়াছে সত্য—কিন্তু এক্ষণে তাহাদের যৌবনকাল। ইহারা ইয়াঙ্কিদের কর্ত্তামি একেবারে সহ্য করিতে পারে না। Enock বলিতেছেন—

"The attitude of the United States towards Latin America has at times given rise to a feeling of resentment and perplexity on the part of their sensitive southern neighbours." কাজেই ইয়াঙ্কিদের অভিভাবকত্ব আর চলিবে না।

অধিকন্তু ইয়াঙ্কিরা এতদিন ল্যাটিন আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন ও নিরপেক্ষ

P29479

ছিলেন। ইহাদের নিজের দেশ গড়িয়া তুলিতেই সময় ও অর্থব্যয় হইয়াছে। অন্যত্র দৃষ্টি ফেলিতে ইহাদের অবসর হয় নাই এই জন্য বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা ঐ সকল দেশে ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। বিদেশীয় টাকায় ল্যাটিন স্বরাজগুলি একপ্রকার কেনা হইয়া রহিয়াছে। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া ইহারিরা Pan-American Union বা আমেরিকা-সম্মিলনী খাড়া করিয়াছেন। ইহাঁরা আর নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবেন না মনে হইতেছে—কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার গতি ফিরান এখন অসাধ্য—ওখানে কর্ত্তামি করাও দূরের কথা। বস্তুতঃ আমেরিকা সম্মিলনীতে ল্যাটিনদিগকে হাতে পায়ে ধরিয়া রাখা হইতেছে।

(১২) নিগ্রো-বিশ্ববিদ্যালয়

নিগ্রোরা বেশ পরিহাসরসিক ও আমোদপ্রিয়। ইহারা পাল ভরিয়া হাসিতে পারে। এই খোলাপ্রাণ নরনারীর সঙ্গে কথা বলিয়া সুখ পাওয়া যায়।

আজ প্রায় একহাজার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ও রমণীকে একসঙ্গে দেখিলাম। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিগ্রো অধ্যাপক কুকের গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। সেই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ ও কার্য্যপরিচালনা দেখিবার সুযোগ ঘটিল। প্রায় চারি ঘণ্টা এই কৃষ্ণাঙ্গ কর্ম্মী পুরুষের সঙ্গে কাটাইলাম।

কুকের বয়স ষাট বৎসরের অধিক—কিন্তু দেখিলে বোধ হইবে ৪০।৪৫ বৎসরের অধিক নয়। ইহাকে প্রধানতঃ সম্পাদক ও কর্ম্মকর্ত্তার কার্য্য করিতে হয়। এজন্য সর্ব্বদাই ইনি ব্যস্ত। একটা বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্ব ইহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া ছাত্র পড়ানও আছে। ইনি Commercial Law এবং International Law এই দুই বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, বোর্ডিংগৃহ ইত্যাদি দেখা গেল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীরাও ছাত্রদের সঙ্গে পড়ে। ইয়াঙ্কিস্থানের এই ধরণের স্ত্রীপুরুষ সমন্বিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে Co-educational বলে। রমণী-স্বাধীনতা-প্রার্থী লোকেরা এইরূপ বিদ্যালয়ই পছন্দ করে।

সুক একজন ট্রিনিড্যাডদ্বীপবাসী ভারতসন্তানের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। ইনি এখানকার একজন ছাত্র—ইহাঁর জন্ম হইয়াছে ট্রিনিড্যাডে—কিন্তু মাতা আসিয়াছেন গাজিপুর হইতে এবং পিতা মাদ্রাজ অঞ্চলের লোক। হিন্দীতে দুই চারিটা কথা বলিবার ক্ষমতা আছে দেখিলাম। ইনি বলিলেন,—"ট্রিনিড্যাডের হিন্দুস্থানীগণ ক্রমশঃ মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির কথা ভুলিয়া যাইতেছে। ইংরাজী ভাষাই ইহাদের মাতৃভাষায় পরিণত হইবে মনে হইতেছে।" ছাত্রের চেহারা দেখিয়া নিগ্রোর মূর্ত্তি মনে পড়ে না—দেখিবামাত্রই আলাপ হইবার পূর্ব্বে আমি ইহাকে হিন্দুস্থানের লোক বলিয়া সন্দেহ করিতেছিলাম। ইনি এখনও খৃষ্টান নহেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের একজন ভারতসন্তানের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনিও কোন ব্রিটিশ দ্বীপের অধিবাসী। তিনি খৃষ্টান—চাকরী করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিবার সঙ্কল্প আছে বুঝিয়াছিলাম।

ছাত্রীদিগের বোর্ডিংগৃহ দেখিবার সময়ে একজন বলিলেন—"মহাশয় এই ঘরটা আমাদের ভজনালয়। ইয়াঙ্কিরা ধর্ম্মকথার আলোচনা অত্যধিক করে—উঠিতে বসিতে

ইহাদের মুখে প্রার্থনা শুনিতে পাইবেন অথচ জীবনে ইহারা নিতান্ত নাস্তিক—ভগবদ্ভক্তি প্রায়ই দেখা যায় না। আমরাও ইহাদের সংস্পর্শে থাকিয়া মৌখিক ধর্ম্ম যথেষ্টই শিখিয়াছি। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে আমাদের জীবন উন্নত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না।" নিগ্রোরমণী টুস্কিজীবাসীকে বলিলেন—"এই ঘরে কোন সময়ে প্রার্থনা হয়—কোন সময়ে নাচগান বাজনা হয়?"

বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনীয়ারিং-বিভাগ এবং চিকিৎসা-বিভাগও আছে। ইয়াঙ্কিস্থানের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই নিগ্রোপ্রতিষ্ঠানেও ততগুলি লক্ষ্য করিলাম। আসবাব পত্র, সাজান গুছান, পরিচালনা ইত্যাদি সবই এক ধরণের। আদর্শের কিম্বা কর্ম্মপ্রণালীর পার্থক্য কিছুই নাই। নিগ্রোদের কারখানায় আসিলে নূতন কিছু দেখিতে পাইব এরূপ ভাবা ভুল। তবে কলাম্বিয়া, হার্ভার্ড ইত্যাদির সঙ্গে তুলনায় হাওয়ার্ড একটা পাঠশালা মাত্র। অবশ্য খরচপত্র টাকা পয়সা বাজেটক ইত্যাদির কথা বলিতেছি। নিগ্রোবিশ্ববিদ্যালয় কিছু দরিদ্র। এইজন্য যতটুকু প্রভেদ হইতে পারে তাহাই লক্ষ্য করা যায়। শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গের জাতিগত, চরিত্রগত অথবা মনীষাগত প্রভেদ কিছুই পাই না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাপেল বা ধর্ম্মমন্দিরে ছাত্র ছাত্রী এবং অধ্যাপকগণ সমবেত হইলেন। এখানকার সভাপতি একজন শ্বেতাঙ্গ—শুনিলাম অধ্যাপকগণের মধ্যেও অনেক শ্বেতাঙ্গ আছেন। কুক বলিলেন—"পূর্ব্বে বহু শ্বেতাঙ্গ ছাত্রও হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত। গত দশবৎসর হইতে তাহারা এদিকে আর ঘেঁষেন না—সম্প্রতি ১৫০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে অধিকাংশই নিগ্রো।" ধর্ম্মমন্দিরে যথারীতি গান ও বক্তৃতা হইল।

সর্ব্বসমেত ১৩০ জন অধ্যাপক ও সহকারী শিক্ষক এখানে কার্য্য করেন। বার্ষিক ব্যয় মোটের উপর ৬০০০০০৲। আমেরিকার হিসাবে এ খরচ অতি সামান্য মাত্র। শুনিলাম সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এত বড় নিগ্রো-বিশ্ববিদ্যালয় আর নাই। টাস্কেগীতে শিল্পশিক্ষা হয় মাত্র—সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নাই।

কুককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"অধিকাংশ ছাত্র ও ছাত্রীকেই ত কৃষ্ণাঙ্গ বোধ হইতেছে না। কোন কোন মুখের গঠনও শ্বেতাঙ্গ নরনারীর অনুরূপ এমনকি চুলও কোঁকড়া নয়। কয় পুরুষে এইরূপ বর্ণপরিবর্ত্তন এবং গঠনপরিবর্ত্তন হয়?" ইনি বলিলেন—"আমার কথা বলিতেছি শুনুন। আমি ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে গোলাম হইয়া জন্মিয়াছি। আমার মাতা নিগ্রো—পিতা শ্বেতাঙ্গ। আমার চেহারা দেখিয়া আপনি কখনই ভাবিতে পারিবেন না যে আমার ভিতর কৃষ্ণাঙ্গের রক্ত আছে। আমার রং পুরাপুরি শ্বেতাঙ্গের রঙের মতও নয়। কিন্তু আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই শ্বেতাঙ্গদিগের সদৃশ! দেখুন আমার চুল পর্য্যন্ত আপনার মতই লম্বা। এক পুরুষে দো-আঁসলা নরনারীর এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। আমি যদি কোন শ্বেতাঙ্গ রমণীকে বিবাহ করিতাম তাহা হইলে খাঁটি শ্বেতাঙ্গ সন্তানের জন্ম হইত। রং বদলান অতি সহজ। চুল বদলাইতে বোধ হয় দুই তিন পুরুষ লাগে। আমার বিশ্বাস, রক্তসংমিশ্রণের সুযোগ যদি বেশী পাওয়া যায় তাহা হইলে গোলামের জাতি বলিয়া একটা পদার্থ পৃথিবীতে থাকিবেই না। আমি এখনই অনেক তথাকথিত শ্বেতাঙ্গের

জন্ম বিবরণ জানি। তাঁহারা আসল গোলামের বাচ্চা। কিন্তু চেহারা দেখিয়া কাহারও ধরিবার সাধ্য নাই।"

উচ্চশিক্ষিত নিগ্রোদের সঙ্গে কথা বলিলে তাঁহাদিগকে কোন একটা নিরুষ্ট জাতির অন্তর্গত নরনারী ভাবিতে পারা যায় না। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, ইরাকি, ইংরাজ, হিন্দুস্থানী, জাপানী যে জাতীয় শিক্ষিত লোকই হউন না—দেখিতেছি চিন্তাপ্রণালী, কর্ম্মপ্রণালী, রসবোধ, বিচারশক্তি, ইত্যাদি সবই ন্যূনাধিক পরিমাণে একরূপ। অবশ্য বীরপরবাচ্য অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান্ লোকের কথা ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু সাধারণ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান যুগে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এক ধরণে হাসে, এক কায়দায় কথা বলে, এক প্রণালীতে সমস্যার সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হয়, একই ধরণের সাহিত্য শিল্পে আনন্দ উপভোগ করে। আধুনিক জগতের শিক্ষাপ্রণালী দুনিয়ার সকল লোককেই মোটের উপর এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তুলিতেছে। নিগ্রোসমাজে বিচরণ করিয়া এই ধারণা বস্তুনিষ্ঠভাবে লাভ করিলাম। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই জাতির প্রায় প্রত্যেক নরনারীই খাঁটি গোলাম ছিল। অথচ আজ তাহাদের সন্তানসন্ততিরা শিক্ষাপ্রভাবে ইরাকি, ইংরাজ, হিন্দু, জাপানীর সঙ্গে সমানভাবে বিশ্বসমালোচনায় সমর্থ।

কুক বলিলেন—"আমাদের এখানে একজন ভারতীয় মুসলমান ছাত্র ব্যবসায়বিদ্যা শিখিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছে। শুনিয়াছি সে কোন তৈলের ব্যবসায়ে কর্ম্ম করিতেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেখিতেছি নিগ্রো ছাড়া অন্যান্য জাতীয় লোকও আপনাদের এখানে আসে?" ইনি বলিলেন—"আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও যাহা আমাদের এই হাওয়ার্ডও তাহাই।"

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল সরকার হইতে বহন করা হয়। কোন কোন কংগ্রেসওয়ালা এইবার টাকা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দেশময় নিগ্রোবন্ধু শ্বেতাঙ্গেরা আন্দোলন করিয়া প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে দেন নাই।

কুক্, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিভাগ, ঔষধ-প্রস্তুতকরণ (Pharmacy)-বিভাগ এবং দাঁত-বাঁধান-বিভাগ ইত্যাদির সকল ল্যাবরেটরীতে লইয়া গেলেন। অধ্যাপকগণের সঙ্গে আলাপ হইল। একজন বলিলেন—"মহাশয়, কিছু দিন পূর্ব্বে আপনাদের জগদীশচন্দ্র বসু ওয়াশিংটনে উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।" নিগ্রোরা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইতেছে। বর্ত্তমান সভাপতি উড্রোউইল্‌সন সম্বন্ধে কুক বলিলেন—"মহাশয়, ইঁহাকে সভাপতি বলিয়া খাতির করিতে বাধ্য। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ইঁহার প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নাই। ইনি নিগ্রোহিতৈষী নহেন। অবশ্য হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা বন্ধ করিবার আন্দোলনে ইনি আমাদের বিরুদ্ধে যান নাই। তাহা হইলে ইঁহার লোকসমাজে মুখ দেখান কঠিন হইবে যে।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মিলন

মানব স্বভাবতঃ মিলনপ্রয়াসী। আত্মস্তরিতা এত প্রবল বলিয়া মানব সর্ব্বদাই সমাজ গঠন করতঃ একত্রে বাস করিতে ভাল বাসে। এই মিলনের আকাঙ্ক্ষাপ্রণোদিত হইয়া মানব পাঁচজনে একত্রে মিলিয়া সকল সময় কার্য্য করিতে ভালবাসে। ইহার ফলে তাহাদের চিন্তাপ্রবাহ প্রায় এক প্রণালীতে চালিত হয়। সেই জন্যই পাঁচজনে একত্র হইয়া হরিনাম করিতে বসিলেই, চঞ্চলচিত্ত স্থির হইয়া যায় ও সেই অচঞ্চল প্রাণে আরাধ্য বস্তু আসিয়া উদিত হন। যেমন প্রকম্পিত বারিরাশির উপর পতিত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব বারিতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত ও পতিত হয়, সেইরূপ সংসারের নানাচিন্তায় প্রক্ষিপ্ত-চিত্ত স্থির না হইলে তথায় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের উদয় হয় না। স্থির জলে পূর্ণচন্দ্র পূর্ণরূপে গোচরীভূত হয়েন। স্থিরচিত্তে ইষ্ট-দেবের শ্রীমূর্ত্তি উত্তমরূপে উপলব্ধ হয়েন। পাঁচজনে মিলিত হইয়া একত্রে সঙ্কীর্ত্তন করিতে বসিলেই, পরস্পরের শক্তিতে পর-স্পরের বিক্ষিপ্ত চিত্ত স্থির হইয়া যায়। তখন স্বরূপ অনুভূতির পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। সহস্র আশায় নিষ্প্রাতিত হইয়া মানব যখন শান্তির আশায় একত্রিত হইয়া মৃদঙ্গ করতালিযোগে ভগবানের গুণগান করে, তখন তিনি নিত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া সেই ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত হয়েন তাই নারদকে বলিয়াছিলেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়েষু চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

বৈকুণ্ঠ ও যোগীগণের হৃদয়ও তাঁহার নিকট ভক্তসমাগম অপেক্ষা প্রিয়তর নহে।

তথাহি আদি পুরাণে

"মদ্ভক্তাঃ যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তাঃ শ্রুতিভিঃ সহ।"

আমার ভক্তগণ যথায় গমন করেন আমিও তথায় গমন করিয়া থাকি। মুক্ত পুরুষগণ শ্রুতিগণের সহিত ভক্তের অনুগমন করেন।

নদীয়ার শ্রীবিগ্রহ তাই জগতে আসিয়া-ছিলেন। জগতের ভ্রমান্ধ, মায়াকুজ্ঝটিকা-জালে আবৃত জীবগণকে তাই এই সঙ্কীর্ত্তন-রূপ ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার কারণ বৈকুণ্ঠ-ধাম ত্যাগ করতঃ শ্রীমতীর ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ। এই চারিযুগের সাধন-পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকারের। কলির প্রবল পরাক্রমে ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া আত্মগোপন করিলেন, পাপ সম্পূর্ণরূপে জগতে আধিপত্য বিস্তার করিলেন, ভগবান দেখিলেন যে জীবশক্তি কলিজীব তমঃপ্রধান অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া পথ-ভ্রষ্ট হইয়া অশেষবিধ কষ্ট পাইতেছে, তাহার উদ্ধারের কোন উপায় নাই। দয়াময়ের প্রাণ জীবের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল। তিনি যে কেবল দয়াময় নহেন,—আবার পূর্ণ প্রেম-ময়! তাই তাঁহার বিশ্বব্যাপী ভালবাসা-প্রণোদিত হইয়া আত্মসৃষ্টি করিলেন। জীবের দুর্গতি দূর করিতে, পতিতের উদ্ধারসাধন করিতে পতিত উদ্ধারণ পূর্ণরূপে, নবশক্তি জগতে অবতীর্ণ হইলেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ করিবার জন্য বৃন্দাবনের যুগলরূপ পরিহার পূর্ব্বক সুরধুনীতীরে শক্তি শক্তিমান একত্রীভূত হইয়া মোহন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। যাহা কখনও অর্পিত হয় নাই সেই অনর্পিত বস্তু জগতে বিলাইবার জন্য "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত" হইয়া নদীয়াধামে উদয় হইলেন।

যথা শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত বিদগ্ধমাধব নাটকে দ্বিতীয় শ্লোকে—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দর দ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।"

পূর্ব্বে আর কখন যে উজ্জ্বল মধুর রস জগতে প্রদত্ত হয় নাই, সেই নিজভক্তি সম্পদ প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও সুন্দর সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়কন্দরে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন।

চিরদিনের জন্য অনর্পিত যে বস্তু, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যাহা কখনও অর্পিত হয় নাই, আপনার উপর যে নিষ্কাম ভক্তি সেই অমূল্য ধন বিতরণের জন্য দয়ার্দ্র হইয়া কলিতে অবতীর্ণ হইলেন। দয়াময় আমাদের সম্ভোগের জন্য সর্ব্বস্ব দিয়াছেন কেবল একটি ধনের তিনি ভিখারী। সেটি শুদ্ধা-ভক্তি বা প্রেম। তিনি এই নিষ্কাম প্রেমের ভিখারী, এই প্রেমের বলে গোপীগণ তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। তাই বলিয়াছিলেন "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।" গোপীপ্রেমে স্বয়ং এত মুগ্ধ যে বৃন্দাদেবীর তপোবন ত্যাগ করিয়া একপদও যাইবার তাঁহার অধিকার ছিল না। তিনি যে ভক্তবৎসল, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। কখন প্রকট এবং কখনও অপ্রকট ভাবে গোপীগণের সহিত তাঁহার যে লীলা তাহা নিত্য। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিলেন—

"এখনও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

যাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন, গুরু কৃপায় যাঁহার জড় লোচনের মধ্যে দিব্যদৃষ্টি বিকাশিত, তিনিই সে লীলা বোধগম্য করিতে পারেন, অন্যে পারে না।

তাঁহার লীলা নিত্য। এই নিত্য লীলার মধ্যে ভক্ত তাঁহাকে যেরূপ অনুভব করিতে পারে অন্যরূপে সেরূপ হয় না। ঠাকুর যখন নরভাব পূর্ণরূপে পরিগ্রহ করিয়া নররূপে মর্ত্ত্যভূমিতে লীলা করেন, তখন জীব তাঁহাকে বুঝিতে পারে, নতুবা নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্ম ধারণা সগুণ সবিশেষ জীবের সাধ্যায়ত্ত নয়। তাই ভক্ত লীলা এত ভালবাসে। মায়ামনুষ্যরূপে মায়ার খেলাঘরে অবতীর্ণ হইয়া মায়ার তরঙ্গে উদ্বেলিত ও শান্ত হইয়া যে লীলা করেন, তাহাই ভক্ত ধরিতে পারে নহিল "আবাঙ্মনসো গোচরং" আদিতত্ত্বকে কে ধারণা করিতে সমর্থ হইবে? জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব। এই লীলার মধ্যে ভগবানের ভক্তপ্রীতি বিশেষ পরিস্ফুট।

যখন রাসোৎসব সম্প্রবৃত্ত হইয়া দুই গোপীর মধ্যে দণ্ডায়মান ভগবান নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তখন গোপীগণ উভয় পার্শ্বেই প্রাণকান্তকে অবলোকন করিয়া

"এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানাং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যো
হ্যধিকং ভুবি॥"
শ্রীভাগবত ১০।২৯।৪৭।

"এই প্রকারে অত্যুদারচরিত্র ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্তমনোরথ গোপী সকল পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত বোধ করিলেন এবং তন্নিমিত্ত মানিনীও হইলেন।"

নিজেকে অধিক মানশীলা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতা হইলেন। অমনি অন্তর্যামী তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন গোপীগণ কি করিলেন, তাহা বলিতেছি কিন্তু তৎপূর্ব্বে আরও কিছু বলিবার আছে।

লীলার মধ্যে ভগবানকে অতি সহজে বুঝা যায় বটে কিন্তু শ্রীমতী ছাড়িয়া কেবল শ্রীমানকে বুঝিতে যাইলে, বুঝা হইবে না। যেমন সুগন্ধ ছাড়িয়া কুসুমকে ধরা যায় না, দাহিকা ছাড়িয়া অগ্নির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না, সেইরূপ একাকী শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে গেলে, সে দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বে প্রবিষ্ট হওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়ে সুতরাং আজ রাধাশক্তি বাদ দিয়া কৃষ্ণকে বুঝা যাইতে পারে না। রাধা-শক্তি ধরিয়া শক্তিমানকে পাওয়া যাইবে কারণ "শক্তি শক্তি মতোরভেদঃ"। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। ভক্তের মধ্যে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া ভক্তের ভিতর দিয়াই ভগবানকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। তাই আজ শ্রীমতীকে বাদ দিয়া শ্রীমান্‌কে বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। সৎ চিৎ ও আনন্দ, এই তিন লইয়া শ্রীবিগ্রহ। সৎ অর্থাৎ সত্তা, চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য এবং আনন্দ অর্থাৎ হ্লাদিনী পরাশক্তি। এই তিন লইয়া ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি। সত্তা ও চৈতন্যের লয় হ্লাদিনী শক্তিতে হয় কারণ আনন্দই আদি। সত্তার আদিস্থান আনন্দ কারণ আনন্দই সৃষ্টির মূল। যথা "আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি। সত্তার স্থিতি ও গতি আনন্দে এবং চৈতন্যও সেই সত্তার প্রধান বিকাশ বলিয়া চৈতন্যও আনন্দের মধ্যে আছে। সুতরাং আজ সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ লইয়া যে শ্রীবিগ্রহ তাহারও পরিণাম সেই আনন্দ তাই আজ শ্রীমতীকে বাদ দিয়া শ্রীমানকে বুঝা যায় না। তাই বলিতেছিলাম সত্তা ও চৈতন্যের লয় হ্লাদিনীতে হয়। এই হ্লাদিনী শক্তির ঘনমূর্ত্তি শ্রীমতী রাধিকা! তাই শুধু কৃষ্ণ বুঝা কঠিন কিন্তু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল বুঝা সহজ। সত্তা ও চৈতন্য লইয়া যে শ্রীবিগ্রহ তাহার পূর্ণতা আনন্দে —এই আনন্দ ঘনমূর্ত্তিই শ্রীমতী রাধিকা— সর্ব্বার্থসাধিকা—ভক্ত-মনোবাঞ্ছা-পূর্ণকারিকা! তাই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ দেখিলে বুঝিতে পারে না —শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি তাহার নিকট বড় প্রীতিপ্রদ! তাই—

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥"

শ্রীভাগবত ১০।৩৩।৩

"মণ্ডলরূপে অবস্থিত দুই দুই গোপীর মধ্যে একৈকরূপে প্রবিষ্ট অতএব সকল গোপীই যাঁহাকে নিজের নিকটস্থ মনে করিতেছিলেন, সেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সমালিঙ্গিত গোপীদিগের মণ্ডলসমূহে সুশোভিত রাসোৎসব আরব্ধ হইল।"

এক গোপী এক কৃষ্ণ এইরূপে মণ্ডলাকারে নৃত্যশীলা গোপীগণ উভয় পার্শ্বে শ্রীমানকে দর্শন করিয়া মনে করিলেন তবে আমাকেই সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক মান দিয়াছেন। কিঞ্চিৎ গর্ব্ব হইলে—

"তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"

শ্রীভাগবত ১০।২৯।৪৮।

যাই গর্ব্ব হওয়া অমনি শ্রীমান অন্তর্ধান করি-লেন। তখন—

"অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্।"

"এইরূপে অকস্মাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, তাঁহার অদর্শনে ব্রজসুন্দরীগণ যূথপতির অদর্শনে করিণীগণের ন্যায় সন্তপ্ত হইয়াছিলেন।"

শ্রীমান অন্তর্হিত হইলে, যূথপতিকে হারাইলে করিণীর যে দশা হয়, গোপীগণেরও সেই দশা উপস্থিত হইল। তাঁহারা দশদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ, পুষ্প, মেদিনী প্রত্যেককে মিনতি করিয়া আপন প্রাণকান্তের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যখন কেহ কিছু বলিল না তখন তুলসীদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

"কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণী গোবিন্দ চরণ প্রিয়ে।
সহ স্বালিকুলৈ বিভ্রদ্দৃষ্টে স্তেহতি প্রিয়োঽচ্যুতঃ।"

"হে কল্যাণী, গোবিন্দচরণ প্রিয়ে তুলসি, তুমি কি তোমাকে সর্ব্বদা ধারণকারী ও তোমার অতিশয় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছ?"

তিনিও যখন সন্ধান দিলেন না, তখন তাঁহারা ভগবল্লীলাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। এই লীলার মধ্যে ভগবানকে সহজে বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভিনয় করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা শ্রীমানের পদচিহ্ন কাননমধ্যে পরিদৃশ্যমান হইল। তখন সকলে সোৎসুকে সেই পদচিহ্ন দর্শন করিয়া বিভোর হইয়া দরদরিতধারে রোদন করিতে করিতে, সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত দেবমুনিব্রহ্মবাঞ্ছিত শ্রীচরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া তদনুসরণে বনমধ্যে যাইতে যাইতে সহসা শ্রীমতীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রাসলীলায় প্রবৃত্ত ভগবান রাধারমণ শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন শ্রীমানের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন সম্মিলিত তথায় পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ কাহার পদচিহ্ন?""

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয় রহঃ।"

"শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমাগত এই রমণী নিশ্চয় ভগবান হরির বিশেষ আরাধনা করিয়াছেন; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্তে ইহাকে লইয়া আসিয়াছেন।" এক্ষণে রোরুদ্যমানা বৃষভানু-নন্দিনীকে দর্শন পাইয়া গোপীগণ আরও হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। যে শ্রীমতীকে লাভ করিবার জন্য শ্রীমানের কত আগ্রহ, যাঁহার অদর্শনে শ্রীমান দশদিক অন্ধকার দেখেন, সেই শ্রীমতীকেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে কি হইবে? কি করিলে কোথায় যাইলে প্রাণনাথের দর্শন পাইব? তখন সকলে সমস্বরে শোকসূচক স্তবগীতি আরম্ভ করিলে শ্রীমান পুনরাবির্ভূত হইলেন

"তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্মরমানঃ মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধর স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথঃ।"

তখন গোপীগণ তাঁহাকে পাইয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন, ও রাসানন্দে দেহ মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন—তাঁহাদের সত্তা—দেহাত্মবুদ্ধি, ও চৈতন্য সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া আনন্দমূর্ত্তিতে সেই রাস-মণ্ডপে প্রকটীভূত হইল। তাই বলিতে ছিলাম শক্তি ছাড়িয়া শক্তিমান্‌কে বুঝা যায় না। যতক্ষণ শ্রীমতীর সহিত গোপীগণের সাক্ষাৎকার হয় নাই ততক্ষণ শ্রীমানের কোন উদ্দেশ ছিল না, যাই শ্রীমতীর দর্শন পাইলেন, অনতিবিলম্বে শ্রীমানও আসিয়া জুটিলেন। তাই ভক্ত যুগল এত ভালবাসে।

লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় তিনটি স্তর

আছে। যথা কুরুক্ষেত্রের লীলা, পুরুষত্বের অর্থাৎ দ্বারকা ও মথুরালীলা, এবং শ্রীবৃন্দাবন লীলা। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ দেখিলে ভক্তের প্রাণ শীতল হয় না, পরন্তু ব্যথিত হয়। কুরুক্ষেত্রে ঠাকুর পূর্ণভাবে লীলা করিয়াছেন। দ্বারকা ও মথুরা লীলার কিছু মধুরতা আছে, তাই সে লীলা পূর্ণতর ও শ্রীবৃন্দাবনের লীলা সর্ব্বমাধুর্য্যময় তাই পূর্ণতম। পূর্ণতম প্রেমের তরঙ্গে পূর্ণ প্রেমময়ী ক্রীড়াপরায়ণা। এই ভাব চিন্তা করিলেও হৃদয় পবিত্রতর হইয়া দেবত্ব আনয়ন করে।

শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে তাঁহার পরাশক্তি শ্রীরাধিকাকে বুঝিতে হইবে। শ্রীরামচন্দ্র জানকী দেবীর মধ্য দিয়াই অধিক পরিস্ফুট। জগজ্জননী আদ্যাশক্তি না থাকিলে জগদ্গুরু শঙ্করকে কে বুঝিতে পারিত? তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।"

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি রাধা, রামশক্তি জানকী এবং বিশ্বশক্তি মহামায়া। এই শক্তি ত্যাগ করিয়া শক্তিমানকে বুঝা যায় না। যতক্ষণ গোপীগণ শ্রীরাধাকে পান নাই, ততক্ষণ কৃষ্ণান্বেষণের উপায়ও তাঁহাদের নিকট বোধগম্য হয় নাই। যাই শ্রীরাধাসঙ্গ মিলিল অমনি শ্রীমান উদিত হইলেন। তাই যুগল না হইলে বুঝা বড় কঠিন—বুঝা যায় না।

ভক্ত এই যুগল লইয়া কত বিলাস করেন। এই পূর্ণতম বিলাসমূর্ত্তি মাত্র শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজদেবীগণ প্রত্যক্ষ করিতেন। তাই কুরুক্ষেত্রের মূর্ত্তিতে ভক্তের প্রাণ শান্ত হয় না। ভক্ত সে মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যথিত, ক্ষুব্ধ হয়। ভক্ত চায় শুদ্ধ প্রেম, কামনাহীন ভালবাসা। অতীন্দ্রিয়, কামগন্ধহীন, নির্ম্মল ভাস্কর সম দীপ্তিমান উত্তাপোজ্জ্বল রসসংযুক্ত এই প্রেম, ভক্তের হৃদয়ানন্দদায়ক! প্রাণ মাতান—মন ভুলান ধন! এই প্রেমের আস্বাদে ভক্ত বিভোর হইয়া যায়। এই প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া ভক্ত আপনার অস্তিত্ব ও জ্ঞানহারা হইয়া কেবল আনন্দানুভূতির সঙ্গে সেবানন্দ উপভোগ করে। তাই বলিতেছিলাম, সৎ-ও চিৎ এই দুইয়ের লয় আনন্দে! আনন্দই পূর্ণতম, আনন্দই সর্ব্বসার! এই আনন্দের জননী কৃষ্ণপ্রেম যাহা, তাহাও এই যুগল লইয়া, শক্তি শক্তিমান লইয়া। যুগলের মিলনে এই আনন্দের উৎপত্তি। এই মিলনরূপ ভক্ত আপন হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিয়া প্রেমনয়নে দর্শন করেন ও বিভোর হইয়া যান। দেহজ্ঞানও থাকে না। এই সেবানন্দ লইয়া ভক্ত আজীবনের সাধ মিটান ও পূর্ণপ্রেমে প্রেমময়ের চরণে হৃদয় সমর্পন করিয়া মায়া পরাহত করেন। এই আনন্দলীলাই ভক্তের হৃদয়ধন—ভক্ত এই লীলা সম্ভোগ ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারেন না। যেমন মীন বারি ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ তদ্গতপ্রাণ দীনভক্ত, দীনবৎসল, ভক্তের হৃদয়ধনকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে না। তাই ভক্তের মানসের অভিলাষ পূর্ণ করিতে সময়ে সময়ে ভক্তপ্রাণ ভক্তমনোরঞ্জনরূপে প্রকট হয়েন। প্রকট ও অপ্রকট উভয় অবস্থাতেই এই লীলা নিত্য। লীলার নিত্যত্ব আছে বলিয়া এই বিশ্বও আছে। লীলার ছলে ভগবান এই বিশ্ব বিকাশ করিয়াছেন।

তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে যে এই যুগলরূপই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ – এই যুগলেই সৃষ্টি অবস্থিত ও লয় প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রীভাগবৎকার বলিতেছেন—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।
ধাম্নঃ স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং
পরং ধীমহি।"

যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, সদসৎ সর্ব্ব পদার্থে সদসৎরূপে যাঁহার সত্তারই উপলব্ধি হয়, যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, দেবাদির দুর্ব্বোধ্য বেদও অন্তর্য্যামীরূপে আদিজ্ঞানবান্ বিবিধির হৃদয়ে নিহিত করিয়াছেন; মরীচিকাদিতে জল ভ্রমের ন্যায়, জলে কাচ ভ্রমের ন্যায়, যাঁহার পরম সত্তায় অধিষ্ঠিত মায়াময় সৃষ্টিত্রয়েও সত্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, সেই মায়াতীত সদা স্বীয় প্রভাবে বেদীপ্যমান সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।"

"অন্বয়াদিতরতঃ"—শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন "যদা অন্বয় শব্দেনানুবৃত্তিঃ ইতরশব্দেন ব্যাবৃত্তিঃ" তাহা হইলে কি বুঝা যাইল? "অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা" যে বস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা অর্থাৎ অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে। এই বিপ্রলম্ভ ও মিলন মূর্ত্তি, এই মিলন ও বিচ্ছেদ লইয়াই এই বিশ্ব।

যাঁহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয়, সেই কপটতাহীন পরম সত্যকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই ভগবল্লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যুগলকিশোরই বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তি। তাই বৈষ্ণব কবি গাহিলেন—

"রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তি রস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং
গতৌ তৌ"

শ্রীরূপগোস্বামীকৃত কড়চা।

"শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভাবরূপিণী হ্লাদিনী শক্তির নাম রাধা। রাধাকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অভিন্নাত্মা হইলেও পূর্ব্বে দ্বাপর যুগে শ্রীবৃন্দাবনে লীলার্থে পৃথক্ শরীর হইয়াছিলেন।"

একাত্মা হইয়াও লীলার ছলে ভিন্ন দেহ হইয়াছিলেন। এই বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি কালিন্দীর কলনিনাদি সলিলরাশির, লতাবিটপী শোভিত যমুনাতীর সমাশ্রয়ী নিকুঞ্জবনের ও বৃন্দাবনের প্রতি কাননের শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া ভক্ত মনোরঞ্জনের জন্য বিহার করিয়াছিলেন। এই বিরহমূর্ত্তিই শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমের পূর্ণ বিকাশ!

সারানিশা বাসকসজ্জা করিয়া শ্রীমতী শ্রীধামের জন্য অপেক্ষা করিয়াও যখন প্রত্যূষ সময়েও ফিরিলেন না, তখন শ্রীমতীর মর্ম্মভেদ সেই কাতর দৃষ্টি, বিরহাতিশয্যে তাঁহার সেই কমনীয় বক্ষের স্ফীতভাব, ভগবান বিরহে ভক্তের কাতরতা জগৎকে শিখাইয়াছে। সে যে কি ব্যাকুলতা, এই আসে এই আসে করিয়া সেই উৎকণ্ঠা, আর কিসের সহিত তুলনীয় হইবে? রাধার বিরহজ্বালার উপমা রাধার বিরহ জ্বালা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এ মর জগতে এমন কোন ভাষা নাই যদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের আকুল নিশ্বাস অভিব্যক্ত করা যাইতে পারে। এই বিচ্ছেদমূর্ত্তি ভক্তের প্রীতিপ্রদ হইলেও—ভক্ত যেন আরও কিছু চায়। মিলন প্রয়াসী জীব যেন আরও কিছুর জন্য আকুল হৃদয়ে বসিয়া আছে। যমুনারতটে, বসন্তানিল প্রকম্পিত বৃক্ষরাজীর

তলে, বৃন্দাবনের মধুরিমাময় কুঞ্জকানন মাঝে যে যুগলমূর্ত্তি ভক্তের হৃদয় মন আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ছাড়া সে যেন আরও কিছু চায়—আরও নিকট চায়। অত প্রভেদ তাহার ভাল লাগে না। সে মিলনের জন্য উন্মুখ। এই বিপ্রলম্ভ বা বিচ্ছেদ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, বৃন্দাবনের সেই মধুর কাননের মধুময় কুসুমবেষ্টনে বেষ্টিত সেই যুগলকিশোর মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্ত বিভোর হইয়া যায় কিন্তু তাহার হৃদয়ের পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা যেন মিটে না। কিছু যেন বাকী রহিয়া যায়। সে যেন আরও কিছু চায়! আরও নিকট—হৃদয়ের আরও কাছাকাছি। শ্রীমতী শ্রীধামে অত দূরত্ব তার ভাল লাগে না। সে মিলন চায় কারণ স্বভাবতঃ সে মিলন প্রয়াসী, তাই সে দুই দেহ চায় না। তাই সে যমুনাতীর হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সুরধুনীর-তীরে আসিতে চায়। তাই সে নদীয়া নগরের প্রান্তে মিশ্র জগন্নাথদেবের বাটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইতে চায়। ভক্তের এই আগ্রহাতিশয্য তাঁহাকে আজ মিলনমূর্ত্তিতে প্রকট করিয়াছে।

তাই—

"চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং।
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥"

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু আজ মিলন মূর্ত্তিতে প্রকট হইলেন। যুগলকিশোর আজ একাধারে মিলিত হইয়া অপরূপ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভক্তনয়নে উদিত হইলেন। আজ ভক্তের প্রীতি শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া ভক্তপ্রাণ ভক্তমনোমোহন-রূপে নদীয়াধামে প্রকট হইলেন। দুঃখের পর সুখ যেমন বড়ই আরামপ্রদ হয়, সেইরূপ বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তির পর এই মিলন মূর্ত্তি "যাহা রাধা অন্ত কৃষ্ণ" মূর্ত্তি ভক্তের প্রাণ শীতল করিয়া অমিয় স্রোতে জগৎকে স্নাত করাইল। অবিরাম প্রেম প্রবাহে জগৎ ভাসিয়া গেল। পাপ মলিনতা বিদৌত হইয়া বিমল আনন্দ জ্যোতিতে দিক্‌চক্র জ্যোতিষ্মান হইল, গ্রহ-নক্ষত্রাদির শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যেন লোকলোচনের তৃপ্তিসাধন করিল। প্রকৃতির হাস্যময়ী বদনে অবিরাম যেন নাম-ধারা বহিতে লাগিল। বিহঙ্গনিচয় স্বীয় মধুর কাকলি লহরীতে দিক মুখরিত করিয়া মনোসাধে আকাশের বিশাল বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, স্থাবর, জঙ্গম, মনুষ্য, তীর্য্যগ, সকলে নাম-ধারায় সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। বহু দিনের সঞ্চিত, বহু কুক্রিয়া কালিমার মলিনতা বিদূরিত হইয়া ধরিত্রী নবশোভায় শোভমানা হইয়া ভক্ত হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিল। পূর্ণিমার নিশিতে চন্দ্র গ্রহণের সময় হরিনাম স্রোতের মধ্যে মিশ্রপাদ জগন্নাথ দেবের প্রাঙ্গণের নিম্ববৃক্ষ তলে যে অদ্ভুত শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, সেই শিশুর প্রভাবে কলি পরাহত ও কলিজীব মুক্তির সোপান পাইয়া ধন্য হইল। ভক্তের কাতর আহ্বানে ভক্ত-প্রাণ নিত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া আজ ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে জগতে অবতীর্ণ হইলেন। সেই অদ্ভুত শিশু বালা চাপল্য বশতঃ সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত ক্রীড়া পরায়ণ। ভক্ত নির্নিমেষ লোচনে দেখিয়া বিভোর হইতেছে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে চাপল্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শচীমাতা আর শাসনে রাখিতে পারেন না। তাড়না করিলেই উৎপন্ন দ্রব্যের উপর গিয়া বসেন ও হাস্য করেন। ভক্ত দেখিতেছে—ক্রমে পাঠাভ্যাস। পাছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের ন্যায় এ সন্তানও

সন্ন্যাসী হয় এই ভয়ে মিশ্রপাদ সন্তানকে মূর্খ করিয়া রাখিবার মনস্থ করিলেন। শ্রীপাদ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অবশেষে পাঠ সমাপন। পরে পিতৃকার্য্য করিতে ৺গয়াধামে প্রয়াণ। পরে প্রেমের পসরা মাথায় লইয়া ৺গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও অদ্ভুত কৃষ্ণ-প্রেমবিলাস। কৃষ্ণপ্রেমবিলাসে বিভোর চিত্ত নিমাই পণ্ডিত ক্রমে হরিগুণ গান আরম্ভ করিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের প্রবাহে জগৎ ভাসাইয়া, পাপ বিধৌত করিয়া, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুধাস্রোত ছুটাইয়া দিয়া, আচণ্ডালে প্রেম বিলাইলেন। সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কলিহত জীবের সহজ সাধনার পথ দেখাইয়া দিলেন। এবং ভগবানের জন্য ভক্তের যে তীব্র অনুরাগ তাহা নিজে আচরিয়া জগৎগুরু জগৎকে শিক্ষা দিলেন। রাধাভাব পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়া, সেই ভাবে জগৎকে মাতাইলেন। "নেড়ার" সাধন হুঙ্কারের ফল ফলিল। প্রেম স্রোতে জগতের পাপ কল্মষ বিধূরিত হইল। কলির এই সাধনের পথ দেখাইয়া, অলৌকিক প্রেম নাট্যের অভিনয় করিয়া নট নাগর জগৎ বিমোহিত করিলেন। সেবাকাঙ্ক্ষী দয়াল নিতাই চাঁদকে দ্বারে দ্বারে প্রেম ভিক্ষাদিতে পাঠাইলেন। প্রহৃত হইয়া প্রেম দেয়, আলিঙ্গন করে, এমন দয়াল ঠাকুর আর কখনও কি দেখিয়াছ—আর কোথাও কি দেখিয়াছ? না দেখিয়া থাক, চল ভাই একবার নদীয়া নগরে, দুই ভাই এসেছে—

"যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
(নদীয়ায়) তারা দুভাই এসেছে রে
যারা মারখেয়ে প্রেম বিলায়
(নদীয়ায়) তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা মা যশোদার প্রাণের নিধি
যারা আচণ্ডালে কোল দেয়
যারা জাতির বিচার করে নারে
(নদীয়ায়) তারা দুভাই এসেছে রে।"

আর ভয় কি? কোন কৃচ্ছ্র সাধনার প্রয়োজন নাই। কেবল হরিনাম কর, নাম করিতে করিতে নামীর উদয় হইবে। তখন একাধারে এই মিলন মূর্ত্তিতে নাম ও নামীর দর্শন করিয়া জন্মধারণ সার্থক করিব। বার বার গতায়াত ঘুচিবে—পুনঃ পুনঃ জঠর যন্ত্রণা ভোগের অবসান হইবে।

জীব স্বভাবতঃ মিলন প্রয়াসী বলিয়া ভক্তের মনোবাসনা মনে মনে বুঝিয়া আজ দয়াময়, প্রেমময় হরি, মিলন মূর্ত্তিতে ভক্তের সমীপে সমুপস্থিত। এস ভাই সকলে মিলিয়া সমস্বরে একবার বলি

ভজ ভাই নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে নাম।"

এমন মধুর নাম আর হবে না, এমন দীনদয়াল ঠাকুর আর পাবে না। যম যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইবে। প্রাণে শান্তি পাইবে। ত্রিতাপে আর পুড়িতে হইবে না।

গুরুপদে প্রার্থনা, যেন এই নাম লইয়া অমিয়ময়, তারকব্রহ্ম নাম লইয়া জগৎ ত্যাগ করিতে পারি। "নাস্যৈব কেবলং" ইহা ভিন্ন গতি নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীকৃষ্ণের সংসার

(১০৬৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

শ্রীগীতায় ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন :—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি
মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী
ভবার্জ্জুন।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো
মতঃ॥"

তুমি স্বর্গে বা ধর্ম্মে যোগে বা জ্ঞানে তাহাকে স্থাপন করিয়াও তজ্জন্য আনন্দ পাবে না কারণ যদি তাহা হইত ব্রহ্মা মোহিত হইতেন না; অথবা শৌনকাদি ঋষিগণ পূর্ব্বে জ্ঞান বা কর্ম্ম কাণ্ডে থাকিয়াও তাহাকে যখন পাইলেন না তখন কাতরভাবে সূতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব আর্ত্ত হও কাতরভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর পাইবে নিশ্চয় পাইবে।

অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে"

যে জন তাঁহাকে পাইবার জন্য কাঁদে, প্রাণের আকুলতা জানায় তিনি তাঁহাকে কৃপা করেন। যেমন বালকের ক্ষুধার উদ্রেক হইলে সর্ব্বপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক হইতে নিবৃত্ত হয়; এবং মাতৃক্রোড়ই বিশ্রাম নিকেতন ও মাতৃস্তনই ক্ষুধা নিবারণের উপায় জানিয়া, কেবল ক্রন্দন মাত্র সম্বল লইয়া জননীর সন্নিধানে অগ্রসর হইতে বাসনা করে এবং সহজেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, ভক্ত সেইরূপ গুরুমুখে সেই ভক্তবৎসলের উদ্দেশ পাইয়া নিজ তৃপ্তি সাধনের জন্য বৈরাগ্যকে মাত্র অবলম্বন করিয়া কাতর হৃদয়ে মর্ম্মবেদনা জানাইতে থাকে। স্নেহময়ী জননী যেমন স্তন্যপান করাইয়াই ক্রন্দন থামাইবার জন্য নানাপ্রকার আবদার সহ্য করেন, ভগবানও ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে উদিত হইয়াও মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য বাহিরেও নিজ লীলা ঐশ্বর্য্যাদি অনুভব করান; তাই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেন কিন্তু চতুর্ব্বেদী ব্রহ্মা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন; নিজের মায়া প্রকাশ করিতে গিয়া মহামায়াবী শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ভাবিতেছেন—একি? যেমন দিবসে সূর্য্য কিরণে খদ্যোত পৃথক প্রকাশ হতে পারে না; যেমন অন্ধকার রাত্রে হিম কণার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মায়ার নিকটে ব্রহ্মার মায়া কিছুই নয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কারণ "তেনে ব্রহ্ম হৃদয়ে যা আদিকায়ে" তিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ আছেন বলিয়াই ব্রহ্মা আজ প্রকাশমান বলিয়া বোধ হইতেছে। অনন্তর ব্রহ্মা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া গদগদবচনে বলিয়াছিলেন :—

"নৌমীড্যতেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়,
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছলসায়।
বন্যস্রজে কবল বেত্রবিষাণ বেণু লক্ষ্মশ্রিয়ে
মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।"

হে ইড্য স্তবনীয়! আপনাকে প্রণাম

করাইবার জন্য আপনারি স্তব করিতেছি। হে প্রভো! আপনার শরীর নব নীরদের ন্যায় শ্যাম বর্ণ। তনীয় বসন বিদ্যুৎ সদৃশ পীত, শুন্দর কর্ণভূষণ এবং মযূরপুচ্ছের শিরোভূষণে আপনার বদন অতিশয় শোভমান, আপনার গলদেশে পদ্ম পুষ্পাদিময়ী মালা কমল বেত্র বিষাণ ও বেণু প্রভৃতি লক্ষণে সুলক্ষিতা তোমার অঙ্গলক্ষ্মী; চরণ যুগল সুকোমল, তুমি গোপরাজ নন্দের অঙ্গজ তোমাকে প্রণাম করি। আমি আপনার মহিমা জানিতে পারি নাই, অথবা কেহ জানিতেও সমর্থ নয়। তুমি স্বেচ্ছাময়, তোমার রূপ অচিন্ত্য এবং আত্মসুখানুভব মাত্র; কেননা "অদ্যাপি তৎপদ রজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব" অতএব—

"উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।"

মাতৃগর্ভে শিশু পাদোৎক্ষেপণ করিলে, মাতা কি সে অপরাধ গ্রহণ করেন?

"অহো হতিধন্যা ব্রজ গোরমন্ধঃ
স্তন্যামৃতং পীত মতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা—
যন্মৃগ্যতে হস্যাপি নাকে সমরাঃ॥"

"অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং॥"

হে বিভো! অনাদি কাল প্রবৃত্ত বেদোক্ত যজ্ঞসমূহ অদ্যাপি যাঁহার তুষ্টি সাধনে সমর্থ হইতে পারে নাই সেই আপনি গোবৎস ও বালকের রূপ ধারণ করিয়া যাঁহাদের স্তন্যামৃত সুস্বাদু ও অমৃত জ্ঞানে পান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছেন, সেই ব্রজবনিতাগণ ও গাভী সকলই ধন্যা। হে প্রভো! নন্দরাজের ব্রজে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারাও ধন্য কারণ পরমানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদিগের নিকট সতত মিত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের ভাগ্যের কথা আর কি বর্ণনা করিব।

"তৎভূরিভাগামিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকং।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ
স্তস্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতি মৃগ্যমেব॥"

হে মুকুন্দ! যে প্রকারেই জন্ম হউক না কেন, গোকুল মধ্যে কিম্বা বৃন্দাবনের বনেও যদি জন্মলাভ ঘটে, তাহাও দুর্লভ; কারণ এই গোকুলে জন্ম হইলে ব্রজবাসীদিগের পদধূলি আমার মস্তকে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। শ্রুতি চিরাদন যাঁহার পদরজঃ অন্বেষণ করিতেছেন সেই মুকুন্দই যখন তাঁহাদিগের জীবন সর্ব্বস্ব তখন সেই গোকুলবাসী অপেক্ষা কে সৌভাগ্যবান্ হইতে পারে?

"তদস্তমে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাং।
যেনাহ মেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবং।

ভক্তি ব্যতীত যখন পরমার্থ লাভ হয় না তবে স্বকীয় কর্ম্মফল দ্বারা যদি কোনও অধম পশ্বাদি তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই জন্মে এইরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয় যেন তোমার পাদপদ্ম অধিকারী একজন ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি।

সহৃদয় পাঠকপাঠিকা! শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত হইয়া জগৎবিধাতা ব্রহ্মারও জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে কোনও যোনিতে জন্মগ্রহণ হউক্ না কেন, ভগবৎভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করাই জীবনের সার্থক। এইজন্যই তিনি ভগবান কৃষ্ণকে নাথ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক দাস্যভাব প্রার্থনা করিলেন।

তিনি ব্রজবাসী ভক্তগণের সৌভাগ্য দর্শনে, তাহার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজন্মকেও তুচ্ছজ্ঞান করিলেন। যদি ভগবানের ভক্ত হইয়া জন্ম জন্মান্তর নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়, তথাপি অভক্ত হইয়া শুষ্ক জ্ঞানীর ন্যায় সর্ব্বোত্তম যোনিতে জন্মগ্রহণ করাও প্রার্থনীয় নহে।

রাগ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি বিষয় কামনা বিসর্জ্জন না দিলে কৃষ্ণের দয়া হয় না। জীব অন্তত্তম দেহাদিতে আত্মজ্ঞান দ্বারা ঘোর মোহজালে আবদ্ধ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও স্বস্ব গুণে আবৃত হইয়া সংসার কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবান জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য যোগমায়া বিস্তার করিয়া নিরাকার হইয়াও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য মানবের ন্যায় প্রতীত হয়েন। ঈশ্বর স্বতন্ত্র, জীব ঈশ্বরের অধীন। সুতরাং মায়া কর্ত্তৃক মোহিত ও প্রপঞ্চান্তর্গত রজ ও তমোগুণে আকৃষ্ট হইয়া জীব আপনি আপনাকে বিস্মরণ হইয়া যায়। প্রপঞ্চান্তর্গত রজঃ ও তমগুণের আধিক্য বশতঃ চিৎস্বরূপের পরিস্ফুটতা না হওয়ায়, জড়ের ন্যায় ধারণা হইয়া থাকে এবং ভগবদ্ তত্ত্বের নির্দ্ধারণে অসমর্থ হয়। তন্মধ্যে যাঁহারা সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রেয়ভক্তি যোগে তাঁহার কৃপার পাত্র হইতে পারেন তাঁহারাই আত্মনাত্ম জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবৎ তত্ত্ব কথঞ্চিৎ জানিতে পারেন। ভক্তি হইতেই ভগবৎ জ্ঞানলাভ হয়। এই ভগবৎ জ্ঞানই কৃষ্ণ প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ। যাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ জ্ঞান অঙ্কুরিত হইয়াছে তিনি নীচবংশ হইলেও শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রণম্য। ভক্তি ব্যতীরেকে কেবল জ্ঞানে কিছু হয় না কারণ :—

"শ্রেয়ঃ স্বতিং ভক্তি মুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধ লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যৎ যথা স্থূল তুষাব ঘাতিনাং॥"

ব্রহ্মা বলিতেছেন হে বিভো! যে সকল ব্যক্তি পরম শ্রেয়ের বর্ত্ম স্বরূপ ভক্তি ত্যাগ করে এবং কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত ক্লেশ করে তাহের কেবল ক্লেশমাত্র লাভ হয়। যেমন তণ্ডুল বিহীন স্থূল তুষ যাহা বাহিরে খাদ্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, তাহা অবঘাত করিলে যেমন কোনই ফল হয় না কেবল পরিশ্রম মাত্র সার—সেইরূপ ভক্তি ভিন্ন শুষ্ক জ্ঞানও কেবল শ্রম মাত্র।

এই জন্যই ব্রহ্মা সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ মোক্ষ প্রত্যাশা বিসর্জ্জন দিয়া কি উপায়ে ব্রজবাসী জনগণের চরণ লাভ করিবেন ইহাই প্রার্থনা করিলেন। হে দীননাথ! এই দীনের প্রতি কৃপা বিতরণ করুন আমি যেন সেই ব্রজবাসীগণের চরণধূলি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। আমার ব্রহ্ম জন্ম অপেক্ষা যদি এই বৃন্দাবনের কোনও একস্থানে তৃণ হইয়াও জন্ম গ্রহণ করিতে পারি; সেও আমার পরম সৌভাগ্য। কেন না ব্রজবাসীগণের চরণধূলি আমার মস্তকোপরি নিপতিত হইবে।

হে ব্রজপতি! এই চরণধূলিই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। আমি শিলাদি পাষাণরূপ হইয়া এই ব্রজভূমির নগরপ্রান্তে নিপতিত থাকিব, যদি নগরবাসী, সূচিকাকর্ম্মজীবী কারুকার্য্যকারী বা মনগ্রাহীও আমার উপর পদনিক্ষেপপূর্ব্বক গমন করে তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। আমি জগৎ বিধাতা ব্রহ্মা বলিয়া কোনরূপ লজ্জাবোধ করিব না। হে মুক্তিদাতা! লোকে

তাহাদিগকে নীচজাতি বলে বলুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; যাহারা আপনার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দর্শনে জীবিত থাকে এবং ক্ষণমাত্র আপনার অদর্শনে হত হয়, তাহারা কি কখনও নীচ বা ঘৃণ্য হইতে পারে? তাহারা মস্তকের মণি সদৃশ।

হে ব্রহ্মণ্যদেব। শ্রুতিসমূহ অদ্যাবধি যাঁহার পদধূলি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই; আমি তাহা অপেক্ষা এমন কি শ্রেষ্ঠ যে আমার লজ্জার উদয় হইবে। হে দেব! আমার প্রার্থনা কোন মতেই অকিঞ্চিৎকর নহে।

ব্রহ্মা যেমন দাস্য ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন; সেইরূপ জীবেরও শ্রীগুরুর উপদেশ মত প্রথমে দাস্যভক্তি বা ভাব স্বীকার করিয়া ভাবময়কে ভাবনা করা উচিত। কারণ আমরা মোহান্ধ জীব, সেই মোহকে দূরীভূত করিতে হইলে শ্রীগুরুর উপদেশামৃত পান করা উচিত। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরীষ্যতি
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং।"

অতএব মোহকলুষিত চিত্তের মোহচ্ছেদের জন্য, শ্রীজগন্নাথের বিশেষ প্রকাশ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির ভজনা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আমি দেখিতেছি মৃৎ ও চিৎভাবে দুই বিভিন্ন কেন না আমি উভয়ের স্বরূপ বুঝিতেছি না। প্রস্তর বল, মৃত্তিকা বল সবইত সেই অবিনাশী আনন্দময়ের অরূপ চিৎএর রূপ। মৃৎ ও চিতে কিছুই ভেদ নাই। যাহা মৃৎ তাহা চিৎ অর্থাৎ যাহা জড় তাহাই চৈতন্য। কার্য্যগুণে চৈতন্য জড়ে পরিণত এবং জড় আবার চৈতন্যে পরিণত হয়। যাহাকে তুমি পাষাণময়ী বা পাষাণময়ী বলিতেছ প্রকৃতপক্ষে উহা চিন্ময়ী। বিশ্বেশ্বরের বিশ্বমূর্ত্তি সম্মুখে থাকিতেও প্রবর্ত্তক সাধকের মূর্ত্তির প্রয়োজন হয় কারণ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির সম্মুখে নদী থাকিলেও সে নদী পান না করিয়া ঘটী ভরিয়া জল তুলিয়া পান করে—সেইরূপ ক্ষুদ্র হৃদয় জীব বিশ্বরূপের বিশ্বমূর্ত্তি ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না, তাই সে বাসনানুরূপ সাধনানুরূপ মূর্ত্তি গঠন করিয়া যার যে ভাব সেই ভাবে ভাবনিধি ভগবানের ভাবনা করিয়া থাকে। অতএব জীব তোমার সম্মুখে অপার সমুদ্র, তোমার পাত্রকে প্রথমে শ্রীগুরুর উপদেশামৃতে প্রক্ষালন কর, তাহার পর যে পাত্রে যতটুকু পরিমাণে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের আনন্দঘন রস পান কর তোমার তৃষা দূর হইবে। যে যে ভাবেই পান করুক না কেন সবই সেই একই সমুদ্রের জল। পাত্রের রূপভেদে ভাবনার কেবল ভেদ দেখা যায়।

শ্যামা শ্যাম ভিন্ন কেবল আকারে
ভিন্ন আকারে ভিন্নাকার রে।
শ্যামা ধরে অসি শ্যাম ধরে বাঁশী
অট্ট হাসি মৃদু হাসি যে অধরে॥
বৃন্দাবনে শ্যাম অপ্রাকৃত কাম
মদোন্মাদিনী শ্যামা ধরে নাম
যে যে ভাবে ভাবে পূরে মনস্কাম
প্রবর্ত্তে প্রভেদ ভিন্ন ভিন্নাকারে॥
দশভুজ রূপে শ্যামার এক মূর্ত্তি
দ্বিভুজ শ্যাম মদন গোপালমূর্ত্তি
উভয়ের পূজার মূল প্রেমভক্তি
অভিন্ন প্রণব রকারে লকারে॥

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ভাগবতভূষণ
কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

বর্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ

২

জামালপুরের মেলা

গত শ্রাবণ মাসের গৃহস্থে আমার "অগ্রদ্বীপের মেলা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে পল্লীবাসী অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "এইরূপ মেলার বিবরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি ?"

তাঁহাদের অবগতির জন্য নিবেদন এই যে, আমি স্বেচ্ছায় এ কার্য্যে ব্রতী হই নাই, গত চৈত্রমাসে বর্দ্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সময় সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত "বাউলের ইতিহাস" লেখক অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বর্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারই আদেশ মত বর্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, এইরূপ ভাবে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার মেলার বিবরণ আলোচিত হইলে দেশের প্রকৃত ইতিহাস বাহির হইয়া পড়িবে।

এইরূপ আলোচনা উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইলে পল্লী সমাজের সহিত শিক্ষিত নাগরিকদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইবে। এইরূপে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের অনেক তথ্যই সংগৃহীত হইবে এবং তদ্দ্বারা আমাদের ধারাবাহিক জাতীয় ইতিহাসের অনেক উপাদান প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

জেলা বর্দ্ধমান পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন জামালপুর পল্লবনাবৃত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথী জামালপুরের প্রান্তবাহিনী ছিলেন—এখন তাহার বহু নিদর্শন জামালপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ভাগীরথী জামালপুর হইতে প্রায় দু ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিকে সরিয়া গিয়াছেন। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী সংপ্রতি উক্ত ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে প্রায় উজাড় করিয়া তুলিয়াছে। আজকাল উক্ত গ্রাম প্রায় জনশূন্য ও জঙ্গলময় হইয়াছে; এবং সেই জঙ্গলে দুই একটা ব্যাঘ্রও বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে "ধর্ম্মরাজ" (যিনি এক্ষণে জামালপুরের বুড়রাজ নামে খ্যাত হইয়াছেন) ঠাকুরের অধিষ্ঠান। এই ধর্ম্মরাজ ঠাকুর যে এখানে কতকাল আছেন তাহার বিবরণ কেহ বলিতে পারেন না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময় যখন শৈব ধর্ম্মের বহুল বিস্তার আরম্ভ হয় সেই সময় রামাই পণ্ডিত মৃত বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিবার বাসনায় ধর্ম্ম পূজার প্রচার করেন। সুতরাং জামালপুরের ধর্ম্মরাজও যে সেই সময়ে বা তাহার কিছু পরে প্রতিষ্ঠিত তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎপরে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে যখন "ধর্ম্মের গাজন" নীচ জন ভোগ্য হইয়া পড়ে, সেই সময় জামালপুরের "ধর্ম্মরাজ" বুড়রাজ নামে শিবত্ব প্রাপ্ত

হইয়া হিন্দুগণের হইয়া পড়িয়াছেন।

জামালপুরের বুড়রাজের নাম বঙ্গের সকল স্থানেই পরিচিত। বাংলা দেশের বহু স্থান হইতে বহুলোক প্রতি বৎসর তথায় সমবেত হইয়া থাকেন। জামালপুরের নিকটবর্ত্তী "গোয়ালপাড়া" নামক গ্রামও পূর্ব্বে জামালপুরের একটী অংশ ছিল।

কথিত আছে এই গোয়ালপাড়ায় অতি প্রাচীন কালে শ্রীমন্ত ঘোষ নামে গোপ জাতীয় একজন ভক্তিবান্ লোক বাস করিতেন; জামালপুরের ধর্ম্মরাজ তাহারই নিকট সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্ত ঘোষের বংশধরগণের বাসবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই শ্রীমন্ত ঘোষের "সুবুদ্ধি" নামে এক পয়স্বিনী গাভী ছিল। শ্রীমন্ত ঘোষ প্রায়ই জামালপুরের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বনমধ্যে গোচারণ করিত। কোন সময়ে উক্ত বনে গোচারণে যাইয়া শ্রীমন্ত তাহার "সুবুদ্ধি"নাম্নী গাভীকে একদিন পালের মধ্যে দেখিতে পাইলেন না, অনেক অন্বেষণ করিয়া "সুবুদ্ধি"কে দেখিতে না পাইয়া শ্রীমন্ত সন্ধ্যাকালে উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গোশালায় গমন করিয়া দেখিলেন "সুবুদ্ধি" অগ্রেই ফিরিয়া তথায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সে যাহাই হউক, সন্ধ্যার পর শ্রীমন্ত সেই গাভীকে দোহন করিতে গমন করিলেন; কিন্তু দোহন ত দূরের কথা "সুবুদ্ধি" তাহার বাছুরকে পর্য্যন্ত সেদিন দুগ্ধ প্রদান করিল না। সেই দিন হইতে প্রত্যহই ঐরূপ ঘটনা ঘটিতে লাগিল। শ্রীমন্তের পত্নী তখন শ্রীমন্তকে বলিলেন—

"শুন নাথ নিবেদন, একি দেখি অলক্ষণ,
নাহি কর তুমি কিছু ইহার উপায়।
বারেক ভাবনা মনে, তোমার সুবুদ্ধি ধনে,
মন্দলোকে মন্দ কিছু করেছে নিশ্চয়॥
নতুবা দেখহ কেন, বাছুরে না দেয় স্তন,
দোহন দূরের কথা কি কহিব আর।
সকলি ত জান তুমি, কি আর বলিব আমি,
দোহিতে কি পারিয়াছ দুগ্ধ একধার॥
যে গাভী সবার শ্রেষ্ঠ, করিল কে তারে নষ্ট,
আমাদের দুরদৃষ্ট হেতু হ'ল হেন।
আলস্যেরে পরিহরি, যাও নাথ ত্বরা করি,
কি হেতু এমন হ'ল জানহ সন্ধান।"

(জামালপুরের শ্রীশ্রী৺বুড়রাজের মহিমা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।)

পত্নীর কথামত পরদিন শ্রীমন্ত গো-চারণে যাইয়া অতি সাবধানে "সুবুদ্ধি"র তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমন্ত দেখিলেন তাঁহার "সুবুদ্ধি" গাভী পাল হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিতেছে; শ্রীমন্ত তাহার অনুসরণ করিলেন। দুর্গম বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্ত একটী আম্র বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেন—

"সুবুদ্ধির স্তন হ'তে,
দুগ্ধধারা পৃথিবীতে,
ধারিত হতেছে স্বতঃ মৃত্তিকার উপর।
চমৎকার শব্দ তার হয় গড় গড়॥"

(৺বুড়রাজ মহিমা গ্রন্থ)

এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীমন্ত একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে চিন্তিত মনে বন হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীমন্ত গো-পাল লইয়া বাড়ী ফিরিলেন এবং তাঁহার পত্নীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। স্বামীমুখে এই অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া গোপরমণী

"দৈবশক্তি হবে কহে মনে অনুমানিয়া।"

এই অলৌকিক ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমন্তের পত্নীর সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। সেই রাত্রিতে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। আমরা নিম্নে "৺বুড়রাজ মহিমা গ্রন্থ হইতে অবিকল সেই স্বপ্নবৃত্তান্তটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা :—

"সুষুপ্ত ধরণী অন্ধকারময়,
জলে স্থলে শূন্য দেশে
নিদ্রায় চেতন হীন এ বিশ্ব সকল;
হেন কালে অতি এক আশ্চর্য্য স্বপন
দেখিল শ্রীমন্ত ভার্য্যা :—
অমল ধবল কায় ব্রাহ্মণ স্থবির এক,
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তার।
শ্বেতবর্ণ দীর্ঘ শ্মশ্রু আচ্ছাদি চিবুক
দুলিতেছে বক্ষোপরে,
শিরোপরি শ্বেতবর্ণ চাঁচর চিকুর
শোভিছে সুন্দর।
শ্বেতবর্ণ পট্টবাস পিন্ধনে তাঁহার,
দিব্য এক শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত কায়;—
উজলিছে যজ্ঞোপবীত তাহার ভিতর।
শিথিল গাত্রের চর্ম্ম, অবনত বদন, স্ববশে
চলিতে নারে শক্তিহীন তায়,
যষ্টিভরে উপনীত তাহার নিকট।
কাঁপিতে কাঁপিতে কহে—
শ্রীমন্ত ভার্য্যায়—
শুন গো আনন্দময়ী!
যথায় সুবুদ্ধি তব নিরজন বনে
দুগ্ধ দিতে প্রতিদিন গোপনেতে যায়।
যথায় গহ্বর মধ্যে গড় গড় রবে
নিপতিত হয় দুগ্ধ;—
পাষাণ মূরতি ধরি বিরাজি
তথায় আমি অপ্রকাশ ভাবে।
মহাদেব অংশ, মম নাম "ধর্ম্মরাজ"।
এতদিন এ কাননে ছিনু গুপ্তভাবে,
তোমারে করিয়া দয়া,
তোমার দ্বারায় প্রকাশ
হইব হেথা হইল বাসনা,
হেই সুলোচনে!
কহি স্বপনে তোমায়;
স্বপন আদেশ পাল হইবে মঙ্গল।
এ গহ্বর মধ্যে যথা শিলামূর্ত্তি মোর—
তাহার উপরে মম গৃহ
নিরমাণ করাও সুন্দরি!
অর্থের অভাব তব কিছু নাহি হবে,
রাখিয়াছি অর্থভাণ্ড তব—
গো-শালার ঈশান কোণেতে।
রজনী প্রভাতে অর্থ করিয়া গ্রহণ
নির্ম্মাইবে গৃহ মোর, সাহায্যে তাহার।
তোমার স্বামীরে কহ স্বপ্ন বিবরণ,
তাহার দ্বারায় মম গৃহ নিরমিত হইবে
উৎসাহ সহ।
নাহি কাজ অট্টালিকায়
মৃন্ময় গৃহেতে হবে বসতি আমার।
তব গ্রামে চট্টোবংশে শিবচন্দ্র নাম,
পৌরোহিত্য-পদে তাঁরে করিয়া নিয়োগ,
নিত্য পূজা দেও মোর ভক্তি সহকারে
বিল্বপত্র পুষ্পসহ চন্দনে চর্চ্চিয়া
জাহ্নবী জীবন সহ,
যথাসাধ্য সোপকর্ণে নৈবেদ্য করিয়া,
পূজিবে আমায় স্বীয় ভ্রাতা অনুসারে।
চৈত্র মাসে গাজনের নিয়ম যে সব
হয়ে থাকে শিবস্থানে,
সেইরূপ ক্রিয়াসব বৈশাখী পূর্ণিমায়
হইবে আমার স্থানে; এ আমালপুরে।
সাইস্থ্য মঙ্গল কিম্বা দৈহিক পীড়ায়,
আমার নিকটে সেবা করিবে মানস,

পূর্ণ হবে মনোবাঞ্ছা তা'র।
কিন্তু এক কথা বলি রাখিও স্মরণে।
চণ্ড আদি বহু শিষ্য আমার নিকট
অলক্ষ্যেতে বিচরিবে;
তাদের ভোগের লাগি
ছাগ পশু বলিদান হইবে করিতে।
যেমন করিবে এই মানস আমার,
নিশ্চয় করিব পূর্ণ তার মনোরথ।
বৈশাখী, জ্যৈষ্ঠ কিম্বা মাঘী পূর্ণিমায়,
আর প্রতি শুক্র সোমবারে
মানসিক পূজা মোর যে করিবে দান,
আর পাঠা দিবে বলি চণ্ডগণ তরে,
নাশিব তাহার আমি সকল অশিব;
সহস্র বিপদ হলে ঘটাব মঙ্গল।
মম গৃহ নির্ম্মাইয়া, বাদ্যভাণ্ড সহ
মহোৎসবে কর মোর পূজা;
এই মাত্র স্বপ্নাদেশ করিনু তোমায়;
নিদ্রাভঙ্গে পতিস্থানে—কহিও সকল।"

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীমন্তের পত্নী শ্রীমন্তকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন। এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ত চমকিত হইলেন এবং সাহসে নির্ভর করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং তথায় যেখানে সুবুদ্ধি গাভী দুগ্ধ প্রদান করিত তথায় একটী গহ্বর মধ্যে শ্রীমন্ত শিলা-মূর্ত্তি ধর্ম্মরাজকে দেখিয়া ভয়ে কম্পমান ও লোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন এবং গদগদচিত্তে কৃতবাসে ভগবান ধর্ম্মরাজকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পত্নীকে স্বপ্ন নির্দ্দিষ্ট অর্থভাণ্ড গোশালা হইতে তুলিয়া আনিতে অনুমতি করিলেন।

শ্রীমন্তগৃহিণী গোশালার ঈশান কোণ খনন করিয়া অর্থভাণ্ড তুলিয়া লইয়া স্বামীর নিকট গমন করিলেন। সেই অর্থদ্বারা শ্রীমন্ত বন কাটাইয়া সপ্তাহ মধ্যে তথায় একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তৎপরে

"আম্রশাখা ঝোলাইয়া,
পূর্ণ কুম্ভ বসাইয়া,
দুধারে কদলী বৃক্ষ করিল রোপণ।
লোহিত নিশান উড়ে,
মহানন্দে জামালপুরে
ঢাক ঢোল আদি বাদ্য করায় বাদন॥
নিকটস্থ গ্রামবাসী,
স্ত্রীপুরুষ সবে আসি,
বাবার মাথায় ঢালে দুগ্ধ গঙ্গাজল।
কোলাহলে পরিপূর্ণ
হইল সে ঘোর অরণ্য
জয়ধ্বনি সকলের মুখে অবিরল॥
আসিয়া ব্রাহ্মণগণ, করি মন্ত্র উচ্চারণ,
অভিষেক করাইয়া পূজায় বসিল।
পুষ্প বিল্বপত্র দিয়া, নৈবেদ্য উৎসর্গিয়া,
অজোৎসর্গ করি পরে খড়্গ উৎসর্গিল॥
হলে পূজা সমাধান, কর্ম্মকার বলিদান,
করিল নিয়ম মত চণ্ডগণ তরে।"

৺বুড়রাজ মহিমা।

এখানকার বুড়রাজের পূজা শিবের "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারু চন্দ্রাবতংসং রত্ন কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত মমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।" ধ্যানে হইয়া থাকে; পূজান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করা হয়:—

"প্রণমা সর্ব্বকর্ত্তারং সর্ব্বজং সর্ব্ব বেদিনম্।
সর্ব্বাত্মং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বং ধর্ম্মরাজ নমস্কৃতম্॥"

উপরি উদ্ধৃত বিষয়গুলির আলোচনা করিলে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হই। যথা :—

১। হিন্দু সমাজ চিরকাল পরকে আপন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এক সময়ে যাহা বৌদ্ধদিগের "ধর্ম্মের গাজন" ছিল এক্ষণে তাহা হিন্দুদিগের শিবের পূজায় পরিণত হইয়াছে।

২। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা হিন্দুগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মরাজকে শিবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিলেও ছাগ বলিদান প্রথা রহিত করেন নাই; চণ্ডাদি শিবভক্তগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা বজায় রাখিয়াছেন।

৩। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বুড়রাজের পূজার ব্যবস্থা হওয়ায় বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মের বার্ষিক গাজন বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়ার দিবসে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় শেষ হইত। সুতরাং ধর্ম্মকে শিবত্ব প্রদান করিয়া হিন্দু দেবতা করিয়া লওয়া সত্ত্বেও তাঁহার গাজনের দিন পরিবর্ত্তিত করা হয় নাই।

৪। ধর্ম্মের গাজনের শোভাযাত্রা, নৃত্যগীত বাদ্য, বাণ ফোঁড়া প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ আছে আমালপুরের বুড়রাজের নিকটও গাজনে প্রায় সেই সকল নিয়মই প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

আজ পর্য্যন্ত আমালপুরে মহা বৈশাখী পূর্ণিমায় ৺বুড়রাজের মহাধুমধামে গাজন ও পূজা হইয়া থাকে। ঐ সময়ে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আমালপুরে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং এক মাস ব্যাপী একটী বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলাতে কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু আমা, জুতা, ছাতা, পিতল কাঁসার বাসন, মনোহারী দ্রব্য, মিষ্টান্ন, আম, লিচু, নারিকেল প্রভৃতি সকল প্রকার ফল মূলের, শিল্প, তাঁতা প্রভৃতি প্রস্তরের দ্রব্য সামগ্রীর বড় বড় দোকান আসিয়া থাকে। বহু টাকার মাল খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলার এই অঞ্চলের লোকেরা তাহাদের আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্যই এই মেলাস্থলী হইতে খরিদ করিয়া থাকেন। সার্কাস্, পেন্টিং বিয়েটার, বাঘের খেলা, নাগর দোলা প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল খেলাও আসিয়া থাকে। মেলার সময় জঙ্গলময় ক্ষুদ্র আমালপুর পল্লী একটী বড় সহরে পরিণত হইয়া থাকে; এক মিষ্টান্নের দোকান এত আসিয়া থাকে যে, ঐ সময়ে লক্ষাধিক টাকার কেবল মিষ্টান্নই বিক্রয় হইয়া থাকে।

ইহা হইতেই এখানকার মেলার গুরুত্ব সকলে উপলব্ধি করুন। মহা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় ও মাঘী পূর্ণিমাতেও এখানে দুইবার ছোট খাটো দুইটী মেলা হইয়া থাকে, তবে সে সময় কলিকাতা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান হইতে কোন দোকান পসারী আসে না; দেশের লোকেই দোকান পাতিয়া থাকে। এ দুই সময়ও বিশ পঁচিশ হাজার করিয়া লোক সমাগম হইয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর এখানে প্রায় চারি পাঁচ হাজার ছাগ শিশু বলিদান হইয়া থাকে।

বৈশাখী পূর্ণিমায় গাজনের সময় প্রায় দুই তিন হাজার 'সন্ন্যাসী' হইয়া থাকে। ঐ সকল সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই দশ পনের ক্রোশ তফাৎ হইতে এক পদও পদভরে অগ্রসর না হইয়া শয়ন করিয়া বুকে ভর দিয়া আমালপুর আসিয়া থাকে। তাহাদের সংযম ও কঠোরতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

অনেক মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীলোকও রোগ-মুক্তি কামনায় এখানে পূজা দিয়া থাকেন। ৺বুড় রাজেরও এমনি মহিমা যে, যে কোন ব্যক্তি, যে কোন প্রকারেরই কঠিন ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া সেই ব্যাধি-মুক্তির কামনায় বাবার নিকট মানস করেন এবং প্রতি মাসের শুক্ল-পক্ষের সোমবারে হবিষ্যান্ন করেন, তিনি সেই ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। আমরা স্বচক্ষে কতশত কুষ্ঠ, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ৺বুড়রাজের কৃপায় রোগমুক্ত হইতে দেখিয়াছি।

বর্দ্ধমান জেলায় চন্দ্রপুরের কবি জগদানন্দ কৃত একখানি গান উক্ত ঘটনার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা :—

জেলা বর্দ্ধমান, মহকুমা কালনার অধীন পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত আমালপুরস্থিত—শ্রীশ্রী৺ বুড়রাজ দেবের মাহাত্ম্যসঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

বাবা বুড়রাজ দেখে তোমার কাজ
মানব সমাজ মোহিত সকলে।
ধীরাধাধিরাজ মহা কবিরাজ
করিছ বিরাজ আমালপুর অঞ্চলে।
হলে মহাব্যাধি বৈদ্যে না পায় বিধি
যদি যাগা বাঁধি পালে নিয়ম বিধি,
ভক্তি বিনিময়ে ভক্তে নিরবধি
দাও মহৌষধি পুষ্প স্বামজলে। ১
দয়াল বাবার দয়ার সীমা নাই দেখি
বন্দনায় বলে অন্ধে পায় আঁখি
আমি ক'ব বা কি চারি দিকে থাকি
হয় ভাবি রোগ মুক্ত ভক্ত দলে। ২
সিদ্ধ তব নাম স্মরি সিদ্ধ কাম
বন্ধ পুণ্য ধাম আমালপুর গ্রাম।
প্রতি পূর্ণিমায় হয় ধুমধাম
আসে কত গ্রাম হতে লোক সমলে। ৩
বৈশাখী পূর্ণিমায় আগে কয় দিন ধরে
তোমার গায়ন উপলক্ষ করে
ভজন পূজন হয় সমাদরে
স্থানে লোক না ধরে ধরে ধরে চলে। ৪
ভক্তে পূর্ণ আমাল পুরের অলিগলি
যার যেমন মানস সে তেমনি দেয় বলি
করিছে উৎসর্গ 'এই লও বাবা' বলি
সবে কুতূহলী এসে তোমার স্থলে। ৫
বাজিছে বাজনা নাচে কত জনা
করছে আনাগোনা যায় নাক লোক গণা
যার যেমন কামনা পুরাচ্ছ বাসনা
হয় না তোমার দেনা শোধ কোন কালে। ৬
দোকানি পসারি বসে সারি সারি
রয় আড্ডা পাড়ি কত গরু গাড়ী
হুহুরি আনাড়ি যত পুরুষ নারী
বেচ্‌ছে কিনছে ভারি তোমার দোহাই বলে। ৭
সমভাবে লোক দিবস রাত্রিতে
কোলাহলে পূর্ণ করেছে যাত্রিতে
ভক্ত দলে দলে মিলে একত্রিতে
ডাকে উচ্চৈস্বরে বাবার জয় বলে। ৮
দ্বিজের সম্মান বাড়াতে বিধান
দ্বিজে দিলে হয় পূজা সমাধান
ননীগোপাল বন্দ্যো সেবক প্রধান
করি অভয় দান রেখেছ কুশলে। ৯
দুরন্বিত ভক্তে করতে অভয় দান
পোষ্ট পিপলন গ্রাম সন্নিধান
• ইছু গ্রামে আছে দ্বিতীয়াধিষ্ঠান
হিন্দু মুসলমান পূজে সবে মিলে। ১০
পুণ্যক্ষেত্র পাশে সাধারণ হিতে
মেখলাম জলসত্র মিষ্টান্ন সহিতে
ভারী বিনা ভার কে পারে বহিতে
হয় না সহিতে টানাটানি জলে। ১১

• বর্দ্ধমান জেলায় ইছুতাড়া পল্লীতে উক্ত বুড়-রাজের আর একটি মেলা হয়।

কিবা শুভক্ষণে যাত্রা করেছিলাম
ভাগ্যক্রমে বাবা তোমার বাড়ী গেলাম
জগদানন্দ কর ধন্য হ'লাম, তোমার
ভক্ত পদরেণু নিলাম মাথে তুলে ॥১২

এখানকার মেলাতেও কএকটী কুপ্রথা প্রচলিত আছে।

১। এখানেও মেলার সময় কখন কখন মদের ছড়াছড়ি হইয়া থাকে।

২। স্থানীয় অনেক ভদ্রসন্তান ও নিম্নশ্রেণীর ইতর লোক বহুদূর হইতে আগত লোকের নিকট পূজার জন্য মানীত পাঠা কাড়িয়া লইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা নিজেদের রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। তবে আজ কাল পুলিশ পাহারার সুবন্দোবস্ত হওয়ায় ও কাল্নার সবডিভিসন্যাল অফিসার মহোদয় মেলার সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকায় উক্ত অত্যাচার অনেকটা কমিয়াছে।
পূর্ব্বে এই ব্যাপার লইয়া অনেক দাঙ্গা মারা মারি খুন জখম হইয়া যাইত।

৩। ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া পূজা দিবার শক্তি সকলের হয় না, কারণ ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিবার সুবন্দোবস্ত নাই, যাহাদের শরীরে বল আছে তাঁহারাই কেবল ঠেলাঠেলি মারামারি করিয়া কোন উপায়ে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকেন; এই বিষয়ে একটু সুবন্দোবস্ত হইলে বড় ভাল হয়।

বর্দ্ধরাজের সর্ব্বপ্রথম সেবাইৎ ব্রাহ্মণ ৺ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশ লোপ হওয়ায় নদীয়া জেলার মুচাগাছা নিবাসী ৺ গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেবাইৎ হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে ৺ বুড়রাজের সেবাধিকারী হইয়াছেন। এই সেবা হইতে ননীবাবুর বাৎসরিক প্রায় চারি হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে; অথচ জামালপুরে আজ পর্য্যন্ত একটী ভাল জলাশয় প্রতিষ্ঠা হইল না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। বৈশাখ মাসে মেলার সময় জলাভাবে কত পুরুষ, কত স্ত্রী, ও কত বালক বালিকার যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

মুকুন্দীমপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ হালদার ও ঐ গ্রামের ডাক্তার শ্রীযুক্ত রঘুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বোধসাহার চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে মেলার সময় একটী জলসত্র স্থাপিত হইয়া থাকে; সেই জন্য অনেকে পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। এই নিঃস্বার্থ জলদানের জন্য ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

জামালপুর পূর্ব্বে কাঁচাগলীর ঘোষাল বাবুদের জমিদারী ছিল; এক্ষণে বর্দ্ধমানের বিখ্যাত উকীল স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান জমিদার বাবুদেরও মেলাস্থানের উন্নতিতে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

জামালপুর ব্যাণ্ডেল কাটোয়া রেল লাইনের পাটুলী ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ

বর্ত্তমান জগৎ

(চতুর্থ ভাগ)

ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ

প্রথম অধ্যায়

আট্‌লাণ্টিক-বক্ষে

১। বিলাতে ছয় মাস

প্রাকৃতিক দৃশ্য

ইংরাজ-স্থানে অর্দ্ধ বৎসর কাটিল। পৌঁছিয়াছিলাম গ্রীষ্মে। তখন কলিকাতায় ব্যবহারোপযোগী সাধারণ রেশমী কাপড়ের সুট্ পরিলেও চলিয়া যাইত। দিনের বেলায় বেশ গরম লাগিত। ছাড়িতেছি শীতের আরম্ভে। ইতিমধ্যে রাস্তায় দুএকদিন বরফ পড়িয়াছে। গরমের সময়ে এদেশের সর্ব্বত্র সবুজ তৃণপত্রের শোভা দেখিয়াছি। ক্রমশঃ শীতের প্রকোপে তরুরাজি বিকট আকার ধারণ করিতেছে। লণ্ডনের কোন গাছেই আর পাতা দেখিবার যো নাই। শ্মশানঘাটের আধ পোড়া কাঠের মত গাছগুলি ছাড়া ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকজনের রং যেরূপ সাদা গাছগুলি এই ঋতুতে তেমনি কাল!

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিকেরই দৃশ্য দেখিলাম। বিলাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য প্রায়ই এক ধরণের। মোটের উপর একটা কুয়াশাবৃত ধোঁয়াটে রংয়ের সবুজ উপত্যকা ও সমতল-ভূমি এদেশের বিশেষত্ব। একটা গূঢ় রহস্যময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জনপদের ভিতর বাস করিতেছি মনে হয়। অন্ধকার ও নীরবতা যেন দেশ-টাকে খানিকটা mysterious ও অতি প্রাকৃত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রকৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশাল বিরাট ও বৈচিত্র্যময়। সেই সৌন্দর্য্যে গরিমা উদারতা মহত্ত্ব ও বিভীষিকার পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতের মাঠঘাট নদীপর্ব্বত দেখিলে সে ভাব মনে জাগে না। ইংরাজীতে যাহাকে pretty বলে বিলাতের প্রকৃতি সেইরূপ— Sublimity or grandeur এখানে নাই বলা চলিতে পারে। ফরাসীদেশের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যতটা মুগ্ধ হওয়া যায় বিলাতের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া ততটা হওয়া যায় না। ফ্রান্সে স্বাভাবিক সুষমাকে মানুষের চেষ্টায় শতগুণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। সমস্ত দেশটা একখানা বাগান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বিলাতে মানুষের সাহায্যে প্রকৃতির লাবণ্য বাড়ান হয় নাই। এখানে কৃষিকর্ম্মের প্রভাব বেশী দেখিলাম না।

বিলাতে মাত্র তিনমাস কাটাইবার ইচ্ছা ছিল। বিলাত ছাড়িয়া ইয়োরোপের বিক্রম-পুর স্বরূপ ডেন্মার্ক দেখিবার উদ্যোগ করিতে ছিলাম। সেখান হইতে নিশীথ সূর্য্যের দেশ নরওয়ে যাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

অকস্মাৎ ইয়োরোপ বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইল। কাজেই নেপোলিয়নের কর্ম্মক্ষেত্র ফিষ্টে-বিস্মার্কের জন্মভূমি এবং ম্যাজিনির "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার আমার দেশ" ইত্যাদিও আর দেখা হইল না। বিলাতেই এক প্রকার 'interned' বা আবদ্ধ হইয়া থাকা সঙ্গত বিবেচনা করিলাম।

বিগত দশ বৎসর

বিলাতে পদার্পণ করিয়া অবধি বুঝিয়াছি যে ইংরাজ সমাজে গত দশ বৎসরের ভিতর সকল দিকে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে বিংশশতাব্দীর বিগত দশ বৎসর ইয়োরোপ ও এশিয়ার সকল দেশেই একটা বিপ্লব আনিয়াছে। ইংরাজেরা নানা আন্দোলনের সাহায্যে নানাবিধ সংস্কার সুরু করিয়াছেন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, রাষ্ট্রশাসন, আইন ব্যবস্থা, শিক্ষা বিস্তার, লোক সেবা, সেনাবিভাগ, ইত্যাদি প্রত্যেক দিকেই পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তন চলিতেছে। তিন মাস কাল বিলাতে ঘুরিয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। সম্প্রতি যে লড়াই সুরু হইল তাহার প্রভাবে এই ব্যাপক সংস্কারান্দোলন আরও বাড়িয়া চলিবে। যুদ্ধের পর ইংরাজের আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, পারিবারিক এবং নৈতিক অবস্থা বিশেষ রূপেই বদলাইয়া যাইবে। বিলাতে একটা যুগান্তর আসিবে বলা যাইতে পারে। এইরূপ এক বিপ্লব প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে সাধিত হইয়াছিল।

মানবজাতির ঐক্য

দূর হইতে একটা নূতন লোক বা জাতিকে যেরূপ দেখায় কাছে আসিলে সেরূপ দেখায় না। এইজন্য বর্ত্তমান কালে প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন ও ভারতের জনসাধারণকে সত্যভাবে বুঝিতে পারা কঠিন। যত দূরে থাকিব ততই বুঝিতে কষ্ট পাইতে হইবে। বলা বাহুল্য এই জন্যই এক জাতি অপর জাতিকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস, সন্দেহ, নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া থাকে। এইরূপ কুসংস্কার মানুষ ও জাতি মাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। এই সকল prejudices কোন দিন জগৎ হইতে দূরীভূত হইবে কিনা সন্দেহ। পরস্পর পরস্পরের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করিবার সুবিস্তৃত সুযোগ সৃষ্ট না হইলে জাতিগত সংস্কার বা ধারণার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব।

ভিন্ন ভিন্ন ধরণের লোক যত বেশী দেখিতেছি ততই মনে হইতেছে যে মানব সমাজে বৈচিত্র্য অপেক্ষা ঐক্যই বেশী। রং ও ভাষা এই দুই বিষয়ে পার্থক্য বোধ হয় এক এক মাইল পরেই লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু মানুষের চিত্ত সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। বর্ত্তমান কালে যে সকল জাতি দেখিতেছি তাহাদের হৃদয় অনুসন্ধান করিলে বুঝিব যে তাহারা সকলেই একই অবস্থায় হাসে কাঁদে। আবার অতীতে যে সকল জাতি জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জীবন-নিদর্শনগুলি আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারি যে আমাদেরই মত তাহারা রক্ত মাংসের মানুষ ছিল, আমাদের সুখ দুঃখের মত তাহাদেরও সুখ দুঃখ ছিল। মানবহৃদয় সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা একরূপ। তথাপি জগতে আমরা বৈচিত্র্যগুলি লইয়াই এত মজিয়া রহিয়াছি কেন? আর এই বিভিন্নতার ওজর করিয়া পরস্পর ধ্বংস সাধনে ব্যাপৃত কেন?

ভারতবাসী ইংরাজের দাস—সুতরাং ইংরাজেরা ভারতবাসীকে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর জীব বিবেচনা করিতে বাধ্য। ইহা একটা কুসংস্কার বটে—কিন্তু ইহা স্বাভাবিক। আবার ভারতবাসীও এই কারণেই ইংরাজকে সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। ইহাও একটা কুসংস্কার—এই কুসংস্কারও স্বাভাবিক। পরাধীন মানবের চিত্ত এইরূপ সম্মোহিত হইয়াই থাকে।

ইংরাজ চরিত্র

কুসংস্কার ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলে বর্ত্তমান ইংরাজকে কিরূপ মনে হয়? ছয় মাসে একটা জাতিকে বুঝা নিতান্তই দুরূহ। কিন্তু যেরূপ ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে বোধ হয় ইহারা স্থির ধীর ও গম্ভীর জাতি। নড়ন চড়ন গতিবিধি পরিবর্ত্তন বিপ্লব ইত্যাদি পছন্দ করে না—বরং এগুলি যথাসম্ভব বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে। এমন কি কোন সময়ে যদি একটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াই যায় তথাপি ইহারা যেন পুরাতন অবস্থাতেই রহিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করিতে ভালবাসে। ইহাদের ভিতর উগ্রস্বভাব বা প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। জাতিটা নিতান্তই শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ প্রকৃতি। ইহারা কথা খুব কম বলে—নীরব থাকিতে বেশী ভালবাসে—এবং আস্তে আস্তে কাজ করিতে করিতে জীবন পথে অগ্রসর হয়।

বর্ত্তমান ইংরাজসমাজে কোন অসাধারণ চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বা কর্ম্মবীর আছেন কি না সন্দেহ। অদ্ভুত ক্ষমতাবিশিষ্ট নরনারী দেখিবার জন্য বিলাতে আসিলে হয়ত হতাশ হইতে হইবে। সাধারণতঃ মানুষের যেসকল গুণ আশা করা যায় ইংরাজের ভিতর তাহা অপেক্ষা বিশেষ বা বেশী কিছু নাই। তবে ভারতবর্ষে যদি একশত লোকের মধ্যে সেই সকল গুণ থাকে তাহা হইলে বোধ হয় দশ হাজার ইংরাজের সেই সকল গুণ দেখিতে পাইব। কেবল সংখ্যার প্রভেদ—দুই জাতিতে উচ্চশ্রেণীর গুণী লোক সম্বন্ধে আর কোন প্রভেদ নাই।

ইংরাজজাতি ভাবুকতাময় একেবারেই নয়। ইহারা একটা দূর ভবিষ্যতের স্বপ্নরাজ্যে বাস করে না—অথবা অতীন্দ্রিয় জগতের ধার ধারে না। দুইজন চারি জন লোক হয়ত idealism, transcendentalism, mysticism ইত্যাদির চর্চ্চা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ উচ্চশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজে এরূপ কল্পনা-প্রবণতা ও আদর্শ-প্রিয়তার সম্পূর্ণ অভাব। ইহারা বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত থাকিতে চাহে। হাতের সম্মুখে, চোখের সম্মুখে যে কাজ বা কর্ত্তব্য উপস্থিত তাহাই সমাধা করিবার জন্য উৎসুক। বেশী দূর ভবিষ্যতের লক্ষ্য ইহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে না। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইহারা সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকে। কাজেই কোনরূপ আবেগ, উদ্বেগ, হুজুগ, উন্মাদনা, উত্তেজনা বা অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিলাতী সমাজে বিরল। কার্য্যকরী বুদ্ধিমত্তা ইহাদের জাতীয় গুণ স্বরূপ।

বিলাতেও "জাতিভেদ" যথেষ্ট। টাকা পয়সা হিসাবে এদেশে উচ্চনীচ বিভাগ হইয়া থাকে একথা সকলেই জানে। কিন্তু আমাদের অনেকের বিশ্বাস যে,—"ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে ছোট অবস্থা হইতে বড় অবস্থায় উঠিতে পারে; কাজেই বিলাতী জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা হইতে

স্বতন্ত্র ও উন্নত ধরণের।" কিন্তু বিলাতে আসিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখানকার কুলী মজুর, গাড়োয়ান, দ্বারবান, ঝি চাকর, সৈন্য খালাসী ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষক, কেরাণী, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোকের বিবাহ সম্বন্ধ এবং বৈষয়িক ক্রমোন্নতির উপায় আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? অনুসন্ধানে জানা যায়, যে নিম্ন হইতে উচ্চ স্তরে উঠিবার দৃষ্টান্ত এ-সমাজে অনেক আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মোটের উপর শ্রেণীগুলি নিতান্তই আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। গাড়োয়ানের বংশধরেরা কোন উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করিবার সুযোগ অতি সামান্যই পাইয়া থাকে। ভারতীয় জাতিভেদের নিয়মে উঠানামা যেরূপ সহজ বা যেরূপ কঠিন বিলাতী জাতিবিভাগের ব্যবস্থায়ও প্রায় তদ্রূপ। এ বিষয়টা বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিতে হইলে দুই দেশের প্রত্যেক "জাতির" লোকসংখ্যা গণনা করিয়া তুলনা করা আবশ্যক।

উচ্চ জাতিস্থ লোকেরা ভারতবর্ষে তাহাদের নিম্ন শ্রেণীর নরনারীকে সামাজিক হিসাবে যতটা অবজ্ঞা করিয়া থাকে, ইংরাজেরা তাহাদের ছোট জাতিকে তাহা অপেক্ষা কম অবজ্ঞা করে না। এদেশে অস্পৃশ্যতা বা "ওলচল" ইত্যাদি ধারণা নাই। এজন্য অবজ্ঞা বা ঘৃণার ভাব বুঝিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষে untouchable সমস্যা অর্থাৎ "ছুঁৎ" জ্ঞান না থাকিলে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রতিবাদ লুপ্ত হইয়া যাইবে।

বিলাতী জাতিভেদ না বুঝিতে পারিবার আর একটা কারণ আছে। এদেশে Compulsory Education-প্রথা প্রচলিত। কাজেই ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক বালিকা লেখা পড়া শিখিতে বাধ্য। এই শিক্ষার ফলে আর কিছু লাভ হউক বা না হউক, সংবাদ-পত্র এবং উপন্যাস পাঠ করিবার ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু এই শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক বা আর্থিক উন্নতির সুযোগ বেশী কিছু সৃষ্ট হয় না। গাড়োয়ানের পুত্র প্রায়ই গাড়োয়ান এবং ঝির কন্যা প্রায়ই ঝি থাকিয়া যায়। ফলতঃ বংশগত জাতিভেদ বিলাতে নাই তাহা বলা চলিতে পারে না।

বিলাতে দারিদ্র্য-সমস্যা, শ্রমজীবি-সমস্যা, মহাজন-মজুর-বিরোধ, ধর্ম্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইংরাজ সমাজের দ্বিতীয় সমস্যা সামাজিক ও পারিবারিক। এখানকার স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ, বিবাহসমস্যা, রমণীজাতির অবস্থা, যৌনবিভ্রাট, ইত্যাদি ভারতবাসীর নিকট বড়ই বিচিত্র। এদেশের স্ত্রীস্বাধীনতা ভারতবর্ষে নাই। কিন্তু ভারতীয় রমণীর দুরবস্থা বেশী কি ইংরাজ রমণীর দুরবস্থা বেশী তাহা মীমাংসা করা কঠিন। বিলাতী স্ত্রী-সমাজে দুঃখের সীমা নাই মনে হইয়াছে। দরিদ্র রমণীদিগকে খাটিয়া খাইতে হয়। ইহাদের কর্ম্মস্থানে নানা প্রকার কষ্ট বর্ত্তমান। ইহারা কোন প্রকার শান্তি বা সুখ পায় না। অধিকন্তু রমণীসমাজের জন্য মজুরীর যেরূপ হার নির্দ্ধারিত তাহার দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের অশনবসনের ব্যয় কুলাইতে পারে না। কাজেই অনেক সময়ে অসদুপায়ে অন্নসংস্থানের আবশ্যক হয়।

এদিকে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধনী ইত্যাদি সকল সমাজেই বিবাহিত জীবন বিরল হইতে চলিয়াছে। পারিবারিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রায় লোকই অনিচ্ছুক। আবার বিবাহ হইলেও যাহাতে একাধিক সন্তান না জন্মে

তাহার জন্য স্ত্রী স্বামী উভয়েই নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করে। বলা বাহুল্য এই সকল কারণে দেশের ভিতর দুর্নীতি স্থায়ী ঘর করিয়া বসিতেছে।

সার্ব্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা পাশ্চাত্য জগতে অল্প দিন হইল মাত্র দেখা দিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে Compulsory Education শব্দটা কোন ভাষায়ই সুপ্রচলিত ছিল না। ইহা ঊনবিংশশতাব্দীর শেষার্দ্ধের আবিষ্কার। কাজেই হিন্দু-সমাজের ভিতর এই প্রথার প্রভাব দেখিয়াই হিন্দু জীবনকে ভিরস্কার করা যায় না। যে যুগ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর স্বচেষ্টায় স্বকার্য্য সাধন করিত ততদিন পর্য্যন্ত ইয়োরোপের কুত্রাপি এই সার্ব্বজনীন লোক-শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই।

আজ কাল বিলাতে অবশ্য বাধ্যতা মূলক শিক্ষা-নীতি প্রবর্ত্তিত। তাহার সুফল সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে দেখা দিয়াছে কি না বিচার করিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু আর্থিক হিসাবে এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে এই লোকশিক্ষা প্রণালীর দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্বাধীন চিন্তা, কর্ত্তব্য বোধ, দায়িত্ব জ্ঞান ইত্যাদি ইংরাজ জনসাধারণের ভিতর অত্যধিক নাই। দুইচারি দশজন বড়লোক দেশের শিল্প ও রাষ্ট্রকে যেরূপ চালাইতেছেন দেশ সেইরূপ চলিতেছে।

(২) জাহাজে জীবন

শীতকালে ভারতমহাসাগর যেমন শান্ত আটলান্টিক মহাসাগর তেমনি ভয়ঙ্কর। লিভারপুল হইতে নিউইয়র্ক পৌঁছিতে সাত দিন মাত্র লাগে। এই সাত দিন বিছানায় শুইয়া কাটাইতে হইয়াছে। মাথা তুলিবার শক্তি ছিল না। কামরার ভিতর দুর্গন্ধের জন্য বেশীক্ষণ থাকা অসম্ভব। রাত্রিকালে ৬।৭ ঘণ্টা মাত্র কামরার মধ্যে থাকিতাম। দিবারাত্রের অবশিষ্ট সময় ডেকের উপর চেয়ারে লম্বা হইয়া পড়িতে হইত। ডেকের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে উদ্গার বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু বাতাস এত ঠাণ্ডা ও প্রবল যে ডেকে বসিয়া সময় কাটানও যার পর নাই কষ্টকর। কাজেই আমেরিকা-যাত্রা বহুকাল মনে থাকিবে।

যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে আমেরিকাযাত্রীর সংখ্যা অভাবনীয়রূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। গত তিন মাসের ভিতর যত জাহাজ বিলাত হইতে আমেরিকা রওনা হইয়াছে তাহাতে লোকের ভিড় অত্যধিক ছিল। বহু কষ্টে এত দিনে টিকেট পাওয়া গিয়াছে।

জাহাজখানা আমেরিকান কোম্পানীর—অর্থাৎ উদাসীনরাষ্ট্রীয়। এই জাহাজে আসিবার জন্য সকলেই লালায়িত। কেন না শত্রুপক্ষীয় কোন রণতরী ইহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। ইংরাজকোম্পানীর জাহাজে জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান যাত্রীর চলাফেরা করা অসম্ভব। কিন্তু উদাসীন জাহাজে ইংরাজ ও জার্ম্মাণ এক সঙ্গে বাস করিতে পারে। আমেরিকান কোম্পানী এই উপায়ে ব্যাঘ্রে বৃষভে সমন্বয় ঘটাইয়াছে বলিতে পারি।

একটা Noah's Arkএ রহিয়াছে মনে হইতেছে। এশিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানাজাতীয় লোক সহযাত্রী। এক সঙ্গে নানা ভাষায় কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কোনস্থানে বসিলে বা দাঁড়াইলে একটা ভাষাবিভ্রাট বা Babel of tongues এর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য প্রায় সকলেই কমবেশী ইংরাজীও বলিতে পারে।

সহযাত্রী

এই জাহাজে সস্ত্রীক অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু আছেন। আমেরিকার ৪।৫টা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানসভা ইঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এতদিন ইনি ইয়োরোপের নানা কেন্দ্রে নিজ গবেষণার বিবরণ দিতেছিলেন। প্যারি, ভিয়েনা, অক্সফোর্ড, লণ্ডন, কেম্ব্রিজ ইত্যাদি নগরের বিভিন্ন বিদ্বৎপরিষদে ইঁহার বক্তৃতা হইয়াছে। এই সকল বক্তৃতা যথেষ্ট সমাদৃতও হইয়াছে।

সহযাত্রীদিগের মধ্যে জাপানী, টার্ক, রুশ, হাঙ্গারিয়ান, অষ্ট্রিয়ান, বেলজিয়ান, জার্মাণ, ফরাসী, অষ্ট্রেলিয়ান, ক্যানাডিয়ান, ইয়াঙ্কি ও ইংরাজ ইত্যাদি সকল জাতীয় দু'একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। অষ্ট্রিয়ান, হাঙ্গারিয়ান ও জার্মানদিগের এক্ষণে ইংলণ্ডে বাস করা কঠিন। প্রায় সকলকেই বন্দীভাবে থাকিতে হয়। এইজন্য কেহ কেহ নানা কৌশলে ইংরাজের কৃপাপাত্র হইয়া আমেরিকায় আসিবার অনুমতি-পত্র পাইয়াছে। এইরূপ অনুমতি-প্রাপ্ত পলাতক জার্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান জাহাজে অনেক দেখিলাম।

একজন হাঙ্গারিয়ান যুবক হাঙ্গারী দেশীয় কোন জাহাজ কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিত। যুবক ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে কোম্পানীর কাজ এক প্রকার বন্ধ রহিয়াছে। লণ্ডনে ইহাদের একটি প্রধান কেন্দ্র। যুবক লণ্ডনের আফিসে কর্ম্মচারী ছিল। যুদ্ধের হিড়িকে ইংরাজেরা ইংল্যণ্ড-প্রবাসী প্রত্যেক অষ্ট্রিয়ান, হাঙ্গারিয়ান ও জার্মাণ নরনারীকে গুপ্তচর জ্ঞানে কারারুদ্ধ করিতেছেন। এই উপায়ে প্রায় ১০,০০০ লোক এক্ষণে বন্দী হইয়াছে। হাঙ্গারিয়ান যুবক ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাইয়া সপ্রমাণ করিয়াছে যে, তাহার শরীর অসুস্থ, সুতরাং যুদ্ধকর্ম্মের জন্য অপটু। এইজন্য ইংরাজ সরকার ইহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন। যুবক নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া কোন ব্যাঙ্কে চাকরী খুঁজিবে।

এক ইয়াঙ্কির সঙ্গে আলাপ হইল। ইঁহার লম্বাচৌড়া বোলচাল ও আস্ফালন দেখিয়া হাস্যসংবরণ করা কঠিন। প্রথমেই ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা; তাহার পর ব্যবসায়ের কথা। ইনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আর কি, মহাশয়? দেখিতেছেন কি? যুদ্ধের ফলে জগতে কি হইবে জানেন? দুনিয়ার বাজারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া উঠিবে। ইতিমধ্যেই ইংল্যণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি আমরা কিনিয়া ফেলিয়াছি! ইংরাজের বাণিজ্যও সবই ইয়াঙ্কিদের হস্তগত হইতে চলিল। ইয়োরোপের এই সংগ্রামে আমেরিকাবাসীর ষোলআনা লাভ।" তারপর যুদ্ধসম্বন্ধে কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে কি হইবে?" ইনি বলিলেন, "আমরা কি বেকুব যে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইব? আর যুদ্ধ বাধিলেই বা ভয় কি? আমাদের বিজ্ঞানবীরেরা এরূপ অদ্ভুত বারুদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যে, ২০০ মাইল দূরের জাহাজ পলকের মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অবশ্য আমাদের শত্রুপক্ষীয় কোন লোকই এখনও সেকথা জানে না। যুদ্ধ-বাধিলে মজা দেখাইব।" আমেরিকা অতি-শয়োক্তির দেশ বলিয়া জানিতাম। এই বাকাবীর ইয়াঙ্কিকে দেখিয়া খাঁটি আমেরিকান "Bluff"এর পরিচয় পাইলাম।

ইনি সহযাত্রীদিগকে জাহাজের নানা স্থানে লইয়া গিয়া নানা জিনিষ দেখাইতেছেন, নানা

বক্তৃতা করিতেছেন। সকলকে বুঝান হইতেছে, "এই যে কলটা দেখিতেছেন ইহা আর কোন জাহাজে পাইবেন না—ইহা ইয়াঙ্কিদের খাস। অমুক সুবিধা, অমুক ব্যবস্থা, অমুক নিয়ম ফরাসী, জার্ম্মাণ বা ইংরাজ জাহাজকোম্পানীরা করিতে পারেন না। এই সকল নূতন নূতন যাহাকিছু দেখিতেছেন সবই আমরা আবিষ্কার করিয়াছি।" ইত্যাদি।

জাপানী-পর্য্যটক

তিনজন জাপানী অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হইল। একজন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা এবং তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ইনি ২০ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি বলেন, "বৌদ্ধ প্রভাবে বহু সংস্কৃত শব্দ জাপানীভাষার অন্তর্গত হইয়াছে। প্রাচীন এশিয়ায় জাতিসংমিশ্রণ এবং বর্ণবিনিময় কিরূপে সাধিত হইয়াছিল, ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা করিলে তাহা নূতন উপায়ে স্পষ্ট হইতে পারে। এশিয়ার প্রাচীন ও নবীন ভাষাগুলি সম্বন্ধে এই কারণে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা আরম্ভ করা আবশ্যক।"

অধ্যাপক মহাশয় রুশিয়া হইতে জার্ম্মাণি ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ দেখিয়া ঘরে ফিরিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়া এবং পরে ইংলণ্ডও এই দুই দেশমাত্র ঘুরিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে আমেরিকা দেখিয়া জাপানে যাইবেন।

দ্বিতীয় জাপানী ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার। ইনি ১৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার ইয়োরোপ ঘুরিয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য জগতে কোন্ কোন্ বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য ইনি দ্বিতীয়বার আসিয়াছেন। ইনি বলেন "আমি যখন প্রথম বিলাতে আসি তখন ওদেশে ইলেক্‌ট্রিক্যাল কারখানা অতি সামান্য ধরণের ছিল। এখনও ইংলণ্ড হইতে এবিষয়ে জাপানের কিছু শিখিবার নাই।" ইনি সুইজর্ল্যাণ্ড এবং জার্ম্মাণির প্রশংসা করিলেন।

তিনজন জাপানীই গবর্মেণ্টের খরচে প্রেরিত হইয়াছেন। কোথায় কোন্ জিনিষ নূতন এবং জাপানে প্রবর্ত্তনযোগ্য বিশেষভাবে এই অনুসন্ধানই ইহাঁদের উদ্দেশ্য। কাজেই ইহাঁরা কেহই নিতান্ত বাবালক নহেন। দেশে কাজকর্ম্ম করিয়া যাঁহারা পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারাই বিদেশের তথ্য সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যাপক জাপানের কোন প্রাদেশিক শিক্ষক-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। শিক্ষা-বিজ্ঞান ইহাঁর আলোচ্য বিষয়। ইনি জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবৎসর কাটাইয়া দেশে ফিরিতেছেন। শুনিলাম যুদ্ধ বাধিবার পর জার্ম্মাণি হইতে পলাইবার সময়ে ইহাঁর বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল।

পলাতক কুমারীদ্বয়

আর দুই জন পলাতকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইহাঁরা অল্পবয়স্কা কুমারী। একজন কোন খ্রীষ্টান সেনাধ্যক্ষের কন্যা, অপরটি তুরস্কের প্রজা—ইহুদি কন্যা। সঙ্গে অভিভাবক কেহই নাই এবং নিউইয়র্কে জাহাজ লাগিবার সময়ে যে ১৫০৲ দেখাইতে হইবে তাহাও সঙ্গে নাই। এমন কি জাহাজের টিকেট কিনিবার পর হাতে মাত্র ২।৪৲ টাকা আছে। কিন্তু দুই জনেই নির্ভীক হৃদয়ে সাহসের সহিত চলা ফেরা করিতেছে। কোন রূপ উদ্বেগ বা আশঙ্কা নাই। উভয়েই জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজী ভাল জানে।

শুনিলাম, ইহারা আমেরিকায় পৌঁছিয়া

চাকরী করিবে সেই চাকরীর আশায়ই এতদূর আসিতেছে। ইহুদি-কন্যা শিক্ষয়িত্রী—স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোর কোন বিদ্যালয়ে কর্ম্ম পাইবার আশা করিতেছে। অষ্ট্রীয়ান কন্যা ইতিমধ্যে বিলাতে থাকিতে থাকিতে নিজের অন্নসংস্থান করিয়া দেশে মাতার নিকট অর্থ সাহায্য পাঠাইয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পর লণ্ডনে থাকা কঠিন হয়, অথচ কর্ম্মাভাব এবং অন্নাভাব। কিন্তু দেশ হইতে টাকা আনাইবার পথ বন্ধ। কাজেই আমেরিকাবাসী কোন দূর আত্মীয়ের অর্থ সাহায্যে তাঁহার গৃহে আসিতেছে। এই খানে নাকি কোন চাকরী পাওয়া যাইবে। এই দুই রমণীরই নিজে খাটিয়া অন্নসংস্থান করিবার ইচ্ছা বলবতী। পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে কেহই চাহে না।

জাহাজে সমাজ

জাহাজে সদসৎ নানা প্রকার নরনারীই যাওয়া আসা করে। অভিভাবকবিহীন রমণীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে কোম্পানীর সন্দেহ। বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনে ইয়োরোপ হইতে বেশ্যা আমদানীর বিরুদ্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। এজন্য স্বাধীন রমণীদিগের উপর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কিছু বেশী। জাহাজ লাগিবামাত্র প্রত্যেকের ঠিকানা ভাল করিয়া দেখা হয়। কেহ অসচ্চরিত্রা প্রমাণিত হইলে, তাহাকে বন্দরে নামিতেই দেওয়া হয় না। যদি কেহ বলে "আমার সঙ্গে কোন অভিভাবক নাই বটে কিন্তু আমি আমার আত্মীয়ের গৃহেই যাইতেছি," তাহা হইলে তাহার কথানুসারে কোম্পানীর লোক রেলওয়েষ্টেসন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া টিকেট কিনিয়া দেয় অথবা তাহার আত্মীয়ের নিকট তারে সংবাদ লইয়া কর্ত্তব্য স্থির করে। এবারে দেখিলাম অষ্ট্রীয়ান-কন্যা ও ইহুদি-কন্যাকে কিছুকাল পর্য্যন্ত নজরবন্ধ করিয়া পরে একজন রমণী কর্ম্মচারীর অধীনে রেলে বসাইয়া দেওয়া হইল।

এত কড়া নিয়ম সত্ত্বেও দুর্নীতির অব্যাহত গতি। জাহাজে দুই চরিত্র স্ত্রীপুরুষেরা যথেচ্ছ আচরণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। তাহা ছাড়া ভদ্রঘরের যুবকযুবতীরাও জাহাজে প্রণয়পাশে বদ্ধ হইবার সুযোগ পায়। জাহাজে জীবন যাপন অনেক স্থলে বিবাহ-বন্ধনের উপায় স্বরূপ হইয়া উঠে। শুনিলাম, আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে দুইজনের বিবাহের পাকা কথা হইয়া গেল।

পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহ বড়ই বিরল হইতে চলিয়াছে। বিশেষতঃ পুরুষেরা কোন এক জন রমণীর নিকট চির-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে না। কাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি সম্বন্ধে বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিতেছে। পুরুষের প্রতিজ্ঞা বা ভালবাসার কথা শুনিয়া পাশ্চাত্য রমণীরা আর ভুলে না। অথচ অন্নবস্ত্রের জন্য স্বামী-সংগ্রহও আবশ্যক। কাজেই পাশ্চাত্য জগতের রমণীসমাজ বড়ই দুঃখনৈরাশ্যময় জীবন যাপন করে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যামো বেড়ে যাচ্ছে

আমাদের বাঙ্গালাতে ক্ষয় রোগ যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, সে কথা বোধ হয় কাউকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে হবে না। গবর্ণমেণ্টের স্যানিটারী কমিশনার যে রিপোর্ট দেন, তাতেও দেখা যায় যে, এ রোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯০৮ সালে এক কলিকাতা সহরেই এই ব্যামোতে শত করা ৮ জন মারা পড়েছে—১৯১২ সালে মৃত্যুহার শতকরা ১০ জনে উঠেছে এবং উহা ক্রমাগতই বাড়্‌তিমুখে যাচ্ছে।

মৃত্যু তালিকা যে ভাবে নেওয়া হয় তাহা যথার্থ নহে

আমাদের দেশে কার কিসে মৃত্যু হলো সে খবর ঠিক নেওয়া হয় না। পাড়াগাঁয়ে ত চৌকীদারেরাই এই সব খবর নিয়ে থাকে। তাদের দিয়ে এই সব গুরুতর কাজ কতটা ভালরূপ চল্‌তে পারে তা সকলেই বুঝতে পারেন। সহরতলীতেও অনেক সময়ই মৃত্যুর কারণ যে যা বলে, তাই লিখে নেওয়া হয়। আমার মনে হয়, যাঁদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান আছে ও ব্যামো যাঁরা চিন্‌তে পারেন, এরূপ শিক্ষিত লোক যদি এই কাজের ভার নেন তবে অনেকটা সুফল ফল্‌তে পারে। সহরতলী ও মহকুমাগুলিতে এঁদের এই কাজে লাগিয়ে দিয়ে পরীক্ষা স্বরূপ দেখা যেতে পারে।

যথার্থ ভাবে নেওয়ার উপায়

প্রত্যেক মহকুমায় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এক একজন করে স্যানিটারী ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হ'বার কথা শুন্‌ছি, তাঁদের উপর এ ভার দিলে বেশ চল্‌তে পারে। তবে এক একটা মহকুমা আয়তনে বড় যেমন তেমন নয়, একজন দিয়ে সব কাজ কুলিয়ে উঠা বড় শক্ত। তা কি করা যায়—ঐ একজনই যে নেই। কথায় বলে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'। তা ঐ একজন দিয়েই বর্ত্তমানে আমাদের কাজ চালিয়ে নিতে হবে। প্রত্যেক মহকুমার অন্তর্গত গ্রামগুলি যদি ভাগ করে নেওয়া যায় এবং পর্য্যায়ক্রমে ঐগুলি ঘুরে দেখা যায়, তা হলে অনেকটা কাজ এগুতে পারে। অধীনস্থ লোকদের বলে দিতে হবে, যাতে তারা ঠিক খবর সংগ্রহ করে। যখন ইনস্পেক্টার সাহেব 'টুরে' যাবেন, তখন নোটবুক দেখে খোঁজ করলেই সন্দেহের কারণ দূর হবে। প্রত্যেক গ্রামে ত আর রোজই ১০।২০ জন ক'রে মরে না—আর খবরটা ৫।১০ দিন পরে পেলেও যখন 'বাসী' হয়ে যাবার ভয় নাই, তখন একটু মনোযোগ কর্‌লে যে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যাবে তাতে কোনই সন্দেহ নাই।

যারা ব্যামোতে ভুগ্‌ছে, তাদের সংস্পর্শে আমাদের নিত্যই আস্‌তে হচ্ছে,—আমরা জান্‌তে পারছি, ক্ষয় রোগ কেমন দ্রুত বেড়ে উঠ্‌ছে।

সরকারী রিপোর্টে যে মৃত্যুসংখ্যা দেখা যায় তা থেকে উহা ঢের বেশী বলে আমার মনে হয়। কারণ আমাদের প্রায় এমন দিন যায়ই না, যেদিন অন্ততঃ ২।১টী ক্ষয়ের রোগী না দেখি।

সতর্কতার প্রয়োজন

ক্ষয় বহুরূপী। একরূপে না হয় অন্যরূপে উহাকে নিয়তই দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ শত্রু যদি আমাদের এতই পিছু নিয়ে থাকে তাহলে কি আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত নয়? ইহা যাতে একেবারে নির্ম্মূল হয়, তার জন্যে কি আমাদের সকলে মিলে একান্ত চেষ্টা করা উচিত নয়?

চেষ্টা করলে ইহা দূর করা যেতে পারে

ক্ষয় এমন একটা রোগ নয়, যার আমরা কিছুই কর্‌তে পারি না। আমরা একটু সচেষ্ট হলেই একে দূর কর্‌তে পারি। কতক কতক দেশে ইহা চেষ্টার দ্বারা তাড়িত হয়েছে। ইংরেজদের মুলুকে এ রোগে মৃত্যু-সংখ্যা পূর্ব্বের চেয়ে ঢের কমে গিয়েছে। জার্ম্মাণি (?), ফরাসী প্রভৃতি উন্নত ও সুসভ্য দেশেও এতে এখন খুব কম লোক মারা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্যই ঐ সব দেশের মৃত্যুসংখ্যা কমেছে। প্রজাদের স্বাস্থ্য যাতে সর্ব্বদা ভাল থাকে, তথাকার গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রয়েছে। ক্ষয় যাতে না বাড়্‌তে পারে, তার জন্য তারা কত উপায়ই না উদ্ভাবন কর্‌ছে—আপদ্‌টা যাতে একেবারে দূর হয়ে যায়, তার জন্য সকলে মিলে কি চেষ্টাই না কর্‌ছে এবং সকলের এই সমবেত চেষ্টায় ব্যাধি খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে।

এতৎসম্বন্ধে লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দেশের সাধারণ লোক কোন নূতন কথা সহজে বিশ্বাস কর্‌তে রাজি হয় না, পুরাণো সংস্কারও কেউ হঠাৎ দূর কর্‌তে পারে না। একটা বিষয় উপকারী কি অপকারী তা তলিয়ে না দেখে হঠাৎ বিশ্বাস করার দিন চলে গেছে। সুতরাং লোকের বিশ্বাস পেতে হ'লে বিষয়টার উপকার সম্বন্ধে তাদের বেশ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। যদি তারা সুফল দেখ্‌তে পায়, তখন আপনা থেকে এসেই দলে মিশ্‌বে। যে সব উপায়ে অন্যান্য দেশে ক্ষয় কমে গেছে, সেগুলি যদি সকলকে সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তবে অনেকটা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক

আশা করি, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনো-যোগ আকর্ষিত হবে এবং যাতে সাধারণে এ বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতে পারে, তার একটা উপায় হবে। গবর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণ উভয়ে একযোগে চেষ্টা কর্‌লে আমা দের দেশ হতে এ ব্যামো সম্পূর্ণ দূর না হউক—অনেকটা যে কমে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

ক্ষয় কোথায় কোথায় হয়

(১) ক্ষয় শরীরের সব জায়গায়ই হ'তে পারে, তবে প্রধানতঃ ফুস্‌ফুস্‌কেই আক্রমণ করে, যাকে আমরা যক্ষ্মা কাশ হয়েছে বলে থাকি। জ্বর, কাসী, গলা দিয়ে রক্ত উঠা প্রভৃতি উহার লক্ষণ।

(২) গলায়, ঘাড়ে, বগলে, পেটে, কুঁচ্‌কীতে ও অন্যান্য স্থানের বীচিগুলি (glands) ক্ষয় দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। অনেক ছেলে মেয়ের গলায় চারি পাশে গুপারী মত বীচি ফুলা দেখতে পাওয়া

যায়, ওগুলি প্রায়ই এই জাতীয়। উহা সময় সময় আপনা থেকেই পেকে ফেটে যায় ও পূঁজ রক্ত বের হয়; কিন্তু সারবার বেলায় সহজে সারে না—অনেক দিন ভুগ্‌তে হয়।

(৩) হাড়ে বা গাঁটেও এই ব্যামো দেখা যায়। সাধারণতঃ পিঠের শিরদাঁড়ার হাড়ে, কোমর ও উরুদেশের সন্ধিস্থলে ও হাঁটুতে ইহা দেখা যায়, যে কোন স্থানের হাড়ে বা গাঁটেই উহা হতে পারে।

(৪) মস্তিষ্ক ও অন্যান্য স্নায়ুকেও আক্রমণ করে। শিশুদের মেনেঞ্জাইটিস্ (menengitis) নামে যে ব্যামো হয়—যাতে তারা তাদের মাথা ক্রমাগতই এ পাশ ও পাশ কর্‌তে থাকে, স্থূল বমি ও জ্বর হয়, তা প্রায়ই এই ক্ষয়জনিত।

(৫) ফুস্‌ফুসের উপরের পর্দ্দাটার প্রদাহ হয়ে প্লুরিসি (Plurisy) হয়। উহা প্রায়ই ক্ষয় হতে হয়, সময় সময় যে ক্ষয় ভিন্নও উহা না হয়, তা নয়। তবে আজকাল প্লুরিসি হ'লেই উহা ক্ষয়জনিত বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সেই জন্য প্লুরিসি হ'লেই ডাক্তারেরা বিশেষ সাবধান হতে বলেন। হয়ত বুকে দু'দিন একটু বেদনা হয়ে জ্বর হলো, বেদনা হয়ত তত বেশীও হল না, জ্বরেই সব সেরে গেল, কিন্তু ডাক্তারেরা বলে বস্‌লেন, একটু প্লুরিসি যখন হয়েছিল তখন দিন কয়েক হাওয়া বদ্‌লালে মন্দ হয় না, কিছুদিন বলকারক ঔষধ খাও, গায়ে পাৎলা ফ্লানেলের জামা রেখো, ঠাণ্ডা যেন না লাগে। অনেক রোগী হেসে উড়িয়ে দেয়—ভাবে ডাক্তার খামোখা একটা হাঙ্গামা বাধাচ্ছে, মশা মার্‌তে কামান দাগার বন্দোবস্ত কর্‌ছে। বাস্তবিক তা নয়; যেমন জাহাজের পাকা কাপ্তেন আকাশে সামান্য এক টুকরা মেঘ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারে, কোন্ মেঘে ঝড় হবার ভয় এবং বহুপূর্ব্ব হতেই জাহাজকে ঝড়থেকে বাঁচাবার জন্য সাবধানতা নেয়; বিজ্ঞ চিকিৎসকও তাই ক'রে থাকেন মাত্র। তাঁরা দেখে দেখে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন যে। যাঁরা এ সময়ে সাবধানতা নেন না, ভবিষ্যতে তাঁদের প্রায় সকলেরই যক্ষ্মা হতে দেখা যায়, কাজেই তাঁরা অত করে সাবধান করেন। বাস্তবিক বিষয়টি উপেক্ষার নহে।

এইরূপ অনেক সময় নিউমোনিয়া ও (Pneumonia) ব্রঙ্কাইটিসও (Bronchitis) ক্ষয় বীজ হতে হয় এবং অবশেষে পাকা যক্ষ্মায় পরিণত হয়।

পেটের ভিতরে ও পেটের চারিদিক ঘিরে একটা পরদা (Peritoneum) আছে উহারও ক্ষয়জনিত প্রদাহ হয়ে পেরিটোনাইটিস (Perietonitis) হয়।

(৬) পেটের ভিতরস্থিত আঁতে (Intestine) অনেক সময় ক্ষয়জনিত ঘা হয়, ঐ সব স্থানের বীচিগুলিও সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বড় হয়।

(৭) উহা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় (uterus) ও তৎসম্পর্কীয় ডিম্বকোষ (ovary) ও ডিম্বনালীকে (tubes) আক্রমণ করে।

(৮) এ ছাড়া অন্যান্য স্থানেও ক্ষয় হতে পারে। যথা প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয়, অণ্ডকোষ ইত্যাদি। উহা একই সময়ে একাধিক স্থানও আক্রমণ কর্‌তে পারে।

(৯) সময় সময় উহা শরীরের সকল স্থানেই এককালীন আক্রমণ করে, তখন উহাকে জেনারেল মিলিয়ারী টিউবার্কিউলোসিস্ (general miliary tuberculosis) বলে। একটা আবদ্ধ স্থান হতেও ক্ষয় এইরূপে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌তে পারে।

ক্ষয়রোগে আক্রমণ করিলে, আক্রান্ত

স্থান সমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু গোটা হয় এবং এই গোটাগুলিকে টিউবার্কল (Tubercle) বলা হয়। এইজন্য এই ব্যাধিকে টিউবার্কিউলোসিস্ বা ক্ষয় বলা হয়।

ব্যামো দেখা দিবার সময়কার লক্ষণ

ক্ষয় হইলেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটি এসে দেখা দেয়। অন্যান্য লক্ষণ যখন থাকে, তখন ইহা ধরা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু অন্য কোন লক্ষণ না থাকলেও প্রায়শই শুধু জ্বরের প্রকৃতি দেখে একে ধরা যেতে পারে। প্রায়ই ঘুস্ ঘুসে জ্বর হয়। হয়ত সন্ধ্যার সময় একটু ৯৯ ; ৯৯.৬ হলো, কি বড় জোর ১০০° অবধি গেল। ভোরে ৯৮° ; ৯৭.৬, ৯৭ হল; এইরূপ। হয়ত থার্মোমিটারে (Thermometer) জ্বর উঠলই না, কিন্তু বিকেলের দিকে একটু চোখ জ্বালা, একটু হাত পা জ্বালা হ'ল, শরীরটায় সোয়াস্তী বোধ হল না। কোন কোন সময় জ্বর ১০২°।১০৩° ও হয়ে থাকে, কচিৎ আরও বেশী হয় তবে ঘুসঘুসে জ্বরই বেশী। জ্বর না হয়েও যে ক্ষয় না হয় তা নয়, তবে উহা নগণ্যের মধ্যে, জ্বরের জোর যত অধিক ব্যামোও তত বেশী খারাপ। এ ছাড়া অনেক সময়ই ঘুসঘুসে কাশী থাকে; ঠাণ্ডা লাগতে না লাগতেই সর্দ্দি হয় ও প্রায় শতকরা ৭০ জনেরই গলা দিয়ে রক্ত পড়ে। এ সময়ই অবশ্য ফুসফুসের আক্রমণ কালে ঘটে।

মানুষ ছাড়া আর কোন্ কোন্ জন্তুর ক্ষয়রোগ হয়

ক্ষয় যে কেবল মানুষেরই হয়, এমন নয়। শূকর, গরু, ঘোড়া, মোরগ, খরগোস, গিনীপিগ (Guinea-Pig) বানর ও পাখীপাখী প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুদেরও হয়ে থাকে। বনে, জঙ্গলে, খোলা জায়গায় যাদের থাকা স্বভাব তাদের যদি বাটীর ভিতর এনে পোষা যায়, তবে তাদের প্রায়ই ক্ষয় হয়। তবে কতকগুলি জন্তুর সহজে হয় না। ভ্যাড়া ও পাঠার খুব কম হয়, আবার গরু, শূকর, মুরগী ও বানরের খুব বেশী হয়। ইংলণ্ডে ত প্রায় শতকরা ৭০টা গরুরই ক্ষয়রোগ দেখা যায়। ভারতবর্ষের গরুর বড় একটা এ ব্যামো হয় না। মাছেরও যে এ ব্যামো একেবারে না হয়, তা নয়, তবে খুব কম।

ব্যামোর মুখ্য কারণ ক্ষয়-জীবাণু

ক্ষয় জীবাণু হতে ক্ষয় ব্যামো হয়ে থাকে। ক্ষয় জীবাণু শরীরে প্রবেশ কর্‌লেই যে ক্ষয় হবে তা একেবারেই নয়। শরীরেরও আবার এমন একটা অবস্থা হওয়া চাই, যাতে ক্ষয় জীবাণু সেখানে যেয়ে তার হুকুমজারী কর্‌তে পারে। সবল সুস্থ শরীরে ক্ষয় জীবাণু ঢুকে বড় একটা এঁটে উঠ্‌তে পারে না। কিন্তু শরীর ত আর লোহার নয়, দেহ থাক্‌লেই তার ভাল মন্দ আছে। শরীর কোন কারণে দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌লে, তবেই ক্ষয় জীবাণু উহাকে আক্রমণ কর্‌তে পারে।

সব প্রাণীরই আত্মরক্ষার একটা স্বভাবদত্ত ক্ষমতা আছে। একটা বিড়াল বা কুকুরকেও মার্‌তে গেলে, তারা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয় ও উল্টে আমাদিগকে আক্রমণ করে। যদি আমরা তাদের সঙ্গে পেরে না উঠি, তবে তারা বেঁচে গেল ; আর যদি আমরা বলবান হই, তারা মারা পড়্‌ল। বাঁচুক আর মরুকই সকলেই প্রাণপণে যোঝে।

এই লড়াই কর্‌বার শক্তি যে কেবল এদেরই আছে তা নয়, আমাদেরও যথেষ্ট আছে ; কুকুরে কামড়াতে এলে আমরাও প্রাণরক্ষার্থে

রীতিমত লড়াই করি। যেমন এই সব চাক্ষুষ শত্রুর হাত হতে বাঁচ্‌বার চেষ্টা করি, সেইরূপ অতীন্দ্রিয় শত্রুর আক্রমণেও করি। ক্ষয় রোগের মতন অনেক ব্যাধিই সাধারণ দৃষ্টির অগোচর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু (microbe) দ্বারা উৎপাদিত হয়। আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (microscope) সাহায্যে এই সকল দেখ্‌তে পাই।

আক্রমণের প্রণালী

ইহারা যখন আমাদিগকে আক্রমণ করে তখন আমরা নিশ্চিন্ত থাকি না। আমাদের দেহেরও স্বভাবদত্ত রক্ষণ ক্ষমতা আছে। গোরা সৈন্যেরা (শ্বেতরক্তকণিকা Leucocytes) সর্ব্বদাই পাহারা দিচ্ছে কোন শত্রু শরীরে ঢুক্‌লেই তারা অমনি আক্রমণ করে। দেহের সুস্থ অবস্থায় উহারা সবল ও সচল থাকে—এ সময়ে শত্রুর আক্রমণ হলে উহারা প্রায়ই তাহাদিগকে পরাস্ত করে। কিন্তু যদি শরীর কোন কারণে অসুস্থ থাকে, তবে উহারা হীনবল ও কতকটা অচল হয়—তখন প্রায়ই বাহিরের শত্রুর সহিত তাহারা পেরে উঠে না এবং সহজেই তাহাদের নিকট পরাস্ত হয়।

বাহিরের শত্রুর সংখ্যা ও বলের উপরেও এবিষয়ে অনেকটা নির্ভর করে। দু'দশটায় আক্রমণ কর্‌লেই যে আমাদের কিছু করতে পারে তা নয়, অনেক শত্রু পিছু লাগ্‌লে তবে যদি কিছু করতে পারে। আর সব শত্রুই সমান বলশালী নয়, কতক বা নির্জ্জীব কতক বা দুর্দ্দান্ত। সুতরাং শত্রুর সংখ্যা ও বল উভয় অনুসারেই আক্রমণের তারতম্য ঘটে। কাজেই ক্ষয় জীবাণু দেহে প্রবেশ কর্‌লেই আমাদের ক্ষয় হয় না। কত ক্ষয় জীবাণুই ত আমাদের শরীরের ভিতর আছে; কিন্তু আমাদের দেহের পাহারাওয়ালারাও সতর্ক—শত্রু ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই তাদের তাড়া কর্‌ছে এবং ধ্বংস কর্‌ছে। তবে শরীর যদি কোনক্রমে ভেঙ্গে যায়, শরীরের স্বাভাবিক বল যদি ক্ষয় হয় তবে পাহারাওয়ালারাও নির্জ্জীব হয়ে পড়ে ও তাহাদের শত্রুদমনে তত শক্তি থাকে না; তাই শত্রু দেহে প্রবেশ কর্‌বার সুযোগ পায়। তখনও অল্পসংখ্যায় এসে কিছু কর্‌তে পারে না, অনেকগুলি এলে তবেই সুবিধা কর্‌তে পারে; আর ইহারা যদি দুর্দ্দান্তজাতীয় (Virulent) হয়, তবে অল্পসংখ্যাতেও সময় সময় কাজ ফতে কর্‌তে পারে।

জীবাণুর আবিষ্কার

জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ কীটতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রবার্ট কক (Robert Koch) সাহেব ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্ষয়জীবাণু আবিষ্কার করেন এবং তিনিই প্রথম দেখান যে, ক্ষয়জীবাণু হতেই ক্ষয়ের উৎপত্তি হয়। ক্ষয়জীবাণু উদ্ভিদজাতীয়ের অন্তর্গত ও অতি ক্ষুদ্রাকৃতি। অণুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন ইহা শুধু চোখে দেখা যায় না।

জীবাণুর স্বরূপ

ইহা সরু কাঠীর আকার (rod-shaped) সচরাচর সোজাভাবে থাকে; সময় সময় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিরূপেও (curved) দেখা যায়। কতকগুলির গায় গোটা গোটা দেখা যায় (beaded appearance) কখনও বা অনেকগুলি জীবাণু একত্রে পুঞ্জীভূত হইয়াও থাকে। ইহা অন্যান্য কতকগুলি জীবাণুর মত নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় না, স্থিরভাবে থাকে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ফরাসী সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী

(১৩২২, আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।)

মণ্টেস্‌কিউ ও ভল্‌টেয়ার যে অভিনব মতবাদের প্রচারকল্পে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন, একদিন বা এক বৎসরেই তাহা সমগ্র ফরাসী জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। বস্তুতঃ, এতদ্দ্বারা কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নাই, অষ্টাদশশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগের ফরাসী-সাহিত্যে এরূপ অনেক গ্রন্থকার দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এস্থলে মাত্র দুই জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

১। ম্যারি-ভোঁ—(১৬৮৮-১৭৬৩ খৃঃ অঃ)। ইনি একজন প্রসিদ্ধ নাটক-কার। সমসাময়িক ফরাসী জনসাধারণ ভল্‌টেয়ারকেই শ্রেষ্ঠ নাটক-কারের আসন প্রদান করিয়াছিল,—এমন কি, অনেকেই তাঁহাকে "র‍্যাসিনের" ও গৌরব-স্পর্দ্ধী বিবেচনা করিত। কিন্তু ভল্‌টেয়ার-রচিত নাটকাবলী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রম-সঙ্কুল ও নিতান্ত একদেশদর্শী। বস্তুতঃ, ফরাসী নাট্য-সাহিত্যে যদি কেহ প্রকৃতই র‍্যাসিনের উত্তরাধিকারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি এই ম্যারিভোঁ। অবশ্য, র‍্যাসিনে, সেক্‌পীর প্রভৃতির মত প্রথম শ্রেণীর নাটক-কার না হইলেও, উৎকৃষ্ট নাটক লিখিতে যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন, ম্যারি-ভোঁর অন্ন-বিস্তর তাহা সমস্তই ছিল। কল্পনা ও বাস্তবের অপরূপ সম্মিলনে তদঙ্কিত নাটকীয় চরিত্রগুলি প্রকৃতই অত্যন্ত উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ম্যারিভোঁর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল, এবং প্রধানতঃ, এই দুই কারণেই তদীয় গ্রন্থাবলী আজিও ফরাসী-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারিতেছে।

২। ডাক্ ভি সেণ্ট সাইমন্—(Duc de Saint-Simon, ১৬৭৫-১৭৫৫ খৃঃ অঃ)। সমগ্র ফরাসী-সাহিত্যে সাইমনের একটী অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বা বিশেষত্ব আছে। সাইমন্ বড় লোকের—জমীদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতমাংশ রাজদরবারে অতিবাহিত হইয়াছিল; অবশেষে জীবন-সায়াহ্নে বাক্‌দেবীর অর্চ্চনাতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সমগ্র ফরাসীসাহিত্যে এমন মনীষামণ্ডিত "সখের" সাহিত্যিক আর দ্বিতীয় নাই—ফরাসী "একাডেমী" কখনও এরূপ "বাবু" লেখককে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না। কিন্তু সাইমনের প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভা ছিল, এবং প্রতিভা কখনও অপরের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে স্বীয় অভিব্যক্তির পথ নির্দ্দেশ বা পরিবর্ত্তন করে না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সাইমন্ বড় লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা নৃপতিশ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ লুই ও তৎপরবর্ত্তী অপ্রাপ্ত-বয়স্ক রাজার দরবারে অতিবাহিত হইয়াছিল।

এরূপ অবস্থাপন্ন লোকের নিকট উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টির আশা অনেক সময়েই বৃথা হয়। কিন্তু সাইমনের কয়েকটী অনন্যসাধারণ গুণ ছিল। তাঁহার বালকোচিত সরল হৃদয় সর্ব্বদাই উদ্দাম ভাবতন্ময়তার লীলা-নিকেতন ছিল ;—তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তিও অসাধারণ ছিল,—একটিবার মাত্র যাহা দর্শন করিতেন, তাহার অবিকল বর্ণনা করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এবং এই দুইটী নৈসর্গিক শক্তির অপরূপ সমবায় ও সংমিশ্রণেই তদীয় গ্রন্থ (Memoirs) আজিও সুধী-সমাজে সাদরে পঠিত হইতেছে।

লক্ষ্মীর বর-পুত্র, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত, নৃপতিশ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ লুইর রাজ-দরবারের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন, সাইমনের, সমসাময়িক ফরাসী জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সুখ ও দুঃখের সহিত কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না, বরং তদীয় গ্রন্থের অনেক স্থলেই অভিজাত-সম্প্রদায়-সুলভ হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও ভাবের কূপ-মণ্ডূকতাই পরিলক্ষিত হয় ; কিন্তু তথাপি তিনি ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর দরবারের যে একটী জীবন্ত ছবি, রাখিয়া গিয়াছেন, সমগ্র ফরাসী-সাহিত্যে তাহা বাস্তবিকই সম্পূর্ণ তুলনা রহিত। তাঁহার রচনায় ভাবের গভীরতা বা বুদ্ধি-শক্তির প্রাখর্য্য দৃষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু অঙ্কিত চিত্রের সজীবতাতে তিনি অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী। ফরাসী "একাডেমী"র বাঁধাবাঁধি আদব কায়দা ও নিয়ম কানুন সাইমনের কল্পনা-সুন্দরীকে কিছুমাত্র শৃঙ্খলিত করিতে পারে নাই ; পরন্তু, যেখানে যেরূপ সুবিধা মনে করিয়াছেন, সেখানে সেইরূপ ভাব ও ভাষার সাহায্যে স্বীয় বক্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন। ইহার ফলে, তদীয় Memoirs গ্রন্থ চতুর্দ্দশলুইর রাজ-দরবারের নিখুঁত চিত্র হইয়াছে।

অষ্টাদশশতাব্দীর প্রারম্ভে মণ্টেস্কিউ ও ভল্‌টেয়ারের রচনা বলিতে আমরা যে অভিনব ভাবপ্রবাহের লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা সাইমন্ প্রভৃতিকে স্পর্শ না করিলেও একেবারে নিষ্ফল হইয়া বসিয়া থাকে নাই। উহা লোকমনের অন্তরালে, অনুকূল আবহাওয়ার সাহায্যে, ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, এবং পরিশেষে ১৭৪০ হইতে ১৭৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে স্বকীয় বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত হইল। ইহার পূর্ব্বেই ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অলোক সাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তদীয় রাজত্বকালে, সম্পূর্ণ একতন্ত্র ও অনিয়ন্ত্রিত শাসন প্রথার অবশ্যম্ভাবী কুফল-সমূহ আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিলেও পরবর্ত্তী নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নৃপতির আমলে তৎসমুদয় স্বীয় বিভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ, করভারনিপীড়িত, অত্যাচারপ্রপীড়িত ফরাসী জনসাধারণের হৃদয়ে যুগপৎ আশঙ্কা ও বৈরাগ্যের উদ্রেক করিয়া দিল ; যাহা অসামান্য মনীষাসম্পন্ন চতুর্দ্দশ লুইর ক্ষমতা ও গৌরবেরই দ্যোতনা করিত, পঞ্চদশ লুইর হস্তে তাহা নিরীহ প্রকৃতি-পুঞ্জের অহিতসাধনেই নিয়োজিত হইল। সুতরাং মণ্টেস্কিউ ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি নব্যতন্ত্রের উপাসকগণ এযাবৎকাল যে সাধনার বীজ নীরবে বপন করিয়া আসিতেছিলেন, মুখমুষ্টি, অন্তঃসারশূন্য, কেবলমাত্র বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয়, সর্ব্বপ্রকার রাজোচিত গুণহীন, অকর্ম্মণ্য নৃপতির আমলে তাহার অঙ্কুরোদ্গমের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইল।

এই সময়ে ফরাসী-সাহিত্য-গগনে এমন এক শ্রেণীর প্রভাবশালী লেখকের উদয় হইল, যাঁহারা যুগযুগান্তের পুঞ্জীকৃত সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক অন্ধমত ও কুসংস্কার সমূহের এককালীন উচ্ছেদ-সাধনে আপনাদের সমগ্র বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্য প্রয়োগে কৃত-সংকল্প হইলেন। চতুর্দ্দশ লুইর আমলে রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতা সহিষ্ণুতার উচ্চতম সীমারেখায় উপস্থিত হইলেও তাঁহার অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রভাবে কেহই এতাবৎকাল তদ্বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু পঞ্চদশলুই সর্ব্বাংশেই চতুর্দ্দশলুইর বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন। সুতরাং দীর্ঘ-কাল যাবৎ অত্যাচারিত ও করভার প্রপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জ যে আপনাদের জন্মগত অধিকার লাভের জন্য তদীয় দুর্ব্বলতা ও অকর্ম্মণ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। মণ্টেস্কিউ ও ভল্‌টেয়ারের শিষ্য প্রশিষ্যের সংখ্যা উত্তরোত্তর দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; সমগ্র ফরাসী দেশের বুকের উপর দিয়া সংস্কারের একটা প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ১৭৬০ হইতে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ফরাসী সাহিত্যের "সংস্কার-যুগ।" তৎপরে "কর্ম্ম-যুগের" প্রারম্ভ। ফরাসী জনসাধারণের হৃদয়ে যাহাতে সর্ব্ববিধ সংস্কারের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা-বহ্নির প্রজ্বলন হয়, তজ্জন্য "সংস্কার-যুগের" নবীন ফরাসী সাহিত্যিকগণ ক্রমশঃ বর্দ্ধমান এক বিরাট আন্দোলন-প্রবাহের সৃষ্টি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নবমন্ত্রের উপাসক এই লেখক-সম্প্রদায় ফরাসী-সাহিত্যে সাধারণতঃ "দার্শনিক" বা Philosophist আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যুক্তি ও বিশ্ব-মানবতা (Reason and Humanity) এই দুই মহামন্ত্রে এই দার্শনিক-সম্প্রদায় সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইউরোপে "নবজীবনের" প্রথমোন্মেষ যে অন্তর্নিহিত মহাশক্তির অনুপ্রেরণায় মহামতি কলম্বাস অকুতোভয়ে মহাসমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন, কোপার্ণিকাস কর্ত্তৃক পৃথিবীর গতিশক্তির আবিষ্কার যাহার বহিঃপ্রকাশের আংশিক প্রচেষ্টা মাত্র, যাহার বলে বলী হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ লুথার প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে উইটেন্‌বার্গের গির্জ্জা মন্দিরের দ্বারদেশে স্বীয় "প্রতিবাদ পত্র" সংযোজিত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, অষ্টাদশশতাব্দীর উদীয়মান ফরাসী "দার্শনিক" সম্প্রদায়ও ঠিক সেই মহা প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও সেই সঞ্জীবনী উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির চিরপুঞ্জীকৃত কলঙ্ককালিমার অপনোদন-পূর্ব্বক ভূতলে নন্দন-শোভার বিস্তার সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। জ্ঞান, যুক্তি ও সত্যের বিমল কিরণ-সম্পাত দ্বারা যুগযুগান্তসঞ্চিত অজ্ঞানতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, কুসংস্কার ও সর্ব্ববিধ উপধর্ম্মের সম্পূর্ণ দূরীকরণ ও কেন্দ্রীকৃত সমাজ-শক্তির যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা বিশ্বমানবের চির কল্যাণ সাধন—ইহাই ইঁহাদের জীবনের একমাত্র মহাব্রত ছিল। এই সময়ে ফরাসী দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এক দিকে যেমন অবনতির নিম্নতম সোপানে পতিত হইয়াছিল, পক্ষান্তরে, নব-বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষেও সেইরূপ অনুকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাঁহারা শাসন কর্ত্তার সম্মানজনক ও লোভনীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রতিকার্য্যেই তাঁহাদের অবিমিশ্র অকর্ম্মণ্যতা, স্বার্থপরতা

ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইত; রাজার সংগ্রহব্যবস্থা যৎপরোনাস্তি একদেশদর্শী ও অত্যাচার দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; শাসন ও বিচার বিভাগে অসভ্যোচিত বর্ব্বরতারই একাধিপত্য ছিল; অনুরূপ দায়িত্বজ্ঞান-বর্জ্জিত অধিকার ভোগে অভিজাত সম্প্রদায় নিতান্ত উন্মার্গগামী হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং ধর্ম্ম-বিদ্বেষ সর্ব্বপ্রকার সহিষ্ণুতার সীমা-মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল। নিরীহ প্রকৃতিপুঞ্জ নিতান্ত অসহনীয় করভারে প্রপীড়িত ও অভিজাতকুলের অন্যায় অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছিল। কোনও নূতন ভাবের উন্মেষ ও বিকাশসাধনের পক্ষে এই অবস্থা যে সর্ব্বতোভাবে অনুকূল, পৃথিবীর ইতিহাস একবাক্যে তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। অমঙ্গলের মধ্যেই মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে, ইহা কবি-কল্পনা নহে। দার্শনিক সম্প্রদায় এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া অভীষ্টসাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

ইঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজা বা মন্ত্রীবিশেষের নির্ব্বুদ্ধিতা বা দুর্ব্বুদ্ধিতাই জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ নহে। পরন্তু, যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত শাসনবিষয়ক কুসংস্কার ও সংকীর্ণতাই দুঃখ দুর্দ্দশার মূল কারণ। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে শাসন-যন্ত্রের সংস্কার অপেক্ষা মূল শাসন-নীতির পরিবর্ত্তনই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। টার্গট, কর্সো প্রভৃতি ২।১ জন ভিন্নমতের পোষণ করিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি সামান্য ছিল। অধিকাংশ "দার্শনিক"ই পলিটিক্সের কাছ দিয়াও যাইতেন না—দেশের তদানীন্তন অবস্থাতে ইহা সম্ভবপরও ছিল না। ইহাতে একদিকে ফরাসী দেশের পক্ষে যেমন কুফল উৎপন্ন হইয়াছিল, পক্ষান্তরে সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে ইহা অমৃতবৎ উপকার প্রদান করিয়াছিল। ইংলণ্ডের শাসন-সংস্কারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের উক্তির সারবত্তা প্রমাণিত হইবে।

আবহমানকাল হইতেই ইংলণ্ডের শাসন প্রথার ক্রম পরিবর্ত্তন বা ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া আসিয়াছে,—ইংলণ্ড প্রথম চার্লসের ছিন্নমুণ্ডের উপরেই স্বীয় নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু সমগ্র দেশের পক্ষে উহা ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় দুর্ব্বিষহ হলাহল প্রসব করে নাই। কারণ কি? সর্ব্ববিধ শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা হেতু শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে যাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাঁহারাই আবার ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্র-নৈতিক সংস্কারের পাণ্ডা ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা অতীতের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখিয়াই, বস্তুতঃ, অতীতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই, ভবিষ্যতের প্রাসাদ উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী দার্শনিকগণের অদৃষ্টে এরূপ কোনও সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই!—দেশের শাসন কার্য্যের সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব ছিল না; পরন্তু, শাসন-কর্ত্তৃগণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্দেহ ও অবজ্ঞার চক্ষেই অবলোকন করিতেন। পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও, প্রকৃত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ইঁহাদের আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। এবং কথা ও কাজের এই পার্থক্যের ফল—ফরাসী বিপ্লবের তাণ্ডব নৃত্য।

কিন্তু নিবিড় কৃষ্ণ মেঘের কোলেও সৌদামিনীর শুভ্র হাসি পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বার্থান্বেষী, ক্ষুদ্রদৃষ্টি, তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ ফরাসীবিপ্লবকে মসীবর্ণে রঞ্জিত করুন না কেন, উহারও

একটা উজ্জ্বল দিক আছে এবং সেইদিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ হইলে মানব-হৃদয় স্বতঃই ভক্তি-ভরে অবনত হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনে ফরাসী বিপ্লবের তাণ্ডব-নৃত্য দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু উহাতে আমরা কি দেখিতে পাই? সমস্তই যেন জীবনী-শক্তি-বিহীন, গোঁজামিল; জীর্ণ-বস্ত্রে তালির ন্যায় উহা যেন কেমন খাপছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থানুসারে ঠিক যতটুকুর আবশ্যক, ইংরাজ সংস্কারকগণ ঠিক ততটুকুই করিয়াছেন,—তাহার বাহিরে এক পদও অগ্রসর হন নাই। তাঁহাদের সংস্কার-নীতির মূলে কোনও বিশ্বজনীন আদর্শের অস্তিত্ব দেখিতে পাই না—কোনও সার্ব্বজনীন ভাবস্রোতে তাঁহারা আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু ফরাসী দার্শনিক সম্প্রদায় এরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না—এরূপ গোঁজামিলে তাঁহাদের কোনও আস্থা ছিল না। যে মহান্ উদার আদর্শের চিত্র তাঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমিকেও ঠিক সেই আদর্শে গড়িয়া তুলিতে তাঁহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মানবহিতৈষিণী প্রবৃত্তি শুধু ফরাসী দেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, পরন্তু মানব-জাতির চরম নিয়তি ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহারা যে গভীর ও উন্নত ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিতেন নির্ভয়চিত্তে ও বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে চতুর্দ্দিকে তাহার ঘোষণা করতঃ, সমগ্র মানবপ্রাণে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার—উন্মাদনার জাগরণ করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু স্বদেশের সমাজ-সমস্যা বা শাসন-সমস্যার সংস্কারসাধন করিয়াই তাঁহাদের মহাপ্রাণ আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে পারে নাই—পরন্তু, জন্মভূমিকে উপলক্ষমাত্র করিয়া সমগ্র মানবসমাজের সমস্যা সমাধানে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভগবান শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পর অষ্টাদশশতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবই যে পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ঘটনা, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। "জগতের ইতিহাসে,—মনুষ্যের উন্নতির ইতিহাসে বুদ্ধদেবের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। বুদ্ধদেব একভাবে মানব-সভ্যতার আদি-পুরোহিত ও সাধারণ-তন্ত্রের আদিম স্রষ্টা;—মনুষ্যের পরম-স্বত্বের ও মনুষ্যত্বের আদি উপদেষ্টা;—শঙ্কিত, ভীত, মুগ্ধ, অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যের নেত্রে প্রথম বিজ্ঞানের সূর্য্যালোক। ভারতবর্ষের যজ্ঞ-হোম-পীড়িত, দেব-ভীতি-ক্লিষ্ট মনুষ্য-মন, সর্ব্বপ্রথম এই সূর্য্যালোক-প্রভাবেই জাগিয়াছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম ষষ্ঠ শতাব্দী জগতের ইতিহাসে নানা বিষয়ে অপূর্ব্ব পদার্থ। ওই সময়েই মানব-আত্মার প্রথম জাগরণ,—মনুষ্য-মনের প্রথম বিপ্লব,—মানুষের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আদর্শে নব-জীবনের সূত্রপাত,—ভারতীয় ইতিহাসের উপনিষদ-যুগের শেষ অধ্যায়। এই দুই শতাব্দীতে সমস্ত পৃথিবীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতেছিল। সভ্যতার ইতিহাসে বুদ্ধাব্দার বা শাক্যসিংহের শীর্ষস্থান।" খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে লোক-তারণ ভগবান বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—তখন আমাদের হীন-হীনা নিরাভরণা ভারত-জননীই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানীয়া ছিলেন। কাল-মাহাত্ম্যে এই ভার-কেন্দ্র ক্রমশঃই পশ্চিমদিকে অপসারিত হইয়াছিল। তাই, সার্দ্ধ-দ্বিসহস্র বৎসর পরে ভারতীয় বৌদ্ধ আত্মাই ফরাসী-বিপ্লবের অগ্রদূতরূপে অবতীর্ণ হইয়া কৌলিন্য ও জন্মগত মাহাত্ম্যের প্রভাব হইতে উদ্ধার

করিয়া ইউরোপীয় মনুষ্যত্ব-আদর্শকে স্বাধীন চরিত্র গৌরবের বিমান-তলে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন "মানুষের আত্মাই বিশ্ব-প্রভু এবং মনুষ্যত্বই সকল ধর্ম্মসাধনের মূল লক্ষ্য"—জগতে ফরাসী "দার্শনিকগণের," অপিচ, ফরাসী বিপ্লবের ইহাই প্রধান শিক্ষা।

ইহাঁদের চিন্তা-প্রণালী সাধারণতঃ দুইদিকে বিশেষ ফল-প্রসূ হইয়াছিল। জগৎ-সমীপে ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন যে শুধু চিন্তা-স্বাধীনতার দ্বারাই মানুষের পরমা উন্নতি সাধিত হইতে পারে না,—মনুষ্যত্বের পূর্ণ-বিকাশের জন্য কর্ম্ম-স্বাধীনতাও তুল্যরূপে আবশ্যকীয়। চিন্তা ও কার্য্যে তুল্যরূপ অধিকার ও স্বাধীনতা না থাকিলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন আদৌ সম্ভবপর নহে। ফরাসী দার্শনিক—অপিচ, ফরাসী বিপ্লবের দ্বিতীয় দাস, —মানবত্ব-নিষ্ঠা। আজকাল আমাদের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই যে বিশ্বমানবহিতেচ্ছা এত অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাও প্রধানতঃ, এই বিশ্বপ্রেমবিহ্বল উদার-হৃদয় ফরাসী দার্শনিকগণেরই অকৃত্রিম চেষ্টা ও অনুরাগের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ফল-মাত্র। ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথম ফরাসী বিচারপ্রণালীর অন্তর্নিহিত লোহরাজির উদ্ঘাটন পূর্ব্বক যথেচ্ছাচার ও অনিয়ন্ত্রিত শাসনপ্রথার কুফল প্রদর্শন করেন, পাপ কার্য্য নিবারণের উদ্দেশ্য অথবা কোন প্রধান রীতির অকৃতকার্য্যতা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত করেন, এবং তৎকাল-প্রচলিত দণ্ডনীতির বর্ব্বরতা প্রতিপন্ন করিয়া মানব-হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দয়তা ও অত্যাচার অবিচারের প্রতি আন্তরিক ঘৃণার উদ্রেক করেন। ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথম দাস-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া মানুষমাত্রেরই ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ জগৎ সমীপে প্রচার করেন।

এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা সঙ্গত যে, এবম্প্রকার চিন্তাবিষয়ে ফরাসী দার্শনিকগণ সম্পূর্ণ মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না এবং যেখানেই তাঁহারা মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী তাদৃশ প্রস্ফুটাকার ধারণ করিতে পারে নাই, তাঁহাদের অধিকাংশ চিন্তাই পূর্ব্বগামী ইংলণ্ডীয় মনীষিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত। কিন্তু তথাপি তাঁহারা অন্যের চিন্তাপ্রবাহকে বিশ্বমানবের হিতার্থে নিয়োজিত করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে এক অমর অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, যুগযুগান্ত ধরিয়া ইউরোপীয় ইতিহাসে ইহাই ফরাসী-জাতীর বিশেষত্ব। অবিমিশ্র প্রবল তর্কস্রোতে ভাসমান হইয়া, অনেক সময়েই তাঁহারা হয়ত তর্কের বিষয়ীভূত মূলসূত্রগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছেন, বা তর্কীভূত বিষয়ের প্রকৃত সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে অনন্যসাধারণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকাতে ইহাঁদের সহানুভূতি ও সমপ্রাণতাও অনেকাংশেই হয়ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে দুর্নিবার ঘটনা-প্রবাহের আবর্ত্তে পতিত হইয়া অনেক সময়ে ইহাঁরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বা যে মতবাদের প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাঁদের প্রচারিত "দর্শন"-তন্ত্রের যথার্থ মূল্য তন্মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। মানব-সমাজের সমস্যা সমাধান কল্পে ইহাঁরা যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদ বা উপনীত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা, ঐ সমস্ত প্রশ্নের মূল্য সহস্র গুণ অধিক ;—চিন্তন-প্রণালীর মৌলিকত্বে তাঁহাদের যাহা-

ছুরী না থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু যে মহান্ আশার বাণী তাঁহারা জগৎ-সমীপে প্রচার করিয়াছেন, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাহা বাস্তবিকই অমূল্য ও সম্পূর্ণ তুলনারহিত।

ইহাদের পূর্ব্বেও আরও অনেক প্রখ্যাত-নামা ইউরোপীয় চিন্তাবীর এই সমস্ত বিষয়ে অনেক চিন্তা, অনেক ধ্যান করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের চিন্তাপ্রবাহ স্ব স্ব সমাজ বা দেশের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-মানবের হৃদয়-দুয়ারে আঘাত করিতে পারে নাই। ফরাসী দার্শনিকগণই সর্ব্বপ্রথম এই চিন্তা-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া মানব মাত্রকেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্ত অনন্ত-গম্ভীরস্বরে আহ্বান করেন;—সভ্যতার ফল-ভোগে মানুষ মাত্রেরই সমানাধিকার, এই মহাবাণী তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করেন। দুঃখ-দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট, অত্যাচার-অবিচার-প্রপীড়িত, পদপদ-দলিত জনসাধা-রণের নিরাশান্ধকার হৃদয়-কন্দরে ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম আশার বর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করেন। মানুষের শক্তি অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত, উন্নতি অনন্ত,—ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী,—ইহাই তাঁহাদের বীজমন্ত্র। কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের সহানুভূতি ও সমপ্রাণতার কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইলেও, বিশ্বমানবপ্রেমে তাঁহাদের হৃদয় ভরপুর ছিল;—তাঁহারা সেই প্রেমামৃত পানে নিজেরা যেমন বিভোর হইয়াছিলেন, সেইরূপ জগৎবাসী ভ্রাতাভগ্নীগণকেও সেই প্রেমসুধা পানের জন্ত অকপট হৃদয়ে আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মবাদে তাঁহাদের বিশেষ আস্থা ছিল না বটে, কিন্তু মানুষের অনন্ত উন্নতিসাধনে—মানবধর্ম্মনিষ্ঠায় তাঁহাদের অচলা ভক্তি ছিল।

মণ্টেস্কিউ ও ভল্টেয়ার এই "দার্শনিক" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও জগৎপ্রসিদ্ধ Encyclopædia বা "বিশ্বকোষ"কে কেন্দ্র করিয়াই এই অভিনব দর্শনবাদ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ১৭২৭খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ ইফ্রেইম্ চেম্বার্স (Ephraim Chambers) কৃত ইংরাজী Encyclopædia প্রকাশিত হয়। ফরাসী পুস্তক বিক্রেতা লি ব্রিটন্ (Le Breton) ১৭৪২ সালে উহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। কিন্তু শুধু অনু-বাদ প্রকাশ করিয়াই তাঁহার সারস্বত হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই। মাতৃভাষায় এইরূপ একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নের জন্ত লি ব্রিটন্ প্রায় প্রত্যেক ফরাসী সাহিত্যিক-কেই আহ্বান করেন—কিন্তু কেহই তাঁহার প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। অবশেষে ডেনিস্ ডিডারো (Denis Did-erot—১৭১৩-১৭৮৪) এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ডিডারো এই সম্পাদনকার্য্য আরম্ভ করেন এবং প্রায় ত্রিশবৎসরব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৭৮০ খৃঃঅব্দে উহা শেষ হয়। রাষ্ট্র-নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যতকিছু উন্নতি সাধিত হইয়া-ছিল, তৎসমুদয়ের বিশদ বিবরণ একত্র সমাবেশিত করাই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই বিরাট ব্যাপারের সম্পাদন শুধু এক ডিডারোর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; বিভিন্নশাস্ত্রে পারদর্শী খ্যাতনামা ফরাসী সাহিত্যিকগণ এই গ্রন্থ সম্পাদনে যথাসাধ্য তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা পরস্পর বিভিন্নমতাবলম্বী হইলেও, সকলেই নব উদ্দীপনায় উদ্দীপিত এক নব

বিশ্বাসে সঞ্জীবিত ছিলেন, সকলেই যুক্তিতন্ত্র ও বিশ্ব-মানবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যের হিসাবে এই অভিধান গ্রন্থের মূল্য তাদৃশ বেশী না হইলেও, চিন্তা-স্বাধীনতা ও নবভাবের প্রচারকল্পে ইহা যে সহায়তা করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কলেবর অত্যন্ত বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী জনসাধারণ কর্তৃক উহা এরূপ সাদরে গৃহীত হইল যে অত্যল্পকালের মধ্যেই সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। এই অনুরাগ শুধু ফরাসীদেশের চতুঃসীমা মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। ইউরোপীয় জগতে তখন ফরাসী সাহিত্যের একচ্ছত্র প্রভাব। গ্রন্থের প্রতি-পাদ্য বিষয়ের সহিত পরিচিত হইবার জন্য সকল দেশের সকল স্তরের লোকেই সমভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রুশিয়-রাজ ফ্রেডারিক্, রুশিয়ার রাণী ক্যাথারিণ্, পর্তুগালের পোম্বাল্ প্রভৃতি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের প্রায় সকলেই Encyclopaediaর গ্রাহক বা পৃষ্ঠপোষক হইলেন।

গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে আরও অনেকে সাহায্য করিলেও, একমাত্র ডিডারোর অলোকসাধারণ প্রতিভা, উৎসাহ ও উদ্যম ব্যতীত এই মহনীয় ব্যাপার কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারিত না ইহা নিশ্চয়। গ্রন্থারম্ভে, সাহায্য করিবার জন্য যাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়া-ছিলেন, গ্রন্থ-সমাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহাদের অনেকেই,—এমন কি, স্বয়ং ডালেম্‌বার্ট (D' Alembert) পর্য্যন্তও সরিয়া পড়িয়া-ছিলেন। অর্থাভাবে তাঁহাকে প্রতি পদবিক্ষেপে চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতে হইয়াছে,—সরকার বেচ্‌ বারে বারে গ্রন্থ প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কিছুই ডিডারোকে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। অষ্টাদশশতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকগণের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য—সার্ব্বজনীনতা, অনুসন্ধিৎসা, সংশয়বাদ, ঔদার্য্য, আশাপ্রবণতা, মানবত্ব-নিষ্ঠা—সকলেরই অপরূপ সমাবেশ এই ডিডারোতে দৃষ্ট হয়।

এই বিরাট গ্রন্থ সম্পাদনে জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইলেও, তাঁহার অধম্য উদ্যম ও অফুরন্ত উৎসাহ শুধু একখানি মাত্র গ্রন্থ সম্পাদনেই পর্য্যবসিত হয় নাই। অন্যের পক্ষে অসম্ভব বোধ হইলেও অদ্ভুতকর্ম্মা ডিডারো এই সুবিশাল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, অবসরমত নাটক, নভেল, সাহিত্য ও চিত্রসমালোচনা, দার্শনিক প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃঃঅব্দে তাঁহার *La Religieuse* নামক প্রসিদ্ধ গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। Re-formation বা খ্রীষ্টধর্ম্ম সংস্কারের পর ক্যাথ-লিক খ্রীষ্টানদের মঠজীবনের বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র আক্রমণ করিতে বোধ হয় আর কেহই সাহসী হন নাই। *Neveu de Rameau*ই ডিডারোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বিশ্বকোষ সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিয়াও যে তিনি এরূপ একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। দুই ব্যক্তির (একজন স্বয়ং ডিডারো) কথোপকথনচ্ছলে সমসাময়িক ফরাসী জনসাধারণের দোষাবলী ও দুর্ব্বলতাসমূহ অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ডিডারোর প্রাণের সমস্ত আবেগ এই গ্রন্থে উৎসারিত দেখা দিয়াছে এবং তাঁহার মনোমোহিনী শক্তিতে আজ-পর্য্যন্তও কেহ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার

অমৃতবাজার পত্রিকার
ভূতপূর্ব্ব সহযোগী সম্পাদক
স্বর্গীয় মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

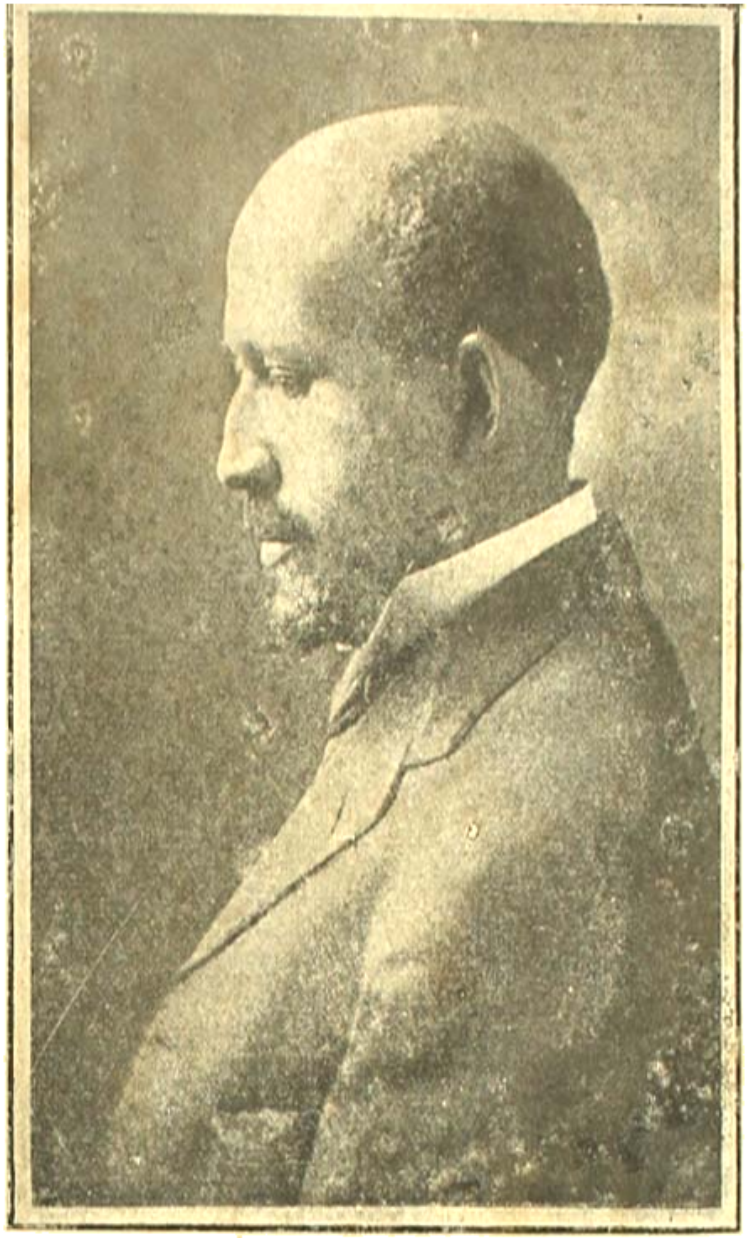

নিগ্রোনায়ক ডুবয়োস

নিগ্রোনায়ক ডুবয়েস্

স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রোসমাজ

পঞ্চাশ বৎসর হইল যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো-সমাজ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। এই পঞ্চাশ বৎসরে তাহাদের লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। একণে এককোটি নিগ্রো নর-নারী যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজের লোকসংখ্যা দশ কোটি মাত্র।

স্বাধীন হইবার পর নিগ্রোরা সকল দিকে উন্নত হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন পঞ্চাশ বৎসরে এরূপ উন্নতি আর কোন স্বাধীন জাতি দেখাইতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

নিউইয়র্কে নিগ্রো বেশী চোখে পড়ে না। শুনিতে পাই নিগ্রোদের মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসা-ব্যবসায়ে, আইন-ব্যবসায়ে এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা-সুলভ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। ধর্ম্মযাজকের কর্ম্ম অবশ্য বহুকাল হইতেই নিগ্রোরা করিয়া আসিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর নূতন নূতন উচ্চস্তরের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে।

তথাপি নিগ্রোদের অবস্থা একণে নিতান্তই শোচনীয়। গোলামীর আমলে ইহাদের যত কষ্ট ও বেদনা ছিল একণে বোধ হয় তাহা অপেক্ষা বেশী। পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিমহলে নিগ্রো-জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি উড়ু উড়ু কল্পনা-প্রসূত ধারণা ছিল মাত্র। Uncle Tom's Cabin পাঠ করিয়া প্রশস্তহৃদয় জনগণ দয়ার্দ্র হইত। ক্রমশঃ ভাবুকতার বন্যায় গোলাম জাতি স্বাধীন হইল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর নিগ্রোরা যুক্তরাষ্ট্রের সত্য সত্যই একটা "সমস্যা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্বেতাঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গে আজকাল যেরূপ বিদ্বেষভাব বিরাজ করিতেছে গোলামীর যুগে এরূপ বোধ হয় ছিল না।

ল্যাটিন জাতীয় লোকেরা সাদা কাল চামড়ার ভেদ গ্রাহ্য করে না। ইহারা সামাজিক ভাবে যে কোন নরনারীর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে সঙ্কুচিত হয় না। তাহার ফলে পর্ত্তুগীজ ও স্পেনিশ রক্ত সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রো রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। মেক্সিকো হইতে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ সীমা পর্য্যন্ত কোথাও রক্তসংমিশ্রণ এবং জাতিসঙ্করের অভাব নাই—বরং বর্ণভেদ এবং জাতিভেদ পাওয়াই কঠিন। সর্ব্বত্রই সাদায় লালে এবং কালায় মিশিয়া এক বিচিত্র সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু টিউটনিক এবং অ্যাংলোস্যাক্সন আমেরিকার পৃথক স্বতন্ত্র। অ্যাংলোস্যাক্সন জাতীয় লোকেরা বর্ণভেদ অত্যধিক স্বীকার করে। ইহারা, কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো অথবা লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ পাতাইতে কখনই প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ যুক্তরাষ্ট্রে আদিম ইণ্ডিয়ান্ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে—এবং এককোটি কৃষ্ণাঙ্গ নরনারী আলগাভাবে শ্বেতাঙ্গ সমাজের পার্শ্বে জীবন যাপন করিতেছে। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ এক রাষ্ট্রে দুই স্বতন্ত্র জগতে বাস করে। ইহারা কখনই মিশিবে না।

কৃষ্ণাঙ্গ একণে কাগজে কলমে আর গোলাম নাই বটে—কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার

অবস্থা গোলামী হইতে সুখকর নয়। নিউ-ইয়র্কে নিগ্রো ইয়াঙ্কি উভয় জাতীয় বালক বালিকা একই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পায় দেখিয়াছি। অথচ আফিসে, ব্যাঙ্কে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, যৌথকারবারে কৃষ্ণাঙ্গ চোখে পড়ে না। নিউইয়র্কের কোন হোটেলে কৃষ্ণাঙ্গকে বসিতে না দিলে হোটেলস্বামী আইনে শাস্তি পান। অথচ কোন হোটেলে একটি নিগ্রোকেও দেখিতে পাই না। এমন কি কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীও কোন হোটেলে প্রবেশ করিলে হোটেলের কর্ম্মচারীরা তাহাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—"মহাশয় আপনার বাড়ী কোথায়?" অনেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়াই আগন্তুককে বলিয়া ফেলে—"ভাই সর্ব্ব পশ্চাদ্ভাগের চেয়ারে বসিবে কি?" হোটেলের খরিদ-দারেরা নিগ্রোদের সঙ্গে বসিয়া আহারাদি করিতে চাহে না অথচ আইনের প্রভাবে হোটেল হইতে নিগ্রোকে তাড়ান হইতে পারে না। কাজেই পশ্চাতে বসাইবার ব্যবস্থা। নিগ্রোরাও আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য সাধারণতঃ কোন শ্বেতাঙ্গ হোটেলে প্রবেশ করে না। এইজন্য শ্বেতাঙ্গ হোটেলে যদি কোন নূতন কৃষ্ণাঙ্গ সাহসপূর্ব্বক প্রবেশ করে এবং শ্বেতাঙ্গ পুরুষ রমণীগণের মধ্যে বসিয়া পড়ে তাহা হইলে লোকেরা বিবেচনা করে—"এই ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ দেখিতেছি—কিন্তু নিগ্রো কখনই নয়। নিশ্চয় বিদেশীয় লোক—হয়ত কিউবাদ্বীপবাসী, হয়ত ভারতবাসী, হয়ত বা স্পেনিষ ইত্যাদি।"

"হোটেলের খানসামা ও বাবুর্চি, ইলেক্-ট্রিসিটিচালিত উত্তোলন যন্ত্রের পরিচালক এবং ঘর বাড়ীর পরিদর্শক অথবা সেবাদাস ও ভৃত্য—ইত্যাদির অধিকাংশই নিউইয়র্কে নিগ্রো। নিগ্রোদিগকে কোন উচ্চতর কর্ম্মে দেখি নাই—তাহাদের সংখ্যা এত বিরল।

অভিংটনের নিগ্রোসেবা

গত দশ বৎসর ধরিয়া ইয়াঙ্কি কুমারী অভিংটন নিগ্রো সমাজের জন্য সেবাকার্য্যে ব্রতী আছেন। ইহার বিবেচনায়, বর্ণভেদের প্রধান কুফল একটি। নিগ্রোরা খানিকদূর পর্য্যন্ত সকল দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়। কিন্তু তাহার পর ইহাদের পথ রুদ্ধ। অভিংটনের সঙ্গে কয়েকবার আলাপ হইল। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বিবেচনা করেন যে, নিগ্রো-সমস্যা এক্ষণে আর বর্ণ-সমস্যা নয়, ইহা সাধারণ দারিদ্র্য সমস্যার এক বিভাগ মাত্র? দরিদ্র ইতালী-য়ান ও স্পেনের যে দুরবস্থা নিগ্রোদের ও কি সেই দুরবস্থা?"—অভিংটন বলিলেন—"আমি সেইরূপই বিবেচনা করি। অবশ্য আমাদের একটা জাতিগত কুসংস্কার মজ্জাগত আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি নিগ্রোরা বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি করিবার সুযোগ ও অবসর পায় তাহা হইলে নিগ্রোসমস্যা সহজ হইয়া যাইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বিশ্বাস করেন যে শ্বেতাঙ্গে এবং কৃষ্ণাঙ্গে মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই? উভয়েই এক প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ? দুই সমাজেই উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা সমানভাবে বিকশিত হইতে পারে?" ইনি বলিলেন—"এই রূপই আমার ধারণা। কেবল আমার নয়—আজ কালকার নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও এই কথাই বলিতেছেন। ইহারা সভ্যতা বিস্তারে কোন জাতিবিশেষের একচেটিয়া অধিকার ও যোগ্যতা স্বীকার করেন না। আমার বিশ্বাস নিগ্রোরা যুক্তরাষ্ট্রে অর্দ্ধ মানব মাত্র বিবেচিত হয়। এজন্য এখানে নিগ্রো-

প্রতিভার বিকাশ হয় না। দুই তিন বৎসর হইল আমি 'Half a man' নাম দিয়া নিগ্রো-জাতির বৈষয়িক দুরবস্থার চিত্র প্রদান করিয়াছি। তাহার ভূমিকায় মৃতস্থবির বোগাস আমার সিদ্ধান্তই বৈজ্ঞানিকের সমর্থন-যোগ্য স্বীকার করিয়াছেন।"

বোগাস লিখিয়াছেন—

"Many students of anthropology recognise that no proof can be given of any material inferiority of the Negro race; that without doubt the bulk of the individuals composing the race are equal in mental aptitude to the bulk of our own people; that although their hereditory aptitudes may be in slightly different directions, is very improbable that the majority of individuals composing the white race should possess greater ability than the Negro race."

কুমারী অভিংটনের এই গ্রন্থে নিউইয়র্কের নিগ্রোসমাজ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। নিগ্রোদের আবাসস্থান ও কর্ম্মস্থান, তাহাদের শিশুজীবন ও নারীজীবন, তাহাদের ধনাগমের উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে প্রাচীনকালে ইহুদিদিগের যেরূপ দুরবস্থা ছিল বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোসমাজ তদপেক্ষা বেশী দুর্য্যোগ সহ্য করিতেছে।

অভিংটন নিগ্রোবালকবালিকাদিগের জন্য একখানা সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি বলেন—সাধারণ বিদ্যালয়ে যে সকল পাঠ্য পুস্তক ব্যবহৃত হয় তাহাতে শ্বেতাঙ্গ ইয়াঙ্কিদিগের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন চিত্রিত থাকে। নিগ্রো ছাত্র ছাত্রীরা এই সকল গ্রন্থে নিজেদের আবেষ্টন দেখিতে পায় না—কাজেই ইহাদের শিক্ষালাভ সরস হয় না। এই বুঝিয়া অভিংটন নিগ্রোসমাজের রীতিনীতি, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানা লিখিয়াছেন।

অভিংটনের সঙ্গে আলাপে জানা গেল আজকাল নিগ্রোসমাজে কয়েকজন কবি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। নিগ্রোরা চিরকালই সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী। উচ্চ অঙ্গের কবিতা রচনায়ও ইহারা ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ করিতেছে। ব্রেথ্ওয়েটের Lyrics of Life and Love সম্বন্ধে এক সম্পাদক লিখিয়াছেন :—

"We have this maker of sweet verses the true poetic spirit and the work has that grace of form that distinguishes the work of the poet from that of the poet-aster. * * * why is praise begrudged the poet? Why do those critics of the North who have so long been on the lookout for some one to wear the bays that rest but lightly on the head of Bliss Carmen pause before giving to the new-come singer the award that is his due? * * * He is one who is by the present volume proving himself to be what ninehundred and ninetynine of the thousand and one verse makers of this country are not—a poet. * * * Can you

tell why he is not hailed praise?—He is a Negro.

সমাজতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ডুবয়েস্

একদিন সন্ধ্যাকালে নিগ্রোদের একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলাম। সঙ্গীত চর্চ্চা হইল—এবং নিগ্রোজাতির অন্যতম জননায়ক অধ্যাপক ডুবয়েস্ বক্তৃতা করিলেন। ইনি Krehbiel প্রণীত Afro-American Folksongs নামক গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ইহার নির্দ্দেশ অনুসারে গান গীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইনি এই সমুদায়ের ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী দিতে লাগিলেন। ডুবয়েস্ (Du Bois) নিগ্রোজাতীয় লোকসাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহা তাঁহার প্রসিদ্ধ (The Souls of Black folk) নামক গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। এই প্রবন্ধ এবং সমস্ত গ্রন্থই সকলের পাঠ করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মবীর বুকার ওয়াশিংটন প্রণীত Up from Slavery গ্রন্থের সঙ্গে অধ্যাপক ডুবয়েস্ প্রণীত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সমগ্র নিগ্রো-সমাজের সকল কথা অবগত হওয়া যায়। ডুবয়েসের রচনা সাহিত্যহিসাবেও অতি উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত।

ডুবয়েস্ বলিলেন—"আপনারা এই গানগুলি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এই গীত শুনিয়া মুগ্ধ হয় না এমন লোক জগতে আছে কিনা জানি না। কিন্তু আপনারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন কি যে এই সমুদয় গীত নিগ্রো জনসাধারণের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল? আপনারা নিগ্রোজাতি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অতি নীচ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। এই অন্ধ কুসংস্কারের ফলে আপনারা কোন মতেই ভাবিতে পারেন না যে জগতের কতকগুলি সুর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীত এই কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম জাতির হৃদয় নিঃসৃত করিতেছে। আমাদিগকে আপনারা অধম নীচ প্রকৃতি পশুস্বভাব ও হৃদয়হীন নরনারী বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। কাজেই আমাদের মুখে যদি কোন ভালকথা আপনারা শুনিতে পান আপনারা স্বভাবতই ভাবিয়া থাকেন যে ঐ সমুদয় বচন আমরা কতকগুলি পরকীয় বুলির ন্যায় আওড়াইতে শিখিয়াছি মাত্র। উচ্চ ধারণা, মহান্ ভাব, গভীর চিন্তা যে নিগ্রোহৃদয়ে জাগিতে পারে ইহা আপনাদের কল্পনার অতীত।

আজ শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গগণকে এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ চোখে দেখিতেছেন। কিন্তু মধ্যযুগে এবং প্রাচীনকালে কৃষ্ণাঙ্গ সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গের এইরূপ অন্যায় ধারণা ছিল কি? ইতিহাস আলোচনা করুন—দেখিবেন প্রাচীন কালে শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিত। কৃষ্ণাঙ্গেরা অর্দ্ধমানব বিবেচিত হইত না। ধর্ম্মকর্ম্মে, শিল্পকর্ম্মে, সাহিত্য চর্চ্চায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন চিত্রালয় ও আর্ট গ্যালারী যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে প্রাচীন শিল্পীরা খৃষ্টধর্ম্ম-বিষয়ক অথবা সভ্যতা বিষয়ক চিত্রের ভিতর কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয় নরনারীর ভক্তি, সেবা, ধর্ম্ম, দাক্ষিণ্য, সৌম্যবীর্য্য এবং নানাবিধ উৎকর্ষের পরিচয় দিতেন। ইয়োরোপের অন্যান্য লোকেরা যেরূপ মানুষ এই সকল চিত্রকরগণের ধারণায় এশিয়া ও আফ্রিকার নরনারীগণও সেইরূপই মানুষ বিবেচিত হইত। কিন্তু আজ তিনশত বৎসরের গোলামীর ফলে নিগ্রোকে আপনারা পশুর সমান বিবেচনা করিতে শিখিয়াছেন। নিগ্রোরা যদি কখনও গোলামী না করিত তাহাহইলে আপনারা

এখনও তাহাদিগের চিন্তাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, বর্ণজ্ঞান এবং সভ্যতা সম্বন্ধে করিয়া চলিতেন।"

ডুবয়েস্ আটলাণ্টা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই বিশ্ব-বিদ্যালয় আপাপোড়া নিগ্রো। এক্ষণে ইনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া মাসিকপত্রের সম্পাদক হইয়াছেন। কাগজের নাম Crisis—বর্ত্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ৩০,০০০। ডুবয়েস খাঁটি নিগ্রো নহেন। বুকার ওয়াশিংটনের ন্যায় ইহাঁর শরীরে শ্বেতাঙ্গ রক্ত প্রবাহিত। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের ভিতর ফরাসী অন্যতম ছিল। ডুবয়েস্ ইয়োরোপের জাতি-সমূহের মধ্যে ফরাসীকেই বেশী ভালবাসেন।

প্রাচীন চিত্র-শিল্পে কৃষ্ণাঙ্গদিগের মর্য্যাদা সম্বন্ধে ডুবয়েস্ Crisis পত্রে লিখিয়াছিলেনঃ—

"The reproduction of the 'Adoration of the kings' by Ian Gossart is one of a number of noted paintings which make the figure of the adoring flock king one of prominence. The Antwerp Museum houses the 'Adoration of the Magi' by Rubens, in which the Nubian slaves are grouped by the side of the worshipping camels and the African King is pictured parading in the centre of the picture. In the Lonvre is seen, painted, three years after, a second picture by the same master, commissioned for the church of the sisters of the Anunciation in which the black king is placed as the central figure.

In Bourne—Jones, 'The star of Bethelhem' the adoring Negro prince the third figure on the right. A painting of an unlike subject, exhibited in the Vienna Gallery 'The Four Quarters of the Globe' by Rubens, symbolises the quarters of the globe by one of the great rivers—the Danube, the Nile, the Ganges and the Amazon. The rivers are in turn symbolised by four male figures with their beautiful female companions. Of 'bronze-hued' loveliness are the man and the maid that represent the Nile."

লোক-সাহিত্যে নিগ্রোজাতি

নিগ্রোদিগের জাতীয় সঙ্গীত ও লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে ডুবয়েস্ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের "Of the Sorrow Songs" অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন। এই সাহিত্যে বর্ত্তমানের কষ্টদৈন্য অথচ ভবিষ্যতের আশা অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গোলামের জাতিই গাহিয়া থাকে—"ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা আহ্লাদে।"

ডুবয়েস্ বলিতেছেন—

"They are the music of an unhappy people—of the children of disappointment, they tell of death and suffering and unvoiced longing toward a truer world, of misty wanderings and hidden ways."

ইহজগতে যাহারা কিছু কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারিল না তাহারা পরকাল, অধ্যাত্ম-

তত্ত্ব, স্বর্গ, ইত্যাদির স্বপ্ন দেখে। পদদলিত জাতির যীশুখ্রীষ্ট এইজন্যই প্রচার করিতেন—"My Kingdom not of this world." নিগ্রো গাহিতেছেন—

"You may bury me in the East,
You may bury me in the West,
But I will hear the trumpet sound
in that morning."

রবীন্দ্রনাথের আশা-তত্ত্বও কি এইরূপ নয়?—

"তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ
ছাড়ি নাই! এত যে হীনতা, এত লাজ
তবু ছাড়ি নাই আশা! * * *
আছ তুমি অন্তর্যামী এ লক্ষিত দেশে,
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হয়ে
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ!"

নিগ্রোদিগের গীতাবলী অধিকাংশই আধ্যাত্মিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক। সাংসারিক, বৈষয়িক ও পারিবারিক চিত্র এই সঙ্গীতে প্রায়ই পাওয়া যায় না। না পাইবারই কথা।

"Purely secular songs are few number. * * * tell in word and music of trouble and exile, of strife and hiding; they grope toward some unseen power and sigh for rest in the End."

নিগ্রোরা সংসারে সুখ পায় নাই। কাজেই হয় স্বর্গের কথা গাহিয়াছে অথবা প্রকৃতির ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে।

"My Lord calls me
He calls me by the thunder
The trumpet sounds it in my
soul."

নিগ্রোসাহিত্যে মাতার উল্লেখ আছে কিন্তু জন্মদাতার উল্লেখ নাই। বিবাহ, প্রেম, ভালবাসা, দাম্পত্য-সম্বন্ধ ইত্যাদির পরিচয় গোলামী যুগের রচনায় পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে গোলামজাতির যথার্থ পারিবারিক জীবন ছিল কিনা সন্দেহ।

ডুবয়েস্ লিখিয়াছেন:—

"Mother and child are sung, but seldom father fugitive and weary wanderer calls for pity and affection, but there is little of wooing and wedding, the rocks and mountains are well known, but home is unknown."

নিগ্রো সঙ্গীতের আর এক লক্ষণ এই যে ইহাতে মৃত্যু ভয় নাই।

"Of death the Negro showed little fear, but talked of it familiarly and even fondly as simply a crossing of the waters, perhaps—who knows?—back to his ancient forests again."

ইহাই কি "গীতার" বাণী নয়?

ডুবয়েসের গ্রন্থ হইতে আর এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"Through all the sorrow of the sorrow songs there breathes a hope—a faith in the ultimate justice of things. The minor cadences of despair change often to triumph and calm confidence. Sometimes it is faith in life, sometimes a faith in death, sometimes assurance of boundless justice in some fair

world beyond. But whichever is, the meaning is always clear that sometime, somewhere men will judge men by their souls and not by their skins."

এইরূপ ভাবুকতা, এইরূপ স্বপ্ন, এইরূপ আশা লইয়াই নির্য্যাতিত জাতিরা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

জেঃবিল তাঁহার Afro-American Folksongs গ্রন্থে নিগ্রোদিগের লোক-সাহিত্য আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে রুশ, আর্ম্মাণ, ফিনিস, কেল্টিক ইত্যাদি নানা জাতীয় গীতাবলীর অবতারণা করিয়াছেন। এই জন্য এই গ্রন্থে নানা জাতির হৃদয়কথা বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত লেখক গীত সাহিত্যের আলোচনায় বেশী মনোযোগ না দিয়া সঙ্গীত-কলা বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস নিগ্রো-জাতির নিজস্ব কোন সঙ্গীত-কলা ছিল না—তাহারা আমেরিকায় আসিয়া শ্বেতাঙ্গদের বিদ্যা অনুকরণ করিয়াছে। এই জন্য লেখককে আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদিগের সঙ্গীত-কলা এবং গীতসাহিত্য আলোচনা করিয়া মামুলি মত খণ্ডন করিতে হইয়াছে। ইহার মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"Some of the melodies have peculiarities of scale and structure which could not possibly have been copied from the music which the blacks were privileged to hear on the plantations or anywhere else during the period of slavery. Correspondence will be disclosed, however, between these peculiarities and elements observed by travellers in African countries."

প্রাচীন মিশরে নিগ্রোসভ্যতা

"Crisis" আফিসে অধ্যাপক ডুবয়েসের সঙ্গে দেখা হইল। ইনি একখানা গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিতেছিলেন। এই গ্রন্থ Home University Library গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। নাম "The Negro". ইহাতে ডুবয়েস্ নিগ্রো সমাজের প্রাচীন সভ্যতা বিবৃত করিয়াছেন। সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে নিগ্রোরা অতি নিম্নজাতি—কয়েক শত বৎসর হইল শ্বেতাঙ্গ সমাজের অধীনে আসিয়া সভ্যতার অ আ ক খ লাভ করিতেছে। সুতরাং ইহাদের উন্নতি এখনও বহুকাল সাপেক্ষ। এই প্রচলিত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অধ্যাপক মুন্‌স্টার-বার্গ তাঁহার "Americans" নামক গ্রন্থের Problems of population অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :—

"It must be left to anthropology to find out whether the negro race is actually capable of such complete development as the Caucasian race has come to after thousands of years of steady labour and progress. The student of social politics need not go into such speculations ; he faces the fact that the African Negro has not had the thousands of years of such training and therefore, although he might be theoretically capable of the highest calture, yet practically he is still unprepared for the higher duties of civilisation."

ডুবয়েস্ বলিতে লাগিলেন—"এইরূপ মতবাদ পণ্ডিতমহলে এবং সাধারণ শ্বেতাঙ্গ সমাজে প্রচলিত হইল কেন জানেন? আমরা ২০০ বৎসর কাল ইহাদের গোলামী করিয়াছি বলিয়া। আমাদের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা কেহই আবশ্যক বোধ করেন নাই। আমরা ত গ্রীক দার্শনিক য়্যারিষ্টটলের হিসাবে "জীবন্ত যন্ত্র" মাত্র। আমাদের কি আত্মা আছে? না চিত্ত আছে? কাজেই আমাদের অতীত, আমাদের বংশ মর্য্যাদা, আমাদের গৌরব কথা আবার কোথায়? পণ্ডিত মহাশয়গণ যদি বর্ত্তমানের কুসংস্কার এবং সাময়িক আবেষ্টন ছাড়াইয়া উঠিয়া "রাগদ্বেষবহিষ্কৃত"-ভাবে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতেন তাহা হইলে নিগ্রোজাতির অতীত গৌরব-কাহিনী বাণীর সন্ধান পাইতেন। প্রাচীনতম যুগের উৎকর্ষও বিবৃত হইতে পারিত এবং মধ্য-যুগের "missing links" বা ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়া যাইত। আপনি বোধ হয় জানেন যে প্রাচীন মিশরীয় ফ্যারাও সম্রাটদিগের আদিম বাসস্থান এবং জাতিতত্ত্ব এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু সেই যুগের মূর্ত্তি ও চিত্র আজকাল কে না দেখিয়াছে? সেগুলি দেখিয়া আধুনিক নিগ্রো নরনারীর কথা মনে না হওয়া অত্যন্ত বিস্ময়জনক। মিশরীয় নরপতিগণের রং, কেশ-বিন্যাস, আকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই নিগ্রোজাতীয় বিবেচনা করিলে কোন অন্যায় হইবে না। নৃতত্ত্ববিদেরা তাহা জানেন। ঐতিহাসিকেরাও তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু ইহারা এতই অন্ধ ও গতানুগতিক যে সেই বিরাট সভ্যতার প্রবর্ত্তকগণকে আধুনিক অবনত নিগ্রোদিগের পূর্ব্ব পুরুষ বিবেচনা করিতে দ্বিধা করিতেছেন। যাহারা কোন কালে জগতের শীর্ষস্থানে ছিল তাহারা কি ঘটনাচক্রে নিতান্ত নিকৃষ্ট সমাজে পরিণত হইতে পারে না? হইতে পারে। পণ্ডিতেরা তাহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু নিগ্রোদের অতীত অতটা গৌরবসূচক সপ্রমাণ করা ইহারা পছন্দ করেন না। কারণ নিগ্রো যে বর্ত্তমানকালে শ্বেতাঙ্গদিগের গোলাম!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এই সকল কথা প্রমাণসহ বিবৃত করিয়াছেন কি?" ডুবয়েস্ বলিলেন—"মহাশয়—Home University Library Series এর কর্ত্তৃকর্ত্তারা আমাকে এইজন্য বিশেষ খাটিতে বলিয়াছেন। আমাকে তিনবার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বদলাইতে হইয়াছে। একটা বিস্তৃত Bibliography ও গ্রন্থের ভিতর দিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার এই কার্য্যে সঙ্গী কতজন পাইয়াছেন?" ইনি বলিলেন—"এখন পর্য্যন্ত একাকী চলিতেছি।" কিন্তু শীঘ্রই একটা পরিষৎ গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে। Encyclopædia Africana নাম দিয়া একটা বিশ্বকোষ বাহির করা হইবে। তাহাতে আফ্রিকা বিষয়ক প্রাচীন ও নবীন সকল প্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ হইবে। আমার এই "Negro" গ্রন্থ সেই বিরাট ব্যাপারের এক প্রকার ভূমিকা স্বরূপ।"

ডুবয়েস্ কয়েকখানা গ্রন্থের নাম করিলেন। এই গুলির লেখক নিগ্রো। প্রাচীন ও নবীন নিগ্রো সমাজবিষয়ক তথ্য এই সমুদয়ের আলোচ্য বিষয়। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

Negro-Culture in West Africa—Ellis.

Gold Coast Native Institutions—Hayford.

3. Out of the House of Bondage —Miller.
Facts of Reconstruction—Lynch.
The Negro in American History—Cromwell.
African Abroad—Ferris
Haitian Revolution—Steward.

কৃষ্ণাঙ্গ বিভীষিকা

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আফ্রিকার বর্ত্তমান নিগ্রোসমাজের সঙ্গে আমেরিকার নিগ্রোদিগের ভাব-বিনিময় এবং কর্ম্ম-বিনিময় হইয়া থাকে কি?" ইনি বলিলেন—"ধর্ম্ম-বিষয়ে আদান প্রদান কথঞ্চিৎ হয়। আমরা জগতে সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোকে এক স্বতন্ত্র খৃষ্টান সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে চাহি। এই আন্দোলনে শ্বেতাঙ্গেরা ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার নাম ইহাঁরা Ethiopian Movement দিয়া থাকেন। এখনও অবশ্য আন্দোলন বিশেষ প্রবল নয়। কিন্তু নিগ্রোদের হাতে কিছু টাকা হইলে যখন আফ্রিকার ও আমেরিকার নিগ্রো ভ্রাতাদের ভিতর ব্যবসায় সম্বন্ধ এবং বৈষয়িক আদান প্রদান প্রবর্ত্তিত হইবে তখন শ্বেতাঙ্গেরা একটা কৃষ্ণাঙ্গ বিভীষিকা (Black Peril) দেখিতে থাকিবেন সন্দেহ নাই। শ্বেতাঙ্গেরা প্রায়ই বিভীষিকা দেখিয়া থাকেন। আজকাল আমেরিকায় Yellow Peril বা পীতাঙ্গ-বিভীষিকা এবং ইয়োরোপে মুসলমান-বিভীষিকা (Pan-Islamism) প্রবল। হয়ত আগামী ৩০ বৎসরের ভিতর কৃষ্ণাঙ্গ-বিভীষিকাও গজাইয়া উঠিবে!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আফ্রিকার বহু নিগ্রো ত এখনও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে কি?" ডুবয়েস্ বলেন—"মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করা নিগ্রোদের পক্ষে মঙ্গলকর নয়। আফ্রিকার মুসলমান নিগ্রোরা খৃষ্টান হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রকৃত পক্ষে, আমার বিশ্বাস, খৃষ্টান সভ্যতার আওতায় নিগ্রোসমাজ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শেই নিগ্রোজাতি অধিকতর উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। Blyden প্রণীত "Christianity, Islam and the Negro Race" গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা পাইবেন।"

বুকার ওয়াশিংটন ও ডুবয়েস্

শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রো-সমাজের নরম দলের নেতা। অধ্যাপক ডুবয়েস্ গরম অর্থাৎ চরমপন্থীদলের নেতা। এই দুই জনই আমেরিকায় সুপ্রসিদ্ধ। আমেরিকার বাহিরে যাঁহারা নিগ্রোসমাজের সংবাদ রাখেন তাঁহারা এই দুই জনকেই জানেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয় আপনাতে এবং ওয়াশিংটনে মতভেদ কোন্ কোন্ বিষয়ে বেশী?" ইনি বলিলেন—"আমার সঙ্গে ওয়াশিংটনের আকাশ পাতাল পার্থক্য। আমি ইহাঁর চরিত্রবত্তা এবং অকপট স্বজাতিসেবা যার-পর-নাই সম্মান করিয়া থাকি। এরূপ কর্ম্মবীর জগতে বেশী নাই—এইরূপ আমার বিশ্বাস। কিন্তু ইহাঁর মতের সঙ্গে আমি কোন দিনই মত মিলাইতে পারিলাম না। ইনি এতবেশী টিল দিয়াছেন যে সমগ্র নিগ্রোজাতি আমেরিকার রাষ্ট্রমণ্ডলে খানিকটা নামিয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক— ইনি last of the submissionists—ইহাঁর পরে আর কেহ বোধহয় ইহাঁর প্রচারিত সহিষ্ণুতা-নীতি অবলম্বন করিবে না।"

বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোজাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না এবং নিগ্রোদিগকেও বলিতে দেন না। তাহার ফলে ইয়াঙ্কিরা বুঝিয়াছে যে নিগ্রোরা রাষ্ট্রমণ্ডলে উচ্চ অধিকার না পাইলেও শান্ত থাকিবে। ওয়াশিংটন নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গকে দুই ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় জগতে বাস করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইনি কেবলমাত্র শিল্পের আন্দোলন, শিল্পশিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির পুষ্টিসাধনে সমগ্র নিগ্রোসমাজকে ব্রতী করিতে চাহেন। আমাদের দেশে এইরূপ আন্দোলনকে "নুন চিনির বা জুতাকাপড়ের স্বদেশী" বলা হয়। বুকারের মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"In all things purely social we can be as separate as the five fingers and yet one as the hand in all things essential to mutual progress."

ডুবয়েস্ বলেন—"এই কথায় ওয়াশিংটন সমগ্র নিগ্রোজাতিকে ইয়াঙ্কিদের নিকট বেচিয়া ফেলিয়াছেন বলিতে পারি। কাজেই ইয়াঙ্কিরা ওয়াশিংটনকে বড়ই খাতির করিয়া চলেন। ইনি সর্ব্বত্রই ইহার টাস্কেজী শিল্প-বিদ্যালয়ের জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন। ইয়াঙ্কিরা বুঝে যে যদি এইরূপ সর্ব্বজনমান্য স্বার্থত্যাগী কর্ম্মবীর তাঁহার স্বজাতির জন্য বৈষয়িক উন্নতি মাত্রে সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে আমেরিকা অনেকটা নিরাপদ হইবে—নিগ্রোসমস্যা আর থাকিবে না। এই বুঝিয়া ব্যবসায়-প্রধান ইয়াঙ্কী-সমাজ ওয়াশিংটনকে যথেষ্ট আদর করেন। কিন্তু নিগ্রোজাতি এই মতবাদের ফলে ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছে। আজ নিগ্রো আমেরিকার রাষ্ট্রমণ্ডলে গোলামেরও অধম।"

ডুবয়েস্ বলেন—"আমরা রাষ্ট্রমণ্ডলে উচ্চ অধিকার আকাঙ্ক্ষা করি।—কেবলমাত্র টাকা পয়সার আন্দোলনে যোগ দিলেই নিগ্রো-জাতির চরম উন্নতি হইবে না। আমরা সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি সভ্যতার সকল অঙ্গেরই বিকাশসাধন করিতে চাহি। অধিকন্তু কেবলমাত্র কতকগুলি শিল্প-বিদ্যালয় অথবা নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীর সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই নিগ্রোদের শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা হইবে না। আমরা নিগ্রোদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য-পরিষৎ, বিজ্ঞান-পরিষৎ ইত্যাদি সকল প্রকার উচ্চ প্রতিষ্ঠান গড়িতে চাহি। কিন্তু ওয়াশিংটন এরূপ ব্যাপক ও গভীরভাবে নিগ্রোজাতির ভবিষ্যৎ চিত্র কল্পনা করিতে পারেন না।"

"Of our spiritual strivings" নামক প্রবন্ধে ডুবয়েস্ আমেরিকাবাসী নিগ্রোর জাতীয় আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন—

"He would not Africanise America, for America has too much to teach the World and Africa. He would not bleach his Negro soul in a flood of white Americanism, for he knows that Negro blood has a message for the world. He simply wishes to make it possible for a man to be both a Negro and an American, without being cursed and spit upon by his fellows, without having the doors of opportunity closed rightly in his face."

অধ্যাপক ডুবয়েস্ নিষ্ঠা ভাবুকতার প্রতিমূর্ত্তি। আধুনিক ইতিহাসের নজির দেখাইতে হইলে বলিবে ডুবয়েস্ ম্যাজিনি এবং ওয়াশিংটন কাহার। একজন স্বপ্ন ও আদর্শ প্রচার করিতেছেন—আর একজন অবস্থা বুঝিয়া যথাসম্ভব কর্ত্তব্য বলিতেছেন।

ডুবয়েস্ আমাদের দার্শনিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উল্লেখ করিলেন। ইহার সঙ্গে লণ্ডনের Universal Races Congressএর দেখা হইয়াছিল।

শ্রীআমেরিকা প্রবাসী

পুষা কৃষি-কলেজের রেশম-বিভাগে পরীক্ষিত ফলাফল ও সিদ্ধান্ত

প্রস্তাবনা

তুঁতভুক রেশমকীট জাতিগুলির বিশেষত্ব :—ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন প্রকারের তুঁতভুক রেশমকীট জাতিগুলির নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ইহাদের বিশেষত্ব ও প্রত্যেক জাতীয় কোয়ার রেশমের পরিমাণ জানা যাইবে।

(১) বম্বিকস মরি বা বিলাতি পলু :—এই জাতীয় রেশমকীট সাধারণতঃ চীন, জাপান, ইতালি, ফ্রান্স, কাশ্মীর, জম্মু, তুরস্ক, পারস্য, তুর্কীস্থান, অষ্ট্রিয়া, স্পেন, ককেশাস্, সাইপ্রাস্ প্রভৃতি দেশে গৃহাভ্যন্তরে পালন করা হয়; বাঙ্গালা, আসাম, মহীশূর, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশেও সম্প্রতি এই জাতীয় রেশম কীট অল্প পরিমাণে পালন করা হইতেছে। এই জাতীয় রেশমকীটের ডিম স্বভাবতঃ দশমাস ডিম অবস্থায় থাকিয়া বৎসরে একবার মাত্র ফুটিয়া থাকে; এই ডিমগুলি কিছুকালের জন্য শীত সওয়াইয়া লইলে এক সময়ে ফুটিয়া থাকে। এই জাতীয় রেশম কীট শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের, মধ্যস্থলে সমাকর্ষণ যুক্ত (দাবা) বা সমাকর্ষণহীন গুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে; এই গুটি হইতে অন্যান্য জাতীয় গুটি অপেক্ষা পরিমাণে বেশী ও ভাল রেশম পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে এই জাতীয় পলুর ডিমগুলি কৃত্রিম উপায়ে শীত খাওয়াইয়া লইলে উপযুক্ত সময় মনোনীত করিয়া যে কোনও সময় ফুটাইয়া লইতে পারা যায়। ফার্ণহীট তাপমান যন্ত্রের ৬০°-৭৫° ডিগ্রি তাপেতে এই জাতীয় রেশমকীটগুলি বেশ পালন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ডিমগুলি এক সময়ে ফুটাইয়া লইতে হইলে পাড়িবার পর একমাস পর্য্যন্ত স্বাভাবিক আবহাওয়াতে খোলা যায়গায় রাখিয়া দিয়া কোনও পাহাড়ে বা বরফের কলে প্রায় চারি বা পাঁচমাস পর্য্যন্ত ফার্ণহীট তাপমান যন্ত্রের ৪০°-৫০° ডিগ্রি তাপ যুক্ত স্থানে রাখিতে হয়। শীতপ্রধান দেশে এই শীত খাওয়ান ডিমগুলি ডিম ফুটাইবার ঘরে রাখিয়া প্রত্যহ দুই বা এক ডিগ্রি উত্তাপ প্রায় ২০।২৫ দিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া প্রায় ৫০° হইতে ৭৫° ডিগ্রি ফার্ণহীট যন্ত্রের তাপে ক্রমে উঠাইয়া এক সময়ে ফুটাইয়া লওয়া হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ ডিমগুলি উক্তপ্রকার যন্ত্রে না রাখিলেও (স্বাভাবিক তাপ ৬০° ডিগ্রি ফার্ণহীটের নিম্নে না হইলে)

শীত খাওয়াইয়া আনার ১০।১৫ দিন পরে. নিস্তারি, ছোট পলু প্রভৃতি বর্ষ-বহুজাত পলুর ডিমের ন্যায় ৬০°-৮০° ডিঃ কাঃ তাপে খোলা বাগোয় রাখিয়া দিলে দুই তিন দিনের মধ্যেই ফুটিয়া থাকে; সুতরাং আমাদের দেশে এই ডিমগুলি ফুটাইয়া লইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না।

ডিমগুলি ঠাণ্ডা স্থান হইতে ৪।৫ মাস পরে কিন্তু ১০।১১মাসের মধ্যে আনিলে নষ্ট হয় না; কিন্তু ঠাণ্ডাতে ১২ মাসের বেশী রাখিলে ভ্রূণগুলি কিছু নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং শীতে ডিমগুলি ৪।৫ মাস রাখিয়া যে কোনও সময় অল্প পরিমাণে ৩।৪ বা ততোধিক বার আনাইয়া লইয়া পালন করা যাইতে পারে। একবারে সবগুলি একসঙ্গে আনাইয়া লইলে প্রায় দুই তিন দিনের মধ্যেই সবগুলি ফুটিয়া যায়। ডিমগুলি শীত খাওয়াইতে না পাঠাইলে ফেব্রুয়ারী মাস হইতে দুই তিন মাস পর্য্যন্ত দুই একটি করিয়া ফুটতে থাকিবে। এই স্থানে মনে রাখিতে হইবে যে ডিমগুলি এক সময়ে না ফুটিলে পোকাগুলি প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া পালন করিতে গেলে ব্যয়বাহুল্য হয় ও অনেক দিনে যৎসামান্য গুটি পাওয়া যায়; সুতরাং যাহাতে ডিমগুলি এক সময়ে ফোটে তাহাই রেশম কীট বা পলু পালনকারীদের (রেশম চাষী) লক্ষ্য। ডিমের মধ্যস্থিত ভ্রূণগুলি ঠাণ্ডা স্থানে থাকা পর্য্যন্ত অব্যক্ত বা স্থিরাবস্থায় থাকে; কিন্তু ঐ স্থান হইতে বাহির করিয়া অল্প গরম জায়গায় রাখিলেই ভ্রূণগুলি বাড়িতে থাকে এবং ১০।১২ দিনের মধ্যেই ফুটিয়া যায়; কিন্তু একবার ভ্রূণগুলি বাড়িতে থাকিলে পুনরায় ঠাণ্ডাস্থানে রাখিয়া উহাদের বৃদ্ধি বন্ধ করা সম্ভবপর নহে, তখন ইহারা শীতে বাড়িতে না পারিয়া ডিমের মধ্যেই মরিয়া যাইবে অথবা খুব দুর্ব্বল অবস্থায় ডিম হইতে বাহির হইবে। অল্প কয়েকদিন শীত খাওয়াইয়া গরম স্থানে আনিলে ভ্রূণগুলি অব্যক্ত অবস্থায় থাকে; সুতরাং পুনরায় উহাদিগকে অনায়াসে শীত খাওয়ান যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে পলুগুলি তেমন সবল হয় না। ভ্রূণগুলি নিয়মিতরূপে বৃদ্ধি করাইয়া লইতে হইলে অন্ততঃপক্ষে চারিমাস পর্য্যন্ত ৪০°-৪৫° কাঃ ডিগ্রি ঠাণ্ডা স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। প্রয়োজনানুসারে চারি মাসের পর ইচ্ছামত কিছু কিছু ডিম কয়েকবারে বা একবারে আনিয়া ফুটাইয়া লওয়া যাইতে পারে; সুতরাং ঠাণ্ডার মধ্যে রাখিয়া দিলে যে কোনও সময় ডিম ফুটান আমাদের হাতে।

এই জাতীয় পলুর ডিমগুলি পাড়ার সময় হরিদ্রাযুক্ত শ্বেতবর্ণের হয় কিন্তু দুই তিন দিন পরেই ধূসরবর্ণে পরিণত হয় এবং এই অবস্থায় শীত অতিবাহন করে কিন্তু ফুটিবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণাভ হয়।

(২) বম্বিক্স্ টেক্ট্রার
(বড় পলু বা বড় পাট)

এই বর্ষ-একজাতীয় পলু বাঙ্গালা ও আসামে পালন করা হয়; ইহারা প্রায় সাদা অথবা হরিদ্রাযুক্ত শ্বেতবর্ণের গুটি প্রস্তুত করে এবং গুটির প্রান্তদ্বয় কিছু সূচাল হয়। বিলাতি পলুর গুটি অপেক্ষা ইহারা নরম ও নিকৃষ্ট এবং ইহাদের রেশমের পরিমাণও খুব কম হয়। এই ডিমগুলি আমাদের দেশে দুই এক দিনের মধ্যে ফোটে না কারণ বাঙ্গালায় রসনীরা ডিমগুলি শীত খাওয়াইবার জন্য শীতপ্রধান স্থানে না পাঠাইয়া বাঙ্গালা দেশেই স্ব স্ব গৃহের

হাঁড়িতে শীতের কয়মাস রাখিয়া দেয় এবং শীতাবসানে হাঁড় হইতে ডিমগুলি বাহির করিয়া ঘরেতে খোলা জায়গায় রাখিয়া দিয়া ফুটাইয়া লয়; বেশী শীত লাগাতে ডিমগুলি এক সময়ে বরাবর না ফুটিয়া ১০।১২ দিনে ফুটিয়া থাকে। এই জাতীয় গুটি হইতে নিস্তারি, ছোটপলু প্রভৃতি বর্ষবহুজাত গুটি অপেক্ষা কিছু বেশী রেশম পাওয়া যায় বটে কিন্তু ইহার ডিম এক সময়ে ফুটাইয়া লইতে পারে না বলিয়া বসনীদের এই জাতীয় রেশম কীট পালনে তেমন আস্থা দেখা যায় না।

বসনীরা উপযুক্তরূপে শীত খাওয়াইয়া লইতে পারে না বলিয়া পলু পালন করিতে ইচ্ছুক নহে যদিও এই জাতীয় প্রত্যেক গুটি হইতে বড় পলুর গুটি অপেক্ষা প্রায় দুই গুণ বেশী রেশম পাওয়া যায়। শীত খাওয়ান ডিম বসনীদিগকে বিতরণ করিলে অথবা সামান্য মূল্যে প্রথমে দিলে এই জাতীয় পলু পালনে ইহাদিগকে উৎসাহিত করা যাইতে পারে। বড় পলুর ডিম বিলাতি পলুর ডিমের মত পূর্ব্বলিখিত মতে এক সময়ে ফুটাইয়া লওয়া যায়। ইহাদের একটু বিশেষত্ব এই যে ইহাদিগকে শীত খাওয়ানের জন্য একটু কম ঠাণ্ডা যায়গায় রাখিলেও ইহারা বেশ ফোটে এবং পলুগুলিও বেশী তাপ সহ্য করিয়া ভাল রেশম উৎপাদন করে। আজকাল বাঙ্গালা দেশের খুব কম স্থানেই বড় পলু পালন করা হয়।

(৩) বম্বিক্‌স্ মেরিডিয়নেলিশ্ (মহীশূর জাতি)

এই বর্ষবহুজাত জাতি মহীশূর ও মাদ্রাসের কলিগপ অঞ্চলে পালন করা হয়; এই জাতি ঈষৎ সবুজযুক্ত শ্বেতবর্ণের গুটি প্রস্তুত করে এবং গুটির প্রান্তদ্বয় অল্প সূচাল থাকে। এই জাতীয় প্রজাপতির ডিমগুলি পাড়ার পর হরিদ্রাযুক্ত শ্বেত বর্ণের দেখায় এবং বিলাতি পলুর ডিমের মত দুই তিন দিন পরে ধূসরবর্ণে পরিণত হয় না কিন্তু ফুটিবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে বিলাতি পলুর ডিমের ন্যায় কৃষ্ণাভ হয়। ঘরের মধ্যে খোলা যায়গায় রাখিয়া দিলে এই ডিমগুলি পাড়িবার দশম অথবা দ্বাদশ দিনে ফুটিয়া থাকে; এই জাতীয় ডিমগুলিকে শীত খাওয়াইবার কোন প্রয়োজন হয় না; তবে ডিমগুলি ঠাণ্ডা যায়গায় রাখিয়া দিলে প্রায় ৩০।৩৫ দিন পরে ফোটে; কিন্তু খুব বেশী দিন ঠাণ্ডাতে রাখিলে ডিমের মধ্যস্থিত ভ্রূণগুলি নিস্তেজ হইয়া নষ্ট হইতে পারে।

এই জাতীয় পলু বিলাতি পলু অপেক্ষা অনেক কম রেশম দেয়; কিন্তু ইহা হইতে দেশীয় সমস্ত জাতি অপেক্ষা বেশী ও ভাল রেশম পাওয়া যায়। বৎসরে চারি পাঁচবার এই জাতি আমাদের দেশে সর্ব্বত্র পালন করা যাইতে পারে। বর্ষবহুজাত সকল জাতি ডিমের বিশেষত্ব এই জাতির অনুরূপ।

(৪) বম্বিক্‌স্ কৃশি (নিস্তারি বা মাদ্রাসী)

এই বর্ষবহুজাত জাতি বাঙ্গালাদেশে পালন করা হয়; এই জাতীয় গুটিগুলি হরিদ্রাবর্ণের এবং ইহাদের প্রান্তদ্বয় ঈষৎ সূচাল হয়। এই জাতি প্রধানতঃ চৈত্রমাসে ও বর্ষার সময় পালন করা হয়।

(৫) বম্বিক্‌স্ ফরটুনেটাস্ (দেশী বা ছোট পলু)

এই বর্ষবহুজাত জাতি বাঙ্গালাদেশে পালন করা হয়; ইহারা নিস্তারি অপেক্ষা কিছু ছোট গুটি প্রস্তুত করে। নিস্তারি জাতীয় গুটি অপেক্ষা ইহাদের প্রান্তদ্বয় একটু

বেশী চলন। এই জাতীয় গুটির বর্ণ শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণের হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসেই এই জাতি সাধারণতঃ বেশী পালন করা হয়।

আসামে হরুপাট বা ছোটপাট নামে যে নিকৃষ্ট জাতি পালন করা হয় তাহা বোধ হয় এই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত।

(৬) বম্বিক্‌স্ শিনেন্‌শিশ্ (চীনাপলু) এবং (৭) বুলু :—

এই বর্ষবহুজাত জাতি দুইটি বাঙ্গালায় মেদিনীপুর ও বীরভূম অঞ্চলে বেশী পালন করা হইত; কিন্তু আজকাল ইহাদের চাষ প্রায় লোপ পাইয়াছে। চীনাপলু হরিদ্রা বর্ণের ও বুলু পলু নীলাভশ্বেত বর্ণের গুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে; এই দুই জাতি পলুই ছোট গুটি প্রস্তুত করে এবং নিস্তারি ও ছোট পলু অপেক্ষা এই জাতীয় গুটি হইতে কম রেশম পাওয়া যায়।

(৮) বম্বিক্‌স্ এরাকেনেন্‌শিশ্ (নিয়া-প)

এই বর্ষবহুজাত জাতি বর্ষাতে পালন করা হয়; এই জাতীয় পলুর গুটি শ্বেতবর্ণের ও চলুহ রঙ্গের হয়। এইজাতীয় গুটিগুলি দেখিতে খুব বড় বটে কিন্তু ইহাতে রেশমের পরিমাণ খুব কম থাকে।

চীন, জাপান ও ইউরোপে বর্ষদ্বিজাত, বর্ষত্রিজাত এবং বর্ষবহুজাত জাতিগুলিও অল্প পরিমাণে পালন করা হয়। বম্বিক্‌স্ জাতীয় সমস্ত পলুর প্রধান খাদ্য তুঁত পাতা; অন্যান্য গাছের পাতা ইহারা তেমন ভাল খায় না এবং খাইতে দিলেও খুব ছোট গুটি প্রস্তুত করে; কিন্তু চীন দেশে এক প্রকার পলু আছে যাহা কুশু রেনিয়া ট্রাই লোবা হান্‌স্ গাছের পাতা খাইয়া বেশ ভাল গুটি প্রস্তুত করে; এই জাতীয় রেশমকীটের বিশেষত্ব এই যে ইহারা কীড়া বা পলু অবস্থায় তিন কলপ ছাড়িয়া গুটি প্রস্তুত করে; অন্যান্য পলুর ন্যায় চারি কলপে যায় না; কিন্তু প্রত্যেক কলপে যাইতে কিছু বেশীদিন লাগে; সুতরাং পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে অর্থাৎ পাকিতে এই দুই জাতির প্রায় একই সময় লাগে। আমি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে টোকিও ইম্‌পিরিয়াল কৃষি-কলেজে এই জাতীয় পলু পুষিয়া ভাল ফল পাইয়াছিলাম।

নিম্নলিখিত তালিকায় প্রতি দশগ্রামে কয়টি করিয়া বিভিন্ন জাতীয় গুটি (যাহা হইতে ইবে ও কলপের খোলস বাহির করা হইয়াছে) গড়ে সাধারণতঃ হয় তাহাই দেওয়া গেল। এই তালিকা হইতে প্রত্যেক জাতীয় গুটির তারতম্য বিচার করা যাইবে।

ইউরোপে পালিত বম্বিক্‌স্ মরি	২৫	বর্ষএকজাত
পুষা কৃষিকলেজে পালিত বম্বিক্‌স্ মরি	৯০	
বড় পলু	৯০	
মহীশূর জাতি	৯০	বর্ষবহুজাত
নিস্তারি	৯৫	
ছোট পলু	১০০	
বর্ষার পলু	১১০	
বুলু পলু	১৩০	
চীনা পলু	১৩৫	
আসাম জাতি	১৪০	

বিভিন্ন জাতীয় গুটির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রের প্রাকৃতিক বিশেষত্ব নিম্নলিখিত নির্ঘণ্টপত্রে দেওয়া গেল

জাতি	প্রত্যেক গুটির এক খেই সূত্রের পরিমাণ	গড়ে ৪৫০ মিটার এক খেই সূত্রের ডেনিয়ার	গড়ে ৪৫০ মিটার ১ খেই সূত্রের ডেনিয়ার	গড়ে ৪৫০ মিটার সূত্রের মধ্যে ১ খেই সূত্রের বল বা ভার-সহন-শীলতার পরিমাণ	৪৫০ মিটার সূত্রের মধ্যে গড়ে ১ খেই সূত্রের সিঁড়ি-ছাপকত্বের পরিমাণ	মন্তব্য
বিলাতি পলু বা বম্বিক্স্ মরি	৬১৪·৭০মিটার	০·১২৫	২২·০০			বর্ষএকজাত
বড় পলু	২৭১·৭০			৪৭·৭ গ্রাম	১২·৮৭মিলিমিটার	
মহীশূর জাতি	৩৪২·০০				১৫·৫০	বর্ষবহুজাত
মিস্তারি	৩০৮·৬৬					
ছোট পলু	২৮৫·৫৭ ,,			৩৮·০০	১৬·৪২	
আসাম জাতি (হল্ফ পাট)	২১১·৪০			৫০·৮০	১০·৭৭	

১ মিটার = ৩৯·৩৭ ইঞ্চি

১ ডেনিয়ার = ০·০৫ গ্রাম। ৪৫০ মিটার লম্বা এক খেই সূত্র ০·০৫ গ্রাম হইলে এক ডেনিয়ার বলা হয়।

ভারতের মধ্যে বাঙ্গালা, আসাম, বর্ম্মা, মহীশূর এবং কাশ্মীর রেশমকীট পালনের কেন্দ্রস্থল। কাশ্মীরে বর্ষএকজাত জাতি পালন হয়; এই জাতীয় ডিম স্বভাবতঃ বৎসরে একবার মাত্র ফুটিয়া থাকে এবং এই গুটি হইতে রেশমের পরিমাণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বেশী রেশম পাওয়া যায়। বর্ষবহুজাত জাতিগুলি সাধারণতঃ বাঙ্গালা, আসাম, বর্ম্মা ও মহীশূরে পালন করা হয়: এই জাতীয় গুটি হইতে খারাপ ও কম রেশম উৎপন্ন হয়। শীতপ্রধান দেশে অক্টোবর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত দারুণ শীতের জন্য গাছের পাতা ঝরিয়া যায়; সুতরাং ঐ কয় মাসে শীতপ্রধান দেশে পলু পালন করা সুকঠিন; কিন্তু এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত একই গাছ হইতে দুই-বার পাতা তুলিয়া পলু পালন করা যায়। নাতিশীতোষ্ণ দেশে প্রায় সব সময়েই তুঁত গাছের পাতা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং একই বড় গাছ হইতে বৎসরে দুইবার ও ঝোপ গাছ হইতে অন্ততঃ পক্ষে তিনবার পাতা পাওয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণ দেশে

পাতাগুলি পলুকে না খাওয়াইলে নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে তিনবার পলু পালন করিয়া লইতে পারিলে লাভ ছাড়া লোকসান হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ ভারতের অনেক স্থানে পলু ব্যবসায়ীরা কেবল পলু পুষিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করে। পলু পোষা ব্যতীত অন্য কোন কাজ ইহাদের নাই; সুতরাং ইহারা বৎসরে দুই প্রকার মাত্র পলু পুষিয়া সন্তুষ্ট হয় না। চীন-জাপান, ইতালি ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কৃষকেরা অন্যান্য কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে এবং ঐ সকল কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া পলু পালন করে; সুতরাং উহারা বৎসরে একবার মাত্র পলু পালন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে এবং কোনও কারণ বশতঃ ইহাদের পলু মরিয়া গেলেও ইহাদের তেমন ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের বসনাদের পলু একবার মারা গেলে ইহাদের অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

বাঙ্গালার রেশম শিল্পের ক্রমেই অবনতি হইতেছে। একসময়ে প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ১২৫,৩০,২৯০৲ টাকা মূল্যের রেশম বিদেশে রপ্তানি হইত কিন্তু এখন প্রতিবৎসর প্রায় ৪০,৪৫,২৮৮৲ টাকা মূল্যের রেশম বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে; অপর পক্ষে ভারতে রেশমের আমদানি বৎসরে প্রায় ৫৩,৪০,০০০৲ টাকা হইতে ৩,০০,০০,০০০৲ টাকায় উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর প্রায় ১২,০০,০০০ সের রেশমসূত্র উৎপন্ন হয় এবং ৬,৬০,০০০ সের রেশমসূত্রের বিদেশ ভারতবাসীর প্রয়োজনে লাগে। আজকাল কৃত্রিম রেশমের আমদানিও ভারতে ক্রমেই বেশী হইতেছে এবং প্রতিবৎসর ইহা বেশী পরিমাণে বিদেশ হইতে আসিতেছে। বিশেষজ্ঞদিগের মত এই যে যদি কোনও উপায়ে রেশম শিল্পের অবনতি রোধ করিয়া উন্নতি না করা যায় তবে শীঘ্রই ভারতের অনেক স্থানের রেশম-শিল্প বিলুপ্ত হইবে।

বিশেষজ্ঞদিগের মত এই যে বাঙ্গালায় রেশমকীটগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা হীনবল হইয়া কম রেশম উৎপন্ন করিতেছে। বাঙ্গালার রেশম-শিল্পের অবস্থা প্রকাশ করিবার জন্য ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যগণও উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সভ্যগণের উপদেশ অনুসারে বাঙ্গালাদেশে পূর্ব্বের মত বর্ণবহুজাত জাতিগুলিই পালন করা হইতেছে। পলুর মহামারী, মাছি এবং নীরোগ ডিমের অভাব বশতঃও এই শিল্প ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। পরিশ্রম ও খাদ্যসম্ভারের মূল্যও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং বসনীরা পূর্ব্বের মত গুটির মূল্য পাইলেও রেশমকীট পালনে এখন আর তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে না; কারণ কুলি মজুরী করিয়াও ইহারা বেশী পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে।

ভারতের রেশম-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে নূতন সবলকায় কোনও জাতি পলুর (যাহা বেশী ও ভাল রেশম উৎপন্ন করিতে পারে) প্রবর্ত্তন ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে কি প্রকারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে তাহা দেখা যাইবে।

(১) বিদেশ হইতে বর্ণএকজাত ডিম আনিয়া পালন করা।

(২) বর্ণএকজাত ও বর্ণবহুজাত জাতি লইয়া বর্ণসঙ্কর জাতি গঠন করা।

(৩) বর্ণবহুজাত জাতিগুলির মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া সবলকায় জাতি গঠন করা।

উদ্দেশ্য

কি উপায় অবলম্বন করিলে সবলকায় জাতি গঠন করতঃ রেশমশিল্পের উন্নতি করা যাইবে আমরা ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি এবং এই পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে দেওয়া গেল। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য একটি সবলকায় বর্ষবহুজাত জাতি গঠন করা যাহা নিস্তেজ না হইয়া ভাল ও বেশী রেশম উৎপন্ন করিবে।

রেশম ব্যবসায়ীরা যাহাতে উপকৃত হইতে পারে তাহা লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক পরীক্ষার ফল দেওয়া হইয়াছে ও আলোচনা করা হইয়াছে।

পরীক্ষাকালে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অনুসরণ করা হইয়াছে :—

(১) বিদেশ হইতে আনীত বর্ষএকজাত জাতির সহিত দেশীয় বর্ষবহুজাত জাতির মিশ্রণে বর্ণসঙ্কর জাতি গঠন করতঃ একই পুরুষের সব ডিমগুলি বর্ষবহুজাতিতে রূপান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগকে বংশানুক্রমে পৃথক পালন করিয়া প্রত্যেক পুরুষ হইতে বর্ষএকজাত ডিমগুলি ত্যাগ করতঃ কেবল বর্ষবহুজাত ডিমগুলি পালন করা।

(২) বাঙ্গালার ও মহীশূরের বর্ষবহুজাত জাতিগুলির মিশ্রণে বর্ণসঙ্কর জাতি গঠন করতঃ পুরুষানুক্রমে পালন করা।

(৩) বিদেশী বর্ষএকজাত জাতির সহিত বাঙ্গালার জল বায়ু সহনশীল বর্ষএকজাত বড় পলু জাতির মিশ্রণে বর্ণসঙ্কর জাতি গঠন করতঃ পালন করা। এই জাতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ভারতের আবহাওয়া প্রতিরোধ করিয়া ভাল ফল দিতে পারিবে।

(৪) আমরা প্রতিবৎসর বর্ষএকজাত জাতির ডিম বিদেশ হইতে আনিয়া শীত খাওয়াইবার জন্য উহাদিগকে পার্ব্বত্য প্রদেশে অথবা বরফের কলে ৪।৫ মাস কাল রাখিয়া ফুটাইয়া লইতেছি এবং তৎপরে উহাদিগকে বড় তুঁত গাছের ও ঝোপ গাছের পাতা খাইতে দিয়া পৃথক করিয়া পালন করতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে কি প্রকার পাতা খাইয়া পলুগুলি ভাল ও বেশী রেশম প্রদান করে এবং ঝোপ তুঁত গাছের পাতা খাইয়া ভাল রেশম উৎপাদন করিতে পারে কি না। বিশেষজ্ঞ লোকের অভাবে বর্ষএকজাত জাতির ডিম ভারতবর্ষে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় হইতে অনেকবার বিদেশ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক পালন করিয়া তেমন সুফল পাওয়া যায় নাই।

(৫) কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজক দ্রব্যের সাহায্যে বর্ষএকজাত ডিমগুলি ফুটাইয়া লইয়া পালন করিয়া লওয়া যাইতে পারে কি না? এই উপায়ে ভাল ফল পাইলে ডিমগুলি শীত খাওয়াইবার জন্য শীতপ্রধান স্থানে অথবা বরফের কলে না পাঠাইয়া ঘরে কম খরচে ফুটাইয়া লওয়া চলিতে পারে।

(৬) দেশী বর্ষবহুজাত জাতিগুলির নির্ব্বাচন প্রণালীর দ্বারা উন্নতি সাধন করা। এই জাতীয় পলুগুলিকে বড় গাছের পাতা খাওয়াইয়া ভাল ফল পাওয়া যায় কি না? এই স্থানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাঙ্গালায় ও মহীশূরে বড় তুঁত গাছের চাষ আদৌই নাই (পুষা কৃষি কলেজ হইতে প্রকাশিত "তুঁত রেশম শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ" দ্রষ্টব্য)।

(৭) পলুগুলি গৃহে পালন না করিয়া স্বাভাবিক উপায়ে তুঁত গাছে পালন করিলে ভাল গুটি উৎপাদন করা যায় কি না?

শ্রীমন্মথনাথ দে

মহিম্নস্তব *

আর্য্যজাতির দেবারাধনার স্তব কবচ একটী অঙ্গ, পূজারাধনকালে কিম্বা উপাসনার সময় অভীষ্টদেবতার পূজার অনন্তর জপ ও স্তবের প্রথা শাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। সম্প্রতি ঋষি-মহর্ষি প্রভৃতির প্রণীত বহুসংখ্য দেবতার স্তব ও কবচ পাওয়া যায়। এই ভিন্ন অতি প্রাচীনকাল হইতে বিবিধগ্রন্থ-প্রণেতৃগণ গ্রন্থের আরম্ভে এবং অবসানে স্ব স্ব অভীষ্টদেবতার স্তব পূর্ব্বক শ্লোক লিখিয়া থাকেন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম স্তবনীয় দেবের স্বাভাবিক গুণবর্ণনা, দ্বিতীয় দেবতায় আরোপিত গুণ-বর্ণন।

এতাদৃশ স্তব কবচ দ্বারা সাধকের মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি ও অভীষ্টদেবের বিশেষ তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক স্বীয় মনের অভিলাষ পূর্ণ করা। মানসিক স্তব ও বাচনিক স্তব—এই উভয়বিধ স্তবদ্বারা সাধকের হৃদয়ে দেব-ভাবের বিকাশ হইয়া শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়। স্তব ও কবচ নানাবিধছন্দে নিবদ্ধ; সুমধুর সংস্কৃত স্বরে উচ্চারিত হইলে পাঠক এবং শ্রোতৃবর্গের মানসিক কালিমা, চাঞ্চল্য, অবসাদ প্রভৃতি যুগপৎ বিদূরিত করিয়া ঐশভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়।

স্তবসমূহের মধ্যে শ্রীশিবের আরাধনায় মহিম্নস্তব অতি প্রসিদ্ধ। 'মহিমন্' এই শব্দ মাহাত্ম্য অর্থে ঋগ্ ও যজুর্ব্বেদের সূক্তে একাধিকবার উক্ত আছে। অতএব মহিমন্ শব্দ খুব প্রাচীন যে তাহাতে কোন সংশয় নাই। সাধারণতঃ শিব পূজার সময় সম্পূর্ণ স্তোত্র আবৃত্তি করিতে না পারিলে অন্ততঃ প্রথমে তিনটী স্তব অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, কোটালিপাড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থলে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই শিবপূজান্তে এই স্তব বিশেষ ভাবে পাঠ করেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা শ্রীভগবদ্ বিষয়ে একাগ্রতা এবং পরম শান্তিলাভ করেন। দক্ষিণাপথ ও মহারাষ্ট্রদেশে মহিম্ন-স্তব সহযোগে শতরুদ্রী বা রুদ্রাধ্যায়, শিব পূজার সময় পাঠ করেন।

আমাদের দেশে অনেক পণ্ডিতের ধারণা আছে যে, 'রুদ্রাধ্যায়' (শতরুদ্রী) কেবল যজুর্ব্বেদীয়বৃষোৎসর্গেই পাঠ করিতে হয়। কিন্তু দক্ষিণাপথ ও মহারাষ্ট্রদেশে (আমাদের) শ্রীদেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর ন্যায় রোগে, বিপদে, ত্রিবিধ উৎপাতে (দিব্য, আন্তরীক্ষ, ভৌম) গ্রহদোষে, শান্তি স্বস্ত্যয়নে 'রুদ্রাধ্যায়' পাঠ করা হয়। এই বিষয়ে রুদ্রাধ্যায়ের ভাষ্য-ভূমিকায় শাস্ত্রীয় নানা প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীমৎ সায়ণ, মহীধর, ভট্ট ভাস্করাচার্য্য তাহার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছেন। প্রতীচ্য দেশীয় কোন কোনও পণ্ডিত শিবকে অনুয়ের উপাস্য দেবতা বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রী, বেদান্ত

* এপ্রিল মাসের 'সরস্বতী' (প্রসিদ্ধ হিন্দী মাসিক পত্র) হইতে কোন কোন বিষয় এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

দর্শনের শৈবভাষ্য, শিবার্কমণি দীপিকা, শিবতত্ত্ববিবেক, শিব রহস্য, কৈবল্যোপনিষৎ, সূত ও ঈশান সংহিতার ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের গূঢ় আশয় না জানাই হেতু। যাঁহারা চিন্ময়ী পরমাশক্তি জগদম্বার মাহাত্ম্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বঙ্গের মুদ্রিত সাতটী টীকাসহ দেবী মাহাত্ম্যচণ্ডী, দুর্গোপাসন কল্পদ্রুম, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত "প্রপঞ্চসার, লক্ষ্মণাচার্য্যের সারদা তিলক, তন্ত্ররাজ, দেবী-ভাগবত পাঠ করা উচিত মনে করি।" দেব আরাধনায় সিদ্ধ ও ফলার্থী আর্য্য ভক্তগণের ধারণা—'মহিম্ন স্তব' দ্বারা শ্রীশঙ্কর অতিশয় প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত পূজা আরাধন সময়ে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত স্তব পাঠ করা হয়। ইহা অতি প্রাচীন সংস্কৃতে সন্নিবদ্ধ ও রচিত হইয়াছে। এমন কি পৌরাণিক সংস্কৃত ভাষা হইতেও প্রাচীন সংস্কৃতে লিখিত এবং 'শার্দ্দূল বিক্রীড়িত' ছন্দঃ দ্বারা গ্রথিত। ইহা যেমন ভাবগম্ভীর, তদ্রূপ বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য গ্রথিত। ইহা যে কেবল বৈষ্ণবগণের পাঠ্য তাহা নয়। ভক্তিসুধার্ণব ভাগবতের ন্যায় বৈষ্ণবগণেরও পাঠ্য। স্তবের সপ্তম শ্লোকে সকল সম্প্রদায়, সকল দার্শনিক এবং সর্ব্ব শাস্ত্রের সার ও তাহার একমাত্র প্রতিপাদ্য যে জগদীশ শ্রীভগবান্ তাহা অতি বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এই তত্ত্ব ফরিদপুর জেলার বৈদিক শ্রেণীতে লব্ধজন্মা নানা শাস্ত্র বিশারদ বঙ্গের প্রধান-বেদান্তী শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়, শিব ও বিষ্ণু পক্ষে স্বীয় বিশেষ পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যায় সুব্যক্ত করিয়াছেন, এবং সকল শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'প্রস্থান-ভেদ' করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীমৎ সরস্বতী মহোদয়ের ব্যাখ্যায় শিব ও বিষ্ণু প্রতি শ্লোকে যেন বর্ণিত হইয়াছেন এইরূপ বুঝা যায়। অতএব তদীয় ব্যাখ্যা উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার সামগ্রী। তিনি ব্যাখ্যারম্ভে বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল আচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তিনি তাঁহাদেরই উক্তি সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র'। অনেকে বলিয়া থাকেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এমন সকল গীতার সারাংশ স্বরূপ একটী শ্লোক আছে তদ্রূপ মহিম্ন স্তবেরও সারাংশ এই শ্লোকটী। গীতার সারাংশ শ্লোক "মৎকর্ম্মকৃদ্ মৎপরমঃ" ইত্যাদি। মহিম্ন স্তবের সারাংশ 'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগ' এই শ্লোকটী, ইহারই ব্যাখ্যার নাম সকল শাস্ত্র সারাংশ "প্রস্থান ভেদ"।* স্তবের ব্যাখ্যাতা সরস্বতী মহোদয়কে দক্ষিণ-ভারত ও উত্তর ভারতের লোকে তদ্দেশীয় মুনি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আমি প্রস্থানভেদের ব্যাখ্যায় তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত অচিরে বাহির করিব। স্তবের হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সরস্বতী মহোদয় টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—'কোন এক গন্ধর্ব্বরাজ, অনৈক নরপতির প্রমোদ-কেলি-বনের মনোহর কুসুমাবলি প্রতিরাত্রে প্রহরী সত্ত্বেও অলক্ষিত ভাবে অপহরণ করিত। রাজা বিশেষ অনুসন্ধানে ও দৈবজ্ঞ দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বে শিব নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিয়া রাখিতে অনুমতি দিলেন। তৎপর দিবস রাত্রিতে যে সময় গন্ধর্ব্বরাজ ফুল অপহরণ করিতে আসেন সে সময় শিব-নির্ম্মাল্যে তদীয় পাদস্পর্শ জনিত অপরাধে তিনি খেচরত্ব হারাইয়া যাওয়াতে প্রতিহারী দ্বারা চৌররূপে

* 'পন্থা' ১৩২০—২১ দ্রষ্টব্য।

আবদ্ধ হইয়া কারাগৃহে নীত হন। কারারুদ্ধ গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় শিব-নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন-জনিত অপরাধে খেচরত্ব হারাইয়া যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়া কারামুক্তি ও অপরাধ পরিমার্জ্জনার নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিতে থাকেন। ইহাই পুষ্পদন্ত-গন্ধর্ব্বরাজের মহিম্নস্তব। এই স্তব সমাপ্ত হওয়ার পর পুনর্ব্বার তাঁহার খেচরত্ব লাভ হয়, অনন্তর অলক্ষিত ভাবে আকাশপথে চলিয়া যান।" ইহার পরের বাণি টীকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মহিম্নস্তব শ্রীওঙ্কার নাথ শিবের মন্দিরের নিকট অমরেশ্বর নামক মহাদেবের মন্দিরে ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথের নর্ম্মদানদীর দক্ষিণপার্শ্বে উক্ত অমরেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দির বর্ত্তমান। ইহার সমীপে উত্তর দিকে অপর তীরে ওঙ্কার নাথের মন্দির। সম্প্রতি সেই দেশীয় কেহ কেহ এই মন্দিরকে 'মমলেশ্বর নাথের মন্দির'ও বলিয়া থাকে। এই স্থান মালবদেশের মধ্যে পরিগণিত। মহারাজ ইন্দোরাধিপতি হোল্‌কারের ষ্টেট্ রেলওয়ের মোরটক্কা নামক একটী ষ্টেসন আছে। এই মোরটক্কা ষ্টেসন হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্বে নর্ম্মদা নদীর পার্শ্বদেশে এই স্থান বিদ্যমান। এইখানে নর্ম্মদা নদীর উপর এক বিশাল সেতুও বিদ্যমান রহিয়াছে। অমরেশ্বর এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ অতিশয় রমণীয় দৃশ্যে পরিপূর্ণ। তথা হইতে নৌকারোহণে পার্শ্ববর্ত্তী দৃশ্য সকল অবলোকন পূর্ব্বক, যাত্রিগণ ওঙ্কারনাথ দর্শনে যাইয়া থাকেন।" উক্ত সুরম্য মন্দিরের মধ্য স্থানে সভামণ্ডপের মধ্যে একটী ছোট প্রকোষ্ঠ আছে। এই স্থান অনেক সময় অন্ধকারে আবৃত থাকে। প্রাতে যে সময় সূর্য্যোদয় হয় সেই সময়ে ভিতের এক আধ্ স্থানে আলোকিত হয়। এই সূর্য্যালোকে বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখিলে বুঝা যায় যে, যেন ভিতের মধ্যে কিছু লেখা আছে। ইহাতে মহিম্ন স্তব (১) অমরেশ্বরের অষ্টক (২) হলায়ুধ প্রণীত মহাদেব অষ্টক (৩) নর্ম্মদাষ্টক (৪) খোদিত আছে। উক্ত স্তব সমূহের নীচে সম্বৎ ১১২০ শকাব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে। বোধ হয় মন্দির নির্ম্মাণের সময়ে স্থপতি দ্বারা উল্লিখিত শ্লোক সকল ভক্ত ও দর্শনার্থিদের যাহাতে প্রবেশকালে দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং পাঠ করিতে পারে এই ভাবে খোদান হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী সভামণ্ডপ, যাহা মহারাণী স্বর্গীয়া অহল্যা বাইর আদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মণ্ডপ নির্ম্মাণের পর হইতেই ঐ প্রকোষ্ঠে কিছু অন্ধকার হইয়াছে। যদিও মন্দিরের ভিত্তিতে কোনও রাজা, মহারাজের সময়ের উল্লেখ নাই তথাপি অনুমান করা যায় যে, উক্ত লিপি রাজা উদয়াদিত্যের সময়ে খোদা হইয়াছিল। উদয়াদিত্য পরমার বংশে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি ভোজ-নৃপতির পরে ধারা নগরীর সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, এই স্তব ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছে। কথা-সরিৎসাগরে লিখিত আছে,—পুষ্পদন্তনামক গন্ধর্ব্ব, শিবের অনুচর ছিল। এই অনুচর গোপনে শিব পার্ব্বতীর কথোপকথন শ্রবণ করাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দেন। সেই শাপে পুষ্পদন্ত মর্ত্ত্যলোকে কাত্যায়ন বররুচি নামে কৌশাম্বী (বর্ত্তমান আরা নগরী) নগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরই আকাশবাণী হয়—এই বালক শ্রুতিধর এবং বর্ষ পণ্ডিত হইতে বিদ্যালাভ করিবে। ইহারই প্রণীত মহিম্নস্তব

কিনা বলিতে পারি না। মন্দিরে মোদিত স্তব, প্রচলিত স্তবের শ্লোকাবলীর মধ্যে কতিপয় শ্লোকের পাঠের অনৈক্য দেখা যায়। তাহাতে কেবল একত্রিশটী শ্লোক আছে। স্তবের মাহাত্ম্যসূচক নয়টী শ্লোক মোদিত হয় নাই। তাহাতে অনুমিত হয় যে, পরিশেষে ঐ নয়টী শ্লোক স্তবের মাহাত্ম্য পরিচায়করূপে পণ্ডিতগণ যোগ করিয়া দিয়াছেন। পরবর্ত্তী মহোদয় উক্ত একত্রিশটী শ্লোকেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেষ নয়টীর কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। মাহাত্ম্যপরিচায়ক শ্লোকের মধ্যেও কোন পুস্তকে সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। কোথায়ও পাঁচটী, কোথায়ও সাতটী, কোথায় বা নয়টী মন্দিরের মোদিত শ্লোকাবলীর শেষে স্তবরচয়িতা পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্বের নাম উৎকীর্ণ হয় নাই। যে যে শ্লোকের শিলালিপির পাঠের সঙ্গে প্রচলিত শ্লোকে পাঠের ভেদ আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) প্রচলিত পাঠ,	শ্লোক সংখ্যা,	(২) শিলালিপির পাঠ
'গিরিশ যৎ স্বয়ং	১০ — ৩-৪	'গিরিশস্য স্বয়ং তস্যে,
'নকন্যাপ্যুরুতৈ'	১৩ — ৪-	'নকন্যা উরুতৈ'
'দৌস্থাং ঘাত্য নিভৃত'	১৬ — ৩-	'দৌস্থাং ঘাতানভৃত'
'নখলু পরতন্ত্রাঃ,	১৮ — ৪-	'নখলু পরতন্ত্রাঃ'
'দৃঢ় পরিকরঃ'	২০ — ৪-	'কৃত পরিকরঃ'
'ক্রতু ভ্রংশঃ'	২১ — ৩-	'ক্রতুঃ ভ্রেশঃ'
'দৃত ধনুষঃ'	২৩ — ১-	'ভৃত ধনুষঃ'
'নৃকরোটী'	২৪ — ২-	'নৃকরোডী'
'শ্রুতিরপি'	২৭ — ১-	'শ্রুতিরপি'
'বধিষ্ঠায়'	২৯ — ৩-	'বহিষ্ঠায়'

ইতি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ

মফঃস্বলের বাণী

১। সৌন্দর্য্য-সাধনা

প্রাচীন কাব্য ও কাহিনীতে দেখিতে পাই, রাজকন্যাগণ প্রতি দিন ফুলের মালা গ্রথন করিয়া ফুলরাণী সাজিতেন, রাজকুমারগণ ডালিয়া ডালিয়া ফুলের বাগানে লাগিতেন, মালিনীর মালঞ্চে ঘরে ঘরে কুসুম ফুটিয়া উঠিত। নৃপতিবর্গ প্রমোদোদ্যানে ফুলের মাঝে ফুলের সাথে অবসর সময় কাটাইয়া দিতেন। ঋষিপ্রাণ নরনারীগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আরাধ্য-দেবতার পূজা করিতেন, পুষ্পরেণু-বাহি-সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া দেহমন সুশীতল করিয়া দিত। কত মুনি তনয়, কত কপিঞ্জল স্বর্গের সুরভি প্রসূনে সুশোভিত

হইয়া প্রাণ মন হরণ করিত, কত শকুন্তলা পুষ্প-ভূষণে ভূষিত হইয়া স্বর্গের দেবী সাজিতেন। ফুলের সহিত মানুষের কত ঘনিষ্ঠতা, কত তন্ময়তা ছিল—শকুন্তলার অধরে ফুল্লকুসুমের সাদৃশ্য দেখিয়া ভ্রমর গুন্ গুন্ রবে শকুন্তলার অধরের পানে ছুটিয়া যাইতেছে। প্রাণের সহিত ফুলকে ভাল না বাসিলে, কুসুম ও ভ্রমরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইলে কেহ কল্পনায় এমন সুন্দর ছবি আঁকিতে পারে কি?

কিন্তু সেদিন চলিয়া গিয়াছে। জাতীয় অধঃপতনের সহিত আমাদের জাতীয়সৌন্দর্য্য-বোধশক্তিও অন্তর্হিত হইয়াছে। আজ আমাদের লক্ষ্মী নাই, তাই আমাদের বাগান নাই, বাগানে সরোবর নাই, সরোবরে কুমুদ-কহ্লার ফোটে না, হংস হংসী কেলি করিয়া বেড়ায় না, ঘরে ঘরে ফুল ফোটে না, পরিমললেহিপবনহিল্লোলে প্রাণ পুলকিত হয় না; আজ কমল নাই, হংস নাই, সুষমা নাই, প্রীতি নাই, লক্ষ্মী সরস্বতী থাকিবেন কেন? এ দেশের বড় লোকের বাড়ী যাইয়া দেখুন সুধাধবলিত অট্টালিকার দ্বারদেশে এখানে ওখানে কেবল সঙ্গীন্ ও লাল পাগড়ী, দেবালয়ের সংলগ্ন উদ্যান এখনও আছে, তাহাতে তামাকের আবাদ হইতেছে, প্রাচীন উদ্যানের প্রাচীন পুষ্পতরুগুলি প্রাচীন কর্ত্তাদের স্মরণ করিয়া দুই চারিটি ফুল, দুই চারিটি অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিতেছে—কে তাহাদের খোঁজ লয়? সব যেন লক্ষ্মীহীন, শ্রীহীন। কিন্তু এই কুঠিয়াল সাহেবের বাড়ী যাইয়া দেখুন শ্বেত সৌধ শ্যাম-লতায় শ্যামায়মান হইয়া নিকুঞ্জ ভবনে পরিণত, সম্মুখে শ্যাম দূর্ব্বাদল মখমলের ন্যায় আস্তীর্ণ রহিয়াছে, চারিদিকে ফুটন্ত ফুল, ফুটন্ত শোভা, ফুটন্ত প্রীতি। টেবিলের উপর পুষ্পাধারে পুষ্পগুচ্ছ, হস্তে, বক্ষে পুষ্পগুচ্ছ, বারান্দার প্রবেশপথে টবে টবে শ্যামসৌন্দর্য্যে প্রাণ ভরিয়া উঠে। যেখানে সৌন্দর্য্য, যেখানে প্রীতি, যেখানে প্রাণ, সেখানেই লক্ষ্মী, সেখানেই শক্তি, সেখানেই বৃদ্ধি। সাহেবদের বাড়ীতে গেলে মনে হয় যেন ইন্দ্রালয়ে, যেন স্বপ্নালোকে, যেন কোন মায়াপুরীতে বিচরণ করিতেছি আর এদেশের কোন বড় লোকের বাড়ীতে গেলে মনে হয় কি যেন নাই, কি যেন খাপছাড়া, কিসের যেন একটা অভাব রহিয়াছে!

কিন্তু সৌন্দর্য্য-বোধ কি বিলাসিতা? আমরা বাজে কাজে কত ব্যয় করিয়া থাকি, আর সামান্য দুই চারিটা লতাপাতা ফুল ফলেই কি আমাদের মিতব্যয়িতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়? বন জঙ্গলে স্বচ্ছন্দজাত কত লতাপাতা ফুল প্রকৃতি দেবীর শোভাসম্বর্দ্ধন করিতেছে—সে সমুদায় আনিতে বড় অর্থের প্রয়োজন হয় না, চাই একটু সৌন্দর্য্য বোধ, চাই একটু পরিশ্রম। আপনার বাড়ীখানা সাজাইতে প্রথমেই যা কিছু ব্যয় পড়ে, পরে সৌন্দর্য্যের রাণী লক্ষ্মী আসিয়া আপনই সেখানে অধিষ্ঠিতা হন। আমাদের দেশে কি একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে কেশ প্রসাধন প্রভৃতি বিলাসিতা, তাই এ দেশের ছাত্র সম্প্রদায় অবিন্যস্ত-কেশ, লক্ষ্মীহীন, শ্রীহীন, বৃদ্ধ বয়সেও অভ্যাস দোষ বিদূরিত হয় না; আর ইউরোপ আমেরিকার আবাল-বৃদ্ধ বনিতা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, লক্ষ্মীর বরপুত্র, তাই লক্ষ্মীও বোধ হয় তাঁহাদের প্রতি এত অনুকূল। আমাদের দেশের কোন বালক বা যুবক যদি কেশ বিন্যাসে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে তাহাতেই তাহার এক ঘণ্টা

কাটিয়া যায়, কিন্তু অন্য দেশের বালক বালিকা সৌন্দর্য্য-সাধনকে কর্ত্তব্যসাধন বলিয়া মনে করে, তাই তাহাদের কোন কার্য্যেই বিলম্ব হয় না।

স্রোতের মত জলসঙ্ঘাতের মত মানুষ মৃত্যুসাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—কর্ত্তব্যের সহস্র ক্ষেত্র উভয় পার্শ্বে প্রসারিত, বিশ্রাম করিবার অবসর ভোগের অবকাশ কোথায়? যে দেশে নিষ্কামধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, সে দেশে কি অনাসক্ত নির্ব্বিলাস ভাবে সৌন্দর্য্য-সাধন অসম্ভব? ভগবান করুন দেশে পুনরায় সুষমাদেবীর প্রতিষ্ঠা হউক, কান্তির সহিত শান্তি ফিরিয়া আসুক, সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া, আনন্দের মধ্য দিয়া এই মড়ার দেশে জীবনের স্রোত তর তর বেগে প্রবাহিত হউক।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ

২। খাইতে দাও

কোথাও বন্যা প্লাবন, কোথাও অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী প্রলয় তাণ্ডবে নৃত্য করিতেছে। সংক্রামক রোগের ন্যায় অন্নকষ্ট দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে! মহামারী হবিপুষ্ট হুতাশনের মত লোল জিহ্বা বিস্তার করিতেছে! ঐ শুন বঙ্গভূমির করুণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ—"মার ক্ষুধাহো"!

তুমি বিলাসী, স্বার্থ-মোক্ষ, বাঙ্গালী—তুমি কি দেশবাসীর এ বিপদ বুঝিতে পার? স্ত্রী পুত্র—চক্ষের সম্মুখে অনাহারে মরিতেছে—ইহাতে স্বামীর মনে, পিতার প্রাণে, যে কি কষ্ট হইতেছে—তুমি কি তা' বুঝিতে পার? ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর অনাহারে উপবাসে—কিরূপ হতাশভাবে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্ত ক্ষেপণ করিতেছে,—ঘরে বসিয়া—সুখ-লালিত তনু বাঙ্গালী—তুমি তা'কি বুঝিতে পার?

অকূল দৈব-বিড়ম্বিত দুষ্ক প্রজার জন্য, আমাদের রাজার প্রাণ কাঁদিয়াছে, কিন্তু তুমি বাঙ্গালী—তোমার প্রতিবেশীর প্রতি তোমার সে সহানুভূতি কৈ? সংবাদপত্রের তালিকায় ছাপার অক্ষরে নাম ছাপার প্রলোভনে, অন্নকষ্ট-ক্লিষ্ট কাতর মুখের উপর তুমি যে এক মুষ্টি তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছ—"যা' ইহা কুড়াইয়া লইয়া নিজের পথ দেখ।" ইহাই তোমার দান! ইহাই তোমার কর্ত্তব্য পালন! ইহাই তোমার মৈত্রী শিক্ষা!

চাঁদপুরে চাঁদমিঞা অনাহারে মরিয়াছে, মরিবার সময়ে বলিয়া গিয়াছে—"মৃত্যুতে আমার দুঃখ নাই, কেবল দুঃখ—মরিবার পূর্ব্বে একমুঠা ভাত খাইয়া মরিতে পাইলাম না!" বাঙ্গালি! বিলাস-ব্যসন-প্রিয় বাঙ্গালি! একথাটা তোমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়াছে কি? এ কি চাঁদমিঞার মুখের কথা?—ভাবিয়া দেখ দেখি—এ মর্ম্মবাণী কি বঙ্গভূমির বুকফাটা হাহাকার নয়? এক সময়ে যে শস্য-শ্যামল চির-শান্তি বিরাজিত শুভ্র বক্ষে, কমলার রত্নভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে দেশের স্বপ্নময় ঐশ্বর্য্য মরীচিকার অনুসরণ—কত রাজ্যেশ্বরের জীবনের অভিপ্রায় সাধনা বলিয়া মনে হইত, সেই কোহিনুর ও ময়ূর সিংহাসনের দেশে—আজ অন্নাভাব!

যে দেশের অতুল সমৃদ্ধি রূপসী ললনার লাবণ্য রজ্জুর ন্যায় মহম্মদ ঘোরীকে সপ্তদশবার নিজের শ্যামল অঙ্কে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল, যাহার শুভ্রবক্ষে মাসিডনীয় আলেকজাণ্ডার আপনার বিজয় কেতন প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই দেশের লোক আজ শুষ্কমুখে দু'টী অন্ন ভিক্ষা

চাহিতেছে ; তাহাদের জন্য তুমি একটুও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছ কি ?

ইংরাজ দুর্ভিক্ষ দমনের চেষ্টা করিতেছেন. দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন, প্রজাকে বাঁচাইবার জন্য যত্ন করিতেছেন, কিন্তু তুমি বাঙ্গালী—তুমি তোমার অনশনক্লিষ্ট ভ্রাতা ভগিনীর জন্য কি করিয়াছ ? তুমি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, উচ্চব্রতধারী মহৎ মনুষ্য-সমাজে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়া কেমন করিয়া দেখিতেছ—তোমার প্রতিবাসী হীন ক্ষুধার জ্বালায় দলে দলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে ? তোমার ভ্রাতা, তোমার ভগিনী, তোমার সম্মুখে অবনত মস্তকে নত-জানু হইয়া যুক্ত-করে ভিক্ষা চাহিতেছে—তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছ। ইহাই যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ?

ঐ দেখ—অনাবৃষ্টির প্রবল প্রতাপে—মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—রক্তবিন্দুর ন্যায় মূল্যবান শস্য শুকাইয়া যাইতেছে,—আবার ঐ দেখ, ঐদিকে—বন্যা প্লাবনে নগর সমুদ্রে রূপান্তরিত হইয়াছে, লোকের ঘরে অন্ন নাই, চালে খড় নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই. দেশবাসীর এ দুঃখ তুমি না বুঝিলে, বুঝিবে কে ? দাও, বাঙ্গালি ! দাও—ভাইকে এক মুঠা খাইতে দাও, দু'দিনের জন্য তোমার বিলাসিতা একটু কমাও। তোমার ১ দিনের খরচ—৫০টী জীবনকে রক্ষা করিতে পারে। দাও, বাঙ্গালি ! তোমার ভাইকে দু'টী খাইতে দাও। চাঁদমিঞার আত্মা—বঙ্গের অস্থি মজ্জায় মিশিয়া বুকুস্কার উন্মাদ তুষা ঢালিয়া দিয়া, তোমার পানে চাহিয়া রহিয়াছে, ভাই সকল ! দাদা সকল ! প্রেতাত্মার তর্পণ করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় কর ! তুমি একটি পয়সা দিলে—তাহারা একটী মোহর দান করিবে—দানের এমন মহান্ আত্মতৃপ্তি—উপেক্ষা করিও না। যেমন করিয়া পার, ভাইকে ভগিনীকে খাইতে দাও।

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ

৩। স্বদেশী ব্রত

মহান কর্ত্তব্যপালন, সময় সাপেক্ষ, শক্তি সাপেক্ষ। ক্ষীণশক্তি মানব মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বার্থসাধনার প্রবৃত্তি ভগবৎ প্রদত্ত। ভগবান সহজে তুষ্ট হন না। তাই সর্ব্ব প্রকার মহৎ লক্ষ্য সাধন জন্য মানব ব্রতধারণ করে। সতী মহেশ্বরকে পতি প্রাপ্তির জন্য স্বকীয় কোমলাঙ্গ কঠোর ব্রতধারণ করিয়াছিলেন। বেহুলা মৃতপতি সঞ্জীবিত করিবার জন্য ভেলায় অকূল সাগরে ভাসিয়াছিলেন। আজও সতী পত্নী পতির মঙ্গলার্থ কঠোর ব্রতধারণ করেন—দেশসেবক স্বার্থসাধক এমনি করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। বাঙ্গালী স্বদেশী শিল্প-উদ্ধার জন্য স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে ব্রতব্রত হইয়াছিল—সেদিন সেই ব্রতের সহিত রাজানুগ্রহ লাভে বঙ্গভঙ্গরহিতকর সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত ছিল—তাই রাজপুরুষগণ ঐ ব্রত খুব সদয় চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। কালক্রমে সে সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে, রাজ-পুরুষগণ তুষ্ট হইয়াছেন—বিভক্ত বঙ্গ জোড়া লাগিয়াছে। সাধনা আংশিকরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু মূল সাধনার সিদ্ধি হয় নাই—তাই কেহ বলেন আর কেন—এ সাধনা সিদ্ধি হইবার নহে। এস নিজেদের ভ্রম স্বীকার করিয়া লই—স্বদেশী বর্জ্জন করি—অনেকে বিনা পরামর্শে ঐ পথে পদার্পণ করিয়াছে ! কিন্তু আমরা দেখিতেছি যাহারা অসহিষ্ণু অবিশ্বাসী, আপাতলোভী ক্ষীণ দৃষ্টি তাহারাই একথা বলিতে পারে—আত্মপ্রত্যয়শীল আত্মনির্ভরশীল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন

ব্যক্তি একথা বলিতে পারেন না। তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে "ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব"—ঐ শোন বঙ্গীয় আইন-সভা-মঞ্চ হইতে একদা পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা মিঃ বেল কি বলিতেছেন—ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমরা এদেশী জিনিষ সরকারী অফিস সমূহে ব্যবহার করিব। কিঞ্চিদধিক মূল্য দিয়াও এদেশে জিনিষ তৈয়ারী করিতে প্রয়াস পাইব! কারমাইকেল কমাল এদেশেই তৈয়ারী হয়, এদেশী জিনিষ আমাদের উদারপ্রাণ মহাপুরুষ গবর্ণর বাহাদুর ব্যবহার করেন! তবে কেন বল সাধনা সিদ্ধ হয় নাই। সরকার সন্তুষ্ট হইয়াছেন—আমাদের স্বদেশীর সিদ্ধি অদূরে। কেহ বলে সস্তায় জিনিষ পাইলে বেশী দরে কেন বস্ত্র কিনিব—কথা সত্য কিন্তু প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, বৎসরে কত জোড়া কাপড় পর? শতকরা কত টাকা তোমার অধিক খরচ বাড়ে! সামান্য—অতি সামান্য। যদি বল আমি গরীব, সামান্য অতিরিক্ত ব্যয়ই বা কেন করিব?—করিবে তোমার নিজের উপকারার্থে—তোমার দেশবাসীর পেটে অন্ন যোগাইতে! ঐ যে লক্ষ লক্ষ কুলি—তোমারই ভাই ভগিনী বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী, কল্যাণ-কটন, গণেশ ক্লথ মিলে কাজ করিতেছে—ঐ যে শতাধিক কলে বঙ্গেবাসী ভ্রাতৃবর্গ মজুরী লাভ করিয়া অকাল মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি পাইতেছে উহাদিগকে কি সাহায্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে—তুমি কি কাল ঐ কুলির অবস্থাপন্ন হইয়া ঐ মিলে চাকুরীর জন্য লালায়িত হইতে পার না। বলিবে ইহাতে ফল কি। মিলগুলি বস্ত্রের উন্নতি করিতেছে না। বলি ঐ খানেই সাধনাসিদ্ধির ক্ষেত্র। যদি ভারতীয় মিল সমূহ আজ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারিত তবে তোমার সাধনার সুযোগ কোথায় থাকিত। তাহারা যে তোমাদের অজ্ঞাতে বহুদিন ত্যাগ স্বীকার করিয়া বস্ত্র পরের জড়াইয়া মিলগুলি রক্ষা করিয়াছে তখন তুমি কাল নিদ্রায় বিভোর ছিলে, আজ তুমি দু এক আনা ক্ষতি স্বীকার করিতে পার না?

কিন্তু তোমার সাধনার জন্যই আজ এই অবস্থা। আজ কাপড় জোড়া প্রতি ৵০ আনা চার আনা ত্যাগ স্বীকার করিলে ভগবানের দয়া হইবে এবং রাজপুরুষগণেরও একটা ভাবিবার বিষয় হইবে—ভগবান রাজপুরুষদিগের প্রাণে একটা সদয় ভাব আগ্রত করিয়া দিবেন। অদূরে তাহারই লক্ষণ সুস্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়াছে। ঐ লাট কাউন্সিলে ভারতীয় বস্ত্রশুল্কের রহিতকর প্রস্তাব উপস্থিত করা হইতেছে—বিলাতের অষাধ-বাণিজ্য-নীতির সংকোচন আরম্ভ হইয়াছে—ঐ জাপানী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছে। আমরা বলি আর একটু দৃঢ় হও, একটু সহিষ্ণু হও—একটু সাধনশীল হও। তুমি কি শুন নাই সাধন বলে প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি তৈলঙ্গ স্বামীর ইঙ্গিতে সচলা হইতেন।

সামান্য কিছু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে অর্থের তুমি নিত্য অপব্যবহার করিতেছ—বিলাস ব্যসনে ব্যয় করিতেছ তাহার সামান্য অংশ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কল্পে ব্যয় করিতে পার না? ধিক্ তোমাকে!

তুমি জান এই স্বদেশী শিল্পোদ্ধারের উপর তোমার জাতীয় জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। তুমি একথা বুঝিয়াছিলে—তুমি তাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলে—আজ তুমি সে প্রতিজ্ঞা ভুলিলে তুমি আত্মপ্রবঞ্চক হও।

পর প্রবঞ্চকের মুক্তি থাকিতে পারে—আত্ম-প্রবঞ্চকের মুক্তি নাই। কবি বলিয়াছেন

To thy own self be true—

তোমার আত্মার নিকট তুমি সত্যবাদী হও—আমাদেরও আজ সেই প্রার্থনা। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভুলিবে কেন?—ভঙ্গ করিবে কেন। মানুষ তাহা করিতে পারেনা। তুমি কি মানুষ নও? সত্যবাদী হও—দেশবাসীর প্রতি সদয় হও দেশ সেবক হও—মাতৃ সেবক হও। স্বদেশী ব্রত ত্যাগ করিও না।

বরিশাল-হিতৈষী

৪। মানবের লক্ষ্য

মানবের লক্ষ্য কি?—এই ভূমণ্ডলে যে ১৬২ কোটিরও অধিক মানব জীবলীলায় রত আছি, আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য কি? আমরা সকলেই যাহা পাইয়াছি তাহাতে তৃপ্ত নহি, আর কিছু চাহি। কি চাহি, কেন চাহি? আমার যখন মনে হয় যে আমা হইতে আমার প্রতিবেশী অধিকতর সুখী তখনই আমি তাঁহার মতন হওয়ার বা তাঁহার পথে তাঁহাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করি। ইন্দ্রিয়নিচয়ের প্রয়োচনায় সমগ্র মানবসমাজ এইরূপেই চলিতেছে:—এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে, এক সমাজ অন্য সমাজকে, এক জাতি অন্য জাতিকে পরাস্ত করিবার জন্য কত ব্যগ্র। আধুনিক শিক্ষা ইহাকে উন্নতির লক্ষণ কহে। কিন্তু এই উন্নতি কিসের জন্য, ইহার পরিণতি কতদূরে গিয়া দাঁড়াইবে কেহ ভাবিয়া দেখিতেছি কি? উন্নতির প্রবাহ দাঁড়াইবে,—একথা বলিলেও বর্ত্তমান নীতি অনুসারে পাপ হয়। কারণ, তন্মতে ক্রমোন্নতিই জীবন্ত মানবের, জীবন্ত সমাজের লক্ষ্য।

আমি কুঁড়ে ঘরে থাকি, সুলভ ডালভাত ফলমূল খাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। আপনি আমা হইতে অধিকতর সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন,—বুদ্ধিবৃত্তি খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন; ধনধান্যে গৃহ পূর্ণ হইল, দ্বিতল ত্রিতল সৌধ নির্ম্মিত হইল, সর্ব্বদিকে আমা হইতে উন্নত-প্রণালীতে বিষয়সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী অপর একজন আপনাকে অতিক্রম করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। এই ব্যক্তির গত স্বাচ্ছন্দ্যলাভের ইচ্ছা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ক্রমে সমাজগত ও জাতিগত হইয়াছে। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৈষয়িক উন্নতির চিত্র ইউরোপেই সম্যক্ ফুটিয়াছে। এক এক যুগের সঞ্চিত কল কৌশল কূটবুদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যে আজ একজন প্রাধান্যলাভ করিলেন, তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিবার জন্য আর একজন অভিনব কল কৌশল উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, রাজনীতির সমাজনীতির নূতন চাল খেলিতে লাগিলেন। সেই সমস্তের সাহায্যে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিকে পশ্চাতে ফেলিয়া মহগর্ব্বে প্রমত্ত হইলেন, তাঁহার প্রতাপে ধরিত্রী কম্পিত হইয়া উঠিল,—অপর দুর্ব্বল জাতিসমূহকে অসভ্য বর্ব্বর ইত্যাদি আখ্যা দিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কার্য্যগুলিকে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান গবেষণা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া মনোরম সাজে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে একে অন্যকে পদতলে ফেলিয়া তদুপরি উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই কি মানবের লক্ষ্য?

পাশ্চাত্য জগৎ এই লক্ষ্যে ছুটিয়াছে; কিন্তু এযাবৎ কখনও তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছে কিনা তাহার প্রমাণ নাই।

এইরূপ অনির্বাণ পিপাসা, এই মর্ম্মশোষনকর অতৃপ্তি কি মানবের লক্ষ্য হইতে পারে? যাহা পাইলে শান্তিলাভ করিব, তাহা পাই নাই বলিয়াই এই অতৃপ্তি। সুতরাং বুঝিতে হইবে যাহাতে এই অতৃপ্তি, এই পিপাসা বাড়িতেছে তাহা মানব প্রাণের লক্ষ্য নহে। যতদিন লক্ষ্য স্থির না হইবে ততদিন আমরা সকলেই অতৃপ্ত অন্তরে ছুটাছুটি করিব। কাড়াকাড়ি, কাটাকাটি, মারামারি করিয়া জগৎকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিব।

ঐরূপ অতৃপ্তির তাড়নায় একদিন ভারতের প্রাণ যখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তখন গভীর নির্ঘোষে আদেশ হইল:—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি রিপুগণের ধর্ম্ম অনুসরণ করিও না, তাহাদের ধর্ম্মের সেবা যতই করিবে ততই তোমার পিপাসা বাড়িবে। তৃপ্তি যদি চাও, শান্তি যদি চাও সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও।' এই 'আমার শরণ' লওয়া কিরূপ? ডাকাতির সফলতার জন্য ডাকাতেরা কালীমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে, হত্যাকারী লক্ষ্মীনারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া আইন আদালতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করে, ধূর্ত্তেরা অন্যকে প্রবঞ্চনা করে। এইরূপ শরণে কি আত্মারামের শরণ লওয়া হয়?

স্বচ্ছন্দ ভোগবিলাস ও পোষাক পরিচ্ছদ পরিধানেও সে তৃপ্তিলাভ ঘটে না। এখন পোষাক পরিচ্ছদ দ্বারাই আমরা ভগবানের শরণ লইবার চেষ্টা করি। বাহিরেও পোষাক, ভিতরেও পোষাক। বর্ত্তমান যুগের বাহিরের পোষাকগুলি উৎকট কৃত্রিমতায় জড়িত, ভিতরেও জ্ঞানের নামে কৃত্রিম পোষাকে অন্তর ঢাকিয়া ফেলিয়াছি। সে সব উদ্ঘাটন করিয়া আত্মারামের খোঁজ লওয়া আজ কাল বড়ই দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং শান্তি তৃপ্তি পাইব কিরূপে? যতদিন লক্ষ্য স্থির না হইবে, যতদিন অন্তিম লক্ষ্যে না পঁহুছিব, ততদিন এই অশান্তি অতৃপ্তি লইয়া কাটাইব।

জ্যোতিঃ

৫। জাতীয় জীবন

বাঙ্গালী আজ জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে কিন্তু দেশের জীবনটা কোন্ স্থানে অবস্থিত তাহার অনুসন্ধান আজও পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। দুই হাত ও দুই পা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষ হওয়া যায় না। মনুষ্যত্ব একটী স্বতন্ত্রগুণ বা ধর্ম্ম এবং আত্মচেষ্টায় ইহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ সাধন হইয়া থাকে। সমাজের বা জাতির যে শ্রেণীতে যে পরিমাণে এই আত্মচেষ্টা শক্তি বা মনুষ্যত্ব আছে, জাতীয়তা সংস্থাপনে সেই শ্রেণীই ততটা সহায়তা করিয়া থাকে। এই আত্মশক্তির বিকাশেই মানুষের মনুষ্যত্ব। ইউরোপের এই "আত্মশক্তি" বিকশিত হইয়াছে সুতরাং সে আজ বসুন্ধরা উপভোগ করিতেছে। আমাদের ইহা নাই তাই আমরা পশুর অপেক্ষাও ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছি।

ইংরাজীতে একটী কথা আছে "The Nation lives in cottages" দরিদ্রের পর্ণকুটীরেই জাতির বাস। কথাটী খাঁটী সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার পুরোহিত সাজিয়াছেন, বক্তৃতা-মঞ্চে বা সংবাদপত্রের স্তম্ভে এই নীতি বাক্যটীর সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে যে সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ রাখিয়া তাঁহারা কাজ করেন এরূপ বোধ হয় না। আমাদের নেতৃবৃন্দ এখনও অভিজাত

সম্প্রদায়ের আপাতমনোহর চাকচিক্যের প্রভাব এড়াইয়া দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জাতীয়তার সন্ধান করিতে অভ্যস্ত হন নাই। এবং সেই জন্যই আমাদের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ জীবনী শক্তির অভাবে দিন দিন ক্ষীণবল এবং অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে।

জাতীয়তা সংস্থাপনে জমিদার সম্প্রদায়ের কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে সন্দেহ নাই, বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে জাতীয় শরীরের কোনও অঙ্গের প্রতি অমনোযোগী হইলে আমাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না। কিন্তু অঙ্গ বিশেষের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ ও যে স্থলে জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, তৎপ্রতি অবহেলা করিলেও চলিবে না। আমাদিগকে দেখিতে হইবে সমাজের কোন শ্রেণীর মধ্যে মনুষ্যত্ব বলিতে আমরা যাহা যাহা বুঝি সেই সেই সমস্ত গুণের সম্যক্ বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস ইহার একই উত্তর প্রদান করিতেছে যে জনসাধারণের হৃদয়েই জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত এবং যে দেশের জনসাধারণ যত উন্নত, যত আত্মপ্রতিষ্ঠ সে দেশ তত উন্নত ও তত সভ্য। কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময়েই জনসাধারণের কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই। সব কাজেই আমরা জনসাধারণের সহানুভূতি না চাহিয়া জমিদার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকি। অনেক সময়ে ইহাতে আমাদের আশা যে পূর্ণ হয় না তাহা নহে কিন্তু এইরূপ ভিক্ষা দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্মেষ সাধনও সম্ভবপর নহে।

যে আত্মনির্ভরতা গুণ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় আমাদের জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার সম্যক্ বিকাশ দেখিতে পাই না এবং তাঁহারা সাধারণতঃ যে ভাবে ও যে অবস্থাতে থাকেন, তাহাতে ঐ শক্তির বিকাশ হওয়া অধিকাংশ সময়েই সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালার জমিদার শ্রেণীর প্রায় ষোল আনাই আজ ঋণভারে প্রপীড়িত। এতদ্দ্বারা কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে আমাদের জমিদার সম্প্রদায় সর্ব্ববিষয়েই পরনির্ভরশীল ও হিতাহিতের বিচারে অক্ষম। সুতরাং জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা কার্য্যে জমিদারের সাহায্য দ্বারা আমাদের বিশেষ কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই তবে যদি কোনও শিক্ষিত আত্মনির্ভরক্ষম জমিদার সৌভাগ্যের বিষয় বাঙ্গালা দেশে আজও এমন ২।১ জন জমিদার বর্ত্তমান আছেন) আমাদের মাতৃপূজার পৌরোহিত্য করিতে অভিলাষী হন, তবে আমরা সানন্দে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইব। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে, যেখানে মানুষ নিয়ত দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও আত্মশক্তির প্রভাবে উন্নতির দীর্ঘস্থানে আরোহণ করিতেছেন সেই খানেই আমাদিগকে জাতীয় জীবনস্রোতের মূল উৎস অনুসন্ধান করিতে হইবে। বড়লোকের কৃপাদত্ত অনুগ্রহে তৃপ্তিসাধন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিলে জাতীয় যজ্ঞের উদ্‌যাপন হইবে না, আমাদিগকে দরিদ্রের নিয়হস্কার যত্নপ্রদত্ত শাকান্ন ভোজনেই গৌরবানুভব করিতে হইবে।

যাঁহারা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন, শিক্ষার দোষে সেই নীরন্ধ্র কর্ম্মীদের প্রতি এতদিন আমরা যথোচিত সম্মান করি নাই কিন্তু এখন হইতে করিতে হইবে। আমরা লেখা পড়ার বড়াই করি কিন্তু ইউরোপ

কি ভাবে আজ বড় হইয়াছে ও হইতেছে প্রত্যক্ষ অনুভব দ্বারা তাহা আমরা জাতীয় জীবনে সম্যক অনুষ্ঠান করিতে পারি না ইহাই আমাদের দোষ। ইংরাজেরা যাহারা লিপ্টনের ভূয়সী প্রশংসা করেন আর তাঁহাদের দেখা দেখি আমরাও শতমুখী হই। কিন্তু আমাদের হতভাগিনী চিরদুঃখিনী জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে যে শত শত লিপ্টন ছিলেন এবং এখনও আছেন, তাঁহার কোনই খোঁজ খবর রাখি না। চা-ব্যবসায়ী লিপ্টন ও ঔষধব্যবসায়ী লালমোহন সাহা ও বটকৃষ্ণ পালে কি প্রভেদ আমরা জানি না। সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্মানিত হইবার পূর্ব্বে দেশের লোকের কাছে মার্টিন কোম্পানীর বড় বাবু নামেই পরিচিত ছিলেন! নলিন বিহারী সরকারের নাম কয়-জন জানে? বিলাতী জুতাওয়ালা ডসনের নামে আমরা ভক্তিভরে প্রণত হই কিন্তু কে, এম, দাস আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ হেতু চিরকালই ঘৃণিতই রহিয়া গেল! এইরূপে কখনই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না ইহা সুনিশ্চিত।

ঐরাজ

৬। এ যে প্লাবন নয়—পাবন

মা শিশুর হাতে একটী খেলনা তুলিয়া দিলে, শিশু তাহা লইয়া খেলিতে খেলিতে মা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে;—খেলায় এতই মত্ত হইয়া যায় যে, মার কথা আর মনে পড়ে না। কিন্তু হঠাৎ যদি খেলনাটি হাত হইতে ফস্কিয়া যায় তাহা হইলেই সে পেছন দিকে মায়ের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠে—তখন মাকে মনে পড়ে খেলার ধাঁধা ছুটিয়া যায়।

আমরাও সংসারে আসিয়া ধন, জ্ঞান, কুলমান, বিদ্যাবিভবের কৃত্রিম খেলায় মত্ত হইয়া, আপনা আপনি শত ধাঁধার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আটকা পড়িয়া যাই,—তাঁহাকে আর মনে থাকে না। আমরা ধনী দরিদ্র, ছোট বড়, উচ্চ নীচ, ইতর ভদ্র ইত্যাদি প্রভেদ জ্ঞান লইয়া একটা "সমাজের" সৃষ্টি করি; দলাদলি, হিংসা দ্বেষ ও ঈর্ষা নিন্দার কলঙ্কে ইহাকে কলুষিত ও আবর্জ্জনাময় করিয়া তুলি। এই-রূপ যখন আমরা আমাদেরই অন্যায় ও উদ্ধত আচরণে সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যটী পণ্ড করিয়া দেই, তখন সেই চিরমঙ্গলময় বিধাতা অতি ভীষণ আকস্মিক আঘাতে আমাদের তুলের ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল-তার শাস্তি বিধান করেন

এই বিরাট বন্যাবিপ্লবে আমরা এই নৈতিক শিক্ষাটুকু লাভ করিয়াছি।—কি দেখিলাম! এ কি দৃশ্য?—এ কি ভীষণ, একি সুন্দর? দৃশ্যটী একদিকে যেমনি ভীষণ, অন্যদিকে তেমনি সুন্দর! একদিকে চাহিয়া দেখ—প্রলয় পয়োধি ভীষণ হুঙ্কারে সব গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, জলরাশি গভীর গর্জ্জনে প্রাণে আতঙ্ক তুলিয়া রাস্তাঘাট ভাঙ্গিয়া, ঘর দরজা, গাছ বাঁশ ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে,—বালবৃদ্ধ যুবা নরনারী গো মহিষ ইত্যাদি প্রাণি মাত্রেই যেন মহাকালের করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্ত্তনাদ করিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া পলাইতেছে! আবার অন্য-দিকে দেখ—কি সুন্দর দৃশ্য; কি বিরাট তীর্থক্ষেত্র;—ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, স্ত্রী পুরুষ একত্র সম্মিলিত। আজ হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টিয়ান একই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমভাবে সমস্বরে একজনের উপাসনায় প্রবৃত্ত —সম্মুখে অনন্তকায় বিপুল সমুদ্র, প্রান্ত-ভূমিতে বিরাট তীর্থক্ষেত্র, আজ আমরা বংশ কুল ধন মানের তুচ্ছ গৌরব ভুলিয়া, জ্ঞান

বিজ্ঞানের অহঙ্কার পরিহরিয়া মহাতীর্থের যাত্রী সাজিয়াছি। আজ আমরা জাতিভেদ ভুলিয়া, সম্প্রদায়বিশেষত্বের ভাব বিসর্জ্জন দিয়া আমরা নানা জাতীয় লোক এক তীর্থে এক দেবতাকে ডাকিতেছি।

হে মঙ্গলময়, তুমি আজ সকল ভুল ভাঙ্গিয়াছ, প্রভো! যে ধনী তাহার রম্য হর্ম্ম্যতলে বসিয়া অর্দ্ধ পরিপুষ্ট উদরে হস্ত মার্জ্জন করিতে করিতে পথবাহী নিরন্ন ভিক্ষুকের প্রতি কটু-কটাক্ষপাত করিতেন, তিনিই আজ মুহূর্ত্তমধ্যে সেই রম্য হর্ম্ম্য ত্যাগ করিয়া পথপার্শ্বে সেই ভিক্ষুকেরই কাছে দণ্ডায়মান। যে অতি সুচিবায়গ্রস্ত পণ্ডিত হীন জাতীয় লোককে দেখিলে ছায়া-পাতভয়ে কুড়িহস্ত তফাৎ হইতে "দূর হ" "দূর হ" বলিয়া নাসাকুঞ্চন করিতেন, তিনিই আজ মুচি মেথরের সঙ্গে একই গৃহতলে অবস্থান করিতেছেন। স্বর্ণালঙ্কার ও দেহ-সৌন্দর্য্যের অভিমানে গর্ব্বিতা রমণীও আজ অর্দ্ধনগ্না অনার্য্যরমণীর সন্নিধান গমনে আপনাতে আপনি লজ্জমানা। আজ ধন, কুল, সৌন্দর্য্য, সভ্যতার অভিমান আর নাই।—আজ আমাদের বহুদিনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, অহমিকা চূর্ণ করিয়া, ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া তোমার পবিত্র আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছ, প্রভো।

আজ কি শুভদিন, কি পুণ্য মুহূর্ত্ত। না জানি কি শুভলগ্নে তোমার এই বিরাট তীর্থের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। তাই আজ ঘরে ঘরে যেমন জলের তরঙ্গ খেলিতেছে, তেমনি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমের বন্যা বহিতেছে।—আজ ধনী দরিদ্রকে, বড় ছোটকে, পণ্ডিত মূর্খকে, পুণ্যবান পাপীকে ঘৃণাবিরহিতভাবে স্নেহসম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না! আজ আমরা মহা সম্মিলনে সমবেত,—আজ মানুষ মনুষ্যত্বের সাধনা করিতে দাঁড়াইয়াছে—অপ্রেমিক প্রেমিক সাজিয়াছে, নিষ্কর্ম্মা কর্ম্মী সাজিয়াছে, কৃপণ দাতা হইয়া বসিয়াছে। আমাদের যে সকল বালক ও যুবা এতদিন "খেলার মাঠের পালোয়ান" বলিয়া কয়জনের স্নেহ গঞ্জনা সহ্য করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই আজ কর্ম্ম-বীর সাজিয়া জীবের সেবা করতঃ নিস্পৃহ-দিগকে স্তম্ভিত করিতেছে। যাহারা আজীবন লাভ ক্ষতির গণনা করিয়া কাটাইতেছে, তাহারাই আজ মুক্ত হস্তে দান করিতেছে,—যে চামচ দিয়া ভিক্ষা দিত, সে অঞ্জলি ভরিয়া তণ্ডুল বিতরণ করিতেছে। এইরূপে আজি সেবাধর্ম্মের সাধনা হইতেছে। ঐ যে স্তরে স্তরে অসংখ্য পাকপাত্রে গুপাকার অন্নব্যঞ্জন লুচি খিচুড়ি প্রস্তুত হইয়া অনবরত বিতরিত হইতেছে,—এই কাহার সেবা হইতেছে? এ তো তোমারই আহুতি দেওয়া হইতেছে। ঐ যে সহস্র সহস্র নরনারী ক্ষুৎকাতর কণ্ঠে "দেও" "দেও" বলিয়া চীৎকার করিতেছে,—ইহারা তো তোমারই যজ্ঞের সাড়া দিতেছে! তুমিই তো সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে সংস্থিতা" হইয়া অনন্তমুখে এই মহাযজ্ঞের মহাহুতি গ্রহণ করিতেছ!—এ তো তোমারই বিরাট বিশ্বরূপের বিকাশ!

জমি পুরাতন হইতে হইতে উৎপাদিকা শক্তি হারাইয়া পাষাণবৎ হইয়া পড়ে; তখন বন্যাজলে প্লাবিত হইলে বহুদিনের জমাট আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত হইয়া উর্ব্বরতা লাভ করে। আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রেরও এই অবস্থা; আমরা আমাদেরই কর্ম্মদোষে নিজ নিজ সরল নির্ম্মল শিশুহৃদয়ে নানাসামাজিক ও সাংসারিক আবর্জ্জনা জমাট বাঁধাইয়া তুলি; প্রেম-শূন্য হৃদয় ক্রমে পাষাণ কঠিন হইয়া পড়ে।

এমনি দুঃসময়ে, হে পতিতপাবন, তোমারই করুণাবারি বন্যাবেগে নানাপথে আসিয়া হৃদয়ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া সেই বহুদিনের জমাট আবর্জ্জনারাশি ধুইয়া লইয়া যায়। ধনীর ধনাভিমান, কুলীনের কুলগৌরব, রূপবানের রূপাভিমান, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা নিম্না বন্যাবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। এ যেন শুভ মুহূর্ত্তে, তোমারি প্রেমবারি প্লাবনে পবিত্রীকৃত মানব হৃদয়ে প্রেমবীজ উপ্ত হইল, হে পতিতপাবন—এই বীজ যেন আবার অঙ্কুরে বিলীন না হয়; এই বিশ্বজনীন প্রেম সাধনা, এই সেবাধর্ম্মের আরাধনা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

সুরমা

৭। মুষ্টিযোগ

ভগন্দর—হস্তিমূল, হরিদ্রা ও কেওয়ার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর ভাল হয়।

কর্ণপীড়া—শতমূল, বিড়ঙ্গ, মধুর সহিত বা ছাগলের মূত্র সৈন্ধবের সহিত, বা আকন্দের পাতা অল্প আগুনে তাতাইয়া তাহার রস কাণে দিলে কানের ভোঁ ভোঁ শব্দ করা, বা কাণ বেদনা ও পিকপড়া নিবারিত হয়।

চক্ষুরোগ—নিমপাতার রস শুঠি চূর্ণ বা বড়ই মূল ঘোলের সহিত চক্ষুতে কয়েক ফোঁটা করিয়া দিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

দদ্রু—কনকধুতুরার মূল ও সেফালিকার পাতা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া বা হরিদ্রা, হরিতাল, দূর্ব্বা, সৈন্ধব, গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া দদ্রু স্থানে প্রলেপ লাগাইলে দদ্রু আরোগ্য হয়।

কুষ্ঠ—শ্বেত অপরাজিতার মূল, বা দেশী হরীতকী, দূর্ব্বা, চাউল, আকন্দের ক্ষীর (আঠা) আইঠাকলার বাকলের ক্ষীর একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

কুষ্ঠ (ধবল)—শেটী শাকের মূল, মরিচ, পিপুল শুঠি নিম গুড়ুচি, হরীতকী সমভাগে চাউলের জলদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ধবল কুষ্ঠ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়।

অর্শরোগ—পিপুল ও হরিদ্রা গোমূত্রে বাটিয়া বা হরীতকী চিনি ও পিপুল বাটিয়া ননী মিশাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রলেপ দিলে অর্শ ভাল হয়।

প্লীহা—রক্ত চিতার মূল বড়ই (কুল) প্রমাণ লইয়া কলার মধ্যে ভরিয়া সেবনে ভাল হয়।

শোথ—কৃষ্ণতিল কাঁজির দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-শোথ আরোগ্য হয়।

ঠোঁট ফাটা—(১) রাত্রিকালে ঘুমাইবার পূর্ব্বে বাম কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা নাভিতে ও গুহ্যদ্বারে তিনবার করিয়া সরিষার তৈল লাগাইয়া ঘুমাইলে ঠোঁট ফাটা সারিয়া যায় (২) শিশিরের জলে কিয়দ্দিন মুখ ভিজাইলেও এই ব্যাধি আরোগ্য হয়।

জিহ্বা ফাটা—শনি কিম্বা মঙ্গলবারে অথবা হরগৌরী সংক্রান্তির দিনে আম্র-বৃক্ষের নিম্নে মাটীতে দাঁড়াইয়া হাতে না ধরিয়া গাছের একটী আম পাড়ি। ছাল ও আঁঠি প্রভৃতির সহিত খাইয়া ফেলিলে জিহ্বা ফাটা সারিয়া যায়। (২) সিদ্ধ চাউল একমুঠা লইয়া এমন ভাবে চর্ব্বণ করিবে, যেন ক্ষত স্থানে বেশ একটু লাগিয়া যায়। তাহার পর সেই চর্ব্বিত চাউল এমন স্থানে ফেলিবে যেন উহা কাকে খাইয়া যায়। ইহার নাম চাউলপড়া। এইরূপ চৌটকায় নিশ্চয়ই জিহ্বার ক্ষত আরোগ্য হয়। (৩) সোহাগার খৈ মধুর সহিত মাড়িয়া জিহ্বার ক্ষত স্থানে দিলেও উহা আরোগ্য হয়।

কণ্ঠক্ষত—সেফালি গাছের মূল চিবাইলে গলার ক্ষত সারিয়া যায়।

চুণে পোড়া—তৈল কিম্বা কাঁজি দ্বারা কুল-কুচা (কুলি) করিলে চুণ ভক্ষণ জন্য মুখ গহ্বরস্থ দন্তরোগ (চুণে পোড়া) সারিয়া যায় (২) খানিকটা চিনি কিয়ৎক্ষণ মুখে রাখিলে ইহা অল্প হইলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

দাঁত পড়া—শ্লেষ্মাতিরেকাদি কারণে অনেকের দাঁত পড়িয়া যাইতে থাকে। পিপুল মূল, বাকস ছাল কিম্বা হিজলের মূল বাটিয়া দাঁতের গোড়ায় প্রলেপ দিলে এই রোগ সারিতে পারে।

দন্তকণ্ডূয়ন—চলিত কথায় ইহাকে দাঁত কড়মড়ি কহে। কেহ বা নিদ্রিত অবস্থায় কেহ বা জাগিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকায় অশ্বের পুচ্ছের সাতগাছি লোম লইয়া তাহার বেণী প্রস্তুত করিয়া গলায় বাঁধিলে ইহা আরোগ্য হয়। (২) কাঁকড়ার একটী পা দুধের সহিত পাক করিয়া সেই দুধ ঘন হইলে নামাইয়া নিদ্রার্থ শয়নের পূর্ব্বে তাহা দ্বারা পদদ্বয় লেপন করিবে। ইহাতেই দন্তশব্দ দূর হইবে।

দাঁতের পোকা—বিচিকলার শিকড় কিম্বা কেশুরার শিকড় পোকা ধরা দাঁতে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে দাঁতের পোকা পড়িয়া যায়। ২। সিজের শিকড় অথবা বড় পানার শিকড় কিম্বা ক্ষিরাইর মূল চর্ব্বণ করিয়া পোকা ধরা দাঁতে লাগাইয়া রাখিলে পোকা পড়িয়া যায় বা মরিয়া যায়।

৩। বটগাছের আঠা পোকা ধরা স্থানে লাগাইলেও উপকার দর্শিয়া থাকে।

৪। রতন অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলেও উপকার হয়।

দাঁতের নালি ঘা—রতন হিং এবং আকন্দের আঠা একত্র করিয়া দাঁতের গোড়ার নালিতে লাগাইলে আরোগ্য হয় এবং পোকা থাকিলে মরিয়া পড়িয়া যায়। ২। তেঁতুল পাতা ও লবণ একত্রে বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে কথঞ্চিৎ ভালো করে বটে, কিন্তু বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রসূন

অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার

গৃহস্থ

"চাহ, চাহ, মতিমান, দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া ধায় !
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ !
মানুষের শক্তি লয়ে কাটসম ব্যর্থ কর তারে ?
বিধাতার পুণ্যদানে—দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার ?
একি···একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত !
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'। ভাসে ধরা আলোক-বন্যায় —
দুয়ারে পাখীর মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি ?"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	অগ্রহায়ণ, ১৩২২	দ্বিতীয় সংখ্যা।

আলোচনা

১। ভারতবাসীর আয়ুঃ

বিভিন্ন দেশের লোকের আয়ুর গড় পরিমাণ :—

দেশ	সাল	পুরুষ	স্ত্রী
সুইডেন্	১৮৯১—১৯০০	৫০.৯	৫৩.৬
ডেন্মার্ক	১৮৯১—১৯০০		
ফ্রান্স	১৮৯৮—১৯০৩	৪৫.৭	৪৯.১

দেশ	সাল	পুরুষ	স্ত্রী
ইংলাণ্ড ও ওয়েলস্	১৮৯১—১৯০০		৪৭.৭
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্	১৮৯৩—১৮৯৭		
ইটালি	১৮৯৯—১৯০২		
প্রাশিয়া	১৮৯১—১৯০০		
ভারতবর্ষ	১৯০১		২৪.০

পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির অধিবাসীরা গড়ে কত বৎসর বাঁচিয়া থাকে তাহার একটী তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হইল। ৪১ বৎসরের নীচে কোন ইউরোপীয় জাতির মৃত্যুর হার নাই। কোথাও কোথাও ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণের জীবনের পরিমাণ। ভারতবাসী পুরুষ গড়ে ২৩ বৎসর এবং স্ত্রীলোক গড়ে ২৪ বৎসর মাত্র বাঁচিয়া থাকে! এইরূপ শোচনীয় অবস্থা আর কোথাও নাই। আমরা যে কেবলমাত্র অল্পায়ুঃ তাহা নহে। যে ২৩টা বৎসর আমরা টিকিয়া থাকি তখনও স্বাস্থ্য, শক্তি, উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি আমাদের বড় বেশী কিছু থাকে না। রোগের বোঝা বহিয়া, পেট ভরিয়া দুই বেলা পুষ্টিকর আহার না পাইয়া আমরা এমন নির্জ্জীব হইয়া পড়ি, যে আমাদের মরা বাঁচার ব্যবধান-রেখা প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। শ্রমসাধ্য, শৃঙ্খলাসাপেক্ষ কাজ ভাল করিয়া সম্পন্ন করা ত দূরের কথা, সুস্থ দেহে দুই বেলা ভাত হজম করিয়া কায়ক্লেশে জীবনযাত্রার উপযোগী পরিশ্রম করিতেও আমরা অনেকেই কষ্ট বোধ করি। অনেকেরই কাছে জীবন যেন সুদীর্ঘ অভিশাপ, নিরবচ্ছিন্ন বেদনা। উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি মহৎ গুণগুলি আমাদের অল্পায়ুঃ লোক সমষ্টির ক্ষণভঙ্গুর দেহ আশ্রয় করিয়া তাই বাঁচিতেই পারে না। আমাদের একটা অপবাদ—আমরা যৎসামান্য লইয়াই তুষ্ট; "Divine discontent"—সর্ব্ববিধ মহৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহৎজনোচিত অসন্তোষ, মানুষোচিত দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ আমাদের নাই। উপরোক্ত তালিকা তারস্বরে বলিয়া দিবে, "যাহারা এমন অল্পায়ুঃ যাহাদের জীবনীশক্তি নিস্তেজ, তাহারা মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ প্রয়াসের দুর্ম্মূল্য দিবে কেমন করিয়া?" আমরা যে উদ্ভিদে পরিণত হইতে বসিয়াছি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর দুই একটা অসহ্য প্রবৃত্তির তাড়না ছাড়া আর কিছু আমাদের স্তিমিত চেতনায় সাড়া আনিতে পারে না।

আমরা অনেকেই হয়ত জানি না যে আমাদের আয়ুঃ গৃহপালিত জীবের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় মৃত্যুর হার জন্তুর হারের উপরে উঠিয়াছে। তাই আমরা ব্যথিত চিত্তে এই তুলনামূলক তালিকাটি আমাদের প্রিয় দেশবাসিগণের সম্মুখে ধরিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য—বাঙ্গালী জাতি তাহার অস্তিত্ব সঙ্কটে বাঁচিবার জন্য চেষ্টা করিবে কি না; বাঁচিবার জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, বাঙ্গালীর উদ্যুক্ত চিত্ত ও সামর্থ্য তাহার কঠোর সাধ-

নায় কৃতসঙ্কল্প হইবে কি না। মানুষ চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারে, মানুষের সমবেত সাধনা মৃত্যুর পরিখা দূরে সরাইয়া দিতে পারে। ১৮৩৮ হইতে ১৮৯৪ এই ৫৭ বৎসর ইংরেজ গড়ে ৩৯.৯ বৎসর বাঁচিত। এখন তাহার আয়ুর হার ৪৭.১। সুতরাং আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ৫০ বৎসরে ইংরেজের আয়ু গড়ে ৪.২ বাড়িয়াছে। ইহাতে আমরা এক মহামূল্য শিক্ষা লাভ করিতে পারি—আমরাও সমবেত এবং অক্লান্ত চেষ্টার বলে দীর্ঘজীবী হইতে পারিব। 'অকাল মৃত্যু' শীর্ষক আলোচনায় ইতিপূর্ব্বে কতক-গুলি কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দুইবেলা পেটভরা পুষ্টিকর আহারের অভাব, দেশের সাধারণ অস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব, নৈরাশ্য, আনন্দহীনতা, উচ্চ সঙ্কল্পের অভাব, বাল্যবিবাহ, বিশেষতঃ বাল্য মাতৃত্ব এবং সর্ব্বগ্রাসী দরিদ্রতা—এইগুলির প্রতিকার করিতে পারিলে তবে এই নিদারুণ অল্পায়ু সমস্যার প্রতিকার সম্ভব। মরণোন্মুখ বাঙ্গালী কি ভারতবাসীর এই মরণ বাঁচন সমস্যার কথা একবার ভাবিয়া দেখিবে না? ইহার প্রতিকারের জন্য কি আমরা এখন সচেষ্ট হইব না?

* *
*

২। চরিত্রের গাম্ভীর্য্য

আমরা বড়ই হাল্‌কা হইয়া পড়িতেছি। চরিত্রের গাম্ভীর্য্য, গভীরতা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারি বিষয়ের অবতারণা করিলে কথা বেশ জমে না, ভারি কাজে হাত দিলে প্রাণ অবজ্ঞা বোধ করে। ভারি চিন্তা মস্তিষ্কের খুলির সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিতেই পারে না। ইহা একটী গভীর দুর্লক্ষণ। ভাসা ভাসা ভাব, দেঁতো কথা, ছেঁদো গল্প, বোস আলাপ, চটুল বোলচাল প্রভৃতিতেই প্রাণ স্ফূর্ত্তি পায় কিন্তু যখনই কোনও গুরুতর গভীরতর বিষয় ভাবিবার প্রয়োজন হয়, তখন সেটী একেবারে উৎপীড়ক দস্যুর মত আসিয়া হাজির হয়। আমরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ি। কারণ তাহা আমাদের প্রাণের সুরের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ বেসুরো। আমাদের আবহাওয়া মোটেই তাহার উপযোগী নহে। এই দুর্ভাগ্যে কিন্তু আমরা ক্ষুব্ধ বা উৎকণ্ঠিত নহি। বেশ হাসিয়া খেলিয়া বকর বকর করিয়া গণ্ডগোলের মধ্যে দিন কাটাইয়া দিই। যা তা খাইয়া কোনও মতে পেট ভরাইয়া অধিকাংশ বাঙ্গালীরই যেমন পরিপাকশক্তি মরিয়া গিয়াছে, সেইরূপ গভীর ভাব ও আলোচনার সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী জাতি গভীর বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের হাল্‌কামি দেখিয়া যাঁহারা মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তাঁহারা যেন ভাবিয়া দেখেন রোগ কোথায়। ভারি বিষয়ের রচনা আমাদের জাতীয় পাকস্থলী জীর্ণ করিতে রাজি নহে। তাই 'চুটকী' আসিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। গভীরশ্বাস (deep breathing) স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। গভীর চিন্তা (deep thinking) ও মানুষের বাঁচিয়া থাকার পক্ষে সেইরূপ প্রয়োজনীয়। অবশ্য বাঁচিয়া থাকা অর্থে যদি আমরা বুঝিয়া থাকি, উদর পূরণ এবং বৎসরে বৎসরে বংশবৃদ্ধি, তবে যেরূপ ভাবে আছি তাহাই প্রশস্ত। গুরুত্ব, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতির কোনই দরকার নাই। অনেকেই বলিবেন, "কোন দেশেই বা এমন গণ্ডায় গণ্ডায় গভীর

চিন্তাময় লোক দেখিতে পাওয়া যায় ?" সেই তুলনাবিৎগণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন—"অন্য দেশের সমকক্ষ হইয়া, সব বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিবার যোগ্যতা দেখাইয়া তাহার পর এই সকল বিষয়ে তুলনা করিলেই শোভন হইবে।"

সমস্ত বিষয়ে এই হাল্‌কা ভাব বড়ই ভীষণরূপে আমাদের গভীর দিকটা অসাড় করিয়া ফেলিতেছে। যতদিন সাগর হইতে স্রোতের জল না আসিলে নদী মজিয়া যায়; তেমনি উচ্চভাব, গভীর চিন্তার জোয়ার না আসাতেই আমাদের মর্ম্মস্থান শুকাইয়া যাইতেছে। কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি আমাদের মনকে জুড়িয়া বসিয়াছে। আমরা চিত্তের অনুশীলন এবং হৃদয়ের প্রসার ভুলিয়া কেবল রূপ-রসাদিরও ভোগের মধ্যে তলাইয়া যাইতেছি, তাহার একটী প্রধান কারণ বিক্ষেপমুক্ত গভীর মনন ও ধারণা প্রভৃতিকে আমরা ঘুরে তাড়াইয়া দিয়াছি। মন যে সকল ইন্দ্রিয়ের উপরে, সে সকলের রাজা, আর সকলে তাহার ভৃত্যমাত্র—এতত্ত্ব শাস্ত্রের জীর্ণ পাতায় নির্ব্বাসিত। আমরা এখন সেই অনন্ত শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের আধার 'চিত্ত'-রাজাকে ভুলিয়া, তাঁহার চোপদার, ফৌজদার মাত্র যাহারা, সেই ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গেই চূড়ান্ত সম্পর্ক করিয়া বসিয়াছি। চোপদার, ফৌজদারের হাঁকডাক, চেঁচামেচি, দাঙ্গাহাঙ্গামাতেই আমরা মন দিই। কিন্তু আমরা কি এমন করিয়া ঐশ্বর্য্য ও মহিমা ভুলিয়া হৈ চৈ লইয়াই থাকিব? আমাদের কি ইহাই নিয়তি? এখনও আপামরের মুখে শুনিতে পাই, "আমাদেরও নিয়তি ঔদার্য্যে ও গৌরবে সমুজ্জ্বল হইবে।" যদি ইহাই আমাদের বিশ্বাস হয়, তবে আমরা যেন মনে রাখি, যেরূপ সাধনা, সিদ্ধিও ঠিক সেইরূপ হইবে। হাল্কামি কখনও মহতের রাজাসনের সাধনা নহে।

* *
*

৩। কৃষি-বিদ্যালয়

বোম্বাইয়ে ভারতবাসীর তত্ত্বাবধানে চারিটী কৃষি-বিদ্যালয় চলিতেছে। যে প্রথায় এদেশের কৃষকেরা চাষ করিয়া থাকে তাহা অতি পুরাতন। কৃষি-বিজ্ঞানে বর্ত্তমান সময়ে এই যে এত উন্নতি হইয়াছে, ভারতবর্ষের নিরক্ষর নিরন্ন কৃষক তাহার কোন সংবাদ রাখিবার সুযোগ বা সময় পায় নাই। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, অধিকতর কার্য্যকরী, উন্নত প্রণালীতে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই বোম্বাইয়ের কৃষি-বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য। সেখানকার কৃষকেরা প্রভূত আগ্রহসহকারে নূতন উপায়গুলি শিখিয়া লইতেছে। নূতন পন্থায় কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি কৃষি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে গ্রামের মোড়ল মাতব্বরগণ সাধারণ কৃষকদের মধ্যে এইরূপে উন্নত কৃষিবিদ্যা শিখিবার উৎসাহ জাগাইবার জন্য চেষ্টা করে কৃষি-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সেই নিমিত্ত বিশেষভাবে প্রয়াস পাইতেছিল বড়ই আনন্দের বিষয়, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন কর্ম্মকার বিলাতী লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রের অনুকরণে যন্ত্রাদি তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছে। যাহারা অভিনব কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে চান, পুনা প্রদর্শনী তাঁহাদিগকে বিশেষ সুযোগ দিতেছেন। দেশীয় মিস্ত্রির প্রস্তুত নানা প্রকার পাশ্চাত্য প্রণালীর যন্ত্রাদি সেখানে দেখান হয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষালাভ

করিয়া ছাত্রগণের কয়জন ভবিষ্য জীবনে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা এখন বলা যায় না। তবে, যাহারা বেঙ্গালের বশবর্ত্তী হইয়া, সখের জন্য কৃষি বিদ্যা শিখিতে চায় তাহাদিগকে যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হয়। যেসকল ছাত্র বাস্তবিকই কৃষিকার্য্যে উৎসাহী, যাহারা ভারতবর্ষের চাষ আবাদের উন্নতির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে তাহাদের জন্যই বোম্বাইয়ের কৃষি-বিদ্যালয়ের স্থাপন।

বোম্বাইএর দৃষ্টান্ত অন্যান্য প্রদেশে স্থানীয় অবস্থার উপযোগী করিয়া চালাইলে বিস্তর কল্যাণ হইবে আশা করা যায়। বড় বড় জমিদার মহাশয়েরা নিজেদের জমিদারীতে কৃষির উন্নতির জন্য দুই চারি জনে মিলিয়া এইরূপ এক একটি কৃষি-বিদ্যালয় প্রদর্শনী ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খুলিলে অন্য দরিদ্র কৃষকেরা কৃষির উন্নতি করিবার সুবিধা পায়।

* *
*

ভারতবর্ষে দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা

আমাদের শিল্পোন্নতির একটি প্রধান অন্তরায় উপযোগী মূলধনের অভাব। বিদেশীর নিকট আমাদের অপবাদ আছে আমরা টাকার ব্যবহার জানি না। বহু বৎসর কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়া প্রচুর অর্থ জমাইয়া আমরা বিবাহ বা শ্রাদ্ধে তাহা সমস্ত নষ্ট করি, অথবা এইরূপ সামাজিক ব্যাপারে বিস্তর ঋণ করিয়া ফেলি। এই অপবাদের মধ্যে একটু অত্যুক্তি থাকিলেও উহাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অনেকে শিল্প বাণিজ্যে টাকা খাটাইতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু বারংবার বিফলতা আসিয়া সকলের বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এখন লোকে টাকা খাটাইতে ভয় পান। এখন সমস্যা, স্বদেশী বণিক বিদেশীর ব্যাঙ্কে ধার পান না আবার মারা যাইবার ভয়ে স্বদেশী ব্যাঙ্কে আমরা টাকা রাখিতেও চাহি না।

যোগ্যতার অভাবে, অর্থের অভাবে ভারতবর্ষে নানা স্থানে সর্ব্ববিধ স্বদেশী প্রচেষ্টার আশ্রয় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে নাই। অথচ এদেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা যে অত্যাবশ্যক তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত এস, আর দাবর "সাঁঝ বর্ত্তমান" পত্রিকায় বলিতেছেন, দেশের লোককে শিল্প বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করিতে শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য দেশের সর্ব্বত্র ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। তিনি লিখিতেছেন, ইয়োরোপীয়েরা এদেশে যৌথ ব্যাঙ্ক খুলিয়া দেশের কথঞ্চিৎ উপকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু এই ব্যাঙ্ক দেশের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণকর নহে। তাই ভারতবাসীর জন্য ভারতবাসী পরিচালিত ব্যাঙ্ক এখন না খুলিলে কোনও মতেই চলিবে না। আমাদের দেশের প্রায় সকল ব্যাঙ্কই ইয়োরোপীয়দিগের হাতে। সামান্য সুদে ভারতবাসীর লক্ষ লক্ষ টাকা ঐ সকল ব্যাঙ্কে খাটিতেছে বটে, কিন্তু তাহা ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য নিয়োজিত হইতেছে না। ইংরাজের ব্যাঙ্কে ইংরাজ ব্যবসাদারেরাই প্রধানতঃ টাকা ধার পাইয়া থাকে, দেশী লোকের সেখানে ধার মিলে না।

আমাদের আর একটি অসুবিধা ব্যাঙ্ক চালাইবার উপযোগী শিক্ষা পাইবার ক্ষেত্র আমাদের নাই। ইংরাজের ব্যাঙ্কে এদেশের লোকেরা কেবল কেরাণীগিরিই করিয়া

থাকে। কোনরূপ গুরুদায়িত্বভারসমন্বিত উচ্চপদে তাহাদের কখন লওয়া হয় না। সুতরাং তাহাদের ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত জ্ঞান কেবল মাত্র হিসাব রাখার মাছিমারা নকল করার মধ্যেই পর্য্যবসিত বাস্তবিক স্বদেশী ব্যাঙ্ক খুলিতে পারিলে দেশের একটা কতবড় অভাব দূর হইবে! ব্যাঙ্কের কাজ চালাইবার উপযোগী সুদক্ষ কর্ম্মপটু লোক সেখানে হাতে কলমে শিক্ষা পাইয়া গড়িয়া উঠিবে। নচেৎ জলে না নামিয়া ডাঙ্গায় সাঁতার শেখা কি সম্ভব? আর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হইলে, যে সকল পরিশ্রমপটু বাণিজ্যোৎসাহীর আশা কল্পনা হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই লয় পায় তাঁহারাও প্রভূত সুবিধা পাইবেন। এইরূপে একদল বিশেষজ্ঞ entrepreneur শিল্প বাণিজ্যে ধুরন্ধর পাওয়া যাইবে। তখন আর ভারতবর্ষীয় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যাদি পরিচালকের বিশেষ অভাব হইবে না।

ইংরাজের ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় সমাজ বা ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের সহিত কোন সংস্রব রাখে না। যতদিন না ভারতবাসী ব্যাঙ্ক খুলিতে এবং চালাইতে শিখেন ততদিন ভারতবর্ষের বণিকসমাজ কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারেন না একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। দেশের অভাব অভিযোগ দেশীয় শিল্পের সুবিধা ও অসুবিধা একমাত্র দেশীয় ব্যাঙ্কপরিচালকগণই বুঝিতে সমর্থ।" আর দেশী ব্যাঙ্কের লাভও দেশেই থাকিবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন পঞ্চাবের একটী ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া যায়, যখন যাঁহারা দেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আতঙ্কে গচ্ছিত টাকা হড়মুড় করিয়া তুলিয়া লন। এইরূপে একের দোষে বা ভাগ্য বিপর্য্যয়ে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অষ্টাদশ ও ঊনবিংশশতাব্দীর ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন কত বৈফল্য, নৈরাশ্য ও দুর্গতি অতিক্রম করিয়া ইংরাজ এবং আমেরিকান শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ সফলতার মুখ দেখিয়াছেন। তাঁহাদের তুলনায় আমাদের পথে বাধা বিঘ্ন অনেক বেশী। সুতরাং আমাদের প্রথম প্রয়াস অকৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। আর স্বদেশবাসিগণের মধ্যে যাঁহাদের উপহাস আমাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহারা একবার সাফল্যের গর্ব্বদৃপ্ত ইংরাজ ও আমেরিকান গণের ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস একটু ঘুঁটাইয়া পড়িবেন! তাহা হইলে আমরাও অযথা নিন্দা, বিদ্রূপ ও উপদেশের হাত হইতে রক্ষা পাইব। তবে অঙ্কে বিফল হইয়াছে বলিয়া আমরাও বিফলতায় উচ্চবাচ্য করিব না তাহা নয়। আমরা দমিব না বৈফল্যের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লোকসানের আটঘাট বাঁধিয়া চরিত্রবল, পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার পাথেয় লইয়া নিরন্নজাতিকে বাঁচাইবার দুর্গম পথে যাত্রা করিব।

* * *

৫। দেশীয় রাজ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা—

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তঃপাতী ঔন্ধ নামক ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই ছিল। দরিদ্র ছাত্রদিগের বৃত্তি ও খাদ্য দান করিয়া সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত ঔন্ধরাজ ইতিপূর্ব্বেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মানুষ সকল সময়ের সুবিধা পাইলেই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না। ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপ প্রভৃতিতে সেইজন্য আইন করিয়া সকলকে লেখাপড়া শিখিবার জন্য বাধ্য করা হইয়াছে। ঔন্ধরাজও তাই সম্প্রতি তাঁহার রাজ্যে বাধ্যতামূলক আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বৃত্তিদান, বিনা পয়সায় আহারের বন্দোবস্ত এবং তাহার উপর আইনের বাধ্যতা, এবার নিশ্চয়ই ঔন্ধরাজ্যে দরিদ্র অজ্ঞ প্রজাদিগের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের প্রভূত সহায়তা করিবে।

শিশুরা সহজে লেখা পড়া শিখিতে চায় না। বিশেষতঃ যাহাদের বাপ দাদা কখনও লেখা পড়া শিখে নাই এবং যাহাদের শিক্ষা চাকুরীর উপযোগী হইবে না, তাহারা শিক্ষার প্রতি স্বভাবতঃই ঔদাসীন্য প্রকাশ করে। লেখা পড়া যে জীবনের সর্ব্ব-বিধ কার্য্যে ও আচারে কতখানি মঙ্গল প্রভাব বিস্তার করে অজ্ঞান লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। যে জিনিসের স্বাদ তাহারা পূর্ব্বে কখনও পায় নাই, যাহা অনতিবিলম্বে টাকা আনা পাইএ রূপান্তরিত হয় না,—তাহার জন্য তাহারা বড় একটা আগ্রহ প্রকাশ করে না। গোখলে মহাশয় যখন বৃটীশ-শাসিত ভারতে বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আইনের প্রস্তাব করেন তখন "Advancement of Learning" "শিক্ষার উন্নতি" ছাপ বুকে লইয়া কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ও সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। বাধ্য করিলে যে কিরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহা মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্যার বিশ্বেশ্বরাজ্যা মহোদয় 'দশরা প্রতিনিধি সভায়' সমক্ষে বিবৃত করিয়াছেন,—"বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সকল স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল সেখানে ধীরে ধীরে কার্য্যারম্ভ করা হইয়াছে। আইন অনুসারে তথায় ১৬০০০ বালক বালিকার শিক্ষালাভের বয়স হইয়াছে। ১০৮০০ বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ে আসিয়া থাকে। আরও ১১০০ শিশু যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। যাদশটী নূতন স্থানে বাধ্যতামূলক আইনের প্রসার করা হইবে—ইতিমধ্যেই স্থির করা হইয়াছে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে শিক্ষা অবৈতনিক করিয়া দিলে এবং লেখা পড়া শিখিবার জন্য বাধ্য করিলে শতকরা অন্ততঃ ৬০ জন শিশু এই ব্যবস্থার প্রারম্ভ সময়েই লেখাপড়া শিখিয়া থাকে।

গোখলে মহাশয়ের পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর আর কেহই বড়লাটের কাউন্সিলে সেই বিষয় লইয়া আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। এখন দেশীয় রাজ্য সমূহের বিবরণ পাঠ করিয়া এই প্রস্তাবের সুফল বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশের জমিদারগণ তাঁহাদের জমিদারীতে বাধ্য করিতে না পারুন, অন্ততঃ যে সকল স্থানে দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের লেখাপড়া শিখিবার কোনরূপ সুবিধাই নাই সেখানে অবৈতনিক প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন করিয়া শিক্ষা অনেক পরিমাণে বিস্তৃত ও সুপ্রাপ্য করিয়া দিতে পারেন। আশা করা যায় ঔন্ধ প্রভৃতি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যের দৃষ্টান্ত আমাদের ভূস্বামীগণের মনে অনুরূপ সঙ্কল্প জাগাইবে। দেশীয় রাজ্যের পারিপার্শ্বি-কের এই সাধু প্রভাবে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকেও এই অশেষ কল্যাণকর বিধানটি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

৬। পরলোকগত ভারতবন্ধু কটন

মানুষের স্বভাব মহৎ কাজের জন্য সে আকর্ষণ অনুভব করে। যিনি বড় কাজের প্রতি যে পরিমাণে আকৃষ্ট, তাঁহার 'মানুষ' বলিয়া পরিচয় দিবার দাবীও তদনুরূপ। মানুষ শব্দটীই আভিজাত্য বাচক। "মানুষের মত মানুষ" প্রভৃতি পুরাতন সুপরিচিত শব্দ গুলি হইতে বুঝা যায় 'মানুষ' কতবড়, মানুষের আপনার ভিতরে কতবড় জিনিষ অবস্থিত রহিয়াছে। মানুষ ফুটবলের ব্লাডার নয়, যে, সে নিজে শুধুই ফাঁকা আবরণ, বাহিরের হাওয়া আসিয়া তাহাকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া কাজের উপযোগী করিয়া লইবে। তাই আমরা সবিস্ময়ে দেখি মহা বিরোধী অবস্থার মধ্য হইতে সময়ে সময়ে শক্তিমান্ কর্মকুশল লোক বাধা প্রতিকূলতা ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজের মনুষ্যত্বের স্পর্দ্ধায় মাথা তুলিয়া উঠেন। পরলোকগত ভারতবন্ধু কটন মহোদয় একজন এই শ্রেণীর মানুষ। তাঁহার হৃদয় "সিভিল সার্ভিসে"র সুদৃঢ় বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালার বিস্তৃত প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দুর্ব্বল অধীন জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমের নির্ম্মল স্রোত তাই বহু হৃদয় স্নিগ্ধ করিয়াছিল। কুলীদের চোখের জল অনর্থক তাহাদের বুকে শুখিয়া যায় নাই। কটন নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া শক্তি ও তেজের সহিত কুলী আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মত্যাগের সময় সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন "আমি চিরদিনই প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিন্দা ও ক্ষতি আমাকে লইতে পারে নাই। সর্ব্বসাক্ষী কালের দরবারে আমার কাজের বিচার হইবে।" বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় তিনি ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ব্যথা তিনি বুঝিতেন, বাঙ্গালীর যোগ্যতা তাঁহার অবিদিত ছিল না। আসামের শাসনকর্তৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে অবস্থান কালে পার্লামেন্টের সদস্যরূপে তিনি আগ্রহ, যুক্তিমত্তা ও সাহসের সহিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। দমননীতির বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদ আজও যেন প্রতিধ্বনির মত কাণে ঠেকে। "মিণ্টোমর্লি" সংস্কার ভারতবর্ষের দাবীর কাছে কতটুকু তাহা নির্ভীক কটন মর্লী সাহেবকে অকাট্য যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি যখন শেষবার ভারতবর্ষে আসেন তখন তিনি ষোল আনা দেশের লোকের। গভর্ণমেণ্টের চাপরাস খুলিয়া তিনি যেন যথার্থই ভারতবর্ষের উত্তরীয় পরিহিত মানস সন্তান। তাঁহার যৌবনের "New India" "নবভারত" উদীয়মান্ ভারতবর্ষের শক্তি, আশা ও ঐক্যের যে চিত্র প্রকটিত করিয়াছিল, আজ আর তাহা অস্পষ্ট নহে। বার্দ্ধক্য রোগ, প্রভৃতিতে যখন তিনি দুর্ব্বল তখনও তাঁহার লেখনী ভারতবর্ষের অভাগা কয়েদী ও লাঞ্ছিত চুক্তিবদ্ধ সন্তানদের জন্য অক্লান্তভাবে আপনার কাজ করিয়াছে। আজ তিনি নাই। ভারতবর্ষের শোকাশ্রু তাঁহার স্মৃতিপীঠের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

৭। সত্যোপলব্ধি

সত্য চোখ বুজিয়া মানিয়া লইবার জিনিষ নয়। ইহার উপলব্ধি আবশ্যক। সত্য তখনই সত্য, যখন মানুষ তাহাকে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করে। যাহা সত্য বলিয়া চলিয়া

আসিতেছে, বহুকাল ধরিয়া যাহা স্বীকৃত ও আচরিত, তাহা আমাদের কাছে জীবন্ত সত্য নয়, যদি আমাদের নিজেদের বোধ শক্তির সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ না থাকে। মানুষ পুরাতনের চিরাচরিতের দোহাই দিয়া কত মিথ্যাই না বহিয়া মরিতেছে! এইরূপেই তাহার বিচারশক্তি নির্জ্জীব, প্রতিভানিস্তেজ এবং কল্পনা ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। রঙ্গিন, অসমতল কাচে কোনও পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়ে। মানুষের মনও তেমনি সমাবস্থ এবং বিক্ষেপ ও আবরণ মুক্ত না হইলে সে সত্যের সাক্ষাৎ পাইবে কেমন করিয়া? বার বার মিথ্যা তাহাকে ছলনা করিবে। মানুষ অবস্তুতে বস্তু আরোপ করিয়া ভ্রমবশে রজ্জুকে সর্প বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে, মেঘের আবরণের পশ্চাতে সূর্য্যকে না দেখিয়া শুধু মেঘ দেখিয়াই ক্ষান্ত হইবে। তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস সত্যের আলোকে সমুজ্জ্বল, অথবা সত্যের শক্তিতে বলিষ্ঠ হইবে না। অতীতের প্রাণহীন কঙ্কালের বোঝা বহিয়াই সে দিন কাটাইবে। মানুষ যখন সত্যের আভাস পায় তখন তাহার কাছে বিশ্বপৃথিবী নূতন হইয়া উঠে, কোথা হইতে সে শক্তিলাভ করে। মানুষের চেতনা তখনই জাগিয়া উঠে, তখনই তাহার জীবন প্রকৃত মনুষ্যত্বের ও চরিতার্থতার পথের সন্ধান পায়, যখন সে সত্যের মূর্ত্তি দেখিয়াছে, সত্যের সঙ্গে তাহার অন্তরাত্মার যেদিন আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে। মানুষের জীবন ব্যর্থ যখন সে সত্যচ্যুত। "নাস্তি সত্যসমঃ তপঃ" সত্যের সমান তপস্যা আর নাই মায়া, মোহ প্রপঞ্চাদির লীলাভূমি সম্ভোগলিপ্সার উৎসবক্ষেত্র পৃথিবীতে মানবের ক্ষণভঙ্গুর জীবন সার্থক হইবে কেমন করিয়? সত্যোপলব্ধির দুরূহ এবং ঐকান্তিক তপস্যাই তাহার সম্বল। সংযম, ত্যাগ, শক্তিলাভ ও সিদ্ধি তাঁহারই পক্ষে সম্ভব, যিনি সঙ্কল্পারূঢ় হইয়াছেন—মিথ্যার মোহে ভুলিয়া হীন স্বার্থ ও সম্ভোগে মজিবনা, সত্যাশ্রিত, সত্যাধিত হইয়া মহাসত্যের যজ্ঞে জীবনের পুরুষোচিত অকান্ত কর্ম্মরাশি এবং নির্ম্মল উদার জ্ঞান আজীবন উৎসর্গ করিব। মানুষ যদি সমস্ত প্রাণ দিয়া সত্যোপলব্ধি করে তবেই তাহার জীবন সার্থক হইবে। জরাজীর্ণ সংস্কারকে অবলম্বন না করিয়া সে নূতন শক্তির অনন্ত উৎসের সন্ধান পাইবে। তখন আর তাহার পরাজয় নাই। তত্ত্বের পথে হার থাকিবে কেমন করিয়া? সত্যোপলব্ধি তাই জীবনের সর্ব্ববিধ সাধনায় জয়লাভের একমাত্র পাথেয় "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।"

* *
*

পরলোকগত ফেরোজসাহ মেটা

বাঙ্গালীর সহিত ফেরোজ শা মেটার অনেক বিষয়েই মিল হয় নাই। গত কয়েক বৎসর ভাঙ্গা কংগ্রেস লইয়া বাঙ্গালী মেটা মহোদয়কে বড় ভাল নজরে দেখে নাই। আজ তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার চিত্ত ব্যথিত হইয়াছে। মরণের আঘাত অন্য সব ভুলাইয়া তাঁহার গুণগুলি বাঙ্গালার কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। পার্শীরা বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের আতিথ্যে, ভারতের অন্ন জলে পুষ্ট হইয়াছেন। ভারতবর্ষ তাঁহাদেরও জননী। সন্তানের মত দেহের শক্তি ও মনের ভক্তি মাতৃভূমির চরণে ঢালিয়া দিয়া মাতৃসেবাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে

হইবে—এই আদর্শ, মহাপ্রাণ দাদাভাই নারোজী মহাশয়ের প্রায় সপ্ততিবর্ষব্যাপী অকুণ্ঠ স্বদেশসেবা উজ্জ্বল ভাবে ভারতবাসীর সম্মুখে ধরিয়াছে। এই বৃদ্ধ পার্শীর অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে পরলোকগত মেটা মহোদয় একজন। বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর সভাপতিরূপে তিনি অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন। কংগ্রেসে অন্য সকলে তাঁহার মতই মানিয়া চলিতেন। লাট কাউন্সিলে তাঁহার তেজস্বিতা, স্পষ্টবাদিতা ও যুক্তিনৈপুণ্য শত্রুমিত্র সকলকেই বিস্মিত করিয়াছিল। মেটা নিজে যাহা বুঝিতেন তাহা সবলে ধরিয়া থাকিতেন। তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বের ধারণাগুলি তাই সর্ব্বত্র নূতন ভাব ও নূতন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। মেটার বিশেষত্ব—তাঁহার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব (individuality)। তিনি যেখানে, সেখানে তিনিই প্রধান, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে তাঁহার দলের লোকেরা বড় একটা কথা বলিতে পারিতেন না। এমন অদম্য প্রকৃতি প্রকৃতই একটা মস্ত জিনিষ। মেটা মচকাইবার পাত্র ছিলেন না, একথা তাঁহার মতাবিরোধীকেও স্বীকার করিতে হইবে। একবার টগবগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিব কিছু পরে ঠাণ্ডা হইয়া পড়িব,—এইরূপ দুর্ব্বলচিত্ততার অপবাদ এই বলশালী পুরুষকে স্পর্শ করে নাই। তিনি যেন পাথরে গড়া, কোথাও কাদা নাই। বঙ্গদেশে ফেরোজ শা মেটা মহাশয় সম্বন্ধে বহু বিতণ্ডা কোলাহল হইয়া গিয়াছে। সেই পরলোকগত পুরুষ প্রবরের চরিত্রের অসামান্য দৃঢ়তা, অটল সঙ্কল্প ও নির্ভীক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বাঙ্গালী যদি আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার চরিত্র বহু অপবাদ হইতে মুক্ত হইবে। বাঙ্গালীর বহু সদ্‌গুণের সহিত এইরূপ অদম্য দৃঢ়তার সংযোগ হইলে, তাহার প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

* *
*

৯। ৺কাশীধামে শুভানুষ্ঠান

গত মাঘীপূর্ণিমায় ৺কাশীধামে "বেদোদ্ধোধিনী" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য বৈদিক ধর্ম্মমূলক চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ রক্ষা। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতির পণ্ডিত মণ্ডলীর উদ্‌যোগে "বেদোদ্ধোধিনী" নামে একটি বৈদিক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বিদ্যার্থিগণ যাহাতে স্বর ও অর্থের সহিত ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিতে পারেন, এবং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হাতে কলমে যথাবিধি শিক্ষা করিতে পারেন তাহার উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশে যাহাতে বৈদিক ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন হয় তজ্জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত বৈদিক ধর্ম্ম ও বেদগ্রন্থ প্রচার বিভাগের বেদ প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে সম্প্রতি "ঋগ্বেদ সংহিতা" বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ-সস্বর-পদপাঠ-পদান্বয় ও সরল বঙ্গানুবাদ সহ আচার্য্যপ্রবর সায়নকৃতভাষ্য এবং শাকপূনি, যাস্ক প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের নিরুক্ত সম্মত "বেদোদ্ধোধিনী টীকার সহিত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ঋগ্বেদভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত প্রকরণের প্রথমখণ্ড বঙ্গানুবাদ সহ বাহির হইয়াছে। এইরূপ শুভানুষ্ঠান সম্বর্দ্ধনে বাস্তবিকই আমরা পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছি। কয়েকটী প্রবীণ মনস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারাই এই সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, এবং এই সমিতির সভাপতি বৈদিক পণ্ডিতকুলপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী মহাশয় হইয়াছেন। ইহার স্থায়িত্ব কল্পে বর্ণাশ্রমধর্ম্মা-

বলম্বিমাত্রেরই সাহায্য করা উচিত। বৈদিক ধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান ব্যতীত সনাতন চাতুর্ব্বর্ণ্য আর্য্য সমাজের সুশৃঙ্খলা সংরক্ষিত হইতে পারে না। বেদ এবং বৈদিক ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র পরমাশ্রয়। সেই বেদ এবং বৈদিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মণ-গণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন। আশা করি বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণসন্তানগণ কাশীতে উক্ত সমিতির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন এবং বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্ম বিধি ব্যবস্থা শিক্ষা করিয়া দেশের ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন।

যাহাতে অধিকারানুসারে সহজে বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং বেদগ্রন্থ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য সাধারণ ।০ আট আনা মাত্র। যাঁহারা অগ্রিম ৫৲ পাঁচ টাকা মূল্য সাধারণ করিবেন তাঁহারা একবৎসরে বারখণ্ড ঋগ্বেদ-সংহিতা বিনা ডাকমাশুলে গৃহে বসিয়াই প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত গ্রন্থ পাইবার ঠিকানা—

শ্রীবিশ্বেশ্বর বিদ্যারত্ন
কাশীধাম বেদোদ্ধোধিনী সমিতি
১১২নং হাউজকটরা, পাথর গলি,
বেনারস সিটি।

আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি সায়ণভাষ্য এবং অনুবাদসহ বঙ্গাক্ষরে ঋগ্বেদ-সংহিতা এই প্রথম প্রকাশিত হইতেছে। আমরা একখণ্ড গ্রন্থ পাইয়াছি। দেখিলাম, বাঙ্গলা অনুবাদ খুব প্রাঞ্জল এবং মুদ্রণকার্য্যও বেশ সুন্দর হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের এরূপ ভাবে প্রচার বাস্তবিকই বড় আশাপ্রদ।

১০। সাহিত্যে সংরক্ষণ-নীতি

"মাতৃভাষার সাহায্যে সকল বিষয়েই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতেও শিক্ষাদান করিতে হইবে। এজন্য ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে অল্পকালের মধ্যে পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে কতিপয় যোগ্য লেখক, অধ্যাপক, অনুবাদককে সাহিত্য সেবায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই সাহিত্যসেবিগণের অন্নচিন্তা দূর করিবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে "সংরক্ষণ-নীতি" প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মাসিক অর্থসাহায্য করিতে হইবে।" ইহাই সংরক্ষণ-নীতির মূলমন্ত্র। ইংরাজী সাহিত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাল ভাল বই অনতিবিলম্বে অনূদিত হইয়া ইংরাজী পাঠকের জ্ঞান, ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দেয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাল ভাল পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যদি ইংরাজী প্রভৃতি বৈদেশিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অনুবাদে উদাসীন থাকি, আমাদের চিত্তের প্রসার হইবে না। গৃহস্থে অধ্যাপক বিনয়কুমার নিগ্রো-জাতির কর্ম্মবীরের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া একজন বিশ্ববরেণ্য কর্ম্মীর জীবনী আমাদের দেশবাসিগণের সম্মুখে ধরিয়াছেন। সুখের বিষয় শিক্ষিত সমাজে সংরক্ষণ নীতির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ এম, এ, বি, এল মহাশয় "Plutarch's Lives" অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার 'সিজার' প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'আলেকজাণ্ডার' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। প্লুটার্কের জীবনী ইউরোপীয় সাহিত্যের অমূল্যরত্ন। অধ্যাপক সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ প্রাঞ্জল

সর্ব্বত্রই মূলের অনুযায়ী হইয়াছে। পুস্তকের ভাষাও মূলের উপযোগী। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের মূল্য হ্রাস করিয়া আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে সদ্বিবেচনার কাজ করিয়াছেন। আমরা দেশের কৃতবিদ্য সন্তানগণকে সংরক্ষণ-নীতি অনুসারে কাজ করিতে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি।

* *
*

পরলোকগত নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর

গৃহস্থে ধারাবাহিকরূপে পৃথিবীর উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত নিগ্রোজাতির একজন অসাধারণ কর্ম্মীর কর্ম্মময় জীবনকথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি নিজে বলিয়াছিলেন "আমি কেনা গোলাম—জাতিতে নিগ্রো। নিতান্ত ছেলে বেলার কথার মধ্যে গোলামবাজের কাজকর্ম্ম ও চালচলন গুলি মনে পড়ে। আর স্মরণ হয় সেই আবাদের গোলাম মহলার কুঠরিগুলি—যেখানে আমার স্বজাতিরা তাহাদের দাসজীবন কাটাইত। নিতান্ত ঘৃণা, অবনত, দারিদ্র্য দুঃখময়, নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই আমার বাল্যজীবন কাটিয়াছে। পরে যুক্তরাজ্যের গৃহবিবাদের ফলে দাসজাতির স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। তখন হইতে আমরা স্বাধীন হইয়া গোলামখানা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার বাল্যজীবনে এবং অন্যান্য হাজার হাজার গোলামের বাল্যজীবনে কোনও প্রভেদই ছিল না। ছেলেবেলায় আমরা কোনও দিন বিছানায় শুইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা তিন ভাই বোন মাটিতে পড়িয়া থাকিতাম। কতকগুলি ছেঁড়া, ময়লা ন্যাকড়ার বস্তার উপরে রাত্রি কাটাইতাম। আমাকে আবাদের অনেক কাজই করিতে হইত। আমি উঠান ঝাড়িতাম এবং কৃষিক্ষেত্রের চাষীদের কাজের জন্য জল যোগাইতাম। অধিকন্তু কলে পিষিবার জন্য সপ্তাহে একবার করিয়া শস্যাদি বহিয়া লইয়া যাইবার ভার আমার উপর ছিল। এই কার্য্য বড়ই কষ্টদায়ক হইত। আবাদ হইতে কল তিন মাইল দূরে। ঐ রাস্তায় যাওয়া আসা আমার পক্ষে বিষম উৎপাত বলিয়া বোধ হইত। বিশেষতঃ বেশী রাত্রে ঘরে ফিরিলে আবার জুতা, লাথি, গালি, খাওয়ারও সুব্যবস্থা ছিল। গোলামী করিতে করিতে আমি কখনও শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে যাই নাই। গোলামবাজে আমার স্বজাতিরা সকলে নিরক্ষর ছিল। তথাপি দেখিতাম প্রায় সকলেই দেশের কথা বেশ জানিত ও বুঝিত। হায়ে ভায়ে সকলে এক সঙ্গে বসিয়া কখনও আমি আহার করিয়াছি এরূপ মনে হয় না। গরু ছাগল ইত্যাদি যেরূপ চরিয়া বেড়ায় এবং যেখানে যাহা পায় তাহাই খায় আমাদেরও ভোজন ব্যাপার সেইরূপ ছিল। কোন সময়ে কাজ করিতে করিতে হয়ত একটুকরা মাংস খাইলাম। কখনও বা দুই একটা পোড়ান আলু হাঁটিতে হাঁটিতে চিবাইতে হইত। আমি জীবনে সর্ব্ব প্রথম যে জুতা পরি তাহা কাঠের তৈয়ারী। তাহা পরিতে পায়ের তলায় বড়ই লাগিত। কাঠের জুতা তবুও ভাল কিন্তু গোলামির আমলে আমাদিগকে যে জামা পরিতে হইত তাহা অতি ভয়ঙ্কর। বোধ হয় দাঁত টানিয়া তুলিতে যে কষ্ট হয় এই জামা পরিতে তাহা অপেক্ষা কম কষ্ট হইত না। * * * * নিগ্রোরা কখনও অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মভীরু, কৃতজ্ঞ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। তাহারা কথার দাম বুঝে, কোন প্রতিজ্ঞা

করিলে তাহা ধর্ম্মবৎ পালন করে।

আমি গোলামি প্রথার পক্ষপাতী নহি—দাসত্ব প্রথা ভাল একথা আমি বলিতে চাহি না—সংসারে গোলামিগিরির আবশ্যকতাও আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমি জানি—আমার প্রভুরা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন নাই। আমি জানি যে তাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আমাদিগকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছেন। আমি জানি—আমরা যে কোন দিন মানুষ হইয়া উঠিব তাহা ইঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই—এবং মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য সজ্ঞানে কোন চেষ্টাও করেন নাই। আমি কেবল এইমাত্র বলিতে চাহি যে ভগবানের কর্ম্মকৌশল বিচিত্র। জগদীশ্বর যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। প্রথম দৃষ্টিতে যাহা তিক্ত ও কঠোর, পরিণামে তাহা মধুময় ফল প্রসব করে। আমাদের অজ্ঞাতসারে এই উপায়ে জগতের মহৎকর্ম্মগুলি নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ভগবানের অপার করুণায় বিশ্বে কত অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। মানুষ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিধাতার মঙ্গল হস্তে যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে। এই আশাতত্ত্ব প্রচার করিবার নিমিত্ত এত কথা বলিলাম। আজকাল লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে—'তুমি এই ঘোরতর দৈন্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার রাশির মধ্যে থাকিয়াও নিগ্রোজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপে এত আশান্বিত?' আমার একমাত্র উত্তর এই যে আমি ভগবানের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাসবান্। যাঁহার করুণায় নানা দুর্দ্দৈবের ভিতর দিয়া আমরা এত দূর উঠিয়াছি তাঁহারই করুণায় আমরা আরও উন্নত হইব। নিগ্রোজাতি জগতের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার স্বকীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া জগদীশ্বরের অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিবে।"

গোলাম কর্ম্মবীরের বাল্যজীবনের কথা তাঁহারই ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। যে প্রচণ্ড এবং অপরাজেয় বিশ্বাস তাঁহার জীবনের অর্গলিত কর্ম্মরাশি সাফল্যে ও সার্থকতায় দীপ্ত করিয়াছে তাহারও আভাষ দেওয়া হইল। তাঁহার জীবনপথের পাথেয় ছিল স্বাবলম্বন, পরিশ্রম ও একনিষ্ঠা—আর তাঁহার হৃদয়ে ছিল ভগবানে অনন্ত বিশ্বাস। নিগ্রোজাতির মনুষ্যত্ব, চরিত্র ও যোগ্যতা, শিক্ষা এবং কর্ম্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া ভগবানের বিপুল কর্ম্মযজ্ঞে নিগ্রোর আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—ইহাই তাঁহার অসংখ্য কর্ম্মের মূলমন্ত্র। "টাস্‌কেজি" বিদ্যালয় আজ গোলাম নিগ্রোর আশা ও শক্তির তীর্থক্ষেত্র। বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোকে সর্ব্বপ্রকারে মানুষ করিয়া গড়িবার জন্য অক্ষুণ্ণ আত্মবশ্যতার সুদৃঢ় পাষাণ ভিত্তির উপর এই পুণ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন। নিগ্রো মানুষ হইয়া উঠুক, তাহার চরিত্রে মানুষোচিত গুণগুলি ফুটিয়া উঠুক, তারপর বিশ্বে তাহার স্থান সেই করিয়া লইবে। তাঁহার এই বিশ্বাস ভগবদিচ্ছার প্রতিধ্বনি বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার স্বার্থত্যাগ যথার্থই "লক্ষস্য বর্জ্জনং ত্যাগঃ।" নিজে প্রচুর অক্ষয় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া তাহার পর সেই উপচিত মনুষ্যত্ব তাঁহার উপেক্ষিত স্বজাতির মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁহাদের জীবনের কর্ম্মকাহিনী নূতন আশার ও কর্ত্তব্যের অধ্যায় সংযোজনা করিয়াছে এই বিশ্ববরেণ্য গোলামবীর তাঁহাদের মধ্যে সমধিক। তাঁহার জীবনচরিত নিরাশ হৃদয়ে আশা জাগাইবে, অবনত, উপেক্ষিতকে

গৌরব ও সম্মানের কক্ষ সোপান দেখাইয়া দিবে। এই ক্ষুদ্র আলোচনায় তাঁহার অসংখ্য কর্ম্মের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। বুকর ওয়াশিংটনের আত্মচরিত পাঠ করিলে সকলেই তাঁহার মনুষ্যত্ব, ও কর্ম্মের পরিচয় পাইবেন। বুকার ওয়াশিংটন আর মর্ত্যধামের অধিবাসী নহেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম, ত্যাগ, একনিষ্ঠ, বিশ্বাস ও আশা মর্ত্যবাসীর যে চিরস্থায়ী ও অপূর্ব্ব সম্পদরূপে বিরাজমান থাকিবে, উত্তরকালে মানবজাতির ইতিহাসে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্নতিকামী জনমণ্ডলী তাহা হইতে প্রচুর পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

১২। সাধারণের উন্নতি

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—The nation dwells in cottages—জাতি বলিলে যাহারা বুঝায় তাহারা কুটীরে বাস করে—এ বাক্যটী আমাদের দেশের পক্ষে যেরূপ খাটে সেরূপ আর কোন দেশের পক্ষে নহে। জাতির পরিচয় লইতে হইলে ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় নগর কয়টী অপেক্ষা অগণ্য পল্লীগুলির উপরেই বেশী মনোযোগ দিতে হইবে। কেবল মাত্র ধনী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষের অবস্থা বিচার করিবেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের কোন ধারণাই করিতে পারিবেন না। আমাদের নগর ও গ্রামগুলির মধ্যে একটা বিস্তৃত ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান নেতারা সাধারণ লোকের প্রকৃত "প্রতিনিধি" হইতে পারেন না। তাঁহারা যেন জনসঙ্ঘ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বস্তুতঃ আমাদের দেশে দুই প্রকারের মনুষ্য আছেন। একদল আছেন—তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলিতে গণিয়া শেষ করা যায়—যাঁহারা বিদ্যায়, জ্ঞানে, মহত্বে, কর্ম্মকুশলতায় জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সমকক্ষ। আর একদল—দেশের জনসাধারণ—অজ্ঞানতা, মলিনতা, কুসংস্কার ও দুর্গতির নিম্নতম স্তরে অবস্থিত।

দেশের উন্নতি অর্থে প্রথম প্রকারের মুষ্টিমেয় লোকের উন্নতি নহে। যে মঙ্গল প্রচেষ্টা সমগ্র দেশব্যাপী না হইয়া কেবল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ, তাহাতে দেশের সম্যক্ কল্যাণ সম্ভব নহে। যে আন্দোলন অধ্যাত্মবোধ প্রচারের জন্যই হউক, অথবা আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যই হউক সমগ্র সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহা কখনও বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন জন সমষ্টিকে ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ "বিহার"-গুলির মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়াছিল, তখনই তাহার পতন আরম্ভ হয়। শ্রীচৈতন্য প্রমুখ বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পল্লীবাসী দরিদ্র সাধারণের মধ্যেই গিয়াছিলেন। তুকারামের অভঙ্গ, কবীরের দোঁহাবলী, তুলসীদাসের রামায়ণ, আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুধর্ম্মের সার সরল, ভক্তিপূর্ণ ভাষায় দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করিয়া হিন্দুসমাজকে সঞ্জীবতা দান করিয়াছিল। রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্ত কবিগণ অল্প, অমার্জ্জিতবুদ্ধি জনসাধারণের উপযোগী করিয়া যে ভাবপূর্ণ, শ্রদ্ধামধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও পল্লীর মাঠঘাট, গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া থাকে।

কিন্তু বর্ত্তমান ভারতবর্ষের আন্দোলনগুলি প্রধানতঃ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ। আমাদের কংগ্রেস মূক, দুর্ব্বল দেশবাসী হইতে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহির্ভূত কেহ কংগ্রেসের নাম শুনে নাই। কংগ্রেসের কথা তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টাও কেহ করে নাই। আবার সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কয়েক জন ব্যতীত কেহ মহাসভার কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কংগ্রেসের আশা, আকাঙ্ক্ষাকে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ আশা ও আকাঙ্ক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। ময়মনসিংহ ও বর্দ্ধমানে এই যে সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গেল, তাহার খবর কয়জনে রাখিয়াছে? ময়মনসিংহ ও বর্দ্ধমানের কয়জন সাধারণ লোক ইহার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বুঝিতে পারিয়াছে? সম্মিলনকে ইহারা বাবুদের তামাসা ছাড়া আর কিছু মনে করে না।

চারিদিকের সকলে যখন অবনত, তখন

কোন বিশেষ সম্প্রদায় আপনাকে বেশীদিন উন্নত রাখিতে পারেন না, ক্রমেই নিম্নের আকর্ষণ তাহাকে নীচের স্তরে টানিয়া আনে যে সমাজের অধিকাংশ লোকেই অবনত, সে সমাজের আদর্শও খুব ছোট। তাই আমাদের আন্দোলনগুলি দীর্ঘ স্থায়ী হইতেছে না। একজন কর্ম্মী কোন এক নূতন কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তীর দল কই? নবজাগরণের দিন যে অফুরন্ত কর্ম্মীর দল স্রোতের মত দেশ প্লাবিত করিবেন এবং জটিল সাধনায় সিদ্ধি আনিয়া দিবেন, তাঁহারা কোথায়? আমাদের আন্দোলন তাই সমাজের সমস্ত স্তরগুলির মধ্যে আপনার মূল বিস্তৃত করিতে পারে নাই। তাই উহা সামান্য ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে। উহা জনসাধারণের সহানুভূতি ও প্রয়াসের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; উহার ভিত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকূলতার আক্রমণ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার সহিত নিম্ন শ্রেণীর কোন সংযোগ নাই, তাহার জন্য নিম্নশ্রেণীকে দোষ দেওয়া যায় না। যাহারা অর্দ্ধাভাবে, অন্নাভাবে দিন দিন শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে, জমিদারের খাজনা এবং মহাজনের সুদ দিতে ও ঋণ পরিশোধ করিতে যাহাদের সমৎসরের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ ব্যয়িত হইয়া যায়, এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবে দুই জন হাওয়ায় বাস করিয়া যাহারা ক্রমেই কর্ম্ম শ্রমবিমুখ, নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে, শিক্ষার অভাবে যাহাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ অথবা সমূহের স্বার্থমূলক বড় ভাবগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহারা যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সহরের আন্দোলনে যোগদান করিবে না ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? উন্নত শ্রেণীর নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য তাহাদিগকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদিগকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া উন্নত শ্রেণীর সহিত সমভূমিতে আনিবার কোন বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই, ফলে, তাহারা ঔদাসীন্য দ্বারা আমাদিগের ঔদাসীন্যের প্রতিদান করিয়াছে।

দেশের সর্ব্বত্র অভাব, অপ্রাচুর্য্য। তাহার উপর দেশের শতকরা ৯৭।৯৮ জন নিরক্ষর। অলক্ষ্য গতিতে জগৎপ্রবাহ ছুটিতেছে, উন্নতির লক্ষ্য করিয়া অবিরাম বেগে ধাবিত হইতেছে, ইহার কোন সংবাদ তাহারা রাখে না। তাহাদের জগৎ বহুদিন পূর্ব্বে যেখানে ছিল, আজ সেইখানেই আছে, বরং পিছাইয়া আসিয়াছে। কোন প্রকার বড় স্বার্থ বা মহৎভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। আশাহীন, আনন্দহীনভাবে জীবনের কয়টা দিন কাটাইয়া দেওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় তাহারা দেখিতে পায় না। অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নির্ব্বিবাদে তাহারা আপনাদের হীন অবস্থার সহিত আপোষ করিয়া লইয়াছে। গ্রামের রক্ষক স্বরূপ জমিদার ও ধনী ব্যক্তিগণ পল্লী ছাড়িয়া এখন নগরে বাস করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন। তাঁহাদের গৃহ প্রাসাদ অজ্ঞতা দারিদ্র্যের মরুর মাঝে জ্ঞান ও আলোকের মরুদ্বীপের মত ছিল। পূজার সময় তাঁহাদেরই প্রাঙ্গণে গ্রামের কৃষক, স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান একত্রে আমোদ উপভোগ করিত। তাঁহারাই পল্লীর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারেন, জ্ঞান বিস্তার করিতে পারেন, কৃষিকার্য্যের অভিনব উন্নত প্রণালী প্রচলিত করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রামত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলি শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে যে অর্থ পল্লীর কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত ব্যয়িত হইত, এখন তাহা কেবল নগরেই বিলাস বাবুয়ানায় খরচ হইয়া যাইতেছে। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় না, নদীগুলি মজিয়া যাইতেছে, আনন্দ কোলাহলপূর্ণ, উৎসবময় গ্রাম সকল এখন ম্যালেরিয়াদি রোগের এবং শৃগালাদি জন্তুর বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। কোন প্রকার উন্নত ক্রীড়া ও আমোদ না থাকায় এবং অভাব বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর পানাশক্তি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। যেখানে যখন প্রাচুর্য্য ও নির্ম্মল আনন্দের অনাটন হয়, তখন লোকের মধ্যে নেশা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। আমাদের আর একটী দুর্ভাগ্য, লোকের খাটিবার ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে বিবাদ মামলা-

রাশি বাড়িয়া চলিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান না থাকায় কৃষক বা শিল্পী কৃষি বা শিল্পের উন্নতি করিতে পারিতেছে না। বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্পীরা কাজকর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া এক্ষণে মজুরী করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে। প্রজাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে জমিদারের উৎসাহ কমিয়া আসিতেছে। সমাজের শুরুস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের অবনতিবশতঃ নৈতিক শিক্ষার অভাববশতঃ গ্রাম্য জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী প্রধানতঃ ভদ্র সম্প্রদায়। যে সমাজ আপনার অধিকাংশ অবনত লোককে উন্নত করিবার কোন চেষ্টা না করে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দেশের জনসংঘ জাতির মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে মাথা অনেকদিন খাড়া থাকিবে না। মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটাইবার জন্য সমাজ। তাহার অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশের সুযোগ দেওয়া উহার কাজ। সুযোগের অভাবে, অনুশীলনের অভাবে জনসাধারণের মধ্যে যে কতশত লোকের প্রতিভা ফুটিতে পারিতেছে না তাহার হিসাব কে রাখিয়াছে? মুসলমান জোলার ঘরে কবীরের জন্ম। ফ্রাঙ্কলিন, গারফীল্ড, লিঙ্কন, গ্র্যাণ্ট প্রমুখ মহাপুরুষগণ অতি সামান্য অবস্থা হইতে আপনাদিগকে ঊর্দ্ধে উন্নীত করিয়াছিলেন। আর্করাইটের প্রতিভা শিক্ষা দেয়—দরিদ্র উপেক্ষার পাত্র নহে, চেষ্টা করিলে, প্রকৃত অনুশীলনের সুযোগ দিলে তাহাদের মধ্য হইতে বড় লোক উঠিতে পারে।

হিন্দু বহুদিন তাহার নিম্নগামী, পতিত ভাই বোনদের কথা ভুলিয়া রহিয়াছে। তাহাদের উদ্ধারের কথা হিন্দুর মনে এখনও ভাল করিয়া স্থান পায় নাই। অসংখ্য দৈহিক অভাব দূর করিয়া, নানাপ্রকার শিক্ষার আলোক প্রবেশ করাইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মশীলতায়, তেজস্বিতায় ও মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য আন্দোলন সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে নাই। পঞ্জাবের আর্য্যসমাজ এবং ভারতবর্ষের খ্রীষ্টান মিশন ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায় বিস্তৃতভাবে জনসংঘের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করেন নাই। বাঙ্গালী এ বিষয়ে এখনও উদাসীন। তাই বাঙ্গালার উপেক্ষিত নমঃশূদ্রাদি জাতি দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

কিন্তু বহুকাল নিম্নশ্রেণীকে নীচে ফেলিয়া রাখিলে ত আমাদের জাতীয় সঙ্কট সমস্যার মীমাংসা হইবে না। নিখিল ভারতের উন্নতির জন্য ভারতের জনসাধারণকে বাদ দিলে চলিবে না। অবনতকে পতিতকে, অপমানিতকে সমাজের উচ্চস্তরে উত্তোলন এবং তাহাদের উন্নতি বিধানই নবভারতের মূলমন্ত্র হউক। যাঁহারা তাহাদের দুঃখে, যাতনায় বেদনা অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদের নীরব আর্ত্তনাদে যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সেই সকল মহাপ্রাণ কর্ম্মীরই এখন প্রয়োজন। যাঁহারা সব স্বার্থ ছাড়িয়া, অন্যান্য সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উপেক্ষিত দীন জনসাধারণের কল্যাণার্থ আপনাদের সমস্ত শক্তি যোগ্যতা ও ভক্তি আগ্রহের সহিত উৎসর্গ করিবেন, তাঁহারাই আজিকার প্রকৃত কর্ম্মী।

দৃশ্য-কাব্য

আমাদের সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নাটকের উপযুক্ত নাম থাকিলেও, বিদেশী নাম ব্যবহৃত হয় দেখিয়া, বহুদিন পূর্ব্বে একবার দৃশ্যকাব্যের প্রাচীন শ্রেণীবিভাগের কথা লিখিয়াছিলাম। নাট্য-সাহিত্যে যাঁহার কীর্ত্তির তুলনা নাই, সেই মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাচীন কালের কয়েকটি জাতিবাচী শব্দ গ্রহণীয় মনে করিয়াছিলেন। এবার বিস্তৃত ভাবে নাটকের শ্রেণী-বিভাগের কথা লিখিব। নাটক শব্দটি দেখিবামাত্র নিঃসন্দেহে ধরিতে পারা যায় যে, যাঁহারা ছান্দস্ ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং যাঁহারা প্রাচীন ভাষায় অপভ্রংশ ও বিকৃতশব্দ ব্যবহার করিতেন না, তাঁহাদের হাতে নাটকের উৎপত্তি হয় নাই। নৃত্য শব্দটি হইতে যে নাট, নট, নাটক প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল সেগুলি প্রাকৃত ভাষার শব্দ। নট শব্দের সহিত যুক্ত স্বার্থের "ক" প্রাচীন প্রাকৃত ভাষাতেও অপেক্ষাকৃত হালের। সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃতের স্বার্থের "ক" এবং 'ত' এর স্থানে প্রবর্ত্তিত "ট" সসম্ভ্রমে গৃহীত হইয়াছিল। প্রকৃত হইতে উৎপন্ন প্রকট, বিকৃত হইতে উৎপন্ন বিকট প্রভৃতি গ্রহণ করিবার পর, সংস্কৃতে নূতন ধাতুরও সৃষ্টি হইয়াছিল। পাণিনির সময়ের পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃতে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ব্যবহৃত হইতেছিল। প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মসূত্র প্রভৃতিতে দেখিতে পাই যে গান-বাজনা রঙ্গ-তামাসা প্রভৃতি শিষ্টদিগের আদর্শের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইত। দেশের লোকে কথা কহিবার ভাষায় চিত্ত-বিনোদনের জন্য যে সাহিত্য গড়িয়াছিল, নাটক সেই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাণিনি এবং উহার মহাভাষ্য দেখিয়া বুঝিতে পারি যে শিষ্টেরা অল্প সময়ের মধ্যেই অশিষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। নৃত্য হইতে যে নচ্চ (নাচ) হইয়াছিল, অভিনয়ে উহা থাকিলেও, রঙ্গমঞ্চের নূতন জিনিসের জন্য নূতন প্রাকৃত নাম হইয়াছিল। বিশেষভাবে রঙ্গশালাগুলির কৃপায় আজকাল নানা শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য সৃষ্ট হইতেছে। সকল বিষয়েও যেমন, এখানেও তেমন; ইংরেজি আদর্শে এবং ইংরেজি ছাঁচেই আমরা সকল জিনিস গড়িতেছি। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও দৃশ্যকাব্যের নাম অপেরা, কাহারও নাম গীতি-নাট্য, কাহারও বা নাম মেলো ড্রামা। ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে নূতন গড়ায় অনেক স্থলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কিন্তু বস্তুটি দেশীয় নাম এবং দেশীয় প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ না করিলে মোহন্ বাগ্দী এবং মেরী ডোমের মত নরকেরও অগ্রাহ্য হইবে। নামটা পরিচয়ের প্রথম কথা এবং পরিচিতের নিত্য সম্ভাষণের শব্দ।

প্রাচীন সাহিত্যে দৃশ্যকাব্যের বহুবিধ শ্রেণী-বিভাগ আছে। নূতন নূতন আদর্শে কাব্য লিখিলেও কিয়ৎপরিমাণে সেই প্রাচীন কাঠাম বজায় রাখা যাইতে পারে; তাহাতে নবসৃষ্ট কাব্যের পূর্ণ বিকাশে বাধা পড়িবে না, বরং সেই নবসৃষ্ট সাহিত্য একটু স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে। প্রাচীনেরা প্রতি-শ্রেণীর লক্ষণাদি লইয়া অনেক বাঁধাবাঁধি

করিয়া গিয়াছেন। একালের রচনায় সে সকল নিয়ম রক্ষিত হয় না; হইবার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল মৌলিক ভাব বা বিশেষত্ব লইয়া শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নবসৃষ্ট কাব্যগুলির বিভাগ এবং নামকরণ করা যাইতে পারে। দৃশ্যকাব্যের সাধারণ নাম রূপক। নাটক, রূপকের অন্তর্গত একটি শ্রেণী হইলেও, প্রাচীন কালেও সকল শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যই নাটক নামে অভিহিত হইত; কাজেই রূপক শব্দটি অত্যন্ত উপযোগী হইলেও, প্রচলিত নাটক নামে দৃশ্যকাব্যের নামকরণ হইলে ক্ষতি হইবে না। দর্পণকারের বিভাগ অনুসারে রূপক দশভাগে এবং উপরূপক ১৮ ভাগে বিভক্ত। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী এবং প্রহসন, এই দশটি রূপক শ্রেণীতে। নাটিকা, ত্রোটক, সোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খন, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা দুর্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ এবং ভাণিকা এই ১৮টি উপরূপক।

ইংরেজিতে যাহাকে Historical Drama বলে, নাটক জিনিসটা তাহাই। নাটকের উৎপত্তির যুগে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ খ্যাতবৃত্ত লইয়াই অভিনয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল বলিয়া, সেকালে যাহা নাটক হইয়াছিল, উহা ঐতিহাসিকই হইয়াছিল; এবং সেই সূত্রেই, যে কাব্যে রূপ আরোপিত হয়, তাহা রূপক বা দৃশ্যকাব্য নামে সাধারণভাবে অভিনীত হইবার সময়, ঐতিহাসিক রূপকের, নাটক নামই রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রের বিভাগ স্বত্বেও সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সাধারণ দৃশ্যকাব্য অর্থেও নাটক নাম ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভাষায় রূপক শব্দটি একটা বিশেষ অর্থেই চলিতেছে, কাজেই ঐ শব্দটি গ্রহণ না করিয়া সাহিত্যশ্রেণীর হিসাবে দৃশ্যকাব্য নাম চলিলেই যথেষ্ট হইবে। ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য পাঁচ অঙ্কের অধিক হইলে মহানাটক হয় এবং পাঁচ অঙ্কের কম হইলে নাটিকা হয়; বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সকল শ্রেণীর নাটক যথেষ্ট আছে। নাটক নাটিকাদির এই প্রভেদ জানা না থাকায়, কেহ কেহ মহানাটককেও নাটিকা নাম দিতে ছাড়েন নাই, কারণ গ্রন্থকারেরা নায়িকার নামে নামাঙ্কিত গ্রন্থকে নাটিকা নাম দেওয়াই ব্যাকরণসঙ্গত মনে করিয়া থাকেন। আশা-করি এই ভুলটুকু সংশোধিত হইবে। নাটকে যে পঞ্চসন্ধি প্রভৃতি থাকিবার কথা তাহার একটা খটমট ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ভাল নাটক রচনা করেন, তাঁহাদের সকলের নাটকেই পঞ্চসন্ধি থাকে। দৃশ্যকাব্য যদি আভ্যন্তরীণ লক্ষণের হিসাবে নাটকের মত হয়, কিন্তু আখ্যান বস্তুটি ঐতিহাসিক না হইয়া কবি কল্পিত হয়, তাহা হইলে ঐ দৃশ্যকাব্যের নাম হয় প্রকরণ। পাঁচ অঙ্কের কম হইলে নাটক যেমন নাটিকা হয়, প্রকরণও সেইরূপ প্রকরণিকা হয়। প্রধানতঃ সমাজচিত্র লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনেক প্রকরণ এবং প্রকরণিকা রচিত হইয়াছে।

"ভাণঃ স্যাৎধূর্ত্তচরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ"

ইত্যাদি।

মৌলিক লক্ষণের হিসাবে মাইকেলের "বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁ," ভাণ শ্রেণীর। বুড়া শালিকে একটিই নায়ক, এবং চরিত্র ধূর্ত্ত-চরিত্র বটে; কাজেই এখানি প্রহসন শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে না। ব্যায়োগের বিশেষত্ব এইগুলি, যথা—খ্যাতেতিবৃত্ত,

প্রখ্যাত, বীরনায়ক বহুনরাশ্রিত, কৌশিকী বৃত্তি রহিত (অর্থাৎ মুখ্যতঃ শৃঙ্গার রস বর্ণিত নহে) এবং অঙ্গীরূপে হাস্য বা শৃঙ্গার অথবা শান্তরস প্রদর্শিত। ইহা একাঙ্ক। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকি প্রতিভা, ব্যায়োগ শ্রেণীস্থ বলা যাইতে পারে, দেবাসুরাশ্রিত করিয়া সমবকারের মত একটা বিশেষ শ্রেণী রাখিবার আবশ্যকতা নাই। একালে ডিম নামটি বড় সুবিধার নহে। কিন্তু এই শ্রেণীর একটু বিশেষত্ব ছিল। "মায়েন্দ্রজালসংগ্রামক্রোধোৎভ্রান্তাদি চেষ্টিতৈঃ, উপরাগৈশ্চ সুষ্ঠিতে ডিমঃ খ্যাতেঽতি বৃত্তকঃ" ইত্যাদি। তাহার উপর আবার "নায়কা দেবগন্ধর্বযক্ষরক্ষমহোরগাঃ।" বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর কাব্য হয়ত সৃষ্ট হয় নাই।

"নায়কো মৃগবদনত্যাং নায়িকাং ঈহতে (বাঞ্ছতি) ইতি ঈহামৃগঃ"।

একালে এই শ্রেণীটি রক্ষিত হওয়া প্রার্থনীয়। কাব্যরসিকেরা দেখিবেন যে, ইহাতে বিলক্ষণ রোমান্স আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ভাষান্তরিত রত্নাবলি প্রায় এই শ্রেণীর। ঈহামৃগ কাহাকে বলে, মুখ্যতঃ তাহাই বুঝাইবার জন্য প্রায় ২৪ বৎসর পূর্বে (১৮৯১) "পঞ্চ পরিচ্ছেদ" লিখিয়াছিলাম, এবং পরে উহা "কথা ও বীথী" নামক গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়াছিলাম, সুরচিত হয় নাই বলিয়া উহা আর মুদ্রিত করি নাই। একটি অঙ্কের কারাগার হইতে মুক্ত করিলে "অঙ্কঃ" নামক দৃশ্যকাব্যও একালে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেখানে নায়ক নায়িকার বিশেষ মিলন, গল্পের মূল অভিপ্রায় নহে, অথচ যে নাটকে করুণ-রসস্থায়ী, একালের সমাজে সে শ্রেণীর অনেক নাটক রচিত হইতে পারে, এবং হইয়াছে। সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি অবস্থার পীড়ন বর্ণনায় 'অঙ্ক' যথেষ্ট উপযোগী বলিয়া মনে হয়। সুপ্রসিদ্ধ "নীলদর্পণ" খানিকে অঙ্কশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। শৃঙ্গাররস-বহুল একাঙ্কের রোমান্সপূর্ণ দৃশ্যকাব্যকে একালে "বীথী" বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর রচনা বুঝাইবার জন্য সুমুখী নামে বীথী রচনা করিয়াছিলাম এবং উহাও এখন সাহিত্যে ত্যাজ্য মনে করিয়াছি। প্রহসন বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত। সধবার একাদশী, একেই কি বলে সভ্যতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

নাটিকার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ত্রোটকের বিশেষত্ব "দিব্যমানুষসংশ্রয়ঃ" লইয়া; নচেৎ অন্যান্য বিষয়ে নাটকের লক্ষণযুক্ত। গোষ্ঠীর কোন বিশেষত্ব নাই বলিয়া বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন দেখি না। মাইকেলের পদ্মাবতী ত্রোটক নামে অভিহিত হইতে পারে। প্রাচীনকালে সকল কাব্যই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইত; সেই জন্যই বোধ হয় প্রাকৃত-বহুল বলিয়া, সট্টক নামে নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। গ্রাম্য ভাষার প্রচুরতার হিসাবেও একালে এই শ্রেণী রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। একটি অঙ্কের সীমা ভাঙ্গিয়া দিলেই, যাহাকে একালে অপেরা বলি, তাহা নাট্যরাসকের অন্তর্ভুক্ত হয়। শৃঙ্গার এবং হাস্যরস যুক্ত বহু তাললয় সংযুক্ত অনেক নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে; সেগুলি নাট্যরাসক নামে চলিলে ক্ষতি কি? কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এই নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। "প্রস্থানে নায়কো যত্রো হীনঃ স্যাৎ উপনায়কঃ; যত্রী চ নায়িকা, বৃত্তিঃ কৌশিকী ভারতী তথা," এই সংজ্ঞায় নাটক বহুভাষায় অনেক সৃষ্ট হইতে পারে। প্রেক্ষণের স্বাতন্ত্র্য না রাখিয়া প্রস্থানের অন্তর্গত করিয়া দিলেই

চলে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিরহ, প্রথম শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য। উল্লাপ্য নানা রকম বাঁধা-বাঁধি নিয়মে নিয়মিত। একালে উহার ব্যবহার হইবে, আশা নাই।

বীররসহীন হাস্যরসাত্মক ক্ষুদ্র নাটক একালে "কাব্য" সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রহসনের কাছাকাছি হইলেও কিছু প্রভেদ আছে। প্রহসন শ্রেণীর দৃষ্টান্তে যে গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কল্কী অবতার গ্রন্থের তুলনা করিলে কাব্যের বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে এই স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষা করিলে কল্কী অবতারকে কাব্য শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যায়। হয়ত এত বিভিন্ন বিভাগের ততটা প্রয়োজন নাই। রাসক, সংলাপক শ্রীগদিত, শিল্পক এবং বিলাসিকা বিশেষত্ব বিহীন বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে। দুর্ম্মল্লিকার বিশেষত্ব আছে। কৌশিকী বৃত্তি বাঙ্গালার অধিকাংশ কাব্যেরই প্রাণ। শৃঙ্গাররস বর্ণনার বৃত্তিকে কৌশিকী বৃত্তি বলে। * বিটক্রীড়াময়, কৌশিকী ও ভারতী বৃত্তি যুক্ত দুর্ম্মল্লিকা রক্ষিত হওয়া উচিত। "নাগরনরা-ন্যূন নায়ক ঘৃষ্টিতা" একালের সামাজিক চিত্র অঙ্কনে বিশেষ উপযোগী। অমৃতলাল বসুর সামাজিক নক্সাগুলি প্রায়ই দুর্ম্মল্লিকার অন্তর্গত। নায়িকা সমান বংশজা হইতেও পারেন, না হইতেও পারেন। নাট্যরাসক যেমন এক-শ্রেণীর গীতি-নাট্য, হল্লীশ তেমনি অন্য শ্রেণীর। এ কালের যে সকল Farce কাব্য অংশতঃ অপেরার মত, তাহাকে হল্লীশ বলা যাইতে পারে। হল্লীশে, নাট্যরাসকের মত Serious প্রসঙ্গ থাকিত না। বহু নায়ক-নায়িকাপূর্ণ, বহু তাল লয়াদি যুক্ত, এবং নানা রসাশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Farce সদৃশ দৃশ্যকাব্য হল্লীশ নামে প্রচলিত হইলে মন্দ হয় না। ভাণিকার অন্যান্য প্রাচীন লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া "উদাত্ত নায়িকা মন্দ পুরুষাঃ" প্রভৃতি রক্ষা করিলে এই শ্রেণীটি হয়ত বজায় রাখা যাইতে পারে।

ইউরোপে একালে এক শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য রচিত হইতেছে যাহা Lyrical Drama নামে খ্যাত। গীতি-নাট্য বলিলে ইহার ঠিক অনুবাদ হয় না, কারণ ইহা তাললয় যুক্ত গানে পরিপূর্ণ নহে। এই শ্রেণীর কাব্য সম্বন্ধে একটু বিশেষ কথা লিখিবার প্রয়োজন আছে, কারণ কবি রবীন্দ্রনাথের অতি মনোহর বিসর্জ্জন কাব্যখানি এই শ্রেণীর। যাঁহারা খুব বেশী শিক্ষিত, তাঁহাদের কাছে ইহার চমৎকার অভিনয় করা চলে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের কাছে অভিনীত হইলে লোকে উহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবে না। যাহা মনে মনে অনুভূত হয়, মানস রাজ্যে স্থাপন করিয়া যাহার অভিনয় দেখিয়া লইতে হয়, তাহা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নহে। Browning কবির Pippa passes সুশিক্ষিত এবং সৌন্দর্য্যবোধে উদ্বুদ্ধব্যক্তিদিগের নিকট অত্যন্ত মনোহর, কিন্তু লণ্ডনের কোন রঙ্গমঞ্চে উহার অভিনয় হইলে সুশিক্ষিতেরাও অভিনয়ের সময়ে রসগ্রহণ করিতে পারিবেন না। Shakespere প্রভৃতির নাটক এমন ধরণে লেখা এবং প্রতিপদে প্রযুক্ত পাত্রদিগকে এমন করিয়া বাস্তব জগতে চালাইয়া লওয়া হইয়াছে, যে নাটকের সাধারণ ধাঁচা এবং বস্তু বুঝিয়া লইতে অথবা অভিনীত অবস্থায়

* যা প্রকরণপথাবিশেষচিত্রাশ্রীরসকুল পুরুষ বৃত্তাশ্রীতা কামোপভোগ প্রভবোপচারাসাকৌশিকী চারুবিলাস মূলা।

মোটামুটি সৌন্দর্য্যটুকু বুঝিতে সাধারণ লোকেরও ক্লেশ হয় না। We are such stuff as dreams are made of প্রভৃতি অনেক যথার্থ Lyric, Shakespere এর কাব্যে আছে; কিন্তু সেগুলি সুবোধ্য বাস্তব ঘটনার মধ্যে এমনভাবে অল্প পরিমাণে আছে, যাহাতে রঙ্গমঞ্চের সমক্ষে বসিয়াও ভাব-প্রধানতার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যাইতে পারে। কবি দ্বিজেন্দ্র লালের অহল্যা কাব্যের যে সকল স্থান সম্পূর্ণ Lyrical হইয়াছে, কোনও প্রকারে রঙ্গমঞ্চে তাহাতে রূপ আরোপ করা চলে না। গোতম, পাহাড় হইতে পাহাড়ে অগ্রসর হইতেছেন এবং দূরে দূরে "প্রতিমা দিয়া কি পুজিব তোমারে" প্রতিধ্বনিত হইতেছে প্রভৃতি, কোন প্রকার দ্রুত পট পরিবর্ত্তনে তাহা দেখান চলে না, অথচ কক্ষে বসিয়া তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা চলে। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ভাষায় বলি, যে "পাষাণী" কাব্যের "বীজ" "মুখ-সন্ধিতে" সুস্থাপিত, এবং উহার "বিমর্ষ" এবং 'নির্বহণ' অতি চমৎকার হইয়াছে; তবুও সাধারণ অভিনয়ে উহার রস উপিয়া যায়। কাব্যের "নির্বহণ-সন্ধি" কথঞ্চিৎ মুখ হইলেও, কবি রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন খানি Lyric এর গৌরবে বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয়। উহার মনোহারিত্বের কথা অনেকবার বলিয়াছি, এবং ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে বসিয়া উহা পড়িয়া অনেকবার মুগ্ধ হইয়াছি। কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছিলাম যে তিনি নিজে পুরোহিতের ভূমিকা লইয়া উহার যে অভিনয় করাইয়াছিলেন, তাহা শ্রোতাদের তৃপ্তিকর হইয়াছিল। অভিনয়টা যে সকল শিক্ষিত লোকের সমক্ষে হইয়াছিল, নিশ্চয়ই তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া রসগ্রহণ করিয়াছিলেন। না-পড়া লোকের কাছে নূতন করিয়া অভিনয় করিলে আসর জমিবে না, মনে হয়। মানস-পট খুলাইয়া যাহার অভিনয় করিতে হয়, সে শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যের একটা নূতন নামকরণের প্রয়োজন। ইংরাজিতে Lyric শব্দের গায়ে এতখানি নূতনভাব জমাট বাঁধিয়াছে, যে কেবল মৌলিক অর্থ ধরিয়া গীতি-নাট্য নাম দিলে উহা অপেরা বা নাট্যরাসকের দলে পড়িবে, অর্থাৎ কর্পূর কার্পাসে ভেদ থাকিবে না। আমার স্মরণ হইতেছে যে প্রথম মুদ্রণের সময়ে কবি রবীন্দ্রনাথ যে মুখবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে রঙ্গচ্ছলে একথাটি বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার কাব্য, নাটক কিংবা অন্য কিছু, তাহা বুঝিতে গোল হইতে পারে। অভিনয়যোগ্য নাটকগুলির শ্রেণীবিভাগের কথা বলিয়া উপসংহারে এই নূতন শ্রেণীর নাটকের নূতন একটা নামের প্রস্তাব করিতেছি। একশ্রেণীর নাটকে যখন "ঈহামৃগ" নাম চলিতে পারিয়াছিল, তখন আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যা অনুসারে এই শ্রেণীর নাটককে "মানসমৃগ্য" নাম দিলে ক্ষতি হইবে কি?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

উজানি

উজানি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সবডিবিসনের অন্তর্গত অজয়নদের তীরস্থ একটী মহাপীঠ, এখানে বিষ্ণুচক্রছিন্ন সতীদেহের কফোণি পতিত হয়। যথাঃ—

"উজানিতে কফোণি মঙ্গলচণ্ডী দেবী,
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি।"

কথিত আছে এই স্থানে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমাংশে বিক্রমকেশরী নামে এক মহাবলশালী নৃপতি ছিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের আদর্শ নৃপতি বিক্রমাদিত্যের এবং তাঁহার রাজধানী শিপ্রাতরঙ্গানীলকম্পিত মহাকাল নিকেতন উজ্জয়িনীর নাম ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পরবর্ত্তী বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অনেক রাজা বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমকেশরী উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধোল্লিখিত বিক্রমকেশরীও বোধ হয় সেই শ্রেণীর একজন রাজা ছিলেন। বোধ হয় তিনি স্বনামখ্যাত বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীর নামানুসারেই নিজ রাজধানীর উজানি নাম রক্ষা করিয়াছিলেন। যথা কবি কালিদাসের "মনসা মঙ্গলে" :—

"ভূপের ভারতী শুনি চন্দ্রপতি বলিছে
সাধুর পাশে,
উজানি নগরী বিক্রম কেশরী
বসতি তাঁহার দেশে।
রাজা মহামতি জানে বৃহস্পতি
ধনুর্ব্বেদে ভীষ্ম সম,
দাতাকর্ণ যিনি রাজ শিরোমণি
রিপুপতি যেন যম।
তার সদাগর নাম ক্রোটীশ্বর
বসতি চম্পানগরী,
তাহার সন্ততি নাম চন্দ্রপতি
আমার আখ্যান ধরি।
সাধুর বচনে হরিল রাজনে
কৈল অতি সমাদর,
মনসামঙ্গল রচিল সুন্দর
কালিদাস কবিবর।"

বিক্রমকেশরীর সাধের রাজধানী উজানি এক্ষণে কোগ্রাম নামক একখানি সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহা একটী প্রকাণ্ড নগরী ছিল। বোধ হয় বর্ত্তমান মঙ্গলকোট থানার অধীন অধিকাংশ স্থানই উজানির অন্তর্গত ছিল। মানসিংহের দিল্লী যাত্রা উপলক্ষে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন :—

"এড়ায় মঙ্গল কোট উজানি নগর।
খুল্লনার সুত সাধু শ্রীমন্তের ঘর।"

উজানি যে প্রকাণ্ড নগরী ছিল তাহাও কবির বর্ণনায় জানিতে পারা যায়। যথাঃ—

"রাজার সামন্ত নাহি পায় অন্ত
ঘুরে যদি একমাস।

উজানিতে এখন পর্য্যন্ত ৪।৫ হাত মৃত্তিকার নিম্নে বিক্রমকেশরীর প্রাসাদের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহের ভিত্তি ও সহস্রাধিক বৎসরের পুরাতন অসংখ্য ইষ্টক পরিলক্ষিত হয়।

বাংলার প্রাচীন কবি শ্রীকবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত "চণ্ডী কাব্যে" যে

উজানির বর্ণনা আছে তাহাও বর্দ্ধমান জেলার অজয়নদতীরস্থ এই মহাপীঠ উজানি। যথাঃ—

"উজানির নিকটে অজয় নদী যান।"

যাহাকে লইয়া চণ্ডীকাব্য সেই যুগযুগান্তরের দেবী মঙ্গলচণ্ডী অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই উজানিতেই চণ্ডীকাব্যোক্ত ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাসস্থান ছিল। কেহ কেহ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যোক্ত ধনপতি, শ্রীমন্ত, খুল্লনা প্রভৃতি নায়ক নায়িকাগণকে এবং তাঁহাদের বাসভূমি উজানিকে কবির কল্পনা প্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান।

কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কারণ আজ পর্য্যন্ত উজানিতে চণ্ডীকাব্যোক্ত "ভ্রমরাদহ" "মারগড়া" "ছাগচড়ানী মাঠ" "খুল্লনার ঘটস্থাপনের স্থান" প্রভৃতির স্মৃতিচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

খুল্লনা যখন শ্রীমন্তকে ধনপতি সদাগরের অন্বেষণে বিদায় দেন, তখন শ্রীমন্ত উজানির প্রান্তবাহিনী ভ্রমরার ঘাটে নৌকায় চড়িয়া ইন্দ্রানি পর্য্যন্ত যে যে গ্রামের মধ্য বা পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়াছিলেন এখনও সেই সকল গ্রামের অধিকাংশই বিদ্যমান রহিয়াছে। যথাঃ—

"প্রথমে ভ্রমরাজলে
শ্রীমন্ত নৌকায় চলে
পূজিয়া মঙ্গল চণ্ডীকায়।
এড়ায়ে ভ্রমরা পানি
সম্মুখেতে উজাবনি
নৌকে গ্রাম এড়াইয়া যায়॥
চাকদা কুমার খালা,
এড়ায় সাধুর বালা
হাড়মুর কৈল ডেয়াগণ।
কাণ্ডার মালুম কাটে
এড়াইল খানা ঘাটে
মৌলায় দিল দরশন॥
সম্মুখে হসনপুর
গড় পাঁড়া কতদূর
দৌলতপুর বাহিল তখন।
কাণ্ডার মেলায় বায়
বাঘা এড়ায়ে যায়
কালনায় দিল দরশন॥
হাটায় মেমান যায়
চড়কি এড়ায়ে যায়
আজারপুর বেনিয়ার বালা।
পার হয় নব গাঁ
তাহাতে করিল বা
উত্তরিল মাটুগিয়া কোলা॥
সম্মুখে উৎনপুর
নৈহাটী কতদূর
শাঁখাই ঘাটে দিল দরশন।
পাইয়া গঙ্গার পানি
মহাপুণ্য মনে গণি
পূজাকৈল গঙ্গার চরণ॥
মণ্ডলহাট ডাহিনে আছে
থাকিব হাটের কাছে
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখে ইন্দ্রানি
ভুবনে দুর্লভ জানি
দেব আইসে যাহার গমন॥"

ইহার মধ্যে এখন ভ্রমরার দহ উজানির নিম্নেই বিদ্যমান রহিয়াছে, নৌযাত্রা করিতে হইলে এই খানেই নৌকায় চড়িতে হয়।

মঙ্গলকোট অঞ্চলে প্রবাদ যে, তাল বেতাল সিদ্ধ বিক্রমাদিত্যই উজানীর বিক্রমকেশরী। তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের তাল বেতাল সিদ্ধির স্থান পর্য্যন্ত দেখাইয়া থাকেন

এবং মহাকবি কালিদাসকে এই উজানী রাজ্যের মুখোজ্জল সন্তান বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

উজানির ভিন্ন ভিন্ন অংশ যে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেই সময় হইতেই বিক্রমকেশরীর সাধের রাজধানী উজানির পূর্ব্বগৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই সময় হইতেই উজানির শ্রেষ্ঠ অংশ কোগ্রাম নামে খ্যাত হইয়াছে। ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এইখানেই বৈষ্ণব কবি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য বিখ্যাত লোচন দাস ঠাকুর অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের অমিয় মন্দাকিনী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবি স্বরচিত গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহার একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস।"

লোচন দাস ঠাকুর ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী ছিল; যথা :—

"মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেম ভক্তি দাতা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্বতীর্থ পূত তিঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥
যথা যাই তথাই দুলিন করে মোরে।
দুলিন দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখান আখর।
ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাঁহার॥

(শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।)

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ছাড়া, তিনি—"দুর্লভসার" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লোচন দাস ঠাকুর রচিত অনেক মধুর ধামালী পদও আছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী অপেক্ষা লোচন দাস ঠাকুর উচ্চাঙ্গের কবি ছিলেন। কবিত্ব-সম্পদে লোচন দাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মধুর পদাবলী রচনায় ও লোচন দাস অনেক বৈষ্ণব কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার ধামালী পদাবলী পাঠ করিলেই এ বিষয় বুঝিতে পারা যায়। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে লোচন দাসের তিরোধান হয়। আজ পর্য্যন্ত কো-গ্রামে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার তিরোভাবের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত পৌষ সংক্রান্তির দিন কো-গ্রামে একটী মহোৎসব ও তদুপলক্ষ্যে একটী মেলা হইয়া থাকে। লোকে তাহাকে "উজানীর মেলা" বলিয়া থাকে। মুসলমান অধিকারের সময়েও উজানীতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, বাহুল্যভয়ে এ প্রবন্ধে আর সে সকল ঘটনার অবতারণা করিলাম না। সময়ান্তরে অন্য প্রবন্ধে তাহা লিখিতে বাসনা রহিল।

স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী

পল্লীভবন

বড়ই সুখের কথা যে, এখন আমাদের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আমাদের গ্রাম ও পল্লীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। এতদিন যাহা একেবারে উপেক্ষিত ছিল, এখন অন্ততঃ সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা আন্দোলন হইতেছে।

কিন্তু আলোচনা আন্দোলনে যেটুকু কাজ হয়, তাহাই যথেষ্ট নহে; আমাদের দেশে অনেক বিষয় লইয়া অনেক সময় অনেক আলোচনা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে; তাহার দুই চারিটীর যে ফল না হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যত উৎসাহ, যত আগ্রহ, তাহা আন্দোলনেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, আসল কাজ কিছুই হয় নাই। একটা একটা করিয়া সেগুলির উল্লেখের প্রয়োজন দেখিতেছি না। এই আন্দোলনটাও সেই পথ অবলম্বন না করে, ইহাই আমাদের ভয়।

ভয়ের একটু কারণ যে নাই, তাহা নহে। কথাটা খুলিয়াই বলি। এই যে সুদীর্ঘ পূজার অবকাশ গেল, এ সময়ে আমাদের সহর নগর প্রবাসী কয়জন তাঁহাদের পল্লী-ভবনে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন, এই কথাটা আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই। পূজার পূর্ব্বে যখন যে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি "মহাশয় এবার ছুটীতে কোথায় যাইতেছেন?" তাহা, এবার ছুটীটা কোথায় কাটাইবে?" কিন্তু প্রায় সকলেই ভূগোলসূত্রে উল্লিখিত নানা স্থানের নাম করিয়াছেন; দুই একজন ব্যতীত কেহই তাঁহাদের পল্লী-ভবনের নামও করেন নাই। কলিকাতা সহরে যাঁহাদের বাস তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; যাঁহারা পল্লীবাসী, বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে নগরপ্রবাসী, আমি তাঁহাদেরই কথা বলিতেছি।

প্রথম কথা এই, আমাদের পল্লীগুলির এমন দুরবস্থা হইল কেন? আমাদের দেশের গ্রাম ও পল্লী যে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, ইহার কারণ কি? বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বলে, জানি না, কিন্তু আমাদের সহজ বুদ্ধিতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, আমাদের দোষেই আমাদের গ্রাম পল্লীর এমন দুরবস্থা হইয়াছে।

প্রথমে ধরুন, ভাল পানীয় জলের অভাব। এ অভাব কেন হইল? পূর্ব্বে আমাদের দেশের যাঁহারা জমিদারছিলেন, যাঁহারা দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, তাঁহারা সকলেই গ্রামের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেন; যাঁহার যেটুকু সাধ্য তিনি গ্রামের জন্য তাহাই করিতেন। জলাশয় খনন তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য একটী পুণ্য কার্য্য ছিল। সেইজন্য আমাদের পল্লী-অঞ্চলে কখন জলের অভাব হয় নাই; এবং ভাল পানীয় জল সর্ব্বত্র সুলভ ছিল। এখনও অনেক গ্রামে অনেক বড় বড় পুষ্করিণী রহিয়াছে, অনেকগুলি বা একেবারে মজিয়া গিয়াছে। এ সকল পুষ্করিণীর জল সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হইয়াছে। যাঁহাদের পুষ্করিণী, তাঁহারা হয় ত কেহ বহু-সরিকে বিভক্ত হইয়া নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, জলাশয় সংস্কারের সাধ্য তাঁহাদের নাই। যাঁহারা অবস্থাপন্ন তাঁহারা ত দেশের মায়া কাটাইয়া সহরবাসী হইয়াছেন; তাঁহা-দের দৃষ্টি সে সকল পুষ্করিণীর দিকে নিপতিত

হয় না। তাঁহারা নগরে সহরে সপরিবারে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন, কলের জল পান করিতেছেন; আর তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত জলাশয় সকল মজিয়া যাইতেছে। যাঁহারা দেশের মায়া কাটাইতে পারেন নাই, তাঁহারা গরিব; তাঁহাদের অন্য কোথাও যাইবার সঙ্গতি নাই; সুতরাং তাঁহারা দেশের মাটী কামড়াইয়াই পড়িয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই গরিব গৃহস্থ; অতি কষ্টে কোন রকমে তাঁহাদের দিনপাত হয়। তাঁহাদের সাধ্য কি যে, পুষ্করিণীগুলির সংস্কার করেন, বা নূতন জলাশয় খননের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা সেই সকল মলিন পঙ্কিল, নানা বিষাক্ত দ্রব্যপূর্ণ জলপান করেন। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ম্যালেরিয়া;—তাহার পর সর্ব্ব সন্তাপনাশিনী মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদিগের সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়; আর যাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহারাও জীবন্মৃত; সাগু ও কুইনাইন সম্বল করিয়া তাঁহারা দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছেন।

তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের গ্রাম পল্লী সকল জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ দোষ কাহার? আমরা পল্লীবাসী; আমরা পল্লীর এ দুরবস্থার কারণ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। আমরা দেখিতে পাই, যাঁহার দুপয়সা সংস্থান হইল, তিনি আর দেশে থাকিতে চান না, সহরে নগরে গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া অথবা বাড়ীভাড়া করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন; দেশের বাড়ী পড়িয়া রহিল। হয়ত কাহারও গৃহে বহু-দিনের দেবসেবা আছে। চক্ষুলজ্জার দায়ে ও আর নারায়ণকে নদী জলে বিসর্জ্জন দিয়া সেবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না। তাই, বিধবা মাসী, পিসি কি নিদি গ্রামের সেই ঠাকুর আগলাইয়া বসিয়া আছেন। প্রকাণ্ড বাড়ী, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বড় বড় বাগান! কিন্তু কে তাহাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করে, কে সে সব দেখে। হয় ত একজন গোমস্তা বাড়ীতে আছে; সে বেচারী প্রজার কাছে খাজনা আদায় করে, যথাসময়ে বাবুদের নিকট টাকা পাঠাইয়া দেয়। এইটুকুই সে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছে। তাহার অধিক কিছু করা তাহার যে কর্ত্তব্য, তাহা সে জানেও না, বোঝেও না। ফলে অট্টালিকা-গুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সমস্ত গৃহ, বাগান চত্বর জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে; আর মশকবৃন্দ তাহাতে চিরস্থায়ী বাসা বাঁধিতেছে। ইহাই আমাদের গ্রাম পল্লীর সাধারণ অবস্থা। যে কোন গ্রামে যাইবে; দেখিতে পাইবে অনেক বাড়ী তালাবন্ধ; বাড়ীগুলি দেখিলে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; সন্ধ্যার পর গ্রামের মধ্যে বাহির হইতে হইলে গা ছম্ ছম্ করে।

অনেকে হয় ত বলিবেন যে, এখন আমা-দের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে তাহাতে গ্রামে বাস করিলে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে কি করিয়া। পূর্ব্বে লোকের বড় একটা চাকুরী করিতে হইত না; গ্রামের দুই একজন লোক বিদেশে চাকুরী করিতে যাইত; আর সকলেই গ্রামেই বাস করিত; চাষবাস করিত; তাহাতেই এক রকমে মোটা ভাত, মোটা কাপড় চলিয়া যাইত। তখন গ্রামের শ্রী ছিল। এখন ত আর সে অবস্থা নাই; এখন অনেককেই দুই পয়সা উপার্জ্জনের জন্য দিল্লী লাহোর কোচবিহার যাইতে হয়, কালে ভদ্রে দুই চারি দিন ছুটী মিলে। এ অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইতেছে। সেকালে অল্প

দুই চারি জন ভদ্রলোক চাকুরী করিতেন; তখন কর্ম্মস্থলে পরিবার লইয়া যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। এখন ত আর সেদিন নাই; এখন বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে যখন বার মাসই বিদেশে বাস করিতে হইবে, তখন স্ত্রী পুত্র কন্যা ছাড়িয়া থাকিলে নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়। তাই এখন চাকুরীজীবিরা যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইচ্ছা করিয়া কে নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে চায়?

কথাটা যে অসত্য, তাহা আমরা বলি না। সত্যসত্যই এখন ঐ প্রকারই অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে কেহ বৎসরে একবারও পল্লীগৃহে যাইতে পারেন না, একথা স্বীকার করিতে কিছুতেই আমরা সম্মত নহি অবশ্য যাঁহারা অতি অল্প বেতনভোগী, তাঁহাদের পক্ষে মধ্যে মধ্যে সপরিবারে পল্লীভবনে গমন করা সাধ্যায়ত্ত নহে; কিন্তু আমরা ত তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা অবস্থাপন্ন, যাঁহারা জমিদার তাঁহারা দেশের মায়া ত্যাগ করাতেই দেশের এই দুরবস্থা হইয়াছে। ছুটী হইলে অনেকেই ত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে যান; এমনও অনেককে জানি যাঁহারা অবকাশ সময় কলিকাতায় বাড়ীভাড়া করিয়া বাস করেন, অথচ গ্রামে নিজের বাড়ীতে যান না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই বলেন "দেশে যে ম্যালেরিয়া, যে জলের কষ্ট, দেশে যাইয়া কি মরিব?" কিন্তু তাঁহারা মোটেই ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা যদি যাতায়াত আরম্ভ করেন, তাহা হইলেই গৃহবেষ্টিত জঙ্গল, পঙ্কিল ও মলিন জলপূর্ণ জলাশয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে এবং তাঁহারা ক্রমে ক্রমে জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধারে মনোনিবেশ করিবেন, বাড়ীর চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিবেন। তাহা হইলেই গ্রাম বাসযোগ্য হইবে। সহরের বিলাসিতার প্রলোভন ত্যাগ না করিলে চলিবে না।

শ্রীজলধর সেন

স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী

"নহে কোন কর্ম্মী নহে কোন বীর,
নহে কোন ধনী গর্ব্বোন্নত শির,
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর,
তবু কাঁদ কাঁদ জনম ভূমির,
সে এক দরিদ্র কবি।"

কয়েক মাস পূর্ব্বে গৃহস্থের পাঠকগণের নিকট বর্দ্ধমান জেলার একজন প্রাচীন সাধক কবির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। অদ্য ঐ জেলার বর্ত্তমানকালের আর একজন কবির বিবরণ লইয়া উপস্থিত হইতেছি।

জন্ম ও বংশপরিচয়

বাঙ্গীর একনিষ্ঠ সাধক, গৌরাঙ্গদেবের পরম ভক্ত স্বর্গীয় অম্বিকাচরণব্রহ্মচারী মহাশয় ১২৭২ শকের ৫ই ফাল্গুন রবিবার রাত্রি ১০ টার সময় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দেহুড়

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজসাহী দেওয়ানী আদালতের নাজির ছিলেন। মহারাজ আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত শ্রীহর্ষের পুত্র ভিত্তিসাহী গ্রামী সতের পুত্র শুদ্ধ শ্রোত্রীয় রায় পরমানন্দ দেহুর ব্রহ্মচারী বংশের প্রবর্ত্তক। শ্রীমৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গুরু শ্রীপাদ্ কেশব ভারতী প্রভুর ভ্রাতা বলভদ্র অম্বিকাচরণের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ। রাধাচাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিভুক্ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী এম্ এ, বি এল্, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এম্ এ, এম্ ডি, পি এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এম্ এ, প্রভৃতি সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বাল্যজীবন

অম্বিকাচরণ শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রামপুর বোয়ালিয়ায় পিতৃসমীপে গমন করিয়া রাজসাহী গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। "দেবীযুদ্ধ" প্রণেতা সুকবি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, কবি ও মানবতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত শশধর রায়, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় শ্রীচন্দ্র মজুমদার রাজসাহী স্কুলে অম্বিকাচরণের সতীর্থ ছিলেন। স্বর্গীয় তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় সেই সময়ে রাজসাহী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত। তিনিই ইঁহাদের রচনা শিক্ষার গুরু। "হিন্দুরঞ্জিকা" ও "রাজসাহী সংবাদ" পত্রে তাঁহাদের বাঙ্গালা রচনার হাতে খড়ি। "রাজসাহী সংবাদ" সম্পাদক জগদ্বন্ধু চৌধুরী এবং "জ্ঞানাঙ্কুর" সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদাস নিজ নিজ পত্রিকায় তাঁহাদের রচনা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিতেন। "জ্ঞানাঙ্কুর" সে সময়ে একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র ছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই অম্বিকাচরণ উক্ত জ্ঞানাঙ্কুর পত্রে কয়েকটী গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ লিখিয়া সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অম্বিকাচরণ অধিকাংশ সময় সাহিত্যালোচনাতেই অতিবাহিত করিতেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ দিতেন না; এবং স্কুলের প্রচলিত শিক্ষাও তাঁহার রুচিকর ছিল না। সেই জন্য তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করেন, এবং অব্যাহত চিত্তে সাহিত্য চর্চ্চায় ব্রতী হন।

সাহিত্য চর্চ্চা

অম্বিকাচরণ পত্রাষ্টক কাব্য, সুখপ্রাহরণ কাব্য, আমেরিকা আবিষ্কার কাব্য, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ নাটক, বঙ্গরত্ন ১ম ও ২য় ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং অনেকগুলি গান ও খণ্ড কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নববিকাশ, শান্তিকণা, শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, আনন্দবাজার ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকা, পল্লীবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েক খানি গ্রন্থ এবং অনেকগুলি গান ও কবিতা এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে।

পত্রাষ্টক কাব্য

অম্বিকাচরণ যে সময়ে সাহিত্য চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন, তখন বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের যুগ। এখন বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ।

এখন প্রায় সকল লেখকই জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদন স্বীয় দৈবী প্রতিভাবলে ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার ওজস্বিতায় ও ছন্দের নূতনত্বে বাঙ্গালা কবিতায় যে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, সে কালের সকল কবিই তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, এবং প্রায় সকলেরই লেখায় অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অম্বিকাচরণও সেই প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার "পত্রাষ্টক" কাব্য মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা" কাব্যের অনুকরণে লিখিত। বীরাঙ্গনার অনুকরণে সে সময়ে আরও কয়েক খানি কাব্য লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে পত্রাষ্টকই সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল। রামদাস সেন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাকুমার কবিরত্ন, রাজকৃষ্ণ রায়, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সুবিখ্যাত সাহিত্যিকগণ এবং প্রায় সমস্ত সাময়িক পত্রের সম্পাদক একবাক্যে পত্রাষ্টকের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

বীরাঙ্গনা ও পত্রাষ্টক

বীরাঙ্গনার অনুকরণে লিখিত হইলেও পত্রাষ্টক কাব্যে কবির মৌলিক প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই ভাব ও ভাষা কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব। বীরাঙ্গনার ভাব গম্ভীর, রচনা ওজোগুণসম্পন্ন; পত্রাষ্টকের ভাব মধুর এবং রচনা প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। বীরাঙ্গনার ন্যায় পত্রাষ্টকের পত্র কয়খানি কতিপয় পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু বীরাঙ্গনার এমন অনেক বিষয় আছে যাহা চিরন্তন হিন্দু সংস্কারের বিরোধী এবং হিন্দু পুরাণ ইতিহাসের অননুমোদিত। মধুসূদন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত, আচারভ্রষ্ট, ধর্ম্মসংস্কার পরিগ্রাহী। তিনি অনেকটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই হিন্দুর চিরাগত সংস্কারকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কিয়ৎপরিমাণে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া আবাল্য কঠোর সংযম ও বিধিনিষেধের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; নিজেও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন এবং পরধর্ম্মকে ভয়াবহ বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দু সংস্কারের বিরোধী বা হিন্দু ধর্ম্মের অননুমোদিত কোন ভাব তাঁহার রচনা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পৌরাণিক কোন চিত্রকে তিনি ম্লান করেন নাই, বরং স্থানে স্থানে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছেন।

মহর্ষির সীতা রমণীকুলের আদর্শ, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। অম্বিকাচরণও একখানি ক্ষুদ্র পত্রে মহর্ষির সেই বিরাট ভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, পতিবিরহে পতিপ্রাণা জানকী জীবন ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

"একবার লঙ্কাধামে তোমার বিরহে,
তব নাম সুধাপানে পূর্ব্বে বাঁচিয়াছি,
আবার সে নাম সুধা হয়েছে গরল,
তাই বুঝি সুধাপানে হয়েছি অমর।
আরো এক বাঁচিবার হয়েছে কারণ,
বিনয়ে নিবেদি তাহা রাজীব চরণে;—
রামরাজা হয়েছেন এবে ভবধামে,
সুখময় রামরাজ্যে সুখী সমুদয়
হেরি যত দুঃখচয়, না পেয়ে আশ্রয়
অনাথ হইয়া তারা ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আসিয়া কান্তারে, হেরি শোকাকুলা মোরে,
নিবেদিলা সুবে মেদি কৃতাঞ্জলি করি;

"জগতে যেখানে যাই সেইখানে হেরি
রামরাজ্যে সুখী সবে কেহ নহে দুঃখী ;
বল মা কেমনে তবে, কোথা যাই মোরা ;
তুমি যদি কৃপা করি দেহ গো আশ্রয়,
তবে ত থাকিতে পারি এ ভব মাঝারে,
নতুবা দুঃখের নাম যায় ভব হ'তে।"
শুনিয়া দুঃখের দুঃখ হেরিয়া নয়নে,
দিলাম আশ্রয় নাথ তা'সবারে আমি ;
সেই নাথ আছে সীতা এখন জীবিতা,
তাদের আশ্রয় হয়ে ; মরি যদি আমি
যায় তারা কোথা বল, আধার ভাজিলে
থাকে কি সলিল কভু নিরাশ্রয়ে আর।
যতদিন দুঃখচয় থাকে দেহে মোর
ততদিন মাত্র সীতা আছে ভবধামে।"

কবির এই অভিনব কল্পনাটী কি সুন্দর ! কি মধুর !

শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে "মধুর বৃন্দাবন" যেরূপ শ্রীহীন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা পাঠকালে বোধ হয় যেন স্বচক্ষে সেই ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। সাধ্য ও সাধকের মাখামাখি ভাবই সাধকের যে চরম ও পরম আনন্দ, এবং কোনও অপরিহার্য্য ঘটনাসূত্রে সেই ভাবের শিথিলতায় সাধকহৃদয় কি যেন কি হারাধন পুনঃ পাইবার আশায় যে উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় আমাদের আদর্শ সাধ্য-সাধকের সেই ভাব, সেই অবস্থা কবি শ্রীরাধিকার পত্রচ্ছলে অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়াছেন। আবার "শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি শচীমাতা" অনাবিল বাৎসল্য রসের অফুরন্ত প্রস্রবন। কবি এই পত্রগুলিতে রমণীর পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব দুই ভাবই বেশ সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্যালোচনা

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ অধিকাচরণের জীবনের প্রধান কীর্ত্তি। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে অনেক লোকের আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কয়েকজন সদস্যের চেষ্টায় পরিষদ্ পুস্তকালয়ে অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। আশা করি ঐ সকল উপকরণ হইতে অচিরে বঙ্গসাহিত্যের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হইবে। অম্বিকাচরণ ত্রিশ বৎসর কাল উক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। তিনি চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এবং ধর্ম্মমঙ্গল প্রণেতা ঘনরামের জীবনী সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গরত্ন ১ম ও ২য় ভাগ নাম দিয়া দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর-বিরচিত চৈতন্য ভাগবতের অপূর্ব্ব প্রকাশিত শেষ তিন অধ্যায় সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া কালনা হইতে প্রকাশিত "পল্লীবাসী" নামক সংবাদ পত্রের উপহার রূপে বিতরিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আর একখানি অপূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থ "ভক্তি চিন্তামণি" তিনি পাঠান্তর, শাস্ত্রীয় বচন ও বিস্তৃত কবি জীবনী-সহ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেখানি এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালের অনেক ঐতিহাসিক মহারাজ আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ বহু প্রাচীন সাহিত্য ও কিংবদন্তি হইতে সে সন্দেহ নিরাশ করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত "শূরনগর" বা "শূরো" আদিশূরের রাজধানী ছিল। তদ্বিষয়ক তাঁহার একটী প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদে পঠিত ও পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া সাহিত্য পরিষদের "সহায়ক

সদস্য ছিলেন, এবং বহু পুঁথি সংগ্রহ করিয়া পরিষদ্ পুস্তকালয়ে উপহার দিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাকে প্রদর্শনী বিভাগের অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সে ভার অন্য ব্যক্তির প্রতি অর্পিত হয়। তবে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী তাঁহার সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা ও হস্তাক্ষর প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম্ম-জীবন

অম্বিকাচরণের জন্মস্থান দেহুড় গ্রাম বৈষ্ণবদের একটী প্রধান তীর্থ। এই স্থানেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট এবং এখনও সেখানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ বর্ত্তমান। অম্বিকাচরণ স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীর ভ্রাতৃবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেশবভারতীর শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ আজ পর্য্যন্ত নিত্য তাঁহাদের গৃহে পূজিত হইয়া থাকেন। এই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করায় বাল্যকালেই তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল, এবং তিনি চির-জীবন শ্রীগোবিন্দদেবের পরম ভক্ত ও শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। "নামে রুচি, জীবে দয়া" তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তাঁহার দীনতা-ব্যঞ্জক প্রতিভাদীপ্ত নয়ন যুগল ও প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখিলে হৃদয়ে স্বতঃই ভক্তির উদ্রেক হইত। তাঁহার নিত্যানন্দ নাটকের অভিনয় দর্শনে অতি কঠোর হৃদয় ব্যক্তিও অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই। সংসারের অনেক ঝঞ্ঝাবাত্যা তাঁহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। পত্নী বিয়োগ, উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ইষ্টদেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সকল প্রকার সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা তিনি নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, তিনি "তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু" ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। বৈষ্ণব-সমাজ কর্ত্তৃক তিনি "ভক্তি রত্নন" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা থাকিলেও অন্য ধর্ম্মে তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহাত্মগণকে তিনি অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন।

উপসংহার

গত ১৩২১ সালের ৩রা মাঘ রবিবার রাত্রি ৯টার সময় অম্বিকাচরণ ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিনয়ী, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তিনি চিরজীবন নীরবে সাহিত্য সেবায় ও ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিয়াছেন; কখন বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করেন নাই। তিনি সংসারী হইয়াও সংসারে অনাসক্ত ছিলেন। এক সময়ে ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহাকে সব্‌ডেপুটীর কার্য্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অর্থোপার্জ্জনে স্পৃহা না থাকায় অম্বিকাচরণ সে কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। সেই সকল কারণে শেষ জীবনে তাঁহাকে কিছু অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

অম্বিকাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী পিতার ন্যায় সাহিত্যানুরাগী ও স্বধর্ম্মপরায়ণ। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনিও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন।

শ্রীকামিনীনাথ রায়

লণ্ডনে সমাজসেবা

(Social Se in London)

গত অক্টোবর মাসের 'সোস্যাল সার্ভিস কোয়ার্টারলী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এন্, এন্ মজুমদার বিএ, বি এস্‌সি (লণ্ডন) মহাশয় লণ্ডনে সমাজ-সেবা সম্বন্ধে একটী সুলিখিত, নানা জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডনে সেবাব্রত কিরূপ বিস্তৃত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে চলিয়া থাকে তাহা হইতে নবভাবে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষের অনেক শিখিবার আছে। আমরা নিম্নে উক্ত প্রবন্ধটীর সারাংশ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ভারতবর্ষে সমাজ-সেবার একান্ত আবশ্যকতা এক্ষণে আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। সমাজ বলিয়া যে একটা প্রাণবান্ জিনিষ আছে তাহা এখন সকলে অনুভব করিতেছেন। ভারতীয় সমাজদেহ যে নানা রোগ গ্রস্ত, ভারতীয় সমাজের উন্নতির জন্য সমাজ-সেবা যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছেন। সমাজ সেবা শুধু মুষ্টিভিক্ষা দান নহে, ইহার এতদপেক্ষা অনেক উচ্চতর অর্থ আছে, সুতরাং বর্ত্তমান জগতে ইহাকে নিয়ন্ত্রিত ভাবে চালাইতে হইলে সুচিন্তিত প্রণালী ও জোট বাঁধা দরকার—একথা এখন আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সমাজকে পূর্ণভাবে উন্নত করিতে হইলে সমাজের লোকেরই চেষ্টা করিতে হইবে। বাহিরের লোকের করুণা কখনও কোনও সমাজের বা জাতির শক্তি-সঞ্চার করিতে পারে না।

প্রতীচ্য হইতে আমাদের অনেক বিষয় শিখিবার আছে। এখন আমাদের সমষ্টি জ্ঞানের উদ্রেক হইয়াছে, সমাজের রক্ষা ও কল্যাণের কথা ভাবিবার প্রবৃত্তি বহু আশা সম্মুখে লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই সেবাব্রতে অগ্রসর প্রতীচ্য হইতে সামাজিক কর্ত্তব্যের বিষয়ে শিক্ষা লইতে হইবে। মানুষকে শক্তিশালী ও কার্য্যক্ষম করিবার জন্য, তাহার শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য জগতে কতশত স্বেচ্ছাসেবী স্বেচ্ছায় কর্ম্মব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। লণ্ডনেই সমাজহিতসাধনের কেন্দ্রস্থান। কি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া, লণ্ডনে নানাবিধ হিতসাধন সভা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, কি পদ্ধতিতে সেখানে সমাজ-সেবকগণ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের চেষ্টা কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছে প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়া ভারতীয় নব্য সমাজ-সেবকগণ অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন।

শিশু-সেবা

প্রথমে জাতির যাহারা ভবিষ্যৎ সেই শিশুদের কথা ধরা যাউক। জাতির ভবিষ্যৎ শিশুর উপরেই নির্ভর করে। লণ্ডনে তাই শিশুদের মঙ্গলের জন্য শত শত সমিতি গঠিত হইয়াছে। শিশুদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রয়াস কেবল লণ্ডন নগরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; এই আন্দোলন সমগ্রদেশব্যাপী। বালক বালিকাগণের শারীরিক, মানসিক ও

নৈতিক পুষ্টির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত গুণগুলির পূর্ণ বিকাশের জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য 'শিশু-পর্য্যবেক্ষণ-সমিতি' (Child Study Society) নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা হইতে Child Study ও Child নামক যে দুই খানি পত্রিকা বাহির হয়, তাহা শিশুজীবন সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ ও আলোচনায় পূর্ণ থাকে। জননীর লালন পালনের প্রভাব শিশুর ভবিষ্যৎ চরিত্রের উপর বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। নারীজাতিকে নিম্নে ফেলিয়া কোন দেশ উচ্চে উঠিতে পারে না। মাতৃত্বের কঠোর দায়িত্বে দীক্ষা দিবার জন্য লণ্ডনে তাই বহুসংখ্যক "মাতৃসভা" (Mothers' Association) আছে। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের পরিপোষকতায় অনেকগুলি "স্ত্রী-মণ্ডলী" (Women's Institutes) গঠিত হইয়াছে। সন্তানপালন সম্বন্ধে সেখানে প্রায়ই বক্তৃতা দেওয়া হয়। যে সকল দরিদ্র জননীকে কারখানায় বা ক্ষেত্রে কাজ করিতে হয় তাহাদের শিশুদিগকে দিবাভাগে লালন করিবার জন্য "দিবা লালন-আগার" (National Society of Day Nursuries) আছে।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন ভারতবর্ষের কল কারখানাতে স্ত্রী মজুরেরা প্রায়ই বাধ্য হইয়া শিশুদিগকে কর্ম্মস্থলে আনিয়া থাকে অথবা অহিফেন সেবন করাইয়া শিশুকে শান্ত ও নিদ্রিত করাইয়া রাখে। কারখানার ঘূর্ণিত বায়ু ও কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া শিশুদের যথেষ্ট স্বাস্থ্যহানি হয় এবং অনেক স্থলে যৌবনে বলিষ্ঠ ও সুস্বকায় হইবার আশা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। শিশুদিগকে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ভালভাবে প্রতিপালন করিবার জন্যই "লালন আগারের" প্রতিষ্ঠা। ইহার আর একটী কাজ আছে—স্ত্রীলোকদিগকে সন্তান-পালনে শিক্ষা দেওয়া। যে সকল বালকবালিকা স্কুলে যায় তাহাদিগের জন্য 'শিশুতত্ত্বাবধান সমিতি' আছে (Children's care Committees) । এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীলোক, কেহ কেহ বা স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট। ইহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট ভাবে কাজ করিয়া থাকেন। ছেলেদের কল্যাণ ও পুষ্টিবর্দ্ধনে তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের গৃহ ও পরিবারগণের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, এবং যাহাতে সন্তানগণ স্বাস্থ্যবান্, প্রফুল্ল বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠিতে পারে তদ্বিষয়ে পিতা-মাতাদের শিক্ষা দেন।

দরিদ্র, গৃহহীন, অত্যাচার-পীড়িত, বিকলাঙ্গ, রুগ্ন বালকবালিকাদিগের প্রতি সমাজসেবকের সবিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস এই সকল হতভাগ্যের দুঃখ দূরীকরণার্থ নিয়োজিত হইয়াছে। দুঃখীর সন্তানের বাসের জন্য গৃহ, শিক্ষার জন্য শিক্ষাগারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তরুণ অপরাধীর জন্য সংশোধনশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহহীন শিশুর নিমিত্ত কুটীর Cottage Homes আছে। অনেকগুলি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। রেডহিলের (Redhill) "বিশ্বহিতৈষিসভা" (Philanthropic Society) এইরূপ একটী বিদ্যালয় পরিচালন করিয়া থাকেন। এই সভা প্রায় আট হাজার বালকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। তাহারা কৃষিবিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর

শিক্ষা পাইয়া, এখন স্বদেশের ক্ষেত্রে বা উপনিবেশে কাজ করিতেছে। "পরিত্যক্ত নিঃস্ববালকহিতৈষিণী সভা" (The waifs' and Strays' Society). প্রায় ৪,৫০০ বালককে ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। কতশত অসহায়, গৃহশূন্য, নিরুপায় বালক এই সভার সহায়তায় আশ্রয়, ভরণপোষণ ও শিক্ষা পাইয়া কালে কার্য্যক্ষম, উপার্জ্জনক্ষম মানুষ হইতে পারিয়াছে। "Referee Dinner Fund" গত কুড়ি বৎসর অভাবগ্রস্ত বিদ্যালয়ের বালকগণকে আহার জোগাইয়া আসিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা সমিতি এখন ভোজনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থানে ছুটির দিনও ছেলেদের খাইতে দেওয়া হয়। এই সমিতির নিযুক্ত চিকিৎসকগণ মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

অনাথ, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, খঞ্জ, বধির, মূক বালকদিগের জন্য অসংখ্য আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। ডাক্তার বার্ণার্ডোর আশ্রমে এক হাজার বালক স্থান পাইয়াছে। ইহা ছাড়া "উপেক্ষিত শিক্ষা-বিজ্ঞান-মণ্ডলী" (*The Ragged School Union*) ৭০০০ বিকলাঙ্গ ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন। বালকদিগের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার নিমিত্ত Queen's Hospital প্রভৃতি অনেকগুলি আরোগ্যশালা (Hospital) খোলা হইয়াছে এবং তাহাদের পীড়াবসানে স্বাস্থ্যলাভের জন্য পঞ্চাশটীর উপর স্বাস্থ্যনিবাসের বন্দোবস্ত আছে। "জাতীয় শিশুনিবাস" (The National Children's Home) নামে Harpendenএ এইরূপে একটী স্বাস্থ্যনিবাসে দীন বালকের চিকিৎসা চলিয়া থাকে। এখানে রোগীরা যাহাতে গৃহের ন্যায় স্বচ্ছন্দে এবং আনন্দে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারে তাহার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। "শিশুর প্রতি দুর্ব্যবহার নিবারিণী সভার" শাখা সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সভার সভ্যগণ শিশুগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের নিবারণ ও প্রতিবিধান করিয়া থাকেন। *The children's fresh air Mission* এবং *Country Holiday Fund* নগরের দরিদ্র বালকদিগকে পল্লীর মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং ভ্রমণের সুযোগ দিয়াছেন। *The children's Happy Evenings Association* হইতে চল্লিশ হাজার বালকবালিকার জন্য স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমতী হাম্‌ফ্রী ওয়ার্ড—প্রতিষ্ঠিত *Evening Play Centres* ছেলেদের খেলিবার খরচ যোগাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় অনেকে Boy Scouts আন্দোলনের কথা শুনিয়া থাকিবেন। এই সকল বালক গুপ্তচর শত্রুনিবাসের চারিপার্শ্বে পরিভ্রমণ করিয়া শত্রুসৈন্যের সংখ্যা, অবস্থান, পরিচালন প্রভৃতি সম্বন্ধে সন্ধান দেয়। বিলাতে The Boy Scouts Association এ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বালক গুপ্তচর আছে। Scoutএর বিষয় শিখিবার সময় বালকেরা অনেক প্রকার কার্য্যোপযোগী জ্ঞান পাইবার সুবিধা পায়। বালিকাদিগের নিমিত্ত এইরূপ "বালিকা শিক্ষাবিধান" (Girl Guide) আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। Guide সভা বালিকাগণের শারীরিক উন্নতিদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। তাহারা এখান হইতে গৃহস্থালীকাজ, সমাজসেবা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিল্পকর্ম্ম, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা পায়। সমাজের সকল শ্রেণীরই বালকবালিকারা এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে।

Batcombeতে তরুণ অপরাধীদিগের সংশোধনের নিমিত্ত যে "শিশু সাধারণ তন্ত্র" (Little common wealth) এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা এক অভিনব ব্যাপার। ইহার নাগরিকগণের বয়স চৌদ্দ হইতে সতের! তাহারা নিজেদের শাসন নিজেরাই করিয়া থাকে। তাহাদের নিজেদের আইন-ব্যবস্থাপক, পুলিশ, বিচারক এবং শাসক আছে। তাহাদের "জনসাধারণের" মতবাদ পরস্পরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহারা খাটিয়া পয়সা উপায় করে, আইন ও শান্তির কদর করিতে শিখে এবং দুর্বৃত্তি ছাড়িয়া যাহাতে দশের ও দেশের উপকারে আসিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করে। কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী ও স্বেচ্ছা-সেবক লইয়া "শিশুপরামর্শদানমণ্ডলী" (The Juvenile advisory Committees) গঠিত হইয়াছে। যখন ছাত্রগণ স্কুল ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশ করে এবং জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কাজের জন্য ছুটিয়া বেড়ায়, তখন উক্ত মণ্ডলী তাহাদের কাজ জুটাইয়া দেন। দারুণ বেকার সমস্যার নিরাকরণের জন্য ইহা একটি সুন্দর উপায়। আমাদের অভাগা বেকারদের উদরান্ন জুটাইয়া লইবার জন্য কেহো (practical) পরামর্শ দিবার ভার কাহারা লইবেন, তাহাদের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র কাহারা প্রস্তুত করিবেন?

শিক্ষা

ইংল্যাণ্ডে অসংখ্য শিক্ষাসংঘ গড়িয়া উঠিতেছে। আমরা এই প্রবন্ধের মাত্র কয়েকটীর উল্লেখ করিব। ব্রিটিশ ও বৈদেশিক বিদ্যালয় সংহতি (*The British and Foreign Schools Society*) প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এই সংহতিই প্রথমে বিলাতে শিক্ষার আন্দোলন তুলেন অল্পদিন হইল শিক্ষাদান রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আইনের সাহায্যে সকলকে লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইহারাই দেশকে শিক্ষিত করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। "জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ" (The National Educational Association) এইরূপ আর একটী সংঘ।

কিন্তু "শ্রমজীবি শিক্ষা পরিষৎ"ই (Workers Educational Association) বিলাতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। পরিষৎ উক্ত W. E. A. নামে সকলের নিকট পরিচিত। ইহা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এত অল্পকালের মধ্যেই সহস্রাধিক, সমিতি, শ্রমজীবি-সম্মিলন (Trade Unions) কো-অপারেটীভ কমিটি, শিক্ষক সম্মিলন, (Teachers Union) যুবক বিদ্যালয় "Adult schools" সহায়ক সমিতি "friendly Societies" রবিবাসরীয়বিদ্যালয় প্রভৃতি সকলের মিলনক্ষেত্র হইয়াছে। বিলাতের মজুরগণের মধ্যে লেখাপড়া শিখিতে কি আগ্রহ তাহা শ্রমজীবি-শিক্ষা-সমবায়ের কার্য্যাবলী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। মজুরেরা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষার জন্য প্রথম আন্দোলন তুলে। ১৯০৭ সাল হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি উচ্চশিক্ষা বিষয়ে তাহাদের সাহায্য করিতেছেন। শিক্ষাসমবায়ের কর্ম্মি-গণ শ্রমজীবিগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া থাকেন এবং শিক্ষার যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাঁহারা মজুরদিগের শিক্ষাসংক্রান্ত অভাব অসুবিধা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া অধ্যাপক ও বিদ্যালয় পরিচালকগণের সহিত পরামর্শ করেন। শিক্ষাসমবায়ের উদ্যোগে রিপোর্ট, পুস্তিকা,

পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। লণ্ডনে ইহাঁর তত্ত্বাবধানে একটী প্রকাণ্ড কলেজ চলিতেছে। কলেজে ১১৭টী ক্লাস আছে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা তিন হাজারের বেশী; ছাত্রীর সংখ্যা মোটের উপর ৬০০ এবং তাহাদের মধ্যে অনেককেই মজুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। সন্ধ্যাকালে ক্লাস বসে এবং প্রত্যেক ছাত্রকে তিন বৎসর এই কলেজে পড়িতে হয়। প্রত্যেক শ্রেণীতে ৩০ জনের অধিক ছাত্র লওয়া হয় না। কলেজে বক্তৃতা করা ছাড়া শিক্ষকগণ বাহিরে সমিতিতে, দম্মিলনে, কো-অপারেটিভ সোসাইটীতে, অন্যান্য স্কুলে, কলেজে, এমন কি গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ছাত্রীরা কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া গৃহস্থালী-বিজ্ঞান, সূচীর কাজ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সন্তান-পালন প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সরকারের তরফ হইতে যে সকল কমিশনার নিযুক্ত হন তাঁহারা এই সকল শ্রমজীবিছাত্র-গণের বিদ্যা ও জ্ঞানলাভের আগ্রহ দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রেরই উচিত দেশের মজুরগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করা, এখানেই ইহার সার্থকতা।" একবার কোন শ্রমজীবিশিক্ষাসমবায়ের ছাত্র বলিয়াছিলেন, "জীবনের উদ্দেশ্য জীবনের মলিনতা সম্পূর্ণরূপে দূর করা।" কুলীমজুরগণের অবস্থার উৎকর্ষসাধন ও তাহাদের জীবনকে উন্নত করিবার মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া শ্রমজীবিশিক্ষা-পরিষদের কর্ম্মিগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অপরাধী

অপরাধিগণের সংশোধন করিয়া সমাজে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কতকগুলি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। The Barstal Association এবং ইহার শাখাগুলি প্রতি বৎসরে সহস্রাধিক তরুণ অপরাধীকে উদ্ধার করে। (*The Central Association for the aid of discharged convicts*) মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর সাহায্যের জন্য যে কেন্দ্রসভা আছে সেখান হইতে বয়স্ক কয়েদীদিগকে খোঁজাইয়া লওয়া হয়। সভার অন্তর্গত শাখা সমিতিগুলি তাহাদের কারাবাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ভার গ্রহণ করেন। তাহাদের অবস্থাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে তদন্ত করা হয় এবং কারামুক্তির পরই যাহাতে তাহারা সাধুপথে থাকিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দেওয়া হয়।

দৈন্য নিবারণ

শুধু দরিদ্রের দুঃখ দূর করিয়া লণ্ডনের সমাজসেবিগণ নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহারা দারিদ্র্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চাহেন। ১৯১২ সালে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী সিডনি ওয়েবের উদ্যোগে জাতীয় দারিদ্র্য-নিবারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুদিগের শরীর ও মনের প্রকৃত পুষ্টির প্রতি যাহাতে অবহেলা করা না হয়, দুর্ব্বলমতি ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যা, যক্ষ্মারোগ নিবারণ, জীবন বীমার আবশ্যকতা, আলস্য, শৈথিল্য, শ্রমবিমুখতা নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়াই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রায় পাঁচশত বক্তা ও লেখক এই সভার অন্তর্ভুক্ত আছেন। তাঁহারা দরিদ্র-তার কারণ ও নিবারণের উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা করেন, ও কাগজে লিখিয়া

থাকেন। দারিদ্র্য-ব্যাধি আরোগ্য করা চাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির (prevention) আক্রমণ হইতে সকলকে রক্ষা করা আরও বেশী দরকার। তাই "দারিদ্র্য-নিবারিণী-সভা" রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

নারী-মণ্ডলী

নারীদিগের মঙ্গলার্থে নারীদিগের দ্বারা পরিচালিত বহুসংখ্যক সমাজসেবাসদন আছে। "(সমাজ) সেবিকামণ্ডলী" (Women's League of Service) রোগীর শুশ্রূষা, স্ত্রী-চিকিৎসক দ্বারা শিশুগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও শিশুপালন বিষয়ে উপদেশ দিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

সমাজের কল্যাণকর আইনসমূহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য নারীসেবকগণ গত বৎসর পার্লামেণ্টের সভ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন। *'Women's Imperial Health Association'*; 'Federation of Universal women', 'Women's co-operative guild' প্রভৃতি বহুসংখ্যক মহিলা সমিতি স্ত্রীজাতির জীবনকে উন্নত ও শক্তিশালী করিয়া তাহাদিগকে সন্তানপালন, গৃহস্থালী ও সামাজিক কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অন্তর্জাতিক সমাজ-সংস্কার সম্মিলন

(International Institute for Co-operation in Social Reform) নামে ইয়োরোপব্যাপী যে সম্মিলন আছে, তাহারই এক শাখা লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইয়োরোপের বেড়শত প্রধান প্রধান নগরে সম্মিলনের শাখা বিস্তৃত। পৃথিবীর যে যে স্থানে সমাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কাজ চলিতেছে, সেই সেই স্থানে কি কি সুফল ফলিয়াছে এবং কোন্ কোন্ সামাজিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে,—এই সকল কার্য্যকর জ্ঞান সমাজসেবকমণ্ডলীগুলির মধ্যে বিস্তার করাই "অন্তর্জাতিক সমাজসংস্কার সম্মিলনে"র প্রধান কাজ।

দানমণ্ডলী

CHARITY ORGANISATION.

দরিদ্রের ভরণপোষণার্থ লণ্ডন নগরীতে যে সকল মণ্ডলী আছে Charity Organisation Societyই সর্ব্বপ্রধান। এই সভা সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিয়া অর্থহীন, অক্ষম লোকদিগের সাহায্যে ব্যয় করিয়া থাকেন। দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থদানই ইহাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি ও দারিদ্র্য নিবারণই ইহাঁদের লক্ষ্যীভূত। তাই উক্ত সভার সভ্যগণ শৃঙ্খলার সহিত নিয়মবদ্ধভাবে সাহায্যদানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা শুধু ব্যক্তিগত দৈন্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, দরিদ্র সমাজের অর্থহীনতার কারণ কি কি তাহার অনুসন্ধান ও বিচার করেন। কোন দুঃখীকে সাহায্য করিবার পূর্ব্বে সভা তাহার অবস্থাদি বিষয়ে তদন্ত করেন। প্রায়ই দেখা যায় নিজেদের দোষে ও চরিত্রহীনতার ফলে দরিদ্র লোকেরা ডুবিতেছে। সে ক্ষেত্রে সভ্যগণ তাহাদের চরিত্রের দোষগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, কারণ কেবল মাত্র অর্থ সাহায্য দ্বারা এইরূপ লোকের অবস্থা স্থায়ীভাবে ভাল করা যায় না। সাহায্য দানের সময় তাঁহারা গৃহস্থালী অর্থ নীতি, গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মিতব্যয়িতা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি বিষয়ে নানা ভাবে

শিক্ষা দিয়া থাকেন। ব্যক্তি বিশেষের অনুষ্ঠিত সেবাকার্য্য ও দান এখন সমাজের দুঃখ এবং অভাব মোচনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠানগুলিকে একটী সমূহে বাঁধিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে একদল উপযোগী কর্ম্মী গড়িয়া উঠিতেছে। Charity Organisationএর আর একটী কাজ দরিদ্রগণ যাহাতে নিজেরা নিজেদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সভা সমিতি করিয়া আত্মনির্ভরতা শিখিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দেওয়া। দরিদ্রকে দান-নির্ভর করিয়া রাখিলে, তাহার আত্মনির্ভরতা হারাইয়া পঙ্গু হইয়া পড়িবে। কাজে কাজেই তাহাদিগকে আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল শিক্ষাদানই শ্রেষ্ঠদান।

ব্যক্তিগতভাবে সেবা
PERSONAL SERVICE.

যাঁহারা অর্থ দিয়া সমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থ নহেন, তাঁহারা তাঁহাদের কিছু সময় ও কাজ সমাজসেবায় অর্পণ করেন। এই স্বেচ্ছাসেবী কর্ম্মিগণের একটী সম্প্রদায় আছে (Prsonal Service Association)। লোকের সহিত মিশিয়া আত্মীয়ের মত ব্যবহারের দ্বারা তাহাদের হৃদয়ের প্রসার, সদালোচনা দ্বারা তাহাদের জ্ঞানের বিস্তৃতি, নানা বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ভাব ও চিন্তার বিস্তার প্রভৃতি এইরূপ সমিতির চেষ্টায় অনায়াসেই সিদ্ধ হয়।

কর্ম্মিগণের উৎসাহ ও কর্ম্মে আগ্রহ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে কাজের উপযুক্ত সেই কাজে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা দরিদ্র পরিবারগণের সহিত আলাপ পরিচয় রাখিয়া, দরিদ্রতার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং তাহার যদি কোনও প্রতীকার থাকে তাহার ব্যবস্থা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবাধর্ম্ম
UNION & SOCIAL WORKS.

বর্ত্তমানে সেবাব্রত কিরূপ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চলিতেছে তাহা লণ্ডন নগরীর "বিশ্ববিদ্যালয়-সেবাশ্রমের" (Universal Settlement) কার্য্যপ্রণালী হইতে বুঝা যায়। ইহা সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য একটী 'ল্যাবরেটারী' পরীক্ষাগার বিশেষ। যাঁহারা সেবাধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সেবাকার্য্য বিশেষ করিয়া শিখান দরকার। নচেৎ তাঁহাদের উৎসাহ ও চেষ্টা যথোচিত কার্য্যকরী হইবে না। কাজের যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া শুধু উৎসাহের উত্তেজনায় 'নিখিরাম সর্দ্দারি' করিতে যাইয়া যে কি বিড়ম্বনা আমরা তাহা বেশ বুঝিয়াছি। লণ্ডনে কেজো শিক্ষাদিবার জন্য সমাজবিজ্ঞানবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণকে সমাজতত্ত্বে শিক্ষিত করিতেছেন।

বর্ত্তমান বাণিজ্য প্রধান যুগে কলকারখানার দিনে পৃথিবীর অনেক স্থলে বড় বড় নগর গড়িয়া উঠিতেছে, ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিভেদ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। অর্থবান্ মূলধনদাতা ও দরিদ্র শ্রমজীবির এই যে বিরোধ ইহা কখনই সমাজের মঙ্গলজনক নহে। তাই আজ নূতন নূতন সামাজিক সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এইরূপ সমস্যার মীমাংসার নিমিত্ত সুবিখ্যাত Toynbee Hall এর স্থাপনা। এই Toynbee Hall এর উৎসাহে বিশ্ববিদ্যালয় সেবাশ্রম অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এই Toynbee Hall এরই দৃষ্টান্তে শতশত বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্র ও ছাত্রী, দরিদ্রের হিতার্থে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন এবং দরিদ্রের জীবনকে উন্নত করিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। *Bermondsey*র Oxford-সেবাশ্রম এবং *Southwark*এর মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়-সেবাশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৭ সালে *Oxford* ও Cambridgeএর অন্তর্ভুক্ত মহিলাকলেজগুলি সম্মিলিত হইয়া Southwarkএ "আশ্রম" খুলেন। উহাই মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়-সেবাশ্রম নামে পরিচিত।

Southwarkএর অধিবাসীদিগের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। সকল সময়ে তাহাদের কাজ কর্ম্ম জুটে না, তাই তাহারা চিরদিনই কপর্দ্দকহীন, ভালরূপ আহার বা থাকিবার স্থান পায় না। তাহার উপর অতিশয় পানাসক্তি প্রভৃতি নানাবিধ পাপ আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই সকল হতভাগ্য পানাসক্ত, চরিত্রহীন দরিদ্রের মধ্যে আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রমণীগণ "আশ্রম" স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে যে সকল সম্প্রদায় Southwark এ কাজ করিয়া আসিতেছিলেন, ইঁহারা তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেইজন্য তাঁহারা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দিকে প্রথম মনোযোগ দিলেন। কারণ সমাজের দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব অক্ষমতা দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভবিষ্যতের আশাস্থল বালকবালিকাদের তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। স্কুলগুলিই ক্রমে তাঁহাদের কার্য্যের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল এবং স্কুলের ভিতর দিয়াই বালকগণের পিতামাতার সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। বিকলাঙ্গ বালকবালিকার শিক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা পরিচিত বহুসংখ্যক বিদ্যালয় খোলা হয়। (ইহার বহু বৎসর পরে London County Councilএর মনোযোগে বিকলাঙ্গদিগের দিকে আকৃষ্ট হয়)। ১৮৯৪ সালে উক্ত আশ্রমের তত্ত্বাবধানে "বালিকা-সমিতি" (Girl's Club) নামে বালিকার জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। "বালিকা-সমিতি" গ্রীষ্মের ছুটিতে পল্লীভ্রমণ, নানাপ্রকার ক্রীড়া ও ব্যায়াম, আমোদ প্রমোদ, সান্ধ্যসম্মিলন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন কি "সমিতি"র বালকবালিকার কমিটি হইতে একখানি পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্কুলের ছেলেরা যখন স্কুল ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশ করে তখন "আশ্রম" তাহাদের কাজকর্ম্ম শিখিবার ও জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেন। প্রয়োজন হইলে ব্যবসা বা কাজ শিখিবার জন্য অর্থ সাহায্যও দিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্টের Juvenile Advisory Committee নামে যে কমিটী আছে তাহা "আশ্রমের" সেবকগণের নিকটেই পরামর্শ করিয়া থাকেন এবং কমিটীর কার্য্যে উঁহারাই প্রধান সহায়।

"British Institute of Social Service" একটী বিরাট আয়োজন। ইহা সমগ্র বিলাতের সমাজসেবা আন্দোলনের মস্তিষ্ক স্বরূপ, একটী সামাজিক "Clearing House" এখানে সব ময়লা দূর করিয়া সমাজকে বিশুদ্ধ করা হয়। পৃথিবীর যাবতীয় সমাজের অবস্থা, বিভিন্ন সেবকসম্প্রদায়ের চেষ্টা, কার্য্যপ্রণালী, বিবিধ সমাজসমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞাতব্য facts ও figuresএর ইহা ভাণ্ডার বিশেষ। দেশ দেশান্তরের সমাজসেবিগণের নিকট হইতে ভাব, জ্ঞান চয়ন করিয়া British Institute of Social Service সঞ্চয় করিয়া রাখেন। যাহাতে দেশে সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়,

যাহাতে সেবাব্রত বিস্তৃতভাবে চলিতে থাকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় মিলিয়া বিধিবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারেন, তাহার জন্য এই সভা বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। কোন বিশেষ বিষয়ে ভালভাবে অনুসন্ধান করিবার জন্য সভা হইতে মধ্যে মধ্যে লোক নিযুক্ত করা হয়। সেবকগণের শিক্ষা ও সুবিধার জন্য সমাজসম্বন্ধে নানা বিষয়ের প্রবন্ধ ও পুস্তক এবং একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। British Institute of Social Service-এর উদ্যোগে সমাজের সেবাকার্য্যে উৎসাহী ব্যক্তিগণের সম্মিলনের মাঝে মাঝে কনফারেন্স বসিয়া থাকে। পার্লামেণ্টের ভিতরেও উক্ত সভার একটী Committee ও Council আছে।

সমাজসেবা—শিক্ষাদান ব্যবস্থা

TRAINING FOR SOCIAL WORK.

সমাজসেবায় নিযুক্ত অন্যান্য সভা সমিতির কথা বলিতে যাইয়া যদি একটী বিষয়ে কোন কিছু না বলি তাহা হইলে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। নূতন কর্ম্মীদিগকে সেবাব্রতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের মধ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত লণ্ডন অর্থনীতি বিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে শৃঙ্খলার সহিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাজতত্ত্ব শিখান হয়। অধ্যাপক Ursurck এই বিভাগের কর্ত্তা এবং অধ্যাপক Hobhouse, Westermark প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানবিদ্‌গণ অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। শুধু কাজ করিবার সঙ্কল্প থাকিলেই কাজ করা যায় না, তদুপযোগী শিক্ষা ও অভ্যাস চাই। যাঁহারা জনসাধারণের কল্যাণার্থ আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদিগকে সামাজিক কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিবার নিমিত্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। যে সভা-সমিতি সেবাকার্য্য চালাইতেছেন, ছাত্রগণ সেইগুলির সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে সামাজিক বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

উপরে লণ্ডনে সমাজসেবার আয়োজন ও অনুষ্ঠানের কথা বলা হইল। ভারতবর্ষে কিরূপভাবে জনসাধারণের মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে তাহা সুধী ও দেশহিতৈষিগণের ভাবিবার বিষয়। আমাদের এখন প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব। অর্থ অপেক্ষা লোকসাধারণের সেবায় উৎসর্গীকৃত চরিত্রবান্ দৃঢ়সংকল্প আশান্বিত কর্ম্মীর প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। যাঁহারা যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া, সমূহ গড়িয়া, সেবাকার্য্যে সফলতা আনিতে পারিবেন, ভারতবর্ষের অশিক্ষিত উপেক্ষিত, মুমূর্ষু মানবসমষ্টি আজ তাঁহাদেরই দিকে আশাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া আছে। এই যে আজ কোটী কোটী নরনারী অজ্ঞতা, কুসংস্কারের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে, তাহার উপর তাহারা দারিদ্র্য দুর্গতির গহ্বরে নিয়তই ডুবিতেছে। তাহাদের মুখে অন্ন নাই, দেহে শক্তি নাই, রোগে চিকিৎসা নাই, হৃদয়ে বল নাই, মনে আনন্দ নাই, আশা নাই, তাহারা যে চিরদিনই উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত! চৈতন্যদেবের পর আর তাহাদের কথা কে ভাবিয়াছে? কয়জন কর্ম্মীর কর্ম্মশক্তি তাহাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হইয়াছে? এই যে সামর্থ্যহীন, নির্জ্জীব মানবসমাজ ইহার প্রাণ বলশালী করিতে হইবে, ইহাদের আঁধার কুটীরে জ্ঞানের আলোক দিতে হইবে, প্রকৃত মনুষ্যত্বে ইহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জগতে

অন্যান্য জাতির সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা কি সামান্য সাধনা? এত বড় সাধনা কোন দেশের সম্মুখে কখনও আসিয়াছে কি না সন্দেহ। এ সাধনার সাধকও দুর্লভ। এই অসাধারণ ব্রতের কর্ম্মীদিগেরও অসাধারণ হওয়া চাই। যাঁহার বিশাল উদার হৃদয় ত্রিশকোটী পতিত ভাই বোনকে প্রেমের অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিতে পারিবে, যিনি ছোটখাট স্বার্থ ও ভোগসুখের চিন্তা দূর করিয়া দিয়া দুঃসাধ্য বিরাট কার্য্যের মধ্যে আপনার কল্পনাকে বিস্তৃত করিয়া অনন্ত অমর আশা বুকে ধরিয়া সকল প্রকার স্বার্থ পায়ে ঠেলিয়া শুধু কর্ত্তব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আজীবন অক্লান্তভাবে নির্ভীকচিত্তে এক দীন সেবকের মত বিনয় ও ভক্তিভরে কর্ম্ম করিতে পারিবেন তিনিই ভারতবর্ষের নব্য-ভাবের কর্ম্মী। তাঁহারই প্রয়াস এই বিপুল সাধনায় সিদ্ধি আনিয়া দিবে।

শ্রীসেবাভিক্ষু

গতি না স্থিতি

আসা আর যাওয়া এই নিয়েই এই ভবের কারবার। এই বিশ্বে অহরহঃই একটা চলার সাড়া পাওয়া যায়। এই জগতের হাটে যেন কেহই টিকিয়া থাকিতে রাজি নহে, সবাই এখানে চল্‌বার জন্য ব্যস্ত। পুরান যে সে নিতুই নূতনকে তার জায়গা গড়াইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত। আবার এই নূতন যখন কাল পুরাতন হইবে সেও আর এক নূতনকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এই রকম নূতন পুরাতনের আসা যাওয়ার মধ্য দিয়া এই বিশ্বলীলা সেই সময় থেকে চলিয়া আসিতেছে, সে সময়ের আরম্ভ কেহ কখনও ধারণাতেও আনিতে পারে না। আদিহীন কালের আদি হইতেই এই খেলা আরম্ভ হইয়াছে, এখনও সেই খেলা তেমনি সমান ভাবেই চলিতেছে, আবার অন্তহীন কালের শেষ পর্য্যন্ত এমনিই ভাবে চলিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া গোড়ায় যাহা ছিল তাহা কি এখন একেবারেই নাই। আবার যাহা ছিল না তাহা কি নূতন করিয়া আসিয়াছে। তাহা কেমন করিয়া ধারণা করিব? যাহা ছিল কালের পরিণতির সঙ্গে তাহা তো অস্তিত্ব হারাইতে পারে না—আবার যাহা ছিল না তাহা তো নূতন করিয়া আসিতে পারে না। ঐ যে একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে একটি প্রকাণ্ড গাছ হইল, আপাততঃ মনে হয় বটে যে গাছটা বুঝি একান্তই ভুঁইফোড়; কিন্তু তাহা তো নহে। গাছটা যাহা দিয়া তৈয়ারী সে সব উপাদানগুলিই যে আগেই ধরিত্রীর রসে, রবির রশ্মীতে, বায়ুর হিল্লোলে লুকাইয়া ছিল। গাছে যে নূতন কিছুই নাই। কেবল সবগুলির একত্র সমাবেশের ফলে যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সেইটুকুই নূতন।

যাহা সৎ তাহার সত্তা যে অবিনশ্বর—তাহা যে চিরকালই থাকিবে। আবার যাহা অসৎ তাহার সত্তার উদ্ভব যে কখনই সম্ভব নহে তাহা যে চিরকালই অসৎ অস্তিত্ব বিবর্জ্জিত। সৎ মানেই যে 'আছে', থাকাই

যে তাহার ধর্ম্ম, অস্তিত্ব বজায় রাখাতেই যে তাহার প্রাণ। তাহা কখনও কি 'নাই' হইতে পারে। আবার যাহা অসৎ যাহা 'নাই' তাহা কখনও কি 'আছে' হইতে পারে।

মান্ধাতার আমল হইতে আমরা কালের একটা দুর্নাম শুনিয়া আসিতেছি বটে, কালের করাল কবলে পড়ে না এমন জিনিস পাওয়া কঠিন। কালের অনুকম্পায় এক সময়ে যাহার অস্তিত্ব বিশ্বের বিশিষ্ট গৌরবাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইত এমন অনেক জিনিসের চিহ্ন পর্য্যন্ত আজ নাই। আবার এক সময়ে যাহার অস্তিত্ব আমাদের কল্পনায়ও আসিত না আজ তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার সৌষ্ঠব, তাহার বিশিষ্টতা জগৎবাসীকে মোহিত করিয়া দিতেছে। কত উদ্ভব ও বিলয় যে কালের অবিরাম গতির সঙ্গে হইতেছে তাহার কি ইয়ত্তা আছে। কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে। তবুও একথা সত্য যে যাহা সৎ তাহার বিনাশ নাই আর যাহা অসৎ তাহা কখনও নাই। কালের সঙ্গে সৃষ্টি ধ্বংসের যে আসা যাওয়া তাহার মূল হইতেছে সৎ বস্তুরই অবস্থা বিপর্য্যয়। আজ যাহা আছে কাল যদি তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়.তাহা হইলে আমাদের অন্ততঃ এ কথা বলিতে হয় যে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার অবসান হইয়াছে। জলাধারের জল রৌদ্র-তাপে শুকাইয়া গেল, এখানে জলের কি একান্ত বিনাশ হইল? না তাহা তো নহে—এখানে জলের অভাবের সঙ্গে জলীয় বাষ্পের উৎপত্তি। একই সত্তার জলীয় অবস্থা বাষ্পীয় অবস্থানে পরিণত হইল। একই সৎ বস্তুর অবস্থান্তর হইল মাত্র। জল আর বাষ্প একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ। একই সত্তার বিভিন্ন অবস্থা। জলের তো একান্ত উচ্ছেদ হইল না বাষ্পের তো নূতন উদ্ভব হইল না। সত্তার অস্তিত্ব ঠিকই বজায় রহিল মাঝে কেবল হইল সেই সৎ বস্তুর রূপান্তর।

বৌদ্ধ মতানুসারে অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হয়—অসৎ হইতেই সতের বিকাশ হয়। আর শুধু তাহাই নহে অসৎই সতের বিকাশের একমাত্র কারণ। অভাব না হইলে ভাবের জন্ম কখনও সম্ভব হয় না। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বলেন বীজ যতদিন বীজ অবস্থায় থাকিবে ততদিন বৃক্ষের অস্তিত্ব নাই। বীজের অভাব, বিনাশ হইতেই গাছের বিকাশ। বীজ লোপ পায় বলিয়াই গাছের অস্তিত্বের প্রকাশ। বীজের মৃত্যুই হইতেছে গাছের জননের একমাত্র কারণ। এই জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়াই এই জগতের বিকাশ এই জগতের পরিণতি। পূর্ব্বাবস্থার উচ্ছেদ ও পরবর্ত্তী অবস্থার উদ্ভব—ইহাই জগতের নিয়ম। এখানে সৎ বলিয়া কিছু নাই যাহা এখন সৎ যাহা এখন আছে পর মুহূর্ত্তে তাহাই অসৎ তাহাই আবার নাই। যাহা এই মুহূর্ত্তে নাই পর মুহূর্ত্তে তাহাই আবার আছে। এই সৃষ্টি বিনাশ এই জন্ম মৃত্যুই জগৎ। স্থায়ী বলিয়া এখানে কিছু নাই এখানে সকলই অস্থির সকলই চঞ্চল। এই আছে এই নাই, ইহাই জগতের ভাব। অবিরাম গতিই জগতের জীবন। আবাহমান কাল হইতে ভাব অভাবের পারম্পর্য্যের মধ্য দিয়াই ভবের লীলা খেলা। সকলই ক্ষণিক সকলই তুচ্ছ সকলই অসৎ। সত্তার এখানে একান্তই অভাব। সৎ বলিয়া এখানে কিছুই নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই পুরাতন যাহা তাহার ধ্বংস হইতেছে আর সেই সঙ্গে আবার নূতনের সৃষ্টি হইতেছে। নূতন পুরাতনের স্থিতি লয়েই জাগতিক ধারা প্রবাহিত। ইহাই একমাত্র

সত্য এই প্রবাহই একমাত্র সৎ আর সব ক্ষণিক সব মিথ্যা। ঐ যে কুলু কুলু রব করিয়া ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ চলিতেছে আমরা তীরে দাঁড়াইয়া মনে করিতেছি বুঝি ভাগীরথীর সম্বন্ধে যেমনটী ছিলেন এখনও ঠিক তেমনই আছেন। কিন্তু তাই কি? যে জলরাশি তর তর করিয়া এই মুহূর্ত্তে আমার সামনে চলিতেছে পর মুহূর্ত্তে আমরা কি সেই জল পুনরই দেখিতে পাই। তাহা তো নহে; কিন্তু এই প্রবাহ সমান ভাবে চলিয়া যাইতেছে আমাদের মনে হয় বুঝি সেই একই গঙ্গা। জগতেরও অবিরাম গতি ও পরিবর্ত্তন এমনি সমান ভাবে চলিতেছে বলিয়াই আমাদের ভ্রম হয় যে জগতের স্থায়ী সত্তা আছে। আমরা ধরিয়া লই যে সৎ বস্তু আছে। কিন্তু বাস্তব পক্ষে এই প্রবাহই জগতের সত্য। প্রবাহের পিছনে সৎ বলিয়া কিছু নাই। সতের ধারণা একেবারেই মিথ্যা একেবারেই কাল্পনিক। অজ্ঞান বলিয়া আমরা ক্ষণবিধ্বংসি অসতে সতের অধ্যাস করি। জগৎ-প্রবাহ চিরকাল বেশ সমান একটানা চলিতেছে বলিয়া সেই প্রবাহকে আমরা সৎ বস্তু বলিয়া মহা ভুল করি।

জগৎ পরিণামী, বিকারী, গতিশীল—কথাটা খুবই ঠিক। পরিবর্ত্তনই জগতের প্রাণ। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বলা যায় না যে এখানে কিছুই সৎ নহে, সৎ বস্তুর এখানে একেবারেই অভাব। পরিণামই হউক আর পরিবর্ত্তনই হউক স্থায়ী জিনিসের অভাবে তাহাদের কোন অর্থই হয় না। পরিণাম বা পরিবর্ত্তন যে স্থায়ী জিনিসের একান্ত অপেক্ষা করে। স্থায়ী জিনিস না থাকিলে পরিবর্ত্তন হইবে কাহার? কাহারও বিকার হইতেছে না অথচ বিকার আছে এমন বিকার আমাদের ধারণার অতীত। গতি আছে অথচ গতিশীল কোন পদার্থ নাই এইরূপ ধারণা আকাশকুসুমের কল্পনা ছাড়া আর কি হইতে পারে? ঘরে প্রদীপ জলিতেছে—আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে দীপশিখা আগাগোড়াই সেই একই শিখা বলিয়া মনে হয় কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তের শিখাই যে ভিন্ন। আমরা জানি যে তেল পুড়িয়া আলো হইতেছে। কিন্তু একবার যেমনি তেল পুড়িল তখনই আবার তৈলাধার হইতে নূতন তৈল আসিয়া সেই শিখাটিকে বজায় রাখে। বৌদ্ধরা বলেন তৈল পুড়িয়াই, তৈলের অসদ্ভাব হইতেই আলোর উৎপত্তি। প্রতি মুহূর্ত্তের এই ভাব অভাবের ধারাই দীপ শিখার প্রাণ। কিন্তু তাই কি? এখানে অভাব হইতেই কি ভাবের উৎপত্তি—অসৎ হইতেই কি সতের জন্ম? কৈ? আলোর প্রাণ ততক্ষণ যতক্ষণ তৈলাধারে তৈল থাকে। তৈলের যখন একান্ত অভাব হয় তখন তো আলো থাকে না। যদি অভাবই ভাবের পূর্ব্বাবস্থা হয় তবে তৈলাধারে তৈলের একান্ত অভাবই দীপশিখার প্রকৃষ্ট উজ্জ্বলতার কারণ হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। বীজের অভাব যদি গাছের উৎপত্তির কারণ হয় তাহা হইলে যেখানে বীজের যথেষ্ট অভাব মরুভূমিতেই গাছের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত। কিন্তু তাহা হয় কৈ?

ইহা দেখিয়া আমরা বৌদ্ধবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। অসৎ হইতে সতের বিকাশ কখনই সম্ভব নহে। সতের বিকাশ সৎ হইতেই একমাত্র হইতে পারে। তাই বা কিরূপে বলিব? সতের বিকাশ বলিলে পুরাতন হইতে নূতন সতের বিকাশ হয়, আমরা এইরূপ অনু-

মান করিতে পারি। কিন্তু সৎ যাহা তাহা শাশ্বত। নূতন পুরাতনের খেলা যে কেবল সতের রূপ পরিবর্ত্তন লইয়াই। নূতন রূপের যে বিকাশ হইল তাহা পুরাতনের মধ্যেই ছিল, আর যে পুরাতন চলিয়া গেল তাহা নূতনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। অবস্থার ফেরে পড়িয়া পুরাতনের আবার পুনরাবির্ভাব হয়। জল যখন বাষ্প হয় তখন সেই বাষ্পের মধ্যেই জল থাকে।

আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এই সতের অবিনশ্বরত্বের কথাই বলেন। তাঁহারা বলেন 'matter is indestructible and energy is transformable from one form into another' কিন্তু—তাঁহাদের মতে এই শাশ্বত সৎ কেবল জড় ও শক্তির রূপ মাত্র। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে কেবল অন্ধ জড় ও শক্তিপুঞ্জের ঘাত প্রতিঘাতেই জগতের অস্তিত্ব ও পরিণতি। জড় ও শক্তিই কেবল সৎ—একমাত্র সত্য। গোড়ায় ছিল কেবল ভৌতিক পরমাণুপুঞ্জ। আকাশে আমরা যে নীহারিকা দেখিতে পাই সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় জড়েরও অবস্থা ঠিক সেই রকম ছিল। তার পর কোথা হইতে একটা শক্তি আসিয়া সেই জড়রাশির মধ্যে বিষম আলোড়ন আনিল মহা তরঙ্গ বহাইয়া দিল। সেই যে তরঙ্গের সূত্রপাত হইল তাহা আর থামিল না। সেই তরঙ্গের প্রভাবে সেই জড়পিণ্ডের মধ্যে যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল সেই বিপর্য্যয়ই হইতেছে এই সৃষ্টির গোড়া। বিপর্য্যয়ের পর বিপর্য্যয় আসিয়া জড়রাশির সেই আদিম অবস্থার যে কত পরিবর্ত্তন যে কত রূপান্তর হইল যে কত অবস্থার উত্থান পতন হইল কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে? কত অসংখ্য পরিবর্ত্তন পরিণতির পর যে জগতের আধুনিক অবস্থা আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথায় সেই নির্জ্জীব কিম্ভূত কিমাকার জড়ের তাল মাত্র আর কোথায় বর্ত্তমান সুবিশাল নয়নাভিরাম কত উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী সমাকীর্ণ এই জগৎ। কিন্তু যতই পরিণতি হউক না কেন সেই জড় সেই জড়ই আছে সেই অন্ধ শক্তি অন্ধ শক্তিই আছে। যাহা ছিল তাহাই আছে নূতন কিছু হয় নাই নূতন কিছু আসে নাই। সবই জল। উদ্ভিদের প্রাণ। প্রাণীর চেতনা আর মানুষের ধী সকলেরই মূলে আছে কেবল জড় ও অন্ধ শক্তি। ধী, চেতনা, প্রাণ জড়ের বিভিন্ন সমাবেশের বিভিন্ন রূপ মাত্র। এই যে মানুষ, এই যে তার প্রকৃষ্টতা, এই যে সমাজের, ধর্ম্মের, সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, এই যে জ্ঞান বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা, এই যে প্রেম ভক্তিতে মানুষে দেবত্বের আভাষ সকলই জড়াত্মক—কেবল বিশেষ বিশেষ জড় শক্তির সমষ্টি সমন্বিত। জড় আর শক্তিই কেবল আছে আর কিছু নাই, নাই। বৈজ্ঞানিকগণ এমন পর্য্যন্ত আস্ফালন করিয়া বলেন, 'Give me *matter* and *Energy* and I will create the universe'. তাঁহারা দম্ভ করিয়া বলেন যদি জগৎস্রষ্টা বলিয়া এমন কেহ থাকেন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি এমন কি বাহাদুরী করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভগবানের কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই, জড় ও শক্তি মানিয়া লইলেই আমরা জগতের পরিণতির প্রতি স্তরই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। কিন্তু এ দম্ভের ভিত্তি কোথায়? যে জড় ও শক্তি লইয়া বৈজ্ঞানিক আচার্য্যগণের এ বড়াই সে জড় কি? জড় সম্বন্ধে প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণই তো বহুমতাবলম্বী। কেহ কেহ জড়কে সূক্ষ্ম

পরমাণু বিশেষ মনে করেন। এই সিদ্ধান্তকে Atomic theory বলে। কিন্তু আধুনিক মনীষিগণ পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অবস্থার ধারণা করিয়াছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তে জড় শক্তির রূপান্তর মাত্র। জড় শক্তির—একটা স্থায়ী অবস্থা মাত্র। জড় পরমাণু (or atom) কতকগুলি শক্তিধারার কেন্দ্র স্বরূপ (Centre of forces)। যদি ক, খ এবং গ শক্তিত্রয় চ বিন্দুতে একত্র কার্য্য করিয়া পরস্পর পরস্পরকে সংযুক্ত করে তবে ঐ শক্তিত্রয়ের সমাবেশের ফলে আমরা চ বিন্দুকে জড়পরমাণু বলিয়া মনে করি। এই সিদ্ধান্তকে Kinetic theory of matter বলে।

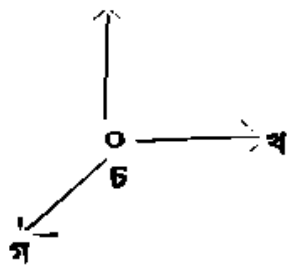

এই বিরোধী মতসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি এই জড় কি? atomic theory অনুসারেই হউক আর kinetic theory অনুসারেই হউক জড় বা শক্তির অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের কল্পনায় ছাড়া আর কোথাও আছে কি? বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের চেতনা শক্তিকে জড়েরই বিশেষ কার্য্য বলেন। আমাদের মস্তিষ্কে যে সকল কোষ বা cells আছে আমাদের জ্ঞান বা চেতনা শক্তি তাহাদের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতেরই ফল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে এই ঘাত প্রতিঘাত তত্ত্ব আমাদের জ্ঞান বা চেতনা শক্তির একটা বিশেষ অবস্থা হইতেই উদ্ভূত। তাঁহাদের মতে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ এই গুলিই দ্রব্যের গৌণ গুণ (বা Secondary attributes) আর আকৃতি, গুরুত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি দ্রব্যের মুখ্য গুণ (বা Primary attributes)। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এটুকু স্বীকার করেন যে দ্রব্যের গৌণ গুণগুলির অস্তিত্ব আমাদের মনের ভিতর ছাড়া বাহিরে নাই। যদি দেখিবার বা শুনিবার কেহ নাহি থাকে তবে এই গুণগুলির কোন অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু মুখ্য গুণ সম্বন্ধে তাঁহারা একথা বলেন না। মুখ্য গুণগুলি বাহিরে যেমন আছে আমাদের মনেও ঠিক সেইরূপ প্রতিভাত হয়। ঐ যে সুন্দরী পথ দিয়া যাইতেছে তার গায়ের চাঁপাগোনা রং দেখিয়া লোকে মোহিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহা দেখিয়া বলিতেছেন ওগো তোমরা কি দেখিয়া মোহিত হইতেছ ঐ রঙের কি কোন বাস্তব অস্তিত্ব আছে, ও রঙ তো তোমার চোখে ছাড়া বাহিরে নাই—বাহিরে আছে কেবল অতি সূক্ষ্ম জড় পরমাণুর দ্রুত স্পন্দন (ethereal vibration)। সেই স্পন্দনের বেগ চক্ষুর আভ্যন্তরীণ পর্দ্দায় লাগিয়া সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্য দিয়া সেই বেগ প্রবাহিত হইয়া আমাদের মস্তিষ্কে যে গতির সঞ্চার হয় তাহার ফলেই আমাদের মানস চক্ষের সামনে বর্ণের আভা ফুটিয়া ওঠে। অন্ধের কাছে রঙ নাই তাহার কাছে জগৎটা একটা রূপহীন অস্তিত্ব। যে বধির তার কাছে জগৎ শব্দহীন। কিন্তু তাহাদের উভয়ের কাছেই জগতের কোমল কঠিনের তারতম্য আছে, গুরুত্ব লঘুত্ব আছে, একটা গড়ন আছে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মুখ্য গুণগুলির বাস্তব অস্তিত্ব আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি? তাহাদের অস্তিত্ব ও যে গৌণ গুণগুলির মতন কেবল আমাদের কল্পনায় নাই কে বলিবে? পরমাণু কেহ কি

চক্ষে দেখিয়াছে? এই যে গুরুত্ব, লঘুত্ব তারল্য, কাঠিন্য আমাদের উপলব্ধির বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব যে থাকে আমরা এমন কথা জোর করিয়া কি বলিতে পারি? একটা জিনিষ যে ভারি কেহ না বোধ করিলে তাহা কি করিয়া বুঝা যায়? বাহিরে যদি বর্ণের অস্তিত্ব না থাকে তবে ইহাও সত্য যে একই যুক্তি অনুসারে মুখ্য গুণগুলিরও আমাদের বোধ শক্তির বাহিরে কোন অস্তিত্ব নাই।

তবে বাহিরে কি কিছুই নাই? কেহ কেহ অবশ্য বলেন যে জগতের সত্তা কেবল আমাদের কল্পনাপ্রসূত আমাদের বোধ শক্তির বাহিরে কোন বাস্তব সত্তা নাই। চক্ষু বুজিলেই সব অন্ধকার। যতক্ষণ আমার চেতনা, যতক্ষণ আমার বোধ শক্তি ততক্ষণই জগৎ তার পর সব শূন্য সব ফাঁকি। গোলযোগের কথা বটে। এই যে এতবড় জগৎটা ইহা কেবল আমার কল্পনা। আমরা যাহা দেখি বা শুনি সব মায়া তাহার পিছনে কোন সত্তা নাই। এরূপ ধারণা করিতেও আমাদের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়।

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়

(৫৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

মানুষের ও অপর প্রাণীর কি একই জীবাণু

আমরা পূর্ব্বে যে সব কথা বলেছি তাহতে দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষয় মানুষ ও গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে হয় এবং ক্ষয় জীবাণুই উহার মুখ্য কারণ। উভয়ের একই জাতীয় জীবাণু দ্বারা এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় কিংবা বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা হয় একথা জানবার কৌতূহল হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

মতের অনৈক্যতা

এ সমস্ত নিয়ে এত বাগবিতণ্ডা চল্‌ছে যে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। আজ যা অভ্রান্ত বলে মনে করা যাচ্ছে পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে সে মত হয়ত একেবারে উল্‌টে গেল। যা ভুল বলে ত্যাগ করা হয়েছিল আবার সেই মতই হয়ত সত্য বলে গ্রহণ করা গেল। এইরূপ সর্ব্বদাই হচ্ছে। আবার হয়ত কোন সম্বন্ধে একাধিক মতও আছে সুতরাং যে মত বেশীর ভাগ লোকে গ্রহণ করেছে, আমরা সেই মত অনুসারেই বলিব।

এই তিন জাতীয় জীবাণুতে আকৃতিগত কিছু পার্থক্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন জীবে বিভিন্ন অবস্থায় বাসহেতু এই পার্থক্য এসেছে অথবা অন্য কোন কারণে উহা ঘটেছে তাহা বলা কঠিন। সাধারণতঃ একজাতীয় জীবাণু অন্য জাতীয় প্রাণীর ব্যাধি সৃষ্টি করে না। কখনও যে করে না, তা নয়। কারণ পরীক্ষা দ্বারা দেখা

গিয়াছে উহা অবস্থা বিশেষে সম্ভবপর। তবে এই সব পরীক্ষার ফলও সব সময়ে অকাট্য বলে গ্রহণ করা যায় না, কারণ যখন ক্ষয় হয় তখন শরীরের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা ত আর সুস্থ শরীরে থাকে না। সুতরাং সুস্থ শরীরের উপর যে সব পরীক্ষা করা হয়—তাহা একই ভাবে হয় কি না সন্দেহের বিষয়। যতটা সম্ভব একই ভাবে করবার যথোচিত চেষ্টা হয় সত্য। কক সাহেব মনে করেন যে গো-জাতীয় ও মনুষ্য জাতীয় জীবাণু পৃথক্ এবং একের দ্বারা অন্যের উদ্ভব সম্ভবে না। কিন্তু আরলইন্ (Arloing) র‍্যাভেনেল (Ravenel) প্রভৃতি মনীষিগণ সেরূপ মনে করেন না। তাঁরা বলেন সব জীবাণুই এক জাতীয় কেবল ভিন্ন জীবে বাস হেতু—এবং উহাদের স্বভাব এবং রীতিনীতির পার্থক্যের দরুণ উহারা সামান্য কিছু পৃথকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিকাংশ পণ্ডিত মণ্ডলীই শেষোক্ত মতের পোষকতা করেন।

পক্ষী জাতীয় জীবাণু সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না।' কারণ এক মোরগ ব্যতীত আমরা অন্য পাখী হতে বড় একটা ছুঁত লই না, মোরগগুলি সর্ব্বদাই মানুষের থুতু খায়—ক্ষয় রোগীর থুথু খেয়ে উহাদের ক্ষয় হতে দেখা গিয়াছে—আবার ঐ ক্ষয়-গ্রস্ত মোরগ খেয়ে মানুষেরও পাল্টা ক্ষয় হতে দেখা গিয়েছে। সুতরাং যাঁহারা উহাতে আসক্ত তাঁহারা এ বিষয়ে সতর্ক হইবেন।

গো-জাতীয় ও মনুষ্য-জাতীয় জীবাণু সম্বন্ধেই আমরা বিশেষভাবে সতর্কিত। ইহাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে জানতে হলে অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন—আমরা ক্রমে ক্রমে এ কথার বিচার করিব এবং একের সহিত অপরের কি সম্বন্ধ তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

জীবাণুর প্রবেশ পথ

ক্ষয়জীবাণু মানুষকে নানাদিক দিয়ে আক্রমণ করে এবং দেহে নিম্নলিখিত পথ সমূহে প্রবেশ করে।

(১) ইহা শ্বাসের (inhalation) সহিত শ্বাসনালী (respiratory passage) দিয়ে প্রবেশ করতে পারে।

(২) খাবারের সহিত অন্ননালী (alimentary tract) দিয়ে যেতে পারে।

(৩) চামড়ার ভিতর (Through skin by inoculation) দিয়ে প্রবেশ করতে পারে।

(৪) ভ্রূণে (infection of Embryo in utero) প্রবেশ করতে পারে।

পিতামাতা হতে সন্তানে বর্ত্তে কি না

আমরা শেষের বিষয়টি সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করিব। ক্ষয় পিতা মাতা হইতে পুত্র কন্যায় বর্ত্তিতে পারে কি না তাহাই জিজ্ঞাস্য। এবিষয়েও অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয় ও বহু বাদানুবাদ চলছে। অনেকেই মনে করেন যে পিতা মাতা হতে ইহা ভ্রূণে প্রবেশ করে না; তাঁহারা বলেন যে পৈতৃক কারণে সন্তানের শরীর দুর্ব্বল ও ভঙ্গুর হয় এবং উহাদের সজীবতার অল্পতা বশতঃই ক্ষয় সহজে আক্রমণ করে। একথা আংশিক সত্য হলেও প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায় না যেহেতু অনেক সময়েই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই জরায়ুস্থিত ভ্রূণে ক্ষয় প্রকাশ হতে দেখা যায়। কাজেই এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে পিতা মাতা হতে উহা সন্তানে বর্ত্তিতে পারে। তবে বাপ মার কাহারও থাকলেই যে সন্তানের অবশ্যই হবে তাও নয়। এই সংক্রমণ বিষয়, অন্যান্য অনেকগুলি বিষ-

রের উপর নির্ভর করে। সন্তানোৎপাদনের সময়ে পিতা মাতার শারীরিক অবস্থা, মানসিক অবস্থা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাত ভ্রূণের উপর ক্রীড়া করে। ৫টী সন্তানের মধ্যে ৩টীর ক্ষয় হয় ২টীর বা হয় না কেন—কখনও সকলটীরই হয়—কখনও এক জনেরও হয় না একথার সম্যক আলোচনা করতে গেলে পৃথক্ একটী প্রবন্ধের প্রয়োজন। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং এবিষয়ে সম্যক্ অনুসন্ধানও হয় নাই। তবে অনেক ক্ষেত্রেই যে ক্ষয় পিতামাতা হতে সন্তানে বর্ত্তে তাহাতে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। মেণ্ডেলের নিয়ম (Mendel's Law) এ-সব সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে কি না তাহাও জানা যায় নাই। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এদিকে পড়লে অনেক বিষয় জানা যেতে পারবে।

চর্ম্মপথ

চামড়ার যে ক্ষয়রোগ হয় তাহা বলাই বাহুল্য। চামড়ার ভিতর দিয়ে ক্ষয়জীবাণু প্রবেশ করে অন্য স্থানের ক্ষয় জন্মাতে পারে কি না তাই জানবার বিষয়। যদি কোন রূপে কোন স্থানের চামড়া উঠে যায় বা কোন স্থান কেটে যায় এবং ঐ সকল স্থানের সহিত ক্ষয়জীবাণুর যোগাযোগ হয় তবে ঐ সব স্থানের ক্ষয় হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। কসাইখানায় (Slaughter House) বা মড়া কাটা ঘরে (Post-mortem Room) ক্ষয়গ্রস্ত প্রাণীর বিস্তর আমদানী হয়। সেখানে অনেকে অসাবধানতা বশতঃ কাটা আঙ্গুল নিয়েই কাজ করে। ফলে ঐ সব স্থানের ক্ষয়রোগ হয়। কখনও আঙ্গুল ছাড়াইয়া হাত পর্য্যন্ত ফুলে উঠে, এমন কি বগল পর্য্যন্ত ফুলা উঠ্‌তেও দেখা যায়; বিশেষতঃ ঐ সব স্থানের বীচিগুলি বড় হয়। বিষ যদি তীব্র হয় তবে আরও ছড়িয়ে যেতে পারে। একটা লোক কসাইখানায় কাজ করত। একদিন হঠাৎ আঘাত লেগে তার একটা আঙ্গুল কেটে যায়। তার এ-বিষয়ে খেয়াল না থাকায় ঐ কাটা আঙ্গুল নিয়েই ক্ষয়াক্রান্ত একটা শক্ত চাম ছাড়ায়। পরদিন দেখা গেল তার হাতটা ফুলে উঠেছে, দেখতে দেখতে অল্প সময়ের মধ্যেই বগল পর্য্যন্ত ফুলে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দিল। বিশেষরূপ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে ক্ষয়বীজের দরুণ এরূপ হয়েছে। এরূপ উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং চর্ম্মপথে ক্ষয়বীজের প্রবেশ অসম্ভব নহে, তবে সাধারণতঃ উহারা এ রাস্তায় বড় একটা বেশীদূর যায় না এবং গুরুতর কোন অনর্থ ঘটায় না।

শ্বাস ও আহার্য্য পথ

সচরাচর নিশ্বাসের ও খাবারের সঙ্গেই ক্ষয়-বীজ শরীরের ভিতর প্রবেশ করে। কোন্‌টার সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ সেটা দেখা দরকার। এসম্বন্ধেও অনেক বাদানুবাদ চলেছে। পূর্ব্বে মনে করা হত শত্রু শ্বাস-পথেই ব্যূহ প্রবেশ করে, আজকাল অনেকে বিশ্বাস করেন যে খাওয়ার রাস্তাই তাহার বিশেষ প্রিয়। বিষয়টি দরকারী, শত্রুকে আমরা শ্বাসের সহিত টেনে লই কি খাবারের সহিত পেটে পুরি সে বিষয়ে একটু চিন্তা করা উচিত।

ক্ষয়রোগীর থুথু

যারা ক্ষয়ে ভুগ্‌ছে তারা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় সহজভাবে প্রশ্বাস ছাড়ে তখন তাতে ক্ষয়জীবাণু থাকে না সুতরাং তাদের প্রশ্বাস হতে ক্ষয় ব্যামো হবার বিশেষ কোন

আশঙ্কা নাই। কিন্তু তারা যখন কাশে, হাঁচে, কথা কয় বা গান করে তখন তাদের, মুখ থেকে, চারিদিকে অতি সূক্ষ্মাকারে থুথু ছড়িয়ে পড়ে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে এই থুথু ক্ষয়বীজে পূর্ণ, কাজেই এ থেকে ক্ষয় হবার সমূহ ভয় আছে।

জীবাণুর প্রকৃতি

ক্ষয়জীবাণুগুলি আকারে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য হইলেও অতি কঠিন প্রাণ, সহজে মরতে চায় না। শরীরের বাহিরেও উহারা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। সূর্য্যের প্রখর আলোকে ইহারা নিস্তেজ হয় এমন কি বেশীক্ষণ থাকিলে মারাই পড়ে। কিন্তু আঁধারে ইহাদের বৃদ্ধি। ভূত প্রেত যেমন অন্ধকারে চলে বেড়ায় এরাও যমদূতের মত অন্ধকারেই আনন্দ পায়। অন্ধকারে ইহারা অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। ঠাণ্ডায়ও সহজে উহার কিছু করতে পারে না। এমন কি বরফের ভিতরেও উহা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। তবে বেশী উত্তাপে অধিকক্ষণ বাঁচে না। থুথু ফেলবার সময় কেহ কাছে থাকলে উহার সূক্ষ্ম বিন্দুগুলি ভিতরে প্রবেশ করে ক্ষয় উৎপাদন করতে পারে; কিন্তু উহা ত্যাগ করার পরও নিষ্কৃতি নাই। উহা শুকাইবার পর আপদ যাওয়া দূরে থাকুক, ভয়ের কারণ আরও বৃদ্ধি হয়। থুথু শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় জীবাণুগুলি মরে না। ধূলি বালু দিয়ে ঢাকা পড়ে ইহারা বেশ সুখে বাস করে ও দীর্ঘ দিনেও এদের কিছু হয় না, ২।৪ মাস ত বাঁচেই এমন কি ৮।১০ মাসও সচ্ছন্দে বাঁচে। শুকাইয়া ধূলির সহিত মিশিয়া বায়ুর দ্বারা নানা স্থানে নীত হয়—এইরূপ ঝুলামান অবস্থায় শ্বাসের সহিত হয়ত আমাদের ফুসফুসে আসিয়া উপস্থিত হয়—হয়ত দেয়ালের কার্ণিসে, গালিচার নীচে বা ঘরে যে সব আসবাবপত্র আছে তার পেছনে, যে কোন স্থানে একটু মাথা গুজিবার ঠাঁই পেলেই, একটু চোখের আড়ালে থাকতে পারলেই বেশ সচ্ছন্দচিত্তে বাস করতে থাকে।

ব্যাধির সূত্রপাত

হঠাৎ চোরের ন্যায় এসে কখন যে নিশ্বাসের সহিত ভিতরে চলে যায় তা জানবার উপায় নাই। শত্রু অলক্ষিতে এসে কখন যে তার অধিকার স্থাপন করল তা কেউ বলতে পারে না। হয়ত কিছুদিন ধরে বাস কচ্ছে কিন্তু কোন সাড়া শব্দই নাই। আমরা একবারও বিপদের কথা মনে করি না; কেমন করেই বা জানব? যেই কোন কারণে শরীর একটু খারাপ হল, একটু দুর্ব্বলতা বেশী হল, সজীবতার একটু অভাব ঘটল অমনি ভিতরকার অজ্ঞাত বন্ধুটি একটু যেন ঘাড় বাঁকালেন এবং নিভৃত গণ্ডী থেকে পা বাড়াবার যোগাড় দেখলেন। হয়ত এখন ঐ পর্য্যন্তই। শরীরটা একটু খারাপ বোধ হল মাত্র কিন্তু কোনরূপ ভয়ের কারণ যে আছে সে সন্দেহও হল না। এইরূপ করে কিছুদিন কেটে গেল। আরও কিছুদিন বাদে হয়ত আরও কয়েকটি বন্ধু আসিয়া জুটিলেন—এইরূপ করে দল একটু পুষ্ট হল এবং যখন পুনরায় কোন কারণে শরীর অসুস্থ হল তখন তারা পূর্ব্বের চেয়ে একটু জোরে গা নাড়াচাড়া দিলেন, এবং সুযোগ পেয়ে রাবণের গুষ্টির মত দ্রুত বেড়ে যেতে লাগলেন। সুবিধামত অবস্থা পেলে এরা সামান্য কটি হতে অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী জন্মাতে পারে যে সে কল্পনার অতীত। এইবার হয়ত শরীরটা একটু বেশী খারাপ

হল—২।৩ দিন একটু জ্বর হল, একটু শুকনা কাশী বোধ হল, এইরূপে ক্রমে ব্যাধি বেড়ে যেতে থাকে এবং যাহা প্রথমে উপেক্ষার বিষয় ছিল তাহা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষয় জীবাণু কোথা হতে আসে

যেমন থুথু হতে এ ব্যাধি হতে পারে সেইরূপ শরীরের যে কোন স্থানের ক্ষয়জাত পুঁয প্রভৃতি হতেও হতে পারে। ক্ষয় রোগগ্রস্তের মল মূত্র হতেও ব্যাধি সংক্রমণ হতে পারে। দুধ ও মাংসের সহিতও প্রবেশ করতে পারে। পৈতৃক কারণে যে হতে পারে সে বিষয়েরও পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি।

মাংসাহার

গরু, শূয়োর, মোরগ প্রভৃতির যখন ক্ষয় হয় তখন যারা মাংসাহারী তাদের যে হবে তার আর আশ্চর্য্য কি? ইদানীং কসাইখানা হতেই সহরের প্রায় সমস্ত খাদ্য মাংস সরবরাহ হয়। সেখানে অনেক জন্তুরই ক্ষয় দেখা যায়। এই সব মাংস পেটে গেলে তা থেকে ক্ষয় হওয়া আবশ্যম্ভাবী। তবে কয়েকটা কারণে আমরা অনেকটা বেঁচে যাই।

স্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষয়জীবাণু বৃদ্ধি না পাইবার হেতু

(১) মাংসের ভিতরে ক্ষয়জীবাণুর বৃদ্ধির বড় একটা সুযোগ হয় না। জন্তুগুলি প্রায় সর্ব্বদাই নড়াচড়া করে। ঘাড় নাড়চে, পা ছুড়ছে, ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে এইরূপে শরীরটা অনবরতই নড়াচড়ার উপর আছে। এইরূপ করায় ওদের মাংসপেশীর (muscles) ভিতর থেকে একরূপ অম্লজাতীয় রস (acid secretion) বার হয়। এই অম্লরসে ক্ষয়জীবাণু নিস্তেজ হয়ে পড়ে ও অধিকক্ষণ সংস্পর্শে বাঁচে না।

(২) আমরা যারা সভ্য বলে পরিচয় দিই তারা কাঁচা মাংস বড় একটা খায় না। খাওয়ার আগে মাংসটাকে সিদ্ধ করে নেই। সিদ্ধ হবার সময় ক্ষয়জীবাণুগুলি মারা পড়ে।

(৩) আমাদের পাকস্থলী (Stomach) হতে যে রস বার হয় তাও অম্লজাতীয়। সেই জন্যই ক্ষয়জীবাণুগুলি সহজে পাকস্থলীকে আক্রমণ করতে পারে না উপরন্তু নিজেরাই মারা পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সহজ সুস্থ শরীরে মাংসের সহিত জীবাণু প্রবেশের বড় একটা ভয় নাই এবং আমরা নিশ্চিন্ত মনে সুপক্ক মাংস উদরপূর্ত্তী করে খেতে পারি।

বৃদ্ধি পাইবার হেতু

(১) জন্তুগুলি সব সময়ে সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত নাও থাকতে পারে, আর যদি কখনও শরীর কোন কারণে নড়াচড়া না করে তবে হয়ত যথেষ্ট অম্লরস নির্গত হয় না।

(২) মাংসগুলিও যে সব সময়ে সুসিদ্ধ হয় এমনও নয়—বিশেষতঃ ইংরেজ প্রভৃতিরা আস্ত আস্ত মাংস খণ্ডগুলি যেরূপ করে আধ পোড়া করে (roasting) খায় তাতে ভিতরকার মাংস অনেক সময়ই কাঁচা থাকে।

(৩) আমাদের পাকস্থলীর কার্য্যও সব সময়ে ঠিক থাকে না—নানারূপ ব্যামোতে নানারূপ বিকৃতি ঘটে। হয়ত আদৌ রসক্ষরণই হল না—হয়ত অম্লজাতীয় রসের পরিবর্ত্তে ক্ষার জাতীয় (Alkaline) রস নিঃসৃত হল। এই ক্ষারজাতীয় রসে ক্ষয়জীবাণু অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

(৪) হয়ত পাকস্থলীর ক্রীড়া স্বাভাবিকই আছে কিন্তু ক্ষয়জীবাণুগুলি খাবার জিনিষের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেল যে উহার আব-

রূপে থেকে অন্ত্রনলের আয়ত্তেই এল না এবং নিরুদ্বেগে আঁতের ভিতর চলে গেল।

খাদ্য মাংসের পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সুতরাং খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হবার পূর্ব্বে মাংসকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করাই সঙ্গত। যদি কোন জন্তুর ক্ষয়রোগের সামান্য সন্দেহও থাকে তবে উহার মাংস কদাচ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। সহরের হেল্‌থ্ অফিসারদের (Health officers) এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। তাঁদের দৃষ্টির উপর বহু প্রাণীর জীবন নির্ভর করছে।

দুগ্ধ

মাংসের সহিত যেরূপ এই জীবাণু শরীরের ভিতর যেতে পারে সেইরূপ দুধের সঙ্গেও যেতে পারে। যখন গাভীগুলির বাঁটে ক্ষয় রোগ থাকে তখন ত জীবাণু দুধের সহিত যেতেই পারে; কিন্তু বাঁটে কোন ব্যামো নাই অথচ শরীরের অন্য কোন স্থানে আছে এরূপ অবস্থায়ও দুধের সঙ্গে বেরুতে পারে। সুতরাং দুধের সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা লওয়া আবশ্যক। দুধ হইতে যে মাখন তোলা হয় উহার ভিতরেও সময় সময় ক্ষয় জীবাণু দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সব দেশের শিশুগণই দুধ খেয়ে বাঁচে, ইহাদিগকে দুগ্ধগত প্রাণ বল্‌লে কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না।

ইউরোপীয় শিশুদের ক্ষয়াধিক্যের একটু কারণ

ইউরোপীয় শিশুদের কয়েকটী কারণে ক্ষয় বেশী হতে দেখা যায়।

(১) উহারা মায়ের বুকের দুধ প্রায়ই পায় না, বেশীর ভাগই বোতল থেকে গরুর দুধ খায়।

(২) আমরা যেমন দুধটা জ্বালে ফুটাইয়া খাওয়াই তারা তা করে না। দুধ দুইয়া কাঁচা অবস্থায়ই খাইতে দেয়।

আমাদের শিশুদিগের ক্ষয়ের অল্পতার কারণ

আমরা দুধ সর্ব্বদাই ফুটাইয়া দিই এবং উহাতে জীবাণুগুলি মারা পড়ে বলেই আমাদের দেশের শিশুদের মধ্যে ক্ষয় আপেক্ষিক কম, বিশেষতঃ যাতে বীচিগুলি আক্রমণ করে। আমাদের দেশের গাভীগুলিও এ ব্যামোতে কম আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশের শিশুরা বোতল থেকেও দুধ বড় একটা খায় না। মায়ের বুকের যে অমৃত আছে তাই স্বচ্ছন্দে পান করে। কিন্তু ইদানীং আমাদের মায়েরা এবিষয়ে যেন একটু শিথিল হইতেছেন। বোতল বড় কম আমদানী হইতেছে না, ইহা দেশের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দশার কথা এবং অতীব অকল্যাণকর। যাতে প্রাণসম সন্তানের অপকার হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের মায়েরা কি তা নিবারণ কর্‌তে সচেষ্ট হবেন না?

গাভী, দুগ্ধ ও দোয়ালের পরীক্ষার আবশ্যকতা

মাংস খাদ্যের উপযোগী কি না তা যেমন পরীক্ষা করে দেখা দরকার সেইরূপ গাভীগুলি দুধ দেবার উপযুক্ত কি না তাও পরীক্ষা করে দেখা কর্ত্তব্য। এজন্য প্রতি গোশালায় গিয়ে হেল্‌থ্ অফিসারদের গাভীগুলি পরীক্ষা করা উচিত। আরও একটা বল্‌বার আছে। গাভীগুলি হয়ত বেশ সুস্থ ও সবল আছে—কোন রূপে ক্ষয়গ্রস্ত নয় কিন্তু তথাপি অনেক সময়ে পানীয় দুগ্ধে ক্ষয় জীবাণু পাওয়া যায়। প্রথমে উহা আশ্চর্য্য মনে হয় বটে কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখ্‌লে রহস্য সহজেই প্রকাশ

পায়। গরুর দুধ, দুহিবার পাত্রে আপনি এসে পড়ে না, একজন দোয়ালের দরকার হয়। মনে কর এই দোয়ালের যক্ষ্মারোগ আছে, দুইবার সময় বেশ ২।৪ বার খক্ খক্ করে কেসে নিলে। কাসীর সময় থুথু সহজেই দুধের মধ্যে যেতে পারে এবং দুধকে সংক্রামিত কর্‌তে পারে; সুতরাং দোয়াল ঠিক কর্‌বার সময়ও তাকে দেখে শুনে সুস্থ দেখে করা উচিত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখ্‌তে পেয়েছি যে ক্ষুদ্রজীবাণু শ্বাসনালী (Respiratory Passage) বা অন্ননালী দিয়ে আমাদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এক একটী করে দেখা যাক্ কোন্ পথে কে কোন্ অবধি যায়।

ক্ষুদ্রজীবাণু অন্ননালী পথে

মুখের ভিতর উহারা বড় একটা উৎপাত করে না, মুখে কচিৎ ক্ষতজাতীয় ঘা হয়, তবে জিহ্বার পেছন দিকটায় এহতে অনেক সময় গোটা গোটা হয় ও ঘা হয়। জীবাণু গলার ভিতর দিয়াও প্রায়ই বিনা উৎপাতে চলে যায়। কিন্তু যদিও গলার ভিতরে কোনরূপ ঘা থাকে বা সেখানকার পর্দ্দাটার (mucous membrane) কোনরূপে ক্ষত থাকে তবে ঐ স্থানের ক্ষয় হয়।

টন্সিলের ব্যবহার

কেহ যদি হাঁ করে তবে জিহ্বার মূলদেশে গলার দুইপাশে দুটা সুপারির মত জিনিষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। উহাদিগকে টন্সিল (Tonsil) বলে। পূর্ব্বে এদের কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না, আজকালও যে বড় একটা জানা গিয়াছে তা নয়। তবে উহারা দেহ-দুর্গের অনেকটা দ্বারীর কাজ করে,—বহু শ্বেত পল্টন (Lincocytes) এই স্থানে বাস করে এবং কোন শত্রু প্রবেশের উদ্যোগ কর্‌লেই এরা বাধা দেয়। কিন্তু সময় সময় শত্রুগণ এই স্থানগুলি বেদখল করে বসে এবং এখান হতে দেহের বহুবিধ অনিষ্ট সাধন করে। এই সব শত্রুদের মধ্যে ক্ষয় জীবাণুর ইহা একটি প্রিয় বাসভূমি। ক্ষয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এদের ব্যাধি ত হয়ই উপরন্তু এখান হতে জীবাণুগুলি নানা স্থানে যেয়ে নানাস্থানের ব্যাধি উৎপাদন করে। গলার চারি পাশের বিচিগুলি (cervical glands) প্রায়শই এখান হতে আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ গলার চতুপার্শ্বেই সীমাবদ্ধ থাকে—কিন্তু এখান হতে ফুসফুসে বা অন্যত্র যাওয়াও অসম্ভব নয়। ক্ষয়বীজ যদিও সময় সময় ইহাদিগকে মুখ্যভাবে (primarily) আক্রমণ করে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ফুস-ফুসকে বা অন্য স্থানকে মুখ্যভাবে আক্রমণ করিয়া ইহাদিগকে তৎপশ্চাৎ গৌণভাবে (Secondarily) আক্রমণ করে।

কাণে

কোন কোন সময় এই জীবাণু গলার ভিতর হতে কাণে চলে যায়। গলা হতে কাণ পর্য্যন্ত দুপাশে দুইটা সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে (Eustachian tube)। কাণের ক্ষয় হলে পুঁয প্রভৃতি হয়ে অনেক ভোগ ভুগ্‌তে হয়।

পাকস্থলীতে

জীবাণু গলা হতে অন্ননালী দিয়ে পাক-স্থলীতে পৌছে। অন্ননালী দিয়ে যাবার সময় এত তাড়াতাড়ি যায় যে সেখানে জীবাণুগুলি বিশ্রাম কর্‌বার বড় একটা অব-সর পায় না—কাজেই অন্ননালীর ব্যামো হবার আপদটা প্রায়ই কেটে যায়। পাক-স্থলীর ভিতর অম্লরস থাকার কথা পূর্ব্বেই বলেছি এবং ঐ রসে যে ক্ষয় জীবাণু বর্দ্ধিত

হয় না তাও বলেছি। সুতরাং পাকস্থলীর ক্ষয় হতে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু যদি কোন কারণে পাকস্থলীর অম্লতা না থাকে বা পাকস্থলীর অন্তর্বিদ পরিবর্ত্তন হয় তবে এ ব্যামো হওয়া অসম্ভব নয়।

অাঁতে

হয়ত ক্ষয়জীবাণু পাকস্থলীর ভিতরে কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত হয়ে বা অন্য কোন প্রকারে অম্লরসের সংস্পর্শে এল না এবং এই-রূপে নিরাপদে অাঁতে যাবার সুযোগ পেল। এখানে ভিতরকার রস ক্ষার জাতীয় সুতরাং ক্ষয়জীবাণু বৃদ্ধির একান্ত পরিপোষক। আমরা তাই অন্ত্রের মধ্যে ক্ষয়জাত ঘা অতি বিশদরূপে দেখ্‌তে পাই। এখান থেকে সময় সময় উদরবেষ্টন ঝিল্লীকে আক্রমণ করে এবং পেরিটোনাইটিস উৎপন্ন করে।

ফুস্‌ফুসে

অন্ত্রের সংলগ্ন যে সব বিচি (Lymphatic glands) আছে উহারা অধিকাংশ সময়ই আক্রান্ত হয় এবং তথা হইতে রসবাহী নাড়ী (Lymphatic vessel) সহযোগে বুকের ভিতরকার (Thoracic) বিচি সমূহ আক্রমণ করে ও পরে ফুসফুসস্থিত ব্রঙ্কইয়াল গ্ল্যাণ্ডগুলি ত (Bronchial glands) আক্রমণ করতে পারে এবং তথা হইতে অবশেষে ফুসফুসকে আক্রমণ করে যক্ষ্মা সৃষ্টি করে।

মলদ্বারে

অাঁতের ভিতরকার ঘা দ্বারা অাঁত কুঞ্চিত হয়ে সময় সময় বাহ্যে বন্ধের (Intestinal obstruction) কারণ স্বরূপ হয়। সময় সময় বীচিগুলি বড় হয়ে মলদ্বার প্রায় বন্ধ করে ফেলে (Tumour and Stricture) এবং নানারূপ যাতনার কারণ হয়। মলদ্বারে অনেক সময় ক্ষয়জাত ফোড়া ও ভগন্দর হয়।

পেটের যক্ষ্মা

অনেক সময়ই ডাক্তারেরা পেটে যক্ষ্মা হয়েছে বলে থাকেন এবং কথাটা সাধারণে প্রায়ই বুঝ্‌তে পারে না সুতরাং এসম্বন্ধে একটু অধিকতর বলা দরকার। উদরাভ্যন্তরে অাঁতে ক্ষয় ব্যাধি হয় এ কথা এই মাত্র বলেছি। এই স্থান হতে ক্রমে বিচিগুলি আক্রান্ত হয় ও পেরিটোনাইটিস হওয়ার কথাও পূর্ব্বেই বলেছি। অনেক সময় জ্বর থাকে তবে সব সময় থাকে না। বাহ্যের বড় গোলমাল হয়। কতকদিন হয় ত খুব শক্ত বাহ্যে হল আবার কতকদিন পেটের অসুখ চল্‌ল। এই প্রকার একবার মল কাঠিন্য ও পরক্ষণে উদরাময় বড়ই সন্দেহের বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে আহারে রুচি থাকে না, খাদ্য পরিপাক হয় না, সময় সময় বা বমন হয়। দেহের বল ক্ষয় হতে থাকে ও শরীর শুকাইয়া যায়। কিছুদিন এই রূপ চল্‌লে পেটে জল জমা অসম্ভব নহে। পেটটি বেশ টিলটিলে হয় উপরিভাগ মসৃণ হয় ও শিরা-গুলি বেশ প্রকাশমান হয়। পেটের উপর থেকে হাত চাপ দিয়ে দেখ্‌লে পেটের ভিতর বিচিগুলি ফুলার দরুন ডিম ডিম বোধ হয়। এই ব্যাধি শিশুদেরই অধিকাংশ হয় এবং ইহাকেই পেটে যক্ষ্মা হওয়া বলে থাকে। (Tabes mesenterica); বাস্তবিক যক্ষ্মা শব্দ মাত্র ফুসফুসের ক্ষয় ব্যাধি সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মা কথাটার দ্বারা পেটের ক্ষয় সহজে ধারণা হবে বলেই উহা ব্যবহৃত হয় নতুবা উহার যক্ষ্মা নাম দেওয়া সঙ্গত নয়।

শ্বাসপথে

এদিকে জীবাণু শ্বাসপথে নাকের ভিতর প্রবেশ করে কোন্ দিকে যায় দেখা যাক্। নাকের ভিতর খুব কম আক্রমণ হয়। কণ্ঠ-

নালীর প্রবেশ দ্বারের (Larynx) প্রায়ই ক্ষয় দেখা যায়। এতে স্বরভঙ্গ হয়ে যেতে পারে ও আহারে কষ্ট হতে পারে। এত স্বরভঙ্গ হতে পারে যে কথা বলার শক্তি আদৌ থাকে না। আহার একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং তদানুসঙ্গিক দেহক্ষয় এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। কণ্ঠনালীর (Bronchial tube) দিয়ে ক্ষয়বীজ সোজা ফুসফুসে চলে যায়। কণ্ঠনালীর ভিতরে সিলিয়েটেড্ এপিথিলিয়ামের (ciliated Epitheliume) আবরণ থাকায় ক্ষয়-জীবাণু সহজে এ পথে প্রবেশ করতে পারে না। যেই প্রবেশ করতে যায় উহারা ঠেলে বের করে দেয়; অন্য কথায় কোন বাহিরের জিনিষ প্রবেশ করলেই এ সব স্থানের নড়নড়ি হতেই কাশি সুরু হয় এবং যা কিছু ভিতরে যাবার যোগাড় করেছিল তা বের হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সিলিয়াগুলি সব সময়ে কর্ম্মক্ষম নাও থাকতে পারে। তখন ত আর উপায় নাই ক্ষয়বীজ অবাধে ফুসফুসে চলে যায় ও যক্ষ্মার সূত্রপাত করে।

শ্বাসপথ ও অন্ননালী পথ সম্বন্ধে বিচার

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই মত অনেকেই অস্বীকার করেন, তাঁরা বলেন যে এ পথে ক্ষয়বীজ সাধারণতঃ ফুসফুসে যায় না। উহা পেটের ভিতরকার অন্ত্র হতে তথাকার বিচিগুলি আক্রমণ করে এবং তথা হতে ক্রমে উর্দ্ধগতি হইয়া ফুসফুসের নিকট বিচিগুলি আক্রমণ করে এবং অবশেষে ফুসফুসকেই ধরিয়া বসে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলা যাইতে পারে।

(১) অন্ত্রের ভিতর যে সব ক্ষয়বীজ দেখা যায় তাহা প্রায়ই গোজাতীয়; কিন্তু ফুসফুসের ভিতর মাত্র মনুষ্যজাতীয় জীবাণুই দেখা যায়।

(২) যক্ষ্মার সব অবস্থায়ই অন্ত্রের ভিতর ঘা বা তথাকার বিচিগুলিকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখা যায় না।

(৩) আমাদের এই ভারতবর্ষে এমন হাজার হাজার লোক আছে যারা মাংস কোন জন্মে খায় না এবং দুধও যে একটু আধটু খাবে অদৃষ্টবৈগুণ্যে দারিদ্র্য জন্য সে সুখ হতেও তারা বঞ্চিত—কিন্তু তাদের মধ্যেও অনেকের যক্ষ্মা রোগ দেখা যায়।

প্রথম মতের অনুকূলে এই বলা যেতে পারে যে, দেহে প্রবেশ করবার সময় গো-জাতীয় জীবাণুই প্রবেশ করে; কিন্তু বহুকাল শরীরের ভিতর থাকার ফলে এবং উহার চারিদিককার অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য উহা আস্তে আস্তে মনুষ্য-জাতীয়তে পরিবর্ত্তিত হতে পারে। কিন্তু কেহ এরূপ নিশ্চিতরূপে ঘটতে দেখেছেন বলে বলেন নাই এবং যে পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান না হয় এবং বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ না হয় সে পর্য্যন্ত এই মতের পোষকতা করা যায় না।

দ্বিতীয় মতের স্বাপক্ষে এই বলা যেতে পারে যে, হয়ত ক্ষত অতি বৎসামান্য হয়েছিল এবং উহা এমন ভাবে সেরে গেছে যে উহার চিহ্নমাত্র নাই। বিচির ভিতর দিয়েও জীবাণুগুলি এত তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছে যে উহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটবার অবকাশ হয় নাই। কিন্তু এরূপ সকল সময়ে সম্ভব নয়।

তৃতীয় মত ইহার একান্তই বিপক্ষে। সুতরাং আমরা যে সব প্রমাণ পাইতেছি তাহা হতে দেখা যায় যে ক্ষয়জীবাণু, সাধা-

রণতঃ সোজা শ্বাস পথেই যায় এবং মনুষ্য-জাতীয় জীবাণু দ্বারাই যক্ষ্মা উৎপাদিত হয়। কিন্তু একথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, কতক কতক জীবাণু খাদ্যপথে দেহে প্রবেশ করে এবং সম্ভবতঃ অবস্থাবিশেষে সময় সময় গোজাতীয় জীবাণু দ্বারাও এই ব্যাধি উৎপন্ন হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

পুণ্যক্ষেত্র ৺কালীক্ষেত্র

(গত ভাদ্র মাসের ১০৩৯ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

(৪)

(কালীঘাটের কয়েকজন সন্ন্যাসী)

কটুভাষী সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসিগণের সহিত আলাপ পরিচয় সকল সময় সুখকর নহে, কখন কখন বিনা কারণে লাঞ্ছিত হইতে হয়।

বাটির নিকটেই কোন এক গঙ্গার ঘাটে কিছুদিন হইতে এক বাঙ্গালী সাধুর দর্শন পাইয়া তাঁহার সহিত আলাপে ব্যগ্রতা জন্মিল। সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে চণ্ডীপাঠ করিতেন ও তখন তাহা বড় সুশ্রাব্য বোধ হইত। অজ্ঞাতসারে সন্ন্যাসী আমার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

একদিন রাত্রিকালে মায়ের নাটমন্দিরে দেখি সন্ন্যাসিটি বসিয়া আছেন ও গান জুড়িয়া দিয়াছেন। গলা যেমন সুমিষ্ট, গানের ভাবটিও তেমনই সুন্দর। কথাগুলি মনে নাই কিন্তু ভাবটি যাহা মনে আছে তাহাতে মনে হয় গায়ক, ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় বিরচিত নিম্নলিখিত সুন্দর গানটিই গাহিতেছিলেন।

এই সময় তারা জাগো জাগো।
ঘোর মহানিশায় ঘোর শিবা রব,
শিব সীমন্তিনি জাগো জাগো।
তুমি ঘুমাইলে সংসার জাগে মা,
সংসার ঘুমাইলে তুমি জাগো শ্যামা
এখন ঘুমাল সংসার জাগো তাই একবার
এই ত সময় যায় গো।
দেহ মনোবৃত্তি দশেন্দ্রিয় শক্তি,
ঘুমাইল তারা হইল সুষুপ্তি;
এখন তুরে গেল তারা, তুমি জাগো তারা!
পুরাও মা অন্তর্যাগ।
এ বিশাল বিশ্ব গভীর আঁধারে,
ঢাকিল মা মহা অবিদ্যার ঘোরে,
ভোগে পশুপক্ষীনরচরাচরে,
আপন আপন ভাগ।
ভেদি এ আঁধার আধার কমলে,
জাগো কুল কুণ্ডলিনি! চতুর্দ্দলে;
ষোল দলে দলে, ষোগিনীর দলে
ষোলায়ে ষোল মাগো। ইত্যাদি।

তখন আমি ঐ গীতটি আর কোথাও পড়ি নাই। ভাল লাগায়, অপরাধের মধ্যে ঐ গানটি আর একবার গাহিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ইহাতেই কিন্তু তিনি চটিয়া গিয়া মুখখামটা দিয়া বলিয়া বসিলেন—"আমি ত তোমার চাকর নহি যে হুকুমে ফরমাস খাটিতে হইবে।" তাঁহার এইরূপ কোপন প্রকৃতি, সময় সময় অধিকতর

কটুভাষা ও অশ্লীল গালাগালি প্রভৃতি হেতু তাঁহার সহিত বেশী মিশিতে আর প্রবৃত্তি বা সাহস হয় নাই। কিছুকাল পরেই ইনি অন্তর্ধান চলিয়া যান, আর দেখা হয় নাই। কে বলিতে পারে, ইনি ঐ পূর্ব্বকথিত অতৃপ্তিকর পিশাচ-বেশী কোন মহাপুরুষ নহেন? কারণ ঠিক এইরূপ আকৃতি প্রকৃতির এক সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত ও তাঁহার কোন ভক্তের নিকট পরে শুনিয়াছিলাম, সন্ন্যাসীটির নাম শাম্ব বা সাংখ্য বাবা এবং তিনি একজন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ।

সন্ন্যাসী সজ্জনের প্রকৃত পরিচয় লাভের পক্ষে এই এক মস্ত বাধা বিদ্যমান। তাঁহারা সত্য সত্যই কোন অসাধারণ পুরুষ অথবা শ্রদ্ধালু হৃদয়ের শ্রদ্ধার গুণে ঐরূপে অনুভূত হন মাত্র, নির্ণয় করিয়া উঠা সুকঠিন। আমরা জানি, ভক্তিরূপ স্পর্শমণি প্রভাবে এইরূপ অঘটন নিত্য ঘটিয়া থাকে। সন্তানের নিকট জনকজননী, জনকজননীর নিকট সন্তান, পত্নীর নিকটে পতি বা পতির নিকটে পত্নী, বন্ধুর নিকটে বন্ধু, ইত্যাদি সকলে,—সম্পর্ক বিরহিতের নিকট যে ভাবেই প্রতীয়মান হউন, ইঁহারা সকলে যত দোষেরই আধার হউন,—অনুরাগরূপ স্পর্শমণি প্রভাবে পরস্পরের নিকট দেবতার ন্যায় সুন্দর ও মনোহর। ভক্তি প্রভাবে এইরূপ দিব্যপ্রকৃতি ও দিব্যদৃষ্টিলাভ হয়; ভক্তের নিকট অসুন্দর কিছু রহে না; ভক্ত তাহার ভক্তি প্রভাবে সর্ব্বসুন্দর বৈকুণ্ঠপুরি রচনা করিয়া তাহার মাঝে নিয়ত বিহার করে। এই জন্যই বলে ঢেঁকি ভক্তেও স্বর্গে যাওয়া যায়, পক্ষান্তরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে পেয়েও দুর্য্যোধনাদির মন মজেনা।

এ সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। পথের ধারে নর্দ্দামার কাছে, আর এখানে কাল ওখানে কাঁথা কানি বেষ্টিত দুষ্ট পুষ্ট সদা প্রফুল্লচিত্ত একজনকে দেখিতাম। তাহার এই সদা প্রফুল্ল ভাবটিই একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কাজের মধ্যে এক ছেলে মানুষি কাজ—টিনের একটা মগের মধ্যে একটা বাঁশের চোঙ্গ রাখিয়া তাহাতে ফুঁ দিয়া খুব গম্ভীর আওয়াজ বাহির করা, শব্দ শুনলে মনে হ'ত যেন বাঘ গর্জ্জরাচ্ছে। ৺গয়াধামে একজন যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি কথায় কথায় আমার কালীঘাট ভবানীপুরে বাড়ি শুনে জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতির কোন সাধু ব্যক্তির সহিত আমি পরিচিত কি না এবং পরিচিত নহি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে যেন চেষ্টা পাই তিনি একজন অসাধারণ পুরুষ। কৌতূহলী হয়ে বাটি এসেই তাঁহার সন্ধানে চলিয়াছি, পথেই দেখি কাঁথা কানি সব কাঁধে লয়ে, মোটাসোটা যেন একজন কাবুলীর ন্যায় দেখিতে হয়ে, সন্ন্যাসী ঐ দিনই কোথায় চলিয়া যাইতেছেন; মুসলমানের ন্যায় দেখিতে মাথায় কিন্তু এক নামাবলি জড়ান কে আর একজন পথ আগুলিয়া দাঁড়িয়েছে। সন্ন্যাসীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া, শেষোক্তটি মৃদুস্বরে কি গান শুনাইতেছে; সন্ন্যাসী একটু মুচকি মুচকি হাসিয়া মাঝে মাঝে আমাদের দিকে চাহিয়া এক একবার চোখ ঠারিতেছেন, ইঙ্গিতে যেন বলিতেছেন "পাগলটার রকম দেখ"। অনেক লোক এই দুই পাগলের কাণ্ড দেখিতে জমা হয়েছে। আমি কাছে যাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু জনতা ঠেলিয়া নিকটে যাইতে অসুবিধা বোধ হ'ল। একটু পরেই নামাবলি মাথায় মুসলমানটি নিকটের এক গাঁজার দোকান হইতে

দুপয়সার গাঁজা কিনিয়া সন্ন্যাসীকে দিলেন। সন্ন্যাসী সেই যে চলিয়া গেলেন সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। ইনি একজন প্রকৃতই কোন মহাপুরুষ কি না, ইহাঁর সহিত পরিচিত হইবার আমার সৌভাগ্য নাই সেইজন্য অথবা প্রকটিত হইবার ভয়ে ঐ ভাবে অন্তর্হিত হইলেন, কিরূপে নির্ণীত হইবে?

গাঁজা কেনা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠিল। একবার একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁহারা অত গঞ্জিকার ধূমপান করেন কেন? সন্ন্যাসী যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, নিতান্ত অযৌক্তিক মনে হয় না। তিনি বলিয়াছিলেন গৃহী ও সন্ন্যাসীর অবস্থা একরূপ নহে। সন্ন্যাসীদিগকে সর্ব্বদা পাঁচ ঘাটের জল খাইতে হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন স্থলে নিয়ত শীতাতপের পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে হয়, ঐ সমস্ত বিষের প্রভাবে তাঁহারা অনেকটা পীড়ামুক্ত থাকেন। কালকূট বিষও সন্ন্যাসীদের পক্ষে অপকারী না হইয়া অনেক সময় অমৃতের তুল্য উপকারী হয়। আমরা জানি, সেকালে ইংরাজিটিকা লইবার পর, সকলে কিছুদিন বিভিন্ন পল্লীর বিভিন্ন পুষ্করিণী সমূহে এক একদিন স্নান করিয়া কৃত্রিম উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র জ্বর আনয়নে চেষ্টা পাইতেন, ইহাতে টিকা লইবার উদ্দেশ্যটি অধিকতর সুসিদ্ধ হয় বিবেচনা করা হইত। এখন ওরূপ করা অনাবশ্যক বিবেচিত হয় এবং এখন আর তেমন পাড়ায় পাড়ায় পুকুরেরও ছড়াছড়ি নাই। কোন্ পুকুরের জল হাল্কা, কোন্ পুকুরের জল ভারি এবং এইরূপ পাঁচ ঘাটের পাঁচ রকম জল ব্যবহার শরীরের পক্ষে অপকারী অনেকেরই জানা ছিল। পক্ষান্তরে সন্ন্যাসীগণের প্রিয় পারাভস্মাদি গরম ঔষধ ব্যবহার ফলে অনেক গৃহীকে আজীবন ডাবের জল চিনির পানা প্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া শরীর সুস্থ রাখিতে হইত। এই সব হইতেও বুঝা যায় সন্ন্যাসীর কথাগুলি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। গৃহী ও সন্ন্যাসীর অবস্থা এক বিষয়ে ভিন্ন সুতরাং গৃহীর আদর্শের মাপকাঠি লইয়া সন্ন্যাসীগণের অনেক আচরণ ভাল কি মন্দ বিচার করা সকল সময় সঙ্গত নহে অথবা মহতের আচরণ অনুকরণীয় এই অজুহাত করিয়া উঁহাদের অনেক আচরণের অন্ধ অনুকরণ করাও কর্ত্তব্য নহে।

"সোদ্রাও" নামে এইরূপ আর একজন সাধুকে প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে একটি একতারা বাজাইয়া পথে ঘাটে বিচরণ করিতে দেখা যাইত। শ্মশানে বাস ও মদ্যপান করিতেন এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না. শুনা যায় গলা পচা মাংস এমন কি মড়াপোড়া মাংস অবধি খাইতে আপত্তি ছিল না। এরূপ পৈশাচিক বেশ ধারণ সত্ত্বেও তিনি অনেকের সবিশেষ ভয় ভক্তির পাত্র ছিলেন এবং তাঁহাকে একজন অসাধারণ পুরুষরূপে অনেকেই বিশ্বাস করিতেন। পথে ঘাটে অড়োমত্ত পিশাচ প্রকৃতির লোক খুব বিরল নহে কিন্তু সকলের প্রতি সকলে ত শ্রদ্ধান্বিত হয় না এবং এত সহজে স্বতঃ মান পাইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও কয়জন লোক এভাবে জীবন যাপনে সমর্থ হইতে পারে?

"বংশী বাবা"

কালীঘাটে এইরূপ অজানা সন্ন্যাসীর সংখ্যা বিস্তর। যতদিন উপস্থিত থাকেন ততদিন তাঁহাদের সহিত মিশিতে অনেকেরই প্রবৃত্তি বা অবসর হয় না। তথাপি অনেকেরই ছোট খাট ভক্তের দল থাকে, কোন রূপের

পরিচয় না পাইলে তাঁহারা মুগ্ধ হনই বা কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই অনুরাগটা ভক্তের ভক্তি প্রবণ প্রকৃতির বা সন্ন্যাসীর সাধন মার্গে অগ্রগামিতার পরিচায়ক সকল সময় নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায় না। যাহা হউক এই সমস্ত হইতে আমরা আমাদের সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনেকটা পরিচয় পাই। প্রবল ধর্ম্মানুরাগের একটা পূত অন্তঃসলিল প্রবাহ এখানে নিয়ত প্রবাহমান। ধর্ম্মানুরাগী সাধক ও সিদ্ধ পুরুষগণের অভাব এখানে কখনই হয় নাই এবং বোধ হয় হইবারও নহে।

কালীঘাটেরই উপকণ্ঠস্থিত টালিগঞ্জের প্রসিদ্ধ মোড়ল বাবুদের ঘাটে একজন সন্ন্যাসী কিছুদিন অবস্থান করিতেন। একটা বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া প্রায় বেড়াইতেন বলিয়া লোকের নিকট ইনি বংশীবাবা, নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি একজন নানকপন্থী উদাসীন এবং এবারকার হরিদ্বারের কুম্ভ মেলায় দেহ রক্ষা করিয়াছেন। বাবা নানক প্রবর্ত্তিত শিখ সম্প্রদায়কে হিন্দুগণ হইতে পৃথক্‌রূপে পরিগণিত করিতে আজকাল কেহ কেহ অভিলাষ দেখান কিন্তু এইরূপ একজন নানকপন্থী উদাসীনের সংস্রবে আসিয়াই ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রাণের ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ তিনি আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপর অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা হউক শিখগণ হিন্দু বা অহিন্দু সে মীমাংসা আপাততঃ অনাবশ্যক।

একজন বিশ্বাস্ত প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বংশীবাবা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অদ্ভুত কাহিনীটি শ্রবণ করিয়াছি।

একদিন অনেকে ইহার নিকট বসিয়া আছেন, সহসা চারিদিকে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। শৃগালেরা রজনীতে এই ভাবে প্রহরে প্রহরে চীৎকার করে বলিয়া ইহাদের একটি নাম "যামঘোষ"। আরও অনেক নিশাচর প্রাণী আছে তাহারা কিন্তু এভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। যাহা হউক উহাদের এরূপ সমস্বরে চীৎকারে যতই বিশেষত্ব থাকুক, ইহা একটা অসাধারণ ব্যাপার নহে। শৃগালগণের ডাক থামিলে সন্ন্যাসী কিন্তু বলিয়া উঠিলেন "হুঁ। বহুৎ আচ্ছা।" সকলে ইহার কারণ জানিতে চাহিলে ইনি বলিয়াছিলেন, "গঙ্গার জল বাড়িয়া শীঘ্রই একটা প্লাবন উপস্থিত হ'বে ও অনেক জীবজন্তু মারা পড়িবে, ইহারা তাহাই জানাইয়া গেল।" ইহার অল্পকাল পরেই, গঙ্গার সহিতই সংযুক্ত যামোঘর নদের ভীষণ প্লাবন সংঘটিত হয়।

এই যে একটি ঘটনার কথা উল্লিখিত হইল আজিকারদিনে অনেকেরই নিকট ইহা একটি ঘোর অবিশ্বাস্ত ও উপহাস্ত ব্যাপার কিন্তু তথাপি ঘটনাটি যে সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন ইহা হইতে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, পাঠকবর্গ নিজ নিজ রুচি ও বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী তাহা স্থির করিয়া লউন। এই প্রসঙ্গে আমাদের এইটুকু মনে রাখা ভাল, নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসটা অনেক সময় অজ্ঞানতা ও অক্ষমতারই নামান্তর মাত্র।

এক সময়ে কি এদেশে কি অন্য দেশে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বহুবহু পশুপক্ষীর আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে অনেকেই অল্প বিস্তর বিশ্বাসবান্ ছিলেন। অন্যান্যবাদিগণ ত স্বীকারই করেন, আত্মা শুধু নরদেহেই নিবদ্ধ নহে। প্রাচীন মিশরে গো-পূজা প্রচলিত ছিল। ইহাদের সংস্রবে আসিয়া প্রাচীন য়িহুদিগণ অনেকে গো-পূজক হইয়া উঠিয়া-

ছিলেন এবং উহাদের এই স্বভাব পরিবর্ত্তনার্থ বিহুদি নেতাদিগকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এদেশে এখনও অনেকে বানর, গো, সর্প, কুক্কুর, বিড়াল, শৃগাল, কাক, পেচক প্রভৃতি বিবিধ পশুপক্ষীর নানারূপ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আস্থা সম্পন্ন। ভারতের নানাস্থলে "মহাবীর" মারুতি জাগ্রত দেবতারূপে পূজিত, কুস্তির আখড়ায় আখড়ায় ইহার মূর্ত্তি রক্ষিত, প্রাচীন রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় বাঙ্গালীর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও হনুমানের কীর্ত্তিকথা বিঘোষিত। গো-মাতার গুণগানে হিন্দুর শাস্ত্র কাব্যসমূহ মুখরিত; গো-সেবায় পুণ্য বৃদ্ধি ও পাপক্ষয় হয়, অপুত্রক পুত্রলাভ, অমঙ্গল দূরে যায়, গোধনের তুল্য ধন নাই, গোদানের তুল্য দান নাই, পঞ্চগব্য পাতিত্য নাশক, গব্যদুগ্ধ ও গব্যঘৃত জরাব্যাধি প্রশমনকারী শ্রেষ্ঠ রসায়ন, গোমূত্র ও গোময় সাহায্যে ধাতু-ভস্মাদি শ্রেষ্ঠ ঔষধীয় উপাদান সমূহ প্রস্তুত হয়। বাস্তুসাপ ও লক্ষ্মীপেচা গৃহস্থের মঙ্গল-কারণ। কুক্কুর সন্ন্যাসীর আদৃত জীব, ভৈরবদেবের বাহন, ধর্ম্মের মূর্ত্তি। কাল-পেচা, দাঁড়কাক, কুক্কুর, শৃগাল, বিড়াল প্রভৃতির বিকট চীৎকার অশুভসূচক। ভুষুণ্ডী কাক চির জ্ঞানের আধার। শাকুন বিদ্যায় পারদর্শিতা জন্মিলে শৃগালের ন্যায় কাকের ডাক শুনেও অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। শৃগাল গর্দ্দভ প্রভৃতির ডাক শুনিয়া ঠগীরা একসময় নিয়ন্ত্রিত হইত। কৃত্তি-বাসী রামায়ণের পাঠক অবগত আছেন,—

"হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে,
পথে অমঙ্গল যত পড়য়ে গোচরে,
বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে,
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।"

শৃগাল বড় সাধারণ জীব নহেন, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব যখন কংসভয়ে সদ্যোজাত শিশুটিকে লইয়া সখা নন্দ গোপের গৃহে রাখিয়া আসিবার জন্য পলায়ন করিতে-ছিলেন এবং দুর্য্যোগময়ী রজনীতে বর্ষার জলে কালিন্দীর স্ফীত কলেবর দেখিয়া প্রমাদ গণিতেছিলেন, মহাদেবী যোগমায়া সেই সময় স্বয়ং শৃগাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনায়াসে নদী পার হইয়া গিয়া বসুদেবের অবসন্ন হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন। শিবাগণ শ্মশান-চারিণী হরজায়া শিবাণীর নিত্য সহচর এবং তাঁহার আদেশে আশ্রিত জীবরূপে অনেক অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন। যাজনের সময় শিবা বলি অর্থাৎ শৃগালগণের উদ্দেশে আহার্য্য প্রদত্ত হয়। (দেবগণের উদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্যসমূহের সাধারণ নাম বলি, বলি ও প্রাণ হনন নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ নহে, বলি শব্দের এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আমরা সকলেই বলিতে পারি "নরবলির" তুল্য শ্রেষ্ঠ বলি বাস্ত-বিকই আর নাই। বলা বাহুল্য নরবলি শব্দের অর্থ এখানে নরহত্যা নহে, পরন্তু ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ বা ধর্ম্মকেই জীবনব্রতরূপে গ্রহণ মাত্র)। নবান্নের সময় গৃহস্থগৃহে কাকবলি প্রদত্ত হয়। চারিদিকে আহার্য্য ছুটে বলিয়া, অথবা সহসা এত আদরের অর্থ কি ভাবিয়া সে দিন কাকদের গর্ব্ব বা সন্দেহ বাড়িয়া যায়, গৃহস্থগৃহে সহসা তাঁহারা দর্শন দেন না। গৃহে কাক এসে একটু বিশেষ ভাবে কলরব আরম্ভ করিলে, গৃহস্থবধূ অনেক সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন "কুটুম আসে যদি তবে নড়ে বস্" এবং কাক ঐ কথা শুনিয়া নড়িয়া বসিল কিনা দেখিয়া আত্মীয় কুটুম্বের শুভাগমন প্রতীক্ষা করেন। বিড়ালেরা প্রায়ই তাহাদের অঙ্গ পরিষ্কারে প্রবৃত্ত থাকে,

এটি তাহাদের একটু অসাধারণ স্বভাব। বিড়ালকে একটু যত্ন সহকারে মুখ মুছিতে দেখিলে, গৃহস্থবধূ অমনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কুটুম আসে যদি কাণ তুলে তুলে আঁচো", বিড়ালও অমনই অনেক সময় তাহার দুলো দিয়া কর্ণদেশ অবধি মুছিয়া লয়, গৃহস্থ বধূও জানিতে পারেন গৃহে অতিথীর আগমন হইতেছে।

দৃষ্টান্তগুলি অবশ্য সামান্য কিন্তু এই সমস্ত হইতে বুঝাযায় এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ, ফলিত জ্যোতিষের একটা অঙ্গ স্বরূপ বা সতন্ত্র বিজ্ঞান বা বিদ্যাবিশেষরূপে বিবেচিত হইত। জড় বিজ্ঞান চর্চ্চা ফলে, তাপমান, বায়ুমান, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রযোগে যেমন আমাদের দিব্যদৃষ্টি বা জ্ঞাননেত্র কিয়ৎপরিমাণে বিকশিত হয় তদ্রূপ ঐ সমস্ত বিদ্যাবলে অনুরূপ বা উৎকৃষ্টতা রূপ জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হওয়া যাইতে পারে, এইরূপ ধারণা একসময় অনেকেই পোষণ করিতেন।

ভারতের নানা কারণে অল্পে অল্পে অবিশ্বাসের যুগ দেখা দিল। আমরা অনেকেই এই সমস্ত বিদ্যার বিশ্বাস কুসংস্কার মাত্র মনে করিয়া, সবই নস্যাৎ করিয়া দিয়া অথবা এসব বিষয়ে মাথাঘামান নিরর্থক ভাবিয়া অজ্ঞানের অন্ধকারে নিশ্চিন্ত মানসে নিদ্রা যাইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এই সব দুর্জ্ঞেয় জটীল বিষয়ে বহু পরিশ্রম সহকারে তত্ত্বানুসন্ধান অপেক্ষা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শিরস্ত্র স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের বহু তপস্যালব্ধ জড় বিজ্ঞানটি অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া লইয়া অধিকতর লাভবান্ হইবার আশায় উৎফুল্ল হইতে ছিলাম। কিন্তু এতদিন পরে এ আবার কি! এতদিন পরে আবার কি সেই বহুদিনের অবজ্ঞাত গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় ভারতের নানা বিদ্যা, ভাবের মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া আমাদের অবিশ্বাসের অন্ধকার উড়াইয়া দিবে ইহা কি তাহারই সূচনা? অথবা আমাদের জ্ঞান ও ক্রমোন্নতির অভিমানটা একটু সংযত করিবার জন্য, আমাদের প্রাচীন উন্নতি ও বিবিধ বিদ্যার কাহিনীগুলা যে কুসংস্কার ও অলীক উপন্যাস মাত্র নহে তাহা বুঝাইবার জন্যই কি জানি কাহার কৃপায় মাঝে মাঝে এইরূপ সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলে কি না কে বলিতে পারে?

বংশীবাবার একটা প্রিয় উপদেশ এই, "সমরতি" অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় সকলের উপর সমদৃষ্টি সম্পন্ন হও। এ সেই চির পুরাতন অথচ চির নূতন সনাতন উপদেশ "শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ" প্রকৃত পণ্ডিত পদবাচ্য যিনি, তিনি ঘৃণিত কুক্কুর বা অস্পৃশ্য চণ্ডালকেও অবজ্ঞা বা উপেক্ষার ভাবে দেখেন না। "সমরতি" এই সামান্য কথাটিতে সর্ব্বভূতে দ্বেষবিহীন করুণাময় প্রকৃতি, শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান ইত্যাদি ব্যাপারে অবিচলিত ভাবে অবস্থান, হর্ষানর্থ ভয় উদ্বেগ ইত্যাদি হইতে মুক্তি লাভ, প্রভৃতি গীতার অনেকগুলি সুমহৎ উপদেশ অতি অল্পাক্ষরে সূচিত। ফলতঃ যতই চিন্তা করা যায়, কথাটির ভিতর হইতে যেন নব নব সুন্দর ভাব বাহির হইতে থাকে। পাকা "সমরতি" আর বেদান্তের নির্গুণ ভাবে অবস্থিতি একই কথা। একটুও ভেদজ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান অবশেষ থাকিতে সমজ্ঞানটা আর ষোল আনা হইল কিরূপে বলা যাজে? আবার সর্ব্বত্র "রতি" বা আনন্দ উপভোগ, আর মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরে মজে যাওয়া একই কথা নহে কি? "চিনি হ'তে চাইনা

যে মন, চিনি খেতে চাই।" যিনি চিনি খেতে চাহেন, তিনি চিনি হবার চিন্তায় যদি ভরিয়ে উঠেন বা চিনি হ'তেই যাঁহার বাসনা চিনি খেতে পেলেও যদি সাধকের তিনি সে রসে বঞ্চিত থাকেন তবে উহাদের কোনটাই ঠিক "সমরতি" হইল না। একজন গ্রীক দার্শনিক বলিয়া বেড়াইতেন, "জীবন ও মরণ দুটাই তাঁহার বিবেচনায় সমান, কোন ভেদ নাই; একটার যেখানে অন্ত অন্যটার তথায় আরম্ভ, এই হিসাবে মরণটা নবজীবন এবং জীবনটা মরণ নামে অভিহিত করিলেও দোষ নাই; ফলতঃ মরণই বা কোথায় জীবনই বা কোথায়? অনন্তের শুধু দুটা কাল্পনিক অংশ-ভেদ মাত্র।" একজন তরলমতি দুষ্টবুদ্ধি তার্কিক যুবক তাঁহাকে একদিন পাকড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, জীবন ও মরণ সত্য সত্যই যদি তিনি সমজ্ঞান করেন তবে বাঁচিয়া আছেন কেন? কৈ মরিয়া দেখান দেখি যে দুটাই তাঁহার বিবেচনায় সমান! দার্শনিক কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর দিলেন, "দুটাই যে সমান, একটা ছেড়ে আর একটার জন্যই বা ব্যস্ত হইব কেন?" ফলতঃ এইরূপ ভাবে সমজ্ঞানটাও সর্বথা অভেদজ্ঞান নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত, আর অভেদ জ্ঞানই ত অদ্বৈতজ্ঞান। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় অদ্বৈতবাদের ইহাও এক উপযুক্ত ও সঙ্গত অর্থ। এই অর্থ গ্রহণ করিলে, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে এক অচিন্ত্য ভাবে সমন্বয় সিদ্ধ হয়; শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি আচার্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বিচার লয়ে আর লাঠালাঠি গালাগালির প্রয়োজন থাকে না। শুধু বুঝিবার বা বুঝাইবার দোষে উঁহাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী রূপে খাড়া করা হয় মাত্র। সুখের বিষয় বর্তমানকালের একজন বাঙ্গালীর—"পত্রাবলী" মহাত্মা হরনাথের—চিন্তায় জীবন্মুক্তির এই নব অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত আদর্শের প্রচার আমরা দেখিতে পাই।

গীতার একটী শ্লোকে আছে "সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" ইত্যাদি। যাঁহার সুখে দুঃখে সমজ্ঞান জন্মেছে, তাঁহার এইরূপ সদা সন্তুষ্ট ভাব, কারণ কোন এক নির্দিষ্ট অবস্থা প্রাপ্তিজন্য তাঁহার আর যত্ন থাকে না। সহসা সন্দেহ হ'তে পারে, গৃহীর পক্ষে একটা হয়ত খুব প্রার্থনীয় আদর্শ নহে, কারণ "অসন্তুষ্টাঃ দ্বিজাঃ নষ্টাঃ সন্তুষ্টাইব পার্থিবাঃ" দ্বিজগণের পক্ষে সন্তোষ দূষণ এবং অসন্তোষ বিনাশের কারণ পার্থিবগণের অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষিগণের পক্ষে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা। উন্নতি অভিলাষী গৃহী ব্যক্তি, সন্তোষ বজায় রাখিয়া এবং মনে মনে সাংসারিক সমুদয় বিষয়ই মায়ার খেলা মাত্র অনুভব করিয়া, রঙ্গালয়ে অভিনয় করার ন্যায়, সংসারের সুখবৃদ্ধি ও দুঃখ পরিহারার্থ প্রচণ্ডভাবে যত্নশীল হইতে পারেন।

"সমরতি" শব্দের একটি অর্থ, সর্বত্র সম অনুরাগী, সমদর্শী, পক্ষপাতবিহীন প্রকৃতি হওয়া। সকলেরই দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখী বোধ করিতে পারিলে জানিবে, সমদর্শিতার পথে অগ্রসর হতেছ, নতুবা সমদর্শিতা শব্দের ইহা অভিপ্রায় নহে, যে সকলকেই এক ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু দেখা যায় কেহ কেহ এই শেষোক্ত ভুলটি করিয়া বসেন, আদর্শভেদ, কর্তব্যভেদ, অধিকারভেদ ইত্যাদি ভেদের দিকটা মোটেই ভাবিয়া দেখেন না। বেঁটে মানুষকে টেনে বড় করা বা লম্বা মানুষকে চাপ দিয়ে ছোট করিবার চেষ্টার নাম সমদর্শিতা নহে।

এইরূপ ঘটে বলিয়া সমদর্শিতা ব্যপদেশে সময় সময় বিষম দলাদলি ও অনর্থের সূত্রপাত হয়, সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া রক্তস্রোত বহিয়া যায়, ব্রাহ্মণ শূদ্রে মিলনের স্থলে অমিলনের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি। ফলতঃ সমদর্শী প্রকৃতি লাভের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে সমদর্শিতা প্রদর্শন কিছু কঠিন, উহার জন্য শিক্ষা, সাবধানতা এবং দীর্ঘকালব্যাপী শম দমাদি সাধনার প্রয়োজন।

বংশীবাবা সম্বন্ধে এই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণটি লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, এমন সময় একদিন ট্রামগাড়িতে যাইতে যাইতে মদীয় অদৃষ্ট, ঘটনাচক্রে বংশীবাবার সহিত পরিচিত জনৈক ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পান। ইঁহার নিকট বংশীবাবা সম্বন্ধে আরও কিছু বিবরণ জানিতে পারা গেল।

বংশীবাবা বলিতেন জীবনান্তে তাঁহার দেহটিকে যেন গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হয়। বংশীবাবা সমস্ত নদনদীকেই সাধারণ ভাবে গঙ্গানামে অভিহিত করিতেন, অথবা ইহা তাঁহার গঙ্গার উপর একটু বিশেষ শ্রদ্ধার পরিচায়ক আমরা বলিতে পারিলাম না। এবারে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় ইনি বিসূচিকা পীড়াক্রান্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ দিন সমাগত সুতরাং পীড়ামুক্তি চেষ্টায় তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া যাইবার আর আবশ্যক নাই। তদনুসারে দেহত্যাগের পর হরিদ্বারের নিকটেই কোন স্থানে তাঁহার দেহের জল-সমাধি প্রদত্ত হইয়াছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন, সাধুগণের দেহের এই ভাবে সৎকার একটা নূতন কাণ্ড নহে, গৃহিগণের ন্যায় তাঁহাদের দেহের অগ্নিসৎকার অত্যাবশ্যক নহে।

টালিগঞ্জের মোড়ল বাবুদের (শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের) একটি গাভী, মাত্র দেড় দিনের এক বাছুর রাখিয়া সর্পাঘাতে মারা যায়। বংশীবাবা এই মাতৃহীনা দেড় দিনের বাছুরের মায়ায় মুগ্ধ হইলেন ও তাহার লালন পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাছুরটিকে তিনি "চা" খাওয়াইতেন, কখন বা কেহ তাঁহাকে পান খাইতে দিয়াছে নিজে না খাইয়া আদর করিয়া বাছুরটিকে উহা খাওয়াইতেন। বাছুরটি তাহার সন্ন্যাসী মাকে পাইয়া এইরূপ ভাবে বাঁচিয়া উঠিল ও উভয়ের মধ্যে হৃদয়ের এক সূক্ষ্ম আকর্ষণ বা ভাবের আদান প্রদানের হয়ত উদ্ভব হইয়াছিল। বাছুরটির সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র কিন্তু বংশীবাবা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন "যমুনা"। যমুনার জল কাল, আদরের সাধ বাছুরের তাই এই উল্টা নাম, অথবা শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতির সহিত বিজড়িত পুণ্যতোয়া নদীর নামে বাছুরটির নামকরণ সকলের পছন্দ হওয়ায় উহার এই নামই বাহাল হইয়া গিয়াছে। যমুনা এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে, সের আড়াই করিয়া দুধ দেয়। অনেকবার দেখা গিয়াছে বংশীবাবা কখন স্থানান্তরে গেলে, যমুনা ঠিক যেন তাঁহার মায়ের মত অথবা মেয়ের মত, কি জানি কি আশঙ্কায় বা বিরহ বেদনায় বড় উন্মনা থাকিত, ভাল করিয়া আহারাদি করিত না। সাধুজি এবার যখন কুম্ভমেলায় গমন করেন, যমুনার চোখে জলধারা বহিতে দেখিয়া একটা কিছু অশুভের আশঙ্কায় অনেকেই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, কারণ হিন্দু মাত্রেরই সংস্কার গরুর চোখে জল পড়িতে নাই। বাবাজি দেহত্যাগ করিলে এখানে সে সংবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সকলে একদিন যমুনাকে অনর্গল কাঁদিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল এবং

ব্যাপার কি তখনও কেহ বুঝিতে পারে নাই।

বংশীবাবার অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক একটি কাহিনীও ভদ্রলোকটি ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু লেখক, আজিকার দিনে অনেকের অবিশ্বাস্য এই সব কাহিনী বর্ণনের ভার একা না লইয়া, কেহ ইচ্ছা করিলে ভদ্রলোকটির মুখে উহা শুনিতে পাইবেন বলিয়া এখানে তাঁহার ঠিকানাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসু পাঠক, "শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, ডিপজিটার্স ডিপার্টমেণ্ট "এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

চাঁড়াল সাধু

আমাদের মুনি ঋষিগণ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি এবং দিব্য শক্তির আধাররূপে চিরপূজিত। অগ্নিসাহায্যে যেমন নানা কার্য্য নিষ্পন্ন করা যায় তদ্রূপ প্রধানতঃ এই ব্রহ্মণ্য অগ্নি প্রভাবে আমাদের মুনি ঋষি ব্রাহ্মণগণ আমাদের সমাজের শাস্তা বা পরিচালক স্বরূপ ছিলেন এবং এখনও আছেন। দেখা যায়, ধার্ম্মিক পুরুষ মাত্রই অল্পাধিক পরিমাণে এইরূপ দিব্য শক্তি লাভে সমর্থ হন। এ বিষয়ে স্ত্রী শূদ্র ম্লেচ্ছ প্রভৃতিতে ভেদ নাই। হিন্দু ব্যতীত বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়েও বহু বহু সাধু মহাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ প্রকাশ করেন না। সতী নারীর তেজের মহিমা কে না অবগত আছেন? ধার্ম্মিক শূদ্রও ধর্ম্মরূপ এই ব্রহ্মণ্য অগ্নি প্রভাবে অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণের ন্যায়ই অনেকের হৃদয় অধিকারে ও সমাজ পরিচালনে শক্তিলাভ করেন। শূদ্রের পক্ষে তপস্যা, সন্ন্যাস, প্রভৃতি বৈধ অবৈধ অথবা উহাদের ধর্ম্মসাধন প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিচার এখানে অনাবশ্যক কিন্তু স্ত্রীশূদ্র ম্লেচ্ছ কাহারও যে ধার্ম্মিক হইতে বাধা নাই, ইহা সকলেই স্বীকার করেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ জনমাত্রই কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মণোচিত নানা শক্তির আধার হন, কারণ "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্"। ব্রাহ্মণও শ্রেষ্ঠ প্রায় সমার্থবাচক শব্দ। এই হিসাবে প্রকৃত পুণ্যাত্মা ব্যক্তি মাত্রই সেই শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য দেবেরই অংশরূপে একভাবে ব্রাহ্মণ নামে অভিধেয়। এই জন্যই বলে "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।" হরিভক্তি পরায়ণ ধার্ম্মিক চণ্ডাল দ্বিজশ্রেষ্ঠ রূপেই পরিগণিত। বলা বাহুল্য ইহাতে ব্রাহ্মণ বর্ণের মর্য্যাদার হানি হয় না কারণ হরিভক্তিপরায়ণ (অর্থাৎ ধার্ম্মিক) দ্বিজ ও চণ্ডাল উভয়ের মধ্যে কেহ কাহারও তুলনায় শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট ইহাতে মীমাংসিত হয় না, এবং কেহ কোন এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও সর্ব্ববিষয়েই যে শ্রেষ্ঠ, প্রমাণীত হয় না—দৃষ্টান্ত পুত্র যত গুণবান্‌ই হউন, পিতামাতা তাঁহার চির গুরুই রহিয়া যান। রাম কৃষ্ণাদি অবতার অবধি ব্রাহ্মণের শাসনাধীনে অবস্থিত। ভগবানের অবতাররূপে বহু স্থলে স্বীকৃত চৈতন্যদেবও একদা পীঢ়া হইতে মুক্তিলাভ জন্য ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়া হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ অন্য কেহ ব্রাহ্মণের ন্যায় দিব্যশক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হইলেও, সেই কারণে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা লোপ হয় না।

কালীঘাটে সময় সময় এইরূপ ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের সাধুও নয়নগোচর হয়। একবার একজন চাঁড়াল সাধুর আগমন হয়েছিল। আমরা তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বেশভূষা কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায়ই ছিল—সন্ন্যাসীর ন্যায় ছিল না। বাক্‌

সিদ্ধ পুরুষ অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলেন মিলিয়া যায় বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি রটিয়াছিল। ইঁহারই স্বজাতি, শ্রীশ্রীমনসা মাতার ভক্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ বহু গুণাধার, চাঁদশীর প্রসিদ্ধ কৃত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ডাক্তারের গৃহে ইনি অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমাদের ন্যায় আরও অনেকে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দেখিলাম দু' একজন ব্রাহ্মণ অবধি আসিয়া ইঁহার দিব্যশক্তির প্রভাব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। শেষে বাহিরে আসিয়া, এই লয়ে দুটা দলের সৃষ্টি হয়। একদলের মতে, গুণ ও শক্তিটাই উপাস্য এবং ইহাদেরই অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অনুসারে আধারের আদর বা অনাদর; গুণবান্ শক্তিশালী ম্লেচ্ছও সকলের পূজ্য, আর বিপ্র অবধি গুণহীন শক্তিহীন হইলে অন্যের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার পাত্র হন। বিশেষতঃ সাধু মহাত্মারা বর্ণাশ্রমের বিধি নিষেধের অতীত। আর একদল ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, ইঁহাদের বিবেচনায় গুণবান্ ও শক্তিধর পুরুষরা যথোচিত শ্রদ্ধা অনুরাগের পাত্র বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে কখনই প্রণম্য নহেন। স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব ভৃগুপদ লাঞ্ছনা। বুঝিয়া না চলিলে গুণ ও শক্তি পূজার বাড়াবাড়িটা পতনেরই কারণ। কে প্রকৃত গুণবান্ কে বা প্রকৃত শক্তিশালী কার্য্যকালে সর্ব্বদা যথার্থতঃ নির্ণীত হইবে কিরূপে? এবং একজনের গুণবত্তা বা গুণাভাব আর একজনকে কেনই বা বিচলিত করিবে?—বেল পাকিলে কাকের কি? বাপ মা গুণবান্ই হউন বা গুণহীন্ই হউন সন্তানের চির প্রণম্য রহেন না কি? ফলতঃ বাধ্যবাধকতা বা পূজ্য পূজক ভাবটা শুধু গুণ বা শক্তির উপরই নির্ভর করে না। যে রাজ্যে বিচারপতি, রাজার ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে পরিচালিত হন, সে রাজ্যের কল্যাণ কোথায়? সামাজিক কল্যাণ ইচ্ছা থাকিলে সেইরূপ আমাদের মাঝে এমন এক সম্প্রদায়কে সর্ব্বদা সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, যাঁহাদিগকে লোভে, ভয়ে বা কোন কারণেই কাহারও নিকট নতশির হইতে হইবে না—আমাদের ব্রাহ্মণ বর্ণই সেই সম্প্রদায়।

এ বিষয়ে লেখকের ধারণা এই শেষোক্ত দলের অনুযায়ী। ইহা কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে এই ধারণানুযায়ী কার্য্য বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্র হইয়া উঠা অসম্ভব, এবং পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটি হইতে বুঝা যায় এ-সম্বন্ধে কাহারও কাহারও ধারণা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা হউক এ-সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আমরা শুধু সামাজিক ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠায় পাঠকগণের কিছু মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।

যাঁহার জন্য এত কাণ্ড তিনি নিজে এ সম্বন্ধে উদাসীনবৎ অবস্থিত ছিলেন, কে প্রণাম করিল বা না করিল সেদিকে লইতে ব্যগ্র ছিলেন না বা ইহার অনুকূলে বা প্রতিকূলেও কোন কথা বলেন নাই। যাহা হউক সাধুটির অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে কিন্তু আমরা একটা সাক্ষ্য দিতে পারি।

আমাদেরই একজন নিকট আত্মীয়ের প্রায় দুই বৎসর বয়স্ক কোন শিশু কন্যা অনেক দিন হইতে প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল। চিকিৎসায় কোন ফল না পাওয়ায় তাহার জীবনাশা সম্বন্ধে সকলেই প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সাধুকে কন্যাটির কথা বলিলে তিনি তাহাকে একবার দেখিতে চাহেন এবং তদনু-

সাধে কন্যাটিকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। সাধু তাহাকে মাটির উপর শুয়াইয়া দিতে বলিয়া, নিজে বিছানার উপর বসিয়া তাহাকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে তামাকুর ধূমপান করিতে লাগিলেন। মেয়েটি বড় কাঁদিতেছে দেখিয়া তাহার পিতা তাহাকে কোলে তুলিতে গেলে সাধু ধমকাইয়া উঠিয়া উহাকে ছুঁইতে নিষেধ করিলেন। কিছু পরে উহাকে বাটি লইয়া গিয়া সেই জ্বর ভোগের অবস্থাতেই স্নান করাইয়া দিতে এবং সে যাহা খাইতে চাহে তাহাই খাইতে দিতে বলিলেন। বাটিতে আসিয়া এই অনুচিত ব্যবস্থা পালনীয় কি না তাই স্থির করিতে অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেষে চাঁড়াল সাধুর আদেশই পালিত হইল। সে রাত্রিতেই একটা কিছু অঘটন ঘটিবে আশঙ্কা করা যাইতে ছিল, কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের ও আনন্দের বিষয় এই অহিতের পরিবর্ত্তে হিতই ঘটিল, সেই রাত্রিতেই মেয়েটি জ্বরমুক্ত হইল এবং অন্য কোনরূপ ঔষধ সেবন বিনা, অমন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির কবল হইতে ক্রমশঃ মুক্তি লাভ করিল।

আর একজন চাঁড়াল সাধুর বিবরণও উল্লেখ-যোগ্য। ইনি আগে কালীঘাটের দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্থিত কেওড়া তলার শ্মশানে বাস করিতেন, তারপর রামকৃষ্ণপুরের শ্মশানে উঠিয়া যান। ধরণ ধারণ অনেকটা পৈশাচিক, মদ্যপান করিতেন, সন্ন্যাসীদের ন্যায় জটাজুট ধারণ প্রভৃতি কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু পিশাচ সাধনাদি নানারূপ তান্ত্রিক ক্রিয়ায় অভিজ্ঞ এবং একজন শক্তিশালী পুরুষরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহারও নিকট একজন একটি দুশ্চিকিৎস্য পীড়া হইতে মুক্তিলাভ আশায় আগমন করেন।

চাঁড়াল সন্ন্যাসী ইহাকে দেখিয়া বলেন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে, নিজেদের ভিতরের আগুন না জ্বালাইয়া অন্যের শরণাগত হও কেন? যাহা হউক পীড়া শান্তি জন্য চেষ্টা করিতে সন্ন্যাসী অবশেষে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে ইহার জন্য ক্রিয়াদি করিবেন জানাইলেন। নির্দ্দিষ্ট কালান্তে ক্রিয়ার ফল জানিবার জন্য সন্ন্যাসীটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া পীড়িত ব্যক্তিটি যাহা শুনিলেন ও দেখিলেন তাহা একটু বিচিত্র বটে। ঐ শ্মশানেরই এককোণে পুরাতন এক বৃক্ষতলে ছোট একটি বেদি ছিল। নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে সেইখানে বসিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসী শ্মশানের অন্যান্য ডোমদের বলিয়া গিয়াছিলেন তাহারা যেন মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার সংবাদ লয়। ডোমেরা ভোর বেলায় গিয়া দেখে সন্ন্যাসী বেদিতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছেন। তাহারা তখন ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিয়া তাঁহাকে একটি আটচালার ভিতর শুয়াইয়া রাখে এবং লোকটি যখন দেখিতে যান সন্ন্যাসী তখনও একটি কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। সন্ন্যাসী জানাইলেন তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই; সাধনায় বসিবার পর বিভীষিকাপ্রদ কোন মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইবার জন্য আদেশ করিল; (চাঁড়ালের পোষ্য একজন অসাধারণ দৃঢ়চেতা নির্ভীক পুরুষ) শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে যখন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তখন অত সহজে তিনি নিরস্ত হইতে পারেন না; ইহার ফলে বেদি হইতে তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়াছে ও তাঁহার হাতে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। কিছুদিন পরে পুনরায় দেখা করিতে গিয়া লোকটি শুনিলেন, ঐ ঘটনার অল্পকাল পরেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া কাঁধে একটি গামছা মাত্র লইয়া

সন্ন্যাসী কোথায় যে চলিয়া গিয়াছেন আর আসেন নাই।

নাস্তিকের চেয়ে আস্তিকের সাহসের মূল্য বেশী যে, ভূত দেখে নাই বা ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহে, ভূতকে ভয় না করা তাহার পক্ষে একটা মস্ত সাহসের পরিচায়ক নহে কিন্তু ভূতকে যে ভয় ভক্তি করে সে যদি ভূতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস পায় সেটা তার নিশ্চিতই অসামান্য হৃদয় বলের পরিচায়ক। বস্তুতঃ এই চাঁড়াল সাধুটির ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাসূচক ব্যবহার, শরণাগত রক্ষা প্রবৃত্তি এবং অসাধারণ দৃঢ়চিত্ততা ও নির্ভীকতা, আজিকার দিনে অনেক শিক্ষিত ভদ্র সন্তানেরও ভাবিবার ও শিখিবার বিষয়।

"শ্রীমন্মদেশ্বর বাবাজি"

বাবাজির প্রকৃত নামটি অজ্ঞাত, প্রদত্ত নামটি আমারই কল্পিত। এত নাম থাকিতে তাঁহাকে ঐ নামে অভিহিত করিলাম কেন, নিম্নোক্ত বিবরণটি পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

তখন আমার বয়স বেশী হয় নাই, হৃদয় অনেকটা আবেগভরা, কাজেই একদিনের একটা তুচ্ছ পরিচয়েই বাবাজির মূর্ত্তিটি হৃদয়ে গাঁথিয়া গিয়াছে।

বাবাজি একযোড়া খড়ম পায়ে দিয়া খটাস্ খটাস্ করিয়া পথে ঘাটে বেড়াইতেন; নাতিদীর্ঘ কৃশ কর্কশ দেহ; মাথায় এক প্রকাণ্ড জটাভার, তাহা জড়াইয়া চূড়ার আকারে বাঁধিয়া রাখিতেন, যেন একটা পিরামিড বহিয়া বেড়াইতেছেন। গঙ্গায় স্নান করিতে গেলে প্রায়ই দেখা হইত, সম্ভবতঃ নিকটের কোন স্নানের ঘাটেই তিনি অবস্থান করিতেন। নিত্য যাহা দেখা যায়, তাহাতে অসাধারণত্ব বোধ সহজে জন্মে না, ইহার উপর কিশোর বয়সের উদ্দাম ভাব, বাবাজিকে দেখিলে আমার তেমন শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হ'ত না। বাবাজি খড়ম পায়ে কেমন সচ্ছন্দে চলা ফেরা করেন, আঙ্গুলের ডগে ব্যথা হয় না, বা পিছল ঘাটে নামিতে উঠিতে আছাড় খেয়ে পড়েন না, আপনাকে কেমন সামলাইয়া চলেন, বাবাজি সম্বন্ধে এইটাই আমার লক্ষ্যণীয় মনে হইত। এইভাবে চলা ফেরাটা যে বেশ একটি আধ্যাত্মিক অর্থেও গ্রহণ করা যায় সে কথা মনেই উঠিত না। আমার একজন বাল্যবন্ধুর দৃষ্টিতে বাবাজির জটাভারটাই তারিফের বিষয় ছিল। বয়স বা শিক্ষার দোষে আমরা দুজনেই কেমন ঠিক করিয়াছিলাম, লোকটা একটা বুজরুক, না হ'লে অমন খড়ম পায়ে যেন ঘন্তরে খটাস্ খটাস্ করে সশব্দে চলন, আর খোঁপা বাঁধার মত অত যত্ন করে জটাবাঁধা।

তারপর একদিন একটা ঘটনা ঘটিয়া বাবাজি সম্বন্ধে আমার ধারণা অনেকটা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল।

একদিন গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে করিতে অনেকদিন পরে বাবাজির সহিত সাক্ষাৎ। আমার পাশে একজন স্নান করিতেছিলেন, তিনিও অনেকদিন পরে বাবাজির দেখা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বাবা অনেক দিন যে দেখা হয় নাই, এতদিন কোথায় ছিলেন?"

সন্ন্যাসী। "আর বাবা, সে কি এখানে, সেই সিংহলে গিয়াছিলাম। সেতুবন্ধ ছাড়িয়ে, সমুদ্রের উপর সাত দিন নৌকায় কাটাতে হয়েছে, ঢেউয়ের উঠা নামায় প্রাণ যায় আর কি। সিংহলে কিছুদিন থাকা গিয়াছিল। সেখানে দেখি সকলে ছেলেকেই চিনে বাপ মায়ের খবর রাখে না, (কার্ত্তিক বা গণেশের

পূজায় ত হরগৌরীর খোঁজ নাই)। আমি ভাবিলাম এটাত ভাল নয়, বাপ মায়ের পূজা প্রবর্ত্তনে কেমন সাধ গেল, অনেকটা কৃতকার্য্যও হয়েছি, একটা ছোটখাট মন্দিরের মত করে এসেছি আসিবার সময় একজন চেলার উপর ভার দিয়া আসিয়াছি। কলিকাতায় আসিয়া ৺নর্ম্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি গড়াইতে দিয়াছি। এবার যখন যাইব তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিব। দেখি বাবার কি ইচ্ছা।"

আমার অভক্তি উড়িয়া গেল ভাবিতে লাগিলাম, এই সেই আমাদের অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত সন্ন্যাসী, ইহার এমন অধ্যবসায় এত কর্ম্মশক্তি! কিসের জন্য এ ব্যক্তি এ সব কাজে ঘুরে মরে—শুধু কর্ম্মজনিত আনন্দে? জীবিকার্জ্জনও যদি একটা অবান্তর উদ্দেশ্য থাকে, তাতেই বা দোষ কি? ইহার কাজে, দেশের ও দশের ইষ্ট বই অনিষ্ট হতেছে কি? এ যেমন বিনাড়ম্বরে দেশের একটা কাজ করিয়া যাইতেছে, আমরা অনেকেই ঐরূপ ভাবে দেশের কোন কাজে লাগিয়া আছি কি? ওরূপ করিবার সামর্থ্য আছে কি? কোথা হ'তে এ ব্যক্তি সাহায্য পায়, কি করেই বা এর চেষ্টা সফল হয়? ইত্যাদি।

এই সব বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন একজন রাজকর্ম্মচারী সেন্‌সাস্ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ কালে বেন একটু দুঃখ করিয়াই লিখিয়াছেন, "অনেকেরই বিশ্বাস, হিন্দুগণ বুঝি অন্যকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে মোটেই প্রয়াসী নহেন, বাহিরের লোকের পক্ষে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ বুঝি অসম্ভব, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাসাধন ও হিন্দুর দলপুষ্টি জন্য গুপ্তভাবে অবিশ্রাম একটা চেষ্টা চলিতেছে। বহু বহু সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব গোঁসাই, এবং স্ব সমাজে অনাদৃত বর্ণব্রাহ্মণ জীবিকানির্ব্বাহে সুবিধার জন্য শিষ্য যজমান প্রভৃতি সংগ্রহে নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে! ইঁহাদের সংসর্গে আসিয়াও এইরূপ চেষ্টার ফলে, হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস বিশেষভাবে ঘটিতে পাইতেছে না। পূর্ব্বে অনেক পার্ব্বত্য বন্যজাতি আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিত না, কিন্তু এখন দেয়।"

যাঁহাদের জন্য এরূপ হইতেছে তাঁহাদের প্রতি আমাদের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য সে বিষয়ে আলোচনা করিতে বসিলে প্রবন্ধ কলেবর বাড়িয়া যায়। যাহা হউক উপরে যে সন্ন্যাসীর বিবরণ প্রদত্ত হইল উহা হইতে বুঝা যাইবে সেন্‌সাস্ সম্বন্ধে প্রাগুক্ত মন্তব্যটি ভিত্তিহীন নহে এবং উহাতে আমাদের ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষায় পঙ্গুত্ব

সেপ্টেম্বর মাসের এক দিবস অপরাহ্ণকালে মানসিক অবস্থাটা হঠাৎ যেন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। ক্রমে এমন হইল যে রিপণ কলেজের সিঁড়ি লাকড়ার ও আমার কোনই পার্থক্য নাই। কাজেই ঘরের মধ্যে আরাম কেদারার আশ্রয় পরিত্যাগ করে এমন সাধ্য কার?

সেদিন বেশ একটু শীতও আরম্ভ হইয়াছিল। আবার অস্তাচলগামী সূর্য্যের শেষ কিরণ রেখা কয়টী গবাক্ষ পথ দিয়া গণ্ডদেশে মৃদুমন্দ উত্তাপ প্রদান করিয়া সান্ধ্য ভোজনের পূর্ব্ববর্ত্তী জড়তাকে মহামহিমান্বিত করিয়াই তুলিল। অনেক সময় দেখিয়াছি যে এইরূপ শারীরিক আলস্যের উপর গা ঢালিয়া দিলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা বিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া মানসিক চাঞ্চল্য আনয়ন করে। সে দিনও অনেকানেক অবান্তর বিষয়ের মীমাংসা আভ্যন্তরিণ নিস্পন্দতা অপনোদনের হেতু। মনে যতই চিন্তার ঢেউ উপস্থিত হইতে লাগিল ততই বিরক্তিবোধ করিতে লাগিলাম। থাকিতে থাকিতে নিরুপায় হইয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রক্ষিত পুস্তকনিচয় হইতে "A Woman's Inspirations of the Philippines" নামক বইখানি লইয়াই উহার মধ্যস্থলের এক অংশ পড়িতে আরম্ভ করি।

বস্তুতঃই এককালে পীত জাতিসমূহ ভারত মাতাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিল। এক সময় ভারত এমনই গৌরবমণ্ডিত ছিল, যাহার প্রভাবে "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে তাঁর"।

কোনও এক ফিলিপিনো ছাত্র তাহার মার্কিণদেশীয়া শিক্ষয়িত্রীকে বলিয়াছিল, "আপনি যতই না কেন পদার্থবিদ্যা আর তাড়িৎবিদ্যা বলিয়া চীৎকার করুন আমার কাণের তুলা কিন্তু খসিবে না। এ সবই আপনার বুজরুকি। ইহাতে আমি কি প্রকারে বিশ্বাস স্থাপন করি? আমি যে আমার চোখের সাম্নে প্রকাণ্ড লোহার মাথাওয়ালা তড়িৎ দেখিতে পাইতেছি। ইহার নাম বজ্র। আমার চৌদ্দ পুরুষে ইহার কথা জানে। আজ কি না আমায় পদার্থ-বিদ্যার বুকনি দেওয়া?" বন্ধো! শিক্ষয়িত্রী তোমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের নিকট অর্জ্জিত বজ্রজ্ঞানে জলাঞ্জলি প্রদান জন্য বক্তৃতা করিতেছেন, কি ক্ষোভের বিষয়! ও কথায় কখনও কর্ণপাত করিবে না। তোমরা বোকা বলিয়াই ইংরাজী কেতাবের কথায় বিশ্বাস কর। আমাদের পণ্ডিতজগতে কিন্তু ওসবের ডা'ল গলে না। আমরা নিয়মিতরূপে নস্য গ্রহণ পূর্ব্বক সনাতন জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হই। জ্ঞানের বিষয় কি? প্রাতঃসময়ে শৌচের নিমিত্ত কতবার মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হইবে; বেদপাঠ যদি শূদ্রের কর্ণে প্রবেশ করে তাহা হইলে পাপাত্মার কর্ণকুহরে কত সের উত্তপ্ত লাক্ষা ঢালিয়া দিতে হইবে; ইহাই আমাদের ধর্ম্ম-শিক্ষা। ইক্ষু-সমুদ্র ক্ষীর-সমুদ্রের দক্ষিণে না পশ্চিমে ইহাই আমাদের মহাগৌরবের ভূগোলজ্ঞান। অনন্ত নাগের শিরঃসঞ্চালনে মেদিনীর কম্পন উপস্থিত হয়; এই কথাটী প্রাকৃতিক ভূগোলে আমাদের মহাজ্ঞান থাকার জন্যই পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে।

এই সব অতি হীন জাতীয় বিচারে আমাদের মস্তিষ্ক নিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা এইটুকু খবর রাখি না যে এই সকল সারবিহীন বাক্যজাল ব্যতীত ভারতবর্ষে এমন সব পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল যাহা চর্চ্চা করিয়া সভ্যজগৎ অধিকতর সভ্য হইতেছে। যাহাদিগকে আমরা গো-খাদক, ম্লেচ্ছ ও নিরয়গামী বলিয়া উল্লেখ করি তাঁহারাই অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতীয় জ্ঞান রত্নাকরে বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া আমাদিগকে উপহাস করিতেছে। বেদাধ্যায়ী শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদ ত অনিবার্য্য! কিন্তু সম্ভব তাহার

উৎপত্তি, গতি, পরিণতি, অপরাপর আর্য্য-ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ নির্ণয়—ইত্যাকার বিষয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মুদ্রণযন্ত্রগণ যাহা করিয়াছেন তাহার সহিত Max Muller, Weber, Paul Duschen, Oldenberg, Windisch, Du Meril, Grassmann, Capeller, William Jones ও Hopkins প্রমুখ বিজাতীয় মুর্ধন্যগণীর দানের তুলনা করিয়া দেখ।

শিক্ষা বিষয়ে আমাদের পঙ্গুতার কারণ প্রধানতঃ দুইটী। প্রথমতঃ হিন্দুজাতির স্বাভাবিক স্থিতিশীলতা। এজন্য আমি ব্রাহ্মণেতর জাতিবিশেষকে অণুমাত্রও দোষী করি না। কারণ তাহারা ত ব্রাহ্মণ্য জাতির দাসস্য দাসঃ। সত্যই তাহাদিগের দাসত্ব রোমকদাস ও নিগ্রোদিগের অবস্থাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানোদ্দীপ্ত পাশ্চাত্য খণ্ডের সাহচর্য্যলাভ করিয়াও সামাজিক শক্তির এই স্থিতিশীল প্রকৃতি বশতঃই তাহার অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথাপরং। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ কেবলমাত্র বোপদেব কণ্ঠস্থ করিতে সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত না করিয়া যদি আধুনিক উপায়ে সংস্কৃত সাহিত্য, জ্যোতিষ ইত্যাদির চর্চ্চা করিতেন তাহাহইলে আজ আমাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে এরূপ শক্তি কাহার? সেই জন্যই প্রায় সপ্তদশ বর্ষ পূর্ব্বে জনৈক হিন্দুঋষি বলিয়াছিলেন "আমি স্বয়ং তোমাদিগের প্রত্যেককে নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্থ নির্ব্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কারণ নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছু হইবার আশা আছে, সে মৃত নহে। কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাথা একেবারে যায়, মস্তিষ্ক নির্বীর্য্য হইয়া যায়; মৃত্যু-কীট সেই জীবন্ত শরীরে প্রবেশ করে। এই দুইটীই পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা চাই রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্কের নির্বীর্য্যতা সম্পাদক, দৌর্ব্বল্যজনক ভাবের দরকার নাই; সেগুলি পরিত্যাগ কর।"

পঙ্গুত্বের দ্বিতীয় কারণ এই। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পর হিন্দুসমাজের অতি নগণ্য অংশ চির পুরাতন প্রভাব কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া মস্তকোত্তোলন করিতে প্রয়াসী হইলে অমনি রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য কুটিল যুক্তি প্রয়োগে আমাদিগের শিশুমস্তিষ্ককে সম্মোহিত করা হইল। এতদিনে আমরা বুঝিতে পারিতেছি "আশার ছলনে হায়, কি ফল লভিনু এবে তাই ভাবি মনে।"

মেকলে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহার বিষবটিকার প্রতি ছাত্রদিগের প্রলোভন উদ্রিক্ত করিতে পারিলেই উহার উন্মাদিকা শক্তি সমগ্র জাতির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবে; যেহেতু শিক্ষিত ছাত্রগণই ভবিষ্য সমাজের কর্ণধার। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন ভারতবর্ষে দুই পরস্পর বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়। কার্য্যতঃ মেকলের পৃষ্ঠপোষকগণই বিজয়লাভে সমর্থ হন। তাঁহাদের ব্যবস্থা হইল যে হিন্দু শব্দটী কেবল মাত্র চর্ম্মের রুক্ষত্ব ব্যঞ্জক বলিয়া রক্ষিত হউক। তদ্ব্যতীত হিন্দুমেষকে বৃটিশ সিংহের গর্জ্জনকারী করিতে হইবে।

সভ্যতা বিকাশের মূলে তিনটী তথ্য বর্ত্তমান। (১) যে জাতির স্বতন্ত্র ভাষা নাই সে জাতির অবচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য ব্যঞ্জক সভ্যতাও থাকিতে পারে না। (২) সজীব পদার্থ মাত্রই

যেরূপ তাহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে সংগৃহীত পদার্থনিচয় ভক্ষণান্তে তাহাদিগকে স্বীয় দেহগঠনোপযোগী পদার্থে পরিণত করে, তদ্রূপ সভ্যতা বিশেষেরও বিজাতীয় স্বাতন্ত্র্য হইতে গ্রহণীয় ভাবরাশি গ্রাস করিয়া তাহাকে আত্মবস্তুতে পরিণত করা প্রয়োজনীয়। এইরূপেই যে কোন সভ্যতা উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করিতে থাকে। (৩) জাতীয় সভ্যতা যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, বৈদেশিক ভাবধারা যদি খর প্রবাহে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিগণ যদি সেই স্রোতকে আত্মগত করিতে অক্ষম হন তাহা হইলে সমগ্র সমাজ ঐ স্রোতবিণীতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে যে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে পুরাতনের পরিচয় পাওয়া যায় কেবলমাত্র ব্যক্তিবর্গের রক্তে ও মাংসে।

ভারতীয় জাতীয়ত্বের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিবার নিমিত্ত মেকলে এই তৃতীয় নিয়মটীর আশ্রয়গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু সভ্যতার দন্তোৎপাটন করিয়া তাহার খাদ্যচর্ব্বণ শক্তি হরণ করিলেন। ভাষাই সভ্যতার দন্ত স্বরূপ। যে জাতির ভাষা যত নিকৃষ্ট তাহাদের চিন্তাপ্রণালীও তদ্রূপ অনুন্নত বলিয়া প্রতীত হয়। মূলে অবশ্য চিন্তা-প্রণালীই ভাষার উৎপাদক। ভারতবর্ষ ইংরাজ-শাসনাধিকারে আসিয়া ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ পাইলেও দন্তবিহীন বলিয়া উহা করিতে পারিল না। গত অশীতি বৎসর ধরিয়া বিদেশাগত খাদ্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমরা গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু হজম করিয়া তাহাকে স্বীয় দেহগঠনোপযোগী করিবার শক্তি আমাদের নাই। মাত্র আশি বৎসর গত হইয়াছে। এখনও আমরা প্রজাপতি হইয়া পড়ি নাই, রেশমকীটের অবস্থাতেই বর্ত্তমান।

দুঃখের বিষয় এই যে এখনও অধিকাংশ "ভদ্রমহাশয়দের" চক্ষুরুন্মীলন হয় নাই। সেই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি প্রকাশ করা অসম্ভব। মতটী পূর্ণ মাত্রায় অলীক। মহাশয়গণ আপনারা বিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বে ভাত খাইতে খাইতে যখন বন্ধুবান্ধবের সহিত পড়া শুনার আলোচনা করেন তখন ইস্কুলি আরম্ভ করিয়া দেন—না যে ভাষায় দিদিমার কোলে বসিয়া রূপকথা শুনিতেন তাহারই সাহায্যে জ্ঞানামৃত পান করেন? পদার্থবিদ্যার Phenomena beyond the critical angle, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের Transpiration stream, প্রাণি-বিজ্ঞানের Taxonomic system, প্রাণ-বিজ্ঞানের cowcealing coloration in the animal Kingdom; অর্থনীতির joint cost and demand, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যখন বিছানায় শুইয়া শুইয়া চিন্তা করেন তখন ইংরাজীর বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়েন না "পুণ্য পীযূষস্তন্য বাহিনী" বঙ্গমাতার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া সুখে নিদ্রা যান? আমার ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস ইহারা ভাবের ঘরে চুরি করেন; কেন না বাঙ্গালা বলিতে না পারা বিদ্বানের লক্ষণ, অন্ততঃ শিক্ষাভিমানিগণের কায়দা। নিশ্চয়ই বাঙ্গালা যার প্রাণের ভাষা, হাজার শক্ত বিষয় হউক না কেন, সে কখনই মাতৃভাষায় চিন্তা না করিয়াই থাকিতে পারে না। অবশ্য এটুকুও আমায় স্বীকার করিতে হইবে যে অধিকাংশ স্থলে ইংরাজী নামগুলি ব্যবহার করিতে হয়। আসলে সবগুলি ইংরাজী নাম নয়। ও সব খিচুড়ী। অনেক ইংরাজী নাম আর্য্যগণ

ভাষাতে ব্যবহৃত হয়, আবার অনেক ফরাসী নাম ইংরাজীতে চলিত। ইহারই নাম হরদম করা।

ভাষা কখনও বিপ্লবের সাহায্যে রাতারাতি সৃষ্ট হয় নাই। ইহা যুগ যুগান্তরের বিবর্ত্তনের ফল। যে কোনও ভাষার কোনও এক যুগ বিশেষের অবস্থা সমসাময়িক ব্যক্তি কর্ত্তৃক পর্য্যালোচিত হইলে উহা ন্যূনাধিক পরিমাণে খিচুরী বলিয়াই বোধ হয়। এই খিচুরীই বিশ বৎসর পরে যখন ঐতিহাসিক ভাবে আলোচিত হয় তখনই ব্যাকরণের সংস্কৃত মিয়মাবলী অঙ্গ-গ্রহণ করে। সুতরাং অধিক বিলম্ব না করিয়া বংশরক্ষার উপায় অবলম্বনই যুক্তিযুক্ত।

ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার পর আমাদের ছাত্রেরা বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের আস্বাদ পাইতে আরম্ভ করে। প্রথম বর্ষে তাহারা যে সমস্ত বিষয় আরম্ভ করে তাহা বস্তুতঃ সময়ের তুলনায় অতি সামান্য। যে দেশে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচার করা হয় তথায় ছাত্রেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ঐ ধরণের বস্তুর পরিচয় লাভ করে। মাতৃভাষায় শিক্ষা-প্রাপ্ত হইলে আমরাও ঐ সব বিজ্ঞান নামধেয় জন্তুকে বাল্যকালেই আত্মসাৎ করিতে পারি।

এখন আসল কথা হইতেছে যে আমরা দাঁটী কাজ চাই। ফেনায়িত ভাষায় সংবাদ-পত্রের কলেবর আবর্দ্ধিত না করিয়া নিটোল বস্তু তাহার ভাষায় ফলপ্রদ ব্যবস্থাপত্র লিপি-বদ্ধ করিতে হইবে। ইংরাজী ভাষায় Consciousness কথাটা অতি পবিত্র ও বীর্য্য-শালী। প্রাণীজগতের নিয়ম এই যে যে সকল জন্তু স্বীয় অস্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে যত জ্ঞানবান্ জীবনসংগ্রামে তাহারা ততই কৃতকার্য্য। মানব সমাজেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। পুরুষকারবিহীন ও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী জাতি লৌকিক বা পারত্রিক কোন জীবনই পরিণতি লাভ করিতে পারে না। তাই বলি "এ নয়ন কবে খুলিবে মা? অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিশূন্য এ নয়ন কবে তোমার কৃপাজ্যোতিঃ পাইয়া আবার দর্শনক্ষম হইবে?" ইত্যাদি ভিক্ষার বাণী সংকীর্ত্তণ না করিয়া স্বীয় অন্তঃশায়িনী শক্তিকে ভীমবেগে ও রুদ্রতেজে সজ্জিতা করতঃ নিজের পথ নিজেই উন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হও।

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র।

এক সপ্তাহে অর্দ্ধ জাপান

(১) নিক্কো পাহাড়

জাপানী সমাজে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই—"Do not say Kakko (magnificent Splendid, Superb) before you see Nikko." অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিক্কো দেখে নাই সে "কেক্কো" বা মনোমোহন সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে নাই। জাপানীদের চিন্তায় নিক্কো অপরূপ সৌন্দর্য্যের খনি। আজ সেই নিক্কো দেখিতে চলিয়াছি।

উয়েনো ষ্টেসনে গাড়ীতে বসিলাম। মহা গরম পড়িয়াছে। ধূলা বালুর দৌরাত্ম্যে গাড়ীতে স্থিরভাবে বসিয়া থাকা অসম্ভব। সহর ছাড়াইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী দুইধারে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছি। একস্থানে সুমিদা নদী এবং অপর স্থানে

ভোলে নদী পার হইলাম। দ্বিতীয় নদী জাপানে প্রশস্ততম নদীর অন্যতম। সাধারণ সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন বিশেষত্ব এই অঞ্চলে লক্ষ্য করিতেছি না।

সাড়ে তিন বা চারি ঘণ্টা পরে উৎসুনোমিয়া ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। এই নগর একটা "প্রেফেক্ট" বা জেলার কেন্দ্র। সমগ্র জাপানে এইরূপ ৪৩ টা প্রেফেক্ট আছে। গাইড বলিলেন,—"এই সহরের লোকসংখ্যা ৪০,০০০।" এখান হইতে গাড়ী একটা শাখা লাইনে চলিতে থাকিল। পথে একটা জেলা-স্কুল দেখিলাম। তাহার পর হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর ভূমির উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। কুমড়া, কচু, ধনে ইত্যাদির আবাদ রেলপথের দুই ধারে দেখিতেছি। ক্রমশঃ পার্ব্বত্য বনজঙ্গলের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। মাঝে মাঝে সরল বা pine তরুর ঝাড় দেখিতে পাইতেছি।

অদূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। উহাই নিক্কো পাহাড়। আকাশের কুয়াশায় পর্ব্বত-গাত্রের নীলিমা কথঞ্চিৎ ঢাকা পড়িয়াছে—কিন্তু গাড়ী হইতে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সবুজ তৃণপত্র উদ্ভিদের আবেষ্টন চোখে পড়ে। পাহাড় দেখিতে ঠিক যেন উল্টাভাবে রাখা করাত। পর্ব্বতের সমাবেশ একটা পাতলা তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট নীল মৃত্তিকাস্তূপের মত বোধ হইতেছে। ত্রিভুজাকার পিরামিড সদৃশ গিরিশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে না। সমতল ভূমি হইতে পাহাড় খাড়া মাথা তুলিয়াছে।

এই অঞ্চলের রেলষ্টেসনে দেখিতেছি কাঠের ব্যবসায় বেশ প্রবল। পার্ব্বত্য প্রদেশে এইরূপ হইবারই কথা। পাইন গাছের সঙ্গে সঙ্গে আর একপ্রকার তরুবরের সারি ক্রমশঃ দেখা গেল। দেখিবামাত্র গাইড বলিলেন,—"এই সকল বৃক্ষের নাম ক্রপ্টোমেরিয়া। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এইগুলি নিক্কো অঞ্চলে রোপিত হইয়াছিল। দুই সারি বৃক্ষের ভিতর দিয়া পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। উৎসুনোমিয়া হইতে নিক্কো পর্য্যন্ত এই কুঞ্জপথ (avenue) দেখিতে পাইবেন।" আজ এই বৃক্ষগুলিকে আকাশ-স্পর্শী বোধ হইতেছে। দুইদিকের শাখা প্রশাখা উর্দ্ধে মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ণ পথের একটা আবরণ প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি কোথাও কোথাও উঁকি মারে মাত্র।

গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল। টোকিও হইতে একশত মাইল উত্তরে আসিয়াছি। এইস্থান সমুদ্রের স্তর হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ। অর্থাৎ হিমলয়ের টিঙেরিয়ায় বা ছোটনাগপুরের হাজারিবাগে যেন উপস্থিত হইয়াছি।

ট্রামে চড়িয়া হোটেলে পৌঁছিলাম। কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। সঙ্কীর্ণ পথের দুই ধারে জাপানী হোটেল, সরাই, বা গৃহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহারি দোকান ইত্যাদি অবস্থিত। দারা নামক একটা পার্ব্বত্য ঝোরা বা নদী পার হইলাম। দুইটা সেতু আছে। একটা সেতু রক্তবর্ণ ল্যাকারধাতুনির্ম্মিত। ইহার উপর দিয়া সাধারণ গাড়ী বা লোকজন যাতায়াত করিতে পারে না। বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে যখন মিকাডোর প্রতিনিধি নিক্কো মন্দিরে আসেন তখন এই সেতু একমাত্র তাঁহার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। আজ সেতুর দ্বার রুদ্ধ সেতু পার হইয়া নদীর পার্শ্ব দিয়া ট্রাম চলিতে লাগিল। নির্ঝরের সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে হোটালে উপস্থিত

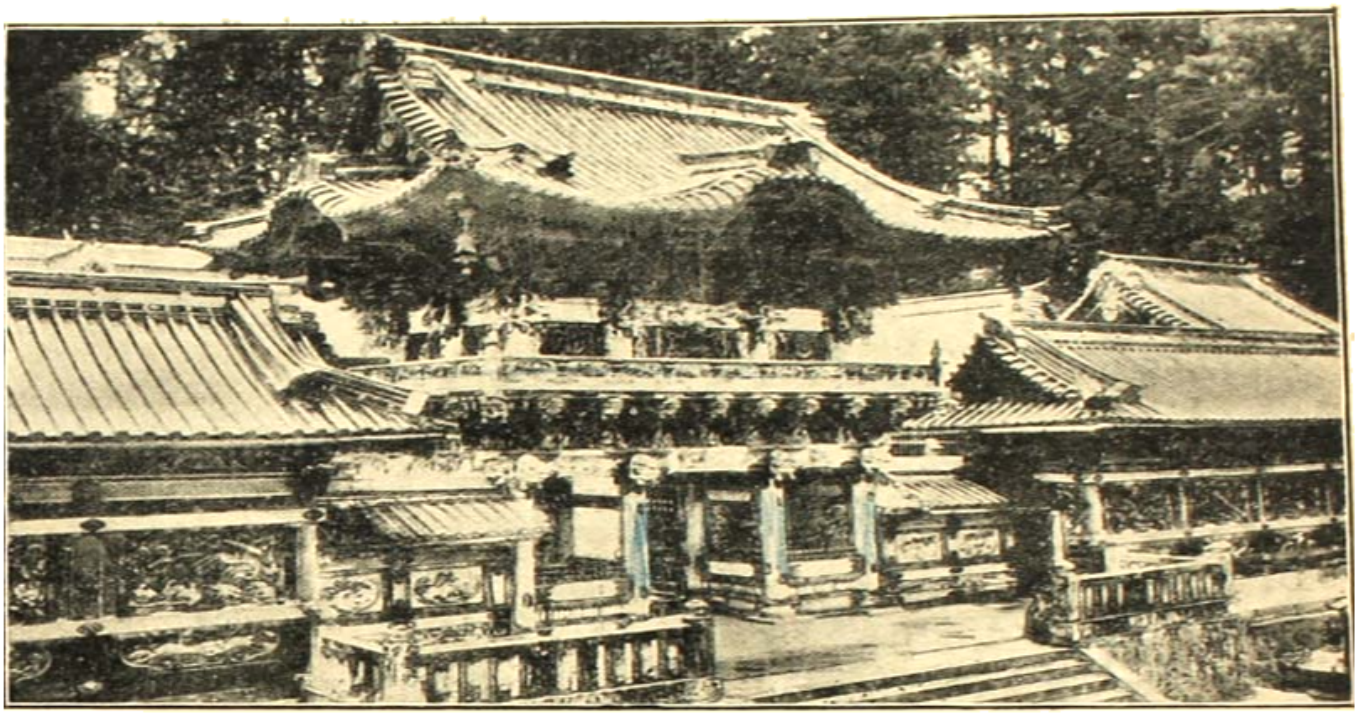

নিক্কোমন্দিরের ফটক

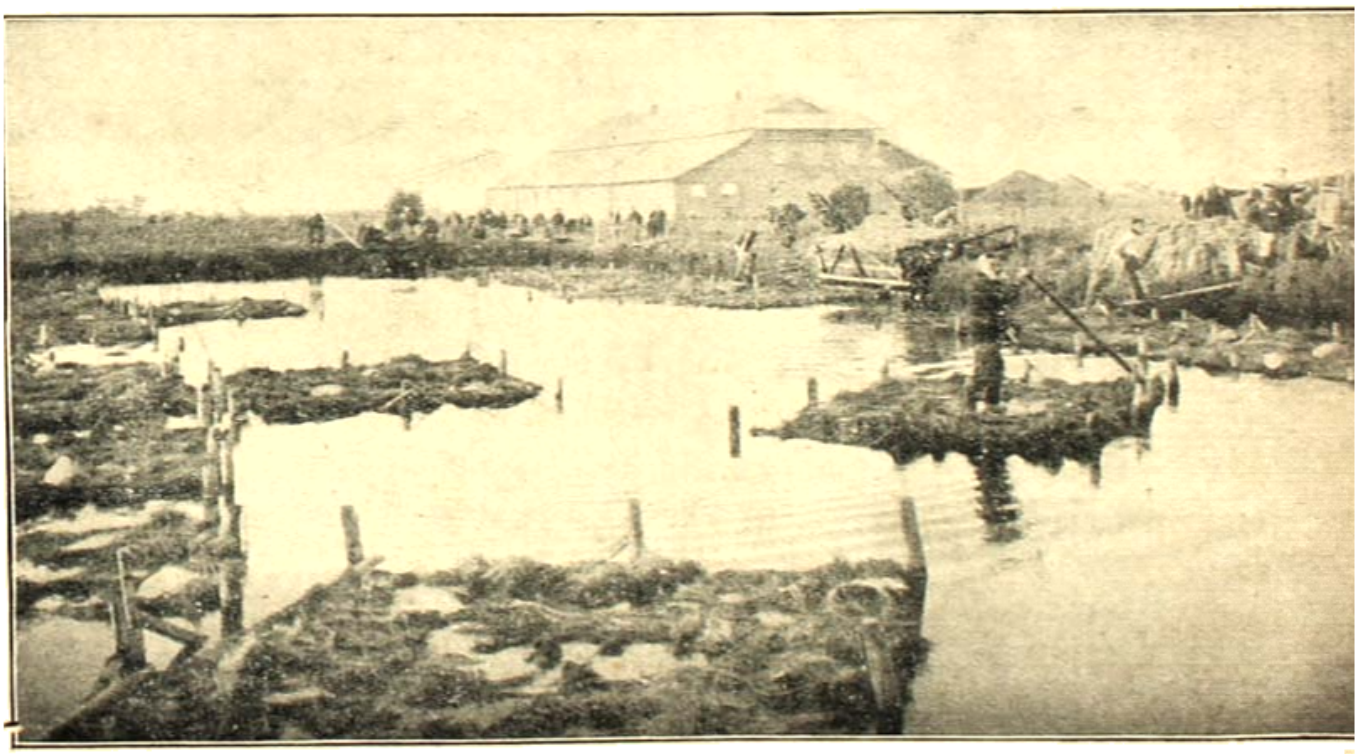

তিশি পচান

India Press, Calcutta.

হইলাম। দারা উপত্যকা দুই সমান্তরাল পর্ব্বতশ্রেণীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। হোটেলের গৃহে বসিয়া সম্মুখের পাহাড় দেখিতেছি। পর্ব্বতের একটা দেয়াল যেন দৃষ্টিপথে বাধা দিতেছে। নদীর অনন্ত ঝর ঝর অবিরাম শুনিতে পাইতেছি।

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অদূরের পাহাড় আর দেখিতে পাইতেছি না। ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন ঘন ঘন শুনিতে পাওয়া গেল। বাঙ্গালা দেশেও আজ শ্রাবণের বর্ষাকাল চলিতেছে। এক পশলা খুব বৃষ্টি হইয়া গেল। ধরিত্রী অনেকটা ঠাণ্ডা হইল।

আজ ১৪ই জুলাই। এই তারিখে ফরাসীরা তাহাদের অষ্টাদশ লুইয়ের (ব্যাষ্টিল) Bastile দুর্গ ধ্বংস করিয়া ইয়োরোপে নবযুগ আনয়ন করে। এই দিনে ফরাসী "রিপাব্লিক" বা স্বরাজের জন্ম। কাজেই ফরাসী সমাজের আজ প্রধান উৎসব-তিথি। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"To-morrow July 14th is the French national holiday in honour of the fall of the Bastille, and though there will not be the usual celebration, all who honour France for the magnificent struggle she is waging against the Bully of Europe will show that sympathy by the display of national flags. Especially will the occasion be taken by the British and the subjects of other allied powers to show their respect for and sympathy with the great Republic in her fight for the freedom of the world."

ফরাসী-বিপ্লবের সর্ব্বপ্রধান শত্রু ছিলেন ইংরাজ। অথচ আজ ইংরাজ সেই বিপ্লব-তিথি সম্মান করিতে অগ্রসর। চিরস্মরণীয় ১৪ই জুলাইয়ের ঘটনায় ফরাসীকে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরাজ ও জার্ম্মাণ জাতিদ্বয় ব্রতবদ্ধ হইয়াছিল। অথচ আজ সেই তারিখের উৎসবে ফরাসীকে সাহায্য করিতেছেন ইংরাজ।

জাপানের তাজমহল

নিক্কোতে পাহাড় আছে, নদী আছে, উপত্যকা আছে, ছোট বড় মাঝারি উদ্ভিদ্ আছে, কুয়াশা মাখা নভোমণ্ডল আছে, নিবিড় বন জঙ্গল আছে, নীরবতা ও শান্তি আছে, আর এই শান্তিভঙ্গকারী জলস্রোতের কল কল নিনাদ আছে। প্রাকৃতিক হিসাবে নিক্কো নিতান্তই রমণীয় সন্দেহ নাই—চিত্রে আঁকিবার অথবা কবিতা লিখিবার যোগ্যবস্তু। প্রকৃতিদেবী নিক্কোকে সত্য সত্যই "কেক্কো" করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বর্ষার দিনে আসিয়াছি—এখন না আছে শীতের শুভ্রতুষার, না আছে মে মাসের চেরিব্লসম, না আছে শরৎ কালের স্বর্ণপ্রভা। নীল গিরি এবং সবুজ উদ্ভিদই এখন চোখের সহচর।

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে Cryptomeria avenue এর ভিতর দিয়া ইয়েয়াসু (Yeyasu) শোগুণের সমাধিক্ষেত্র দেখিতে বাহির হইলাম। ইয়েয়াসু তোকুগাওয়া বংশের শোগুণী স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে নিক্কো পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে তাঁহার কবরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল সৌধ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত।

টোকিওর শিবা-পার্কে শোগুণী সমাধিক্ষেত্র দেখিয়াছি। এই স্থানেও অবিকল তাহাই দেখিতেছি। সেই তোরী বা তোরণদ্বার, সেই প্যাগোডা, সেই প্রস্তরপ্রদীপ, সেই কাষ্ঠ গৃহ, সেই ত্রিভঙ্গিম বক্রগতি ছাদ সমাবেশ, সেই স্বর্ণশিল্প ও ল্যাকার-শিল্প, সেই সুচিত্রিত অন্ধকারময় গৃহাভ্যন্তর—সবই প্রথম তোকুগাওয়া শোগুনের সমাধিক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে। শিবাপার্কের সৌধসম্পদ দেখা থাকিলে নিক্কোর ইমারাবলী না দেখিলেও চলে।

তোরী, কটক, আন্তাবল, প্যাগোডা, ভাণ্ডার-গৃহ, চৌবাচ্চা, ঘণ্টাগৃহ, বাদ্যগৃহ ইত্যাদি প্রত্যেকটার জাপানী নামে এক একটা ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। কোনটা ডাইমোদিগের দান, কোনটা কোরিয়া নৃপতির দান, কোনটা ওলন্দাজ গবর্মেণ্টের দান ইত্যাদি। ভাণ্ডার-গৃহে উৎসবের জিনিষপত্র রক্ষিত হয়—বৎসরে দুইবার করিয়া এই গৃহ হইতে শোভাযাত্রার সাজসরঞ্জাম বাহির করা হইয়া থাকে। আস্তাবলে শোভাযাত্রার ব্যবহৃত ঘোড়া রাখা হয়। সমাধিক্ষেত্রের সকল গৃহই ল্যাকারমণ্ডিত এবং সুচিত্রিত—কিন্তু আস্তাবলে কাষ্ঠের উপর কোন কারুকার্য্য নাই। এই ঘরের প্রাচীরের দিকে দেখাইয়া গাইড বলিলেন—"বানরের সারি দেখিতেছেন—উহাদের একজনের মুখ ঢাকা, একজনের চোখ ঢাকা, একজনের কাণ ঢাকা। ইহার দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে কুদৃষ্টি দেখা উচিত নয়, কুকথা বলা উচিত নয়, এবং কুকথা শুনা উচিত নয়।"

কোন্ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কত খরচ পড়িয়াছিল তাহার তালিকা কোন কোন স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। একনিলায় তিন শত ডাইমো-রাজগণের গৃহে যুদ্ধের জন্য যতটাকা সঞ্চিত ছিল তাহার সমস্তই এই ভবন নির্ম্মাণে খরচ করা হইয়াছিল। কুপ্টোমেরিয়া বৃক্ষের কুঞ্জপথ সম্বন্ধে গাইড বলিলেন—"মাসাৎসুনা ডাইমো বিশ বৎসর কাল চেষ্টা করিয়া এই অ্যাভিনিউ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পথ প্রায় ২২ মাইল বিস্তৃত।"

ইয়েয়সু বহু উপদেশ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একটি উপদেশের ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে—

Life is like unto a long journey with a heavy load. Let thy steps be slow and steady, that thou stumble not. Persuade thyself that imperfection and inconvenience is the natural lot of mortals, and there will be no room for discontent, neither for despair. When ambitious desires arise in thy heart, recall the days of Extremity thou hast passed through. Forbearance is the root of quietness and assurance for ever, look upon wrath as thy enemy. If thou knowest only what it is to conquer, and knowest not what it is to be defeated, woe unto thee! it will fare ill with thee. Find fault with thyself rather than with others. Better the less than the more."

ইহা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া জঙ্গলে পলাইবার উপদেশ নয়। ইয়েয়সু কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার বাহুবল ও চরিত্রবল জাপানের সংখ্যাতীত ডাইমোগণকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার

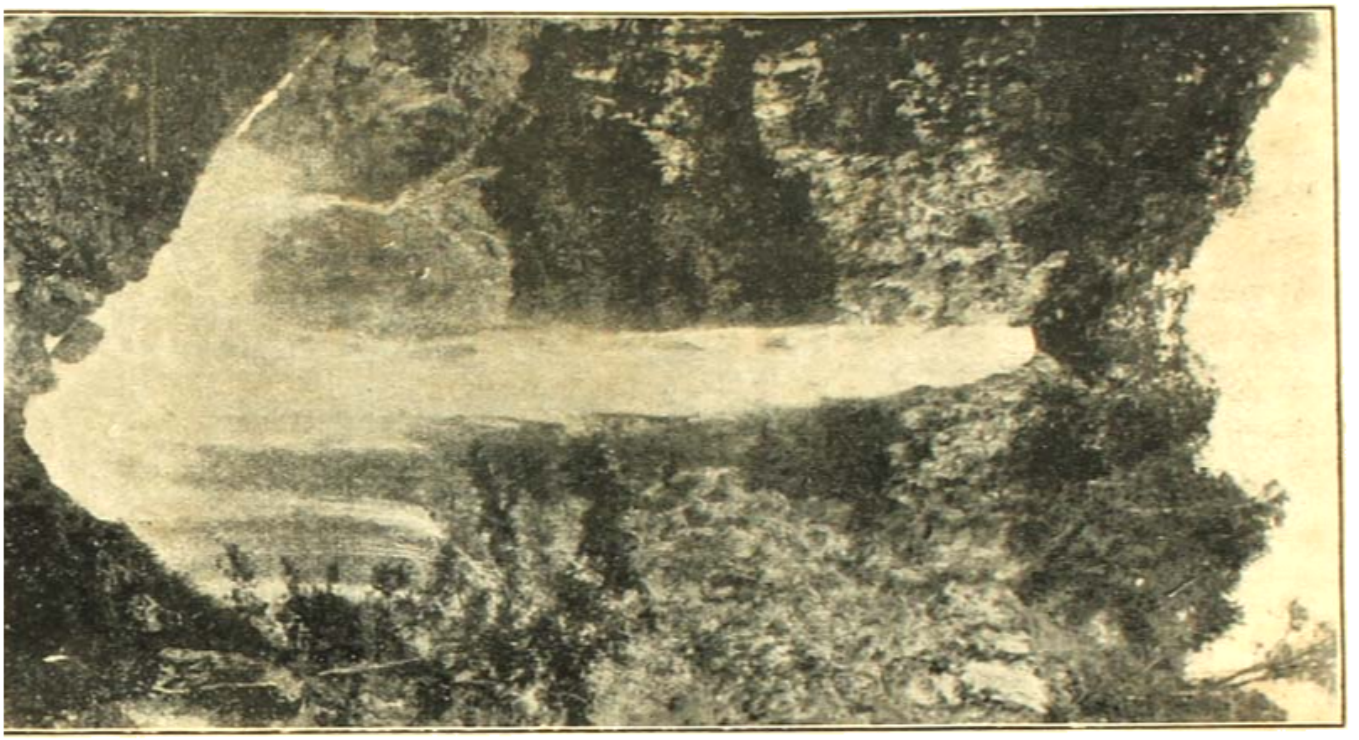

নিক্কোপাহাড়ে জলপ্রপাত

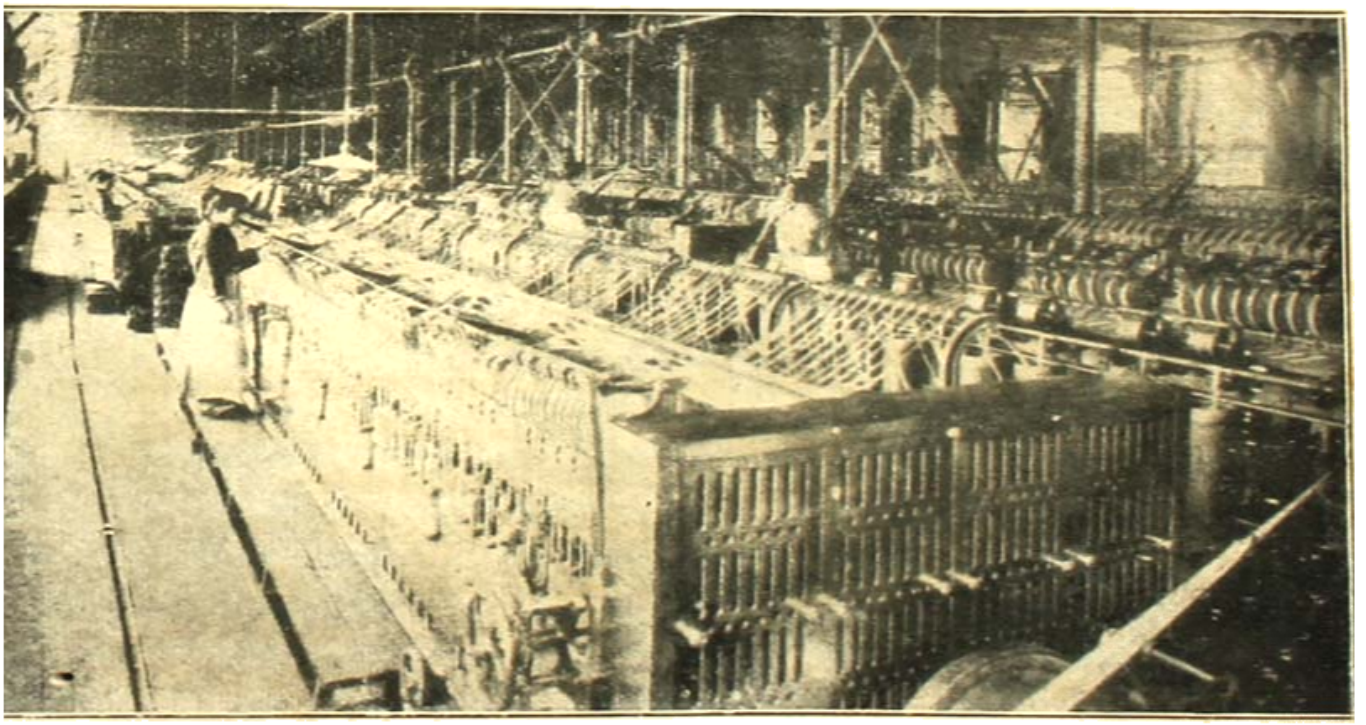

লিনেন-ফ্যাক্টরি

করাইয়াছিল। কার্য্যোপযোগী পাণ্ডিত্যের প্রভাবেই তিনি নিতান্ত নগণ্যপদ হইতে জাপান রাজ্যের পোশুণ্ডীপদ অর্জ্জন করেন। এইরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী বীরপুরুষই ধর্ম্মযোগের অনুশাসন প্রচার করিতে অধিকারী।

একটা ফটকের ভিতরে বাহিরে উপরে কারুকার্য্য খোদাই ও চিত্রণ এত বেশী যে সমস্ত দিন দেখিলেও সব শেষ করা যায় না। নয় লক্ষ টাকায় এই ফটক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ফটকের জাপানী নামে ইংরাজেরা বুঝিয়া থাকেন—"The gate where one spends the whole day."

একটা ফটকের নাম "চীনা ফটক।" সিংহ ও ড্রেগন এই দ্বারের বিশেষত্ব। এগুলি চিত্রিত নয়—কাষ্ঠদ্বারের উপর আলসাভাবে বসান।

প্রধান গৃহের অভ্যন্তর দেখিয়া মোটের উপর শিবাপার্কের ভবন মনে পড়িল। সাজ-সজ্জা আসবাব পত্র ইত্যাদি এখানে কথঞ্চিৎ বিভিন্ন। ভিতরকার ছাদ এবং প্রাচীন গাত্রের চিত্রাঙ্কনও স্বতন্ত্র। দেওয়ালে জাপানের ৩ জন প্রসিদ্ধ কবিবরের চিত্র ঝুলান আছে। সেদিন তোকুতোমির সংগৃহীত প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে এই সকল চিত্র দেখিয়াছি। একপ্রকার সোনালি কাগজের পাত্র গৃহের মধ্যভাগে রক্ষিত হইতেছে। এইগুলি নাকি ধর্ম্ম কর্ম্মে লাগে—প্রকৃত অর্থ বুঝিলাম না। এতদ্ব্যতীত ফুল ফল জানোয়ার গাছ ইত্যাদির খোদাই অথবা চিত্র শিবাপার্কের সৌধাবলীতেও দেখা যায়। কতকগুলি গৃহে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

একটা কাষ্ঠদ্বারের নিকটে যাইয়া গাইড বলিলেন—"উপরে দৃষ্টিপাত করুন। পিয়নি ফুলের নীচে একটি বিড়াল নিদ্রা যাইতেছে। কাঠের খোদাই-কার্য্যে ঠিক যেন জীবিত বিড়াল দেখিতে পাইতেছি।" আর একটা ফটকে খোদাই করা ব্যাঘ্রদ্বয়ের তারিফ করিতে করিতে গাইড বলিলেন—"কাঠের উপর কারিগর কাজ করিয়াছেন—কিন্তু ঠিক যেন জীবন্ত জানোয়ারের লোম দেখিতেছি।"

ইয়েয়সুর মন্দির পূর্ব্বে বৌদ্ধ সরঞ্জামে পূর্ণ ছিল। সুবর্ণ মূর্ত্তি, সুবর্ণ পদ্মপত্র, প্রকাণ্ড বাতিদান, ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ, পতাকা, ধূপপাত্র ইত্যাদিতে ঘর ভরা ছিল। কিন্তু "মেজি"-যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে শিণ্টো-মতের প্রতি জাপান গবর্মেণ্ট সদয় হইয়াছেন। স্বয়ং মিকাডো একবার ইয়েয়সুর মন্দির দেখিতে আসেন। তখন হইতে একটা দর্পণ এবং কাগজের পত্র গৃহাভ্যন্তরে স্থান পাইতেছে—বৌদ্ধ সরঞ্জামগুলিকে দূরীভূত করা হইয়াছে।

এই মন্দিরে বৎসরে দুইবার করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব প্রধানতঃ শোভাযাত্রার আকার ধারণ করে। এক মন্দির হইতে অন্য মন্দিরে তিনটা ক্ষুদ্র মন্দির বহন করিয়া লওয়া হয়—আবার সেইগুলি ফিরাইয়া আনা হয়। অনুষ্ঠানটিকে অনেকটা রথযাত্রার মত বিবেচনা করা যাইতে পারে। সম্রাটের দূত আসিয়া পূজার অর্ঘ্যপ্রদান করেন। সেই সময়ে যাওয়ার উপরকার রক্তবর্ণ ল্যাকার সেতু খুলিয়া দিবার নিয়ম আছে।

জুন মাসে সাধারণতঃ যে শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহার বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে বিবৃত হইতেছে। ঠিক যেন 'রামলীলা'র মিছিলের কর্দ্দ।

১০০ শ্বেত পোষাকাবৃত ব্যক্তি পবিত্র বৃক্ষ বহন করে।

তাহাদের পশ্চাতে একটি দেবতা শোভা-যাত্রার দলপতি হন।

দুইটা সিংহের মুখোস বহন করিয়া ছয়জন লোক যায়।

তিনজন শিন্তো বাদক।

তিনটি শিন্তো পুরোহিতপত্নী।

দুইজন শিন্তো পুরোহিত অশ্বপৃষ্ঠে দলবল সহ অগ্রসর হন।

তিনটি অশ্ব।

১০০ গোলন্দাজ।

১০০ তীরন্দাজ।

১০০ বল্লমধারী সৈন্য।

১০০ সশস্ত্র সৈনিকপুরুষ।

১২ জন যুবক পুরোহিত ফুলের টুপি মাথায় পরিয়া থাকেন।

১০০ বিভিন্ন মুখোসপরা সৈন্য।

৪টা পাখার মত পতাকা।

অশ্বপৃষ্ঠে শিন্তো পুরোহিত তরবারি ধারণ করেন।

অশ্বপৃষ্ঠে শিন্তো পুরোহিত ধ্বজা ধারণ করেন।

তিনটি বিভিন্ন পতাকা ধারণ করিবার জন্য শ্বেত পোষাকাবৃত ব্যক্তি।

ঢাক বহন করিবার জন্য তিনজন শ্বেত পোষাকধারী ব্যক্তি।

ঘন্টা বহনকারী।

৩০ বালক বানরের মুখোস পরিয়া চলে।

বানর ও তাহাদের পালক।

৬ শিন্তো পুরোহিত প্রাচীন সম্রান্তবংশীয় বেশে।

৪০ শিন্তো পুরোহিত প্রাচীন বেশে।

১২ বাদক।

১০ ব্যাধ পক্ষী হস্তে।

২ মল্ল।

সোনালি কাগজের পত্র বহন করিবার জন্য শিন্তো পুরোহিত।

অশ্বপৃষ্ঠে শিন্তো পুরোহিত।

এই শোভাযাত্রা দেখিলে মধ্যযুগের জাপানকে বুঝিতে পারা যায়। নিক্কোর মন্দির-গুলির উপর বাহির ভাল করিয়া দেখিলেও জাপানের শোগুণী আমল সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। সৌধগুলি সেই যুগের মিউজিয়াম বিশেষ। জাপানের বাস্তুবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, রঞ্জনশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, ল্যাকার-শিল্প, সকলই এই সমাধিক্ষেত্রে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। শিন্তো বৌদ্ধজাপানের ধর্ম্মভাব এবং সামাজিক জীবন এই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইখানে আসিলে ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেকার শোগুণী আমলের আব-হাওয়া ফিরিয়া পাওয়া যায়। অজন্তা, সাঞ্চি সারনাথ, তাকত ইত্যাদি অঞ্চলের কারুকার্য্যে যেরূপ প্রাচীন ভারতের আর্থিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয় এবং ধর্ম্মবিষয়ক অবস্থা বুঝিতে পারি, সেইরূপ নিক্কোসৌধগুলির চিত্রাঙ্কন, খোদাই কার্য্য এবং মূর্ত্তিসমূহ নিরীক্ষণ করিলে মধ্যযুগের জাপানী-জীবন আমাদের সম্মুখে ভাসিতে থাকে।

তোকু গাওয়াবংশের প্রবর্ত্তক য়েজো (টোকিও) নগরের স্থাপয়িতা বীরবর ইয়েয়স্থ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ১৯১৫ সালে এই ঘটনার তিনশত বর্ষ কাল হইল। এই উপলক্ষে গত জুন মাসে নিক্কোতে মহা সমারোহে শোভাযাত্রা, লোকনৃত্য, মহোৎসব, পানভোজন, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হোটেলের কর্ত্তা বলিলেন—"য়্যাসুশি শিবুসাওয়া এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। তোকুগাওয়া শোগুনদিগের অনু-চরবর্গের মধ্যে শিবুসাওয়া সর্ব্বপ্রধান এবং আজকাল বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ।"

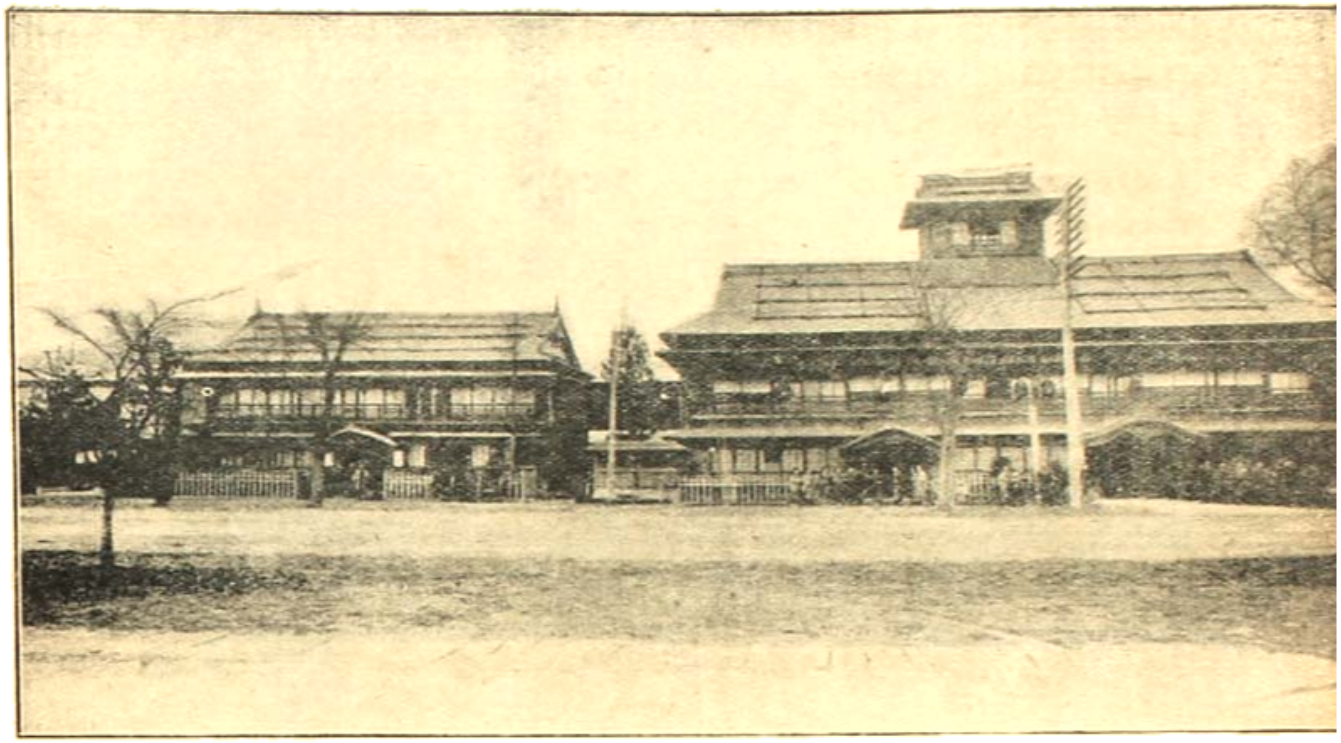

জাপানী সরাই-সাপ্পরো

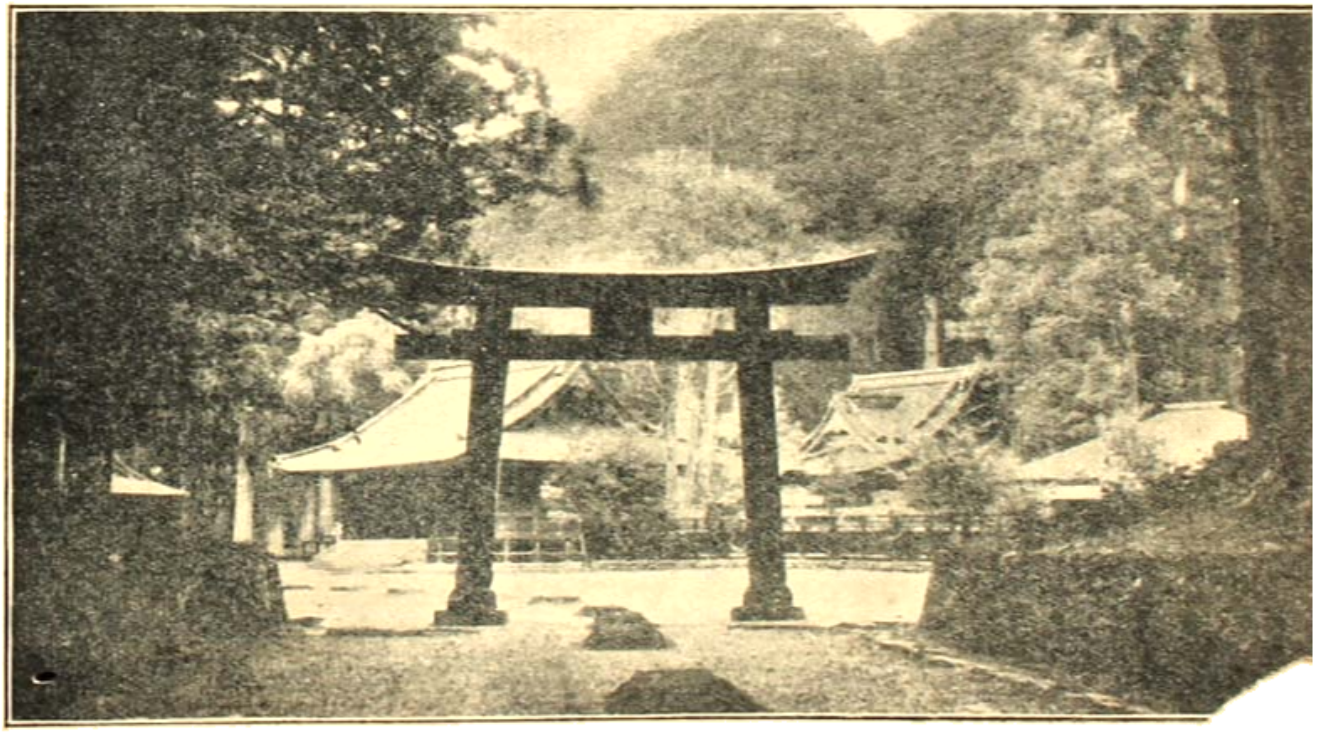

তোরী

৩। তোকুগাওয়াযুগের বাস্তুশিল্প

ট্রামপথের শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল। নিক্কো পল্লীর পর আর একটা পল্লীতে আসিলাম। এইখানে একটা তাম্র ধাতুর কারখানা—তামা পরিষ্কার করা হয়—প্রায় আটশত লোক কর্ম্ম করে। দশ এগার মাইল দূরস্থিত এক পাহাড়ে তামার খনি আছে।

দারা নদীর কিনারা দিয়া ট্রাম পথ বিস্তৃত। নীরব জনপদের মধ্যে নির্ঝরের ঝর ঝর সর্ব্বদাই শুনিতেছি। হাঁটিয়া খানিকদূর যাওয়া গেল। পার্ব্বত্য উপত্যকার দৃশ্য অনেকটা আল্‌মোড়ার পথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সাইড বলিলেন—"এখান হইতে চারি মাইল দূরে একটা হ্রদ আছে। সেই হ্রদ নিক্কো পল্লী হইতে ২০০০ ফিট উর্দ্ধে—অর্থাৎ সমুদ্র হইতে ৪০০০ ফিট উচ্চ। হ্রদ হইতে একটা বিপুল জলপ্রপাত পড়িয়া এই দারা স্রোতস্বতী সৃষ্টি করিয়াছে।" শুনিলাম জলরাশি হ্রদের ২৫০ ফিট নিম্নে লাফাইয়া পড়িতেছে। বলাবাহুল্য তাহা হইলে এই প্রপাতে নায়াগ্রা-জোয়ার গৌরব উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সকল দিক হইতেই নিক্কোমণ্ডল ও তাহার সন্নিহিত ভূখণ্ড প্রাকৃতিক হিসাবে "কেক্কো" পদবাচ্য।

বস্তুতঃ এখানে প্রকৃতির মহিমা দেখিয়া ও শুনিয়াই মুগ্ধ হইতেছি। মানুষের কীর্ত্তি দেখিয়া মনে হইতেছে সেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দীর্ঘশ্বাস—"And is this Yarrow?" নিক্কোর বাস্তুশিল্প আমার চোখে কেক্কো বোধ হইল না। এখানকার সৌধগুলি কাষ্ঠময় তাজমহল সন্দেহ নাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় প্রস্তরশিল্প দেখিয়া কখনও "And is this Yarrow?" বলি নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর জাপানী কাষ্ঠশিল্প দেখিয়া আশানুরূপ আনন্দ উপভোগ করিলাম না। মিসরের লুক্‌সর-কার্ণাক দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছি—প্রাচীন মিসরীয় শিল্পের সম্বন্ধে হইলে "কেক্কে" বা চমৎকার না বলিয়া থাকা যায় না। কিন্তু নিক্কোর সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের লাবণ্য দেখিয়া চক্ষু পীড়া পাইতেছে—মরমে বিস্ময়লাভ করিতেছি না।

শিবাপার্ক এবং নিক্কো উভয় স্থানের দর্শনসমূহেই সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়ে ল্যাকার-মণ্ডিত প্রাচীর, কপাট, ছাদ ইত্যাদি। সোনালি কাজের প্রভাও দর্শকমাত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এই দুই শিল্পের নিদর্শন প্রত্যেকটায় এত বেশী সঞ্চিত হইয়াছে যে চোখ ঝলসিয়া যায়। ভিতরকার মূর্ত্তি এবং অঙ্কিত চিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে অতি উচ্চ শ্রেণীর কারুকার্য্যই বিবেচিত হইবে—কিন্তু গৃহের ভিতর এগুলির সমাবেশে ইহাদের মূল্য অনেকটা কমিয়াছে। ঘরের বাহিরে অন্য কোথাও এগুলি আলগা করিয়া প্রদর্শিত করিলে চিত্রকর ও ভাস্করের কৃতিত্ব প্রশংসিতই হইবে। কিন্তু গৃহ নির্ম্মাণকারী বাস্তুশিল্পিগণ গৃহের আভ্যন্তরীণ অলঙ্কার সংস্থানের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং হইয়া পড়িয়াছে।

এক কথায় বলিতে পারি যে, তোকুগাওয়া-যুগের বাস্তুশিল্পে সংযমের অভাব যৎপরোনাস্তি। অল্পপরিসর স্থানের ভিতর নানা প্রকার উচ্চতম সৌন্দর্য্যের বস্তু রাশীকৃত করা হইয়াছে। এখানে কারিগরদিগের বিলাস অত্যধিক দেখিতে পাই। কিন্তু এই যুগের ভারতীয় হর্ম্ম্য বাস্তুশিল্পের মধ্যে সংযমের সহিত সৌন্দর্য্য ভোগের নিদর্শন আছে। তাজমহল একটা উচ্ছৃঙ্খল সৌন্দর্য্য পিপাসার প্রতিমূর্ত্তি নয়। ইহার ভিতরকার সকল

অঙ্গের পরস্পর সম্বন্ধ অতি নিপুণভাবে নিরূপিত হইয়াছে। বাস্তুশিল্পীর ক্ষমতা এই বিষয়েই বিশেষরূপে প্রকটিত। তাজমহলের অসংখ্য প্রকার প্রস্তরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নিরীক্ষণ করিলে কোথাও হয়ত লাবণ্য পাইব না—সকলগুলির মিলনেই তাজমহলের গৌরব ও মহিমা। এই মর্ম্মর শিল্পের আভ্যন্তরীণ অলঙ্কার এবং বাহ্য গঠন উভয়ই চূড়ান্ত সামঞ্জস্য ও অনুপাত জ্ঞানের সাক্ষ্যপ্রদান করে। কিন্তু জাপানী শিল্পের সকল অঙ্গে সামঞ্জস্য পাইলাম না—প্রত্যেকটাই অত্যধিক দেখিতে পাই—কাজেই নয়ন তৃপ্ত হয় না। তাজমহলের শিল্পী নানাবিধ কারুকার্য্যের সাহায্যে একটা ভাবই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। জাপানের বাস্তুশিল্পে সকল কারিগরই নিজের নিজের চরম দেখাইতে ব্যস্ত।

(৪) রেলে বার ঘণ্টা

সকাল হইতেই অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। যথাসময়ে রেলে বসিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা ছোট ষ্টেসনে নামা গেল। এইখানে চট, তোয়ালে, জিন ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার কারখানা আছে। এতদিন কোথাও Linen Factory দেখি নাই। আজ দেখিবার সুযোগ হইল অবশ্য ভিতরে সকল বয়ন কারখানাই একরূপ। সুতা প্রস্তুত করা এবং কাপড় বুনা এই দুই কাজের জন্যই কল আছে। পশম, তুলা, পাট ইত্যাদির বয়নেও এইরূপ। কারখানায় স্ত্রীমজুরের সংখ্যা বেশী বোধ হইল। লিনেন তিশি গাছের খড় হইতে প্রস্তুত করা হয়।

ষ্টেসনের নিকটে একটা সরাইয়ে আহার করা গেল। নিক্কো হোটেল হইতে ভাত, তরকারী, ভূট্টাসিদ্ধ, ডিমভাজা ও কুমড়া ভাজা ইত্যাদি আনা হইয়াছিল। সরাইটা যেন গোয়ালন্দের একটা হোটেল বিশেষ। চৌকি সদৃশ মেজের উপর মাদুর বিছান রহিয়াছে—মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে—উঠানে জলের গামলা সাজান। আহার করিবার সময়ে ঝী বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। প্রাচ্যদেশ ছাড়া দুনিয়ার অন্যত্র এই সকল দৃশ্য দেখিবার জো নাই।

সরাইয়ে লোক জন রাত্রিবাসও করিতে পারে—ইচ্ছা করিলে কয়েক দিবস কাটানও যায়। শয়নগৃহ ইত্যাদি আছে। জাপানীরা খাট বা চৌকি ব্যবহার করে না। মেজেতে মাদুর বিস্তৃত থাকে। তাহার উপর বিছানা পাতিয়া শুইতে হয়।

এই ধরণের সরাই বা চটি ষ্টেসনের নিকট অনেকগুলি দেখিলাম। খড়ো অথবা টিনের ছাদ, কাঠের বেড়া, অপরিষ্কার উঠান, ইত্যাদি ভারতীয় সরাইসমূহেরও আনুষঙ্গিক নহে কি? "স্বদেশী" জাপানে ও "স্বদেশী" ভারতে প্রভেদ খুঁজিয়া ত পাই না।

দ্বিপ্রহরে উৎসুনোমিয়া ষ্টেসনে গাড়ী আসিল। গরম এতবেশী যে রেল কোম্পানী প্লাটফর্ম্মে এবং ষ্টেসনের সকল ঘরে জল ছিটাইবার হুকুম দিয়াছেন। প্লাটফর্ম্মের উপর কয়েকটা আল্‌মারিতে দেখিলাম এই প্রেফেক্ট বা জেলায় কৃষিজাত ও শিল্পজাত যত প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাদের নমুনা সংগৃহীত রহিয়াছে। রেলযাত্রীরা সহজেই সেগুলি দেখিয়া লইতে পারে।

নিক্কো হইতে শাখা লাইনের গাড়ীতে আসিয়াছি—বড় লাইনের গাড়ীর জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। টোকিও হইতে গাড়ী আসিলে তাহাতে বসিয়া উত্তর-দিকে অগ্রসর হইতেছি। জাপানের উত্তরার্দ্ধ

অপেক্ষা দক্ষিণ অর্দ্ধই ঐতিহাসিকতার প্রাচীনতর ও প্রসিদ্ধতর।

ধানের ক্ষেত দুই ধারেই দেখিতেছি—ভুট্টা ও তুঁতের চাষও স্থানে স্থানে দেখিলাম। কয়েকটা পার্ব্বত্য নদী পার হইলাম। নদীতে জল অল্প—প্রস্তর শিলার রাশিই বেশী দেখা যায়। জাপানে সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত নদী নাই। এই নদীগুলি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ধাবিত। পূর্ব্ব অঞ্চলের পাহাড়গুলি ইহাদের উৎপত্তিস্থান।

ক্রমশঃ খাটি পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। যেন আমেরিকার নেভাডা অঞ্চল দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। অঙ্গলাবৃত পর্ব্বত পৃষ্ঠ, সঙ্কীর্ণ কৃষিভূমি, নিবিড়বন, সুদীর্ঘ তরুবর অথবা ঘন ঝোঁপ এই সমুদয়ই চোখে পড়িতেছে। চারিদিকেই পাহাড়ের সমাবেশ। সন্ধ্যাকালে ফুকুশিমা নগরের নিকটে আসিতে আসিতে অতিশয় রম্য দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। পাহাড়ের উর্দ্ধদেশ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। রেল পথের দুই ধারেই পাহাড়—বনজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি কৃষিক্ষেত্র। খানিকটা দক্ষিণ ফ্রান্স ও রোম উপত্যকার দৃশ্য মনে পড়ে। ফুকুশিমার পর আর একটা বড় সহর আছে। তাহার নাম সেন্ডাই। ইহাই উত্তর জাপানের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ নগর। এখান হইতে আধ ঘণ্টার মধ্যে মাৎসুসিমায় পৌঁছিলাম। তাহার পর রিক্‌শতে হোটেলে পৌঁছিতে আরও ৪০ মিনিট লাগিল।

রাস্তার দুই ধারে পার্ব্বত্য পল্লীর মধ্যে যে সকল কুটির দেখিলাম সেগুলির চালা হয় খড়ের না হয় টালির নির্ম্মিত। ঘরের দেওয়াল প্রায়ই মৃত্তিকা গঠিত। মেজেতে কাঠের আবরণ নাই। বলা বাহুল্য এইরূপ পল্লীগৃহ ভারতের সকল প্রদেশেই দেখা যায়। চালার আকৃতিও ঠিক আমাদের চৌয়ারী বা আটচালা ঘরের ছাদের মত। টোকিওর ধনীজনগণের কাষ্ঠভবনগুলির চালাও আমাদের সুপরিচিত খড়োচালার অনুরূপ। জাপানে একমাত্র মন্দির, রাজপ্রাসাদ এবং দুর্গের ছাদ অন্য ধরণের দেখিতে পাই। এই সমুদয়ের গঠনকে ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা-রীতির অন্তর্গত করা যায়। চালা দুই তিন ধাপে সম্পূর্ণ—প্রত্যেক ধাপই ত্রিভঙ্গিম ও বক্রগতি। এই তরঙ্গায়িত টালির বা টিনের ছাদ জাপানী বাস্তুশিল্পের বিশেষত্ব—ভারতবর্ষে এইরূপ ঢেউ কাটান চালা দেখিতে পাই না। জাপানীরা কোরিয়া ও চীন হইতে এই প্যাগোডা-রীতি আমদানি করিয়াছে।

শুক্ল পক্ষের চাঁদ ঘণ্টা খানেকের জন্য দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। ষ্টেসনে যখন নামিলাম তখন চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। পল্লীর ভিতর ইলেকট্রিক বাতি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। চীনা কাগজের লণ্ঠন রিক্‌শতে ঝুলাইয়া কুলীরা মাঠের ভিতরকার পথ দিয়া দৌড়িতে লাগিল। শীতল বাতাস বহিতেছে—মাঠের পর মাঠ পার হইতেছি স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র পল্লীর "চটি" বা মুদীখানা দেখা গেল। মেজেতে শুইয়া খালি গায়ে লোকজন নিদ্রা যাইতেছে। কোথাও জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই—মাঝে মাঝে দুই একটা গাড়ীর কোঁকর কোঁকর শুনিয়া ভাবিলাম বোধহয় গরুর গাড়ী আসিতেছে। দেখিলাম এগুলি অশ্ববাহিত শকট বটে কিন্তু গরুর গাড়ীর সঙ্গে এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নির্জ্জন নীরব প্রান্তর ও পল্লীর মধ্যে একমাত্র সহচর পাইলাম ব্যাঙের ডাক। বর্ষাকালে আমাদের

দেশের মত জাপানেও ঠেক জাতির কন্‌সার্ট বাজিতে থাকে। নিম্নে সহস্র সহস্র ব্যাঙের গান এবং উর্দ্ধে আকাশের "ছায়াপথ" ও তারকারাজি, অদূরে নাতিউচ্চ অস্পষ্ট পাহাড়, আর সর্ব্বত্র অন্ধকার ও দুইচারিটা জোনাকী পোকা।

"সাধ হয় মনে, তারকারি সনে,
ধীরে উঠে চলি সুনীল গগনে,
ললিত লহরী তুলিয়া সুতানে,
জোছনা কিরণে মিশাতে কায়।"

মাৎসুসিমার বাজার পাড়ায় বৈদ্যুতিক বাতির বাহার দেখিলাম। দোকানদারেরা ঘরের ভিতরে অথবা বাহিরে শুইয়া বসিয়া গল্প গুজব করিতেছে। ভারতীয় মফঃস্বলের নৈশ দৃশ্য। তফাৎ কেবল বিদ্যুতে।

৫। উপসাগরের কূলে

বাহিরে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস—কিন্তু ঘরের ভিতর যেন অগ্নিকুণ্ড। রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত এই ভাবে গেল। বসিয়া বসিয়া কয়েক সংখ্যা "Japan Magazine," Alfred Noyes প্রণীত A tale of old Japan নামক কবিতা এবং Hundred verses from old Japan নামক প্রাচীন জাপানী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ ইত্যাদি পাঠ করা গেল। পুরাতন জাপানী উপন্যাসে, গল্পে, কাব্যে এবং নোনাটকে বৌদ্ধ প্রভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়। নির্ব্বাণ-তত্ত্ব, পরকালবাদ ইত্যাদির চিহ্ন সেখানে সেখানে পাই। জাপানীরা প্রেম-সাহিত্যেও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এমন কি অষ্টম নবম দশম শতাব্দীর কবিগণ ও নব্য ইয়োরামেরিকার রীতিতে romantic প্রণয়-কবিতা রচনা করিত। ইহা বিশেষ বিস্ময়ের কথা।

নবম শতাব্দীর এক রাজকুমার প্রেমে পড়িয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

" Now, in dire distress.
It is all the same to me;
So, then, let us meet
Even though it costs my life
In the Bay of Naniwa."

এখানে "যমুনাসলিলে সই অব তনু ভারব" — ইত্যাদির সুর শুনিতে পাই। এই সম্বন্ধে অনুবাদক ভাষ্য করিতেছেন—" It is clear from the poem that love a thousand years ago was much the same in power and unevenness as it is to-day."

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে এইরূপ গীত রচিত হইত কি? তখন ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানীতেও এই ধরণের গীতি-কবিতা দেখা গিয়াছিল কি?

নৈশ অন্ধকারকে দৃষ্টিগোচর করিবার জন্যই যেন জোনাকি পোকাগুলি মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। ঘরের ভিতরে মশকের জ্বালাতন যৎপরোনাস্তি। মশারির ব্যবহার হোটেলে প্রচলিত। চারিটার সময়েই উষার আবির্ভাব হইয়াছে। ছয়টার পূর্ব্বে ঘরের ভিতর সূর্য্যের উষ্ণ কিরণ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। বিছানা হইতেই দেখিতে পাইলাম একটা হ্রদসদৃশ জলাশয় সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটা ক্ষুদ্র পাহাড়।

মাৎসুসিমা জাপানী সমাজে প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত। জাপানীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে—"আমাদের দেশে তিনটা অতি রমণীয় স্থান আছে। তাহার মধ্যে মাৎসুসিমা অন্যতম।" মাৎসু শব্দের

নিকোপাহাড়ের হ্রদ

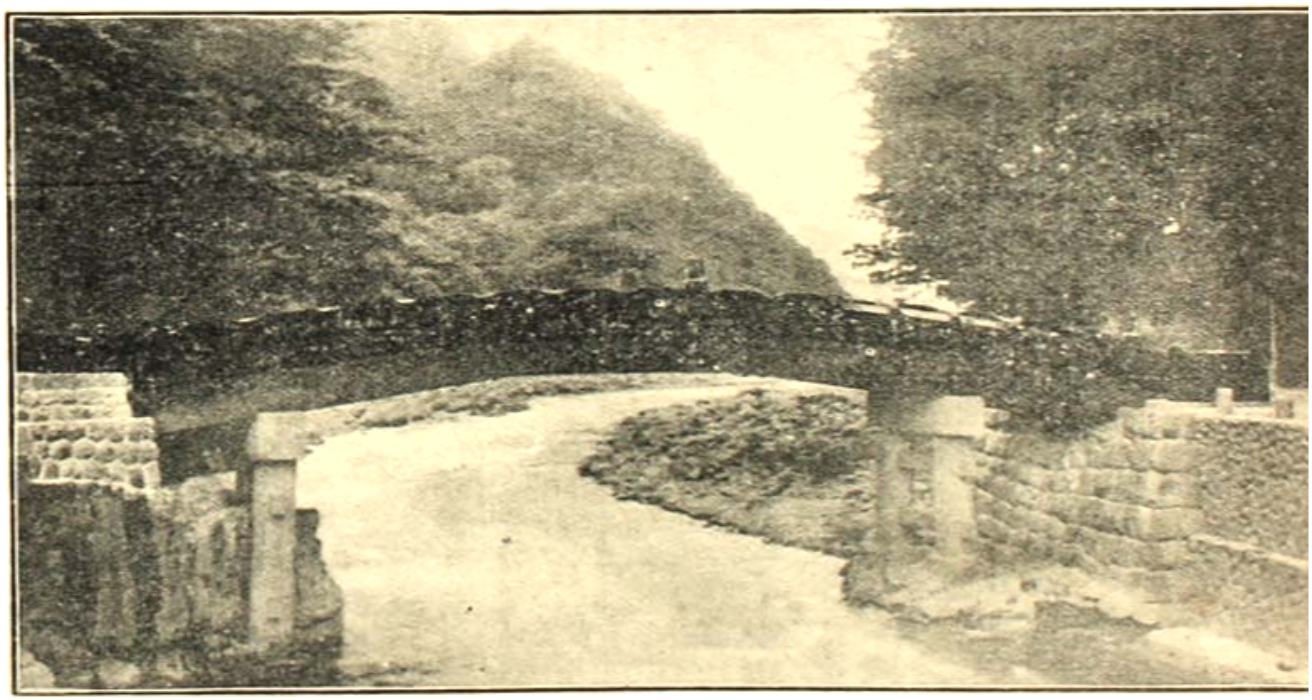

দায়ার উপর ল্যাকার সেতু

অর্থ pine বা সরল বৃক্ষ, শিমা শব্দের অর্থ দ্বীপ। ইহাকে পাইন বা সরল দ্বীপ বলা যাইতে পারে। এই জনপদে পাইন বৃক্ষের সংখ্যা অগণিত। একটা উপসাগরের চারি দিকে পাহাড়—বস্তুতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরেই যেন একটা হ্রদ অবস্থিত। এই জলাশয়ের ভিতর স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই দ্বীপগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গ বিশেষ। সর্ব্বত্রই সরল বৃক্ষের ঝাড় বিরাজমান। নিক্কো পাহাড়ের কৃত্রিম কৃপটোমেরিয়া ম্যাডিনিউ হইতে সাগর-কূলের এক প্রাকৃতিক পাইন-কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

মাৎসুশিমার সৌন্দর্য্য মধ্যযুগের জাপানীরাও উপলব্ধি করিয়াছিল। সেওাই জনপদের ডাইমোগণ এইখানে একটা গ্রীষ্ম ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রায় তিনশত বৎসরের পুরাতন একটা "ভিলা" আমাদের হোটেলের পার্শ্বেই অবস্থিত। গাইড বলিলেন—"লর্ড দাতে যখন সেওাইরাজ্যের ডাইমো ছিলেন তখন এই গৃহ নির্ম্মিত হয়।" সেদিন থিয়েটারে A Samurai and a Courtesan নাটকের অভিনয়ে দাতের পরিচয় পাইয়াছি।

মাৎসুশিমায় এতদিন পর্য্যন্ত জাপানী রীতির হোটেল, পান্থশালা, সরাই বা চটি মাত্র ছিল। ইয়োরামেরিকার পর্য্যটকগণ এই সকল গৃহে বাস করিয়া সুখ পাইত না। অথচ বিদেশীয় টুরিষ্টেরা এইখানে আসিতে আরম্ভ করিলে স্থানীয় লোকজনের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইবার কথা। এইরূপ ভাবিয়া সেওাই প্রেফেক্টের কর্ত্তৃপক্ষ একটা উচ্চশ্রেণীর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সরকারী খরচে এই ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। নূতন একটা পার্ক বা উদ্যান রচিত হইতেছে। উপসাগরের কূলে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক স্থানে এই উদ্যান ও গৃহের সমাবেশ। সকল প্রকার পাশ্চাত্য আহার বিহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটা হোটেল-কোম্পানী গবর্মেণ্টের নিকট এই গৃহ ভাড়া লইয়াছেন। দুই এক বৎসরের ভিতর এই "পার্ক হোটেলের" সাহায্যে মাৎসুশিমা বিদেশীয় পর্য্যটকগণের মক্কায় পরিণত হইবে।

মধ্যযুগের ইতিহাস মাৎসুশিমার পর্ব্বতগাত্রে ও পর্ব্বতকন্দরে অনেক দেখিতে পাইলাম। সেতু পার হইয়া একটা দ্বীপে পদার্পণ করা গেল। ইহার ভিতর একটা বিরাট কাষ্ঠময় বুদ্ধমূর্ত্তি এবং বহু প্রস্তরময় শিশুসংরক্ষক জিজোদেবের বিগ্রহ ইত্যাদি রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে দেখিলাম ভারতীয় কার্লাডাঙ্গা ইত্যাদি পর্ব্বত গহ্বরের ক্ষীণ অনুকরণ করা রহিয়াছে। মৃত নরনারীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নানা প্রস্তরস্তূপ, কতকগুলি পর্ব্বতকন্দরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রস্তরস্তূপের উপর চীনা অক্ষরের লিপি পাঠ করিয়া বৌদ্ধ অনুষ্ঠান বুঝিতে পারা যায়। এই ধরণের কন্দর মাৎসুশিমার নানা অঞ্চলেই দেখিতে পাইলাম। স্মৃতি স্তম্ভের সর্ব্বনিম্নে চতুষ্কোণ প্রস্তর, তাহার উপর গোলাকার প্রস্তর—তাহার উপর আবার চতুষ্কোণ—তাহার উপর আবার গোলাকার এবং সর্ব্বোচ্চস্তর শীর্ষ সদৃশ।

মাৎসুশিমার বাজার-পাড়ায় আসিলাম। এইখানে একটা ফটকের ভিতর দিয়া কৃপটোমেরিয়া বৃক্ষের কুঞ্জপথে প্রবেশ করিলাম। এই পথে একটা বৌদ্ধ মন্দিরে আসা যায়। দাতে বংশীয় প্রথম ডাইমো এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। শুনিলাম পরলোকগত মিকাডো মৎসুহিতো পাইন দ্বীপে ভ্রমণ করিতে আসিয়া এই মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। আজকাল যত জাপানী পর্য্যটক মাৎসুশিমা ভ্রমণে আসেন তাঁহারা সকলেই এই মন্দির দেখিয়া যান। গাইড বলিলেন—"এই পল্লীতে স্বদেশীয় লোকজনকে সাহায্য করিবার জন্য এক শ্রেণীর গাইড আছে। তাহারা তীর্থযাত্রী অথবা স্বাস্থ্যান্বেষী জাপানীগণকে সকল দর্শনীয় স্থানে লইয়া যায়।" আমি বুঝিলাম ইহারা আমাদের দেশে পাণ্ডা নামে পরিচিত।

এখানকার পাহাড় বিশেষ শক্ত নয়। নিতান্ত নরম স্যাণ্ডষ্টোন বা বালুকা প্রস্তরে এই অঞ্চল গঠিত। ঘুঘু, হাঁস, ইত্যাদি পাখীর ঝাঁক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গবর্মেণ্টের আইনে এই সকল শীকার করা বারণ। শীতকালে বরফ পড়ে তখন এই

অকূলে লোকজনের গতিবিধি এক প্রকার বন্ধ থাকে। উপসাগরে স্রোত বা তরঙ্গ নাই। প্রত্যহ বিকালে জোয়ার হয়, তখন জলের পরিমাণ কিয়ৎকালের জন্য বাড়িয়া যায়। সাধারণ নৌকা, তড়িচ্চালিত নৌকা, বাষ্প-চালিত ষ্টীমার ইত্যাদি সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু সুবিস্তৃত বাণিজ্যের কেন্দ্র এখনও মাৎসুশিমায় গড়িয়া উঠে নাই। কোন কৃষি বা শিল্পকর্ম্মের পরিচয়ও এই জনপদে পাইতেছি না। এমন কি সাধারণ শাকসব্জী, ফলমূল, মাংস মাছ, ডিম, দুধ, মাখন ইত্যাদির জন্যও হোটেলের কর্ত্তা সেওাই সহরে লোক পাঠাইয়া থাকেন।

মাৎসুশিমা ভারতবাসীর পুরী বা ওয়াল্টেয়ার। গ্রীষ্মের সময়ে পয়সাওয়ালা লোকেরা এখানে কিছুকাল কাটাইতে ভালবাসেন। ইহা অর্থ বায়ের স্থান—টাকা রোজগারের পথ এখানে নাই। ঘন সবুজ পাইন তরুর হাওয়া খাইয়া যাহাদের পেট ভরে অথবা মর্ম্মর ধ্বনি শুনিয়া যাহাদের চিত্ত উৎফুল্ল হয় তাহারা প্রকৃতির এই বিলাসক্ষেত্রে সুখ পাইবে। অথবা যাহারা সাগরকূলে বসিয়া বিরলে লহরমালা দেখিতে চাহে তাহাদের পক্ষেও এই স্থান প্রশস্ত। দুঃখের কথা লহরমালা এখানে দেখিতে হইলে নৌকা করিয়া কিছুদূর যাইতে হয়।

কোম্পানীর ষ্টীমারে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গাইডের পরামর্শে একটা আল্‌গা নৌকা ভাড়া করিয়া উপসাগর-বিহারে বাহির হইলাম। প্রাচীনকাল হইতে কোম্পানীদের ধারণা এই যে এই অকূলে ৮০৮ দ্বীপ অবস্থিত। শুনিলাম দ্বীপ সংখ্যা প্রায় তিনশত আছে। দ্বীপগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ী "চর" মাত্র। একটা দ্বীপের নাম সৌভাগ্যদ্বীপ, কোন দ্বীপ দেবতার নামে অভিহিত, কোনটা বা প্রসিদ্ধ স্ত্রীকবির নামে বিখ্যাত। হোটেলের নিকটে সাগরে স্নানের সুবিধা নাই, জলের ভিতর জঙ্গল অত্যন্ত বেশী। আধ ঘণ্টা যানেক নৌকায় চলিয়া একটা দ্বীপে আসিলে স্নানের ঘাট পাওয়া যায়। একটা দ্বীপে একপ্রকার বাঁশ পাওয়া যায়—উহা পুরাপুরি নিরেট।

সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। ভোজনালয়ে বসিয়া আহার করিতেছি এমন সময়ে দেখি ২০।২৫ জন জাপানী বালক ও বালিকা বারান্দায় আসিয়া দেখিতেছে। ইহারা রঙ্গিন "চারখানা" বা ছিটের কিওমনো পরিয়াছে, পায়ে কোন খড়ম বা জুতা নাই, মাথায়ও কোন আভরণ নাই। ইহাদিগকে দেখিতে আমাদের স্বদেশীয় শিশুগণের মত। বোধ হয় ইহাদিগকে বঙ্গীয় মুসলমান সন্তান বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। ঘরের বাহিরে আসিবা মাত্র সকলে দূরে পলাইয়া গেল। আবার ভিতরে প্রবেশ করিলেই উহারা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। পাশ্চাত্য দেশের শিশুগণকে এই ধরণের সঙ্কোচ বোধ করিতে দেখি নাই। পরে এক এক টুকরা রুটি প্রদান করিয়া ইহাদিগকে বিদায় করা গেল। উহারা এই জিনিষ গ্রহণ করিবে পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। গাড়ীর সময় হইয়া আসিল—সকলকে "সায়োনারা" বলিয়া রিক্‌শতে বসিলাম। তাহার পর আবার সেই বাজারের পথে মুদী দোকানদারের ঘটলা, জোনাকির রোশনাই, ব্যাঙের কনসার্ট অতিক্রম করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত।

গাইডকে প্রতিদিন ৭৷০ করিয়া দিতে হইতেছে। তাহার উপর যাতায়াতের খরচ আছে। এই ব্যয়কে জাপানী ভাষা না জানার মূল্য বিবেচনা করিতেছি। মিশরেও গাইডের খরচ আবশ্যক হইয়াছিল। কোন মতে রেলজাহাজের মাসুল মাত্র লইয়া আসিলে বিদেশ ভ্রমণ করা চলে না।

৬। টোকিও হইতে সাতশত মাইল উত্তরে

আমেরিকার নিয়মে জাপানীরাও রেলে আরোহীদিগের জন্য ঘুমের গাড়ী প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এই সকল গাড়ীতে একজন করিয়া সেবক সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে। বিছানা পাড়া হইতে জুতা জামা পরিষ্কার পর্য্যন্ত সকল কাজই এই সেবকের কর্ত্তব্য। আমেরিকার গাড়ীতে মশারি ও চটি জুতা পাওয়া যায় নাই। জাপানী sleeping car এ এই দুই জিনিষ "অধিকন্তু"।

এক ঘুমে রাত্রি কাবার করিয়া দিলাম।

ভোরে আওমরি ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। নিম্নে দ্বীপের ইহাই সর্ব্বোত্তর সীমা। এইখানে উপসাগর ও প্রণালী পার হইয়া পরবর্ত্তী দ্বীপে যাইতে হইবে। সেই দ্বীপের নাম হোক্কাইদো। এই দ্বীপের কেন্দ্রসহর স্যাপ্পরো যাত্রা করিয়াছি

জাপানী রেলে ভাড়া অত্যন্ত অল্প। টোকিও হইতে স্যাপ্পরো ৭০০ মাইল। ইহার মধ্যে জাহাজে থাকিতে হয় পাঁচ ঘণ্টা—প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপী জলপথ। নিদ্রা যাইবার জন্য অতিরিক্ত খরচ সমেত প্রথম শ্রেণীর মূল্য দিতে হইল মাত্র ৩২৲। কিন্তু কলিকাতা হইতে কাইরোসে কাশী যাইতে হইলে খরচ হয় ৩৮৲। অথচ দূরত্ব মাত্র ৩৪০ মাইল। এদিকে আরাম বেশী জাপানী 'স্লীপিং কারে'।

জাপানের প্রত্যেক গাড়ীতে ভোজন-প্রকোষ্ঠ থাকে না। প্রায় সকল যাত্রীই নিজ নিজ খাদ্যদ্রব্য বোচকায় বাঁধিয়া আনে। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাও এইরূপ করেন। ডাইনিংকারে যাইয়া খাওয়ার রীতি জাপানী সমাজে বেশী দেখিতেছি না সাধারণতঃ স্বদেশী খাদ্য গ্রহণ করাই ইহাঁদের অভ্যাস। বিদেশীয় পোষাকেও বেশী জাপানী দৃষ্টিগোচর হয় না। ষ্টেশনের মোসাফেরখানার বেঞ্চ টেবিল দেখিতে পাই বটে—কিন্তু সাধারণতঃ ফরাস বিছাইয়া বসিবার অভ্যাসই বর্ত্তমান। আওমরি ষ্টেশনের Waiting Roomএ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা সকলেই টেবিল চেয়ারের কামরায় প্রবেশ করে না। মেজেতে আসন পাতিয়া বসাই সকলে পছন্দ করেন। রেল গাড়ীর এবং মোসাফেরখানার পায়খানাতেও জাপানীরা স্বদেশী কায়দাই রক্ষা করিয়াছে। পাশ্চাত্য "কমোড" ব্যবহার জাপানী সমাজে আরব্ধ হয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় এবং ওয়েটিং রুমেও প্রাচ্য ধরণের পায়খানাই দেখিতে পাইতেছি। ভারতবর্ষে যে সকল রেল ষ্টীমার চলে তাহাতে দেশীয় লোকজনই যাতায়াত বেশী করে সত্য—কিন্তু রেলকোম্পানী দুই চারিজন শ্বেতাঙ্গ নরনারীর সুখ সুবিধা বিবেচনা করিয়াই সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কোন্ ষ্টেশনে কতক্ষণ থাকিবে ইত্যাদি স্থির করা হইতে গাড়ী ঘরের পায়খানা পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই ভারতীয় মোসাফেরদিগের স্বভাব অভ্যাস বিবেচনা করা হয় না। এই জন্যই রেল ষ্টীমারে চলাফেরা করা ভারত-বাসীর পক্ষে একটা ঝকমারি বা কর্ম্মভোগ বিবেচিত হয়। কিন্তু জাপানীরা ভারতবাসীর পরে রেল দেখিয়াও অল্পকালের মধ্যেই ইয়োরামেরিকানদিগের ন্যায় এই সকল যান-ব্যবহারে সুদক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। রেল ষ্টীমার ইত্যাদি ইহারা হজম করিতে পারিয়াছে—এই সকল নব্য যান ইহাদের ধাতে লাগিয়াছে। একমাত্র কারণ এই যে, জাপানীরা নব্য কল যন্ত্র হাতিয়ারগুলি নিজ ইচ্ছানুসারে নিজ সুযোগ সুবিধা বাড়াইবার জন্য নিজ অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যে আমদানি ও প্রয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ ইহারা রেলওয়ে ষ্টীমার ইত্যাদি বিষয়ে পাকা ওস্তাদও হইতেছে—অথচ কোন বিষয়ে নিজস্ব পরিত্যাগ করিতেছে না। এদিকে ভারতবাসীরা এতদিনে স্বাধীন-ভাবে বাষ্পশকট বা বাষ্পজাহাজ তৈয়ারী করিতেও পারিল না, নিজ নায়কতায় চালাইতেও শিখিল না—অধিকন্তু রেলে জাহাজে চলিতে হইলে ভারত সন্তানকে নিজ স্বভাব ও অভ্যাস বর্জ্জন করিতে হয়। ভারতীয় স্নানাহারের নিয়ম অথবা সময় এবং মলমূত্র ত্যাগের আয়োজন জলাঞ্জলি না দিলে ভারতবর্ষে চলাফেরা করা অসম্ভব। কাজেই ষ্টীম-এঞ্জিন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে assimilated বা অঙ্গীকৃত হইবে কেন?

আওমরি ষ্টেশনের বিশ্রামগৃহে কয়েকটা আলমারি দেখিলাম। এই সহরে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেগুলি এইখানে প্রদর্শিত হইতেছে। এক প্রকার বেতের বাক্স, চুপড়ী, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে স্থানীয় লোকেরা সিদ্ধহস্ত। এতদ্ব্যতীত ল্যাকারের নানা প্রকার জিনিষও এই সহরে প্রস্তুত হয়।

পাঁচ ঘণ্টা জাহাজে কাটিল। জাহাজে পাশ্চাত্য ধরণের খানাঘর আছে—কিন্তু কোন জাপানী এখানে আহার করিল না।

জাহাজের রন্ধনালয়ে জাপানী খাদ্যই প্রস্তুত হইতেছে—একমাত্র আমার জন্য নূতন খাদ্য প্রস্তুত হইল। কইমাছ ভাজার সঙ্গে ভাত আহার করা গেল।

জাপানীদের এইরূপ স্বাতন্ত্র্য দেখিয়া ভাবিতেছি—ইয়োরামেরিকার লোকেরা এইজন্যই জাপানের উপর বিরক্ত। পৃথিবীতে বোধ হয় জাপানই একমাত্র দেশ যেখানে পাশ্চাত্য নরনারীদিগের সুবিধার জন্য বিশেষভাবে সুবিধা সৃষ্টি করা আবশ্যক বিবেচিত হয় না। কাজেই সেই জাপানের ধ্বংস না হইলে ইয়োরামেরিকা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে কি? যাহারা দুনিয়ার সর্ব্বত্র হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতার ন্যায় বিচরণ করে তাহারা জাপানে আসিয়া দেখে যে শ্বেতাঙ্গের কর্ত্তৃত্বে একটাও হোটেল নাই—রেলগাড়ীতে শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই—ওয়েটিংরুমের পায়খানায় কমোড নাই!

হাকোদাতে বন্দরে আসিয়া জাহাজ থামিল। সমুদ্রের কিনারা হইতে পাহাড় উঠিয়াছে। পাহাড়ের গাত্রে গৃহসমূহ স্তরে স্তরে সাজান। সেনাবিভাগের ভবনাদি এইখানে অবস্থিত—এইজন্য ফটোগ্রাফ লওয়া নিষিদ্ধ। রিকশতে করিয়া নগর দেখিতে বাহির হইলাম। নগর অনেকাংশে ইয়োকোহামার মত বোধ হইল। রুশভাষায় এবং রুশ অক্ষরে বহু দোকানের সাইন-বোর্ডে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। বাজারে বঙ্গদেশের সকল প্রকার শাকসব্জী এবং ফলমূল পাওয়া যায়। অতিরিক্ত কিছু না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কচু, আলু, আদা, লঙ্কা, কুমড়া, লাউ, শসা, বেগুন, কড়াইশুটি, সকরকন্দ, ভরমুজ, নাসপাতি, কলা, মূলা, লকাট ইত্যাদি সবই বাঙ্গালীর সুপরিচিত। বোধ হয় চেরিফল আমাদের পক্ষে নূতন। ট্রামও আছে, তড়িতের বাতিও আছে—কিন্তু ঘরবাড়ী সবই আমাদের পল্লীকুটীরসমূহের অনুরূপ।

হাকোদাতে হইতে ১৮০ মাইল ঘুরে স্যাপরো নগর পুরা নয় ঘণ্টার পথ। এই রেলে স্লীপিংকার অথবা ডাইনিংকার নাই। দুই ধারে পাহাড়—লোকালয় কোথাও চোখে পড়ে না। কৃষিক্ষেত্রও অতি বিরল। সর্ব্বত্র বনজঙ্গল দেখিতে পাইতেছি। খানিক পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রের কিনারা দিয়া রেল চলিল—বাম দিকে বৃক্ষাবৃত পর্ব্বত। স্থানে স্থানে কতকগুলি হ্রদ দেখিতে পাইলাম। এই সকল হ্রদ পার্ব্বত্য ঝোরার জলে গঠিত। সন্ধ্যার সময়ে গাড়ী অতিশয় রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর চলিতে লাগিল। রেলপথের চারিদিকে পর্ব্বতশৃঙ্গ। সঙ্কীর্ণ উপত্যকার উপর সঙ্কীর্ণতর রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বক্রগতি পার্ব্বত্য নদী ঝর ঝর বহিয়া যাইতেছে। নিবিড় বনের উপর ক্ষীণচন্দ্রের কিরণ এক অপূর্ব্ব আলোক বিকীরণ করিতেছে। ঝরণার শব্দের সঙ্গে আওয়াজ মিশাইয়া গাড়ী গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। জনপ্রাণী জীবজন্তুর সাড়া শব্দ কোথাও নাই।

একটা ষ্টেসনে কিছু দুধ পান করা গেল। জাপানে দুধ পাওয়া একটা সৌভাগ্য বিশেষ। জাপানীরা দিনে অন্ততঃ ৫০ বার চা পান করে—কিন্তু দুধ কখনও চোখে দেখে না। খানিক পরে একটা বড় ষ্টেসনে আসিলাম। নাম ওতারো। উহা একটা সমুদ্রবন্দর।

ষ্টেসনের ফেরিওয়ালাদের ডাক শুনিয়া মনে হয় যেন ভারতীয় রেলে ভ্রমণ করিতেছি।

রাত্রি বারটার সময়ে স্যাপরো পৌঁছিলাম। ষ্টেসনে অধ্যাপক স্যাতোর পুত্র আসিয়াছিলেন। ইনি এই বৎসর এখানকার কৃষিমহাবিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ইংরাজী বেশ বলেন। শুনিলাম এখানকার প্রায় সকল অধ্যাপকই ইংরাজী ও জার্ম্মাণ জানেন। অধ্যাপক সংখ্যা প্রায় একশত।

স্যাতো জাপানের একজন নামজাদা লোক—স্যাপ্পারোর মহাবিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন। এক্ষণে পরিচালক ও অধ্যক্ষ হইয়াছেন। ইনি পাঁচ বৎসর জার্ম্মানিতে ছিলেন—ইংলণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি ভ্রমণও হইয়াছে। গত বৎসর যখন বিলাতে ছিলাম তখন ইনি আমেরিকায় বর্ত্তমান জাপান সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন।

দাতেবংশীয় প্রথম ডাইমো

ইয়াঙ্কিস্থানের ধনকুবের কার্ণেগির হুকুমে একটা শান্তি-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। সেই পরিষদের আয়োজনে জাপানের ধুরন্ধরগণ আমেরিকায় বক্তৃতা করিতে যান এবং আমেরিকার নামজাদা লোকেরা জাপানে বক্তৃতা করিতে আসেন। গত বৎসর স্যাতো পালা ছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসর "কুশিডো"-লেখক নিতোবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। স্যাতো স্যাপ্পরো বিদ্যালয়ে কৃষিবিষয়ক ধন-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

ভাবিয়াছিলাম টোকিও হইতে বহু উত্তরে আসিতেছি—বোধ হয় শীত পড়িবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কলিকাতা হইতে দক্ষিণ ইতালী ও দক্ষিণ স্পেন ইত্যাদি দেশ যত উত্তরে হোক্কাইদো দ্বীপ মাত্র তত উত্তরে। কাজেই যদিও টোকিওতে আজকাল Dog Days চলিতেছে, এবং সকলের মুখেই "একি গ্রীষ্ম ভাই প্রাণ আই ঢাই, ঠাঁই নাহি পাই কোথায় জুড়াই" শুনিয়াছি, স্যাপ্পরোতে পৌঁছিয়া আমাদের দেশী বসন্তের মলয় মারুৎ পাইলাম। ধূলা উড়িতেছে। রাস্তায় বাহির হইবামাত্র যুবক স্যাতো বলিলেন—"স্যাপ্পরোর রাস্তাগুলি সবই এইরূপ প্রশস্ত। আমেরিকার অনুকরণে এই নগর গঠিত হইয়াছে। সোজা সমান্তরাল ভাবে দুইদিক হইতে পথ নির্ম্মিত দেখিতে পাইবেন।"

একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম—ইহা জাপানীদের স্বদেশী সরাই। তবে বিদেশীয় পর্য্যটকগণের জন্য পাশ্চাত্য ধরণের কয়েকটা কামরা আছে।

সরকারী পশুশালা

প্রবেশদ্বারে জুতা রাখিয়া যথানির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এক জোড়া চটি জুতা নীচ হইতেই পাওয়া গেল।

সকালে উঠিয়া দেখি—সেবিকারা জাপানী ধরণের গৃহসমূহ হইতে বিছানাগুলি বাহির করিয়া আনিতেছে। দিবাভাগে গৃহের মধ্যে বিছানা রাখিবার নিয়ম নাই। আমার ঘরে কোনরূপ নূতন চড়ন হইল না। কিন্তু পায়খানা সেই ভারতবর্ষের খাস জিনিষ।

আমরা বাহির হইতে শুনিতে পাই জাপানীরা ৪০।৫০ বৎসরের ভিতর অভাবনীয় রূপে সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। এই বিস্ময়জনক রূপান্তর পরিগ্রহ সত্য ভাবে বুঝিতে হইলে একবার জাপানে আসা আবশ্যক। আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়া জাপানীদের পোর্ট আর্থার-কীর্ত্তি মাত্র বুঝিয়াছি। বস্তুতঃ পোর্ট-আর্থার ইহাদের অন্যতম কীর্ত্তিমাত্র। জীবনের কোন বিভাগ নাই যাহাতে জাপানীরা যুগান্তর প্রবর্ত্তন করে নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীর ভিতর দেশটার চেহারাই বদলাইয়া গিয়াছে। এমন কি জীবজন্তু, শাকসব্জী ইত্যাদির বৃত্তান্ত অবগত হইলেও বুঝিতে পারি যে জাপানের যুগান্তর সত্য-সত্যই বিস্ময়জনক ও অদ্ভুত।

হোক্কাইদো দ্বীপের কথা ধরা যাউক। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে মাত্র আদিম আইনোদিগের বসতি ছিল—আজ রেলপথে যে সকল বনজঙ্গল দেখিতেছি তাহার দশগুণ দুর্গম কানন ছিল—আর পশুর মধ্যে ছিল টাট্টুঘোড়া এবং কুকুর। আজ এখানে ১৫ লক্ষ সভ্য শিক্ষিত জাপানীর বাস। গোমহিষ বলদ, অশ্ব, মেষ, শূকর, খরগোশ, বিড়াল, মুরগী, হাঁস, তিত্তির, ঘুঘু ইত্যাদি জানোয়ারের বংশ বিশেষ সমৃদ্ধ হইতেছে। এদিকে গোধূম, যব, আলু, ধান, লবঙ্গ, তুটা, নাশপাতি, আপেল, চেরি, আঙ্গুর, ট্রবেরি, কপি, পেঁয়াজ, কড়াইশুটি, মটর, শিম, কুমড়া, টোমাটো, য়্যাস্পারেগাস ইত্যাদিতে হোক্কাইদো আজকাল "সকল দেশের সেরা।" হোক্কাইদোর অধিকাংশ ভূখণ্ডই পতিত রহিয়াছে। দেশটার বাহ্য আকৃতি বদলাইয়া যায় নাই কি?

হোটেল হইতে সরকারী পশুশালা বহুদূরে। ইহার কর্ত্তা গাড়ী পাঠাইলেন। ধূলা, হাওয়া ও গরম ভোগ করিতে করিতে যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে চাষ আবাদও হয় কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্য পশুগণের খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এগুলি বাজারে বিক্রয় করা হয় না। অভ্যর্থনা-গৃহে এখানকার সকল দ্রব্য প্রদর্শিত দেখিলাম।

একপ্রকার গোধূমের পরম রস পান করিতে করিতে দুগ্ধ বিভাগের ওস্তাদের সঙ্গে

খানিকক্ষণ গল্প করা গেল। ইনি উইস্ কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন—পুত্রে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিলেন। এই পশুশালার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন ওস্তাদ নিযুক্ত। ওস্তাদের সংখ্যা ছয় জন। ইহাদের কর্ত্তা ও পরিচালক একজন। ইনি কয়েকবার ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গাভী, বলদ, মেষ ইত্যাদি ক্রয় করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

জাপানে মেষ ছিল না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে তিন জোড়া, স্পেন হইতে তিন জোড়া এবং বিলাত হইতে তিন জোড়া মেষ আমদানী করা হয়। মেষ পালন এখনও জাপানী সমাজে দাঁড়াইয়া যায় নাই। গবর্মেণ্ট ইহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখনও যথেষ্ট অর্থব্যয়ে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিতেছেন। সাপ্পরোর এই পশুশালায় সম্প্রতি প্রায় ১৩০ মেষ রক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমানে বৎসরে একবার করিয়া মেষের লোম কাটা হয়। পশমের কাটাই বাছাই বুনাই ইত্যাদি জাপানীরা জানে না। তাহা শিখাইবার জন্য গবর্মেণ্ট এই পশুশালায় ক্ষুদ্রভাবে আয়োজন করিয়াছেন। জাপানে পশমের বস্ত্র তৈয়ারি করিবার জন্য কয়েকটা ফ্যাক্টরি আছে—ফ্যাক্টরির মালিকেরা অষ্ট্রেলিয়া ও বিলাতের পশম আমদানি করে। জাপানের ভিতর মেষ পালন এবং পশম ব্যবসায় সুপ্রচলিত হইলে এই কাঁচা মালের জন্য জাপানকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। নিজ পায়ে দাঁড়াইবার জন্য গবর্মেণ্ট ৪০ বৎসর হইতে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ফল পরীক্ষায় নিযুক্ত। এই নীতি প্রয়োগ করার ফলেই অল্পকালের ভিতর জাপানের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে।

জাপানে আসিয়া অবধি দেখিতেছি দুধ অতি বিরল। মাত্র অল্পদিন হইল জাপানীরা দুধ মাখন ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। কাজেই গাইড একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আপনারা ভারতবর্ষে ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে মাখন খাইতেন কি?" উত্তর দিলাম—'আজন্মকাল আমরা জানি 'আঘৃতৈ' ঘৃতম্।'

জাপানে গোপালন বিদ্যাও অনেকটা নূতন—গোপালন ব্যবসায়ও অনেকটা নূতন। হোকাইদো দ্বীপ সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবেই খাটে। এদেশে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ার হল্‌ষ্টাইণ জেলা, সুইজর্ল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ইত্যাদি দেশ হইতে গোবলদ আমদানি করা হইয়া থাকে। ঘোড়ার আমদানিও আমেরিকা হইতে হয়। যেখানে যে জীব ভাল পাওয়া যায় জাপানীরা সেইখান হইতে সেই সমুদয় জীব আমদানি করিতে সুপটু। এইরূপেই দেশের শ্রী বদলাইয়া যায়।

সাপ্পরোর পশুশালায় প্রায় ২৭০টি বিদেশীয় গোবলদ আছে। প্রত্যেক গাভী প্রতিদিন প্রায় আধ মণ করিয়া দুধ দেয়। বলদগুলি মাঝে মাঝে বিভিন্ন জেলায় চালান করা হয়। এই উপায়ে জাপানী গোজাতির বংশোন্নতি সাধিত হইতেছে।

গোশালা, মেষশালা, দুগ্ধশালা ইত্যাদি দেখিলাম। শীতকালে পশুখাদ্যের অনটন সকল দেশেই হইয়া থাকে। তখন ভারতবর্ষে শুকনা ঘাস ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইয়াঙ্কিরা বর্ষার ঘাস বহুকাল পর্য্যন্ত তাজা রাখিবার জন্য এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটা বায়ুহীন স্থানে এইগুলি পুঞ্জীকৃত করা হয়। পরে আবশ্যকমত এইগুলি বাহির করা চলে। জাপানীরাও সেই কৌশল প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

জাপানীরা দুধ দুহিবার সময়ে বাছুরকে দিয়া গাভীর বাঁট চাটায় না। গোয়ালা স্তনে হাত বুলাইয়া দুধ বাহির করে। জাপানীরা আমেরিকার রীতি অনুসরণ করিতেছে। দুগ্ধশালায় দেখিলাম দুধ বাষ্পে গরম করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাজা রাখা হইতেছে। কলে মাখন প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে cream বা দুগ্ধসার তৈয়ারি করা হইয়া থাকে—পরে দুগ্ধসার হইতে মাখন তৈয়ারি হয়। ১০০ ভাগ সাধারণ দুধ হইতে ১০ ভাগ মাত্র দুগ্ধসার পাওয়া যায়। আবার ১০০ ভাগ দুগ্ধসার হইতে ২৮ ভাগ মাখন প্রস্তুত হইতে পারে। দুগ্ধসার বাহির করিয়া লইলে দুধের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে Condensed Milk বা ঘনীভূত দুধ, Milk

powder বা দুধের গুঁড়া, cheese বা পনির ইত্যাদি তৈয়ারি করা যায়। কিন্তু জাপানের এই পশুশালার কর্তৃপক্ষীয়েরা তাহা করেন না। দেখিলাম গোপালকেরা বাছুরগুলিকে সেই অবশিষ্টাংশ পান করাইতেছে। খাঁটি গোদুগ্ধ হইতে পনির এবং ঘনীভূত দুগ্ধ তৈয়ারি হইতেছে দেখা গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এবারকার প্যানামা-প্রদর্শনীতে এক প্রকার নূতন ঘনীভূত দুগ্ধ প্রদর্শিত হইতেছে। তাহার সংবাদ রাখেন কি?" দুগ্ধশালার ওস্তাদ বলিলেন—"আমরা সুইস্‌প্রণালী অনুসারে Condensed milk প্রস্তুত করিয়া থাকি। এই দুধের সঙ্গে চিনি মিশ্রিত হয়। এই জন্য দুধ আঠাল বোধ হয়। এবার একজন আমেরিকান যাহা উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা evaporated milk. ইহাতে চিনি মিশ্রিত করা হয় না। কেবল মাত্র দুধের জলীয় অংশ বাষ্পরূপে বিতাড়িত করা হয়। এই দুধ আমি দেখিয়া আসিয়াছি—জাপানে এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।"

এই পশুশালার জন্য গবর্মেণ্টের বার্ষিক খরচ হয় ৭৫০০০৲। নানা বিভাগের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আমদানি হয় ৩৫০০০৲।

ঘোড়ার জন্য অনেকগুলি স্বতন্ত্র পশুশালা আছে। সেনাবিভাগের জন্য এবং কৃষিকার্য্যের জন্য এই সকল স্থানে উচ্চবংশীয় অশ্বের পালন বর্দ্ধন ইত্যাদি হইয়া থাকে।

হোক্কাইদোতে সর্ব্বসমেত আটটা পশুশালা আছে। এতদ্ব্যতীত জাপান সাম্রাজ্যের দ্বীপপুঞ্জে ছোটবড় সরকারী বেসরকারী বহুসংখ্যক পশুপালনের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। নূতন নূতন জীবজন্তুর আমদানি এবং পুরাতন পশুজাতির বংশোন্নতি জাপানে যেরূপ দ্রুত চলিয়াছে তাহাতেই জাপানী যুগান্তরের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিল কে? স্বদেশী আন্দোলনের স্থাপয়িতা প্রজা-"সংরক্ষক" গবর্মেণ্ট।

৮। জাপানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

একটা সুবৃহৎ লিনেন ফ্যাক্টরি দেখিলাম। ১২০০ মজুর কার্য্য করে। কারখানার আয়তন বেশ বিস্তৃত। মালগুদামে রাশি রাশি সূতা, কাম্বিশ, চট, ইত্যাদি মজুত করা রহিয়াছে। গবর্মেণ্টের অর্ণব-যান-বিভাগের জন্য এইখানে মাল তৈয়ারী হয়। সেদিন নিক্কো হইতে আসিবার পথে কারখানাতে যাহা দেখিয়াছি এখানেও তাহার বড় আকারে দেখিলাম। সূতা প্রস্তুত করা হইতে চট, তোয়ালে, জিন, কাম্বিশ ইত্যাদি তাঁত করা পর্য্যন্ত সবই কলে হইতেছে। তুলা, পশম, পাট, লিনেন ইত্যাদি সকল কারখানাতেই প্রায় একধরণের যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং একটা বয়ন-ফ্যাক্টরী দেখিলে সকল বয়ন কারখানার আসবাব পত্র ও পরিচালনা দেখা হয়। এই কোম্পানীর তিশি-ক্ষেত্র আছে। সেখানে তিশিগাছ জলে পচাইয়া সূতা প্রস্তুত করিবার যোগ্য করা হইয়া থাকে। পাট পচান আর তিশি গাছ পচান এক ধরনেই নিষ্পন্ন হয়।

জাপানের সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক বাতি দেখিতেছি কিন্তু বিদ্যুত চালিত ট্রাম দেখিতেছি না। ট্রামগাড়িগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র—একটা ঘোড়ার দ্বারা টানা হয়।

ঘরে বসিয়া হোক্কাইদোর উদ্ভিদ্‌রাজ্য সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ কতকগুলি ছুই পটকা ও বন্দুকের আওয়াজ শুনিলাম। বারান্দা হইতে দেখি রাস্তায় বহুলোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে হোটেলের ঝি চাকরেরা ঘরের বাহিরে দৌড়িয়া গেল। রাস্তায় নামিয়া আসিলাম। দেখিতেছি একটা শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। ব্যাণ্ড বাজিতেছে—তাহার পশ্চাতে প্রায় ২০০ রিক্‌শ চলিতেছে—কোনটাতে পুরুষ কোনটাতে রমণী বসিয়া আছে। সংবাদ পাওয়া গেল—টোকিও হইতে ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের অভিনেতৃদল স্যামোরোতে কয়েকটা পালা অভিনয় করিবার জন্য আসিয়াছে। আজকার গাড়ীতে ইহারা পৌঁছিয়াছে। সহরময় এই সংবাদ প্রচার করিবার জন্য এই মিছিলের আয়োজন। বড় সহর হইতে মফঃস্বলে নামজাদা লোক জন আসিলে নাকি জাপানীরা এইরূপ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে, যেমন কোন ঋতুতে দার্জ্জিলিঙ্গ শিমলা নৈনিতাল, কোন ঋতুতে

মধুপুর দেওঘর পুরী ইত্যাদি যাইবার রেওয়াজ আছে জাপানে সেইরূপ গ্রীষ্মকালে লোকেরা স্যাল্পরোতে আসে। এক্ষণে এই সহরে পর্য্যটক আগমনের "যোগ" পড়িয়াছে সহরের প্রত্যেক সরাইয়েই বহুলোক আশ্রয় লইয়াছেন শুনিতে পাই।

মাৎসুশিমা হইতে আসিবার সময়ে যাহাদের দুইটি বালকের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। উহারা "ব্যাঙ্ক অফ্ জাপানে"র গবর্ণর শ্রীযুক্ত ডাইকাউন্ট মিশিমার পুত্র। টোকিওতে সম্ভ্রান্ত ধনীবংশীয় সন্তানগণের জন্য Peers' School আছে। ইহারা সেই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। ইংরাজি বলিতে পারে মন্দ নয়। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম গ্রীষ্মাবকাশে ইহারা চোকাইদো বেড়াইতে আসিয়াছে। সঙ্গে একজন অভিভাবক আছেন। আমাদের হোটেলেই ইহারা অতিথি হইল। বাহিরে যাইবার সময় কাপড় চোপড় পাশ্চাত্য ধরণের থাকে—কিন্তু সদাসর্ব্বদা জাপানী পোষাকেই ইহাদিগকে দেখিতেছি।

ইয়োরামেরিকার লোকেরা জাপানীদিগকে আফিসী পোষাকে দেখিয়া ভাবে যে জাপান পুরাপুরি পাশ্চাত্য জীবন অবলম্বন করিয়াছে। সত্য কথা জাপানীরা স্বদেশী কোন জিনিসই বিন্দুমাত্র ছাড়ে নাই। আমাদের দেশে উকিল, হাকিম, মাষ্টার, কেরাণী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার সময়ে কোট প্যাণ্ট চাপকান ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এইমাত্র দেখিয়া বিদেশীয়েরা যদি ভাবেন যে ভারতবর্ষ Occidentalised হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে ভারতবর্ষকে তাঁহারা যতটুকু বুঝিবেন তাঁহারা জাপানকে মাত্র ততটুকুই বুঝিয়াছেন।

এখানকার বোটানিক্যাল উদ্যানের ভিতর একটা মিউজিয়াম আছে। পক্ষীকুলের সংগ্রহ মন্দ নয়। জাপানের আদিম নিবাসী আইনোদিগের পোষাক পরিচ্ছদ, অস্ত্র শস্ত্র, ভল্লুক-পূজা, কৃষিশিল্প ইত্যাদি বিষয়ক নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। অল্প সংখ্যক আইনো আজকাল হোকাইদোর এক নিভৃত পল্লীতে বাস করিতেছে। অতদূর যাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

জাপানীদের স্বভাব চরিত্র অতিশয় মধুর। উচ্চ মধ্যম নিম্ন নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিলাম—প্রত্যেককে নম্র ও বিনীত দেখিতেছি। পূর্ব্বে ভাবিয়া ছিলাম—"কাইজার পাওয়ারে"র নরনারীগণ অহঙ্কারী হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই জাপানীদের ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেছি। বলা বাহুল্য যথেষ্ট বিস্মিতও হইলাম।

আগে ভাবিতাম জাপানীরা হাসে না—সর্ব্বদা মুখ লম্বা করিয়া বেরসিক ভাবে চলা ফেরা করে। অথচ জাপানে পদার্পণ করার পর হইতে দেখিতেছি এমন হাস্যপ্রিয় মধুরভাষী সুরসিক লোকজন খুব কমই আছে। ইহাদের ভাষা বুঝিতেছি না—তথাপি ইহাদিগকে আপনার মনে হইতেছে। ইহারা পরকে অতি শীঘ্র আপনার করিয়া লইতে পারে। শ্বেতাঙ্গ ইয়োরামেরিকানেরা জাপানে এতটা আত্মীয়তা ও সৌহার্দ্দ্য অনুভব করে কি না জানি না।

আমি ত দেখিতেছি জাপান ভারতবর্ষেরই যেন অন্যতম প্রদেশমাত্র। বাঙ্গালী মারাঠার ভাষা বুঝে না—তথাপি মারাঠাকে সকল বিষয়েই নিজের লোক বলিয়াই জানে। পুণার রাস্তায় দাঁড়াইয়া মারাঠীভাষী নরনারীকে যেরূপ দেখিতাম টোকিও নিক্কোমাৎসুশিমা-স্যাল্পরোর রাস্তায় হোটেলে বাজারে জাপানী নরনারীকে দেখিয়া ঠিক সেইরূপ ভাবই মনে জাগিতেছে। ভাষার প্রভেদ সত্ত্বেও এশিয়ার হৃদয়ে ঐক্য অতি গূঢ়ভাবে রহিয়াছে। জাপানে এ কথাটা সত্যভাবে বুঝিলাম।

আদবকায়দা সৌজন্য শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে আমরা মুসলমান জাতিকে জগৎপ্রসিদ্ধ বলিয়া জানি। জাপানীদের শিষ্টাচারের রীতি দেখিয়াও মুগ্ধ হইতেছি। পাশ্চাত্য লোকেরা কথায় কথায় Thank you ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু এই শব্দের ভিতরে প্রাণ থাকে কি না বলা কঠিন। জাপানীরা সমস্ত শরীর ও মস্তক অবনত করিয়া অতিথির অভ্যর্থনা করে—অথচ এই বিনয়ের ভিতর বিন্দুমাত্র নীচতা ও দৈন্য প্রকাশিত হয় না। নম্রতার সঙ্গে আত্মসম্মানের সংযোগ

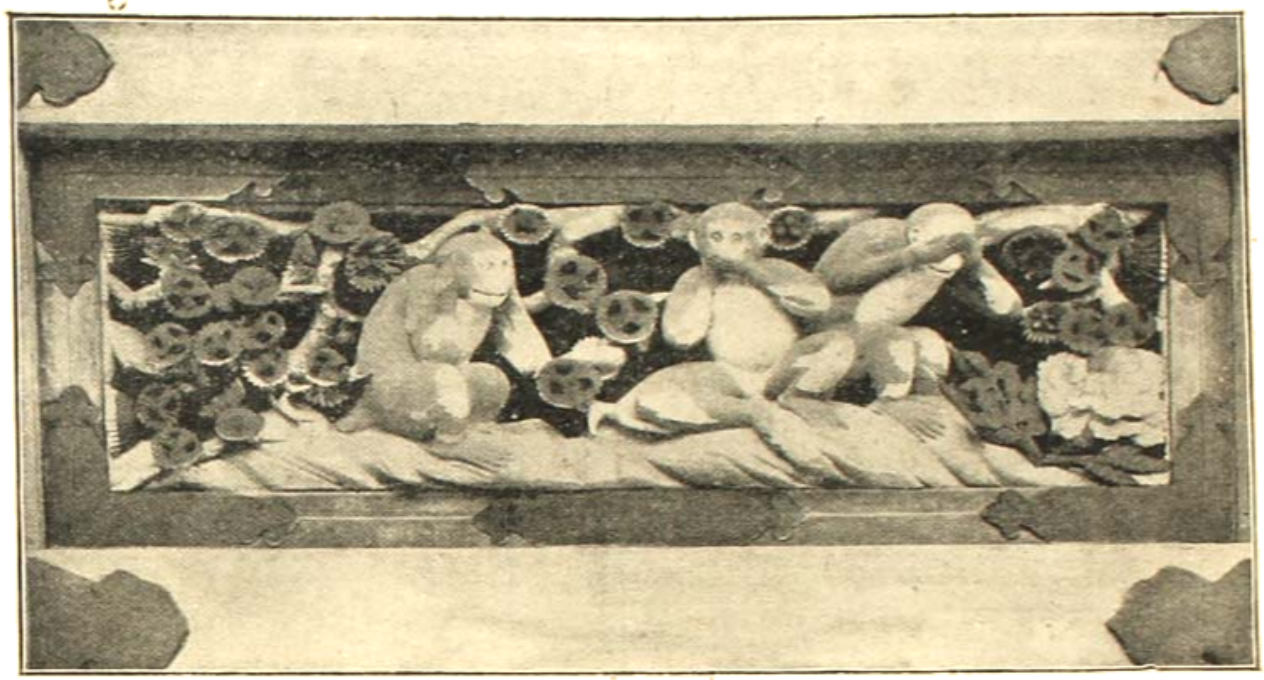

বানর-ত্রয়

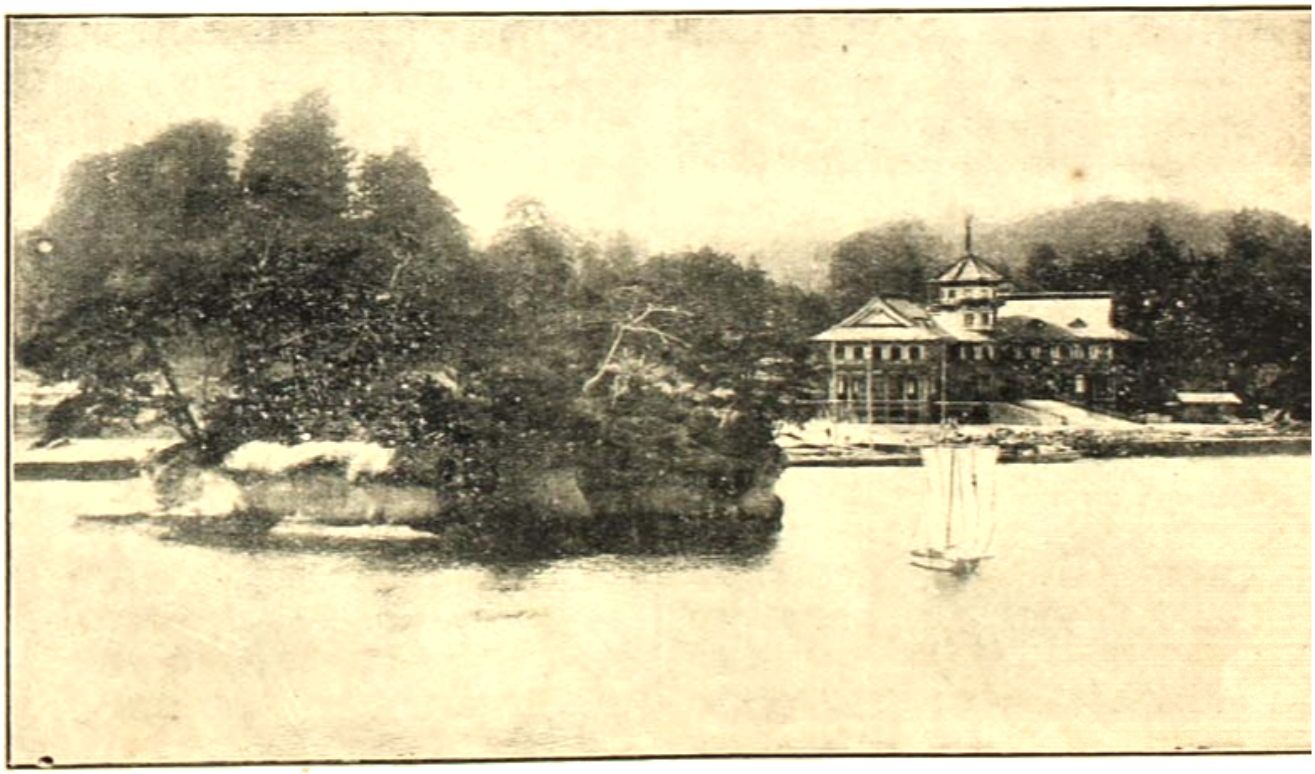

মাৎস্যাসমাষ পার্কহোটেল

জাপানী চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। ইহা বর্ত্তমান "মেজি-যুগের" নূতন সৃষ্টি নয়—তাহার বর্ষব্যাপী এশিয়াটিক সংস্কারের ও অভ্যাসের ফল।

৯। স্যাপ্পরোর কৃষি-মহাবিদ্যালয়

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিস্থানের মধ্য-পশ্চিম এবং মধ্য পশ্চিম প্রদেশে জনপদ ও নগর স্থাপিত হইতেছিল প্রায় সেই সময়েই হোক্কাইদো দ্বীপে নব্য জাপানী উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মেজি-যুগ প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র জাপানের সকল নূতন নূতন কর্ম্মপ্রণালী আরব্ধ হয়। হোক্কাইদো দ্বীপের উন্নতি বিধানের জন্যও মিকাডো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন। আজ এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই গবর্মেণ্ট-প্রবর্ত্তিত সেই স্বতন্ত্র আয়োজনের ফল।

সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিলে কত কম সময়ে কত বেশী কাজ হইতে পারে তাহা বুঝিবার জন্য জাপানে আসা আবশ্যক। আবার জাপানের মধ্যে হোক্কাইদো দ্বীপও তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

সম্রাট্ প্রথমে এখানে একজন শাসনকর্ত্তা পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন এদেশ অতিশয় উর্ব্বর এবং ধাতুর আধার। কিন্তু কৃষিকার্য্য, পশুপালন অথবা আকর-খনন ইত্যাদি কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত লোকের অভাব। স্থানীয় লোকের দ্বারা এই সব করান অসম্ভব—অধিকন্তু জাপানের প্রধান দ্বীপেও তখন এই ধরণের লোক পাওয়া যাইত না। কাজেই শাসনকর্ত্তা বিদেশের শরণাপন্ন হইলেন। জাপানীরা সেই সময়ে ইয়াঙ্কিস্থানকে প্রধান গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। বিশেষতঃ তখন সেদেশেও নব নব জনপদ গঠনের যুগ চলিতেছিল। এই জন্য হোক্কাইদোর শাসনকর্ত্তা উপনিবেশ স্থাপনের প্রণালী বুঝিবার জন্য আমেরিকা গমন করিলেন। ফিরিবার সময়ে কয়েকজন ইয়াঙ্কি ওস্তাদ সঙ্গে লইয়া আসিলেন। দশ বৎসরের ভিতরে এইরূপে প্রায় ৭০ জন বিদেশীয় ওস্তাদ হোক্কাইদোতে আগমন করেন। আমেরিকা, রুশ, ফরাসী, ইংরাজ, ইয়াঙ্কি সকল জাতি হইতেই বিশেষজ্ঞের আমদানি হইয়াছে।

এই সকল ওস্তাদ হোক্কাইদোতে জাপানী উপনিবেশ গঠনের পথ উন্মুক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রধান ও প্রথম কার্য্য হইল বিদ্যালয় স্থাপন। এই বিদ্যালয়ে নূতন দেশে বসতি প্রতিষ্ঠা এবং কৃষি খনন ও কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিকতম জ্ঞান প্রচারিত হইতে থাকিল। বিশটি ছাত্র এবং একজন ইয়াঙ্কি অধ্যাপক লইয়া এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। আজ এখানে বিরাট মহাবিদ্যালয় দেখিতেছি—৯০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, সহকারী ও কর্ম্মচারী লইয়া একশত অধ্যাপক আছেন—ইঁহাদের মধ্যে মাত্র একজন বিদেশীয়। উদ্ভিদ্, ধাতু এবং জীবজন্তু সম্বন্ধে সকল প্রকার কার্য্যকরী বিদ্যার আলোচনা এইখানে হইয়া থাকে। এখানকার অধ্যাপকগণ দুনিয়ার বিজ্ঞানমহলে সুপরিচিত। আমরা জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্ল চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়া যত বড়াই করিয়া থাকি সেইরূপ বড়াই অনেক বিজ্ঞানবীর সম্বন্ধে স্যাপ্পরোবাসিগণ করিতে অধিকারী।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মিয়াবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার আসা গ্রে (Asa Gray) র ছাত্রছিলেন। স্যাপ্পরোতে কর্ম্মগ্রহণ করিবার পর হইতে নানা স্বাধীন গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ল্যাবরেটরিতে ইঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। সম্প্রতি ইনি যে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহার উপকরণগুলি দেখিলাম। হোক্কাইদো দ্বীপের উদ্ভিদ্‌সমূহ বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিবৃত হইতেছে। Hooker প্রণীত Flora of India যেরূপ মিয়াবে প্রণীত গ্রন্থও সেইরূপ হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"উদ্ভিদের যে সমুদয় নমুনা দেখিতেছি সেগুলি সবই কি আপনি একাকী সংগ্রহ করিয়াছেন?" বৈজ্ঞানিক বলিলেন—"আমার মত আরও ২০।২২ জন সংগ্রাহকের সমবেত চেষ্টার ফল এইখানে সঞ্চিত হইয়াছে। ২৫ বৎসর হইতে এই সংগ্রহকার্য্য চলিতেছে। কোন কোন উপকরণ বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সংগ্রহ হইতে বিনিময়ে পাইয়াছি।"

কৃষি মহাবিদ্যালয়ের পাঠাগারে ইংরাজী,

জার্ম্মাণ, ফরাসী এবং জাপানী সকল প্রকার গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে। লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত তাকাওকা জার্ম্মাণ ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি জাপানী ও জার্ম্মাণ দুই ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন—ইংরাজীতেও কথা বলেন। ইনি বলিলেন—"আমাদের ছাত্রেরা প্রত্যেকে ইংরাজী, জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা শিখিয়া থাকে—তিন ভাষাতেই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকে। অধ্যাপকগণ একমাত্র জাপানী ভাষায় বক্তৃতা করেন।" তাকাওকা Agricultural Economics বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। ইনি লাইব্রেরীতে রক্ষিত ইয়োরামেরিকার পত্রিকাসমূহ দেখাইলেন। একমাত্র ধনবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিদ্যাসমূহ আলোচনা করিবার জন্য জাপানী পত্রিকাও আছে। আমেরিকান, ইংরাজ, জার্ম্মাণ ও ফরাসী পণ্ডিতগণের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রায় সবই জাপানীতে অনূদিত হইয়াছে। এখানকার লাইব্রেরী আমেরিকার প্রণালীতে সাজান। তাকাওকার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কৃষিক্ষেত্র ও পাশুশালাগুলি দেখিলাম।

অধ্যাপক ত্যাতো কয়েক বৎসর হইতে এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। ইনি বলিলেন—"বার্ষিক ১।০ লক্ষ টাকা অধ্যাপকগণের বেতনাদিতে খরচ হয়। আর দেড় লক্ষ টাকা বিদ্যালয়ের সম্পর্কিত পশু শালা ও কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদিতে খরচ হয়। খরচের অর্দ্ধাংশ গবর্মেণ্ট হইতে পাওয়া যায়, অপরার্দ্ধ আবার হইতে আসে।"

বর্ত্তমানযুগে দুনিয়ার লোকেরা যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিতেছে সেই সকল সমস্যার আলোচনায় যে জাতি যোগ দিতে পারিবে তাহাকেই বর্ত্তমান যুগের জাতি বলা যাইতে পারে, আর যে পারিবে না তাহাকে আধুনিক পদবাচ্য করা চলে না। এই হিসাবে ভারতবাসীকে আধুনিক বা বর্ত্তমান যুগের জীব বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। ত্রিশ কোটি নরনারীর মধ্যে আমরা কয় হাজার বা কয়শত বা কয় ডজন বা কয়গণ্ডা লোকের নাম করিতে পারি যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের কর্ম্ম প্রবাহে ও চিন্তাপ্রবাহে গা ঢালিয়াছেন? কয়জন ভারতবাসীর চিন্তা ও কর্ম্মের সংবাদ লইয়া জগতের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অগ্রসর হন? বস্তুতঃ ভারতবর্ষ নামক একটা দেশ আছে কি না তাহা জানা না থাকিলেও বর্ত্তমান বিজ্ঞানবীরগণের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু জাপান সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। জাপানের লোকেরা বর্ত্তমান যুগের সকল আন্দোলনেই যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত সত্যগুলির তালিকা করিলে বেশ বুঝিতে পারি যে, নব্য জাপান বর্ত্তমান জগতেরই একটা দেশ। অবশ্য জাপানের আবিষ্কারসমূহ বিজ্ঞান-সংসারের বিশ্লবসাধন করিবার উপযুক্ত কি না জানি না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, এখানকার অনুসন্ধানকারিগণ যেসমুদয় গবেষণা করিতেছেন সেগুলি দুনিয়ার অন্যান্য গবেষণাকারিগণ একবার খতাইয়া দেখিতে চেষ্টা করেন। জাপানীরা সত্য সত্যই আধুনিক বিজ্ঞান-মণ্ডলের অধিবাসী—ভারতবর্ষের লোক সেই উচ্চ অধিকার কবে লাভ করিবে?

বর্ত্তমান যুগের জীব হওয়া কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার জন্য একজন জাপানী বৈজ্ঞানিকের একটা প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। টোকিও ইম্পিরিয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the College of Science পত্রিকায় A study of the Geniculae of Corallineae রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক এই আলোচনার ইতিহাস জ্ঞাপন করিতেছেন। ইয়োরামেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার সঙ্গে জাপানী অনুসন্ধানকারীর যোগ কোথায় এই উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

As far as the present writer's observation extends, the literature relating to the subject in question is comparatively scarce. Nelson and Duncan jointly tried some investigations into the histology of the calcarasus algae and left a valuable paper. Solus treated somewhat the same subject and wrote a few lines about the

formation of the genicula in the *Corallinae*, and pointed out the difference between *Amphiroa* and *Corallina* in the structure of genicula. Heydrich noticed the critical points of the primary incrustation of *Corallina* and *Lithothamnion*. He took *Corallina officinalis L.*, as the representative of the *Corallinae* and mentioned the genicular formation as an important diverging point of the two subfamilies.

The writer previously noticed several interesting facts about the genicula of the *Corallina* while he was examining material from Japan and Canada. Some of the views arrived at a different conclusion from those of former investigators. They will be pointed out under the proper chapters."

যেদিন ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ অন্যান্য দেশীয় চিন্তাবীরগণের কর্ম্মসূত্র বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, এবং যেদিন ভারতীয় চিন্তাবীরগণের গবেষণা খতাইয়া না দেখিলে জগতের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ অসম্পূর্ণ থাকিবেন সেই দিন বুঝিব ভারতবর্ষ বর্ত্তমান জগতের দেশ। সেদিন কবে আসিবে? জাপানে সেই দিনের আবির্ভাব হইতে মাত্র ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছে। সেই দিন আনিবার একমাত্র উপায়—"সংরক্ষণনীতির" প্রয়োগ।

১০। মৎস্যবিজ্ঞান ও সামুদ্রিক উদ্ভিদের চাষ

সাধারণ জাপানী পরিবারে মাংস খাওয়ার অভ্যাস এখনও বিশেষ প্রবল নয়। যাহারা মাংস খায় তাহারা পাখী পর্য্যন্ত উঠে। শোয়ুকরাদি নিতান্ত নব্য ইয়োরামেরিকা-প্রত্যাগত পরিবারে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে খাওয়া খাওয়া সম্বন্ধে জাপানীরা বাঙ্গালীর অনুরূপ। তবে কাঁচা মাছ খাইবার রেওয়াজ বঙ্গদেশে নাই—এই যা প্রভেদ। মাছের ঝোল, মাছ ভাজা, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি দুই সমাজেরই সমান প্রিয়। একটা মজার কথা দেখিতেছি যে বাঙ্গালীদের মত জাপানীরাও কই মাছের অত্যন্ত ভক্ত। বড় বড় মহোৎসব ব্যাপারে নাকি কই মাছের আয়োজন না থাকিলে ষোলকলা পূর্ণ হয় না।

জাপানে আসিয়া অবধি একটা নূতন খাদ্য দ্রব্যের পরিচয় পাইতেছি। তাহার নাম Sea-weeds বা সামুদ্রিক উদ্ভিদ্। বাজারে এই উদ্ভিদের বিক্রয় যৎপরোনাস্তি দেখিতেছি। দোকানে শুষ্ক আকারে এই উদ্ভিদের বিক্রয় প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। জাপানের স্বদেশী হোটেলে বা সরাইয়ে এবং মিঠাইয়ের দোকানে Sea-weeds এর প্রস্তুত নানা দ্রব্য পাওয়া যায়। ইয়োরামেরিকার কোথাও এই উদ্ভিদের এরূপ ব্যবহার বোধ হয় নাই। জাপানীরা এই বস্তু খাইতে খুব ভালবাসে—ঝোলে ঝালে অম্বলে মিষ্টান্নে প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যেই ইহার প্রয়োগ হয়। অধিকন্তু এই উদ্ভিদের ব্যবসায় হইতে জাপানে বহুল পরিমাণে টাকা উৎপন্ন হয়। চীনারা জাপানীদের মতই এই উদ্ভিদের ব্যবহার করিয়া থাকে—জাপান হইতে তাহারা এইগুলি মণে মণে আমদানি করে।

আমেরো কলেজে দেখিতেছি—সামুদ্রিক উদ্ভিদ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার করিবার জন্য একজন অধ্যাপক স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম য়েণ্ডো (Yendo)। সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্বন্ধে গবেষণা করা ইঁহার বিশেষত্ব—মাছ এবং উদ্ভিদ দুই প্রকার জীব ইঁহার আলোচ্য বিষয়। Marine Botany, Fishery, Sea weeds ইত্যাদি বিষয়ে য়েণ্ডো বহুকালাবধি শিক্ষকতা করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই সকল বিদ্যার নাম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শুনা যায় না।

য়েণ্ডো ইংরাজীতে বেশ কথা বলেন—জার্ম্মাণ ভাষায়ও সুপণ্ডিত। মৎস্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানা বিরাট গ্রন্থ জাপানী ভাষায় লিখিয়াছেন। ইঁহার গবেষণাসমূহ ফরাসী, ইংরাজী, আমেরিকান ইত্যাদি বিদেশীয়

বৈজ্ঞানিক পত্রে বাহির হইয়া থাকে। অন্যান্য জাপানী পণ্ডিতের ন্যায় ইনিও আমেরিকা, জার্ম্মাণি, বিলাত ইত্যাদি দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। বিশেষ কথা এই যে, যেগুলি প্রায় আড়াই বৎসর কাল নরওয়েতে ছিলেন। এইখানে সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ আলোচনা করিবার ব্যবস্থা নাকি উৎকৃষ্ট।

য়াগো বলিলেন—"জাপানীরা এই উদ্ভিদের ব্যবসায় করিয়া চীন হইতে বৎসরে ৪,৫০০,০০০১ রোজগার করে। সর্ব্বসমেত ইহার প্রায় আড়াইগুণ টাকার কারবার জাপানে চলিতেছে। কাজেই Sea-weeds আমাদের নিকট তুচ্ছ খেলানার সামগ্রী নয়।"

ইহার গৃহে একবার আলাপ হইল—স্বদেশী পোষাক আসবাব ইত্যাদিই দেখিলাম—কলেজেও একবার দেখা হইল—তখনও কিওমনো পরা দেখা গেল।

সামুদ্রিক উদ্ভিদের জন্ম, ক্রমবিকাশ ও বিস্তার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আপনাদের ব্যবসায় একদিন না একদিন বন্ধ হইয়া যাইবে না কি? কারণ উদ্ভিদ্‌সমূহের যোগান ত সমুদ্রে অফুরন্ত নয়।" য়েগো বলিলেন—"সত্যই তাহা ঘটিয়াছে। বিগত ৪০ বৎসরের ভিতর আমাদের Sea-weed ব্যবসায়ীরা অত্যধিক "ফসল" টানিয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলে সমুদ্রে ক্রমশঃ উদ্ভিদের অনটন পড়িতে থাকিল। কাজেই এই আবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক আলোচনা সুরু হইয়াছে।"

আজকাল ফলের চাষ, মাছের চাষ, ডিমের চাষ—ইত্যাদি নানাবিধ চাষের কথা শুনা যায়। কৃষিকর্ম্ম বলিলে একমাত্র ধান চাউল গম যবের আবাদই বুঝায় না। জাপানে আসিয়া মুক্তার চাষও শুনিয়াছি। য়েগোর নিকট সামুদ্রিক উদ্ভিদের আবাদও শুনিলাম। বর্ত্তমান যুগের মানব প্রাকৃতিক শক্তি ও সুযোগসমূহের দাস হইয়া থাকিতে চাহে না। পূর্ব্বেও মানবসমাজ প্রকৃতির দাস ছিল না। এই জন্যই কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে মানব-বিদ্যার যথেষ্ট প্রসার ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে—এইজন্য চাষ আবাদের ক্ষেত্রও বাড়িয়া যাইতেছে। প্রকৃতি যদি মুক্তহস্তে দান করিতে থাকেন—তাহাতে মানুষের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে না। প্রকৃতির স্বভাব অবগত হইয়া সেগুলিকে নিজ ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে কাজে লাগাইবার জন্য মানুষ নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। এই সকল উপায়, নিয়ম ও কার্য্যপ্রণালীর উদ্ভাবনই বিজ্ঞানের কার্য্য।

য়েগো বলিলেন "আমি গত বৎসর আয়র্ল্যাণ্ডে গিয়াছিলাম। সেখানে ডাবলিনের রয়্যাল সোসাইটিতে সামুদ্রিক উদ্ভিদের চাষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই। এই বক্তৃতার নাম শুনিয়াই অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। নদীর মাছ ও সমুদ্রের মাছ সম্বন্ধে যদি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ধীবরদিগকে কর্ম্মপ্রণালী শিখাইতে পারেন তাহা হইলে Sea-weeds এর "cultivation" সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না কেন?" এই সামুদ্রিক আবাদকে Mariculture বলা হইতেছে।

কয়েক বৎসর হইল সামুদ্রিক উদ্ভিদের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। জাপান গবর্ণমেণ্ট য়েগোকে বিষয়টা বুঝিবার জন্য যথাস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। য়েগো তদারক করিয়া মন্তব্য প্রচার করেন। মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, সকল সমুদ্রেই উদ্ভিদ জন্মে না। সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থিত পর্ব্বতগাত্রের প্রকৃতির উপর ইহাদের জন্ম ও ক্রমবিকাশ নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত সমুদ্রজলের গভীরতা, উষ্ণতা, তরঙ্গ, স্রোত ইত্যাদিও সামুদ্রিক উদ্ভিদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। জলের মধ্যে লবণের পরিমাণও এই জীবের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু জলের ভিতর সূর্য্যকিরণ এবং বায়ু প্রবেশ না করিলে Sea-weeds জীবিত থাকিতে পারে না। কাজেই অত্যন্ত গভীর জলপ্রদেশ সামুদ্রিক উদ্ভিদের জন্মনিকেতন হয় না।

এই সম্বন্ধে The Economic Proceedings of the Royal Dublin Society হইতে "On the Cultivation of Sea weeds with special accounts of their Ecology" প্রবন্ধের স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"How far down in the water Sea-weeds can grow is a question not easily decided. • • • Various experiments have been carried out to ascertain the limit of Sun-Light in deep water. It is estimated that at the depth of about 500 fathoms there is absolute darkness. • • • From my own experience I have found that the amount of illumination during broad day light, penetrating to a depth of 12-13 fathoms, may be compared to clear moonlight.

• • •

Each species of algæ is adapted to enjoy a certain fixed amount of light. Some algologists attribute this phenomenon to the colour of the water. But I think I can give many examples to disprove this view. • • • The light acts upon Sea-weeds something in the same way as upon landplant. In the shaded place they may grow larger in size, but weaker in texture, and mostly poor in the chlorophyll grains."

রেণ্ডো কিছুকাল বিলাতের প্রসিদ্ধ Kew Botanic Garden এ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিয়াছেন। ইনি বলিলেন—"প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান হইতে বহু উদ্ভিদের নমুনা বিলাতের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নীত হয়। আমি সেগুলি এখানে দেখিবামাত্র গবেষণা আরম্ভ করিয়া দিলাম। কতকগুলি উদ্ভিদের বিবরণে কিছু অসম্পূর্ণতা ও ভুল ছিল সেগুলি সংশোধন করিতে পারিয়াছি।"

কৃষিবিদ্যালয়ের Fishery Museum বা মৎস্য-ভবন দেখাইতে দেখাইতে রেণ্ডো বলিলেন—"মৎস্য-বিজ্ঞান প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—এই তিন বিভাগের সংগৃহীত বস্তু এই প্রদর্শনী গৃহে রহিয়াছে। প্রথম বিভাগের নাম মাছ ধরা, দ্বিতীয় বিভাগের নাম মৎস্য-পালন বা মাছের চাষ, তৃতীয় বিভাগের নাম মৎস্য-শিল্প। এই তিন বিষয়েই আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রচার করা হয়।"

মাছ ধরিবার ছিপ, বড়শি, জাল হইতে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি পর্য্যন্ত সকল বস্তুই এখানে দেখিলাম। ভিন্ন ভিন্ন মাছের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের জাল, জালপাতা এবং অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় প্রস্তুত করিবার প্রণালীও প্রদর্শিত হইয়াছে। ছবি, ফটোগ্রাফ ইত্যাদির সাহায্যেও বিষয়টা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল। মৎস্য পালনের জন্য কিরূপ পুষ্করিণী খনন করিতে হয় তাহার একটা নমুনা এখানে আছে। ডিমের আকৃতি পরিবর্ত্তন, মাছের রং খোলা ইত্যাদির ক্রমবিকাশ এবং মৎস্য-জীবনের অন্যান্য বহু তথ্য মিউজিয়মে বুঝিতে পারিলাম। Oceanography বা সমুদ্র-বিজ্ঞানবিষয়ক নানা কল যন্ত্র ও হাতিয়ার এই গৃহের ভিতর আছে। পূর্ব্বে এগুলি কখনও দেখি নাই। শুনিলাম জাপানীরাও ইয়োরামেরিকানদের মত কয়েকটা যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। মাছের চামড়া, অস্থি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া যে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় তাহার নমুনা এখানে অনেক দেখিলাম। সামুদ্রিক উদ্ভিদের সংগ্রহও যৎপরোনাস্তি।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

মফঃস্বলের বাণী

বঙ্গের নব শিল্পজাগরণ
ও
স্বদেশী ব্রত

প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক জাতির হৃদয়ে একটা আশা, একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আদর্শ বা লক্ষ্য না থাকিলে তাহার প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। যাহার জীবনে কোন লক্ষ্য নাই, সে কর্ণধারহীন তরণির মত সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়ায়—তরঙ্গে তরঙ্গে তটভূমিতে আহত হইয়া তাহার নিরর্থক জীবনের অবসান হয়। আমরা এইরূপেই ভাসিয়া চলিয়াছিলাম; পরানুগ্রহ-পবনে আত্ম-সমর্পণ করিয়া পরের চাকুরীতে জীবনের সকল শক্তি সঁপিয়া দিয়া, সংসারসমুদ্রে পাল তুলিয়া দিয়াছিলাম। লক্ষ লক্ষ পশুপক্ষী চরিতেছে, উড়িতেছে, পড়িতেছে, মরিতেছে, আমরাও সেইরূপ পোড়া পেটের জন্য চারিদিকে ছুটিতেছিলাম, উঠিতেছিলাম, পড়িতেছিলাম, মরিতেছিলাম—আত্মসম্মান-বোধ, জাতীয়-গৌরব-জ্ঞান, জাতীয় অস্তিত্ব ও বিশেষত্ব তোষামোদির অতলজলে বিসর্জ্জন দিয়া, পরপদলেহনে মত্ত ছিলাম। হঠাৎ কাহার যেন করস্পর্শনে, কাহার যেন ইঙ্গিতে, আমাদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি দ্বিধা বিভক্ত হইল, আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, ঊর্দ্ধে গগনমণ্ডল এক মহাশক্তির জ্যোতিচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়াছে—যেন এক দেবীপ্রতিমা অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাদিগকে বলিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। লক্ষ লক্ষ বঙ্গের সন্তান! তোমরা সকলেই গঙ্গলিকাপ্রবাহের ন্যায় দাসত্বের পঙ্কিল-সলিলে ছুটিয়া চলিয়াছ—ইহাতে কখনও পিপাসার তৃপ্তি হয় না; ওই দেখ শিল্প-বাণিজ্যের নির্ম্মল সরোবরে কত কুমুদ-কহ্লার-ফুটিয়া রহিয়াছে, বিদেশীয় বণিকগণ রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির ধূলিকণাও সংগ্রহ করিয়া তোমাদেরই নিকটে রূপান্তরে বিক্রয় করিতেছেন, আর তোমরা শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, রাজসেবা—জীবিকানির্ব্বাহের এতপথ থাকিতে শুধু পরসেবাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করিয়াছ; তোমাদের আশা কোথায়? বাঙ্গালী! যদি বাঁচিতে চাও, ভাগীরথীর ন্যায় সহস্র ধারায় জীবনসমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাও; আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভর আন; পরপ্রসাদভুক্ কুক্কুরের বৃত্তি যথা-সম্ভব পরিহার করিয়া, পরের অনুগ্রহে পদাঘাত করিয়া, আপনার পায়ে দাঁড়াইতে চেষ্টা কর, আপনার শিল্প, আপনার বাণিজ্য আপনি রক্ষা করিবার জন্য উৎসুক হও; তোমাদের বাগানে নব নব ফুল ফুটিয়া উঠুক, লক্ষ্মীর শূন্য মন্দিরে লক্ষ্মী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হউক।"—কি যেন এক উদ্দীপনার স্রোত বহিয়া গেল, কাহার যেন মোহন-মুরলী পঞ্চমে তান ধরিল—বাঙ্গালী তন্ময় হইয়া ক্ষণেকের তরে সব স্বার্থ ভুলিয়া স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিল, বঙ্গে শিল্পের বীজ উপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে কত নূতন কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল, বাঙ্গালার শিল্পোদ্যানে কত নূতন ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিল, কত লোকের জীবিকার সংস্থান হইল। এই শিল্পের নব জাগরণে এই শিশুশিল্পকে কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কত বার পড়িতে হইয়াছে, বাঙ্গালী হৃদয়ের রক্ত দিয়া ইহাকে মানুষ করিতেছিল। বাঙ্গালী প্রতি পরতে একদিন অনশনে থাকিয়া মহামায়ার নিকটে এই শিশুশিল্পের মঙ্গল কামনা করিয়াছে।

কিন্তু অকস্মাৎ ছিন্ন বঙ্গ যুক্ত হইল, বাঙ্গালী সেই আনন্দে আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, বাঙ্গালীর সাধের শিল্প আজ অনাদরে ধূলি-বিলুণ্ঠিত! সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষরাক্ষসী বঙ্গের রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—আজ বাঙ্গালী শক্তিহীন, অসহায়, দুর্ব্বল! বাঙ্গালী! আজ তুমি উত্থানশক্তি-হীন হইলেও যাহাকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছ, তোমার সেই শিশু সন্তান আজ ধূলিধূসরিত—উত্থানশক্তিশূন্য হইলেও আজ একবার তাহার পানে ফিরিয়া চাও, একবার তাহাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে আহ্বান কর।

অই যে অন্নপূর্ণা আসিতেছেন! আজ যেন নিরন্নের গৃহেও অন্নের সংস্থান হয়, বিষন্নের মুখেও প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠে—আর বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শক্তির স্রোত প্রবাহিত হউক। আজ ভাই ভাইয়ের হস্ত ধরিয়া মহাশক্তির চরণ বন্দনা করিবে ভাই বঙ্গবাসী! আজ তুমি দুর্ব্বল হইলেও তোমার অপেক্ষা দুর্ব্বলতর ভ্রাতার হাত ধরিয়া অগ্রসর হও, তোমার দৈহিক ও মানসিক শক্তির কিয়দংশ তোমার দুর্ব্বল ভাইদের দান কর—এসো আজ, সকলে মিলিয়া মায়ের পূজা করি, কোটি কোটি বঙ্গের সন্তান শক্তির পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করুক, দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া যাউক। প্রয়াগে অক্ষয় বটের নিকটে সকল যাত্রীকেই একটি করিয়া ফল ত্যাগ করিতে হয়, আজ বাঙ্গালী, আদ্যা শক্তির নিকটে বিলাস বাসনা বিসর্জ্জন দেও—ধনী স্বদেশীয় দ্রব্য সম্ভারে শারদীয় উৎসব সমাপন করুন, দরিদ্র আজ একটী পয়সার স্বদেশীয় শিল্প-কুসুম মায়ের চরণে উপহার দাও! যাহার কিছু নাই, তিনি ধান্য দূর্ব্বায় কায়মনোবাক্যে বঙ্গের শিশুশিল্পকে আশীর্ব্বাদ করুন—বঙ্গের গৃহে গৃহে মঙ্গল-বায়ু প্রবাহিত হউক।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম

ভগবান মনু বলিয়াছেন, ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে যাহাদের প্রাণ আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। প্রাণীর মধ্যে যাহাদিগের বুদ্ধি আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিজীবীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, এবং মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের শরীরোৎপত্তিই ধর্ম্মের শাশ্বত মূর্ত্তিমান অবয়ব এবং ইঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াই জগতি তলে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মসমূহ রক্ষা করেন বলিয়া সকল জীবেরই ঈশ্বরত্বে ব্রতী ও ধর্ম্মার্থে উপনীত হওয়াতেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সকল মানবের অগ্রে হওয়া ও সাতিশয় বেদ ধারণ করেন বলিয়া তাঁহারা পৃথিবীর সকল মানবের ধর্ম্মানুশাসনের প্রভু। তাই ভগবান মনু আদেশ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় মানব এই অগ্রজন্মা মানবের নিকট হইতে বর্ণোচিত আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবে। এই বর্ণোচিত আচার প্রতিপালন করাকেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা বলে।

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণদিগকে, তাঁহাদিগের নিজের ও তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের প্রতিপালনোপযোগী আবশ্যকীয় বস্তু যোগাইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত ভাবে স্বীয় বর্ণোচিত আচার প্রতিপালন করিতে এবং বর্ণেতর মানবকে তাহাদিগের আপন আপন বর্ণোচিত আচার প্রতিপালন করিতে শিক্ষা প্রদান করাইয়া উন্নত করিতেন। তাই বহুকাল জগতি তলে ভারতের ক্ষত্রিয় রাজারা, তাঁহাদিগেরই শক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে পূজ্য ছিলেন এবং ভারত মাতাও শ্রেষ্ঠা ছিলেন।

মানবের ধর্ম্মই বল, ধর্ম্মই সম্বল এবং জগত ধর্ম্মদ্বারাই সুরক্ষিত এই ধর্ম্মাপেক্ষায় সার বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। তাই, হিন্দুরা পূর্ব্বকালে ধর্ম্ম রক্ষা করাই সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য মনে করিয়া, কিসে এই ধর্ম্ম রক্ষা হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেন।

"ধর্ম্মে নৈব জগৎ সুরক্ষিত মিদং
ধর্ম্মো ধরা ধারকা।
ধর্ম্মাৎ বস্তু নহি কিঞ্চিত ক্ষিতি ভুবনে
ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥"

বৌদ্ধ ও যবনেরা বুঝিয়াছিল, যতদিন এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভারতে প্রবল থাকিবে ততদিন, ভারতের বর্ণেতর মানব ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তীই থাকিবে; তাহারা কিছুতেই একাধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইবে না। তাই-তাহারা ব্রাহ্মণদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে হিন্দুর বর্ণোচিত ধর্ম্মাচরণ পদ্ধতি উঠিয়া গিয়া, ধর্ম্মাচরণের নানারূপ নূতন নূতন পদ্ধতির অবতারণা হইয়া পড়িয়াছে। যদি তৎকালে হিন্দুজাতি "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ" ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত এই মূল মন্ত্রটি হৃদয়ে পোষণ করিয়া ধর্ম্মেতরের আশ্রয় গ্রহণে বিরত থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের লোপের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের হিন্দুস্থান উপাধিটি লোপ পাইত না ও তাহাদিগের এত হীন অবস্থা লাভ করিতেও হইত না।

বৌদ্ধদিগের, তৎপর বৌদ্ধ ও যবনদিগের শাসনকালে তাহারা ব্রাহ্মণদিগের ও তাঁহাদিগের পৃষ্ঠপোষক ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিতে থাকায়; ক্ষত্রিয়গণ নির্জীব হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় লয়। তাই, ব্রাহ্মণগণ (আপদ কালে) পেটের দায়ে বর্ণেতরের নিষ্কিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করাতে ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং বর্ণেতর মানবও শিক্ষার অভাবে উন্নত হইতে না পারিয়া সমগ্র হিন্দুজাতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ভারতের চারিবর্ণের মানবেরই বর্ণোচিত ধর্ম্ম, কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। উদর পোষণের জন্য এখন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকে স্বধর্ম্মচর্চ্চা ও স্বধর্ম্মানুশীলন করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগের দেহ, যে উপাদানে গঠিত তাহা অন্তর্হিত হয় নাই, অঙ্কুরটি এখনও সজীবই আছে, তাঁহারা, নিরুপদ্রব ও নিশ্চিন্ত হইয়া সাধনা করিতে পারিলেই, বর্ণেতর হইতে সহজে ও সকালে পূর্ব্ববৎ শক্তিশালী যে হইতে পারিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ শক্তিশালী না হইতে পারিলে বর্ণেতরের উন্নতির আশা করা বোধ হয় দুরাশা মাত্র। এখনও আত্মোন্নতির জন্য বর্ণেতরের অনেক হিন্দু, ব্রাহ্মণদিগের নিকটই পূর্ব্ববৎ দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন ও হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক দৈবকার্য্যাদি তাঁহাদিগের দ্বারাই করাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে বর্ণেতরের মধ্যে ব্রাহ্মণই নাই বলিয়া, কেহ কেহ স্বাধীনভাবে একরূপ নূতন রকমের ধর্ম্মানুশীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখা যায় এবং শুনাও যাইতেছে অনেকেই, তাহাদিগের পিতৃপুরুষ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক দৈব কার্য্যাদি করাইতেন তাহা তাঁহারা নিজেই করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখেন না যে, সেই সত্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দু, আত্মোন্নতির জন্য ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই উন্নত হইয়াছিলেন এবং এখনও অনেকেই তাহাই করিতেছেন। আত্মোন্নতির শিক্ষা দীক্ষা পুথি পড়িলে হয় না, উহা গুরুর উপদেশসাপেক্ষ। চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যাদি, মহাজ্ঞানী ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইয়াও, গুরুর নিকট আত্মতত্ত্বের উপদেশ লইয়া এক একটি ধর্ম্ম-স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বহুদিনের কথা নহে, এই রাজসাহীর নাটোরাধিপতি পৃথ্বীপতি মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর, মহারাণী ভবানী, মহারাণী শরৎসুন্দরী, রামপ্রসাদ সেন, ঋষি বৎসরাচার্য্য, সাধকশ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দ গিরি, ব্রহ্মানন্দ গিরি ও ভৈরবানন্দ গিরি প্রভৃতি এই চীনবীর্য্য ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিখ্যাত। যতই ধর্ম্মবীর দেখা যায়, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ মুখে শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াই আত্মোন্নতি করিয়া ছিলেন। এমন কি, অনেকে স্বীয় স্বীয় গুরু অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী হইয়া ছিলেন।

যাহারা জগৎগুরু ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে কি তাঁহাদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বা যাহাদের তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয়, তাহারা এই সকল বিষয় অগ্রে অনুসন্ধান করিয়া পরে ঐরূপ ভাবটি প্রকাশ করিলেই ভাল হয়। নতুবা ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া (বটতলার ২।৪ খানা বই পড়িয়া) ব্রাহ্মণনিন্দা দেবনিন্দা করা; বেদ ও স্মৃতির নিকট পঁহুছিবার শক্তি না থাকায় বেদ স্মৃতির দোহাই দিয়া; এবং পুরাণাদির মূল অর্থ বোধ করিবার শক্তি না থাকায় তাহার মর্ম্ম উল্লেখে যা তা একটি বলা বাতুলতা মাত্র।

তাই বলি, যদি কেহ আত্মোন্নতি করিতে চাও, যদি ভগবৎ কৃপা পাইতে চাও এবং যদি ভগবানের প্রতি প্রেম ভক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণদ্বারা দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া যে কার্য্যই করিবে তাহাতেই উন্নতি লাভ করিবে। অন্যথা ফল লাভ তো হবেই না; বরং অবনতি অপরিহার্য্য।

হিন্দুরঞ্জিকা

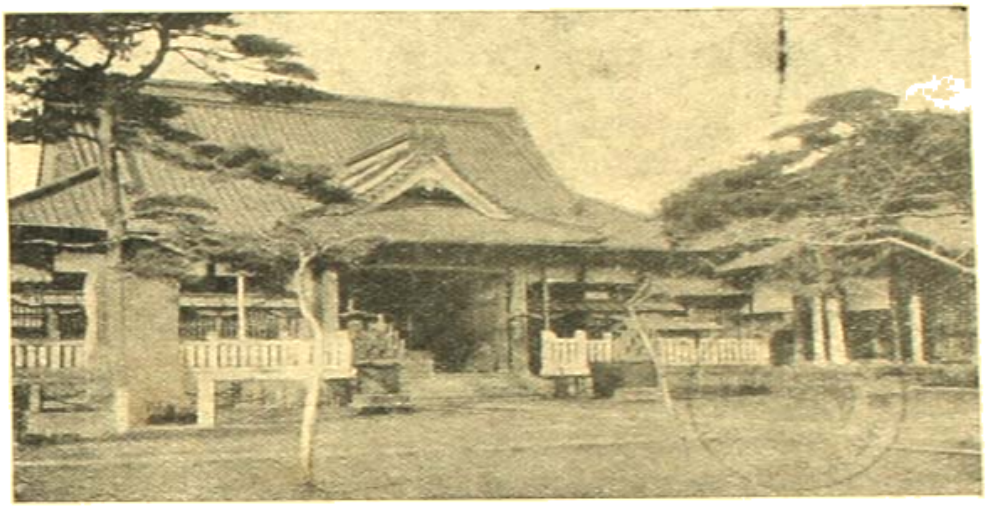

বৌদ্ধ মন্দির

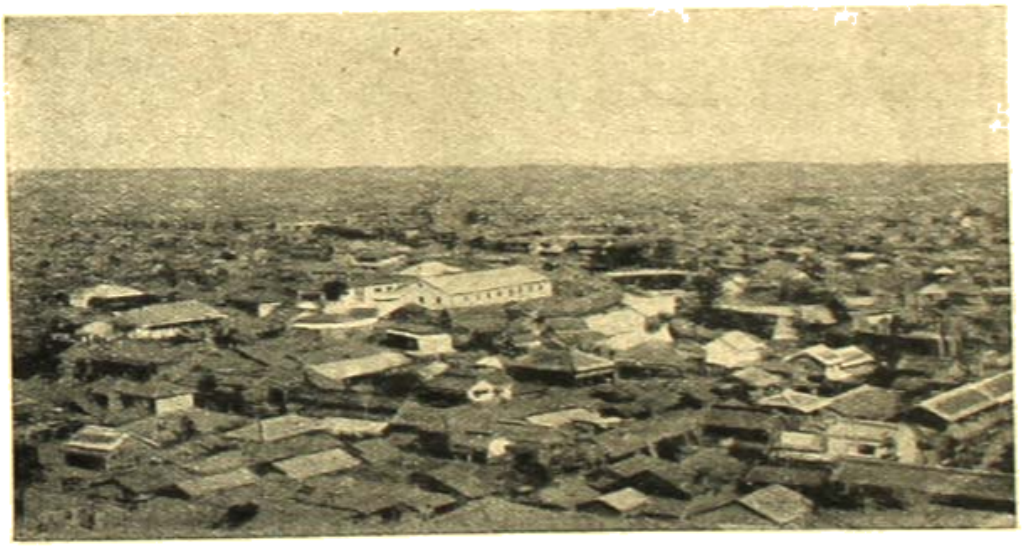

ইয়োকোহামা নগর

India Press, Calcutta.

গল্পলহরী

"চাহ, চাহ, মতিমান, দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া ধায়!
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ!
মানুষের শক্তি লয়ে কীটসম ব্যর্থ কর তারে?
বিধাতার পুণ্যদান—দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার?
একি—একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত!
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'। ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়—
দুয়ারে পাখীর মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি?"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	পৌষ, ১৩২২	তৃতীয় সংখ্যা।

আলোচনা

১। পারিপার্শ্বিক

প্রতিভা বংশগত কি না এ বিষয়ে প্রজা-তন্ত্রের পক্ষপাতিত্বের দিনে অনেকেই সন্দেহ করেন। পিতা বা পিতামহ বা প্রপিতামহের দোষ বা গুণ সন্তানের মধ্যে বর্ত্তিবেই ইহা এখন সকলে মানিতে চাহেন না। আজ গণতন্ত্রের যুগ, জনসাধারণের যুগ, শিক্ষা, বিজ্ঞান আজ কয়েকজন ধনাঢ্যের মধ্যে আবদ্ধ নাই—চারিদিকে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। গণিতজ্ঞের পুত্র গণিতজ্ঞ হইবেন রাজনীতিজ্ঞের পুত্র রাজ-নীতিজ্ঞ হইবেন, কৌটিল্যবিদের পুত্র কৌটিল্যবিৎ হইবেন—এ ধারণা এক্ষণে বদলাইয়া গিয়াছে। অতীত যুগ যখন শিক্ষা, সুসংস্কার, মানসিক উন্নতি সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল, তখন প্রতিভা

বংশগত বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তখন সেই সম্প্রদায়ের (aristocratic section) মধ্য হইতেই কেবল সুমার্জ্জিত বুদ্ধি, শিক্ষিত লোকের উদ্ভব সম্ভব ছিল। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, সে স্থলেও মানুষের দোষগুণ বংশ অপেক্ষা চারিপার্শ্বের অবস্থার উপরও নির্ভর করিত।

কিন্তু মনুষ্য চরিত্রের সহিত বংশের কোন সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, ইহার সহিত পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। সিংহশাবক শৃগালের সংসর্গে থাকিয়া শৃগাল-স্বভাবাপন্ন হইয়াছিল এইরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। চতুষ্পার্শ্বের আবহাওয়া অত্যন্ত সংক্রামক। ছোঁয়াচে রোগের মত উহার দোষ গুণ লোককে আক্রমণ করিয়া থাকে। মানুষের অভ্যাস, চরিত্র সামাজিক আবহাওয়ার অনুরূপ গঠিত হয়। যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কেবলই হীনতা, হীনতা, সেখানে মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি বড় গুণগুলির বাঁচিয়া থাকা কষ্টকর। নির্জ্জীবতা, নিশ্চেষ্টতা, কাপুরুষতা যে সমাজের বিশেষত্ব, সে সমাজের মানুষ প্রচণ্ড কর্ম্মশীলতা, তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পারে না। যেখানে আকাশে, বাতাসে নিয়তই ক্ষুদ্র, নীচ স্বার্থেরই কথা প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেখানে কি করিয়া উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মহৎ কল্পনা, উন্নত ভাব উদার কর্ম্মপ্রিয়তা স্থান পাইবে?

অন্যদেশের অবস্থার সহিত আমাদের দেশের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে উক্ত সত্যটী বেশ পরিস্ফুট হইবে। অন্য দেশের লোকদিগের সভ্যতাদি চরিত্রের কতক অংশ পারিপার্শ্বিকের সহায়তায় কেমন গড়িয়া উঠে। কিন্তু আমাদিগের আবহাওয়া একেবারে স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষের পরিবারগুলির প্রতি দৃক্‌পাত করুন। সেখানে দেখিবেন—স্বার্থপরতা বাতাসকে আবিল করিয়া তুলিয়াছে; ত্যাগের কথা দূরে থাকুক, বড় স্বার্থের কথা সেখানে কখনও উঠে না; পিতা সেখানে সর্ব্বদাই সন্তানকে বাঁধিয়া, চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। একবার গুরুকুল বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জনৈক সমাজসেবক লিখিয়াছিলেন যে আশ্রম ছাত্রগণকে চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট সময় বাল্যাবস্থাতেও গৃহের প্রভাব হইতে দূরে রাখেন। ইহাতে তাঁহাদের চরিত্র খর্ব্ব হইবার আশঙ্কা আছে। গুরুকুল সমাচার ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান ভারতীয় গৃহগুলির প্রভাব সন্তানগণের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নহে। বাস্তবিক সমাচারের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। তারপর সমাজের দিকে চাহিয়া দেখুন। দেখিবেন—যিনি উদ্যম, উৎসাহ এবং জীবনীশক্তির পরিচয় দিতে পারেন, তিনি বাতুল বলিয়া উপহাসের পাত্র; সমাজসেবা, পতিত জাতির উদ্ধার প্রভৃতি গুরুভার কর্ত্তব্যগুলি দুঃসাধ্য বলিয়া তাহা অকর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত। আমাদের দেশ এখন মহাপুরুষ জন্মাইবার অনুকূল ক্ষেত্র নহে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভা ও পুরুষকার বলে বড় হইয়াছেন তাঁহাদের কত বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া উঠিতে হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের দেশে পারিপার্শ্বিক সংশোধিত করিয়া উহাকে উচ্চভাবের পরিপোষক করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের মত মানুষ যাহাতে গড়িয়া উঠে তাহার উপায় করিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক একেবারে অপরাজেয় নহে। প্রতিদিনের চেষ্টা দ্বারা উহার আমূল পরিবর্ত্তন করা যায়। দেশের

আবহাওয়াকে পবিত্র ও সুন্দর করিবার কয়েকটী উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) জাগ্রত জীবন (conscious life)। জীবন সদা জাগ্রত সতর্ক রাখিব, কোন শত্রু আসিয়া অতর্কিতে আমার হৃদয়দুর্গ অধিকার করিতে পারিবে না। কোন কুচিন্তা ও কুভাব আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে অভিভূত করিতে দিব না, এবং ভাল ভাবকে বিচার করিয়া সাদরে গ্রহণ করিব। আমার হস্ত যেন আমার অজ্ঞানে কোন কাজ না করে। এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। ইহার জন্য আত্মপরীক্ষার অনুশীলন করিতে হইবে। আমার মধ্যে কোন কোন দোষ রহিয়া গিয়াছে তাহা দূর করিবার এবং আমার ভিতরকার সদ্‌গুণ কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। মহাত্মা রাণাডে এইরূপ নিয়মিত ভাবে আপনার চরিত্রের পরীক্ষা আপনি গ্রহণ করিতেন।

(২) মহাপুরুষ সংশ্রব। সমাজের সকলেই মন্দ নহেন। তাহার মধ্যে গুণী ব্যক্তি সংসর্গ লাভ করা যায়। তাঁহাদের সংশ্রব কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যে নির্ম্মল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে। তাঁহাদের সহিত সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা মানসিক পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে বড় সহায়।

(৩) স্বাধ্যায়। শক্তিশালী, উন্নত মনের চিন্তা ও ভাবরাশি পাঠ করিয়া বাস্তবিকই প্রাণে একটা উদ্দীপনা অনুভব করে। মহাপুরুষগণের জীবনচরিত চারিদিকের বিক্ষিপ্ততার মাঝে আশ্রয় স্বরূপ। তাহাদের জীবনবৃত্তান্ত হইতে মানুষ ভাবের প্রেরণা লাভ করে।

(৪) সুচিন্তা। যাহা কিছু হৃদয়কে অপবিত্র করে, যাহা নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর সেই সকল হাল্কা চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে। দুষ্ট পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকিয়া নানাপ্রকার হীন ভাবনা আসিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। তাহার প্রতি আদৌ মনোযোগ না দিয়া সদ্‌ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ।

(৫) উন্নত হইবার জন্য আগ্রহ, ব্যাকুলতা ও চেষ্টা। আপনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য তীব্র আগ্রহ চাই। চতুষ্পার্শ্ব আমাকে যতই টানিবার চেষ্টা করুক না কেন আমি ঠিক খাঁটি থাকিব। উহার প্রভাব হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া আমি আপনার পথে চলিব। শুধু আগ্রহ থাকিলে চলিবে না, চেষ্টা প্রবর্ত্তক ব্যাকুলতা চাই। ব্যাকুলতার অভাবে অনেক সদিচ্ছা কোনরূপ ফলপ্রসূ হইবার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছে।

(৬) জীবনে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ। জীবনের উদ্দেশ্য কি, জীবনে আমি কি কার্য্য করিব তাহা স্থির করিতে হইবে। একটা আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, একটী উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যীকৃত করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যাঁহাদের জীবনের নিয়তি আছে তাঁহারাই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারেন। যাঁহাদের গন্তব্যস্থল স্থির নাই, তাঁহারা ঘটনাস্রোত যে দিকে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেই দিকেই ভাসিয়া যান। স্রোতকে ঠেলিবার মত উৎসাহ তাঁহাদের সাধারণতঃ থাকে না।

* *
*

২। বিজ্ঞানচর্চ্চা

আমাদের জাতি প্রাচীন এবং বর্ত্তমান জগতের শিক্ষা দীক্ষার গুরু হইলেও, আধুনিক জগতের নিকট নবীন, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষার শিষ্য। আমরা জানিতে পারি, গৌরবও করি, আমাদের দেশেই জ্ঞান বিজ্ঞানের খনি

—সন্দেহ নাই। আমরা যে শুধু কালিদাস-মল্লিনাথ, পুরু-চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তকে পাইয়াই গৌরবান্বিত তাহাই নহে। আমরা চিন্তা-ভাবনাহীন বিজ্ঞানরাজ্য হইতে বিচ্যুত নহি। চোখের সাম্‌নে যাহাদিগকে পাই তাহাদিগকে টানিলেও দেখিতে পাইব,—লাখ লাখ বৎসর পূর্ব্বের যাহাদের বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল আর্য্যভট্ট, নাগার্জ্জুন, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের বিজ্ঞানালোচনাই মধ্যযুগের ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে উপাদান দিয়াছিল, তাৎকালিক ইউরোপের বুভুক্ষু পণ্ডিতমণ্ডলীকে সঞ্জীবীত করিয়াছিল। কিন্তু আজ সমুদায় ভারতভূমি অজ্ঞতার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। আমাদেরই কবি বলিয়াছেন—

"এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে॥"

কিন্তু আমাদের অবস্থা বিপরীত হইয়াছে। শুধু প্রাচীন বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলেই আমরা আজও বাঁচিয়া আছি। কাব্য, উপন্যাস, এইগুলি মানুষের হৃদয়ে একটা সাময়িক পরিবর্ত্তন আনিতে পারে, আপাত মধুর রস উহাতে পাওয়া যাইতে পারে। তারপর লোকচরিত্র ও সমাজচিত্র আঁকিতে কাব্য ও উপন্যাসই প্রধান। কিন্তু চিরস্থায়ী আনন্দ, চিরমধুর রস বিজ্ঞানরাজ্যেই বর্ত্তমান; বিজ্ঞান সমাজচিত্র বা ব্যক্তিগত চরিত্রাঙ্কণেও যথেষ্ট পারদর্শী। আমাদের তিনশত বৎসরের ইতিহাস এই বিজ্ঞানের ভিতর দিয়াই কতকটা বুঝা যাইবে। বিজ্ঞান, শক্তিমান ভগবানের রূপান্তর মাত্র। বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিরাশা ও হতাশা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কিন্তু আর একটুকু পেছনেই শাশ্বত আনন্দ অপেক্ষা করে। সাধারণতঃ যাঁহারা দার্শনিক বলিয়া পরিচিত তাঁহারা ভগবানের সত্তা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক জড় জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া, প্রতি অণুতে তাঁহার মাহাত্ম্য দেখিয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না, অনন্ত পিপাসা—অনন্ত ব্যাকুলতা। বৈজ্ঞানিকই প্রকৃত দার্শনিক। আমাদের মুনি ঋষিগণকে যাঁহারা জটাজুটধারী নেত্রনিমিলীত সাধারণ দার্শনিক ভাবেন, তাঁহারা অন্যায় বুঝেন। তাঁহারা জড়জগতে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে যাইয়াই দার্শনিক হইয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক। তাই বলিতেছিলাম, বিজ্ঞানের সৃষ্টি না হইলে মানুষ বাঁচিত না। সংসার একটা ভোগের স্থান হইত—লোক শূন্যবাদী হইয়া উন্মাদ হইত।

যে সমাজে বিজ্ঞানচর্চ্চা নাই সে সমাজ সমাজই নহে। যে জাতির হৃদয় বিজ্ঞানালোচনার জন্য ব্যাকুল নহে সে জাতির হৃদয় মরুভূমির তুল্য। জাতি বিজ্ঞানালোচনা ব্যতীত বাঁচিতে পারে না বলিয়াই আজ ৩০০ শত বৎসর পরেও আবার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমাদের দেশবাসী সন্তানগণ অন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে। লড়াইয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ ভাবে বুঝা যায় এটা বিজ্ঞানের যুগ, কারণ যাঁহারা বিদেশ যাইতেছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য। সম্প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিতেছেন তাঁহারা দেশে বিজ্ঞান-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুন। বহুদিন তরল সাহিত্য ও অসার উপন্যাস পাঠ করিয়া বিজ্ঞানের রস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে বিজ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমরাই উহার শিশুপ্রজা হইব। বিজ্ঞানের শৈশবকালে, আধুনিক জগতের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি

শুধু মুখস্থ না করাইয়া, প্রাঞ্জল ভাষায়, সহজ উদাহরণে, দেশীয়ভাবে বুঝাইতে পারিলে, সুবিধা হইবে। বিজ্ঞানজগতে প্রবেশ করিতে সহজ পন্থা পাইব। বিজ্ঞান বিষয় লিখিলেই যে দেশের লোক হঠাৎ আকৃষ্ট হইবে এমন নহে; কাব্যোপন্যাসের রাজ্যের ক্ষণিক রসভোগ সহসা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিকে বহুল প্রচার করিতে হইলে কথায় বার্ত্তায়, গল্পে প্রবন্ধে সহজ মাত্রায় চালাইতে হইবে।

বিদেশপ্রত্যাগত বিজ্ঞানসেবী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আবিষ্কারগুলি অনুবাদ করিলে গ্রন্থপ্রকাশেও সুবিধা হইবে। যতদিন না বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সমাজে চলিতে থাকিবে ততদিন আমরা অতি নিভৃতে আছি বলিয়াই ধারণা হইবে। বৈজ্ঞানিক সমর্থগুলি বেশ রসাল হইলে খুব শীঘ্রই ফল পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি পণ্ডিত মহলে যে বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে—সেগুলিও প্রকাশিত হইলে বিজ্ঞান-রাজ্য অতি সত্বরেই প্রসার লাভ করিবে।

আমরা নবীন বিজ্ঞানসেবীদিগের অনেক আশা করিতেছি। তাঁহারা পকেট ঝাড়িয়া দিলেও আমরা খুসী হইব না। আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ঘুরিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াও যদি তাহা নীরব থাকেন অথবা মজ্জাগত রীতির অনুবর্ত্তন করেন তাহা হইলে দেশের লোক ঠিক থাকিবে কি করিয়া? বৈদেশিক শিক্ষায় লোকের ভক্তি না আসিয়া বিতৃষ্ণা জন্মিবে। দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা যেন আবার দেখিতে পাই—বিজ্ঞানালোচনা কিছুকাল স্থগিত থাকিলেও আমরা এইমাত্র প্রথম শিক্ষার্থী নই। প্রাচীন পণ্ডিতগণের দেশে তাঁহাদের বংশে আবার প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষণীয় বিষয় কখনও খাপছাড়া হয় না। যুগের পর যুগ চলিয়া যাইতেছে আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে তাহার সূত্রও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আশা করি, ষোড়শশতাব্দীর পর হইতে এই তিনশত বৎসরে আমরা যতটুকু পাছে পড়িয়াছি, এই বিংশশতাব্দীতে মানবজাতির উন্নতিযুগে তাহারাই ততটা পূরণ করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। আমাদিগকে বিজ্ঞান-রাজ্যে লইয়া যাইতে তাহাদিগকে অনবরত কষ্ট করিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রের সুবিধা অসুবিধা তাহাদিগকেই বহন করিতে হইবে। আমরা অজ্ঞান তমিস্রা হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত দার্শনিক হইতে চাই। আমাদের ৩০০ বৎসরের পুরাতন খনি হইতে তাঁহারা আলোক হস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মণি অনুসন্ধান করুন। তাঁহারা দেখাইয়া দিউন আমরা দেখিয়া সার্থক হই, আমরা নূতন নহি আমরা পুরাতন। ভবিষ্যতের শিক্ষাগুরু আমাদেরই দেশবাসী।

* *
*

৩। বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি

বিগত ১৩২১ সালের ৫ই কার্ত্তিক এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহাশয় ইহার উপদেষ্টা। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু ইহার স্থায়ী সভাপতি, নিখিলনাথ রায় বি, এ, সহকারী সভাপতি। মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ইহার সম্পাদক। তাঁহারই ব্যয়ে সমিতি পরিচালিত। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে

জানাইয়াছেন যে তাঁহারা এই এক বৎসরের মধ্যে বক্রেশ্বর, সৌফলাই, সুপুর, কেন্দুবিল্ব, শ্যামরূপারগড়, মঙ্গলডিহি প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বীরভূম-বিবরণ নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছেন। তন্মধ্যে সুপুর, বক্রেশ্বর, শ্যামরূপারগড় প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে 'বৃহদ্ধে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সমিতির কার্য্য-কর্ত্তারা অনেক ফটোগ্রাফার সমভিব্যাহারে বীরভূমের আরো অনেক স্থান ঘুরিয়া বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরাদির ফটো সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তন্মধ্যে বক্রেশ্বরে মহিষমর্দ্দিনী, সেনভূমে সহস্র বৎসরের পুরাতন (বৌদ্ধ তারামূর্ত্তি) সুন্দেশ্বরী, দেউলিতে ষাদশভুজ শিবমূর্ত্তি, কলেশ্বরের বাসুদেব মূর্ত্তি, ভদ্রপুরের দ্বিভুজ শিবমূর্ত্তি, একচক্রার দশাবতার চিত্রযুক্ত বাসুদেব মূর্ত্তি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমিতি এবং বর্দ্ধমানের রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি রীতিমত কার্য্য করিতে পারিলে রাঢ় দেশের পুরাতত্ত্ব বেশ সুন্দর-ভাবে সংগৃহীত হইতে পারিবে, আশা করা যায়। যে সব ধনাঢ্য ব্যক্তি অর্থসাহায্যে এই সকল সমিতিকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

* *
*

৪। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

Evolution theory আজ কাল বিজ্ঞান-জগতে একটা আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই, জগতে যাহা কিছু ঘটে সে সকলই Evolution নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই মতটির আজ কাল এতই বাড়াবাড়ি হইয়াছে, যে Evolution ও যেন Evolution নিয়মানুযায়ী উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। ইহাকে বলে "সর্ব্বাতোভদ্রং গহিতং"। যাহা হউক যখন বৈজ্ঞানিক মহারথীরা Evolution পদ্ধতির এত মর্য্যাদা, ও গৌরব প্রদর্শন করিতেছেন, তখন তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে সমধিক সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, এটা বাঞ্ছনীয়।

বৈজ্ঞানিকগণ কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ সাধন করিতে বদ্ধপরিকর; সুতরাং সহজেই মনে হয়, বিজ্ঞানবেত্তারা কুসংস্কার বিনির্ম্মুক্ত। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, তাঁহারাও মনে মনে কতকগুলি কুসংস্কারের পূজা করিয়া থাকেন।

নিজের ভ্রম নিজে কেহ দেখিতে পায় না, এটা জগতের রীতি। বৈজ্ঞানিকগণ সমীক্ষা পরীক্ষা পূর্ব্বক যে সকল সত্য আবিষ্কার করেন সেগুলি নির্ভুল হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, কেবল সমীক্ষা ও পরীক্ষাই সত্য নহে, সত্য আবিষ্কারের সহায় মাত্র। এই সমীক্ষা ও পরীক্ষালব্ধ উপকরণ হইতে, কল্পনা দ্বারা সত্যের যে ছবি অঙ্কিত করা হয়, এই কল্পনার মধ্যেই ভ্রম প্রমাদের অবসর থাকিতে পারে। কেবল প্রত্যক্ষ দ্বারা সাধারণ তথ্যে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং সমীক্ষা ও পরীক্ষার গণ্ডীকে অতিক্রম করিতেই হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে। এই গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিককেও বিশুদ্ধ দার্শনিক হইতে হয়। এই দার্শনিক বুদ্ধি ব্যতীত কোন তথ্যেরই যাথার্থ্য নির্ণীত হইতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম, বিজ্ঞানের সমীক্ষা ও পরীক্ষা লইয়া বিশেষ বাদানুবাদ সম্ভবপর না হইলেও, তদবলম্বিত অনুমান সম্বন্ধে মতদ্বৈধ —সর্ব্বথা সম্ভবপর। হটকারিতা, কি দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক, উভয়েরই পরিহর্ত্তব্য।

বৈজ্ঞানিকদিগের Evolution পাঠ করিতে গেলে দেখা যায় সেখানে রূপকের বহু অপপ্রয়োগ রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রধান প্রধান শব্দগুলির বিশ্লেষণ করিলে একথার তাৎপর্য্য গৃহীত হইতে পারে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, পারিপার্শ্বিক প্রভাব প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় তাহারা ভিন্নার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই ভিন্নার্থটা আমাদের বুদ্ধিগম্য কি না তাহা বিবেচ্য। প্রকৃতিকে অচেতন বলা হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক "নির্ব্বাচন" কথাটার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। অচেতনের 'নির্ব্বাচন' ব্যাপারটা যে কি তাহা কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অতীত। নির্ব্বাচন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলিতে যদি তদ্ভিন্ন অর্থের সূচনা করা হয়, তবে সে শব্দটা কি আমাদের দুর্ব্বোধ্য হয় না? অন্যান্য শব্দ সম্বন্ধেও এই প্রকার জানিতে হইবে। আমরা রূপকের প্রয়োগ করি কখন? যখন বস্তুটিকে পরিচিতের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করি, তখনই নহে কি? ব্যাখ্যা মাত্রেই পরিচিতের ভাষায় অপরিচিতের প্রকাশ। যদি বৈজ্ঞানিকগণ অপরিচিত বস্তুকে পরিচিতের কথায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক না হইয়াও পরিচিত ভাষার প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে, বিষয়টিকে জটিলতর করিয়া তোলা ব্যতীত আর কি করা হয়, আমরা বুঝিতে অক্ষম।

তারপর, Evolution জিনিষটার প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই উহা একটা পদ্ধতি একটা প্রক্রিয়া মাত্র, স্বয়ং হেতু (agent) নহে। হেতুনিষ্ঠ শক্তি যে প্রণালীতে মূল ব্যবহারিক দশায় উপনীত হয়, সেই প্রণালীর নাম Evolution, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ কেবল এই প্রক্রিয়াটিকেই সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া ঘোষণা করেন মূলের শক্তির কথাটা সেখানে আনেন না। বরং তাহার অপলাপই করিয়া থাকেন। ইহা চিন্তাশীলতার পরিচায়ক নহে। যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষায় Evolution শব্দটির নানা ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে, দেখা যায়। কেহ বলেন ক্রমবিকাশ, কেহ বলেন পরিণাম, কেহ বলেন অভিব্যক্তি, কেহ বা বলেন বিবর্ত্ত। আমাদের মনে হয় প্রথম তিনটি শব্দ মন্দ নহে। তবে সংস্কৃত দার্শনিক ভাষায় 'পরিণাম' শব্দটিই বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে 'পরিণাম' শব্দেরই বিশিষ্ট প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অভিব্যক্তি শব্দটিও উহার অনুকূল। কিন্তু যাঁহারা Evolution অর্থে 'বিবর্ত্ত' শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, সংস্কৃত দর্শনে 'বিবর্ত্তবাদ' সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবোধক। যাঁহারা সংস্কৃত দর্শনের চর্চ্চা করেন তাঁহাদের নিকট একথাটি নূতন নহে। বস্তুর স্বরূপের অন্যথাভাব হওয়াই 'পরিণাম', এবং স্বরূপের অন্যথাভাব না হইয়া যে স্বরূপরূপে ভান তাহাই বিবর্ত্ত। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ লেখকগণ একটু বিবেচনা পূর্ব্বক শব্দাদির ব্যবহার করিলে, অর্থবোধ সহজ হইতে পারে। আশাকরি তাঁহারা শব্দের প্রসিদ্ধার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আলোচ্য বিষয়কে পরিস্ফুট করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করিবেন না।

* *
*

৫। আমাদের চিন্তাপ্রণালী

বহুদিন যাবৎ আমরা কর্ম্মজগতে ও চিন্তাজগতে অনড় ও অসাড় হইয়াছিলাম। ভাবিবার, চিন্তা করিবার বড় একটা প্রয়োজন বোধ করি নাই। এখন যদি হাল ফিরিয়াছে

তাহা হইলেও যাঁরা পথে ফিরিতেছি ; চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছি। নিজেরা কোন কোন নূতন বিষয় ভাবিবার আদৌ প্রস্তুত নহি ; কোন এক ব্যক্তি যদি তাহার নূতন চিন্তার আভাস দিলেন তাহা হইলে অমনি বিভিন্ন লেখনী হইতে বিবিধ নামে প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। দুই একটী নূতন কথা যোগ করিয়া লেখক ভাবিলেন, কিছু করিলাম, কিন্তু জগৎ তোমার নিকট হইতে কি পাইল তুমি ত তাহা ফিরিয়া দেখিলে না। যে বিষয়গুলি লইয়া আমাদের সাহিত্য সমাজে নড়চড় চলিতেছে, অনেকে মনে করেন, এইগুলিই আধুনিক সমাজের বাণী ও আন্দোলনের বিষয় তাই তাহারা নিজস্ব ভাবিয়া থাকেন। আমরা একে একে ২।৩ টী বিষয়ের নমুনা দেখাইব।

প্রথমতঃ পল্লীচিন্তাই আমাদের প্রধান চিন্তা হইয়াছে। পল্লীর শিক্ষা, পল্লীর বিচার, পল্লীর সমাজ, পল্লীর শিল্প ইত্যাদিই চিন্তার অন্যতম ও প্রধান বিষয়। তারপর "করিতে হইবে" "করা উচিত" প্রভৃতি অনুজ্ঞা ও উপদেশপূর্ণ শব্দে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করে। আজকালকার দিনে Theoritically perfect হইলে চলিবে না। যদি কিছু করিতে হয় আগে নামিতে হইবে, ক্ষমতা থাকে কর। যেখানে একা পারা যায় না দু' একজনে মিলিয়া দু একটা উপদেশ নমুনাস্বরূপ ধর। আমাদের মত অবস্থায় কেহ কাহারও কথা শুনিতে চায় না সুতরাং আগে নিজে না নামিলে অন্যকে পাওয়া মুস্কিল। অনেক লেখক মনে করেন, পত্রিকা তাহাদেরই জন্য তাহারা শুধু লিখিয়া পথ দেখাইবেন। লেখকদিগের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁহারা পল্লী দেখেন নাই, অথবা কেহ কেহ ২।১টী গ্রামের এক আধটুকু খবর রাখিয়াই তৃপ্ত। পল্লীতে ঘুরিয়া খবর সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য এমন কথা কেহ ভাবেন না কি ? তারপর স্বায়ত্তশাসন—এ ব্যাপারটী কিছু বেশী দিনের পাকা হইলেও, একটা বলিবার ও লিখিবার বিষয় হইয়াছে। আমরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি,—উপযুক্ত হইলে শাসন ক্ষমতা পাইব ; কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখি না, আমরা উপযুক্ত কি না। তাহারা বলে "দিবনা" আমরা বলি "চাইই।" তাহারা যত বেশী না করে, আমরা তত জোর করিতেছি। আমরা জোর করি কেন ঠিক বুঝিতে পারি না। আমাদের দাবী দাওয়া কি আছে সকল সময় বুঝি না। আর চাহিলেই বা দিবে কেন কে কাহাকে দেয়। এটা একটা আবদার হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—একেবারে মিথ্যাও নয়, আমরা এখনও শিশু —চাওয়া অভ্যাসটী আমাদের এখনও আছে। এক একবার শুনি "দিতে হইবে" অমনি মনে হয় যেন কপালে "চাঁদের টিপ" পড়িল। তারপর আরও মনে হয় না কি—এত বড় একটা শক্তিশালী জাতির সংস্পর্শে আসিয়া, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" যাঁহাদের বাণী তাঁহাদের রক্ত মাংসের হইয়াও, আমরা ভিক্ষাবৃত্তির আশা ছাড়িতে পারি নাই ; ভুলে ঐ ভাবনাটাকে পরিত্যাগও করিতে পারি নাই। দুর্ব্বলের কাতরোক্তি সকলকে দূষিত করে, সুতরাং প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া, শক্তিমানের পথে চলিয়া তাহার মহত্ত্ব বৃদ্ধি করি।

তৃতীয় চিন্তা প্রাথমিক-শিক্ষা—আমরা কি দেখিয়াও দেখিতেছি না, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজ অঙ্গকে প্রতিনিয়ত ঘা দিতেছে। বরোদা প্রভৃতি মিত্র রাজ্যের ন্যায় করদ রাজ্য সমূহ বাঙ্গলায়ও আছে, নাই কেবল প্রাণ।

যাহারা জমির মালিক হইয়া প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ এলাকায় ইচ্ছামত স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন না কি? গভর্ণমেণ্ট যখন করেন নাই তখন ত আর কোনই উপায় নাই! শুধু প্রার্থনা করি বলিয়াই আমাদের আবেদন মঞ্জুর হয় না। সকল সর্ব্বনাশ ঐ খানেই। আমাদের দেশে যখন যখন স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন হয় তখন দূরাতিদূরেও তাহার প্রতিধ্বনি হয়। আমাদের প্রাণহীন চীৎকারকে থামাইবার জন্য একটা উপায় গৃহীত হয়। যদি অভাব সত্য সত্যই উপলব্ধি করিতাম তাহা হইলে বসিয়া বসিয়া চীৎকার না করিয়া, এক হাতে অশ্রু মুছিতাম অন্য হাতে কর্ত্তব্যের বোঝা টানিয়া লইতাম। দু'একজনের আজীবনের অশ্রুতে কিছু আসে যায় না। লিখিয়া, পড়িয়া বা বক্তৃতা দিয়া কোন লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগান যায় না। যথার্থ প্রাণহীন ব্যক্তি কোন কাজ করিতে পারে না। যেখানে প্রাণের স্পন্দন আবশ্যক সেখানে বাহ্য আস্ফালনে কোন কাজ হয় না। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে চীৎকার তাহা পৌষলের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় থামিয়া গিয়াছে। আমাদের সবই আছে, নাই কেবল প্রাণের সাড়া, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতা। যেখানে একটী সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয় না সেখানে বিশ্বালয় হইবে কিরূপে। আবার কিছুদিন যাবৎ আর এক ধুয়া চলিতেছে—শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা। আমরাও মনে করিলাম হইলে হইতেও পারে, কিন্তু শেষে স্থির করিলাম—"সকল ব্রত করছেন মাসী, বাকি আছে ক্ষুমি একাদশী।" কাজের ঘরেও তাই।

তারপর ম্যালেরিয়ার নামে কত লিখন পঠন চলিতেছে। না করিয়াই বা উপায় কি? যতদিন এ জাতির প্রতি তৃণ ম্যালেরিয়ার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, ততদিন এ চীৎকার চলিবেই, এ প্রলাপ বকিবেই। প্রথমে এক আধটুকু জায়গায় দাঁড়াইবার জন্য ম্যালেরিয়া ব্যস্ত হইয়াছিল এখন বিশাল শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে—বিরাট তাহার পাশ। আমরা আজ পর্য্যন্ত মানুষের কাছে প্রার্থনা করিতে ভুলিলাম না। মানুষে মানুষের জন্য কতটুকু করিতে পারে—শক্তি কৈ? সেখানে হিংসা ও স্বার্থের বীজ নিহিত রহিয়াছে। একমাত্র নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া ভগবানকে ডাকিলে কিছু কাজ হইত। তাঁহাকে অনন্ত বিশ্বের খবর লইতে হয়, যে আগে যাইবে তার পুরস্কার আগে দেন।

ম্যালেরিয়ার কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ২।১টী সাধারণ নিয়ম পালন করিয়াছি কি? মশার সঙ্গে লড়াই করিয়া বাঁচিবার ক্ষমতা যদি না থাকে তাহা হইলে মানুষের মরাই শ্রেয়। সংসারে দুর্ব্বল চিরদিনই সবলের অধীন। শুধু মৃত্যুর তালিকা দেখাইলে আমাদের দুরন্ত বলিবে না। সংসারে মানুষের মত বাস করিতে হইলে, খাটিতে হইবে, মাথার ঘাম পায়ে পড়িলে তবে কিছু করিতে পারিব। "কাঁদিবার তরে মানব-জীবন যতদিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই" এ দুর্ব্বলের মন্ত্রবাণী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এত লোক মরিতেছে, তবুও ত আমরা ধাক্কা পাইতেছি না। ঐ ধাক্কাটা যদি স্কুলের হইত তাহা হইলে কতকটা কাজ করিতে পারিতাম। ঐ সকল পুঞ্জীকৃত মৃত আত্মা যদি তাঁহাদের লৌহ পাদুকা দ্বারা লাথি দিতেন তাহা হইলে আমাদের জাতির একটু চেতন হইত। মানুষ মানুষের কাছে কাঁদে। তাহার ষোল আনাই ত বৃথা যায় তবে আর অনর্থক অশ্রু ত্যাগে ফল কি? নিজকে নিজে চিনিতে পারি এমন শক্তি চাই, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

* *
*

৩। বঙ্গভাষার প্রকৃতি

আল্ এস্‌লাম পত্রিকায় 'বাঙ্গালীর মাতৃভাষা' নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন, মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা বুদ্ধিমান জনোচিত কাজ নহে। আমরা যে কোন ভাষাই পড়িনা কেন, তাহা মাতৃভাষার সাহায্যেই বুঝিয়া থাকি, কারণ বাল্যকাল হইতে সেই ভাষা দ্বারাই আমাদের

অন্তরে কথা বুঝিবার শক্তি গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগকে নানাদেশে ও নানাজাতিতে বিভক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছেন এবং দেশ ও জাতি বিশেষে বিভিন্ন ভাষাও দিয়াছেন। এজন্য কাহারও লজ্জিত হওয়ার কারণ নাই। বাঙ্গলা, ইংরেজী, উর্দ্দু ও ফারসী ইত্যাদি ভাষা অর্থাৎ আরবী ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাই মুসলমানের জন্য সমান এবং সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সকল ভাষাই হিন্দুর জন্য সেইরূপ। মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দ্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিম্বা 'বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি' এরূপ বলা—এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁহাদের এরূপ নীতি অবলম্বন করা কি বাস্তবিক পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক নহে? যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা ও মাতৃভূমির প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজমুখে নিজের মায়ের এবং দেশের হীনতা হীনতা জ্ঞাপন করে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে মাতৃভাষা শিক্ষা করা এবং তাহার উন্নতি সাধন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিলে তাহা উর্দ্দু প্রভৃতি হইতে কোন মতেই হীন হওয়ার কথা নহে। আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই তদ্দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। মায়ের কাজ মায়ের দ্বারাই সম্পন্ন করাইতে হইবে, অপরের দ্বারা তাহা কখন পূর্ণ হইবে না। এইরূপ না করার ফল এই হইয়াছে যে, আজকাল সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তির বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনার জন্য যেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের ভক্তিভাজন মৌলবী মৌলানা সাহেবানের আরবী-উর্দ্দু ওয়াজ শুনিবার জন্য শিরনী, রসগোল্লা, লাড্ডু ও জিলাপী ইত্যাদি বিতরণের প্রলোভন সত্ত্বেও সভায় লোক উপস্থিত করা মহা মুস্কিল হইয়া থাকে।

মাতৃভাষার উন্নতি আমরা দুই রকমে করিতে পারি। প্রথমতঃ, ঐ ভাষায় ধর্ম্ম সংক্রান্ত কেতাব সকল তরজমা করা এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাদশা, অলী ও দরবেশগণের জীবন চরিত ইত্যাদি লেখা। দ্বিতীয়তঃ আজকালের নূতন আবিষ্কৃত হেকমত বা জ্ঞান বিজ্ঞান ও হিসাব ইত্যাদি পার্থিব উন্নতি বিষয়ক পুস্তকাদি লিখিয়া তাহা জনসমাজে প্রচারের সুবিধা করা।

আজকাল আমাদের দেশে দুই রকমের বাঙ্গালা দেখা যাইতেছে। একটী আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের অবলম্বিত সংস্কৃতবহুল শব্দ বিজড়িত বাঙ্গালা, ইহা ইংরেজ আমলদারীর বিগত শতাব্দীর গড়ান বাঙ্গালা ভাষার নূতন সংস্করণ নামে অভিহিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময় অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমানও তাঁহাদের অনুকরণে ঐরূপ সাধু ভাষাজড়িত বাঙ্গালা বই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই রকম বাঙ্গালাই আজকাল স্কুলে পড়ান হয়। এই ভাষাতে বাঙ্গালীর পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সব শব্দ কখনও শুনেন নাই, তাহা অতি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়াছে। এমন কি, তাহা ভালমতে বুঝার জন্য মৃত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা এবং ওস্তাদ ও অভিধানের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। বাঙ্গালার সাধারণ লোকে কখনও ঐরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে না। ইহাকে তাহাদের মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে না বরং তাহা মাতৃভাষার বিকৃতি মাত্র।

অন্যরূপ বাঙ্গালা এই দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। তাহাতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের ধর্ম্ম ও কারবারের আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত শব্দের ব্যবহার ও স্থান আছে। এই ভাষাই বাস্তবিকপক্ষে এদেশের লোকের মাতৃভাষা।

এইরূপ ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গলা বলা ঠিক হয় না, কারণ এই ভাষায় আমরা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি পুরুষানুক্রমে কথা বার্ত্তা ও লেখা পড়া করিয়া আসিতেছি। কাগজ, কলম, কেতাব, আদালত, আরজী, ইস্তাফ, কুরছি, মেজ, দোয়াত, সিয়, সিনী, মগজ, বরতন, পেয়ালা, তশ্তরী, পাল্‌ং, তোষক, বালিশ, গয়রহ ইত্যাদি শব্দ আমরা

উভয় সমাজে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি এবং এখনও করিয়া থাকি। কিন্তু আজ ২০।২৫ বৎসর হইতে দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ শিক্ষা দোষে বাঙ্গালী হিন্দু ভ্রাতাদের মনে মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ভালবাসা কমিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা মুসলমানগণ হইতে পৃথক হওয়ার উদ্দেশ্যেই যেন মাতৃভাষার অন্তরঙ্গ-স্বরূপ পুরুষানুক্রমে প্রচলিত শব্দ সমূহের স্থলে, নূতন শব্দ ব্যবহার করত এবং তাহাকে নানা রকমের বিকৃত আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া তাঁহারা যেন বৃদ্ধ মায়ের এক যুবতী সতীন গড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ-প্রিয় কতক মুসলমানও ইহার পরিণাম ফলের বিষয় চিন্তা না করিয়া মায়ের গায় কুড়াল মারিতে ত্রুটী করেন নাই। এতদিন ত মুসলমানগণ লেখা পড়ার দিকে বিশেষ কোনরূপ মনোযোগ দেন নাই। তাহাদের বাদশাহী গেলেও কিন্তু বাদশাহী খেয়াল যায় নাই এবং পূর্ব্বপুরুষগণের ঝুটা (উচ্ছিষ্ট) সব খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন। কিন্তু এখন তাহাও ফুরাইয়া যাওয়ায় উপায়ান্তর না দেখিয়া বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্কুল পাঠশালার দিকে ছুটিয়াছেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, তাহাদিগকে মাতৃভাষা নামে এক নূতন ভাষা শিখিতে হইবে। তাঁহাদের মা বাপের নিকট যাহা কিছু শিখিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সেখানে কোন কাজে লাগিবে না এবং বাধ্য হইয়া তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। বাস্তবিক বিগত ২০।২৫ বৎসর মধ্যে আমরা পূর্ব্ব প্রচলিত অনেক শব্দই ভুলিয়া গিয়াছি এবং কতক নিত্য ব্যবহারের শব্দও কমাইতে শিখিয়াছি। হায়! কি দুর্দ্দশা! যে জাতিকে মাতৃভাষাও নূতন করিয়া শিখিতে হয়, তাহারা কি শিক্ষা ক্ষেত্রে অপর লোকদের সমানে পড়া চলাইতে পারে? এখনও সময় আছে, শিক্ষার উন্নতির সহিত হিন্দুদের বেরাদরি ভাব বাড়িতেছে, এবং শিক্ষিত মুসলমানগণও এখন এত কম নহেন যে তাঁহাদিগকে তুচ্ছ করা যায়। বলাবাহুল্য যে সকলেই এখন উন্নতির দিকে ছুটিয়াছে। এমন সময়ে উভয় সমাজের লেখকগণের পক্ষে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া এ বিষয়ে—যে ক্ষেত্রে দেশের হিন্দু মুসলমান এই উভয় জাতি একত্রে সম্মিলিত হইতে পারে, মাতৃ ভাষাকে সেরূপ ভাবে গড়িয়া তোলা আবশ্যক, এবং আমি ইহার জন্য করি, সকলে এই বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

লেখকের মতে বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দু ও মুসলমানী শব্দ যাহা বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে, ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমরা জানি এখনও আমাদের বঙ্গ ভাষার সেইরূপ ব্যবহারই চলিতেছে। তবে কোন কোন লেখক তাঁহার রচনায় সংস্কৃতশব্দ বহুল প্রয়োগ করেন, এই মাত্র। এবং তাঁহার নিন্দুকের দলও যে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদিগের মধ্যে কম আছে, তাহা নহে। বাঙ্গালাভাষায় এখন প্রাচীন কালের মত মুসলমানী শব্দ প্রয়োগ হইতেছে না, তাহার কারণ মুসলমানগণের প্রতি হিন্দুদিগের প্রীতির হ্রাস নহে, তাহার কারণ মুসলমানদিগের এমন কোন প্রভাব এখন দেশের মধ্যে নাই, যাহাদ্বারা দেশবাসী তাঁহাদিগের সাহিত্য বা আদবকায়দার দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। হয়ত সেইরূপ প্রভাব থাকিলে বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টি আজ অন্য রকমে হইত। তারপর বাঙ্গালা ভাষা যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে বুঝা যায় ইহার উন্নতির মূলে সংস্কৃত ভাষা। দুই একটি শব্দের ব্যবহারে ভাষার প্রকৃতি বদলায় না। যে সময় মুসলমানী শব্দ বহুল প্রচলিত ছিল, সে সময়েও বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের আদর্শেই চলিত। কেন না বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি যে প্রাকৃতের মধ্য হইতে এবং তাহার উন্নতি যে সংস্কৃতেরই সাহায্যে! মুসলমান বিদ্বেষ জাগাইবার জন্যই জোর করিয়া কেহ যে সংস্কৃত শব্দ বেশী প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা নহে; স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কৃতের দিকে বাঙ্গালা ভাষার টান আছে বলিয়াই লেখকগণ ঐরূপ পথে চলিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষায় এখনও যে সকল মুসলমানী শব্দ এমন ভাবে জড়াইয়া আছে, যে অনেকের মনে সে সব আর মুসলমানী বলিয়াই মনে হয় না, তাহার একমাত্র কারণ

আমাদের সাহিত্য ও সমাজের উপরে প্রাচীন মুসলমানগণের অতিরিক্ত প্রভাব। সে প্রভাব স্থূল হইলে যাহা হয়, তাহাই এখন হইয়াছে। অতএব ইহার জন্য হিন্দুদিগকে দোষ দেওয়া উচিত নহে। কোন ভাষাকেই জোর করিয়া কেহ কৃত্রিম উপায়ে উন্নত করিতে পারে না। পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সে নিজের একটা স্বাভাবিক গতি লইয়াই চলে। বঙ্গভাষাও সেইরূপ তাহার উন্নতির পথে কত বর্জ্জন কত গ্রহণ করিয়া চলিতেছে। সেই চলার মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা থাকিতে পারে না, লেখক এই কথাটি যেন মনে রাখেন।

* *
*

৭। যুদ্ধের কারণ

যুদ্ধ কেন হয়, ইহার মূলতত্ত্ব কি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়া মিষ্টার এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন অন্যান্য শ্রেণীর উপরে একটি শ্রেণীর আধিপত্য-প্রয়াসই যুদ্ধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। প্রধানতঃ মানুষের মধ্যে তিনটি শ্রেণী দেখা যায়। এক শ্রেণী ধর্ম্ম লইয়া থাকেন, আর এক শ্রেণী যুদ্ধ এবং অন্য এক শ্রেণী ব্যবসায় কালযাপন করেন। এই তিনটির যে কোন এক শ্রেণী প্রধান সাজিয়া জাতির শাসনবিভাগকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেন না সেই শ্রেণীর প্রাধান্যে জাতির মধ্যে হিংসা দ্বেষ প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে কলহ বিবাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধ। এইরূপে একটি জাতির প্রধান শ্রেণীর স্বার্থ অন্য জাতির প্রধান শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করে এবং তাহাতেই আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের সূত্রপাত হয়।

এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে জার্ম্মাণী এবং বৃটেনের ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ-সংঘাতই এই বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ। যুদ্ধ নিবারণ করিতে হইলে একমাত্র গণতন্ত্র-মূলক শাসনেই তাহা সম্ভবপর, এইরূপ তাঁহার বিশ্বাস। কেবলমাত্র জনসাধারণ কর্ত্তৃক শাসনদণ্ড পরিচালিত হইলেই হয় না, সমগ্রের মঙ্গলের জন্য অংশের ত্যাগস্বীকারেই সত্য-কারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এইরূপ অবস্থা এখন আমাদের নাই, কিন্তু আজ হোক কাল হোক এইরূপ অবস্থায় আমাদিগকে উপনীত হইতেই হইবে।

* *
*

৮। দারিদ্র্য-নিবারণ

আমাদের দারিদ্র্য ঘুচাইবার জন্য নানান জনে নানান উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। কেহ বলেন বর্ত্তমান বৈষয়িক জীবনযুদ্ধে আমরা যদি বীরের মত অগ্রসর হই—অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে যে সব প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে, তাহাদেরই ধরণে অথচ উন্নত রকমে সাজ সরঞ্জাম, শক্তি সাহস এবং জ্ঞান ও একাগ্রতা লইয়া নামিতে পারি, তাহা হইলে জয়লাভ সম্ভবপর হইবে, নচেৎ নহে। কেহ বলেন, ওরূপভাবে লড়াই করিবার কোনই দরকার নাই, নিজেরা অনাবশ্যক ব্যয় বাহুল্য যদি কমাইয়া দেই, তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিনাযুদ্ধে পরাজিত হইবে। এবং দারিদ্র্যজন্য যে বেদনা এখন উপস্থিত হইয়াছে তাহাও আর থাকিবে না।

'সঞ্জীবনী' পত্রে ব্যাধি ও দরিদ্রতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা লেখোক্ত মতেরই পরিপোষক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা লেখকের কথা তুলিয়া দিতেছি,—

"সেকাল অপেক্ষা একালের লোক দৈনিক আহার পান, পরিচ্ছদ গৃহসজ্জা, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়া কর্ম্ম, সামাজিক নিমন্ত্রণ প্রভৃতি লৌকিকতা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে অতি ব্যয়ী হইয়া পড়িতেছে, অনেকেই এইরূপ বিশ্বাস করেন। বাঙ্গালীর আহার পান ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার করিলে শরীরের পুষ্টি সাধন হয় অথচ ব্যয় হ্রাস হয়, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। পঞ্চব্যঞ্জন না হইলে বাঙ্গালীর দৈনিক আহার নিষ্পন্ন হয় না। ইহাতে ব্যয় অনেক কিন্তু শরীর রক্ষার জন্য যে অবশ্য প্রয়োজন এমন কথা বলা যায় না। পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীগণ ডাল আর রুটী

খান ইহাতে ব্যয় কম অথচ তাঁহাদের শরীর বাঙ্গালীর অপেক্ষা দৃঢ়পুষ্ট। জাপানীরা ভাত আর মাছ খান—ভাতের মাড় ফেলিয়া দেন না। তাঁহাদের আহারের ব্যয় কম অথচ শরীর অতি দৃঢ়। এই সকল চিন্তা করিয়া বাঙ্গালীর আহার সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার করা প্রয়োজন, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

রন্ধন প্রণালীর জন্যও অনেক ব্যয় হইয়া থাকে। রন্ধন প্রণালীর কিরূপ সংস্কার করিলে আহার্য্য দ্রব্য সুসিদ্ধ হয়, অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাও নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

পূর্ব্বে জল, সরবৎ বা ডাবের জল ইহাই বাঙ্গালীর পানীয় ছিল। এখন সোডা, লেমনেড, চা, কফি প্রভৃতি নানা প্রকার পানীয় ব্যবহার হইতেছে। ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, শরীরের কোন উপকার হয় কিনা তাহাও বিবেচ্য।

চা চুরুটে অনেক টাকা খরচ হয়। এই উৎপাত আগে ছিল না। সেকালে চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, খৈ, গৃহজাত নারিকেলের লাড়ু, ক্ষীরের সন্দেশ প্রভৃতি জল খাবার দ্রব্য ছিল। অল্প ব্যয়ে এই সকল দ্রব্য তৈয়ার হইত, এখন তৎপরিবর্ত্তে দুষ্মূল্য মোওা মিঠাই ব্যবহৃত হইতেছে—এতদ্দ্বারা বেশী অর্থব্যয় হইতেছে, শরীরের তাদৃশ উপকার হয় কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

পরিচ্ছদের আড়ম্বরও অতি বেশী হইয়াছে। প্রথমে গঞ্জি, তাহার উপর জামা, তদুপরি কোট, এই গরম দেশে আর দরিদ্র দেশে এইরূপ পোষাক প্রচলিত হইতেছে। পায়ে মোজা ও বুট, ইহাতে পা সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। রেশমী কোট, রেশমী চাদর, ইহার ব্যবহার ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। মোটা কাপড় ও সাদাসিধে পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে অতি ব্যয় হ্রাস হইতে পারে।

গৃহ-সজ্জা ক্রমে জাঁকাল হইতেছে। পল্লী-গ্রামেও তক্তপোষ, জল চৌকি, ফরাসের পরিবর্ত্তে টেবিল চেয়ার, সোফা পালঙ্ক প্রবেশ করিতেছে। গৃহ সজ্জার একটা সীমা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বরের পণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘড়ী, চেন, পালঙ্ক, আলমারী, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি উপহার দ্রব্য, আবার, বাজারোসনাই, গোরার বাদ্য প্রভৃতি কত আড়ম্বরে বাঙ্গালীর ঘর লুণ্ঠ হইতেছে।

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে এখন দই চিড়া বা লুচি সন্দেশে কাহারও মন উঠে না। পোলাও, কোরমা, চপ কালিয়ার দরকার হইয়াছে। শ্রাদ্ধেও এখন মাছ মাংস চাই।

আগে যাত্রাগান বিনাপয়সায় শোনা যাইত, এখন থিয়েটার বায়স্কোপের পালা পড়িয়াছে। যুবক বৃদ্ধ ইহার জন্য প্রতি মাসে বহু টাকা ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইতেছে।

নানারূপে বাঙ্গালীর অপব্যয় হইতেছে। এই অপব্যয় নিবারণের জন্য চিন্তাশীল বাঙ্গালীদের মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী সময়-স্রোতে গা ভাসাইয়া না দিয়া অবনতির পথ রুদ্ধ করুন।"

এখন কথা হইতেছে এই যে যাঁহারা বীরের মত বৈষয়িক যুদ্ধে অগ্রসর হইতে বলেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না বীরত্ব আসিবে কোথা হইতে। দারিদ্র্য হইতে যতগুলি দোষ জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া থাকে, আমাদের সে সবগুলিই প্রায় হইয়াছে। হীন স্বার্থ, অবিশ্বাস, প্রতারণা প্রভৃতি নানাবিধ চরিত্রহীনতায় আমরা এখন কলঙ্কিত। সেই জন্য বর্ত্তমান প্রতিযোগীতার যুগে আমাদের যতখানি একতা, যতখানি একাগ্রতা, যতখানি উদ্যম, যতখানি ত্যাগের দরকার, ততখানি আমরা কিছুতেই লাভ করিতে পারিতেছি না। দারিদ্র্য আমাদিগকে সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহা বুঝিয়া, চোখের সম্মুখে দেখিয়াও দেশপ্রীতির অভাবে আমরা তাহা উন্মূলন করিতে অক্ষম। আবার যাঁহারা আমাদিগকে বিলাস ব্যসন প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিতে বলেন, তাঁহারাও ভুলিয়া যান যে আমাদের এমন কোন শিক্ষাই দেওয়া হয় না, যাহাতে আমরা ত্যাগের মাহাত্ম্য অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করিয়া সংযমের পথে চালিত হইতে পারি। অভাবের বিভীষিকা চোখের উপর ধরিলেও সম্মোহিত চিত্ত তাহাতে প্রবুদ্ধ

হইবে কিরূপে? চিত্তের এই সম্মোহন ঘুচাইতে হইলে আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা আবশ্যক—যে শিক্ষা আমাদের অন্তরে জাতীয় সমাজের প্রতি গভীর প্রীতি সঞ্চারিত করে—আমাদের স্বার্থ ব্যক্তিগত না করিয়া সমষ্টিগত করিয়া তুলে—আমাদিগকে যথার্থ মনুষ্যত্ব দানে ধন্য করে। সভা সমিতি করিয়া ভয় দেখাইয়া, সংস্কারের ডঙ্কা বাজাইয়া আমাদিগের চৈতন্য জাগ্রত করিবার প্রয়াস ব্যর্থ বিড়ম্বনা মাত্র।

* *
*

৯। স্বার্থহীনতার শিক্ষা

ধর্ম্ম শিক্ষা ব্যতীত যে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। আমাদের সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া 'কায়স্থ পত্রিকা' বলিতেছেন, "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক মূল্যহীন নহে, উহার অপব্যবহারই উহার গৌরবহীনতার বিষয়। স্বাধীন চিন্তা ব্যতীত আমাদের প্রতিভা কার্য্যকরী হইতে পারিবে না। ধর্ম্ম শিক্ষা আমাদের বিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার মূলে সংস্থিত হওয়া আবশ্যক। এবং তজ্জন্য বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের যুবকবৃন্দ যাহারা জাতির ভবিষ্যৎ পিতা স্বরূপ তাহাদিগের জীবনে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে হইবে। এবং শিক্ষিত বর্গের দেশের জনসাধারণকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষা দান করিতে হইবে। সুতরাং এতগুলি বহু আয়াসসাধ্য ও কঠোর স্বার্থত্যাগময় কর্ম্ম-নিচয় আমাদের সম্মুখে আমাদের কর্ম্মকর হস্তের প্রতীক্ষা করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যদি আমরা এই কঠোর ব্রতাবলম্বন করিয়া তাহা উদ্যাপন করিতে পারি তবেই সিদ্ধি আমাদের হস্তগত—তবেই জাতিকে উন্নত করিতে সমর্থ হইব। সমাজকে শিক্ষিত করিতে পারিব। তবে আমরা এ কথা বলিতে সাহস করি যে জাতি বা সমাজকে এ ভাবে শিক্ষিত করা সময় সাপেক্ষ। এবং যে ভাবেই আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই না কেন, স্বার্থ ত্যাগ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিতে হইবে। নতুবা বর্ত্তমান সময়ের যে সকল দেশহিতকর ও সমাজসংস্কারক সম্প্রদায়গুলি কর্ম্মের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের পরিশ্রম বৃথা হইবে। এবং এ কথার প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরের সত্যতা আমরা স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখিতে পাইয়াছি। যখন, যত ক্ষুদ্র ভাবেই আমরা দেশের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি না কেন, উহা স্বার্থহীন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া থাকিলে উহার পুরস্কার আমরা অবশ্যই উপার্জ্জন করিতে পারিব। যে কোন ভাবে আসিয়া সে কর্ম্মের ফল আমাদিকে বহিবেই সুতরাং ইহাই যদি আমাদের জাতীয় জীবনের যথার্থ চিত্র হয়, তাহা হইলে স্বীয় প্রতিভার বিশ্বাস-পরায়ণ হইয়া স্বাধীন চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এবং স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক সে চিন্তার ফল দেশের জীবন নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে।"

* *
*

১০। ভারতের সঙ্গীতকলা

মনোবিজ্ঞান পড়াইবার সময় কলেজের ইংরাজ অধ্যাপক অনেকবার আমাদিগকে শুনাইয়া থাকেন, "তোমাদের দেশীয় সঙ্গীতে melody আছে কিন্তু harmony নাই—কিন্তু আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঙ্গীতের চর্চ্চা হয় বলিয়া harmony সাধন করা সম্ভবপর হইয়াছে।" পাশ্চাত্য দেশ আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই এতদিন পোষণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় সেদিন প্রবাসীতে জানাইয়াছেন, পাশ্চাত্যের এই ধারণা এখন অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদিগের একজায়গায় মিলিয়া বুঝাপড়া না হইলে এইরূপ বিকৃত ধারণা থাকিয়া যায়। পশ্চিম এখন ভারতের সঙ্গে নানাস্থলে মিলিতেছে, এবং মিলিতেছে বলিয়াই ভারতের মাহাত্ম্য নানাদিক হইতে বুঝিতে পারিতেছে।

ভারতবর্ষ সঙ্গীতকে কেবলমাত্র অলসের আমোদরূপে ব্যবহার করে নাই। যাওয়া

পূজা ধ্যান ধারণার মত ইহাকেও জীবন যাত্রার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। 'প্রতিভা' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই উক্তির সমর্থন করিতেছি। "কিম্বদন্তী ছাড়িয়া দিয়া, ইতিহাসের আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, কি রাজদরবারে, কি সাধারণ লোকের নিকট, সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যা মধ্যে সঙ্গীতকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে। নাটকীয় অভিনয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে সঙ্গীত একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ বিশেষ। মানুষের নৈতিক চরিত্রগঠনেও ইহার প্রভাব বড় কম নয়, এবং শিক্ষা-ক্ষেত্রেও ইহার স্থান সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় সঙ্গীতশিল্পেরও যে অবসাদ দেখা যাইতেছে, কোনও আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা বা ধ্বংসপ্রবণতা তাহার কারণ নহে। পাশ্চাত্য প্রভাবকে ভারতবাসীরা আজিও আপনাদের প্রকৃতির অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে নাই,—অথচ হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য হইয়া শুধু অনুকরণই করিতেছে। এই পাশ্চাত্য প্রভাবের আধিপত্য, ভারতে প্রতীচ্যজগতের বণিক-প্রকৃতির প্রবেশ লাভ, এবং পারিবারিক শিল্পপ্রথার পরিবর্ত্তে ফ্যাক্টরী প্রথার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি এতাবৎ ভারতীয় সঙ্গীত প্রতিভাকে দমিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের সর্ব্বত্র নবজাগরণের যে লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা হয় যে ভারতীয় ললিতকলা আবার স্বীয় স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে ক্রমোন্নতি লাভে সমর্থ হইবে।

ভারতীয় জীবনের সহিত সঙ্গীত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, চিরাগত প্রথা হইতে উহা কখনই স্থায়ীভাবে স্খলিত হইবে না। প্রকৃত জাতীয় সঙ্গীত আজিও কিছুমাত্র প্রবঞ্চিত হয় নাই। রাজোচিত সম্মান বা অধিকার হইতে উহাকে বিচ্যুত করা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রকৃত জাতীয় সঙ্গীতই আমাদের বিবেচ্য বিষয়,—সাধারণতঃ বৈদেশিকগণ মিশ্রিত ও পাশ্চাত্য প্রভাবে কলুষিত যে একপ্রকার গান বা চীৎকার শুনিয়া থাকেন, তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। এই শিল্প এতকাল বৈদেশিকগণের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিয়াছিল। এতদিন এ সম্বন্ধে কিছুই শোনা যায় নাই বা লেখা হয় নাই; কোনও সমিতি কর্ত্তৃক ইহার প্রণালী বা নিয়মাদির আলোচনা করা হইয়াছে বা ইহার রক্ষার জন্য কোনও চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। তথাপি ইহা এক গৌরবময় অবিচ্ছিন্ন অতীত লইয়া আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে ইহা হইতে পারে, ইউরোপীয়দের কাছে তাহা প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু প্রাচ্য দেশে এরূপ ঘটনা আদৌ অসম্ভব বা অসাধারণ নহে। আমাদের গ্রীককাব্যগুলি পূর্ব্বে মুখে মুখেই প্রচারিত হইত; এক্ষণে তৎসমুদয় লিখিবার প্রথা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই মৌখিক প্রচার কার্য্য লিখিবার প্রথার সহিত একত্র বর্ত্তমান থাকিয়া এযাবৎকাল স্বীয় স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর ছিল। বরং বড় বড় গ্রন্থগুলির এইরূপভাবে প্রচার করাই সুসঙ্গত বিবেচিত হইত। মনোভাবের ব্যাখ্যা করাই যে শিল্পের একমাত্র কার্য্য বা উদ্দেশ্য, মৌখিক প্রচারের অধিকতর স্বাধীনতা-দ্বারাই অধিকতর স্বাধীনভাবে সেই শিল্পের অনুশীলন সম্ভবপর। এই কারণেই সাহিত্য অপেক্ষা সঙ্গীতেই মৌখিক প্রচারের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হইত এবং এই জন্যই ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা লেখা দেখিয়া মুখস্ত করিতে অসম্মত ছিল। এই জাতীয় শিল্পের একনিষ্ঠ সেবকেরা আজিও এই মৌখিক প্রচারেরই সমর্থন করিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণ সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহারের জন্য যে ধূয়া উঠিতেছে, উহা যথার্থই কার্য্যে পরিণত হইলে, ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

ডাক্তার কুমার-স্বামী বলিয়াছেন যে "প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও শিক্ষাসংস্কারকগণ যে পরিমাণে ভারতীয় সঙ্গীত অবহেলা করিয়াছেন, তাঁহারা, ঠিক সেই পরিমাণে

ভারতবাসী ও ভারতবর্ষকে বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন।"

অভিযোগটী এতই গুরুতর যে উহা অবহেলা করিলে চলিবে না। বাস্তবিকই যদি ইহা সত্যই হয়, তবে প্রকারান্তরে এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের সঙ্গীতের গুরুত্ব সম্বন্ধে বাস্তবিক যতটা দাবী করিতে পারেন, ভারতবর্ষীয়দিগের তাহাদের নিজ সঙ্গীতশাস্ত্রসম্বন্ধে দাবী তদপেক্ষা অনেক বেশী। পাশ্চাত্য-দেশীয়েরা সঙ্গীতবিষয়ে যতই বাক্যাড়ম্বর করুক না কেন, ইহা ঠিক যে একমাত্র বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত অপর কেহই তাঁহাদের সঙ্গীতের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ ছাড়া অসংখ্য লোকের নিকট বর্ত্তমান ইউরোপীয় সঙ্গীতের মূল্য অতি সামান্য। সঙ্গীতের দ্বারা ইহাদের দৈনন্দিন জীবন কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত নহে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতবাসীগণের জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব এতদপেক্ষা অনেক বেশী। যেরূপ প্রণালীবদ্ধভাবে ইউরোপীয় সঙ্গীতের অনুশীলন হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেরূপ কিছুই হয় নাই বটে—কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব বা কার্য্য কিছুমাত্র কম নহে।

আজিও সঙ্গীত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশবিশেষ বলিয়া স্বীকৃত হইবার সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই;—এখনও উহা আমাদের নিত্য কর্ম্মের বাহিরেই পড়িয়া আছে। যাহার যেরূপ রুচি বা বুঝিবার ক্ষমতা, সঙ্গীতালোচনায় সে সেইরূপ আমোদ পাইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্গীতের দ্বারা চরিত্র গঠিত বা আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হৌক, কেহই ইহা আশা করে না। সঙ্গীত আমাদের উচ্চ শিক্ষার একটা আবশ্যক অঙ্গবিশেষ বটে,—কিন্তু উচ্চ শিক্ষাকে আমরা দৈনন্দিন জীবনের আবশ্যক অন্তরঙ্গরূপে ধরি না। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞগণই সঙ্গীতরসভোগের অধিকারী, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা একবাক্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। সঙ্গীত বিশেষ স্বাভাবিক রুচি বা প্রবৃত্তি আছে, এমন কি প্রতিভাও আছে—সঙ্গীতজ্ঞ বলিতে ইউরোপে এমন লোককে বুঝায় না। সেখানে সঙ্গীতজ্ঞের অর্থ—এসম্বন্ধে যার একটু বেশ ব্যবসাদারী জ্ঞান বা চা'লচলন আছে।

কিন্তু ভারতবর্ষীয়গণের জাতীয় জীবন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, সেখানে সঙ্গীত ধর্ম্মেরই সহচর, এবং সঙ্গীতানুশীলন যেমন একটা আমোদপ্রদ ব্যাপার, সেইরূপ একটা ধর্ম্মানুষ্ঠানও বটে। বেদ হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি এবং ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধর্ম্মকর্ম্মের সাহায্যকল্পে নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি, আজিও প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপবহুল প্রত্যেক উৎসব এবং অনেক নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য পর্য্যন্তও তাল মান লয়-শুদ্ধ সঙ্গীত বা নৃত্যের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে।"

বৌদ্ধমন্দিরে ঘণ্টা-গৃহ

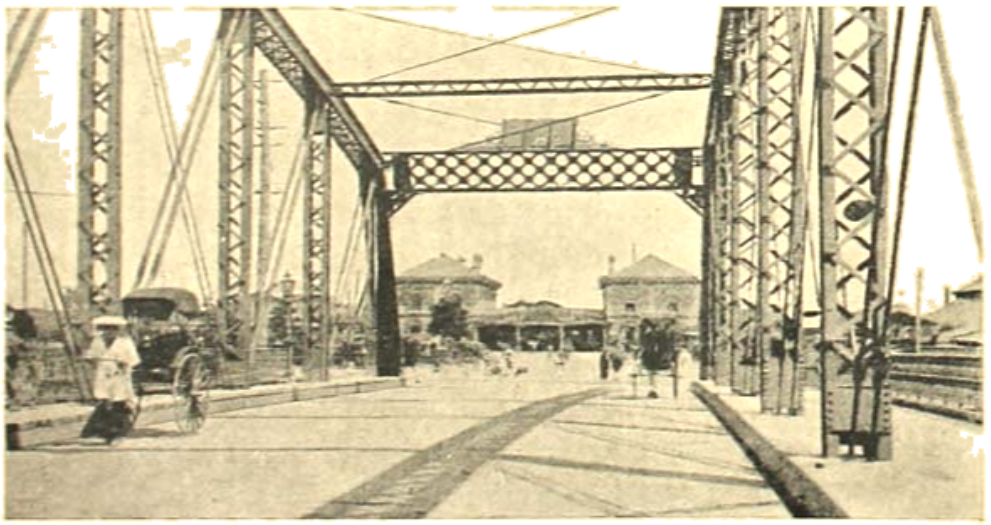

ইয়োকোহামার একদৃশ্য

India Press Calcutta

বর্ত্তমান জগৎ

(চতুর্থ ভাগ)

ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীন এশিয়ার রাজধানী

১। টোকিওর পথে

জাহাজ প্রত্যূষে আসিয়া ইয়োকোহামায় ঠেকিল। জাপানে এখন বর্ষাকাল। আকাশ মেঘে ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন। বিলাতেও এই সময়ে অবস্থা প্রায় এইরূপ—কিন্তু শীত কিছু বেশী।

ইয়োকোহামা বন্দর দেখিয়া নিউইয়র্কের বিরাট দৃশ্য ত মনে আসিলই না—এমন কি ফ্রান্সের মার্সেলও জাপানের সেরা বন্দর অপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন বোধ হইতে লাগিল।

এতদিন পর আবার ভাষাসমস্যায় পড়িলাম। ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট ইংলিশস্থান ও ইয়াঙ্কিস্থান হিন্দুস্থানেরই বিস্তার মাত্র। এই দুই দেশের প্রত্যেক স্থানে নিজের দেশেই আছি ভাবিতাম। লোকজনের কথা বুঝিতে পারার এই ফল। আজ হিন্দু-প্রভাব-সমন্বিত এশিয়ার এক অংশে পদার্পণ করিবামাত্র নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। ইয়োরামেরিকার নর-নারীগণই এশিয়াবাসী অপেক্ষা ভারতবাসীর আত্মীয় মনে হইতেছে। ভাবিতেছি—"ইংরাজকে, ইয়াঙ্কিকে চিনিতে জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু জাপানীকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও সফল হইব কি ?"

'এশিয়ার ঐক্য' কথাটা বর্ত্তমানযুগে শব্দ মাত্র। প্রাচীন যুগে ভাষার ঐক্য না থাকিলেও সাহিত্যের ঐক্য, ভাবের ঐক্য, আদর্শের ঐক্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের ঐক্য, সুকুমার শিল্পের ঐক্য, পূজাপাঠের ঐক্য ইত্যাদি ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক কালে এশিয়াবাসীর মূলমন্ত্র আসে এশিয়ার বাহির হইতে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, আদর্শ, প্রেরণা ইত্যাদি সবই এশিয়া ইয়োরামেরিকা হইতে আমদানি করিয়া থাকে। ইয়োরামেরিকার সাগ্‌রেদী করিয়াছি বলিয়া ইয়োরামেরিকার প্রভাবে ও সাহায্যে ইয়োরামেরিকার কৃতী শিষ্য জাপানকে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিব মাত্র। সুতরাং এশিয়ার ঐক্য মিথ্যা কথা—এশিয়া অনেক। পরন্তু ইয়োরামেরিকা অনেক ক্ষেত্রে সত্যসত্যই এক। ইয়োরামেরিকার ঐক্যেই দুনিয়ায় একটা চলনসই ঐক্যবন্ধন সৃষ্ট হইয়াছে। ইংরাজী ভাষা বর্ত্তমানযুগে এইরূপ এক বন্ধন-রজ্জু।

ইংরাজী ভাষাকে সম্বল করিয়া কোন ইতালীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিলে হিন্দুস্থানের কতখানি বুঝিতে পারিবেন? ভারতবাসীও ইংরাজীর মাহাত্ম্যে জাপানী-জীবনের ঠিক ততটুকুই বুঝিতে পারিবেন। বরং ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষে ইংরাজীর সাহায্যে যথেষ্ট উপকার হয়। কিন্তু জাপান ত এক মাত্র ইংলণ্ডকেই বর্ত্তমান জগৎ বিবেচনা করে না। জাপানীরা কেহ জার্ম্মাণ শিখে, কেহ ফরাসীতে গ্রন্থ লিখে, কেহ বা ইংরাজী চর্চ্চা করে। কাজেই ইংরাজী জানা লোক জাপানে বেশী না থাকারই কথা। মিশরের অবস্থাও এইরূপ দেখিয়াছি। মিশরীয়েরা এতকাল ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের আদরই করিয়াছে।

বন্দরে নামিয়া টুরিষ্ট কোম্পানীর আশ্রয় লইলাম। একজন লোক সঙ্গে পাওয়া গেল—জাতিতে রুশ—ইংরাজী কথা মন্দ বলে না। যথারীতি মাল পরীক্ষা সুরু হইল। কাষ্টম আফিসের কর্ম্মচারীরা বাক্স খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন তামাক চুরুট ইত্যাদি সঙ্গে আছে কি না। প্রত্যেক বন্দরেই এই ব্যবস্থা।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন মার্কিণ কমডোর পেরি জাহাজ লইয়া জাপানে উপস্থিত হন তখন ইয়োকোহামা একটা ধীবর-পল্লী মাত্র ছিল। আজ এই বন্দরে রণতরী বাঁধা থাকে—ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্র এই বন্দরের ভয়ে জড়সড়—এই জাহাজখানার শক্তি খর্ব্ব করিতে পারিলে ইংরাজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, রুশ সকলেই যারপর নাই সন্তুষ্ট হয়। ষাট বৎসরে এই রূপান্তর।

অথচ ইয়োকোহামা সহরটা এখনও নিতান্ত জাঁকজমকহীন ও দরিদ্র দেখিতেছি। না আছে অট্টালিকা বৈভব—না আছে অগণিত লোকসমাগম। ইয়োরামেরিকার নগরগুলির তুলনায় ইয়োকোহামা এখনও একটা পল্লীই বটে।

এই সহরে মোটর-কার নাই বলিলেই চলে—ঘোড়ার গাড়ীও নাই। রাস্তায় হৈহৈ রৈরৈ সামান্য মাত্র দেখিতে পাই না। হোটেল, দোকান, বাজার ইত্যাদির ঐশ্বর্য্যই বা কৈ? জাপানকে এশিয়ার ইংলণ্ড, এবং আজকাল জার্ম্মাণি বলিয়া বিবৃত করা হয়। অথচ তাহার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র এত দরিদ্র কেন? দেখিতেছি ইয়োরামেরিকার সমান ধনশালী ও চালচলনশীল না হইয়া ইয়োরামেরিকার বিজ্ঞান ও শিল্পের মূলমন্ত্র আয়ত্ত করা যায়। আর নিতান্ত দরিদ্র পল্লীবাসী জাতিও দুনিয়ায় প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি (First class power) হইতে পারে। ইয়োকোহামায় নামিবার পূর্ব্বে এই কথাটা যথার্থরূপে বুঝিতে পারিতাম না। আজ বিস্ময়ের সীমা নাই। এই বিস্ময় দুনিয়ার সপ্তম আশ্চর্য্যজনক বস্তু বা অষ্টম আশ্চর্য্যজনক বস্তু দেখিবার বিস্ময়েরই অনুরূপ।

ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে ঠেলা-গাড়ীর চলন আছে। সেইরূপ ঠেলা গাড়ীতে মাল চাপাইয়া জাপানী ঠেলাওয়ালারা সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। আমি বসিলাম মানুষ-ঠেলা রিক্‌শতে। এইরূপ ঠেলাগাড়ী এবং রিক্‌শই ইয়োকোহামার স্থল-যান। কতকগুলি গরুরগাড়ীর মত গাড়ীও দেখা গেল। এই সমুদয়ে মানুষ যাওয়া আসা করে না—মাল চালান দেওয়া হয়। এইগুলির বাহক গর্দ্দভপ্রায় অশ্ব। লিভারপুল, নিউইয়র্কের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্য বন্দরের দৃশ্য এইরূপ।

রাস্তায় লোকজনের পায়ে কাহারও জুতা

আছে কাহারও বা নাই। জুতাও বিচিত্র। কাঠের খড়ম অথবা খড়ের চটি জুতা অধিকাংশ চরণের আবরণ দেখিলাম। চামড়ার সম্পূর্ণ জুতা অথবা বুট প্রায় কোন পথিকের পায়েই দেখা গেল না। বস্ত্রের মধ্যে জাপানী আলখাল্লা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের চৌগা চাপকান, মিশরের গালাবিয়া আর জাপানীদের "কিওমনো" একশ্রেণীর অন্তর্গত। মাথার টুপি একধরণের নয়—তবে সকলের মস্তকেই একটা না একটা আবরণ রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের মাথায় বিচিত্র খোপাই একমাত্র শিরস্ত্রাণ। জাপানী রমণীরা সর্ব্বদা বসিবার আসন সঙ্গে লইয়া যাতায়াত করে। এই আসন পৃষ্ঠে বোঁচকার মত বাঁধা থাকে। ইহারা শিশুসন্তানগণকে কোলে করিয়া বেড়ায় না—পীঠে বাঁধিয়া রাখে। ভারতবর্ষে পাহাড়ী মেয়েরা এইরূপ করে।

সহরের এদিক ওদিক সামান্য মাত্র ঘুরিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিলাম। নগরের অন্যান্য দৃশ্যে যেরূপ এখানেও সেইরূপ দারিদ্র্যের লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি। গাড়ীগুলি ছোট ছোট—কোন মতে কাজ সারা যায় এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। ইয়াঙ্কিস্থান কুবেরের রাজ্য—সেখানকার বিষয়সম্পদ দেখিতে দেখিতে চাল বড় হইয়া গিয়াছে। কাজেই জাপানের বাহ্য অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইতেছি। যে পরিমাণে হতাশ হইতেছি সেই পরিমাণে আবার বিস্ময় বাড়িতেছে। যতই বিস্ময় বাড়িতেছে ততই ভাবিতেছি—"রূপেতে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে?" দুনিয়ায় সম্পদহীন জাতিমাত্রেই জাপানের বাহ্য দুরবস্থা দেখিলে স্বকীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইবে সন্দেহ নাই।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। জাপানের কয়েকখানা ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। এই সকল কাগজে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের পক্ষ প্রধান ভাবে অবলম্বিত হইয়া থাকে। জাপানে একখানা মাসিকপত্র ইংরাজীতে সম্পাদিত হয়। নাম The Japan Magazine. ইহারও এক সংখ্যা কাগজের দোকানে পাওয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই কাগজের কথা জানা ছিল। ভারতবাসীরা এইখানা নিয়মিত পড়িলে নব্য জাপানের লেখকগণকে বুঝিতে পারিবেন। জাপানীরা বিগত দুই বৎসর হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে কারবার বাড়াইবার জন্য ঝুঁকিয়াছে। এইজন্য এই মাসিকপত্রের পরিচালকগণ আজকাল ভারতীয় মাসিকপত্রে নিজেদের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকেন। লেখকেরা অধিকাংশই জাপানী।

এশিয়া ছাড়িবার সময়ে মিশর দেখিয়াছি—এশিয়ায় প্রবেশ করিবার সময়ে জাপান দেখিতেছি। মিশরে ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও সৌন্দর্য্যের আকর দেখিতেছি মনে হইত। জাপানের দৃশ্য প্রথম দৃষ্টিতে একেবারেই চিত্তাকর্ষক নয়।

রেলপথের দুই ধারে নিতান্ত অবজ্ঞেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগৃহ। ঘরগুলি যেন খেলানার সামগ্রী মাত্র। খড়ো চালা অথবা খোলা বা খাপরার ছাদ প্রায় অধিকাংশ গৃহেই দেখিতেছি। কোন কোন স্থানে সাধারণ টিনের ছাউনি। দোকানগুলি ভারতীয় পাড়াগেঁয়ে দোকানের মত। মাঞ্চেষ্টার লণ্ডন ইত্যাদির পার্শ্বে এই ধরণের পল্লী কল্পনা করা অসম্ভব।

রেলপথের দুই ধারে কৃষিক্ষেত্র—চাষীরা কাজ করিতেছে। বর্ষাকাল—ক্ষেতে কাদা—কৃষকেরা ছত্রসদৃশ বৃহদাকার তালপাতার

টুপি মাথায় পরিয়া আছে। ভূমিতে উদ্ভিদের কোন বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষ্য করিলাম না। পোর্ট-সৈয়দ হইতে কাইরোর পথে কৃষি-ক্ষেত্রের কত বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে—এখানে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। বরং মোটের উপর বিশ্রী ও বন্যাকার দৃশ্যই দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। স্থানে স্থানে বাঙ্গালা দেশের পচা ডোবার জল ও দুর্গন্ধময় খালের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। স্থানে স্থানে উচ্চ পাহাড় থাকায় চট্টগ্রাম অঞ্চল মনে পড়ে—কখনও কখনও ফরিদপুর বা রাজশাহী জেলার ম্যালেরিয়াপ্রধান মাঠ যেন সম্মুখে বিস্তৃত। গোয়ালন্দ দামুকদিয়া পোড়াদহ ইত্যাদির হাট বাজার দোকান হোটেল ও আবহাওয়া যেন জাপানের এই স্যাতস্যাতে অঞ্চলে দেখিতে পাইতেছি। প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে টোকিও পৌঁছিলাম।

২। খোলার ঘরের মহানগরী

টোকিও ষ্টেসন বেশ বড়—কিন্তু রাজধানীর কোলাহল কিছুই শুনিতে পাই না। শুনিলাম এই সহরে বিশলক্ষ নরনারীর বাস—কিন্তু রেলে, ষ্টেসনে, রাস্তায় তাহার কোন চিহ্ন নাই।

ইয়াঙ্কিরা জাপানীদের গুরু—ইয়াঙ্কিস্থানের প্রয়াসেই জাপান দুনিয়ার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই ইয়োকোহামায় টোকিওতে ইয়াঙ্কি প্রভাব দেখিতে পাইলাম। রেলওয়ে, ষ্টেসন, গাড়ী, যাতায়াত সহরের বিভিন্ন বিভাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে জাপানীরা ইয়াঙ্কিদের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। শাসন এবং কার্য্য নির্ব্বাহও ইয়াঙ্কি মতে হইতেছে।

টোকিওতেও রিক্‌শ। ভারতবর্ষের একটা সাধারণ মফঃস্বলের সহরের ভিতর দিয়া যেন যাইতেছি। নিউইয়র্ক লণ্ডন ইত্যাদির কোন কোন রাস্তায় শুইয়া থাকিতে প্রবৃত্তি হয়—সেগুলি এমনই সুগঠিত সুশ্রী ও পরিষ্কার। টোকিওর পথ ঘাট কর্দ্দমময় অপরিষ্কার। ইয়োরামেরিকার মাপকাঠিতে এখানকার রাস্তাগুলিকে পাকা রাস্তা বলা উচিত নয়। ট্রাম চলিতেছে—কিন্তু লোকের ভিড় নাই। কয়েকটা বড় বড় অট্টালিকা পথে পড়িল—এগুলি ছাড়া অন্যান্য গৃহসমূহ কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ও অনুচ্চ। ছাদ প্রায় সর্ব্বত্রই টালি-নির্ম্মিত।

হোটেলে জিনিষপত্র রাখিয়া নগরদর্শনে বাহির হইলাম। কাইরোকে প্রাসাদপুরী মনে হইয়াছিল—টোকিওকে কুটির-নগর বলা যাইতে পারে। সত্যসত্যই টোকিও চালা-ঘরের রাজধানী। ইট পাথরের ঘর এখানে অতি বিরল। সহরের মধ্যে এইরূপ উল্লেখযোগ্য ভবন মাত্র দুই চারিটা আছে। বলা বাহুল্য জাপানী নরনারীগণ এই সমুদয় গৃহ অতিশয় কৌতূহলের সহিত দেখিয়া থাকে। আমাদের তাজমহল দেখা আর জাপানীদের "পাকা বাড়ী" দেখা অনেকটা একধরণের।

অনুচ্চ খোলার ঘরের রাজধানীর ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে ইহার একপ্রকার সৌন্দর্য্যও লক্ষ্য করিলাম। সে সৌন্দর্য্যের নমুনা ইয়োরামেরিকার কুত্রাপি পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষের কুটির-সভ্যতার তাহার নিদর্শন অনেক দেখা যায়। চৌয়ারি আটচালা, বাঙ্গালা ঘর, ইত্যাদির গঠনরীতি দেখা থাকিলে টোকিওর গৃহ-নির্ম্মাণশিল্প অনুমান করা সহজ। আমাদের দেশে মধ্যযুগে জমিদার ও রাজরাজড়ারা এই ধরণের গৃহ প্রস্তুত করিয়াই নগর বা

ডাইমোদ্বয়ের কলহ

টোকিওর একদৃশ্য

পল্লী বসাইতেন। টোকিওতে ঘুরিতে ঘুরিতে মহারাষ্ট্রের পুণানগরে আছি মনে হইল। সেখানকার "গায়কবাড়-ওয়াড়া" যেন জাপানী রাজধানীর পাড়ায় পাড়ায় দেখিতে পাইলাম।

এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম যে জাপানীরা আপাদগোড়া পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপে পড়িয়া জাতীয় বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে। ইয়োকোহামা এবং টোকিওর বহির্দ্দৃশ্য দেখিয়া ত তাহার কোন পরিচয় পাইলাম না। জাপানের হাট বাজার মাঠ বাগান রাস্তা ঘাট বাড়ীঘর লোক জন ইত্যাদি দেখিয়া ইয়োরামেরিকার প্রভাব শীঘ্র শীঘ্র অনুমাণ করা কঠিন। বরং জাপানীদিগকে ভারতবাসীর জাতি বিবেচনা করাই সহজ ও স্বাভাবিক। ইয়োরামেরিকায় ও জাপানে আদৌ কোন আদানপ্রদান বা সংমিশ্রণ আছে কি না তাহা গ্রন্থে বর্ণিত প্রমাণ ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। জাপানকে ইয়োরামেরিকার অনুকরণ মাত্র অথবা দালান বা উপনিবেশ মাত্র ভাবিবার কোন কারণ নাই। জাপানে ইয়োরামেরিকা আসিয়াছে সত্য—কিন্তু সর্ব্বত্র এশিয়াই দেখিতে পাইতেছি।

ইয়োরামেরিকার বিচারে যেরূপ জীবনযাপনকে নিম্নতর মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র বলা হয় জাপানের লোকজন বাড়ীঘর দেখিলে মোটের উপর সেইরূপ সংসারযাত্রার কথা মনে হইবে। সমগ্র বৈষয়িক জীবনই পাশ্চাত্য সমাজে যথেষ্ট উচ্চতর ভূমির উপর অবস্থিত। অশনবসনের যে সমুদয় দ্রব্য ইয়োরামেরিকায় একান্ত আবশ্যক জাপানীর বিচারে সেগুলি হয়ত বিলাস সামগ্রী স্বরূপ।

কয়েকটা গলি ও সঙ্কীর্ণ বক্র পথ অতিক্রম করিয়া একজন অধ্যাপকের গৃহে আসিলাম। অধ্যাপক গৃহে নাই। একজন আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আগন্তুককে দেখিবামাত্র সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল! ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর এতখানি মস্তক অবনত করা এই প্রথম দেখিলাম। ইয়োরামেরিকায় সম্মান প্রদর্শনের জন্য মাথা হেঁট করিবার রীতি নাই। এশিয়ার চরণ-বন্দনা করাই দস্তুর। দাসীর কথা আমি বুঝিলাম না আমার কথাও দাসী বুঝিল না। দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম গৃহের ভিতর হইতে একজন রমণী উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন। বোধ হয় তিনি অধ্যাপকপত্নী। আবার এশিয়ার কথাই মনে হইতেছে—ইয়োরামেরিকার নয়। স্ত্রী-স্বাধীনতার পাশ্চাত্য সংস্করণ জাপানে অতি সামান্য মাত্র আমদানি হইয়াছে। জাপানে ও ভারতবর্ষে এ বিষয়ে প্রভেদ অল্প। বিকৃশ-বাহক সংবাদ লইল অধ্যাপক গৃহে নাই। দুর্গন্ধময় পঙ্কিল নর্দ্দমা ও পাড়াগেঁয়ে "কাঁচা" গলির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

হোটেলের স্বত্বাধিকারিগণ সকলেই জাপানী—কর্ম্মচারী এবং দাস দাসীরাও স্বদেশী। কিন্তু খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত ইয়োরামেরিকার আদর্শে করা হয়। হোটেলে নানাদেশীয় পর্য্যটক অথবা জাপান-প্রবাসী বাস করিতেছেন। জাপানীও কয়েকজন আছেন। রুশ, ফরাসী এবং ইংরাজ পর-রাষ্ট্র-দৌত্য বিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারী এই হোটেলের মক্কেল। খানাঘরে জাপানীরা তাঁহাদের স্বদেশী পোষাকই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য শ্বেতাঙ্গ অতিথিগণ ইহাঁদের খড়ো চটিজুতা এবং অসভ্যতাসূচক আলখাল্লার বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন

না। ইয়োরামেরিকায় খানাঘরের পোষাক ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়ম অত্যন্ত কড়া। কিন্তু জাপান যে first class power—কাজেই তাহার রাজধানীতে শ্বেতাঙ্গদের আস্ফালন টিকিবে কেন?

জাপানী দাস দাসীরা মনিবদিগকে অত্যন্ত খাতির করে দেখিতেছি। ইয়োরামেরিকায় খাতির সম্মান ইত্যাদির বেওয়াজ নাই বলিলেই চলে। বিলাতে Please বা Thank you বলিলেই চূড়ান্ত খাতির করা হয়—ইয়াঙ্কিস্থানে এই সকল শব্দের ব্যবহারও অত্যন্ত কম। ইয়াঙ্কিরা কেহ কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। কিন্তু জাপানী ভৃত্যেরা মনিবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঠে এবং অনেকখানি মাথা নীচু করিয়া অভিবাদন করে। এই অভ্যাস কি নিতান্তই গোলামীর লক্ষণ? ইহাতে জাতীয় চরিত্রের নূতন একপ্রকার উৎকর্ষ বুঝা যায় না কি?

আর দেখিলাম হোটেলে নৈশভোজনের জন্য বহুলোক আসিতেছেন—সকলেই জাপানী। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি? ইহারা কি হোটেলেই থাকেন?" ইনি বলিলেন—"না। আমাদের হোটেল টোকিও-সহরের সমাজকেন্দ্র। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এখানে ৮।১০টা সমিতির বৈঠক, আলোচনা, উৎসব ইত্যাদির সঙ্গে ভোজ হয়। জাপানের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের গণ্যমান্য সকল লোকই কোন না কোন উপায়ে এই সকল বৈঠকের সঙ্গে লিপ্ত আছেন। কোন কোন দিন রাত্রে দুই হাজারের অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। আজ প্রায় ৩০০ অতিথি উপস্থিত।" ভাবিলাম এই হোটেল ওয়াশিংটনের কস্‌মস্ ক্লাবের সমকক্ষ।

নব্য জাপানের কতিপয় প্রতিষ্ঠান

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাঙ্গালা দেশে বর্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে। জাপানেও তাহাই দেখিতেছি। আজ পূর্ণাদমে অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে। বহুদিন পর ঝমঝম বৃষ্টিপাত দেখিলাম—কিন্তু মেঘের গুড়ুম গুড়ুম ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর শুনি নাই। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মুখও অনেকদিন দেখা হয় নাই।

বৃষ্টির মধ্যেই রিক্‌শতে বাহির হইলাম। কলিকাতার বর্ষাকাল দেখিতে পাইতেছি। ট্রাম-গাড়ীগুলির ভিতর খড়মের কাদা জমিয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতা মাথায় দিয়া লোক জন চলাফেরা করিতেছে। পাশ্চাত্য ধরণের ছত্র অনেকেই ব্যবহার করে না। আমাদের দেশে কৃষকেরা যেরূপ তালপাতার ধামা স্বরূপ প্রকাণ্ড টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে সেইরূপ টুপি টোকিওতেও ব্যবহৃত হইতেছে মাঠের কৃষক এবং রাস্তার পথিক উভয়েই এই ধরণের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে। ইহার দ্বারা রৌদ্র বৃষ্টি দুই হইতেই রক্ষা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ঘরের চালা-স্বরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছত্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নদীর ঘাটে, সাধু সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে, তীর্থক্ষেত্রে, কুম্ভমেলায় এই ধরণের ছত্র অনেক দেখা যায়। সেই শ্রেণীর ছাতাই আজ বাদলার দিনে টোকিওর পথে পথে দেখিতেছি। জাপান ইয়োরামেরিকা হইতে এখনও বহুদূরে নহে কি?

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী দেখিলাম। অধ্যাপক কাজুতোশী উয়েদার সঙ্গে নিউইয়র্কে আসিবার সময়ে যাহাদের আলাপ হইয়াছিল।

ইহার সঙ্গে জাপানী ভাষা সম্বন্ধে খানিকক্ষণ গল্প হইল। ইনি বলিলেন—"জাপানীদের পক্ষেই জাপানী ভাষা কঠিন—জাপানী অক্ষর পরিচয়ই অনেকের পুরা পুরি হয় না। বিদেশীয় লোকের পক্ষে আমাদের ভাষা আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জাপানী বর্ণমালা ও লিপি-প্রণালী ত চীনা রীতি অনুসরণ করে। কোন বাঁধাবাঁধি নাই কি?" উত্তেজিত বলিলেন—"জাপানীরা চীনা লিপি গ্রহণ করিয়াছে সত্য—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন লিপিও প্রবর্ত্তন করিয়াছে। যে কোন জাপানী গ্রন্থে দুই রকমের লিপিই দেখিতে পাইবেন। চীনা লিপির উচ্চারণ আবার সমস্যাপূর্ণ। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে যে উচ্চারণ ছিল আজকাল চীনালিপির উচ্চারণ সেরূপ নয়। কাযেই কোন অক্ষর বা চিত্র দেখিলে তাহা দুই প্রকারে উচ্চারণ করা যায়। সুতরাং লেখা পড়িতে শিক্ষা করাই একটা প্রধান কাজ হইয়া পড়ে।"

জাপানীরা ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইংরাজী তিন ভাষারই গ্রন্থ সমানভাবে ব্যবহার করেন। ইহাদের অধ্যাপকগণ কেহ ফরাসী ভাষায়, কেহ জার্ম্মাণ ভাষায়, কেহ বা ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়া থাকেন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই কারণে দেখিবার জিনিষ। চীনা গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ এখানে যথেষ্ট।

একটা ক্ষুদ্র মিউজিয়ামও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। ভারতবর্ষের নিদর্শন এক গৃহে সংগৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক জুকিরো টাকাকুসু দুই তিনবার ভারতবর্ষ হইতে এই সমুদয় লইয়া আসিয়াছেন। দেখিবার তাঁহার সঙ্গে দেখে দেখা হয়। টাকাকুসু বৌদ্ধ সাহিত্যাভিজ্ঞ ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। টোকিওর বৌদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক মহাশয়ের আনেসাকি এক্ষণে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। টাকাকুসু ভারতবর্ষে বিদেশী পোষাকে ছিলেন—আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিলাম কিমনো-পরা এবং খড়ো চটি পায়ে। অধ্যাপকগণ দ্বিপ্রহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোটেলে আহার করেন—বিদেশী ধরণে রান্নাবাড়ি হয়। প্রায় সকল অধ্যাপকই বিদেশের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

আমেরিকায় দেখিয়াছি ইয়াঙ্কিতে জাপানীতে সদ্ভাববর্দ্ধনের প্রয়াস দ্রুতবেগে চলিতেছে। "জাপান-পরিষৎ" স্থাপিত হইয়াছে—পরিষদের মুখপত্রের নাম New York Japan Review. পরিচালকগণ প্রধানতঃ জাপানী। বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের আলোচনাই উদ্দেশ্য—অন্যান্য বিষয়েও প্রবন্ধ-সমালোচনাদি বাহির হইয়া থাকে। "Japan Review aims to interpret Japan to America and America to Japan, and promote friendly relations between the two nations." পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাসুজি মিয়াকাওয়া ডি সি, এল্, এল্, এল্, ডি। ইনি "Life of Japan" এবং "Powers of the American People" গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা।

হার্ভার্ডে দেখিয়াছি অধ্যাপক আনেসাকি জাপানীদের শান্তিপ্রিয়তা প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দুনিয়ায় যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয় আজকাল সকল দেশেই তাহার পরামর্শ ও বৈঠক হইয়া থাকে। জাপানীরা এইরূপ শান্তির আন্দোলনে পশ্চাৎপদ নন। টোকিওতে এই জন্য Japan Association Concordia স্থাপিত হইয়াছে। আনেসাকি

ইত্যাদি মহলে এই শান্তি-পরিষদের প্রতিনিধি।

ভারতবর্ষের সঙ্গেও জাপানীদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য জাপানীরা ব্যগ্র। ভারতীয় বাজারে জাপানী মালের কাটতি বাড়ানই উদ্দেশ্য। এই জন্য কয়েক বৎসর হইল Indo-Japanese Association নামক জাপানী-ভারতীয় পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য জাপানী পরিষদের সভ্য—প্রধানতঃ মহাজন ও ব্যবসায়িগণ ইহার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। নব্য জাপানের পিতৃস্থানীয় রাষ্ট্রবীর কাউণ্ট ওকুমা পরিষদের সভাপতি। দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলে ভারতবর্ষের কোন স্থান নাই—ভারতবর্ষ বৃটিশসাম্রাজ্যের অংশ মাত্র—সুতরাং ভারতবর্ষ বিষয়ক রাষ্ট্রীয় সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য জাপানীরা বৃটিশ জাতির সঙ্গে আলোচনা করিয়া থাকেন। বিগত ৮।৯ বৎসর হইতে ইংরাজের সঙ্গে জাপানীদের offensive and defensive alliance স্থাপিত হইয়াছে। এই সন্ধির ফলে ভারতবর্ষের ভিতর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে অথবা কোন শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার জন্য জাপানীরা ইংরাজকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবেন। অধিকন্তু ইংরাজ যদি এশিয়ার কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন জাপানও তাহাই করিবেন। সেই বন্ধুত্বের সর্ত্তেই জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে ইংরাজের যুদ্ধ সুরু হইবামাত্র জাপান চীনের জার্ম্মাণ রাজ্য আক্রমণ করেন।

কাজেই "জাপানী-ভারতীয়-পরিষদে"র কার্য্যতালিকায় রাষ্ট্রনীতির গন্ধ নাই। এই পরিষৎ বৎসরে দুইখানা ইংরাজী পত্র এবং দুই খানা জাপানী পত্র প্রচার করিয়া থাকেন। পরিষদের উদ্দেশ্য নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

"The object of the Association shall be to promote intimate relations between Japan and Indian countries (British India, Netherlands India, Straits Settlements, Siam, French, Indo China &c).

The work of the Association shall be as follows :—

(1) To study commercial, industrial, scientific and religious topics relating to the above-mentioned countries.

(2) To afford facilities for traffic and communication between the respective countries, and for the investigation and study of things Indian and Japanese.

ভারতবর্ষ শব্দে জাপানীরা সমগ্র ভারতমণ্ডল বুঝিতেছেন। শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, ফরাসী, চীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদি জনপদ ইহার অন্তর্গত। ভারতবাসীরও এই বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ ও প্রচার করা কর্ত্তব্য।

বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডাক্তার বুনিউ নাম্বিও, অধ্যাপক টাকাকুসু এবং অধ্যাপক আনেসাকি এই পরিষদের অন্যতম ধুরন্ধর। আজকাল জাপানের প্রায় ৫০০ মহাজন এই পরিষদের সভ্য। টোকিওর কর্ম্মবহুল অঞ্চলে ইঁহাদের কার্য্যালয় অবস্থিত। একজন প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ করিলাম। কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল—জাপানীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। ইঁহারা রুশিয়াকে পরাজিত করিবার পর ৭।৮ বৎসর কাল ভারতবিরোধী ছিলেন।

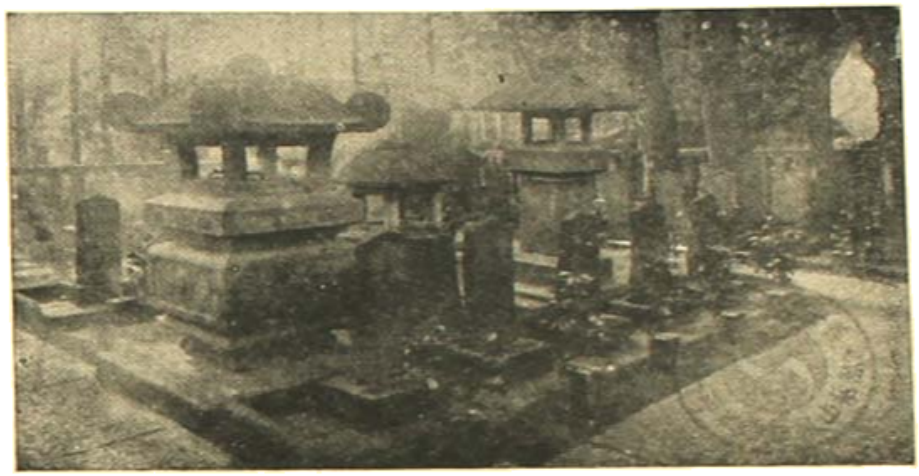

সাতচল্লিশ রোণিনের গোরস্থান

খোলার ঘরের রাজধানী

এখানে আসিয়া ভারতবাসীরা সহানুভূতি ও হৃদ্যতা পাইত না। সেই যুগের জাপান সম্বন্ধে পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন—"জাপান ভারতের মিত্র নহে।"

রাষ্ট্রমণ্ডলে মতপরিবর্ত্তন এবং কর্ম্ম-পরিবর্ত্তন অহরহঃ ঘটিতেছে। সুতরাং আট দশ বৎসরের মধ্যে জাপানে ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে কার্য্য পরিবর্ত্তনের সূচনা হওয়া অতি স্বাভাবিক। বিশেষতঃ গতবৎসর হইতে ইয়োরোপের মহাকুরুক্ষেত্র সমর দুনিয়ার ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত করিতেছে। তাহার ফলে এশিয়ায় জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান শিল্প এবং বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ রহিয়াছে। ইহাতে একদিকে ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলন পুষ্টিলাভ করিতেছে—এমন কি বৃটিশ গবর্মেণ্টও বাধ্য হইয়া ভারতীয় স্বদেশীর সংরক্ষণ করিতেছেন। অপরদিকে এশিয়ায় জাপানের স্বর্ণসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও জাপান স্বাধীন ভাবে যাহা করিতে পারিতেন না তাহা এই সংগ্রামের ফলে আপনা আপনিই সাধিত হইতেছে। এইরূপেই "একস্য সর্ব্বনাশঃ অন্যস্য তু পৌষমাসঃ" হইয়া থাকে। ইয়োরোপীয়েরা যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে—ফাঁক তালে জাপান এশিয়ায় শিল্প ও ব্যবসায়ের সাম্রাজ্য গঠন করিয়া লইতেছেন। সুতরাং ১৯১২ সালের জাপানে দেখিতেছি—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের কথা জানিতে ও শুনিতে উদ্‌গ্রীব। জাপানের সকল মহলেই ভারতবর্ষ লইয়া একটা সাড়া পড়িয়াছে।

একটা ছাপাখানা দেখিলাম। ভারতবর্ষের ছাপাখানাগুলি হইতে এখানে কোন উৎকর্ষ লক্ষ্য করিবার নাই। ইয়োরামেরিকার কার্য্যালয়ে সাধারণতঃ যেরূপ পারিপাট্য, বাহ্য-সৌন্দর্য্য ও সুশৃঙ্খলা থাকে জাপানের কার্য্যালয়ে সেরূপ নয়। ইংরাজী ভাষার জন্য উৎকৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্র জাপানে নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজী ছাপা জাপানের তুলনায় ভালই হয়। তবে টাইপ হইতে আরম্ভ করিয়া, যন্ত্র, কালী, কাগজ সবই জাপানের স্বদেশী।

ট্রামে কয়েকবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসা গেল। কণ্ডাক্টর কিংবা পথিক বা ট্রামযাত্রীরা প্রায়ই ইংরাজী জানে না। কাজেই হোটেলের ম্যানেজারের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে আমার গন্তব্য স্থানের নাম জাপানী ও ইংরাজী ভাষায় লিখাইয়া লইতেছি। কাগজের টুক্‌রাগুলি দেখাইয়া রাস্তায় চলাফেরা করিতেছি। রিক্‌শবাহকগণও লেখা পড়িতে পারে। সার্ব্বজনীন শিক্ষার সুফল টুরিষ্ট হিসাবে বেশ বুঝিতে পারা গেল। কোন ফরাসী পর্য্যটক ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়া যদি বাঙ্গালা, হিন্দী কিম্বা তেলেগু ভাষায় গন্তব্য স্থানের নাম লিখাইয়া লন তাহা হইলে তাঁহার গমনাগমন সুসাধ্য হয় কি? ভারতবর্ষের গাড়োয়ান মাঝি কুলী মজুরেরা নিরক্ষর যে!

ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় লোকসমাগমের কেন্দ্রে সুবিশাল মানচিত্র ঝুলাইয়া যুদ্ধের ফলাফল প্রতিদিন বুঝান হয়। বড় বড় অক্ষরে সংবাদ ছাপান হইয়া থাকে। আপামর জনসাধারণ পথে হাঁটিতে হাঁটিতে একবার সেদিকে দৃষ্টি পাত করে। টোকিওতেও স্থানে স্থানে অট্টালিকার প্রাচীরগাত্রে জাপানের মানচিত্র, আমেরিকার মানচিত্র, ইয়োরোপীয় মহাসমরের মানচিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—জাপানী আবালবৃদ্ধবনিতা সেইগুলি আগ্রহের সহিত দেখিতেছে। ভারতবর্ষে এই দৃশ্য কবে দেখিতে পাইব?

জাপানের কোথাও ইষ্টক বা প্রস্তরের একটা নূতন সৌধ নির্ম্মিত হইলে তাহা সকলের পক্ষে একটা দর্শনযোগ্য বস্তু বিবেচিত হয়। খোলার ঘরের সহরে পাকা বাড়ী দেখিবার সাধ স্বাভাবিক। এইরূপ দেখিবার উপযুক্ত অট্টালিকা দুইটা একটা করিয়া টোকিওর নানা পাড়ায় মাথা তুলিতেছে। দুইটা বড় বড় দোকানগৃহের ভিতর দেখিলাম। এই দুই স্থানে ইয়াঙ্কিস্থানের রীতি অনুসারে কার্য্য চালান হয়। নামও Department store। প্রত্যেক দোকানে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হয়।

প্রথম কোম্পানীর নাম Maruzen & Co., ইহাদের পুস্তকবিভাগ দেখা গেল। টোকিওতে ইউরোপীয় গ্রন্থসমূহের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দোকান। বলা বাহুল্য জাপানের সাধারণ পুস্তকালয়ে চীনা এবং জাপানী গ্রন্থই রক্ষিত হইয়া থাকে। ইরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ বা রুশ ভাষায় প্রণীত গ্রন্থের জন্য ইয়োরোপে অথবা আমেরিকায় অর্ডার পাঠাইতে হয়। কিছুকাল হইল মারুজেন কোম্পানী এই অসুবিধা নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহারা প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত বহুবিধ মূল্যবান্ গ্রন্থ সর্ব্বদা মজুত রাখিতেছেন। ইহাদের দোকানে বর্ত্তমান বিশ্বসাহিত্যের যে সমুদয় গ্রন্থ রক্ষিত হইতেছে সেই সমুদয় গ্রন্থ ভারতবর্ষের কোন দোকানে দেখিতে পাই না। ভারতবর্ষের সর্ব্ব বিখ্যাত পুস্তকালয়ে ইংরাজী গ্রন্থমালা মাত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু মারুজেন কোম্পানী দুনিয়ার পুস্তক আমদানি করেন। কাইরোর কোন কোন দোকানে এইরূপ দেখিয়াছি—কিন্তু সেখানে স্বত্বাধিকারীরা হয় জার্ম্মাণ, না হয় ফরাসী। মারুজেন কোম্পানী আগাগোড়া স্বদেশী—কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একজনও বিদেশী নাই—অথচ জার্ম্মাণ, ফরাসী, রুশ, ইংরাজী সকল প্রকার গ্রন্থেরই ব্যবসায় চলিতেছে। অধিকন্তু জাপান এবং চীন সম্বন্ধে দুনিয়ার লোকেরা যাহা যাহা লিখিতেছেন বিশেষভাবে সেই সমুদয় পুস্তকের সংগ্রহও হইতেছে। ভারতবাসী চীন ও জাপান সম্বন্ধে গ্রন্থতালিকা এই ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরের নিকট হইতে লইতে পারেন।

দ্বিতীয় দোকানের নাম Mitsukoshi. লণ্ডন, নিউইয়র্ক, শিকাগোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরের ইহা সমকক্ষ। দোকান হিসাবে এসিয়ায় ইহার তুলনা নাই। সাজসজ্জা, আসবাব, শৃঙ্খলা, কার্য্যপরিচালনা, খরিদ্দারের প্রতি মনোযোগ, কর্ম্মচারিগণের মধ্যে শ্রমবিভাগ ইত্যাদি সকল বিষয়েই মিৎসুকোষী ইয়াঙ্কি বা ইংরাজ দোকান বলা চলিতে পারে। দোকানগৃহও টোকিও নগরের উল্লেখযোগ্য বিল্ডিং বা তাজমহল। কোম্পানী আগাগোড়া স্বদেশী—দু একজন বোধ হয় বিদেশীয় কর্ম্মচারী আছেন। মাল স্বদেশী বিদেশী উভয় প্রকারই পাওয়া যায়। নূতন গৃহ মাত্র ১৪ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। দোকান অতি পুরাতন—প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। কাজেই পর্য্যটক মাত্রেই অন্ততঃ দেখিবার জন্য মিৎসুকোষীতে আসিয়া থাকেন। আধুনিক এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার সকলপ্রকার আবিষ্কারই এই ভবনে দেখিতে পাইলাম। তড়িতের শক্তিতে সিঁড়ি উঠা লণ্ডনে প্রথম দেখি—এই দোকানের ভিতরও দেখিলাম। জাপানী এঞ্জিনীয়ারই এই গৃহের নির্ম্মাণে ধায়িত্ব পাইয়াছিলেন। অথচ ফরাসী, ইতালীয় ও প্রাচীন ইউরোপীয় বাস্তুরীতি অট্টালিকার ভিতর অবলম্বিত হইয়াছে।

ইহার নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে:—

The great edifice is of pure Renaissance style and is built of iron and concrete, while its accomodations are superb with the very latest equipments and apparatus. Especially fine are its fire prevention devices. • • • Several automatic sprinklers are provided at the right places throughout the building. Six passenger elevators are in the building, besides an escalator. • • • The mailchutes for the convenience of customers and visitors are installed alongside of the elevators. The cash received for goods is conveyed through pneumatic tubes from all parts of the store to the main cashier's desk on the ground floor.

ইয়োরামেরিকার আধুনিকতম দোকানেও এই সকল ব্যবস্থার অতিরিক্ত কিছু নাই। জাপানীদিগকে দেখিতে নিতান্তই unpromising, বুদ্ধিহীন ও অকেজো বোধ হয়। ইহারা যখন চারি ইঞ্চি উচ্চ কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া রাস্তায় ঠকাশ ঠকাশ করিতে হাঁটে তখন ইহাদিগকে রণ-বিজয়ী জাতি বিবেচনা করা অসম্ভব। অথচ এই চেহারা ও চালচলন লইয়াই জাপানীরা বড় বড় জাহাজও চালাইতেছে—দোকানও চালাইতেছে। ভারতবাসী বহুকাল নিষ্কর্ম্মা থাকিতে থাকিতে সামান্য কার্য্য সাধন করিবার ক্ষমতাও হারাইয়া বসিয়াছে। কাজেই কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা অগ্রপশ্চাৎ ভাবিতে ভাবিতে হয়রাণ হইয়া পড়ি। "আমরা কি এই কাজের যোগ্য?" "আমাদের দ্বারা কি ইহা পোষাইবে?" ইত্যাদি নৈরাশ্যসূচক প্রশ্ন আমাদের মাথায় স্থায়ী ঘর করিয়া রহিয়াছে। ছোট খাট কাজকেও মহা গুরুতর-রূপে প্রচার করা আজকাল আমাদের স্বভাব। ফলতঃ কোন দিকেই আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। জাপানে আসিয়া দেখিতেছি—সত্যই "মরা হাড়েও ভেল্কি" খেলান যায়! যোগ্যতা, "Fitness", কার্য্যক্ষমতা, ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশী উচ্চ মাপকাঠি রাখা বেকুব ও নিষ্কর্ম্মাজাতির প্রকৃতি।

৪। গাইডের সঙ্গে নগরভ্রমণ

জাপানে প্রতিবৎসর প্রায় ২০,০০০ পর্য্যটকের সমাগম হইয়া থাকে। জাপানী ভাষা তাঁহাদের প্রায় কাহারও জানা থাকে না। এই সকল লোকের সুবিধার জন্য গবর্মেণ্ট একটা "টুরিষ্ট বিউরো" স্থাপন করিয়াছেন। এই Japan Tourist Bureau সকলকে বিনামূল্যে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বিউরোর কর্ত্তাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া একজন জাপানী গাইড বা প্রদর্শক নিযুক্ত করিলাম। ইহার পারিশ্রমিক দিতে হইবে দৈনিক ৬৲। সহরের ভিতর সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য ল্যাণ্ডো ভাড়া করিতে হইবে। দৈনিক ভাড়া লাগিবে ১৪৲।

গাইড ইংরাজী মন্দ জানেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখিয়াছেন?" ইনি বলিলেন—"না মহাশয়, লোকের সঙ্গে কারবার করিতে করিতে আমি এই ভাষা আয়ত্ত করিয়াছি। আমাকে দুই বৎসর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে কাটাইতে হইয়াছে।" ইনি পূর্ব্বে ভারতীয়

পর্য্যটকগণের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। শুনিলাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বড়োদার গায়কবাড় যখন জাপানে আসেন তখন তাঁহার সঙ্গে এই প্রদর্শক ঘুরা ফিরা করিয়াছেন। কিছুকাল হইল সিংহলের বৌদ্ধ প্রচারক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল জাপান ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। এই গাইড তাঁহাকেও সাহায্য করিতেন।

আমাদের দেশে বর্ষাকালে যেরূপ, এখানেও সেইরূপ, কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি, কখনও মুসলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। কর্দ্দমময় রাস্তার অবস্থা দেখিয়া ভারতবাসীর নাক সিটকান উচিত নয়। পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই উচ্চ খড়ম পায়ে চলিতেছে। বৃহদাকার ছাতাও বহু লোকের মাথায় দেখিতেছি। গাইড্ বলিলেন "জাপানের প্রাচীন স্বদেশী ছত্র দুই প্রকার। রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য একপ্রকার ছত্র ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য আর এক প্রকার ব্যবহৃত হয়। দুইই কাগজের তৈয়ারী। বর্ষাকালে যে ছাতা ব্যবহৃত হয় তাহার কাগজ তৈলে সিক্ত করা থাকে।" জাপানীরা কাগজ প্রস্তুত করণে সিদ্ধহস্ত। জাপানীকাগজ খুব শক্তও হয়। কাগজের প্রাচীর, কাগজের সূতা ও দড়ি, কাগজের ছাতা ইত্যাদি জাপানের বিশেষত্ব।

চশ্‌মার দোকান

একটা দোকানে প্রবেশ করিলাম। এখানে চশ্‌মাসংক্রান্ত নানা প্রকার কাজ করা হয়। ইয়োরামেরিকার নূতনতম যন্ত্রাদি এই গৃহে অনেকবিধ দেখা গেল। অথচ বাহির হইতে দেখিলে ইহা একটা নিতান্ত নগণ্য ও খেলো কারবারের স্থান মনে হইবে। দোকানে টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নাই। চৌকির উপর মাদুর পাতা রহিয়াছে। তাহাতে দুই জন পুরুষ ও একজন রমণী বসিয়া আছে। বসিবার রীতি ভারতীয় ধরণেরই জাপানীদের বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝিবার জো নাই। দারিদ্র্য সত্ত্বেও একটা জাতি কত বড় বড় কাজ করিতে পারে জাপান তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু মনোহারী দোকানদার ফরাসে বসিয়া কারবার চালাইতেছে—এই দৃশ্যই টোকিওর অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাই। নিংসুকোষী ও মাৎসুজেন কোম্পানীর আড়ম্বর জাপানী ব্যবসায় মহলে অতি বিরল। টোকিও দেখিয়া নিউ ইয়র্ক শিকাগোর সামান্য মাত্র ইঙ্গিতও পাইতেছি না—ভারতীয় মফঃস্বলের পরিচয়ই বেশী পাইতেছি। বর্ত্তমানযুগে Cottage Industry, Small Scale Production ক্ষুদ্র কারবার এবং পরিবারবদ্ধ শিল্পনীতি যন্ত্রচালিত বৃহদাকার কারখানার সঙ্গে কিরূপভাবে চলিতে পারে তাহা বুঝিবার জন্য জাপানে আসা আবশ্যক। জাপানে কুটির সভ্যতা বিলুপ্ত হয় নাই—ফ্যাক্টরীর দৌরাত্ম্য এখানে মারাত্মকভাবে দেখা দেয় নাই বিশ্বাস করিতেছি।

মিকাডো-প্রাসাদ

রাস্তায় দুই পার্শ্বে দোকান-শ্রেণী দেখিতে দেখিতে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলাম। পথে কতকগুলি সুবৃহৎ অট্টালিকা চোখে পড়িল। প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক, আফিস, থিয়েটার ইত্যাদির জন্য এই সকল সৌধ নির্ম্মিত। স্থানে স্থানে দুই একবার নাতিবিস্তীর্ণ খাল পার হইতে হইল। এই খালগুলি মধ্যযুগে নগর-দুর্গের পরিখা ছিল। এক্ষণে গমনাগমনের, বিশেষতঃ মাল আমদানি রপ্তানির জন্য এইগুলি ব্যবহৃত হয়। এই কয়দিনে মালগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখিলাম। প্রত্যেক অংশেই সর্ব্বদা মহা-

বৌদ্ধ মন্দিরের তোরণদ্বার

আটাগো পাহাড় হইতে টোকিওর দৃশ্য

অনগণের নৌকা যাতায়াত করিতেছে। দেখিয়াছি।

রাজপ্রাসাদে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। তবে যে বাগানের ভিতর ইহা অবস্থিত তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। প্রাসাদ মধ্যযুগে নির্ম্মিত—তখন টোকিও নগরের নাম ছিল ইয়েডো। সেই সময়ে সম্রাট্‌গণের ক্ষমতা এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। সম্রাটেরা কিয়োটো নগরের প্রাসাদে বন্দিস্বরূপ বাস করিতেন। সাম্রাজ্যের যথার্থ ক্ষমতা সেনাপতি বা শোগুনদিগের হস্তগত ছিল। সেই শোগুনেরা টোকিওতে তাঁহাদের কাছারী খুলেন। সেই কাছারীই বর্ত্তমানে রাজপ্রাসাদ। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শোগুনদিগের ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া সম্রাট্ যথার্থ সম্রাট্ হন। এই যুগের নাম Restoration বা Meiji (মীজি) অর্থাৎ সম্রাটের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে কিয়োটো হইতে টোকিওতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছে। আজকাল স্বাধীন এশিয়ার যে রাষ্ট্রকেন্দ্র দেখিতেছি তাহা মাত্র ৬৫ বৎসরের নগর। গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রাসাদের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কোন কাহিনী প্রচলিত আছে কি? এই কার্য্যের জন্য ইয়োরোপীয়েরা নিযুক্ত হইয়াছিল কি?" ইনি উত্তর করিলেন—"সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা নির্ম্মিত হয়। ওলন্দাজ শিল্পিগণের হাত বোধ হয় ইহাতে কিছু আছে। জাপানীরা ওলন্দাজ প্রভাব কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে পারে নাই।"

আটাগো পাহাড়

সপ্তদশ শতাব্দীর নির্ম্মিত একটা তোরণদ্বারের নিম্ন দিয়া অগ্রসর হইলাম। প্রাসাদের বাহিরে চারিদিকে বড় বড় সরকারী ভবনসমূহ অবস্থিত। বিচারালয়, পার্লামেন্ট-গৃহ, ইত্যাদিতে না নামিয়া একটা অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে আসিলাম। এই পাহাড়ে একটা শিন্টো মন্দিরে অল্প হাঁটিয়া শিরোদেশে উঠা গেল। জাপানের গৌরব চেরিবৃক্ষের তরুশ্রেণী এখানে দেখিতে পাইলাম। বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফুল ফুটিয়াছে—এক্ষণে তরুসমূহ পুষ্পহীন। পাহাড়ে দাঁড়াইয়া নগরের দক্ষিণাংশ আগাগোড়া দেখিয়া লইলাম। মাঝে মাঝে কলের চিমনি হইতে ধূম বহির্গত হইতেছে—অদূরে টোকিও সাগরের জলরাশি—কিন্তু মোটের উপর কৃষ্ণ টালিনির্ম্মিত ছাদের শোভাই দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিল। নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ কাষ্ঠ কুটিরের সুন্দর সমাবেশ টোকিও ছাড়া আর কোথাও দেখিব কি না সন্দেহ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে কখনও শিন্টো-মন্দির দেখি নাই। আটাগো পাহাড়ে এই প্রথম দেখিলাম। মন্দিরের সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র আবৃত স্থানে এক চৌবাচ্চায় জল রহিয়াছে। এই জলে হাত মুখ ধুইয়া মন্দিরে পূজা করিতে আসা হয়। মন্দির দেখিতে জাপানের অন্যান্য মন্দিরেরই অনুরূপ। গৃহ-রচনায় জাপানীরা বৌদ্ধশিন্টো প্রভেদ করিত না। বৌদ্ধ ও শিন্টো দুই মতাবলম্বী লোকই আটাগোর শিন্টো মন্দিরে আসিয়া থাকে। এশিয়ায় ধর্ম্মকলহ কখনও ভয়ঙ্কর হয় নাই। এই মন্দিরের ভিতর কোন মূর্ত্তি দেখিলাম না—কিন্তু বৌদ্ধ মন্দিরে মূর্ত্তিপূজার চরম অবস্থা দেখা যায়। পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি মন্দিরের ভিতর রক্ষিত হইতেছে। পিত্তলের মুকুর শিন্টোমন্দির মাত্রের প্রধান অঙ্গ। এইগুলির প্রভাবে দুষ্ট প্রেতগুলি দূরে বিতাড়িত হয়। এইজন্য চকানিনাদও করা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বপুরুষদিগের চাল চলনওয়ালা, পোষাক ইত্যাদি মন্দিরের ভিতর সাজান রহিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে জাপানীরা মুখোস পরিয়া নৃত্য করিত। সেই সকল মুখোসও কতিপয় দেখিতে পাইলাম। শিণ্টোমন্দিরের উপাসকগণ মন্দিরে প্রবেশ করে না—বাহির হইতে দুইবার হাতে তালি দিয়া অবনত মস্তকে পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশে প্রণাম করে।

আটাগো পাহাড়ের পাদদেশে একটা কবরস্থান। ইহা অনেকদিনের পুরাতন—প্রায় ২৫০ বৎসরের হইবে। শিণ্টো মতাবলম্বীরা মৃতদেহ কবর দেয়। বৌদ্ধেরা প্রথমে ইহার অগ্নিসৎকার করে, পরে ভস্ম কবরের ভিতর পুঁতিয়া রাখে। কবরের উপর প্রস্তরশিলা স্থাপন করা বৌদ্ধ শিণ্টো খৃষ্টান সকলেরই ধরণ।

জাপানী ক্ষত্রিয়ের কাহিনী

পাহাড় হইতে নগরের ভিতর অনেকদূর পর্য্যন্ত গাড়ী চলিতে থাকিল। কুটির-সভ্যতার সমাধি চৌকিওর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি। যোজনব্যাপী মাদ্রাজ-সদৃশ বাসভবন বা আফিস-গৃহ যদি নব্যজীবনের সাক্ষ্য হয় তাহা হইলে চৌকিওকে "সেকেলে" নগর বলিতে হইবে,—"আধুনিকতা" জাপানীসমাজে প্রবলমাত্রায় প্রবিষ্ট হয় নাই।

একটা সুবৃহৎ উদ্যানে আসিয়া পড়িলাম। নানাবিধ তরুবরের প্রভাবে ইহা সর্ব্বদা বনের মত দেখায়। সুদীর্ঘ সরল বৃক্ষের সারি অনেক রহিয়াছে। উদ্যানে লোকজন থামিলাম না। বরাবর এক বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। একটা ফটক পার হইলাম। দুই পার্শ্বে তীর্থক্ষেত্রের সুপরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান সাজান রহিয়াছে। জাপানী ছবি, ছড়ি, বাটি, পাখা, ইত্যাদি অনেক প্রকার দ্রব্য এইখানে বিক্রয় হয়।

দু এক পা হাঁটিতে হাঁটিতে দুইটি বৌদ্ধ সাধু বা দেবতার প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম। অদূরে একটি তোরণদ্বার—ইহা জাপানের স্থাপত্যরীতি অনুসারে নির্ম্মিত। ইহা দুইতল বিশিষ্ট—আগাগোড়া কাঠের প্রস্তুত। পার্শ্বস্থিত একটা কাষ্ঠগৃহে ঘণ্টা ঝুলিতেছে। কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরের দৃশ্য মনে পড়িল। সুবৃহৎ মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া গাইড্ বলিলেন—"এই মন্দির ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডে সেই ভবন ভস্মসাৎ হয়—তাহার পর নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তোরণদ্বার রক্ষা পাইয়াছিল।"

জাপানে বৈশাখ মাসে বুদ্ধদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে জনসাধারণের বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে এই মন্দিরে যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিনই তীর্থযাত্রীরা মন্দির দর্শন করিতে আসে। বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানী-সমাজে জীবন্ত রহিয়াছে। ইয়োরামেরিকার প্রভাবে নবযুগের লক্ষণ জাপানে যথেষ্ট আমদানি হইয়াছে সত্য—কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের জীবনপ্রবাহ বিলুপ্ত হয় নাই। তথাকথিত কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে নব্য জাপানীরা যতই আন্দোলন করুক না কেন, জনসাধারণের চিত্ত হইতে বুদ্ধ-আত্মার প্রতি অকপট ভক্তি বিদূরিত হয় নাই; এই জন্য জাপানের নরনারীগণকে দেখিলে ভারতসন্তানদিগের আত্মীয় বলিয়া সহজেই ধরিতে পারি। জাপানীদের চলাফেরায়, উঠাবসায়, ভাবভঙ্গীতে ইয়োরামেরিকার চিহ্ন দেখিতে পাই না। এই সমুদয়ে ভারতবর্ষেরই ছাপ যেন মারা রহিয়াছে।

মিৎসুকোশী দ্রব্যভাণ্ডার

জাপানের সামুরাই ক্ষত্রিয়

India Press, Calcutta.

মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে অনেক পুরুষ ও রমণীকে বাগানের ভিতর অন্য একদিকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম। গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই উদ্যানে বৌদ্ধ মন্দির ছাড়া আর কোন দেখিবার জিনিষ আছে কি?" গাইড্ বলিলেন—"জাপানী 'বুশিডো' বা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের অনন্য পরিচয় এই বাগানে আছে। জাপানীরা কিরূপ প্রভুভক্ত, সমাজভক্ত ও দেশভক্ত তাহার প্রমাণ এইখানে পাইবেন। মধ্যযুগে জাপানী ক্ষত্রিয়েরা প্রভুর জন্য প্রাণদান করিয়াছিল—তাহাদের কবর এই বাগানের ভিতর অবস্থিত। সেই গোরস্থান অদ্যাপি জাপানীজাতির তীর্থক্ষেত্র।"

প্রাচীন জাপান সম্বন্ধে আধুনিক জাপানীরা ভাবিয়া থাকে—

"দেশের জন্য ঢালিল রক্ত
অযুত যাহার ভক্ত বীর।"

সেই আত্মবলিদানের নাম বুশিডো-ধর্ম্ম। আবার সেই আত্মত্যাগের প্রবৃত্তিকে পূজা করিবার আগ্রহের নামও বুশিডো-ধর্ম্ম। যাঁহারা ভারতীয় রাজস্থানের কাহিনী জানেন তাঁহারা বুশিডো-প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। কেবল মাত্র শারীরিক বলের প্রয়োগ ও পাশবিক ক্ষমতার বড়াইকে বুশিডো বা ক্ষাত্র-ধর্ম্ম বলা হয় না। অত্যাচারীর আক্রমণ হইতে দীনগণকে রক্ষা করা; স্বজাতি, স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বসমাজের ইজ্জৎরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করা; ব্যক্তিগত, পরিবারগত, গোত্রগত, কুলগত মানসম্ভ্রম অটুট রাখিবার জন্য শত্রুনিপাত করা; রমণীজাতির গৌরব রক্ষা করা ইত্যাদি কার্য্যই বুশিডো-ধর্ম্মের অন্তর্গত। "রঘুবংশে" ক্ষত্রিয় শব্দের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে—ক্ষতাৎ কিল ত্রায়তে ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।" বুশিডো শব্দেরও ব্যুৎপত্তি ঠিক এইরূপ।

গোরস্থানে ৪৭টি কবর দেখিতে পাইলাম। কবরের সম্মুখে ধূপ পোড়ান হয়। গাইডের কথানুসারে ধূপের কাঠি ক্রয় করা গেল। জাপানীরাও এইরূপই করিল। কবরের নিকট মস্তক অবনত করা এবং প্রজ্বলিত ধূপশলাকা স্থাপন করা পূজার অঙ্গ।

এই কবর সমূহে ৪৭ জন "রোনিন" বা ক্ষত্রিয়-বীরের শবদেহ প্রোথিত আছে। ইহারা তাহাদের প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। মধ্যযুগে প্রতিহিংসা গ্রহণ করা দুনিয়ার রীতি ছিল। দলাদলি, গৃহকলহ, পারিবারিক বিরোধ, feuds, clan-spirit ইত্যাদি ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্ম্মানীতে, ইতালীতে, ভারতবর্ষে, জাপানে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিত। ব্যক্তিগত সম্মানের উনিশবিশ হইলে, অথবা বংশগত কৌলীন্য বা পদমর্য্যাদার সামান্য মাত্র অসম্মান হইলে মধ্যযুগের লোকেরা অস্ত্রধারণ করিত। স্যার ওয়াল্টার স্কটের Lay of the Last Minstrel কাব্যে "Till pride be quelled and love be free" কাহিনী বিবৃত আছে। রাজস্থানের প্রত্যেক কাহিনীই এই বংশমর্য্যাদা বা ব্যক্তিগত মর্য্যাদার আখ্যায়িকা। জাপানের মধ্যযুগেও সেই রেষারেষি, প্রতিযোগিতা, ও প্রতিহিংসার বৃত্তান্ত প্রচুর।

মিকাডোকে কিয়োটোর প্রাসাদে এক-প্রকার বন্দী রাখিয়া তাঁহার শোগুণ কর্ম্মচারীরা কামাকুরা নগরে শাসন কার্য্য চালাইতেন। কোন এক জমিদারবংশই চিরকাল শোগুণী করিতে পারেন নাই। বংশে বংশে আড়াআড়ি ও ঠোকাঠুকি সর্ব্ব-

দ্বাই চলিত—এক এক সময়ে এক এক পরিবার শোগুনী বা নবাবী করিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে টোকুগাওয়া-বংশীয় জমিদারেরা প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা কামাকুরা হইতে ইয়েডো (বর্ত্তমান টোকিও) নগরে শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত করে। টোকু-গাওয়া নবাবগণের আমলে দুইজন জমিদার-কর্ম্মচারীর মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। একজনের নাম আসানো—আর একজনের নাম কিলা। কিলা উচ্চতর পদের কর্ম্মচারী। ইনি আদেশ দ্বারা আসানোকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিতেন। অথচ আসানো কিলা অপেক্ষা চরিত্রে ও দেশ হিতৈষণায় উন্নত ছিলেন। অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আসানো আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার নাম জাপানী ভাষায় "হারাকিরি"। গত বৎসর মিকোডোর মৃত্যুর পর সেনাপতি নোগি এবং তাঁহার পত্নী এই-রূপ হারাকিরি করিয়াছেন। পেটের ভিতর ছোরা বসাইয়া প্রাণনাশ করাকে হারাকিরি বলে। বিষপান করা অথবা রিভলভারের সাহায্যে বুকে কিংবা গলায় গুলি করা হারাকিরি নয়।

আসানোর হারাকিরিতে তাঁহার বিশ্বাসী "রোনিন"গণ উত্তেজিত হইল। আমাদের দেশে যাহাকে প্রভুভক্ত লাঠিয়াল বলা হয় তাহাকে জাপানে "সামুরাই" Samurai বলা হইয়া থাকে। রোনিনেরা সামুরাই-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দল-বিশেষ। প্রভুভক্তি ও যুদ্ধপিপাসা এই দুই লক্ষণে সামুরাই চরিত্র গঠিত। ভারত-বর্ষের প্রত্যেক রাজপুতকে জাপানী ভাষায় সামুরাই বলা যাইতে পারে, এবং প্রত্যেক দলপতি বা chiefকে জাপানী পারিভাষিক অনুসারে ডাইমো (daimio) বলা উচিত।

আসানো ডাইমোর "লাঠিয়ালেরা" প্রত্যেকেই মর্ম্মাহত হইয়া ভাবিতে লাগিল—"প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার। প্রতিহিংসা বিনা মন কিছু নাহি আর।" ঘটনা অষ্টাদশশতাব্দীর প্রথমভাগে ঘটিয়াছিল। ডাইমোতে ডাইমোতে বিবাদ প্রায়ই হইত—কাজেই শোগুনের কাণে এই হারা-কিরি এবং রোনিনগণের উত্তেজনার কথা শীঘ্র উঠে নাই। রোনিনেরা কিলা ডাইমোর দুর্গ আক্রমণ করিল—ইহারা সংখ্যায় ৪৭। কিলার পেটোয়ারা আসানোর বীরগণের সঙ্গে লড়াইয়ে হার মানিল। রোনিনেরা কিলার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সদর্পে আসানোর কবরের নিকট উপস্থিত হইল।

গাইড্ বলিলেন—"পথে আসিতে একটা কূপ দেখিয়াছেন। তাহার জলে কিলার মস্তক ধৌত করা হইয়াছিল। পরে উহা আসানোর কবরের সম্মুখে উপহার স্বরূপ রক্ষিত হয়। আসানোর কবরই এই গোর-স্থানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গোর-স্থান আসানোবংশের জন্যই রক্ষিত—তাঁহার ভক্ত রোনিনগণকে পরিবারের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইজন্য তাহাদের কবরও এখানে দেখিতে পাইতেছেন।"

কিলা হত হইলে সংবাদ নবাবসর-কারে রটিয়া গেল। শোগুনের বিচারে রোনিনগণের হারাকিরি-দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। তাহাদের দোষ—তাহারা দেশের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছে। রোনিনেরা আনন্দের সহিত এই আজ্ঞা গ্রহণ করিল। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ হাতে পেটে ছুরি চালাইয়া আত্ম-হত্যা করিল। পরে শোগুনের ঘাতক ইহাদের মস্তক ছিন্ন করিল। বর্ত্তমানকালেও জাপানের আবাল বৃদ্ধ বনিতা ৪৭ রোনিনের

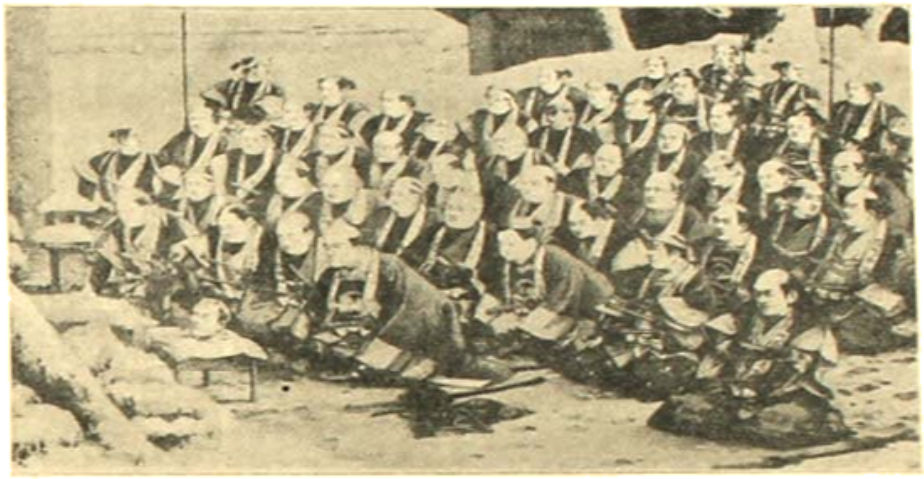

রোগিনেরা কিলার মস্তক প্রভু-কবরের নিকট
উপহার দিতেছে

রোগিনেরা কিলা-ভবন আক্রমণ করিতেছে

প্রভুভক্তি, দেশসেবা ও আত্মত্যাগ কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

শোগুণদিগের সমাধি-ক্ষেত্র

এইবার শিবা-পার্কের দিকে ফিরিলাম। বাগানের ভিতর বৌদ্ধ মন্দির এবং শোগুণদিগের সমাধি অবস্থিত। মন্দির পুড়িয়া গিয়াছে—পুনরায় নির্ম্মিত হইতেছে। প্রাচীন স্থাপত্যরীতি অনুসারেই কাষ্ঠময় ভবন নির্ম্মিত হইবে। টোকুগাওবাবংশীয় দ্বিতীয় নবাব ও নবাবপত্নীর সমাধি-স্থান দেখিলাম। গৃহগুলি মন্দিরের রীতিতে নির্ম্মিত—সমস্তই কাষ্ঠময়।

সমাধিক্ষেত্রের চতুঃসীমার ভিতর প্রবেশ করিতে কতকগুলি আলোক-স্তম্ভ দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ দেখিলাম। মিশরের সুন্দর-কার্ণাকে স্ফিংসের সারি স্মরণে আসিল। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় দ্বাররক্ষক জুতার উপর কাপড়ের জুতা পরাইয়া দিল। গৃহের মেজে পরিষ্কার রাখিবার জন্য এই নিয়ম। কাইরোতেও মস্‌জিদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ করিতে হইয়াছিল। গৃহাভ্যন্তর অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। মধ্যযুগের জাপানী সুকুমার শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই খানে বিদ্যমান। কেবলমাত্র চিত্রকলা নয়—রঞ্জনশিল্প, ধাতুর কার্য্য, কাষ্ঠশিল্প, Lacquer work ইত্যাদি নানা বিষয়ের উৎকর্ষ দেখিতে পাইলাম। কোন মূর্ত্তি বা প্রতিমা দেখা গেল না। শুনিলাম শোগুণের পরিবারস্থ লোকেরা আসিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের জন্য এখানে প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাঁহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, মুকুট, যুদ্ধসাজ ইত্যাদি গৃহের ভিতর পবিত্র ভাবে রক্ষিত হইতেছে।

প্রাচীরগাত্রে এবং ছাদে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। চিত্রের ভিতর কোন কাহিনী বর্ণিত নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনাই প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর নানা সমাবেশ চিত্রকরগণের কার্য্যে দেখিতে পাইতেছি। ময়ূর, সিংহ, পদ্ম, অশ্বত্থ ইত্যাদির চিত্রই বেশী। সিংহ আঁকিতে শিল্পীরা বড় নন বুঝিলাম। এতদিন ইয়োরামেরিকায় নব্যযন্ত্রপাতিত কারুকার্য্য দেখিয়াছি। আজ জাপানী মধ্যযুগের হস্তশিল্প দেখিয়া এক অভিনব জগতে বিচরণ করিতেছি। এ যে মিশর-ভারতের শিল্প-সাধনা। মধ্যযুগের শিল্পকলা বোধ হয় জগতে আর ফিরিবে না। কিন্তু তাহার এক কণামাত্র দেখিলেই হৃদয় আবেগে পূর্ণ হয় কেন? নিউইয়র্কের উল্‌ওয়ার্থ বিল্ডিং দেখিয়া সে রোমাঞ্চ ত অনুভব করি না!

সমাধিক্ষেত্রের চতুঃসীমার মধ্যে স্থানে স্থানে কৃষ্ণ গ্রানাইট প্রস্তরের উপর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত দেখিলাম। কোন কোনটায় বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীও বিবৃত রহিয়াছে। নমুনাগুলি ভাস্কর্য্য হিসাবে উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। একস্থানে একটা ব্রহ্মদেশীয় পঞ্চশিখিষ্ট প্যাগোডা নির্ম্মিত হইয়াছে। বাগানের ভিতর কতকগুলি কর্পূর-বৃক্ষ দেখিলাম।

শিবা-পার্ক ছাড়িয়া রাজকুমারগণের প্রাসাদের দিকে আসিলাম। এই ভবন লণ্ডনের বাকিংহাম প্যালাসের অনুকরণে নির্ম্মিত। পথে সেনাপতি নোগির গৃহ দেখা গেল। নোগির দুই পুত্র রুশ যুদ্ধে মারা গিয়াছিল—তাঁহার পত্নীও স্বামীর সঙ্গে হারাকিরি করেন। এই জন্য নোগি তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি টোকিও নগরকে সমর্পণ করিয়াছেন।

জাপানের স্বদেশী হোটেল

ইতিমধ্যে দু একবার জাপানী খানা দেখিয়াছি। আজ ষোড়শোপচারে জাপানী

ভোজনের ব্যবস্থা করিলাম। একটা হোটেলে আসা গেল। যেন গোয়ালন্দের কোন হোটেলে প্রবেশ করিতেছি। একজন দাসী আসিয়া একটা ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া গেল। গৃহের ছাদ টালি-নির্ম্মিত ও অনুচ্চ। প্রাচীর এবং মেজে কাঠের প্রস্তুত। কাগজের ব্যবহারও কাঠের পরিবর্ত্তে হয়। কাগজের দেওয়াল-বিশিষ্ট ঘরে বসিয়া যেন স্বপ্নরাজ্যে আছি অথবা খেলানার সামগ্রী দেখিতেছি মনে হইতে লাগিল। জুতা খুলিতে হইল। বালিশের মত আসনে আমাদের অভ্যস্ত নিয়মে উপবেশন করিলাম। জাপানীরা আসনের উপর সাধারণতঃ হাঁটু পাতিয়া বসে—আমরা যে ভাবে বসি তাহা কিছু অসভ্যতার লক্ষণ। বর্ষাকাল—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ঘরে বাতি জ্বলিতেছে না—গৃহের চালা হইতে টুপুর টাপুর জল মাটিতে পড়িতেছে। মাদুরের ফরাসের উপর আসনে উপবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধে ও পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিতেছি আর ভাবিতেছি,—জাপানের রাজধানীর ভিতর এরূপ নীরব নিঝুম শান্তিময় স্থান আছে! টোকিও কি আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র—ইয়োরামেরিকান লণ্ডন নিউইয়র্কের প্রতিদ্বন্দ্বী? এ যে পূর্ব্ববঙ্গের এক পল্লী-কুটির! অথচ টেলিফোনও দেখিলাম—আর তড়িতের বাতিও রহিয়াছে। ইহার নাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়। পল্লীবাসী, কুটিরবাসী, রিক্তপদ, কিওমনোধারী, ভেতোজাপানীরা Wireless telegraphy, aeroplane, এবং তড়িৎ ও বাষ্পের শক্তি নিজস্ব করিয়া লইয়াছে।

যে কুটিরে বসিলাম সেই কুটিরে অন্য কোন অতিথি আসিবে না। গাইড্ বলিলেন—"এইরূপ অনেকগুলি কুটির এই হোটেলে আছে। প্রত্যেকটাই স্বতন্ত্র। রন্ধনাদি একত্র হয়—কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপবেশন ও পরিবেষণের গৃহ।"

দাসী হাঁটু পাতিয়া এবং মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। প্রথমেই চা আসিল। দুধ ও চিনি চার সঙ্গে পাইলাম না। প্রত্যেকের সম্মুখে কাঠের একটা ক্ষুদ্র বাক্সের ভিতর করলার আগুনের ভাঁড় রক্ষিত হইল। গাইড্ ধূমপান করেন—আগুনে চুরুট জ্বালাইয়া লইলেন। বাক্সের ভিতর একটা ছোট চোঙ্গা দেখিলাম—তাহার ভিতর চুরুটের ছাই ফেলিতে হয়।

এইবার একটা কাঠের রেকাবিতে খাদ্য দ্রব্য আসিল। চারি পাঁচটা বাটিতে আহার্য্য ও পানীয় রক্ষিত হইয়াছে। বাটিগুলি চীনা-মাটির প্রস্তুত—অথবা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। কাষ্ঠ-পাত্রের উপর সোনালি কাজ করিতে জাপানীরা ওস্তাদ। দুইটা কাঠিও রেকাবিতে ছিল। কাঁটা চামচের পরিবর্ত্তে চীনা ও জাপানীরা কাঠি ব্যবহার করে। গাইড্ বলিলেন—"প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র কাঠি—একজনের ব্যবহৃত কাঠি অন্যে ব্যবহার করে না। পয়সাওয়ালা লোকেরা রূপার কাঠি ব্যবহার করে।" খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে মৎস্যই প্রধান। কাঁচা মাছও জাপানীরা খায়। শুঁটকি মাছও পাওয়া গেল। একটা ঝোল পান করিলাম—তাহার ভিতর চিংড়ি মাছ, পায়রার মাংস, পাঁপা ইত্যাদি সিদ্ধ করা হইয়াছে। বেগুনভাজা খাইলাম। জাপানীরা সকল মাংসই ভক্ষণ করে—গোঁড়া বৌদ্ধগণ গোমাংস খায় না—মৎস্যে কাহারও আপত্তি নাই। খানিকক্ষণ পরে ভাত আসিল। গাইড্ মহাশয় কাঠির সাহায্যে সকল খাদ্যই উদরসাৎ করিলেন। আমি কেবল ঝোলের

অর্দ্ধভোজনং করিলাম। তবে বোতলটা চলনসই ছিল। বকশিষ সহ মূল্য দিতে হইল সাড়ে তিন টাকা। আহারের পর ধোপী পরম জলে গামছা ভিজাইয়া সম্মুখে রাখিল। মুখ মুছিয়া "সয়োনারা" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। এই কথাটা মাত্র এ কয়দিনে রপ্ত হইয়াছে।

৫। সমর-মিউজিয়াম ও যুদ্ধস্মারণী-প্রদর্শনী

টোকিওর পার্ক বা উদ্যানগুলির ভিতরেই বড় বড় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অবস্থিত। পার্কের ভিতরেই প্রাচীন মন্দির এবং কবরসমূহও দেখিয়াছি। একটা বাগানের মধ্যে টোকিওর সর্ব্বপ্রসিদ্ধ শিন্টোমন্দির দেখিলাম। স্বয়ং মিকাডো এই মন্দিরে পূজা প্রদান করিয়া থাকেন। মন্দিরের সম্মুখে তোরণদ্বার যথারীতি অবস্থিত। শিন্টো তোরণদ্বারে এবং বৌদ্ধ তোরণদ্বারে সামান্য প্রভেদ আছে। বৌদ্ধদ্বারের সর্ব্বোচ্চ দণ্ড বক্র—শিন্টোদ্বারের দণ্ডগুলি সবই সরল রেখার ন্যায় সন্নিবেশিত।

গাইড্ বলিলেন—"এই মন্দিরে সেনাবিভাগের লোকজনই বিশেষভাবে যোগদান করে। জাপানী বীরগণের মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহাদের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য এই মন্দির উৎসর্গীকৃত। মন্দিরের বার্ষিক উৎসবের সময়ে সেনাবিভাগ হইতে ইহার সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।"

শিন্টোধর্ম্মে পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়াইয়া দেয়। তাহার ফলে "পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত ধূলিরূপে তাহে রয়েছে মিশ্রিত" এই "ভাবজ্ঞান" সর্ব্বদা লোকের মনে থাকিয়া যায়। যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় ও বুদ্ধিজীবীগণের পক্ষে ancestor-worship বা পিতৃ-পূজা বিশেষ কার্য্যকরী। যে ধর্ম্মমতের দ্বারা অতীত গৌরববাহিনী বাণী সাধারণ্যে সুপ্রচারিত হয় তাহাকে রণপণ্ডিতগণ সর্ব্বথা সম্মান করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইজন্য শিন্টোতত্ত্ব জাপানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম।

শিন্টোমন্দিরের সন্নিকটেই মিলিটারি বা সমর-মিউজিয়াম অবস্থিত। এই ভবনের সম্মুখে কতকগুলি ভগ্ন কামান রক্ষিত হইয়াছে। রুশযুদ্ধে জাপানীরা যে কামান ব্যবহার করিয়াছিল তাহার দু একটা এখানে দেখিলাম। রুশেরা পোর্ট আর্থার দুর্গে যে সকল কামান ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল তাহারও কয়েকটা এখানে দেখা গেল। এই বাগানে বহুসংখ্যক চেরিবৃক্ষ বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম।

পয়সা দিয়া মিউজিয়ামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কামান, গোলা ও বন্দুক অনেকগুলি সাজান রহিয়াছে। এই সকল পুরাতন অস্ত্র শস্ত্র, রণপোষাক, দুর্গের নমুনা ইত্যাদির সংগ্রহে বহু প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ। এইগুলি দেখিলে রাজপুত-মারাঠা-শিখ-মোগল যুগের যুদ্ধসজ্জা ও বুঝিতে পারা যায়।

সামরিক চিত্রের সংখ্যাও মন্দ নয়। প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণের ফটোগ্রাফ অথবা তৈলচিত্র, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য, পুরাতন জাহাজের চিত্র ইত্যাদি প্রায় সকল গৃহেই দেখা গেল।

মধ্যযুগে জাপানী দুর্গ ও প্রাসাদগুলি ধর্ম্ম মন্দিরের রীতিতেই নির্ম্মিত হইত। এই সমুদয় অট্টালিকার মধ্যে একটা পরিচয়গত সাম্য লক্ষ্য করিতে পারি।

এই সেদিন চীনের আর্থার-বন্দর যখন

করিবার সময়ে জাপানীরা যে এরোপ্লেন ব্যবহার করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম। জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক সমর ১৯০৫ সালের রুশ-সংগ্রাম। তাহার পর হইতেই জাপানকে জগতের রাষ্ট্রমণ্ডল প্রথমশ্রেণীর শক্তিরূপে স্বীকার করিতেছে। বলা বাহুল্য সেই রুশ সমরের কাহিনীই এই সংগ্রহালয়ে বৎসরোপযোগি বিবৃত রহিয়াছে। কোথাও রুশদিগের রন্ধন-শালা, কোথাও বা তাহাদের যুদ্ধ-সরঞ্জাম· জাপানীদের trophy বা লুণ্ঠিত দ্রব্যরূপে বিরাজ করিতেছে।

রুশযুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানীরা আর একটা সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। ১৮৯৪ সালে কোরিয়ার সওগোল উপলক্ষ্যে চীনের বিরুদ্ধে জাপানীরা যুদ্ধঘোষণা করে। তখন ইয়োরামেরিকানেরা জাপানকে বিশেষ সম্মান ও ভয় করিত না। চীন সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি দেখিয়া তাহারা চীনাজাতিকে ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানীরা নব্য বিজ্ঞান, নব্য শাসন, নব্য শিল্প ইত্যাদি প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক অভাবিতরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে। তাহাদের নৌবল এবং সামরিক শক্তিও যথেষ্ট দৃঢ় হইয়াছে। জাপানী সেনা ও রণতরীর সম্মুখে চীনারা উড়িয়া গেল। চীনাদিগকে পরাজিত করিবামাত্র জাপান দুনিয়ায় বিশেষ বিখ্যাত হইয়া পড়িল। ১৮৯৪ সালেই ইয়োরামেরিকানেরা জাপানীদিগের কৃতিত্ব প্রথম লক্ষ্য করিল। তখন হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত জাপানের গতিবিধি সকলেই মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল। ১৯০৫ এর পর হইতে জাপানকে ইয়াঙ্কি এবং ইংরেজেরাও খোসামোদ করিতে লালায়িত। যাহাহউক· ১৮৯৪ সালের চীনা-সমর নব্য জাপানের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই মিউজিয়ামে সেই সংগ্রামের বহুবস্তু প্রদর্শিত দেখিলাম।

নব্য জাপানের জন্ম হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। সেই বৎসর মিকাডো সম্রাট শোগুণদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন হইতে জাপানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য শাসন, পাশ্চাত্য কায়দার প্রবলভাবে আমদানি সুরু হয়। কিন্তু মিকাডোর সিংহাসনপ্রাপ্তি সহজে সাধিত হয় নাই। মিকাডোর পক্ষে এবং জমিদারবংশীয়গণের পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সেই Civil War বা গৃহ-বিবাদের কোন কোন চিত্রও সমরসংগ্রহালয়ে রহিয়াছে। টোকিও সহরের এক উদ্যানে শেষ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের এক চিত্রও দেখিলাম।

জাপানের সামরিক ইতিহাসে ১৮৬৮, ১৮৯৪, এবং ১৯০৫ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মধ্যযুগের কাহিনীসমূহ বংশগত বিবাদ, ব্যক্তিগত অভিমান ইত্যাদির বৃত্তান্ত। তাহাতে সামরিক তথ্য বা তত্ত্ব বিশেষ কিছু নাই। কাজেই "মিলিটারি মিউজিয়ামে" জাপানী মধ্যযুগের কোন যুদ্ধ বিবরণ নাই। তবে সেই যুগে যোদ্ধারা কিরূপ পোষাক পরিত, শিকারীরা কিরূপ অস্ত্রচালনা করিত, তীর ধনুক বন্দুক গোলা ইত্যাদি কিরূপ ব্যবহৃত হইত তাহার যথেষ্ট নিদর্শন সংগৃহীত রহিয়াছে। ষোড়শশতাব্দীতে জাপানীরা কোরিয়া দখল করিতে যাইয়া পরাজিত হয়। সেই কোরিয়া যুদ্ধের কোন বস্তু এখানে দেখিলাম না। তখনকার একটা জাহাজ দেখা গেল মাত্র। এশিয়া ও ইয়োরোপে বাষ্পযুগের পূর্ব্বে এক ধরণের জাহাজই নির্ম্মিত হইত।

জাপানীরা সর্ব্বদা গৌরব করিয়া থাকে যে

তাহাদের দেশ কখনও বিদেশীয় জনগণের হস্তগত হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলেরা চীন দখল করিয়া জাপান আক্রমণ করে। মোগলের সাম্রাজ্য তখন ইয়োরোপের পশ্চিম সীমা হইতে এশিয়ার পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সর্ব্বগ্রাসী মোগল পরাক্রম দৈবক্রমে বিধ্বস্ত হয়। নাগাসাকি বন্দরের নিকট প্রবল ঝটিকায় মোগল নৌবল ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পর হইতে কোন বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ জাপানী জাতিকে আশঙ্কিত করে নাই। ইংরাজের মত জাপানীরাও স্বাধীনতার বড়াই করিতে অধিকারী। এই মোগল আক্রমণের কয়েকটা পুরাতন চিত্র দুই তিন প্রাচীরে দেখিতে পাইলাম।

টোকিওর এই মিউজিয়াম দেখিলে সমগ্র জাপানের ধারাবাহিক ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং প্রস্তর যুগের অস্ত্রাদিও কিছু কিছু সংগৃহীত রহিয়াছে। জাপানের আদিম নিবাসী আইনোদিগের সামরিক জীবনও বুঝিতে পারা গেল।

বর্ত্তমান যুগে ইয়োরামেরিকার রাষ্ট্র-সমূহ যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে এক গৃহে সেইগুলির নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। একটা আল্‌মারির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া গাইড্ বলিলেন—"এই দেখুন চুলের কাছি। চীনা-সমরের সময়ে একজন জাপানী রমণী স্ত্রীলোকের চুল সংগ্রহ করিয়া এই দড়ি প্রস্তুত করিয়াছিল। হাজার হাজার রমণী এই কাছির জন্য তাহাদের কেশ সমূলে নষ্ট করিয়াছিল। এই কাছি এক জাহাজের কাপ্তেনকে উপহার পাঠান হয়।" কোন কোন গৃহে অলঙ্কারস্বরূপ "পোষাকি" অস্ত্র শস্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। এগুলি যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত না। রাজদরবারে উৎসবোপলক্ষে, অথবা সামাজিক কার্য্যকলাপের সময়ে মধ্য-যুগের "ডাইমো" বা দলপতিগণ এই সমুদয় মণিমুক্তাসমন্বিত তরবারি ধারণ করিতেন।

এক গৃহ সেনাপতি নোগির স্মৃতিরক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত। এখানে সেনাপতি এবং তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। তাঁহাদের দুই পুত্র রুশযুদ্ধে মারা যায়। তাহাদের চিত্রও দেখিলাম। যে পোষাক পরিয়া সপত্নীক নোগি হারাকিরি করেন সেই পোষাকও প্রদর্শিত হইতেছে। নোগি ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, জাপান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র হইতে যে সমুদয় গৌরবসূচক "ব্যাজ" বা পদক পাইয়াছিলেন সেগুলির সঙ্গে তাঁহার হস্তলিপি এক আলমারির মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। নোগির পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সমুদয় সামরিক দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই সমুদয় বস্তুও এই গৃহে দেখিতে পাইলাম।

টোকিওর নৌচালন-বিদ্যালয়ে একবার আকস্মিক বিপদ্ ঘটে। একটা জাহাজে করিয়া বহুসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক সমুদ্রে পরীক্ষা কার্য্য করিতে বাহির হন। পরে তাঁহারা নিরুদ্দেশ হইয়া পড়েন। সেই জাহাজের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মিউজিয়ামের ভিতর এই জাহাজ ও আরোহিগণের চিত্র দেখিলাম।

সমর-মিউজিয়াম হইতে উয়েনোপার্কে আসিলাম। ইহার ভিতর একটা পুষ্করিণী আছে। তাহার মধ্যে পদ্ম ফুটিয়া থাকে। এই পুষ্করিণীর সম্মুখে একটা সুবৃহৎ গৃহ দেখিলাম। গত বৎসর প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। এই বৎসর এখানে একটা House-Keeping Expo-

sition বা গৃহস্থালী-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা স্থায়ী প্রদর্শনী গৃহ বা মিউজিয়াম স্বরূপ রক্ষিত হইবে।

জাপানীরা ইয়াঙ্কিদের নিকট প্রদর্শনী-পরিচালনা শিখিয়াছে। ব্যবস্থা আগাগোড়া সেইরূপ বোধ হইল। তবে জাপানের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের লক্ষণ দেখিতে পাই—প্রদর্শনীর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদিও দারিদ্র্যের পরিচয় প্রদান করিল। মেলায় যে সমুদয় বস্তু দেখিলাম এগুলিই কোন ইয়োরামেরিকান নগরে প্রদর্শিত হইলে ইহাদের সৌন্দর্য্য দশগুণ বেশী দেখিতাম। পাশ্চাত্যেরা বাহ্য আয়োজনগুলি অতিশয় উচ্চ অঙ্গের করিয়া থাকে। তাহাতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়। এশিয়ার লোকেরা সেগুলিকে অনাবশ্যক বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

যাহাহউক এখানে জাপানের স্ত্রীশিক্ষা ও রমণীসমাজ সম্বন্ধে সকলপ্রকার তথ্য দেখিতে পাইলাম। চিত্রাঙ্কণ, শিশুবিনয়ন, ধাত্রীবিদ্যা, বস্ত্রসৌষ্ঠবকরণ, রন্ধন ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ, পোষাকপ্রস্তুতকরণ ইত্যাদি সামাজিক জীবনের সকল প্রকার নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। গত বৎসরের ভিতর জাপানীরা যে যে বিষয়ে নূতন আয়োজন করিয়াছে এখানে সেইগুলিই প্রদর্শিত। গৃহস্থালীর প্রদর্শনীতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি সকল বিভাগেরই পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এখানে তাহাই দেখিলাম। ভাব্লিনের Civic Exhibition আর টোকিওর House-Keeping Exposition অনেকটা একশ্রেণীর অন্তর্গত।

৬। স্বদেশী জাপান

মিৎসুকোষী কোম্পানী, মাকজেন কোম্পানী, বড়ং বড় ব্যাঙ্ক ও নব্যবয়সের "ষ্টোরস্"-সমূহ গিন্জাষ্টিটে অবস্থিত। গিন্জাষ্টিটকে টোকিওর চৌরঙ্গি রোড বলা যাইতে পারে। নিউ-ইয়র্কের পঞ্চম য়্যাভিনিউ ও লণ্ডনের পিকাডিলি যাহা, টোকিওর গিন্জা-মহাল্লা তাহা। নব্য জাপানীর ব্যবসায়কেন্দ্র এইখানেকার আধুনিক অট্টালিকাসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চল দেখিয়া জাপানে ইয়োরামেরিকার প্রভাব কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি। অবশ্য গিন্জা দেখিয়া নিউইয়র্ক লণ্ডনের ধনসম্পদ ও লোক-সমারোহ অনুমান করা অসম্ভব।

গিন্জামহাল্লার বাহিরে নগরের স্থানে স্থানে কতকগুলি ইয়োরামেরিকান রীতির সৌধ দেখিতে পাই। এগুলি হয় রাজপ্রাসাদ কিম্বা সরকারী কার্য্যালয়। ইহাদের সংখ্যা বেশী নয়—কিন্তু দুই চারিটা প্রত্যেক অঞ্চলেই আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে টোকিওর সর্ব্বত্র জাপানীর জাপানই লক্ষ্য করিতেছি। ক্ষুদ্র কুটির, সঙ্কীর্ণ গলি, কাঠের বাড়ী, কাগজের দেওয়াল, কাঠের খড়ম, কাগজের ছাতা, ঠেলাগাড়ী, ছেলে-পীঠেকরা রমণী, ফরাস-বিছান দোকান, মাছভাতের হোটেল,—ইত্যাদিই সর্ব্বত্র চোখে পড়ে। আর ইয়োরামিকার ত্রিসীমানায় নাই—ভারতবর্ষের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছি মনে হইতেছে। টোকিওতে হাট্-কোট্-পরা, হোটেলবাসী ইয়োরামেরিকাপ্রিয়, জড়বাদী, ধর্ম্মত্যাগী জাপানী কয়জন? বুদ্ধসেবী, কুটিরবাসী, কিমনো-পরা, পুরাতনতন্ত্রী নরনারীই এখনও জাপানের মেরুদণ্ড। বিগত ৫০ বৎসরের পাশ্চাত্য প্রভাবে স্বদেশী জাপান মারা যায় নাই—ইহার উপর কোন গভীর ও বিস্তৃত বিদেশীয় প্রলেপ পড়িয়াছে কি না সন্দেহ—বরং নূতন প্রবর্ত্তিত ইয়োরামেরিকান্ অনুষ্ঠানে

প্রতিষ্ঠানগুলিই জাপানীদের সাধারণ জীবন-প্রবাহের অঙ্গীভূত হইয়া যাইতেছে।

শব্জী-বাজার

আজ সকালে বাজার দেখিতে বাহির হইলাম। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা বড়বাজারে আসা গেল। বাঙ্গালাদেশের মফঃস্বলে পাড়াগাঁয়ে হাট বসিলে যেরূপ হয় লণ্ডন নিউইয়র্কের সমকক্ষ টোকিওর বাজার সেইরূপ মাত্র। ইংরাজ ও ইয়াঙ্কিরা এই বাজার দেখিয়া দূর হইতে ত্রাহি মধুসূদন বলিবে সন্দেহ নাই। উহারা যে সকল জাতিকে অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত তাহাদের ধরণধারণ সবই জাপানী সমাজে বর্ত্তমান। অথচ জাপান রুশিয়াকে কাবু করিয়াছে—কাজেই সে আজ প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি। সুতরাং তাহাকে অসভ্য বলে সাধ্য কার? কিন্তু ইয়োরামেরিকানেরা জাপানকে নিজেদের সঙ্গে একই রাষ্ট্রীয় আসনে স্থান দিতে বাধ্য হইয়া প্রতিপদে মর্ম্মাহত হইতেছে।

একটা মুদীখানায় প্রবেশ করিলাম। চৌকির উপর ফরাস পাতা রহিয়াছে। মুদী মহাশয় হাঁটু পাতিয়া বসিয়া আছেন। ঘরের মেঝে অপরিষ্কার—বিশেষরূপে পাকা-বাঁধান নয়। বাদলার দিনে খড়মের কাদায় ঘর ময়লা হইতেছে। মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। কতকগুলি কাঠের ভাঁড়ে নানাপ্রকার শস্য সাজান রহিয়াছে। আমাদের দেশে চটের বোরায় মাল রাখা হয়—জাপানীরা কাঠের ব্যারেল ব্যবহার করে। কতকগুলি ব্যারেল ঘরের বাহিরে রাস্তার উপরেই রক্ষিত হইয়াছে। মটর, তিল, গোধূম, শিমের বীজ ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। ধান চাউলের দোকান অন্যত্র। টিনের কৌটায় সুরক্ষিত ফলও এই দোকানে আছে। এইগুলি জাপানেই প্রস্তুত। গাইড্ বলিলেন—"এই যে বাক্সের ভিতর কতকগুলি শুষ্ক শব্জী ও ফল দেখিতেছেন এগুলি নিরামিষাশী বৌদ্ধ পুরোহিতগণের খাদ্য।" Sea weeds এবং mushrooms রৌদ্রে শুকাইয়া এইরূপে রাখা হয়।

মুদীখানা হইতে বাজারের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঠিক যেন এলাহাবাদের চকের ভিতর দিয়া চলিতেছি। এখানে কপির পাতা পচিতেছে, ওখানে মূলার শাক পড়িয়া আছে। কোথাও বা ঠেলাগাড়ীতে করিয়া কুমড়া, আদা, বেগুন, সাকরকন্দ আলু, শালগম ইত্যাদি স্থানান্তরিত হইতেছে—কোথাও বা অর্দ্ধাবৃতদেহ ভারবাহী বাঁকে করিয়া মাল চালান করিতেছে। তাহার উপর বৃষ্টির উৎপাতে জল কাদা দুর্গন্ধ ত যথারীতি আছেই।

ছোট ছোট চুপ্‌ড়ীতে শাকশব্জীগুলি সাজান। দোকানঘরগুলি নিতান্তই ক্ষুদ্র—ঘরের বাহিরেই কেনা বেচা চলিতেছে। কোথাও বা একটা টিনের ছত্রস্বরূপ আবরণের নীচে দোকানদার বসিয়া আছেন। খোলার ছাদওয়ালা গৃহই বেশী। দেখিয়া শুনিয়া কলিকাতার কোন বাজারের কথা মনে হইল না। স্যাঁত স্যাঁতে বিক্রমপুরের হাটবাজার মেলার দৃশ্যই চোখে আসিল। টোকিও কি "আধুনিক" নয়?

আমাদের দেশে বাজারের স্থানে স্থানে চাল কড়াই ভাজার দোকান দেখা যায়। এখানে সেইরূপ চার দোকান। কয়েকটা অন্ধকারময় ঘরে রুটি তৈয়ারী হইতেছে। মাছে আলুতে মিশাইয়া এই রুটি তৈয়ারি করা হয়। একজন অর্দ্ধউলঙ্গভাবে একটা গামলার ভিতর লাফাইতেছে—তাহার পায়ের

নীত কটির উপকরণ। টোকিওর বাজারে ফল বেশী দেখিলাম না। জাপানীরা কয়-মোসা হইতে কলা আমদানী করে এবং আমেরিকা হইতে লেবু আনয়ন করে। পূর্ব্বে জাপানে নাসপাতি জন্মিত না। কিছু-কাল হইল যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই গাছের চারা আনা হইয়াছে। এক্ষণে নাসপাতি জাপানেই উৎপন্ন হয়।

হস্ত-শিল্পের কারবার

শঙ্কীবাজার হইতে বাহির হইয়া নগরের নানাস্থানে কতকগুলি দোকান দেখা গেল। এই সকল দোকান ইয়োরামেরিকায় দেখিতে পাই না। ভারতবাসীর পক্ষে অবশ্য এগুলি নূতন নয়। এই সমুদয়ে মধ্যযুগের জাপান, এশিয়াবাসী জাপানী এবং জাপানীর জাপান বুঝিতে পারা যায়। জাপানীরা যে ভারত-বাসীর শিষ্য ও আত্মীয় তাহার পরিচয় এইখানে পাইলাম।

বিলাতে ও ইয়াঙ্কিস্থানে আজকাল প্রায় সকল পদার্থই কলে প্রস্তুত হয়। বিগত ৩০।৪০ বৎসরের ভিতর জাপানেও যন্ত্রচালিত কার-খানার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ছুরী কাঁচি হইতে গরদ পশম পর্য্যন্ত সকল বস্তুর জন্যই জাপা-নীরা ছোট বড় ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াছে। টোকিও, ওসাকা, নাগাসাকি ইত্যাদির কোন কোন কারখানায় দশ হাজার নরনারী কর্ম্ম করিতেছে।

এই সকল কারখানায় যে সমুদয় জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে তাহা ছাড়া ইয়োরামে-রিকায় বর্ত্তমানযুগে আর কোন বস্তু পাওয়া যায় না। কিন্তু জাপানে এখনও বহু জিনিষ হাতেই তৈয়ারী হয়—সেগুলির ফ্যাক্টরী বৃহৎ যন্ত্রচালিত কারখানা নয়—ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিবারের কুটির, জাপানীদের এই হস্তশিল্প, কুটির-শিল্প এবং পরিবারগত কারবার না দেখিলে জাপানের যথার্থ রূপ দেখা হয় না। স্বদেশী জাপান বুঝিবার জন্য হস্তশিল্পের, handicrafts ও industrial artএর কয়েকটা দোকান খুঁজিয়া লইলাম। গাইডের সাহায্য আবশ্যক হইল।

ধাতুশিল্পের নমুনা দেখিয়া পাশ্চাত্যেরা বিস্মিত হইবেন। কিন্তু ভারতবাসীর চোখে এগুলির বিশেষত্ব বেশী নাই। তবে সোনা রূপা কাঁসা হাতীর দাঁত ইত্যাদির উপর জাপানী অলঙ্কার-সমাবেশ নূতন। এনামেল এবং চীনামাটির শিল্প সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। কাশী, মোরাদাবাদ, মুর্শিদাবাদ, তাঞ্জোর ইত্যাদির arts and crafts দেখা থাকিলে এই ধরণের কারুকার্য্য দুনিয়ার অন্যত্র দেখিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দুইটা শিল্প বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। Lacquer ware বা সোনালি পালা (লাহা) নির্ম্মিত কলাইয়ের কার্য্যে জাপানীরা সুদক্ষ। এগুলি অতিশয় মনোরম। দ্বিতীয়তঃ, রেশমের উপর বুনন কার্য্য ইহাই জাপানীদের খাস শিল্প। এ বিষয়ে ইহারা জগতে অদ্বিতীয়।

সোনালি পালার কাজ ইতিমধ্যে জাপানের নানাস্থানে দেখিয়াছি। সাধারণ থালা বাটি বাক্স ছুরি ইত্যাদির উপর ইহার প্রলেপ যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সেদিন টোকুগাওয়া বংশীয় দ্বিতীয় শোগুণের সমাধি-মন্দিরে সচিত্র lacquer worksএর প্রাচীর ও ছাদ দেখিয়া এক অভিনব শিল্প-জগতের পরিচয় পাইয়াছিলাম। ফরাসী শিল্প-সমালোচক M. Louis Gonse বলেন—"Japanese lacquered objects are the most perfect works that have ever issued from the hands of men,"

জাপানের এই কারুকার্য্য সম্বন্ধে Stewart Dick তাঁহার The Arts and Crafts of old Japan গ্রন্থে বলিতেছেন :—" The most wonderful of all Japanese arts is their lacquer work, and perhaps in this more completely then in any other medium does the peculiar genius of Japan find expression. • • • Even were the same brilliant faculty of design the gift of the European, the amazing and unfaltering precision of hand, and the limitless patience and unceasing care required by the technical processes, place lacquer work far beyond his scope."

রেশমী কাপড়ের দোকানে আসিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হইলাম। রেশমের উপর নানা রংয়ের রেশমী সুতার বুনন দেখিতেছি কি কাগজ কিম্বা কাম্বিশের উপর তুলির ছবি দেখিতেছি, কি সম্মুখে জীবন্ত পশুপক্ষী তৃণলতা দেখিতেছি বুঝা কঠিন। এই সকল কার্য্য পর্দ্দার জন্য, গালিচায় ব্যবহারের জন্য, আসনের জন্য টেবিল ক্লথের জন্য, অথবা দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। শিল্পীরা জাপানের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, মন্দির, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঋতু, হ্রদ, নদী, সমুদ্র, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি এই রেশমী শিল্পে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে। এই দোকানের সংগ্রহালয়ে দাঁড়াইয়া সমগ্র জাপানের প্রতিকৃতি দেখিয়া লইলাম।

জাপানীদের এই শিল্প ভারতবর্ষে নিতান্ত অপরিচিত নয়। Kakemono (কাকেমনো) নামক লম্বমান রেশমী চিত্রপট আমরা দেশে দেখিতে পাই। তাহাতে জাপানের ফুজি—পর্ব্বত অথবা মিয়াজিমা শিন্টো মন্দিরের তোরণদ্বার কিম্বা নারা নগরের বৌদ্ধ মন্দির, কিম্বা জাপানী বারমাসের বার ফুল দেখিয়া থাকি। এই সকল কাকেমনো মানচিত্রের মত গুটাইয়া রাখা যায়। জাপানী চিত্রকরেরা ছবি কাঠের ফ্রেমে বাঁধাইয়া রাখে না। চিত্র ঝুলাইয়া রাখা এবং আবশ্যক হইলে গুটাইয়া রাখা এদেশে সম্ভব। কাকেমনোর আবিষ্কার চীনে হয়—পরে কোরিয়া হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধশিল্পের সকল অঙ্গ জাপানে আমদানি হইয়াছে।

এই রেশমী বুনন কার্য্যের দোকান জাপানে সুপ্রসিদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে টোকুগাওয়া শোগুণদিগের আমলে এই দোকান খোলা হয়। সেই শোগুণেরা সকল প্রকার শিল্পকর্ম্মের উৎসাহদাতা ও সংরক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের অর্ডার পাইয়াই কারিকরেরা সহিষ্ণুতার সহিত হস্তিদন্ত, গালা, ধাতু, রেশম ইত্যাদির উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ফলাইতে সমর্থ হইত।

দোকানদার বলিলেন—"চৌদ্দ পনর বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ তাতা মহাশয় জাপানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমরা অনেক জিনিষ বেচিয়াছি। পাঁচসাত বৎসর হইল বড়োদার গায়কবাড় এখানে আসেন। তিনিও বহুসংখ্যক কাকেমনো, পর্দ্দা, টেবিলক্লথ, বিছানার চাদর ইত্যাদি ক্রয় করিয়াছেন।"

দুইখানা সুবৃহৎ পর্দ্দা দেখিলাম। একটার উপর সমুদ্রের তরঙ্গ বুনা হইয়াছে—অপরটায় পার্ব্বত্য প্রদেশে ধান্যক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছি। প্রথমটার মূল্য ৩০০০৲ দ্বিতীয়টার মূল্য ৬০০০৲। দুই কারিগরই কিয়োটো

—নগরে বাস করেন। ইহাদের মত আরও অনেক ওস্তাদ কিয়োটোতে আছেন। ইহাদের কোন ফ্যাক্টরী নাই—স্বগৃহে সাগ্‌রেদের সাহায্যে কার্য্য করিয়া থাকেন। ভারতীয় গৃহ-শিল্প এইরূপ।

দোকানদার বলিলেন—"আমরা ইহাদের নিকট "ডিজাইন" চাহিয়া পাঠাই। বুনন কার্য্যের জন্য আর একশ্রেণীর লোক নিযুক্ত করি। সর্ব্বসমেত আমাদের অধীনে রেশমী-কার্য্যে ১০০ কারিগর কার্য্য করে। আমাদের দোকানের অন্যান্য বিভাগও আছে। কারিগর সংখ্যা প্রায় ১০০০। কোন একস্থানে এই সকল লোক সমবেত হয় না। দশ বারটা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যালয় আছে। কোথাও আধুনিক যন্ত্রাদির ব্যবহার নাই।"

এই দোকানের বড় আফিস এবং কার্য্যালয়-গুলি কিয়োটোতে অবস্থিত। কিয়োটো নগর বহুকাল পর্য্যন্ত জাপানের রাজধানী ছিল—ইহা জাপানীদের দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, গৌড় বা মুর্শিদাবাদ। কাজেই এই নগর সকল প্রকার সুকুমার ও সূক্ষ্ম শিল্প-কারুকার্য্যের কেন্দ্রস্থল। দোকানের নাম নিশিমুরা কোম্পানী। রেশমী বুনন কার্য্য ষোড়শশতাব্দীতে শিল্পী শিনো কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কেইনিন, কোকিও প্রভৃতি আধুনিক কারিগরেরা তাঁহারই চেলা।

মুক্তার চাষ

মুক্তার কারবার সমগ্র এশিয়ার স্বদেশী। জাপানেও মুক্তার ব্যবসায় প্রসিদ্ধ। টোকিওর "মিকিমোতো পার্‌ল্‌ষ্টোর" এই প্রাচ্য শিল্পের বিখ্যাত দোকান।

এই দোকানে মুক্তার জিনিষ অনেকবিধ রহিয়াছে। কিন্তু সেগুলি দেখিবার জন্য এখানে আসি নাই। এখানে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে ইচ্ছানুরূপ খাঁটি মুক্তা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে শুনিয়াই আসিয়াছি।

শুক্রনীতিতে বর্ণিত আছে যে সিংহলের লোকেরা কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা প্রস্তুত করিত। এইজন্য সংস্কৃত নাটকীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই যে খাঁটি মুক্তা বাছিয়া লইবার জন্য মুদক্ষ জহরি নিযুক্ত হইত। কৃত্রিম মুক্তার বিবরণ আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যেও পাই। Imitation pearls, Roman pearls, Venetian pearls ইত্যাদি নামে কাচ, পাথর ইত্যাদি চালান হইত। কিন্তু জাপানের এই দোকানে সেইরূপ নামে মাত্র মুক্তার ব্যবসায় চলিতেছে না। দোকানের স্বত্বাধিকারী মিকিমোতো মহাশয় সমুদ্রের ভিতর আসল মুক্তা-জীবের পালন বা চাষ করিতেছেন। Agriculture, Horticultur, Pisci-culture ইত্যাদির ন্যায় Pearl-culture ও খাঁটি বিজ্ঞানের সাহায্যে চলিতেছে। সমুদ্র হইতে প্রকৃতির দান স্বরূপ মুক্তার অল্পমাত্র পাওয়া যায়। বিশেষ আয়োজনের ফলে মিকিমোতো প্রতিবৎসর বহুসংখ্যা মুক্তা পাইতেছেন। কাজেই বলা যাইতে পারে যে তিনি "attempts to make the pearl oyster work for man and produce natural and true pearls in a more reliable and methodical manner than nature—in short a kind of "harnessing" the mollusc for the Service of man". ইয়াঙ্কি সুধার বার্ব্যাঙ্ক উদ্ভিজ্জগতে যাহা করিতেছেন জাপানী মিকিমোতো বিনুক শামুকের জগতে তাহাই করিতেছেন। ইঁহার তৈয়ারী মুক্তার কাটতি আজকাল বিলাতে ও আমেরিকায় বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্বাধ্যাপক ডাক্তার মিৎসুকুরীর পরামর্শে মিকিমোতো মুক্তার চাষে প্রবৃত্ত হন। মাছের চাষ যে কারণে সম্ভব, ঝিনুক শামুকের চাষও সেই কারণেই সম্ভব। যথারীতি ঝিনুকের চাষ করিতে পারিলে মুক্তালাভের আশা করা যায়। কৃত্রিম উপায়ে সকণ্টক উদ্ভিদ্‌কে নিষ্কণ্টক উদ্ভিদে রূপান্তরিত করা দেখিয়াছি। মিকিমোতোর দোকানে কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক মুক্তাফলের উৎপত্তি দেখিলাম। মুক্তার আবাদ-প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

Every year during the months of July and August, small pieces of rock and stone are placed where the oyster larvæ are most abundantly found. Soon small oyster spats are found attached to them. As this takes place in the shallow waters, if the oysters were left there during the winter they would die from chill. So together with the stones to which they are anchored, they are removed to deeper waters when they reach their third year, they are taken out of the sea, and undergo an operation which leads to the pearl formation. This consists chiefly in introducing into them small pearls or round pieces of nacre which are to serve as nuclei of pearls. The shells are then put back into the sea and carefully laid down on the bed. They are left there undisturbed for at least four years more. At the end of that period it will be found that the animal has invested the nucleus with many layers of nacre and in fact produced a pearl."

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

হংসদূত

বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে যে সকল কবি কাব্য লিখিয়া মানবহৃদয়ে প্রেমভক্তির সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীল রূপগোস্বামী মহোদয় অন্যতম। শ্রীরূপের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আছে,—সকলগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির নাম বঙ্গীয় বৈষ্ণব মাত্রেরই সুবিদিত। এতদ্ব্যতীত ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটকের নামও সুপ্রসিদ্ধ। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বহুবার এই সকল গ্রন্থের পরিচয় পাইয়াছেন। যিনি নাটকচন্দ্রিকায় নাটকীয় লক্ষণ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহার লিখিত ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটক যে নাটকীয় লক্ষণে দোষ বিবর্জ্জিত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এই দুই গ্রন্থের প্রকৃত প্রশংসা নাটকীয় লক্ষণ নিয়ামক নহে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই

দুইখানি নাটকে যে মধুময় প্রেমভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে চিরদিনই তাঁহাকে প্রেমিক ভক্তসমাজে অমর করিয়া রাখিবে।

পবিত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সপার্ষদ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এইরূপের এই দুই নাটকের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দকে এই দুইখানি নাটক শুনাইতেন, এক একটি শ্লোক শ্রবণে ভক্তগণ আনন্দ সুধাসাগরে একবারেই নিমগ্ন হইতেন যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

"যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোকশুনি সবার হৈল আনন্দ বিস্ময়।
সবে কহে নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ নাহি বর্ণে আর।"

আবার অন্যত্র—

"রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার।"

অপিচ—

"এতশুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব যাহ সহস্র বদনে।
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার।
প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্তে কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন।"

এই বলিয়া রসময় কবি শ্রীরামানন্দ একটি প্রাচীন শ্লোক বলিয়া নিজের বাক্য সমর্থন করিলেন, সে শ্লোকটি এই :—

"কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ।"

অর্থাৎ সেই কবির কাব্যেই বা কি প্রয়োজন, যদি উহা পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ে স্পর্শ করিয়া তাহার চিত্ত ঘূর্ণন করিতে সমর্থ না হয়, আর ধনুর্দ্ধারী বীরের সেই ধনুঃ কাণ্ডেরই বা কি প্রয়োজন, যদি সেই কাণ্ড অপরের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া তাহার শিরোঘূর্ণন উপস্থিত করিতে না পারে? রূপের কাব্য শ্রবণে প্রকৃতস্থ থাকা সহজ নহে। তোমার শক্তি সঞ্চার ব্যতীত জীবের যে এইরূপ শক্তি হইতে পারে ইহাত আমার ধারণার বহির্ভূত।

"তোমার শক্তিবিনে এই জীবের নহে বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি।"

প্রভু বলিলেন—প্রয়াগে ইহার সহিত আমার মিলন হয়, ইহার গুণে আমি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তোমরা ইহার নাটক শুনিলে তো?

"মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনে নহে রসের প্রচার।
সবে কৃপা করি ইহার দেও এই বর।
ব্রজলীলা রস প্রেম বর্ণে নিরন্তর।"

ইহার পরে অখিল রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপাদ সনাতনের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—

ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয় নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম।
তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ ঐছে তার রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাহাতেই স্থিতি।
এই দুই ভাই আমি পঠাইনু বৃন্দাবন।
শক্তি দিয়া ভক্তি শাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তন।"

শ্রীপাদ রূপের কবিত্ব সমৃদ্ধির গুহ্যতত্ত্ব উহাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ রূপকৃত স্তবাবলীও ভাববৈভবে ও শব্দসম্পদে বাস্তবিকই বিস্ময়জনক।

এই অমর কবির সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির অধিকাংশই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। কিন্তু হংসদূত ও উদ্ধব সন্দেশের নাম তত প্রসিদ্ধ নহে। আমরা এইস্থানে হংসদূতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া ভক্ত পাঠকগণের সমক্ষে

বৌদ্ধ মন্দিরের তোরণদ্বার

আটাগো পাহাড় হইতে টোকিওর দৃশ্য

এই গ্রন্থখানি সমুদ্ভাসিত করিতে প্রয়াস পাইব।

বিরহবিধুর নায়কনায়িকার দূতদূতী-প্রেরণ-ব্যাপার-অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় অনেক খণ্ডকাব্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকাব্যের অন্তরালেও কখন কখন এইরূপ ব্যাপারের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস মেঘদূত-বিরচনের পূর্ব্বে খুব সম্ভবতঃ বিরহবিধুর নরনারীর বিরহবিহ্বলতা-জনিত উদ্ভ্রান্তচিত্তের এতাদৃশ দূতপ্রেরণ ব্যাপারের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা ভ্রমর দূত দেখিতে পাই। কিন্তু কালিদাসের পূর্ব্বে এ বিষয়ে অপর কেহ কোনও খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার অনুসন্ধান করি নাই। পদাঙ্কদূত গ্রন্থখানি আধুনিক। বৈষ্ণব সমাজে এ গ্রন্থখানি বহুদিন হইতে সুপ্রচলিত। বটতলার প্রকাশকগণ বহুবার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদের সহিত এই পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শৈশব সময়ে গুরুজনদের মুখে পদাঙ্কদূতের আবৃত্তি শুনিয়াছি, তাঁহাদের চরণ সন্নিধানে উপবেশন করিয়া উহার অনেক শ্লোক কণ্ঠস্থও করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও হংসদূতের নাম শুনি নাই।

শ্রীরূপের গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে করিতে হংসদূতের নাম দেখিতে পাই, এবং উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতিতে হংসদূতের দুই একটি শ্লোকও দেখিতে পাই। সে অনেক দিনের কথা। তাহার পরে ভগবদিচ্ছায় একখানি সুলিখিত সটীক হংসদূত গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়। টীকাকার সুবিখ্যাত বঙ্গীয় শ্রীল গোপাল চক্রবর্ত্তী। ইতঃপূর্ব্বে যাঁহার কৃত দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীর টীকা পাঠ করিয়াছিলাম। গোপাল গঙ্গাতীরবাসী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান; উপাধি—চক্রবর্ত্তী। ইনি ১৪১৮ শাকে এই টীকা প্রণয়ন করেন। টীকার উপসংহারে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন সেই স্থলেই উক্ত শকেরও উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় অন্যান্য গ্রন্থে গ্রন্থ-প্রণয়ন-কাল নির্দ্দেশ করিলেও হংসদূতের উপসংহারে সে নিয়ম রক্ষা করেন নাই। হংসদূত যে উজ্জ্বল নীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্বে বিরচিত এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাহা জানা যায়। এই দুই গ্রন্থের মধ্যে হংসদূতের অনেক শ্লোক উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃত গ্রন্থখানি ১৪৬৩ শকে রচিত হইয়াছিল। ইহার প্রায় ২৪ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রয়াগে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ ১৪৩১ বা ১৪৩৬ শকেরও পূর্ব্বে হংসদূত লিখিত হইয়াছিল। আমাদের এরূপ অনুমান করার কারণ এই যে শ্রীরূপ মহাপ্রভুর সহ সম্মিলন লাভের পরে যেসকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই সকল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বন্দনা কি দৃষ্ট হয়। কিন্তু হংসদূতে মহাপ্রভুর নামোল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা একবারেই সুনিশ্চিত যে হংসদূত অতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ যে সুবিখ্যাত শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামীরই লিখিত তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধীয় লঘু তোষণী টীকার শেষে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাদের যে স্বীয় বংশাবলীর পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে হংসদূত শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত বলিয়াই উল্লেখিত আছে।

এখন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীরূপের এই কাব্যখানি—খণ্ড-

কাব্য। সাহিত্যদর্পণে খণ্ডকাব্যের যে লক্ষণ লিখিত আছে তাহা এইরূপ—

"খণ্ডকাব্যং ভবেৎ কাব্যস্যৈকদেশানুসারিকম্"

যথা মেঘদূতাদি।

অর্থাৎ কাব্যের একদেশ মাত্র অবলম্বনে যে কাব্য রচিত হয়, তাহারই নাম খণ্ডকাব্য, যেমন মেঘদূতাদি। খণ্ডকাব্যও বহু প্রকার। সাহিত্যলক্ষণ বিচারক পণ্ডিতগণ কাব্যের শ্রেণী ও নাম বিনির্ণয়ে খণ্ডকাব্যের বহুল প্রকার-ভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই সকল লক্ষণের বিচারে জানা যায় হংসদূত "সাংঘাখ্যে" খণ্ডকাব্য। উহার লক্ষণ এই :—

"যত্রৈকমর্থমেকেন সর্গেণৈবতু বর্ণয়েৎ।
একেন ছন্দসা তত্তু সাংঘাতাখ্যমুদাহৃতম্॥"

অর্থাৎ যে কাব্য এক ছন্দে এক সর্গে একমাত্র অর্থ বর্ণিত হয় সেই কাব্য সাংঘাতাখ্য খণ্ডকাব্য।

বিরহিণী নায়িকা শ্রীমতী রাধিকার বিরহ-ব্যথায় ব্যথিতা হইয়া তাহার মর্ম্মসখী শ্রীমতী ললিতা বিহ্বলা হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিরহব্যাকুলা শ্রীমতীর অন্তিমদশা জানাইবার জন্য এতই অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে একটি হংসকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই এই সংবাদ প্রেরণের দূতরূপে বরণ করিলেন।

কালিদাস অচেতন মেঘকে যক্ষের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে গিয়া একটা কৈফিয়ৎ দিয়া লিখিয়াছেন।

"কামার্ত্তা হি প্রকৃতি কৃপণা চেতনাচেতনেষু"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও এই রীতির অন্যথা করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"ধৃতোৎকণ্ঠা সন্তোহরিসদসি সন্দেশহরণে"

টীকাকার এস্থলে লিখিয়াছেন :—

"উৎকণ্ঠা যুক্তাত্বাৎ যোগ্যা যোগ্য-
বিচারোঽপি ন কৃতঃ।"

অর্থাৎ উৎকণ্ঠাযুক্ততা নিবন্ধন যোগ্যাযোগ্য বিচার করার অবসর ঘটে নাই।

অপিচ পাছে কেহ মনে করে যে বিশেষ জ্ঞানহীন পক্ষীকে এই গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া ললিতা ভাল কার্য্য করেন নাই তাই শ্রীপাদ গ্রন্থকার অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার দিয়া অপর শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

"ন তস্যা দোষোঽয়ং যদিহ বিহগং প্রার্থিতবতী।
ন কস্মিন্ বিশ্রম্ভং দিশতি হরিভক্তি প্রণয়িতা॥"

টীকাকার মহাশয় ইহার পরিস্ফুট ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন :—

নমু "বিশেষ জ্ঞানহীনং পক্ষিণং কথং দূতং কৃতবতী?" ইত্যাহ—"ইহ দৌত্য করণে যদিহগং প্রার্থিতবতী তস্যাঃ সারাসার বিচার বিচাররহিত্ব দোষো ন। তত্র হেতুঃ—হরিভক্তি প্রণয়িতা শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবনাতিশায়িতা কস্মিন্ জনে বিশ্রম্ভং বিশ্বাসং ন দিশতি? হরি ভক্তি রসিকস্য সর্ব্বত্রৈশ্বর্য্য দৃষ্টা। উচ্চনীচ ভেদাভেদাভাবাৎ। যথা বিশ্রম্ভং প্রণয়ং হরিভক্তস্য সর্ব্বত্র প্রণয়াৎ।"

অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানহীন পক্ষীকে ললিতা দৌত্য কার্য্যের জন্য বরণ করিলেন কেন? গ্রন্থকার বলিতেছেন, সারাসারবিচাররহিত পক্ষীকে দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ ললিতার পক্ষে দোষের কারণ হয় নাই, কেননা শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রীতির এমনই মাহাত্ম্য যে উহার ফলে মানব-হৃদয় সর্ব্বত্রই বিশ্বাস স্থাপন করে। যেহেতু হরিভক্তিরসিক ব্যক্তিদিগের সর্ব্বত্রই ঈশ্বর জ্ঞান জন্মে তাহার ফলে উচ্চনীচ ভেদজ্ঞানের অভাব ঘটে। অথবা এমনও হইতে পারে যে হরিভক্তের কোথাও অপ্রণয় নাই, সুতরাং সর্ব্বত্রই তাঁহার বিশ্বাস।

বলা বাহুল্য ভক্ত কবি এইভাবে এই কাব্যের প্রায় সকল স্থানেই ভক্তির সুধা ধারার উৎস উৎসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

একমাত্র বিশ্রম্ভ রসই এই কাব্যে প্রবাহিত হইয়াছে। এক সর্গে কাব্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। পদ্যগুলি শিখরিণী ছন্দে লিখিত। সর্ব্বশুদ্ধ একশত বিয়াল্লিশটী মাত্র পদ্যে এই খণ্ডকাব্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ভক্ত ভাবুক ও সাহিত্যিক মাত্রের নিকটেই এই কাব্য সমধিক সমাদৃত। টীকায় কাব্যের মর্ম্মার্থ পরিস্ফুট করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য বন্ধ্যঘটীয় শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী বহুগ্রন্থের সুপণ্ডিত টীকাকার। তাঁহার টীকা সর্ব্বত্রই মধুর। টীকা ও অনুবাদসহ গ্রন্থখানি প্রকাশ করা অতি প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালী গ্রন্থকার ও বাঙ্গালী টীকাকারের রচিত গ্রন্থ বাঙ্গালীদের আদরের ও গৌরবের সামগ্রী।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

আসাম প্রদেশে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্ত্তক

৺গোপীনাথ ন্যায়ালঙ্কার

যে সকল বাঙ্গালী ইংরাজ আমলের প্রাথমিক সময়ে বাঙ্গালার বাহিরে ভারতবর্ষের নানাস্থানে আপনাদিগের প্রতিভাদ্বারা প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছিলেন, কালপ্রভাবে তাঁহাদিগের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

আসামপ্রবাসী ঐরূপ দুই একটি বাঙ্গালীর কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার মানস করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে, ৺স্বর্গীয় পণ্ডিত গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কারের জীবনী সংক্ষেপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আসামে ইংরাজ-রাজত্বের অভ্যুদয় হইয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক সময়ে ইনি শিক্ষাপ্রচারকল্পে আসামে আগমন করিয়া বঙ্গভাষায় শিক্ষা বিস্তার করেন।

৺গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী জেলার বালীগড়ী পরগণার অন্তঃপাতী হরিপাল থানার অধীনে গোপা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যায়ভূষণ। গোপার সুবিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে বিদ্যাবুদ্ধি এবং সাধন প্রভাব অনেকের ছিল জানা যায়। বংশপরিচয়ে ইনি ফুলে মেল, গড়ঘড় গাঁই, হিরণ্য বন্দ্যের সন্তান শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভঙ্গ কুলীন ব্রাহ্মণ। ইহারা পুরুষানুক্রমে পাণ্ডিত্য খ্যাতি অর্জ্জন করতঃ চতুষ্পাঠী স্থাপনা ও বিদ্যাদান করিতেন। তদ্ব্যতীত দেবত্র ব্রহ্মত্র ভূম্যাদির আয়ে স্বচ্ছলভাবে ক্রিয়া কর্ম্মান্বিত ও বহু প্রতিপাল্য প্রতিপালন করিয়া জীবন যাপন করিতেন। এ বংশে ৺গোপীনাথ ন্যায়ালঙ্কারের পূর্ব্বে কেহই রাজকীয় বৃত্তিভুক হইয়া রাজকর্ম্মে নিয়োজিত হইবার বাসনা করেন নাই।

ইহার পিতা ৺রামমোহন ন্যায়ভূষণ মহাশয় যবন বা ম্লেচ্ছের অধীনে বেতন ভোগী হইয়া শাস্ত্রালোচনা তথা বিদ্যাদান কার্য্যে অত্যন্ত বীতরাগ প্রদর্শন করিতেন। তদীয় জনৈক ছাত্রকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক পদ গ্রহণ জন্য আবেদন করিতে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺তারানাথ বাচস্পতি মহাশয় অনুরোধ করিলে

ন্যায়ভূষণ মহাশয় উত্তর দেন, আমার ছাত্র বেতনভোগী হইয়া ম্লেচ্ছের অধীনে শিক্ষাদান করিতে সম্মত হইবে বলিয়া মনে হয় না। শিরোমণি উপাধিধারী সুবর্ণবণিকজাতীয় তদীয় জনৈক ছাত্রকে আবেদন করিতে বলা হইলে, শিরোমণি মহাশয় বলেন, জীবিকার্জ্জনের জন্য হিন্দু সুবর্ণবণিকের দানগ্রহণ করিয়া পতিত হইয়া আছে, আবার ম্লেচ্ছের অধীনে বেতনগ্রাহী হইয়া বিদ্যাদান ব্যবসায় করিতে আজ্ঞা করিবেন না।

এহেন পিতার পুত্র গোপীনাথ স্বয়ং সুপণ্ডিত হইয়াও কেন যে ম্লেচ্ছাধীনে শিক্ষা বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার উপার্জ্জনের জন্য এ হীনতা স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু তখনও তাঁহার পৈত্রিক বিত্ত জনিত সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল।

তাঁহার সার্ভিস বুকের নকল দৃষ্টে জানা যায়, ১৮৬১ সনে তাঁহার বাট বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তদ্দ্বারা অনুমান হয় তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই জন্মগ্রহণ করেন। যে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও শিক্ষা সম্প্রসারিত হইয়া সমগ্র জগতকে জ্ঞানের নবীনদীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিতেছিল, সেই শতাব্দীর প্রভাব এই ব্রাহ্মণকুলেও গোপীনাথে প্রথম সঞ্চারলাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশে এই সময়টা রামমোহন রায়ের যুগ। ৺রামমোহন ন্যায়ভূষণ মহাশয় রাজর্ষি রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত সংস্কারের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অন্যতম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তদানীন্তনকালের যে সকল গণ্যমান্য কলিকাতাবাসী ভদ্রলোকগণ রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেন, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন ৺পণ্ডিত রামমোহন ন্যায়ভূষণ তাঁহাদিগের অন্তর্গত ছিলেন। অথচ এই রামমোহনের ঔরসে পণ্ডিত গোপীনাথ জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবিদ্যমানে তাঁহার অভিলষিত কার্য্যসাধনের জন্য পিতার ইচ্ছা বা রুচি অথবা বংশগত নিয়ম পালন করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

গোপীনাথ পাণ্ডিত্যোচিত উপাধি লাভ করিয়া তদানীন্তন কালের অনেক ইংরাজ-রাজপুরুষকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানকল্পে ব্রতী হইয়া তৎকালীন অনেক ইংরাজ-রাজপুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানোন্নতি অনেকটা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল ভারতের জনসাধারণ বহুলরূপে শিক্ষালোক প্রাপ্ত না হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ সূচিত হইবার আশা নাই।

তৎকালীন যে সকল উচ্চপদস্থ ইংরাজ-রাজপুরুষ ভারতে আগমন করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই মনে করিতেন এতবড় একটা জাতির বহুকালের অধীনতা ও জড়তাজাত মলিনতা দূর হইয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত প্রাচ্য জ্ঞানের সম্মীলন হইয়া উন্নতিলাভ করিতে না পারিলে মঙ্গল হইবে না। এতবড় একটা জাতির প্রতি একটা কর্ত্তব্যের দায়িত্বভার ঈশ্বরকর্ত্তৃক তাঁহাদিগের উপর প্রদত্ত হইয়াছে বিবেচনা করিতেন।

উচ্চবংশীয় ভদ্রশ্রেণীর ভারতবাসীর সহিত উচ্চপদস্থ ভদ্রশ্রেণীর ইংরাজগণ কার্য্যক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের অধীন হইয়া উচ্চতন অধস্তনভাবে মিলিত হইয়া বন্ধুভাবে সহযোগীতায় কার্য্য করিতেন। শাসক ও শাসিতভাব বন্ধমূল হইয়া প্রভুভৃত্যের ন্যায় ক্ষমতা পরিচালনা ও আজ্ঞা প্রতিপালনে পর্য্যবসিত হইত না।

ভদ্র শ্রেণীর ভারতবাসীগণের চাকরী প্রভৃতি তখন তত পরিমাণে বদ্ধমূল হয় নাই, এবং অভাবের তাড়না ও বিলাস ব্যসনের ব্যয়াধিক্য এতটা পরিমাণে ছিল না। সংযমের ক্রোড়ে লালিত পালিত হওয়ায় তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা পরিস্ফুট থাকিত। কাজেই কর্ম্ম-জীবনে দাসত্বের তীব্রতা অনেককেই ভোগ করিতে হইত না। সুতরাং সে কালে অনেক ভদ্রবংশীয় ভারতবাসী আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া ইংরাজ-রাজপুরুষের অধীনতায় সম্মান সহকারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ত্তব্য পরিচালনায় ও স্ব স্ব অভিরুচি অনুরূপ দেশের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিবার সুযোগ পাইতেন। সেই জন্য তদানীন্তনকালের অনেক ভারতীয় রাজকর্ম্মচারী রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন। নেতা ও নেতৃত্বভাবে স্বার্থ সংঘর্ষ ফলে এখনকার কালের ন্যায় এতটা দূরে থাকিয়া দেশের কার্য্য করিবার জন্য স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার ভাব তখন বড় একটা দেখা যাইত না।

গোপীনাথের অভিলষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রের উপযুক্ত ক্ষেত্র ভগবৎকৃপায় আসামে নির্দ্দিষ্ট হইল।

আসাম যখন ইংরাজের অধীন হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল যাবৎ, দেশে অন্তর্বিপ্লবে দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। ইংরাজ যখন এদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করেন তখনকার এদেশের অবস্থা মিলস্ রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে ঐতিহাসিক বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। ফলকথা লিখিতে পড়িতে জানা লোক এক একটি জেলায় কুড়ি ত্রিশ অথবা পঞ্চাশের অধিক ছিল না। ভয়ঙ্কর প্রলয়ঙ্কর প্রজাবিদ্রোহ ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবফলে প্রজাবর্গ উৎপীড়িত হইয়া সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হারাইয়া অপরিসীম দুর্দ্দশা ও অজ্ঞানতায় আবৃত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট তদানীন্তনকালের স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জনগণের স্বাক্ষরিত একটি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা দেখা হইয়াছে উহার সহিত মফাট মিল সাহেবের সঙ্কলিত সরকারী রিপোর্টের উক্তির সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। ইংরাজ রাজত্বের অভ্যুদয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে আসাম বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার অধীনে জনৈক পোলিটিকাল এজেন্ট ও জুডিশিয়াল কমিশনারের শাসনাধীনে পরিচালিত হইতেছিল। সেই সময় দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজ-রাজত্বের আশু সুফলদায়ক বিবিধরূপ জনহিতকর কার্য্যের পূর্ব্ব সূচনা যে সময়ে আরম্ভ হয়, গোপীনাথ ঠিক সেই সময়ে বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের প্রধান রাজপুরুষের দ্বারা শিক্ষা বিভাগে নিয়োজিত হইয়া এদেশে আগমন করেন। ৺গোপীনাথ পণ্ডিত যে সময় আসামে আগমন করেন, শ্রুত হওয়া যায় সে সময় আগমন করা অত্যন্ত ক্লেশজনক ও বিভীতিপ্রদ ছিল। তিন চারি মাসকাল নৌকাযোগে আগমন করিতে হইত। পথে দস্যু ও দৈববিপদ ভীতি ছিল। ব্যয় অত্যন্ত হইত। পরিবার লইয়া আগমন করা বড় অসুবিধাজনক ছিল বলিয়া প্রবাসী-জীবনে পরিবার সঙ্গে রাখা সুবিধা হইত না বলিয়া বিদেশে পরিবার আনা বড় সামাজিক লজ্জাজনক ব্যাপার ছিল। তজ্জন্য দেখা যায় তৎকালে প্রবাসে অনেক বাঙ্গালী উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করিতেন। অনেক কলঙ্কিত চরিত্র বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধেই

অনেকের হীন ধারণা জন্মিত। চরিত্রগুণে ৺গোপীনাথ তৎকালীন এতদ্দেশীয় জন-সমাজেও সম্মানিত হইতেন। তৎকালে দেশাচার অনুরোধে বাঙ্গালী অসমীয়া সম্প্রদায়ে পান ভোজন প্রচলিত ছিল না। কিন্তু শুনা যায় গোপীনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভোজন করিতে এদেশীয় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেও কেহ আপত্তি করেন নাই। সে সময় শিক্ষাবিভাগই দেশহিতের সূচনা করিয়াছিল। বঙ্গদেশেও শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত মনস্বীবর্গই নব যুবকদিগের অন্তঃকরণে নব ভাব জাগরণ করিয়া দেশে প্রকৃত মানুষ গঠন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে দেশে অনেক কৃতী সুসন্তান যশঃসৌরভে পুণ্যস্মৃতি ও আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

গোপীনাথ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারীতে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসামে আসিয়া গৌহাটীতে বঙ্গবিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত রূপে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর পর্য্যন্ত গৌহাটী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে বিরাজিত থাকিয়া অতিলম্বিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার সুযোগ গ্রহণ করেন। কিরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত গোপীনাথ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন সে সকল বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। তদানীন্তন সময়ের প্রাদেশিক স্থানীয় শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণের ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের পত্রাদি হইতে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম।

Major General Jenkins সাহেব স্থানীয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১ই মে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন।

"I am much pleased to see that so large a body of influential native gentlemen have so correctly appreciated the good service of such an old and valuable servant as the Pundit has proved himself to be, and it would give me sincere pleasure to bear testimony to the ability and zeal with which he has fulfilled his duties during the long period he has presided over vernacular education in Assam," "however we may think that the high degree of usefulness of the Pundit's long. continued labours in a rude and foreign Province may deserve to be noticed with the special favour of the Govt."—

আর একখানি পত্রে উক্ত মেজর জেনারেল জেনকিন্স সাহেব বাহাদুর লিখিয়াছিলেন—"but the services of the Pundit have been of an unusual description, for he has had to introduce the Bengalee Language into a Province where it was before unknown, and to found a system of instruction where none existed before. He came to this Province rather late in life, and had to labour against no ordinary difficulties, in a country foreign to him, but by great assiduity and much kindness to the Assamese lads he has succeeded in making

Bengalee current throughout the Province and has established an efficient system of elementary instruction everywhere under master that he had taught and trained."

এতদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় তিনিই প্রথমে আসামে বঙ্গভাষা শিক্ষাবিস্তারে বিস্তার দান করেন।

এতদ্দেশে অহোম রাজাদিগের আমলে উচ্চবর্ণ ও বংশীয়গণের অত্যন্ত আভিজাত্য অহঙ্কার ছিল। হীনবংশীয় অথবা অন্যান্য জাতীয় লোকদিগকে অত্যন্ত উপেক্ষিত অবস্থায় থাকিতে হইত। ইংরাজ রাজ্যশাসনের প্রথম সুফল এই সকল পতিতজাতিদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও সাম্যভাবে অধিকার দান করিয়া উন্নত করা। উচ্চ ও হীনবংশীয় ছাত্রগণ একত্রে বিদ্যালাভ করায় ও যোগ্যতানুসারে হীনবংশীয় ছাত্রও উচ্চবংশীয় ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষকের নিকট সমধিক ছাত্রমর্য্যাদা লাভ করায় ঈর্ষা ও স্বভাবশতঃ উচ্চবংশীয় ছাত্র এ বিষয়ে গোপীনাথের নিকট আক্ষেপ করিলে, তিনি স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া দিতেন যে তোমরা পুরুষানুক্রমে সুশিক্ষালাভ ও সদ্বৃত্তি অনুশীলনের সুযোগ পাইয়াও যোগ্যতানুসারে উহাদের অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া কার্য্যতঃ পরিচয় না দিয়া শুধু আব্দার করিলে আমি আব্দারের জন্য কিরূপে পক্ষপাতীত্ব প্রদর্শন করিব। উহারা নানারূপ অসুবিধা ও উপেক্ষা সত্ত্বেও আপনাদিগের যোগ্যতা দেখাইয়া উচ্চস্থান লাভ করিলে উহাদিগকে সমধিক উৎসাহ দান করা আমার ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য। অন্যান্য ও হীনবংশীয়দিগকে তিনি অত্যন্ত সহানুভূতি ও স্নেহভাবে দেখিতেন।

মেজার এগ্‌নিউ Major Agnew একজন তদানীন্তনকালে এদেশে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ছিলেন,—তিনি লিখিয়াছেন; "I have known Gopeenath nearly twenty years, I know the difficulties he has had to contend against, and the successful result of his labours in the cause of vernacular education • • •"

উইলিয়ম রবিনসন (William Robinson) সাহেব আসামে তদানীন্তনকালে শিক্ষাবিভাগের প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। আসামের ইতিহাস ইংরাজীতে প্রথমে রবিনসন সাহেব প্রণয়ন করেন। শুনা যায় গোপীনাথ তাঁহার সঙ্কলন কার্য্যে অনেক সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

রবিনসন সাহেব একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"The Pundit came into Assam as one of the pioneers in the work of education, and, as through the entire period of his service, I have had the best opportunities of becoming acquainted with him, of witnessing his labours, and noting the mode in which he overcame the almost insuperable difficulties that met him at every step, how zealously he discharged his duties and what peculiar advantage he enjoyed from his natural disposition and superior attainments for the efficient discharge of those duties."—

স্বয়ং গোপীনাথ পণ্ডিত মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছিলেন,—"I came into Assam soon after the establishment of Gauhatty school when the first

attempts were being made to promote the cause of education in the Province."—

১৮৬২ খৃঃ ৭ই মে তারিখে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণের স্বাক্ষরিত একখানি পত্রে উল্লেখ আছে—"The history of his life from the date of his arrival in Assam is properly speaking the history of vernacular education in the country. He took charge in February 1838, of the Head Punditship of the Government Vernacular School at Gauhatty, which was then a school only in name—, under the most discouraging circumstances.

The people of the country were immersed in barbarism. The language spoken was a peculiar jargon. The knowledge of letters was confined only to a few. The court Umlahs were composed of only those natives of Bengal who could obtain no appointments in their native country. He began therefore his work in earnest, and after encountering for a time very great difficulties succeeded in effecting a complete change in the condition of the school under his charge. He then directed his attention to the amelioration of the condition of the people of the whole country. He introduced a system of education well adopted to the degraded condition of the people. He trained teachers to whom the charge of imparting instruction was given." "The whole country from Dhubri to Suddea lying the extreme north, has yielded a rich harvest. Men able to read and write are to be found in every quarter. Indegenous schools have sprung up with rapidity of the prophets Gourd, parts of the country which the rays of civilization could not penetrate before. In addition to all these advantages we have now members of Assamese Umlahs who have supplanted the natives of Bengal and are well competent to fill high posts."—

প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও শাসনকর্ত্তা, এবং সম্ভ্রান্ত প্রজাবর্গের নিকট এরূপ সুখ্যাতি অর্জ্জন করা বড় সৌভাগ্যের কথা নহে। পরলোকগত আসামের জননেতা মাননীয় মাণিকচন্দ্র বুড়য়া মহাশয়ের পিতৃদেব ও মাননীয় ব্যারিষ্টার তরুণরাম ফুকন মহাশয়ের পিতৃদেব মহাশয়ের স্বাক্ষরও উপরোক্ত পত্রে দৃষ্ট হয়। তেইশ বৎসর নয়মাস কাল কার্য্য করিয়া ষাট বৎসর বয়ঃক্রমে অবসর বৃত্তি গ্রহণ করতঃ বহুকাল পেন্সন ভোগ করিয়া অশীতির অধিক বয়ঃক্রমে গোপীনাথ কলিকাতায় গঙ্গালাভ করেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দর্শন ও বিজ্ঞান

দৃক্-দৃশ্য, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় লইয়াই জগৎ। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, সাহিত্য বল, গণিত বল, যে কোন বিদ্যার কথাই বল না কেন, সমস্তই—এই দৃক্-দৃশ্যাত্মক জগৎ লইয়া। দ্রষ্টার যাহা দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য, তাহাই দৃশ্য, তাহাই বিষয় বা প্রতিভাস (phenomena)। দ্রষ্টা নিজের সম্বন্ধে যাহা দেখে, বা জানে, এবং অপর সম্বন্ধেও যাহা দেখে বা জানে—সমস্তই দৃশ্য বা প্রতিভাস। দ্রষ্টার স্ব-ব্যাপার ঘটিত দৃশ্যগুলির আলোচনা অধ্যাত্মবিজ্ঞান; এবং তদতিরিক্ত দৃশ্যগুলির আলোচনা অনাত্ম বিজ্ঞান বলিয়া ব্যবহৃত। ব্যবহারতঃ প্রথম শ্রেণীর দৃশ্যগুলিকে আন্তর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃশ্যগুলিকে বাহ্য নামে অভিহিত করা হয়। এই বিভাগানুসারে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আন্তর বিজ্ঞান ও অনাত্ম-বিজ্ঞান বাহ্য বিজ্ঞানরূপে পরিকল্পিত। পরন্তু এই বিভাগ ন্যায়ানু-মোদিত কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা হয় না।

যাহা হউক, এই উভয়বিধ বিজ্ঞানের প্রতি-পাদ্য বিষয়সমূহের তুলনামূলক মূল্যাবধারণ সহজ ব্যাপার নহে। এই উভয় শ্রেণীর বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ আন্তর ও বাহ্য বিষয়-সমূহের মধ্যে, কোন্‌গুলি সম্যক্ নিশ্চিত, পরিস্ফুট ও অধিগত?—এই প্রকার প্রশ্ন করিলে অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও অনাত্মবিজ্ঞানের উত্তর পরস্পর বিসদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনাত্মবিজ্ঞানবেত্তা বলেন, বাহ্য বিষয়ই আমাদের সম্যক্ নিশ্চিত, পরিস্ফুট ও অধিগত; কেন না জীবের জীবন ইহার অধীন, ইহাকে অতিক্রম করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না,—অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের আন্তর বিষয়গুলি আমাদের ইচ্ছাধীন; ইহাদিগকে না মানিলেও আমাদের জীবনযাত্রার কোন বাধা হয় না; বিশেষতঃ আন্তর বিষয়গুলি সদা চঞ্চল, অস্থির, কিন্তু বাহ্য বিষয়গুলি নিত্য, স্থির, নিয়মানুবর্তী।

মনস্তত্ত্ববেত্তার উত্তর সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তাঁহার মতে সমস্ত বাহ্যজগৎটা মনের ভিতর। মনুষ্যের হাত পা মস্তক—এমন কি গোটা দেহটা—তাঁহার মানস ব্যাপার ব্যতীত আর কিছু কি না তাহা তিনি জানেনও না। অবশ্য তিনিও বাহ্য জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহেন। তথাপি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে 'বাহ্য' বলিয়া কোন পদার্থ নাই। জ্ঞানের বিশ্লেষণে বাহ্য জগতের কোন চিহ্ন তিনি দেখিতে পান না। যাহাকে অনাত্ম-বিজ্ঞান বলা হয়, তিনি বলেন, দেখিতে গেলে উহাকেও আত্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। মন বা আত্মা বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ আছে কি না মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহা জিজ্ঞাসা করেন না, মানস ব্যাপার লইয়াই তিনি ব্যাপৃত। তাই কেহ কেহ মনস্তত্ত্বকে মনবিহীন মনস্তত্ত্ব বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন।

এই উভয় প্রকার উত্তরের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর সমীচীন, আন্তর ও বাহ্য বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর নিশ্চিত ও পরিজ্ঞাত, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমার

মতে মনোবিজ্ঞানের উত্তরই অধিকতর সঙ্গত ও সমীচীন। জ্ঞান সম্বন্ধে আন্তর ও বাহ্য—এ প্রভেদ সর্ব্বথা অসিদ্ধ। দ্রষ্টাকে লইয়াও এ প্রকার প্রভেদ সিদ্ধ হয় না। দৃশ্য দ্রষ্টার অবভাস—এই মাত্র বলা যায়, দ্রষ্টার বাহিরে, এ কথার কোন অর্থ হয় না।

অনাত্ম-বিজ্ঞান বিষয়ভেদে নানাপ্রকার যথা:—জড়তত্ত্ব বিজ্ঞান (physics), রাসায়ন বিজ্ঞান (chemistry), জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy), ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান (geology), প্রভৃতি। সেই প্রকার, অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও বিষয়ভেদে একাধিক প্রকার যথা :—মনোবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান প্রভৃতি।

বিজ্ঞানের সাধারণ উদ্দেশ্য, জগতের এক একটা বিভাগ লইয়া তাহার উপকরণ, পারস্পরিক সম্বন্ধ, স্বভাব ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলীর আবিষ্কার। অনাত্মবিজ্ঞান ভৌতিক পদার্থের মাত্রা, গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর বিবরণ প্রদান করে। কোন বস্তু কোন বস্তুর কতটা সংমিশ্রণে উদ্ভূত, কি কি অবস্থায় উৎপন্ন হইয়া থাকে এ সকল তত্ত্বও তাহার অন্তর্গত। বাহ্য বস্তুর সমীক্ষা, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করত তাহাদের গতিবিধিজ্ঞাপক কতিপয় সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকসূত্র প্রচার করিতে পারিলেই অনাত্মবিজ্ঞান সফলকাম। ইহার বস্তুপরীক্ষা পরিমাণগত,—অনুবীক্ষণে, দূরবীক্ষণে, অনলে, নলে, নিক্তিতে,—হাতে কলমে।

বিজ্ঞান মাত্রেই কতকগুলি পদার্থকে অবিচারে মানিয়া লয়। জড়ের অস্তিত্ব, বহু পুরুষের অস্তিত্ব, দিক্‌কালের অস্তিত্ব, ইত্যাদি। এইগুলি মানিয়া লইয়া বস্তু পরীক্ষা ও তন্মূলক অনীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞান যে সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করে, সেই সূত্রগুলিকে বৈজ্ঞানিক মূলসূত্র বা মূলতথ্য (first principles) বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান জগৎকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে; এক এক বিজ্ঞানের এক একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী রহিয়াছে, উহা তন্মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং বিজ্ঞান ঐকদেশিক বিদ্যা। ইহার সার্ব্বভৌম তথ্যগুলি তত্তৎ গণ্ডীর অন্তর্গত যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে সত্য।

পক্ষান্তরে দর্শনের উদ্দেশ্য,—আমি কি, দেশ কাল কি, জগৎ কি, প্রমাণ কি, সত্য কি, সৎ কি, জ্ঞান কি, উহার উৎপত্তি ক্রম ও উপকরণ কি, আমার আশা ভরসা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি—ইত্যাদি মানব-হৃদয় নিহিত মূল ও গভীর প্রশ্নগুলির মীমাংসা চেষ্টা। এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর দিতে যাইয়া দর্শন, বিজ্ঞানের নৈদানিক তথ্যগুলিকে ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করত জগৎসম্বন্ধীয় অন্তর্বিরোধ শূন্য, সুসঙ্গত, সর্ব্ববিষয় ব্যাখ্যানুকূল ও সর্ব্ববিষয়ক উপপত্তি যোগ্য একটা স্পষ্ট ধারণা করিতে চায়। দর্শন বিজ্ঞানের ন্যায় একদেশদর্শী নহে, বরং সমাক্‌দর্শী, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিকে বিশ্লিষ্ট সমন্বিত সমীকৃত করিয়া বিশ্বজগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে একটা মূল ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে। দর্শন কেবল যে অনাত্মবিজ্ঞানের তথ্যগুলি লইয়া এই ঐক্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে; অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া অনাত্মবিজ্ঞানের তথ্যগুলিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া লয়। মনোবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান এবং জ্ঞানবিজ্ঞান (epistemology)দর্শনের আলোচনার উপকরণ প্রদান করিয়া থাকে। এই নানাবিধ উপকরণ লইয়া দর্শন জগৎ-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করে। সকল বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্যগুলির যথাযথধারণ (grasp of the

meaning) দ্বারা মূলতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। বিজ্ঞান কেবল কার্য্যপরম্পরার নিয়ম অধিকার করে; কিন্তু উহাদের অর্থ কি—উহাদিগের দ্বারা কি সূচিত হয়—তাহার খবর রাখে না। বিষয়রাশির অর্থোপলব্ধিতাই দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড আমাদের সম্মুখে বিরাজমান, ইহার তাৎপর্য্য কি, অর্থ কি—ইহা কেন উপস্থিত হইল, ইহার অন্তর্নিবিষ্ট পদার্থরাশীর পারস্পরিক সম্বন্ধের উদ্দেশ্য অভিপ্রায় বা অর্থ কি—ইত্যাদি প্রশ্ন লইয়া দর্শন নিরন্তর ব্যস্ত।

জগতে সকলেই সত্যের অন্বেষণ করে। দর্শনও করে, বিজ্ঞানও করে। এবং সত্য যে মূলতঃ অদ্বয়—এক, সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। স্বীকার করে বলিয়াই সর্ব্বত্র ঐক্যের অনুসন্ধান করে। কিন্তু প্রজ্ঞার ও পর্য্যবেক্ষণের তারতম্যে এই অদ্বয় সত্য নানা আকারে আকারিত হইয়া পড়ে। যে যে আকারে উহাকে দেখিতে পায় সে সেই আকারকেই সত্য বলিতে চায়, অপর আকারকে অসত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসে। তাই সমগ্রের দিক হইতে বিষয়কে অবলোকন—পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। খণ্ডের দিকে অভিনিবেশ করিলে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এবং সেই জন্যই দর্শন সমগ্রের দিক হইতে বিষয়কে দেখিতে চায়।

অপরোক্ষ জ্ঞান দিয়াই পরোক্ষ বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর; পরোক্ষবিষয় দিয়া অপরোক্ষ জ্ঞানকে বুঝিতে চেষ্টা করা বাতুলতা। দর্শন সেই জন্য অপরোক্ষ জ্ঞানকেই বহির্ব্যাপারের চাবি স্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার অনেক সময়ে অপরোক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান এমন ভাবে পরস্পর মিশিয়া যায়, যে সম্যক বিচার ও বিশ্লেষণ ব্যতীত তাহাদের পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। এমন কি অনেক সময়ে আনুমানিক জ্ঞানকেও আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া প্রতারিত হই। গভীর বিশ্লেষণ-পটুতা না থাকিলে যেমন বাহ্যজগতে কৃতিত্ব লাভ করা কঠিন, অন্তর্জ্জগতের সত্যাবিষ্কারও সেই প্রকার কঠিন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়ের পক্ষেই বিশ্লেষণ ও সংযোজনপটুতা নিতান্ত আবশ্যক। তবে একজনের বিশ্লেষণ পরিমাণগত,—হাতে কলমে; অপরের বিশ্লেষণ গুণগত, কেবল বুদ্ধি সহায়ে। একজনের বিশ্লেষণ কৃত্রিম যন্ত্রাদি লইয়া; অপরের বিশ্লেষণ প্রজ্ঞা লইয়া।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রত্যেক বিজ্ঞানের স্বীয় স্বীয় গণ্ডী নির্দ্ধারিত আছে। দর্শনের ঐ প্রকার কোন গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট নাই। সুতরাং তাহার প্রসার সর্ব্বত্র। বিজ্ঞানের বিলাস-ক্ষেত্রে দর্শনের পদার্পণ উচিত কি না, তাহা সুধীবর্গের বিচার্য্য। তবে আমার মনে হয় জ্ঞানের মধ্য দিয়াই যখন সত্যের বিকাশ এবং জ্ঞানের যাথার্থ্যাবধারণই যখন দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন অবশ্যই দর্শন বিজ্ঞানের গণ্ডীতে নিজ অধিকার স্থাপন করিবে। তাহা নিবারণের উপায় নাই। তবে কি সত্য বিজ্ঞানের অধিষ্ট বা আয়ত্ত নহে?

সত্য দুই প্রকার,—পরমার্থিক সত্য (absolute truth); ও প্রাতিভাসিক বা ব্যবহারিক (relative or phenomenal) সত্য। পারমার্থিক সত্য দর্শনের অধিষ্ট ও লক্ষ্য। প্রাতিভাসিক বা ব্যবহারিক সত্য বিজ্ঞানের অধিষ্ট ও লক্ষ্য। অবশ্য বিজ্ঞান যে সত্য আবিষ্কার করে তাহাকে প্রাতিভাসিক না বলিয়া পারমার্থিক সত্য বলিয়াই গ্রহণ করে; কিন্তু

সমগ্রের দিক হইতে এই সত্যের বিচার করিলে ইহাকে ধ্রুব পূর্ণ পারমার্থিক সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় কি না, বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না। বিজ্ঞান স্পর্দ্ধা করিয়া বলে বটে, তাহার আবিষ্কৃত সত্যই সনাতন নিরপেক্ষ সত্য; কিন্তু বিচার মুখে তাহা দাঁড়ায় কি না দেখিতে হইবে। কিন্তু কে দেখিবে? দর্শনই দেখিবে—সমগ্রের দিকে যাহার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত, সেই দেখিবে, সঙ্কীর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞানের তাহা দেখিবার সাধ্য নাই। এই পারমার্থিক সত্য দর্শনের অধিষ্ঠ বলিয়াই কেহ কেহ দর্শনকে পরাবিদ্যা (science of sciences) বা তত্ত্ব বিদ্যা (science of ultimate existence) প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। মুণ্ড কোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যাকে (science) পরা ও অপরাভেদে তত্ত্বদর্শীগণ দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে চতুর্ব্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ সমস্তই অপরা বিদ্যা বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে; এবং উপনিষৎ "যয় তদক্ষরমধিগম্যতে" তাহাকেই পরাবিদ্যা (the highest science) বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে তত্ত্ববিজ্ঞানই প্রকৃত দর্শন। ইংরাজীতে যাহাকে metaphysics বলে, তাহাই যথার্থ তত্ত্ববিজ্ঞান। তবে আমি এখানে দর্শনকে তাহা হইতে অভিন্ন করিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান প্রজ্ঞার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বিজ্ঞান কতিপয় প্রতিভাস সমষ্টির মধ্যে একটা ঐক্যের অন্বেষণ করে। কিন্তু সে ঐক্যও ব্যবহারিক ঐক্য। দর্শন সমস্ত বিশ্বের মধ্যে পারমার্থিক ঐক্যের অনুসন্ধান করে; সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সেই ঐক্য খুঁজিয়া থাকে এবং সমস্ত প্রভেদের মূলে যে সেই ঐক্য সমাহিত, তাহা বুঝাইয়া দেয়। যেন মনিগণের ন্যায় বিশ্বরত্নও সেই ঐক্যে গ্রথিত। মহামতি Herbert spencer দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয়; বিজ্ঞান জিনিসটা কি তাহা বুঝাইতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন,—

"Science means merely the family of sciences—stands for nothing more than the sum of knowledge formed of their contributions; and ignores the knowledge constituted by the *fusion* of all these contributions into a whole. As usage has defined it, science consists of truths existing more or less separated; and does not recognize these truths as entirely integrated."

দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—"So long as these truths are known only apart and regarded as independent, even the most general of them cannot without laxity of speech be called philosophical. But when they are contemplated together as correlatives of some ultimate truth, then we rise to that kind of knowledge that constitutes philosophy proper." পরে তিনি প্রাকৃত-জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞান সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"knowledge of the lowest kind is *un-unified* knowledge; Science is *partially-unified*

knowledge ; Philosophy *pletely-unified* knowledge." 132-134, First Principles).

আমাদের দেশে, অন্যান্য দেশের ন্যায়, মনো-বিজ্ঞান, মনন-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিদ্যা পরিদৃষ্ট হয় না। ইহারা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই আলোচিত হইয়াছে।

দর্শন যেহেতু তত্ত্ব-বিজ্ঞান, সেই জন্যই ইহা কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করে না। অমুক মহাশয় এই বিষয় সম্বন্ধে এই প্রকার বলিয়া-ছেন, অতএব ইহাই সত্য, এ প্রকার আবদার দর্শন গ্রাহ্য করে না। তিনি যত বড় মনস্বীই হউন না কেন, চিন্তাজগতে ও যুক্তিমার্গে দর্শনের নিকট তাঁহার খাতির নাই। দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দর্শনের কাছেই করিতে হইবে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত সিদ্ধান্ত। বহি-র্জগৎ বিষয়ক জ্ঞান আমরা পরের সাক্ষ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি। প্রত্যেক দ্রষ্টাই যে নিজে নিজে স্ব স্ব বিষয়ের পরীক্ষা করিবে—এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই ; কিন্তু অন্ত-র্জগৎ বিষয়ক জ্ঞানে, তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলনে অপর দ্রষ্টার সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই। অন্তর্জগতেই দর্শনের প্রতিষ্ঠা, তাই সেখানে পরের সাক্ষ্যের কোন উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না।*

এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা দর্শনের উপর বড় চটা। তাঁহারা বলেন, দর্শন শাস্ত্রটা কেবল উন্মত্তের প্রলাপ মাত্র ; উহার কিছু-মাত্র বাস্তব ভিত্তি (foundation in fact) নাই ; উহার কিছুমাত্র সার্থকতা (utility) নাই। দর্শন কূট-বুদ্ধি-প্রসূত অনাবশ্যক কল্পনা। সুতরাং উহার চর্চ্চা পণ্ডশ্রম মাত্র। পক্ষান্তরে দেখ, বিজ্ঞান কেমন বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; কেমন অভিজ্ঞতার সহিত একতান বিশিষ্ট (accordant with experience)। দৃঢ় প্রতিষ্ঠ বলিয়াই বিজ্ঞান ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারে, গ্রহ উপগ্রহের ভবিষ্যৎ অবস্থান গতিবিধি পূর্ব্বেই স্থির করিতে পারে। বিজ্ঞান আমাদের নিত্য ব্যবহারে লাগে, আমাদের নিয়ম প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু দর্শন আমাদের কোন ব্যবহারে লাগে না ; কোন নিত্য প্রয়োজন সাধন করে না।

এই প্রকার আপত্তির বিরুদ্ধে দুই চারিটি কথা বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ দর্শনের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই এই আপত্তিটির উত্তর দেওয়া যাউক। জিজ্ঞাসা করি 'বাস্তব ভিত্তি' শব্দের অর্থ কি ? বস্তু শব্দেরই বা অর্থ কি ? যদি বলা যায়, ধরা ছোঁয়া যায় এমন কোন বাহ্য পদার্থই বস্তু, ও এই বস্তু মূলকতাই 'বাস্তব ভিত্তি' শব্দের অর্থ, তাহাও ঠিক নহে। বস্তুকে বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ স্বীকার করিলে, যাহা বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ভিত্তিহীন, তাহা আন্তর বস্তু সম্বন্ধে ভিত্তিমূলক হইতে পারে। এবং তাহা হইলে দর্শন বাস্তব ভিত্তি-হীন, এ আপত্তির কোন মূল্য থাকে না। আর যদি বস্তুকে বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ স্বীকার না করিয়া অভিন্ন করিয়াই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে যে পরিমাণে উহা জ্ঞানাবচ্ছিন্ন সেই পরিমাণেই উহা বাস্তব-ভিত্তি-মূলক, এবং যে পরিমাণে উহা অজ্ঞাত সেই পরিমাণে

* "In point of fact, our knowledge of the external world is taken chiefly upon trust. in the science of mind we can believe nothing upon authority, take nothing upon trust."—Hamilton's metaphysics. Lecture XIX, Vol. I.

উহার সত্তা সন্দিগ্ধ, ইহাও সপ্রমাণ করা যায়। সুতরাং দর্শন বাস্তব ভিত্তিহীন,—কথাটা নিতান্তই অবিচারকের উক্তি, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক দর্শনের কোন সার্থকতা বা উপযোগিতা (utility) আছে কি না। জিজ্ঞাসা করি, উপযোগিতা শব্দের অর্থ কি? যদি বলা যায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকারিতা। তাহার উত্তরে বলি, 'দর্শন' বা 'বিজ্ঞান' কোন শব্দটার ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থের মধ্যে এতাদৃশ কোন উপকারিতার আভাস নাই। উভয় শব্দের অর্থই জ্ঞানবিশেষ। যদি বলা যায়, বিজ্ঞানের সত্যগুলিকে যেমন মানব-জগতের উন্নতিসাধনে প্রযুক্ত করা যায়, দার্শনিক সত্যগুলিকে সে প্রকার কোন কার্য্যে প্রযুক্ত করা যায় না। ইহার উত্তরে বলা যায়, সকল সত্যই যে কার্য্যে পরিণত করা যাইবে তাহার প্রমাণ কি? উচ্চ গণিতের অনেক সত্যই মানুষের ব্যবহারে লাগে না এবং এই উচ্চ গণিত ভিন্ন বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন হয় না; তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে, উচ্চ গণিত-নিবন্ধন বিদ্যা, নিরর্থক শাস্ত্র? বিশেষতঃ ব্যবহারিক বস্তু, বা ব্যবহারিক সত্যকেই ব্যবহারিক উন্নতির কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর, কিন্তু যাহা সে জাতীয় বস্তু বা সত্য নহে তাহাকে ব্যবহারিক উন্নতির কার্য্যে পরিণত দেখিবার ইচ্ছাটা কি অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে? উক্ত আপত্তিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আপত্তিকারী মানব-জগতের উন্নতিকে উপেয় (end) ও বিজ্ঞানকে তৎসাধক (means) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে উপেয় প্রাপ্তিই (realisation of an end) হইতেছে উপায়ের উপযোগিতা বা উপকারিতা। অর্থাৎ সাধন উপেয় প্রাপ্তির যতদূর সহায়, ততদূরই উহার উপযোগিতা বা উপকারিতা। যে উপায় অতি সহজে উপেয় প্রদান করিতে পারে, সেই উপায়ই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম উপায়? উপেয় ভালই হউক আর মন্দই হউক, যাহাদ্বারা উহা অতি সহজে প্রাপ্তব্য, তাহাই উৎকৃষ্টতম উপায় বলিয়া গণ্য হইবে। বর্ত্তমান স্থলে মানবজগতের উন্নতিই উপেয়; এক্ষণে উপেয় লাভের প্রশস্ত উপায় বিজ্ঞান না দর্শন তাহাই বিচার্য্য। ইহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে মানবজগতের উন্নতির আদর্শ বা মাপকাটি কি? জিজ্ঞাস্য,—কোন্ প্রকার উন্নতি মানব জগতের শ্রেষ্ঠতম উন্নতি? মানব সমাজের সুখ সুবিধার উৎকর্ষ? না মানবের পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ? যদি বলা যায় প্রথমটি। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, উহাই কি মানবের শ্রেষ্ঠতম উপেয় (the highest end of humanity)? যদি আপত্তিকারী বলেন, হাঁ; উহাই মানবের শ্রেষ্ঠতম উপেয়, এবং বিজ্ঞানই উহা লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়!—তাহা হইলে আমার বক্তব্য—বিজ্ঞানের যে অংশটা ভাবনাত্মক (speculative) তাহা দর্শনের অন্তর্গত। সে হিসাবে বিজ্ঞান দর্শনের বাহিরে নহে। যদি তাহাই হইল, তবে বিজ্ঞান-উদ্ভাবিত সুখ-সুবিধার সামগ্রীতে দর্শনের কিছুমাত্র সহায়তা নাই, তাহা কি প্রকারে বলা যায়? ইহা ত হইল তর্কের কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শারীরিক সুখসুবিধা পুরুষার্থ হইলেও উহা যে পরম পুরুষার্থ (highest end) নহে, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। যদি তাহা না হইল, তবে তাহার উপায়ীভূত বিদ্যাও যে পরম উপায় (highest means) নহে, তাহাও সহজে অনুমেয়।

পরিশেষে বুঝা যাইতেছে পূর্ণ মনুষ্যত্বের

বিকাশই মানবের পরম পুরুষার্থ। এবং এই —মনুষ্যত্বের বিকাশই মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ব। এক্ষণে দেখিতে হইবে এই পূর্ণমনুষ্যত্ব বিকাশের উপায়ীভূত বিদ্যা দর্শন না বিজ্ঞান।

আমার বিশ্বাস, পূর্ণমনুষ্যত্বের ধারণা করিতে হইলে সমগ্র জগৎটার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, জগতের মধ্যে মনুষ্যের স্থান কি, মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ইত্যাদি গভীর তত্ত্বের আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আত্মার সমস্ত বৃত্তিগুলিকে অন্তর্মুখী করিয়া আত্মচিন্তায় নিযুক্ত করা ব্যতীত এই সকল জটিল তত্ত্বের মীমাংসা সম্ভবপর নহে; ইহাতে প্রজ্ঞার বিশুদ্ধ অনুশীলন ও প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহাই দর্শনের সার্থকতা। তাই অপরোক্ষভাবে না হইলেও, পরোক্ষভাবে দর্শনই পূর্ণ মনুষ্যত্ব অভিব্যক্তির উপায়, বিজ্ঞান নহে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশই পূর্ণানন্দ। এই পূর্ণানন্দের অন্বেষণে, মৃগগণের মৃগনাভি অনুসন্ধানের ন্যায়, মনুষ্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া থাকে। জাগতিক পদার্থনিচয়ের মধ্যে তাহার অন্বেষণ করে, কিন্তু সেখানে খণ্ড, ক্ষণভঙ্গুর সুখ বা আনন্দ ব্যতীত আর কিছু পায় না। তাহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা যখন তাহাতে উপশান্ত হয় না, তখন তাহার সদসৎ বিবেকের উন্মেষ হয়, তাহার ফলে সে জগৎকে অন্য চক্ষে নিরীক্ষণ করে এবং তখন সে দেখিতে পায়—

যল্লভ্যা চাপরংলাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।

তাহা তাহার বাহিরে নহে, তাহার আত্মায়। তাই তখন সে শ্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা শ্রেয়ঃ তাহাই গ্রহণ করে। তাই তখন তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্ব স্ফুরিত হয়; সে স্থিতধী হইয়া যায়। আপত্তিকারীর আরও দুইটি আপত্তি আছে তাহারও উত্তর দেওয়া আবশ্যক: আপত্তিকারী বলেন, বিজ্ঞানের সত্য অকাট্য, বিজ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দেখা যাউক একথা কতদূর ঠিক। বিজ্ঞানবিষয়ক সত্য অভিজ্ঞতালব্ধ (derived from experience) উহার স্বতঃসিদ্ধতা নাই; উহা তাৎকালিক সত্য, অনতিক্রমণীয় সত্য নহে; যে সত্য অভিজ্ঞতালব্ধ, অভিজ্ঞতার অন্যথাভাবে সে সত্যে অন্যথা হইতে পারে, বিজ্ঞানের পূর্ব্বাপর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই এ কথার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে। (১) পূর্ব্বে বলিয়াছি বিজ্ঞানের সত্য তাৎকালিক আপেক্ষিক। কিন্তু এই আপেক্ষিক সত্যের উপরই ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত; তাই ব্যবহারজগতে ইহার মূল্য কম নহে। বিশেষতঃ সকল বিজ্ঞানের সত্যই যে সমান মূল্যের সত্য তাহাও ত প্রতিপন্ন হয় না, এবং তত্ত্ববিদ্যাঘটিত যে সকল সমস্যা আছে, তাহা যে পর্য্যন্ত না মীমাংসা হয়, সে পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের সত্যকে খুব সম্ভবপর সত্য বলিব কি না তাহাও বিবেচ্য। John Stuart Mill বলেন (২)"the difficulties of metaphysics lie at the root of all science; that those difficulties can only be quieted by being resolved and until they are resolved,

(১) Examination of H's philosophy. Ch. I.

(২) A description of certain phenomena, though it be indubitably the simplest we can now give, may in the further progress of science be superseded by another simpler still. Of such like changes the past history of mechanics furnishes instances in plenty—Kirchh quoted by Ward.

positively whenever possible, but at any rate negatively, we are never assured that any human knowledge, even physical, stands on solid foundations."

আপত্তিকারীর চতুর্থ আপত্তি—দর্শন দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে আমাদের কোন প্রয়োজন সাধনা করে না—কোন ব্যবহারে লাগে না। আপাততঃ এই আপত্তির উত্তর করা যাইতেছে। মানুষ প্রজ্ঞাসহ জন্মগ্রহণ করে। প্রজ্ঞার অনুশীলন-প্রবৃত্তিও তাহার স্বভাবসিদ্ধ। তাই মানুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকে দর্শন-চর্চ্চা তাহার অনিবার্য্য। বিশুদ্ধ ভাবেই হউক আর অশুদ্ধ ভাবেই হউক, দার্শনিক বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। সর্ব্বত্র যুক্তির অন্বেষণই তাহার প্রজ্ঞাবত্তার লক্ষণ। এই প্রজ্ঞাবত্তাই তাহাকে ইতর জন্তু হইতে বিশেষ করে, নতুবা কেবল জন্তুত্ব পুরস্কারে সে পশ্বাদি হইতে বিভিন্ন নহে। এই প্রজ্ঞানুশীলনই তাহার দার্শনিকতা। তাই Hamilton বলেন—"Man philosophises as he lives. He may philosophise well or ill, but philosophise he must. Philosophy can, indeed, only be assailed through philosophy." তাই Aristotle বলিয়াছেন,—"If we must philosophise, we must philosophise, if we must not philosophise we must philosophise ;—in any case, therefore, we must philosophise."

অতএব আপত্তিকারী যদি দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপে নিজের দার্শনিকতার পরিচয় প্রাপ্ত না হন, তবে বুঝিতে হইবে তাঁহার প্রজ্ঞাবত্তা (rationality) নাই। যদি তাঁহার প্রজ্ঞাবত্তা না থাকে তবে তাঁহাকে মানুষ বলিব কি না জানি না। কেন না মানুষের লক্ষণ হইতেছে,—জীবত্ব + প্রজ্ঞাবত্তা (animality + rationality)। যদি বলা যায়, মানুষ যে প্রতিদিন দার্শনিকতার পরিচয় দেয়, তাহা ত সে নিজে বুঝিতে পারে না। নিজে দার্শনিক, অথচ সে জানে না যে সে দার্শনিক ইহা কি অসঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে বলা যায়, যাহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ, তাহার পরিস্ফুট জ্ঞান তাহার থাকে না; অন্ততঃ সে তাহাকে 'খেয়ালে' আনে না। অতএব বুঝা গেল মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তিতে দর্শন আমাদের প্রধান সহায়। দর্শনই আমাদিগকে খণ্ড সুখ হইতে ভূমানন্দের দিকে টানিয়া লয়। দর্শনই আমাদিগকে বিপদে ধৈর্য্য, শোকে সান্ত্বনা, মোহে দিব্যচক্ষু, মরণে অভয়, তাপে শান্তি, প্রদান করে। দর্শনই আমাদিগকে সর্ব্বজীবে সমভাবের উপদেশ দেয়; ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেদ করিয়া বিশ্বাত্মার সহিত এক হইবার সহায়তা করে। যে শাস্ত্রের কার্য্য এত গভীর, এত উদার, এত উচ্চ, সে শাস্ত্র মানব-জীবনের কোন কার্য্যে আইসে না,—একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা আর বলিতে হইবে না। লৌকিক দৃষ্টিতে দর্শনের কোন মূল্য না থাকিতে পারে; লৌকিক বুদ্ধিতে উহা অসার জল্পনা মাত্র হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া দর্শনের সার্থকতা নাই, কোন ব্যবহার নাই ইহা প্রতিপন্ন হয় না। যাহার সার্থকতা —উপযোগিতা নাই, অভিব্যক্তির রাজ্যে তাহার উচ্ছেদ অনিবার্য্য। কিন্তু দর্শন যখন উদ্ভূত হইয়া রহিয়াছে তখন উহা যে যোগ্যতম বিষয় তাহা নিঃসন্দিগ্ধ।

এক্ষণে দর্শনের সহিত অপরাপর বিদ্যার

কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও মনন শাস্ত্রের (Logic) সহিত দর্শনের সম্বন্ধ অতি নিকট। উহাদের কার্য্যক্ষেত্র ঐকদেশিক; উহারা মাত্র মানসী ক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ। মনোবিজ্ঞান আমাদের মানসিক ভাব, বৃত্তি বা অবস্থানিচয়ের ক্রম, উৎপত্তি, ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হয়; (it only classifies and analyses the phenomena or the varying states of the human mind)। ইহাদের মূলদেশে কোন বাস্তব পদার্থ আছে কি না তাহার আলোচনা করে না।

মননশাস্ত্র বিশুদ্ধ মননের (correct thinking) নিয়মাদি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কি প্রকারে চিন্তা করিলে চিন্তায় দোষের (fallacy) সংস্পর্শ না হয়, সেই পদ্ধতি সূচিত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য (It investigates the nature of the process which takes place in reasoning, and lays down rules to enable that process to be conducted as it ought.)। পরন্তু যাহা অবলম্বন করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, অর্থাৎ যাহা data তাহার সত্যাসত্যতা অবধারণ করা উহার অন্তর্গত নহে। অবশ্য কোনও কোনও তার্কিক (Logician) datar সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণের ভারও মননশাস্ত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া ঐ শাস্ত্রকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন—Formal Logic ও Material Logic অর্থাৎ বস্তু নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ মননশাস্ত্র ও বাস্তব মননশাস্ত্র। তাঁহারা বলেন তর্কশাস্ত্র যখন সত্যনির্ণয়ের শাস্ত্র তখন উহাকে কেবল চিন্তার পণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে চলিবে কেন? প্রতিজ্ঞার ও হেতুর সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করাও ইহার আয়ত্তাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এবং প্রতিজ্ঞা ও হেতু যথার্থ বিষয়-ঘটিত কি না তাহা অবগতির জন্য বিষয়ের সহিত উহাদিগকে মিলাইয়া দেখিতে হইবে। যাহা হউক, তর্কশাস্ত্রের এতাদৃশ লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইলে তাহা প্রকারান্তরে দর্শন শাস্ত্রেই পর্য্যবসিত হয়, ইহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তথাপি তর্কশাস্ত্র ঐকদেশিক শাস্ত্রই থাকিয়া যাইতেছে; সর্ব্বগ্রাহী অবও অদ্বৈতে পৌঁছিতে না পারায় দর্শনের ন্যায় ব্যাপক শাস্ত্র হইতে পারিতেছে না, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে।

কেহ কেহ বলিবেন, দর্শনের এ আস্পর্দ্ধা, এ ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। কেননা, ইহা অমূলক। দর্শনের কোন একটা অবলম্বন, আশ্রয় বা ভিত্তি নাই যাহার উপর দাঁড়াইয়া ইহা স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয় অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানাদি যেমন তাহাদের নিয়মাদি আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়; মানসী ক্রিয়াদিকে অবলম্বন করিয়া যেমন মননশাস্ত্র বা মনোবিজ্ঞান স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, দর্শনের সম্বন্ধে তেমন একটা মূলাবলম্বন বা আশ্রয় পরিদৃষ্ট হয় না। সকল সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধন, সকল বিচারের সমালোচনা অবশ্যই কোন একটা সত্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ। দর্শনের সেই মূল সত্য কোথায়? কোথায়ও নাই; অতএব ইহার ধৃষ্টতা অসহনীয়। দর্শন শূন্যে বিচরণ করে, শূন্যে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করে; ইহা স্বয়ং শূন্যময়, বাজে কল্পনা মাত্র।

চিন্তাশীল দার্শনিকবৃন্দের এ আপত্তির—এ উপহাস বাক্যের—এ ব্যঙ্গের কি উত্তর দিবেন তাহা আমি বলিতে পারি না। হয়ত তাঁহারা প্রসাদোজ্জ্বল বদনে একটু হাসিয়া

বলিবেন,—"অমৃতং বালভাষিতং।" যাহা হউক, আমার মতে এ আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক। একটা মূল আশ্রয়, বিজ্ঞানেরও ন্যায় দর্শনেরও আছে, দর্শন ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। সেই অবলম্বন (আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন ধারণা করিতে পারি) আত্মবোধ (self-consciousness) ও তদবলম্বিত বিশুদ্ধ বিচার (pure reasoning)। এই প্রকার মূলকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত বিদ্যার প্রতিষ্ঠা; সমস্ত বিজ্ঞান মূলতঃ এই সত্যের অপেক্ষা করে; এই সত্যে অনাস্থা করিলে, অনাস্থার সত্যতাও অসিদ্ধ হয়। অতএব এই মূল আশ্রয় করিয়াই দর্শন স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কবি, চিত্রকর, দার্শনিক ও উন্মাদদিগের পারস্পরিক সম্বন্ধ। ইহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে পাই, কল্পনা (imagination) চারিজনেরই সাধারণ সম্পত্তি। কল্পনা যে কেবল ইহাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি, অপর কাহারও নহে, আমার বলিবার উদ্দেশ্য তাহা নহে। বৈজ্ঞানিকেরাও কল্পনার সাহায্য লইয়া থাকেন। আমি বলিতে চাই, কল্পনা এই চারিজনের, অন্ততঃ তিনজনের, মধ্যে কিছু বেশী পরিমাণে বিদ্যমান।

কবি ও চিত্রকর উভয়েরই উদ্দেশ্য অপরের মনে হর্ষ বিষাদ ভয় বিস্ময় প্রভৃতি রসাত্মক ভাবের উদ্দীপনা করা। কবিরা কল্পনাবলে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া মানবের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া ধরান। সেই সৌন্দর্য্য বাস্তব হউক কিম্বা অবাস্তব হউক তাহাতে কবির বড় একটা যায় আসে না। মানব-হৃদয়ের নিগূঢ় সৌন্দর্য্যানুভাবকতাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেই তাঁহার পরিতৃপ্তি। দার্শনিকের ন্যায় যুক্তি-তর্ক-পরম্পরায় তিনি স্বসিদ্ধান্তে উপনীত হন না; পরন্তু তাঁহার হৃদয়-নিহিত সিদ্ধান্তকে বাসনা-রাগ-রঞ্জিত করিয়া, নাম-রূপ পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়া, আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে একবারে হাজির করিয়া দেন। কল্পনায় স্পষ্টতঃ অসঙ্গতি থাকিলে চিত্রের অঙ্গহানি হইতে পারে, তাই তিনি সঙ্গতির ঠাট বজায় রাখিয়া একটা পদ্ধতির (method) মধ্য দিয়া চলেন। কবির চিত্র কাব্যের অলঙ্কারে, ছন্দের তালে, শব্দের ঝঙ্কারে ফুটিয়া উঠে।

চিত্রকর কল্পনা বলে প্রকৃতির হুবহু চিত্র অনুরূপ বর্ণ বৈচিত্র্যে অঙ্কিত করিয়া দর্শকের মনে রসাত্মক ভাবলহরী উদ্দীপিত করেন অথবা মনঃকল্পিত বস্তুকে রূপসৌন্দর্য্যে লোক চক্ষুর গোচর করেন। তাঁহার সে চিত্র বাস্তব হউক কিম্বা অবাস্তব হউক, তাহাতে তাঁহার বড় একটা আসে যায় না। তবে সে চিত্র গঠনে নির্দ্দোষ, ভাবের সঞ্চারে কুশলী হইলেই তিনি সফলকাম। কবির উপকরণ ভাব ও ভাষা; চিত্রকরের উপকরণ ভাব ও বর্ণ। কিন্তু কথা হইতেছে ভাষার অধিকার অতি বিস্তৃত; বর্ণের অধিকার তত বিস্তৃত নহে। বর্ণের অধিকারকে অতিক্রম করিয়াও ভাষার অধিকার বিস্তৃত। সুতরাং ভাষার যাহা আয়ত্ত, তাহা বর্ণের আয়ত্ত হইবে, ইহা খুবই সম্ভাবনীয়। সুতরাং কবি যেমন শব্দ সাহায্যে অনেক অতীন্দ্রিয় বিষয়কে শ্রোতার বুদ্ধিগোচর করিতে সমর্থ হন, চিত্রকর বর্ণের সাহায্যে তাহা দর্শকের বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

দার্শনিক কবির ন্যায় কল্পনাপ্রবণ হইলেও কবির ন্যায় আত্মহারা হন না। তাঁহার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি নহে, সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার। তাই তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপ সুতর্ক,

তাঁহার চিন্তাগুলি গ্রথিত, শৃঙ্খলিত ও সত্যানুসন্ধী। তিনি যে সৌন্দর্য্য আবিষ্কৃত করেন, তাহা বিবেক-বিচার-সাপেক্ষ। কবির আদর্শ কাল্পনিক বলিয়া বিশ্বাস করিলে তাহার বিরুদ্ধে কবির কিছু বলিবার নাই। কেননা কবি কি প্রণালীতে এই আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তিনি খুলিয়া বলেন না, বা বলিতে পারেন না। তাহা তিনি কখনও বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখান না। আমরা তাই তাঁহার আদর্শকে সত্য বলিয়া গ্রহণ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জন করিতে পারি। দার্শনিকের প্রণালী সকলের সমক্ষে উন্মুক্ত ;—সোপানাবলীর ন্যায় বিন্যস্ত। তাহার দোষাদোষ বাহির করিবার জন্য সকলেই সমাহূত। তাঁহার সিদ্ধান্তে সন্দিহান হইতে হইলে তাঁহার যুক্তি প্রণালীতে, তাঁহার বিচারে গলদ বাহির করিতে হইবে ; ইহা না করিতে পারিলে তাঁহার সিদ্ধান্ত অবশ্যই মাননীয়, অবশ্যই বিশ্বাস্য।

উন্মাদের সহিত কবি, চিত্রকর ও দার্শনিকের সাদৃশ্য এইটুকু যে সকলেই কল্পনা-প্রবণ। কিন্তু উন্মাদের কল্পনায় একটু বিশেষত্ব আছে। তাহার কল্পনা উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, অসম্বদ্ধ। তাহার কল্পনায় সিদ্ধান্ত আছে, হেতু নাই ; হেতু আছে, সিদ্ধান্ত নাই ; চিন্তা আছে, অর্থ নাই ; তাই তাহার চিন্তাকে অনুসরণ করা যায় না। যাহারা প্রকৃতিস্থ তাহাদের কল্পনার ধারাবাহিকতা আছে, পদ্ধতি আছে, সম্বন্ধ আছে, উদ্দেশ্য আছে ; তাই তাহা অনুসরণ করা যায়, বুঝিতে পারা যায়। ব্যক্তি বিশেষ উন্মত্ত কি প্রকৃতিস্থ জানিতে হইলে দেখিতে হইবে তাহার আচরণে উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় কি না, তাহার চিন্তায় শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতার চিহ্ন পাওয়া যায় কি না। যদি সংসারে সকলেই উন্মত্ত হয়, তবে কে অল্প কে বেশী উন্মাদ অন্ততঃ ইহা জানিতে হইলেও সামঞ্জস্য ও উদ্দেশ্যের কষ্টিপাথরেই তাহাদের হাবভাব আচার ব্যবহার পরীক্ষা করিতে হইবে। এবং যে এই মাপকাঠির যত সন্নিকৃষ্ট হইবে তাহাকেই প্রকৃতিস্থ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি, এ

উপল-খণ্ড

পাশ্চাত্য কলাবিৎ দেবতা গড়িতে মানুষ গড়েন ; প্রাচ্য কলাবিৎ মানুষ গড়িতে দেবতা গড়িয়া ফেলেন।

Kipling বলিয়াছেন পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন অসম্ভব। কিপ্লিং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নহেন।

বন্ধনের প্রতি বিদ্রোহ জীব মাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক ; তথাপি একমাত্র মানবই শুধু নিজের জন্য বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

স্রষ্টার নিকট এ জগৎ মিথ্যা মায়া নহে—নিতান্তই সত্য। কবির নিকট তাঁহার কাব্য শুধু কল্পনা নহে—সেইরূপই সত্য।

প্রতীচ্য শিল্পী যাঁহাকে ভালবাসেন, প্রাচ্য শিল্পী তাঁহাকে পূজা করেন। প্রতীচ্য শিল্পীর নিকট তাঁহার কলালক্ষ্মী—প্রেয়সী ; প্রাচ্য শিল্পীর নিকট—জননী, দেবী।

ইউরোপে জাতীয়তার বর্ত্তমান উৎকট অভিব্যক্তি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র।

'মানবের জ্ঞান অসম্পূর্ণ; এমন কি দৃষ্টি শক্তি পর্য্যন্তও অসম্পূর্ণ। এত অসম্পূর্ণতা লইয়াও মানব পূর্ণতমের সমকক্ষতা লাভ করিতে ইচ্ছা করে?

কবিত্ব অনুভব করিবার বস্তু; সূত্র দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

সৌজন্য অনেক সময় মিথ্যার নামান্তর মাত্র। কৃত্রিমতা মানুষকে এইরূপ ভাবেই অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

যাহাকে সুন্দর বলিয়া মনে করিতেছ, মুখোস খুলিয়া গেলে হয় ত তাহাকে কি কুৎসিতই না দেখাইবে!

কবি স্বপ্ন-বয়ন-পটু নহেন—বিশ্বের মর্ম্মবাণীর প্রকাশক। কাব্য—মিথ্যা কল্পনা নহে; সত্যের নিগূঢ় মর্ম্মবাণী।

বেদনা সহ্য করিতে পারিবে বলিয়া হৃদয়কে কঠিন করিয়া তুলিও না; তুলিলে আনন্দের স্পর্শও অনুভব করিতে পারিবে না।

জগতে নূতন বলিয়া কিছুই নাই। তবে যাহা এ পর্য্যন্ত তোমার অজ্ঞানিত ছিল তাহাকে নূতন বলিতে পার।

সত্য চিরন্তন; মানুষ তাহাকে আবিষ্কার করে মাত্র।

ইউরোপে আজ যে অনন্ত দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে—ধর্ম্মহীন, বিশ্বাসহীন ইউরোপ একমাত্র জাতীয়তার উপর আস্থা-স্থাপন করিয়াই তাহাকে সহ্য করিতে পারিতেছে।

সকল বিশ্বাসহীন মানবের পক্ষে বেদনা সহ্য করা অসম্ভব।

বৃক্ষ-লতা-পুষ্পের প্রাণ স্পন্দন এতদিন একমাত্র কবিগণই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন—আজ বৈজ্ঞানিকও তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

জগতের মুক্তি বস্তুতন্ত্রতা বা ভাবতন্ত্রতার নহে; উভয়ের সামঞ্জস্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে। শুধু বিজ্ঞানে নহে—বিজ্ঞানে ও কাব্যে।

অন্ধ বিশ্বাস হইতে অবিশ্বাসও ভাল। অবিশ্বাস তোমার নিজেরই অপকার করিবে, অন্ধ বিশ্বাস অপরেরও ক্ষতির কারণ হয়।

ভগবান তাঁহার সৃষ্টিক্ষমতা একমাত্র কবি এবং শিল্পীকেই কিয়ৎ পরিমাণে দান করিয়াছেন।

দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক উভয়েই দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। দার্শনিক চিন্তা দ্বারা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা প্রকৃতির গুপ্ত রহস্যের পরিচয় পাইয়া থাকেন।

প্রতীচী একদিন মানবের স্রষ্টাকে বাদ দিয়া শুধু মানবতার পূজার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে পূজা ব্যর্থ হইয়াছে।

প্রকাশের আনন্দ হইতেই কাব্যের উৎপত্তি। বিশ্বসৃষ্টির কারণও তাহাই।

উষার আগমনের মত তোমার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকাররাশি দূর করিয়া প্রেমের উদয় হউক।

নারীর যাহা জীবন, পুরুষের তাহা আরাম; নারীর যাহা প্রেম পুরুষের তাহা প্রণয়।

পশ্চিমে আজ যে ধ্বংসের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার বিরাটত্ব মানবের মনকে এরূপভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে যেন ইহার করুণ দিকটার বিষয় ভাবিবার অবসর পাইতেছে না। দেবদেব রুদ্রকে নমস্কার।

সর্ব্ব বিষয়ে সাম্য সম্ভাবনীয় হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে। বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই জগৎ এত সুন্দর।

পৃথিবীতে দুই প্রকার লোক চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। যাহারা অতিরিক্ত ভাল-বাসে, এবং যাহারা তোষামদপ্রিয়।

যাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক তাঁহারা ক্রমে কতকগুলি মুদ্রাদোষের অধীন হইয়া পড়েন, এবং নিজেই নিজের অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন।

প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কেহ অপকারীর অপকার করিয়া, কেহ বা তাহাকে ক্ষমা করিয়া সে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করেন।

বিজ্ঞান যে দিন জীবনকে ধ্বংস বা বিনাশ-পরায়ণ করিবার জন্য নিয়োজিত না হইয়া তাহাকে সুন্দর করিবার জন্য নিয়োজিত হইবে, সেই দিনই সে সার্থকতা লাভ করিবে।

ভারত 'অতি মানুষ' বলিয়া পূজা করিত —যিনি আপনার সর্ব্বস্বকে ত্যাগ করিতে পারিতেন—তাঁহাকে। আর্য্যাণী 'অতি মানুষ' (Super-man) বলিয়া পূজা করিতে চাহে যিনি অপরের সর্ব্বস্বকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে পারেন—তাঁহাকে।

নিজের ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে উন্নত করিবার যে শক্তি তাহাই স্বাধীনতা। ইচ্ছানুযায়ী নিজের অবনতি সম্পাদন—উচ্ছৃঙ্খলতা।

শক্তির এমনই মহিমা যে ঘোরতর অত্যাচারীকেও আমরা সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করিতে পারি না—কতকটা বিস্ময় ও প্রশংসার চক্ষে দেখিয়া থাকি।

সামঞ্জস্য সমতা নহে। সামঞ্জস্য—শান্তি; সমতা—মরণ।

আমরা যে সমস্ত ভাল কায করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই অপরের নিকট সম্মান লাভের জন্য অথবা নিজের প্রতি নিজে গৌরব অনুভব করিবার জন্য করিয়া থাকি।

প্রতীচী একদিন বিশ্বাস করিয়াছিল যে, মানবতার (Humanity) অনুশীলন দ্বারা মানবসমাজে এবং চিন্তারাজ্যে এক অখণ্ড বিরোধহীন ঐক্য স্থাপিত হইবে;—এবং উহাই মানবের চরম পরিণতি—মুক্তি—স্বর্গ। কিন্তু চিন্তা ভাবে এবং কর্ম্মে এরূপ বৈচিত্র্যহীন সার্ব্বজনীন ঐক্য যে শুধু মরণ ইহা ভাবিবার অবসর তাহার হয় নাই। যাহা হউক ইহার জন্য সে অজস্র শোণিত পাত করিয়াছে—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহার পর সে আর এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিল—তাহা জাতিবাদ (Nationalism)। জাতীয়তার অনুশীলন ক্রমে জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ (National Imperialism) বা জাতিগত স্বার্থপরতায় পরিণত হইয়াছে। তাহার ফল আফ্রিকার এই ভয়াবহ শোণিতপাত। ইহার পর হয়ত সে ব্যক্তিত্বের (Individuality) অনুশীলনকেই মুক্তির পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাহাতে মুক্তি মিলিবে না—মিলিবে ধ্বংস। কারণ ধর্ম্মহীন প্রতীচীর পক্ষে ব্যক্তিত্বের অনুশীলন ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতায় পরিণত হইবে। তাহাকে এ ধ্বংস হইতে উদ্ধার করিতে পারে—ভারতের যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞানরাশি।

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী

কবিবর হেমচন্দ্র ও তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতি *

যে মহাত্মার জীবন এবং কার্য্য লইয়া আজ আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া, দেখিতে দেখিতে বহুদিন হইল, ইহ জগতের নিকট বিদায় লইয়াছেন। তাঁহার গভীর দুঃখময় জীবন-নাট্যের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ইহ জগৎ হইতে তাঁহার উদার আত্মার সম্বন্ধ যায় নাই; তিনি বাঙ্গালীর বক্ষে অটল হিমাচলের ন্যায় আপনার যশঃস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

হেমচন্দ্র।—এ নাম কে ভুলিবে?—এমন বাঙ্গালী কে আছে? হেমচন্দ্র আজীবন ধরিয়া অশেষ পরীক্ষার ভিতর দিয়া অদৃষ্ট-চক্রে নিষ্পেষিত হইয়াছিলেন বটে, বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ, ভিখারী হইয়া অতি কষ্টে দেহপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ সমস্ত ভাগ্যবিপর্য্যয় তাঁহার আত্মাকে অধীর করিয়া তুলিতে পারে নাই। তিনি উচ্চরাজপদ, অবিনশ্বর সুযশ ও বহু ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু দুঃখের বহুদর্শিতা তাঁহার অন্তশ্চক্ষুকে আজীবন জাগরিত রাখিতে ভুলে নাই। বলিতে হইলে তিনি আজীবন দুঃখী ছিলেন, অতুল সম্পদেও সে দুঃখের হস্ত হইতে তিনি অব্যাহতি পান নাই। যখন নিজ অর্থের সাচ্ছল্য, তখন নানা পারিবারিক দুঃখে তিনি নিমজ্জিত ছিলেন। কিন্তু কবিতা লেখায় তিনি যে বিমল সুখ ও আনন্দ অনুভব করিতেন, সেই অটল কাব্যানুরাগ তাঁহার জীবনের শেষ দশা পর্য্যন্ত, অন্ধাবস্থাতেও অপ্রতিহত ভাবে বর্ত্তমান ছিল, তাহা আমরা তাঁহার জীবনের শেষ দশার কবিতাগুলি অনুসন্ধান করিলে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি।

"চিন্তবিকাশ"—হেমচন্দ্রের শেষ দশার রচনা। তখন তিনি চক্ষুদ্বয় হারাইয়াছেন কিন্তু প্রতিভার অন্তশ্চক্ষু হারান নাই। তাঁহার 'চিন্তবিকাশ' বাস্তবিকই চিন্ত-বিকাশ। অন্ধাবস্থায় কবিবর হেমচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি আরও উন্মীলিত হইয়াছিল। Where telescope ends, microscope begins ফরাসী কবি হুগোর এই কথাটী খাঁটী সত্য। কবি হেমচন্দ্র তাঁহার 'চিন্ত-বিকাশে' নিজ জীবনস্মৃতির বহু আভাষ দিয়া গিয়াছেন। তিনি এমন নিখুঁত চিত্তের চিত্র তাঁহার অন্য কোন কবিতা-গ্রন্থেই তেমন প্রস্ফুটিত করিতে সমর্থ হন নাই। 'চিন্ত-বিকাশের' সকল কবিতাগুলিতেই কবির দুঃখের গাথা শেষজীবনের এবং সারাজীবনের সুখ দুঃখের কথা। 'চিন্তবিকাশে' যিনি 'বিভু কি দশা হবে আমার?'—শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিয়াছেন তিনি কবির দুঃখে বাস্তবিকই না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন না। বাহুল্য ভয়ে আমরা কেবলমাত্র উক্ত কবিতার তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কবি অতি দুঃখে গাহিতেছেন—

---

* ১০ই জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্রের স্বর্গারোহণ-দিবসে—হেমচন্দ্র-পাঠাগারের উদ্যোগে—স্মৃতিসভায় পঠিত।

"বিভু কি দশা হবে আমার ?
একটী কুঠারাঘাত, শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন ;—
সব আশা চূর্ণ করে রাখিলে অবনী'পরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন ॥
সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়ে চক্ষু নিধি
মানবের অধম করিলে।
বল, বিত্ত সব হীন, পর প্রতিপালা হীন,
করে ভবে রাখিয়া রাখিলে।
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার।
জীবনের শেষকালে সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু ! কি দশা হবে আমার ?"

কবির এই হৃদয়োত্থিত আক্ষেপ-উক্তি বঙ্গবাসী কি এত শীঘ্রই ভুলিবে ! এমন প্রাণভেদী হাহাকার, বৃদ্ধবয়সে এমন কবি-ভাগ্যের দুর্দ্দশার চিত্র বঙ্গদেশে আর কাহার কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায় ! বাস্তবিকই হেমচন্দ্র বঙ্গদেশের Heine ছিলেন। Goldsmith-স্বভাব মাইকেল মধুসূদনকেও বহুবিধ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল বটে কিন্তু মাইকেল ইচ্ছা করিয়াই যেন কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের উন্মার্গগামী কবি, উচ্ছৃঙ্খলতা বশতঃ তাঁহাকে ইহজীবনে বহু স্বেচ্ছা-কৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু হেমচন্দ্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অদৃষ্ট-ফল ভোগ করিয়াছিলেন। মাইকেল যথেচ্ছাচারী প্রতিভাবান্ পুরুষ ছিলেন কিন্তু হেমচন্দ্রের প্রতিভায় বিচার-বুদ্ধি বা হিতাহিত জ্ঞান ছিল। প্রতিভাশালী ব্যক্তির পতন সম্ভব কিন্তু বিবেকী ব্যক্তির পতনে শুরুত্ব আছে। মাইকেলের জীবন-প্রারম্ভে কিছুরই অভাব ছিল না, যদি বুঝিয়া চলিতেন পরবর্ত্তী জীবনেও অভাব থাকিত না। কিন্তু হেমচন্দ্র অল্প বয়স হইতেই হচ্ছে আত্মনির্ভরশীল পুরুষ। সামান্যাবস্থা হইতে হাইকোর্টের সরকারী উকীল হওয়া কবি হেমচন্দ্রের পক্ষে কম সহিষ্ণুতা ও আত্মনির্ভরশীলতার নিদর্শন নহে। এই অসাধারণ আত্ম-নির্ভরতার সঙ্গে ভগবান্ তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী করিয়াছিলেন। এমন মহা সম্মান খুব অল্প কবি-ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

হায়, ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়, এমন সর্ব্বগুণমণ্ডিত ব্যক্তিকেও অবশেষে দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতে হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের অবদশা—fallen greatness—বড়ই মর্ম্মপীড়াদায়ক—ধনাঢ্য মনুষ্যজীবনের বড়ই চৈতন্য-উৎপাদক ! "হের ওই হেরুটির কি দশা এখন !"—কবির এই মর্ম্মন্তুদ কথাটী যেন নিজের দশা স্মরণ করাইয়া দিয়া অপর সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছে ! হেমচন্দ্রের জীবন হইতে আমরা অনেক শিক্ষা পাই। পরম বিষয়াভিমানী ব্যক্তিরও ভগবদ্ভক্তি জাগিয়া উঠে। হেমচন্দ্রের বল বুদ্ধি বিদ্যার কিছুই অভাব ছিল না, তথাপিও তাঁহার জীবনে সুখের সৌভাগ্য বড় অল্পই দেখা গিয়াছিল !

হেমচন্দ্রের জীবনে প্রকৃত সুখ কি ? এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে একমাত্র কবিতারাজ্যেই তাঁহার সুখ। হেমচন্দ্রের কবিত্বের প্রত্যেক ছন্দে ছন্দে সে সুখ, সে আনন্দ স্বর্গের অমৃতধারার ন্যায় প্রবাহিত হইত। এতদ্ব্যতীত, সংসারী হইয়া, পুত্রকলত্র আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব লইয়া তিনি একদিনের জন্যও সুখী হইতে পারেন নাই। বাল্যে মাতামহের ঘরে পালিত, যৌবনে পাগলিনী তাঁহার সহধর্ম্মিণী, প্রৌঢ়ে পুত্রগণ পিতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথাবলম্বী, বিষ-বৃক্ষ

তুল্য সংসার এবং বৃদ্ধাবস্থাতে তাঁহার ততোধিক অভাবনীয় পরিণাম! চক্ষুদ্বয় অন্ধ, শরীর পঙ্গু, দৈবতব্য-নির্ভর জীবন, এতদ্ভিন্ন নানারূপ বিড়ম্বনা ও প্রবঞ্চনা ভোগ করিয়া অমর হেমচন্দ্র নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাহাদিগকে তিনি আপন প্রসার হানি করিয়াও নিঃস্বার্থ পরোপকারের পরিচয় দিয়াছিলেন শেষে তাঁহারাই তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে দেশের লোকের কৃপার উপর জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল। হায়, দারিদ্র্য-নিপীড়িত অন্ধ ব্রাহ্মণ হেমচন্দ্র, অবশেষে তোমার এমনি পরিণাম! তাই যেন চিত্তবিকাশে তোমার 'ভালবাসা' শীর্ষক কবিতায় হতাশ হইয়া লিখিয়াছিলে।—

"কতজনে কতবার সোদর অধিক
জড়ায়েছি হৃদয়েতে ভাবিয়া প্রেমিক,
বৃশ্চিক-দংশিত হয়ে ফিরিয়াছি শেষে,
কেঁদেছি রজনী দিবা যাতনার ক্লেশে।
কতবার কতজনে কণ্ঠের ভূষণ
করিয়া রেখেছি বুকে ভাবিয়া রতন,
ছিঁড়িয়া ফেলেছি শেষে বুঝিয়া স্বপন
করেছি কতই তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন।"

অতি বড় মানসিক ক্লেশ না পাইলে হেমচন্দ্রের রচনা হইতে এইরূপ খেদোক্তি কখনই নির্গত হইত না। চিত্তবিকাশের মধ্য দিয়াই কবি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কবিতার ভিতর দিয়া হেমচন্দ্রের জীবন-কাহিনী আলোচনা করিতে হইলে কবির চিত্তবিকাশ'ই একমাত্র অবলম্বন। কবির আপন কথাতেই আমি যতদূর পারি কবির হৃদয়ের পরিচয় দিব। প্রায় সকল কবিই কবিতার ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সহস্র চেষ্টা করিয়াও আত্মগোপন করিতে পারেন না—অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাদিগকে ধরা দিয়া ফেলেন। ইহাই কবিগণের অন্তঃ প্রকৃতি। দুঃখের কারাগারে, মেঘের অন্ধকারে, জীবনের নির্জ্জনতায় কবির স্বরূপ যেন আরও স্পষ্ট হইয়া পড়ে।

চিত্ত-বিকাশ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, কবিবর হেমচন্দ্র কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ তিনি অমিতব্যয়ী ও মহা দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দরিদ্র ব্যক্তিকে কখন আজিকালকার বড় লোকের মত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। তিনি যাহা দান করিতেন, সাধারণে তাহা জানিতে পাইত না, তাঁহার মুক্তহস্ত গোপনে দুঃখীর দুঃখ মোচন করিত।

'চিত্ত-বিকাশে'র একস্থলে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"পরের হিতার্থ মন না বুঝে যে ধনী
নিজ স্বার্থ চরিতার্থ সদা যাহা করে
পরহিত ভাবে না যে মুহূর্ত্তের তরে,
সে জন দুরাত্মা অতি জগতের গ্লানি।"

পরদুঃখকাতরতা হেমচন্দ্রের জীবনের একটী বিশেষ গুণ ছিল। সপেনহাউর বলিয়াছেন সম্পূর্ণ পরার্থপরতাই (Complete objectivity) প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের প্রধান লক্ষণ। নিঃস্বার্থপরতাই সকল সত্য উদ্ঘাটনের দ্বার। যাহারা যত অধিক পরার্থপর, তাহারা তত সত্যদর্শী সত্যক্ সমদর্শিনম্। যেখানে যত স্বার্থপরতা এবং সঙ্কীর্ণতা মিথ্যা এবং কুটিলতাও তথায় ততোধিক বর্ত্তমান। ইহাই দর্শনের নিগূঢ় রহস্য।

আমাদিগের হেমচন্দ্র সরল এবং উদার স্বভাবের লোক ছিলেন। পরের প্রার্থনায় তিনি 'হবে না' বলিয়া পশ্চাৎপদ হইতেন না কিম্বা আত্মগোপন করিতেন না। তিনি

পরোপকারের মর্ম্ম বুঝিতেন, দরিদ্র ব্যক্তির দুঃখ দূর করিয়া তিনি অভাবনীয় আনন্দানুভব করিতেন। বালকাল হইতেই দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অসীম সহানুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর বিধাতা যখন তাঁহার সৌভাগ্যের সময়ে ধন দিয়া মন দেখিলেন, বাল্যের সেই ছুটোমুখ স্বভাব তখন আরও ছুটিয়া উঠিল। তাই চিত্তবিকাশে কবির চিত্তমুকুর অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাই—

"নিত্য স্মরণীয় সেই মহাত্মা ভূতলে
কত দুঃখ, প্রাণী জ্বালা করে নিবারণ
জগতের কত হিত করে সে সাধন
সে কথা ভাবিলে প্রাণ আপনি উথলে।"

হেমচন্দ্রের বাল্যজীবন বড় মন্দ কাটে নাই। কবি স্বমুখেই বলিয়া গিয়াছেন।

"শৈশব সময় বর্ষ যার তের
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি একদিন তরে
জানি না কখন দুঃখ কেমন
তখন (ও) পুরাই মাতামহ মম
সুমেরুর মত উন্নত শরীর
মাতা পিতা আদি বন্ধু সর্ব্বজন
সে গিরি আশ্রয়ে আছে স্থির
• • •
আদরে লালিত আদরে পালিত
মাতাম'র আর ছিল না কেহ
অগত্যা তাঁহার আমাদেরই প্রতি
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।"

বৎসরে বৎসরে তাঁহার মাতামহের বাটীতে তখন শারদীয়া পূজা হইত। তাহাতে বালক হেমচন্দ্রের মাসাবধি ধরিয়া কতই না আনন্দ, কতই না উৎসাহ। কেবল আত্মীয় স্বজন লইয়াই একালের ন্যায় আনন্দে স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইত না। সেকালের নিঃস্বার্থ আনন্দোৎসবে সকলেই যোগ দিতে পারিত। ধনী ব্যক্তির গৃহে আনন্দময়ী আগমন করিলে গ্রামের কেহই বাদ পড়িত না। শৈশবের এই সব সুমহান আনন্দোৎসবের ধারণাই হেমচন্দ্রের পরবর্ত্তী জীবনকে অসীম মহানুভবতায় গঠিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার দিনে হেমচন্দ্রের ন্যায় দরিদ্রানুরাগী পরার্থধর্ম্মী কবি জন্মিবার সম্ভাবনা কোথায়? মহাকবি জন্মাইবারও একটা কাল আছে, সংযোগ ও সুযোগ আছে। প্রতিভা আকাশকুসুম নহে—অল্প আয়াস ও অদৃষ্টের সাফল্য নহে। দেশপ্রকৃতি এবং জাতীয়প্রকৃতির প্রসারতা ব্যতীত প্রকৃত প্রতিভাবান্ কবি জন্মায় না। তাঁহারও একটা ভূমি চাই, উর্ব্বরতা চাই।

পূজাবাটীতে বৎসরান্তে আনন্দময়ী বিশ্বজননী বিজয়া আসিয়াছেন—এই কথা শুনিয়া গ্রামের চারিধার হইতে দীনদুঃখী হেমচন্দ্রের মাতামহ ভবনে সমবেত হইতেছে, সকলেই সেই তিনদিনের তরে সকল দুঃখ ভুলিয়া হাসি মুখে সর্ব্বদুঃখহরা আনন্দময়ীকে দেখিবে, তাহাতে আবালবৃদ্ধ বণিতার কত আগ্রহ, কত না আনন্দ! সেই নিঃস্বার্থ আনন্দে বালক হেমচন্দ্রের যোগদান কি অপূর্ব্ব—দীন দুঃখীর প্রতি তাঁহার কি করুণাপূর্ণ চাহনি! সে চাহনির মর্ম্ম তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের 'চিত্তবিকাশে'র ভাষায়—প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে,—

"আসিত প্রত্যহ প্রতিমা দেখিতে
কত দুঃখী প্রাণী প্রফুল্ল মুখে
নব বস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি
সাজায়ে বালিকা, বালকে সুখে
সে আনন্দ ছবি তাহাদের মুখে
হেরি কতবার সংসারে ভাবি,

কার বেশী শোভা প্রতিমার কিবা
তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।"

এই কয়টী চরণ তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের রচনা অথচ দেখুন এ বৃদ্ধ বয়সেও হেমচন্দ্রের কিরূপ বালকভাব! মহাজনদিগের স্বভাবই এইরূপ—নীচাশয়তা তাঁহাদিগকে বিন্দুমাত্রও আশ্রয় করে না।

"কার বেশী শোভা, প্রতিমার কিবা, তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।"

এইখান হইতেই কবি হেমচন্দ্রের জীবনে মহানুভবতা ও পরার্থ পরতার আরম্ভ। তাই বলিতেছিলাম প্রতিভা আকাশ হইতেই পড়ে না—প্রতিভা এই মাটী হইতেই বর্দ্ধিত হয়। এই মাটীর সংসর্গ হইতেই মানবের হৃদয়ে নিসর্গছবি ফুটিয়া উঠে। মানব জীবনের সম্পূর্ণ বিকাশ বড়ই রহস্যময়। তাই মহাকবি হুগো বলিয়াছেন—The production of souls is the secret of the unfathomable depths.

বালক হেমচন্দ্র সকলেরই আদরের পাত্র ছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার অবারিত দ্বার। ঘৃণা নাই, অবহেলা নাই, অহঙ্কার নাই। উচ্চ নীচ সকলেরই আনন্দের পসরা বহিয়া বালক হেমচন্দ্র আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দ-বিভোর।

"সে আনন্দ মাঝে আমি শিশু মতি
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী ঘরে
আমার প্রবেশ নিষেধ নাই।"

প্রবেশ নিষেধ থাকিলেও কবির স্বানুভূতির দ্বার কে রুদ্ধ করিতে পারে? কবির কার্য্যই হইতেছে প্রবেশ করা—মানব জীবনের অতি গভীরতম আধ্যাত্মিক প্রদেশের ভিতর প্রবেশ করা। মানব প্রকৃতির হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করাই কবির প্রকৃত কার্য্য। হেমচন্দ্রের অন্তঃ-প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিবার জন্যই আমি এতগুলি কথার উত্থাপন করিতেছি।

'বর্ষ বার তের' বয়সেও বালক হেমচন্দ্র যে আনন্দে বিভোর থাকিতেন ষাটবর্ষ আয়ু-কালেও সে বিগতানন্দের সুখ-স্বাদ ভুলিতে পারেন নাই। চিত্ত-বিকাশে সেই সুখ-স্মৃতি কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখুন।

"ষাট্‌বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,
আজ ত সে দিন ভুলেনি হৃদয়
সে সুখের স্বাদ আজ ও আছে।"

"We have something of the child in us"—একথা যদি সত্য হয়, হেমচন্দ্রের এতাদৃশ বাল্যভাব পূর্ণ মাত্রায় আজীবন ছিল। অন্ধ ও বৃদ্ধাবস্থাতেও অতি দুঃখ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও সেই তরুণ রসমাধুর্য্যে কবি আপনার চিত্তকে সদাসর্ব্বদা সিক্ত করিয়া রাখিতেন। অন্ধ হইয়াও কবি 'কৌমুদী' 'খদ্যোত' 'প্রজাপতি' 'আলোক' 'ফুল' 'সরিৎ-সমুদ্র' 'শিশু-বিয়োগ' 'ব্রজ-বালক' প্রভৃতি বালভাবাপন্ন কবিতারাশি কল্পনানেত্রে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি কেবল দশমহাবিদ্যা ও বৃত্রসংহারের গাম্ভীর্য্যময় কাব্যেরই কবি ছিলেন না তিনি আনন্দ ও রহস্যের কবিও ছিলেন। তিনি কেবল কালের ভেরী বাজাইয়া যান নাই, অনেক ব্যঙ্গ কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের পারিবারিক অবস্থা ভাবিতে গেলে কিছু থাকে না—কবির একমাত্র পাগল হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না কিন্তু অসীম পরীক্ষার মধ্যেও তিনি মহাযোগী, তিনি সংসারের সব চিন্তা ভুলিয়া স্বকীয় প্রতিভার ভাবজগতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তাহার পর, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কি দুর্দ্দশাই না

গিয়াছে ! কিন্তু হেমচন্দ্র তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দুঃখের দিনেও দুঃখের গাথা গাহিয়া তাহার কবিজীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন।

Shelly অতি দুঃখেই গাহিয়াছিলেন—

"Most Wretched men are cradled into poetry by wrong,
They learn in suffering what they teach in song"

আমাদিগের হতভাগ্য কবি হেমচন্দ্রও লিখিয়া গিয়াছেন।

"এ চির মনের সাধ মিটিল না, অপরাধ
লয়োনা দুঃখিনী মাগো, দৈব প্রতিকূল।
কমলা ঠেলিলা পায়, রোষ কৈলা সরস্বতী
শুষ্ক আশা-শুষ্ক মম বিনা ফল ফুল।

এক একবার কবির আনন্দ-মুদিত চক্ষু যখন তাঁহার শ্মশান-স্বরূপ সংসারের দিকে নিক্ষেপিত হইত তখন তাঁহার আক্ষেপের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু জীবনের সান্ধ্যশ্মশানেও তিনি ভগ্নোদ্যম হন নাই—তখনও কবির হৃদয়ে কবিতার উৎস শান্ত হয় নাই। অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সেই হৃদয়াস্তরালের ভিতর দিয়া কহিয়া যাইত :—

"এ অতৃপ্তি কেন সদা, ধন যশ কি প্রেমদা
কিছুই সন্তোষ-কর নহে।
নাহিক আকাঙ্খা আশা, নাহিক কোন লালসা
প্রাণ যেন সদা শূন্য রহে।
মুখে ব্যঙ্গ পরিহাস, হৃদে যেন বারমাস
রক্ত সদা শুকাইয়ে চলে।
বাহিরে আলোক পূর্ণ, হৃদয়ে অন্ধার চূর্ণ
প্রাণে সদা বহ্নি শিখা জ্বলে।
সহেছি অনেক দিন স'ব আর কত দিন
দিনে দিনে ডুবিছে পাথারে।
সত্বর এ প্রাণ হরি এ দুঃখ ঘুচাও হরি,
এ যাতনা দিওনাক কারে।"

হেমচন্দ্র এত যাতনাতেও অধীর হইয়া পড়েন নাই। Cowper সেই সত্য চরণ দুইটী তিনি হৃদয়ের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন।

"Renounce all strength
but strength devine
And peace shall be for ever
thine"

"কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট শৃঙ্খলে ?
ঘটেছে আমার যা'ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি ?"

কবি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন। হেমচন্দ্রের 'কি হবে কাঁদিয়া ?' শীর্ষক কবিতার আগা গোড়াই এই স্বান্তনার কথা।

হেমচন্দ্রের জীবন-সঙ্গীতে এই একঘেয়ে দুঃখের সুর হয়ত অনেকের শুনিতে ভাল লাগিবে না, তজ্জন্য প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহিনা। তবে, এই মাত্র বলিয়া রাখি যে বঙ্গবাসীর এমন প্রাণের কবি অভাগিনী বঙ্গভূমি আর প্রসব করিবেন কিনা সন্দেহ ! হেমচন্দ্রকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবার দিন চির হতভাগ্য বাঙ্গালীর জীবনে এখনও আসে নাই, সে অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনার শুভমুহূর্ত্ত কখন আসিবে কি না, জানি না। যে দিন হেমচন্দ্রকে যথার্থ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার দিন আসিবে সে দিন বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশেরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। সে দিন হেমচন্দ্রের বাণী আমাদের প্রত্যেক জীবনেই করাঘাত করিবে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে আমাদিগকে লইয়া চলিবে। তখন আমাদিগের বর্ত্তমান অর্থহীন অহঙ্কারের উন্মত্ততা আর থাকিবে না, অভিজাত্য-ভুলিয়া তখন আমরা উদারতা ও সহায়তার ক্ষেত্রে পরস্পর মিলিত হইব।

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহী মণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা সবলা।"

যবনাই যে জাতীয় অবনতির মূল এবং সৌভ্রাত্র ও সহৃদয়তাই যে সকল কল্যাণের জননিত্রী ইহা হেমচন্দ্র বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সেই উদার স্বভাব ব্রাহ্মণ বাস্তবিকই ব্রহ্মণ্যদেবকে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেন,—

"প্রিয়ং মাকুরু দেবেষু, প্রিয়ং রাজসু মাকুরু
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥"

তিনি 'রাখি-বন্ধন' নামক কবিতায় যে একতার ছবি আঁকিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই এক অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় সংযোগে পূর্ণ!—সে মিলনে হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই, পুরবী পঞ্জাবী ভেদ নাই। তিনি অভেদ ও ভারতের সুখময় চিত্র কল্পনা করিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও ভাবরসে নিমগ্ন থাকিতেন! হেমচন্দ্রই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত! কেবল বাঙ্গালীরই বা বলি কেন সমগ্র ভারতবাসীর জীবন-প্রভাতের তিনি অগ্রদূত। নবজীবনের সাড়া লইয়া তিনি বঙ্গসাহিত্য-গগনের প্রভাত-শৈলবে সমুদিত হইয়াছিলেন। গদ্যসাহিত্যে বঙ্গে বঙ্কিমের স্থান যেমন অগ্রে, পদ্য সাহিত্যেও হেমচন্দ্রের স্থান তেমনি। প্রভেদ এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকস্থলে একদেশদর্শিতা ও মুসলমান-বিদ্বেষ ছিল কিন্তু মহানুভব বিদ্বেষ-বুদ্ধিহীন হেমচন্দ্র সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে অভেদ ভারতের অপূর্ব্ব আদর্শ লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই স্থানেই হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব। তিনি সাহিত্য সাধনা দ্বারা ভরতবর্ষের আর একটী সন্তান মুসলমানকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিয়া যান নাই। যাহাহউক হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধ বাংলার মাটীর সঙ্গে; জাতীয় অনুপ্রেরণা, অনুপ্রাণনার সঙ্গে। ভারতচন্দ্রের পর বঙ্গভাষায় ওজোভাবের শক্তি হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রই জাগাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গভাষা যে কেবল ছেলেখেলা ও অন্তঃপুরের কঙ্কণধ্বনি নহে, বঙ্গভাষারও যে এক তাণ্ডব নৃত্য ও বজ্রনির্ঘোষ আছে ভারতচন্দ্রের পর রঙ্গলাল, রঙ্গলালের পর হেমচন্দ্রে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করি। আমার মনে হয়, মধুসূদনের অপেক্ষাও হেমচন্দ্রের প্রতিভায় তেজস্বিতা অধিকতর ছিল। 'বৃত্রসংহার' কাব্যে তাঁহার ভাষার ঝঙ্কারটায় যেন বজ্রতেজ নিহিত ছিল। দধিচীর অস্থিদান বাস্তবিকই কবিবর বজ্র দিয়া গড়িয়াছিলেন। 'বৃত্রসংহারে'র প্রারম্ভেই কিরূপ শব্দ-শক্তি লইয়া হেমচন্দ্র অবতীর্ণ হইতেছেন দেখুন,

"হা ধিক হা ধিক দেব! অদিতিপ্রসূত।
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দনুজের বাস!
নির্ব্বাসিত সুরগণ রসাতল ভূমে
অবসন্ন তেজশূন্য অশক্ত অলস!"

হেমচন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী কবি বাঙ্গলায় আর জন্মিবে কিনা সন্দেহ।

দশমহাবিদ্যাও হেমচন্দ্রের শব্দশক্তিমত্তার একটী অননুকরণীয় ও অভাবনীয় নিদর্শন।

"রে সতি, রে সতি" কাঁদিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ মগন হর, তাপস যতদিন,
ততদিন না ছিল ক্লেশ।"

এসব অনুকরণ করিয়া লিখিতে যাওয়া ত দূরের কথা, যথার্থ সুর ভঙ্গিতে পঠন করাও আমার মত ক্ষীণজীবি অনেকের পক্ষে

দুঃসাধ্য। তাহাতে সবিশেষ বক্ষের বল ও কণ্ঠের বলও প্রয়োজন। লিখিবার কালে স্বয়ং মহাদেব যেন কবির কণ্ঠে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপ ভাষা লইয়া সর্ব্বত্রই হেমচন্দ্রের তাণ্ডবনৃত্যের ও মেঘ-গম্ভীর গর্জ্জন! 'মহাদেবের বিলাপে'র আর একটী উদ্ধৃতি দেখুন,

জল নিধি মথনে অমৃত উছালিল
যত সুর বাঁটিলি তাহে।
ভস্ম ভকত হর, হরষিত অন্তর
ঢালিল গরল প্রবাহে।

এ সব কবির নিজস্ব সম্পত্তি ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি। মহামতি ফরাসী সমালোচক Taine একস্থলে বলিয়াছেন যে All original art is self-regulated; and no original art can be regulated from without it carries its own counterpoise and does not receive it from else where, lives on its own blood." তেমতি, হেমচন্দ্রের প্রতিভা হেমচন্দ্রের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছিল। আধুনিক কবিগণের ন্যায় বাহিরের উচ্ছিষ্ট লইয়া তিনি স্বকীয় ভাব-জগৎকে পুষ্ট করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হেমচন্দ্রের প্রতিভার সম্যক্ পর্য্যালোচনার দিন এ নির্জ্জীব রঙ্গভূমে আসিতে এখনও বহু বিলম্ব। বাঙ্গালীর জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটিলে হেমচন্দ্রের যশোসূর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে না। জীবদ্দশায় তিনি ভিক্ষা করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট তিনি কোন সম্বর্দ্ধনাই পান নাই। কিন্তু এমন দিন আসিবে যে মহাদিনে হয় ত এই অন্ধ-কবি বাঙ্গালীর হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন।

মার্কিণ মহাকবি Walt Whitman তাঁহার অভিনব গ্রন্থ Leaves of Grassএ এক স্থলে লিখিয়াছেন, "that first class literature does not shine by any luminosity of its own, nor do its poems. They grow of circumstances and are evolutionary." হেমচন্দ্রের মহতী কল্পনাও বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। হয় ত সেই কল্পনা একদিন বাস্তবে পরিণত হইয়া আমাদিগের অধমাধম জীবনকে জ্ঞানে গরীয়ান ও সম্পদে-মহীয়ান করতঃ বিবিধ উন্নতিশীল মানব-জাতির সমকক্ষ করিয়া তুলিবে। হেমচন্দ্রের জলন্ত এবং জীবন্ত ভাষায় বঙ্গে জাতীয়-জীবনের বীজ রোপিত হইয়াছে—বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। "Still lives the song though Regnar dies." আমাদের হেমচন্দ্রও আজ ইহজগতে নাই বটে কিন্তু তাঁহার সঙ্গীত ফুরায় নাই, বাঙ্গালীর হৃদয়ে বংশপরম্পরায় তাহার রেশ্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে ও হইবে। হেমচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু হেমচন্দ্রের আত্মার কার্য্য এখনও ফুরায় নাই। তাঁহার প্রতিধ্বনি জাতীয় জীবনের ধমনী হইয়া বাঙ্গালীর হৃদয়-মরুভূমে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। হেমচন্দ্রের সঙ্গীতের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে Tennysonএর ভাষায় বলিতে হয়—"The song that nerves a nation's heart is in itself a deed."

হেমচন্দ্র দরিদ্রের দুঃখে যেমন সদাই ব্যথিত থাকিতেন তেমনি স্বদেশের দুঃখেও তিনি ম্রিয়মান ছিলেন। বিলাতফেরত বাঙ্গালীর উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দেখিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অমনোযোগিতা দেখিয়া তিনি

বড়ই দুঃখিত হইতেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেন,—

"হে জগৎপতি এ দাস মিনতি
রেখো এই ধরা বঙ্গমাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ
যেখানেই থাক যেখানেই যাক
যতই সম্মান যেখানেই পাক
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।"

আমরা বিদেশের নোবেল প্রাইজই পাই বা ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বই পাই না কেন, যত দিন না দেশবাসীর হৃদয়ের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিব, ততদিন আমাদের সকল সাধনাই বৃথা, ইহা হেমচন্দ্র বহুপূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অনুকরণ-শক্তি থাকিতেও দেশের মাটীর সঙ্গে স্বকীয় চিন্তার যোগ লুপ্ত করেন নাই। তিনি বঙ্গের জাতীয় কবি বলিয়াই অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহার ছায়াময়ী, তাঁহার নলিনী-বসন্ত ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত প্রতিভা-শালী কবি তাঁহারা পরানুকরণ প্রবৃত্ত হইলেই কেমন ফাঁপরে পড়িয়া যান। অনুকরণ করা যে কৃত্রিম কবিগণেরই স্বভাব, এবং ব্যবসা। ভাবের ঘরে চুরি করিতে তাঁহারা বেদনার পরিবর্ত্তে আনন্দই অনুভব করিয়া থাকেন।

আধুনিক অন্নায়াসী যশের কাঙ্গালে উদীয়-মান কবিগণের অনুকরণ প্রবৃত্তিই প্রবল। তজ্জন্য তাঁহারা গীতি কবিতার ক্ষুদ্রতার ভিতর আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিতেই ভাল-বাসেন, মধুসূদন, হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের ন্যায় মহতী কল্পনা সাহিত্যের আসরে অবতরণ করিতে সমর্থ নহেন। আধুনিক প্রতিভার সে ভরসা কোথায়? প্রতিভার এখন জরা-জীর্ণ মৈন্যাবস্থা! মেঘনাদ বধ, বৃত্র-সংহার বা পলাশীর যুদ্ধের ভাব ও ভাষা আধুনিক কবিগণের কল্পনারও অতীত। কারণ অন্নায়াসী, বিজাতীয় উচ্ছিষ্টপ্রত্যাশী আমরা। সে পূর্ব্বাচার্য্যগণের ন্যায় মহা-ভারত রামায়ণে, বাল্মীকি, বেদব্যাসে আমা-দের সাষ্টাঙ্গ প্রণতি কোথায়? তাই জ্যোৎস্না, ফুল ও রমণীরূপ বর্ণনা করিয়াই আমরা কবি বলিয়া যাই, নিজ ঢক্কা নিনাদিত করি ও আপনা-দিগকে অমর মনে করি। আমাদিগের সে শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার কোথায়? যে শিক্ষায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও মাইকেল মধুসূদন 'নমি আমি কবিগুরু বাল্মীকির পদে।'—বলিয়া ভক্তিভরে পূর্ব্বপুরুষের নিকট মস্তক অবনত করিয়া গিয়াছেন, আজীবন ধরিয়া পৌরাণিক সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের সে শিক্ষা কোথায়, যে শিক্ষায় হেমচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই প্রণোদিত। রামায়ণের গান শুনিতে বালক হেমচন্দ্র আহারনিদ্রা ভুলিয়া যাইত। কবিবর নিজেই লিখিয়াছেন:—

"সেকালের প্রথা রামায়ণ গান
অপরাহ্নে শুনি, মোহিত হয়ে
সমুদ্র লঙ্ঘন, পুষ্পকে গমন
শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে ভয়ে।
নিশিতে আবার শুনি যাত্রাগান
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি
শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয়ফলকে লিখিয়া রাখি।"

হৃদয়ফলকে লিখিয়া না রাখিলে বৃত্র-সংহারের ন্যায় কাব্য কখনও হেমচন্দ্র রচনা করিতে পারিতেন না। এইরূপ মহাকাব্য গঠনের উপযোগী শিক্ষা আধুনিক কবিগণের কোথায়? তাই বঙ্গীয় সাহিত্য-প্রাঙ্গণ ঊর্ব্বরতা হারাইয়া কেবল আগাছা ও পরগাছা-তেই পূর্ণ হইতেছে।

আইস ভাই বাঙ্গালি, আমরা আবার

হেমচন্দ্রের একনিষ্ঠ আদর্শ ও অভেদভাব লইয়া সাহিত্য সাধনা দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে উন্নত করিয়া তুলি, সাহিত্যকে জাতীয় কল্যাণ ও সমাজের মুখ চাহিয়া গঠন করি। হেমচন্দ্রের মহানুভবতা এবং উদারতাকে বক্ষে এবং অন্তরে ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য এবং কল্যাণের পথে অগ্রসর হই। তাঁহার যথার্থ সম্মান করিতে হইলে তাঁহার পদাঙ্ককে আমাদিগের তুলিলে চলিবে না। তাঁহার অভেদ ভারতের সুখস্মৃতি আবার জাগ্রত করিতে হইবে। বিদ্বেষ বুদ্ধিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। এস ভাই আজ সেই মহাপ্রাণ কবির পরলোকগত আত্মার নিকট যোড়করে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি ও তাঁহার স্মৃতি-শিখরে যশের কিরীট পরাইয়া দিয়া জীবনকে ধন্য করি। Henley বলিয়াছেন—"Fame's a pearl that hides beneath a sea of tears" আমরাও আইস, তাঁহার ইহজীবনের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া পরজীবনের মঙ্গল কামনা করি, তাঁহার দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করি।

ইংলণ্ডের কবি Pope বলিয়াছেন—"Fame is a fancied life in others breath" এখন তিনি আমাদিগকে অভাবের অশ্রুজল ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে ফেলিয়া মহা শাশ্বতী শান্তিতে কি এক মৃত্যুহীন আনন্দরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন! ইহজীবনের পরপারে কি এক অম্লান, চির-সৌরভময় কবিজীবনের পারিজাতমালা গ্রথিত হইয়াছে! হেমচন্দ্রও তথায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। সেই অন্ধ ভিখারী ব্রাহ্মণ এখন সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ের রাজা। আর তিনি মুষ্টিভিক্ষার জন্য বাঙ্গালীর দ্বারে লালায়িত ন'ন—দাতব্য-নির্ভর—যন্ত্রণাকাতর জীবন বহন করেন না। এক্ষণে তিনি fancied life other's breath লইয়া স্বর্গের কাব্যকুঞ্জে বিহার করিতেছেন ও অনন্তকাল ধরিয়া সেক্সপীয়র কালিদাস ও গাইটের ন্যায় ইহজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস

রাজশাহীর প্রাচীন

যৎকিঞ্চিৎ

রাজশাহীর ঐতিহাসিকগর্ব্বে সমগ্র বঙ্গ—সমগ্র ভারতবর্ষ গরীয়ান; কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজশাহীর ইতিহাস নাই। নাই বলিয়া কেহ তাহার চেষ্টাও করেন না—করিতেও বোধকরি ঘৃণাবোধ করেন। কিন্তু এদেশের ইতিহাস যে, বঙ্গ ইতিহাসের কতিপয় পরিচ্ছেদ পূরণ করিতে পারে—বঙ্গীয় কতিপয় প্রসিদ্ধজনের প্রাণে অতীত গৌরব—অতীত স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া জাতীয়তার একটা প্রাণ আনিতে পারে, একথা আমরা ভাবি না এবং ভাবিতেও চাই না। রাজশাহীর আদৎবাসীর কথা বলিতে গেলে সকলেই প্রায় আপন দেশের কিছুই জানেন না—সুতরাং রাজশাহীর ইতিহাস নাই। আমি আমার কোন ঐতিহাসিক বন্ধু দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এখানে কতিপয় প্রাচীন রাজবংশের উদ্ভববার্ত্তা জ্ঞাপন করিব।

বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গ অধিকার করিলেন। তাঁহার দুইজন সেনাপতি লস্কর খাঁ ও তাহেরলা খাঁকে যুদ্ধকালে সৈন্যসাহায্য করিবার জন্য তিনি কতিপয় স্থান জাইগির দিলেন। লস্করের জাইগিরের নাম লস্করপুর ও তাহেরলার জাইগিরের নাম তাহেরপুর পরগণা।

১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে নাছীরুদ্দীন গৌড়ভক্তে। তাহেরলা নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে নাছীরুদ্দীন আপন সৈনিকবিভাগের এক কর্ম্মচারী বিজয় লস্করকে তাহেরের জাইগির ও তাঁহার আত্মীয় সনাতন চৌধুরীকে গৌড়-রাজের খাস সম্পত্তি হছরাপুর ও চান্দনাই পরগণা প্রদান করিলেন। নন্দনাবাসী প্রসিদ্ধ কলুক ভট্ট ও তাঁহার ভ্রাতা পুরুষোত্তম বেদান্তীর অধস্তন অষ্টম পুরুষে বিজয় ও সনাতনের জন্ম। প্রথমতঃ বিজয় লস্কর দিঘাগ্রামে (১) ও সনাতন গুয়াধারাতে (২) বাস করিতেন। কিন্তু জাইগিরপ্রাপ্তির পর, বিজয় তাহেরপুর (৩) ও সনাতন ঝিকড়াতে (৪) বাস করিতেন। বিজয় লস্করের বংশধর তাহেরপুরের পূর্ব্ব রাজবংশীয়গণ। সে বংশের এখন কেহই নাই। সনাতনের বংশীয় ভানপুর (৫) ও কোশিয়ার (৬) চৌধুরীবর্গ, এবং তালন্দর (৭) রায়গণ এখনও হছরাপুর পরগণার কতক কতক সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

সম্রাট বুলবন্ গৌড়াধিপ বখ্‌রা খাঁকে নিস্তেজ করিবার জন্য যখন বাঙ্গলায় আসেন প্রত্যাগমনকালে তিনি চন্দ্রকোলাবাসী (১) ঋষি বৎসরাচার্য্যের তপস্যার সাহায্য স্বরূপ কিছু ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তিনি অস্বীকার করিলে, বখ্‌রা খাঁর দ্বারা তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পীতাম্বর বাগ্‌চীকে (লস্করের মৃত্যুতে) খাস সম্পত্তি লস্করপুর জাইগির প্রদান করেন। পীতাম্বর, সম্রাট স্নায়নে পড়িয়া দিল্লীর নগর-রক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাই তিনি "পীতাম্বর সহরমণ্ডল" রূপে পরিচিত। পীতাম্বরের দিল্লী প্রবাসকালে, তাঁহার কনিষ্ঠ নীলাম্বর পুঠিয়াতে বসত বাস করতঃ সম্পত্তি দেখিতেন, অপর ভ্রাতা পুষ্পরাক্ষ তাহেরপুরের বিজয় লস্কর বংশোদ্ভব হরিনারায়ণ ও হৃদয়নারায়ণ ঠাকুরের অধীনে কর্ম্ম করিতেন।

হরিনারায়ণ ও হৃদয়নারায়ণের মধ্যে বিরোধ ঘটিল—হরিনারায়ণ নিঃসন্তান তাই তাহার অংশ পুষ্পরাক্ষকে দিয়া বারাণসী বাস করিলেন, পুষ্পরাক্ষ পুঠিয়াতে যাইয়া ভ্রাতা নীলাম্বরের সহিত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সহসা পীতাম্বর ও পুষ্পরাক্ষের মৃত্যু হইল। বাদসাহ সনন্দ লইয়া নীলাম্বর লস্করপুর প্রাপ্ত হইলেন। নীলাম্বরই পুঠিয়ার রাজাদিগের আদিপুরুষ। পুষ্পরাক্ষের প্রাপ্ত তাহেরপুরের অংশের জন্য আবার বিবাদ উঠিল। হৃদয়নারায়ণের দেওয়ান—তেঁতুলিয়ার (১) রায়চৌধুরী—নীলাম্বরকে

(১) দিঘা—নাটোর থানার অধীন। (২) গুয়াধারা—বড়াইগ্রাম থানার অধীন। (৩) তাহেরপুর—বাঘমারা থানার অধীন।

(৪) ঝিকড়া—এখন অঙ্গলাকীর্ণ গোদাগাড়ী থানার অধীন।

(৫।৬) ভানপুর ও কোশিয়া—গোদাগাড়ী থানার অধীন।

(৭) তালন্দ—তানইর থানার অধীন।

(১) চন্দ্রকোলা—পুঠিয়া থানার অন্তর্গত ও সন্নিকট।

(১) গোদাগাড়ী থানার তেঁতুলিয়া। যেখানে ইহার বাড়ী ছিল তাহাই তেঁতুলিয়া ডাঙ্গা নামে খ্যাত।

ঐ অংশের পরিবর্ত্তে একদিক হইতে কিছু সম্পত্তি প্রদান করাইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। পুঠিয়ার রাজারা এখনও কাছিহাটা লস্করপুর বলিয়া যাহা ভোগ করেন, তাহাই ঐ সম্পত্তি।

আলি মোবারকের গৌড় রাজত্বকালে, নাসীরুদ্দীনের পুত্র বার্ব্বক বরেন্দ্র শাসন করিতেন। "সরকার বার্ব্বকাবাদ" বলিয়া বেহুখণ্ড রাজশাহীর জমিদারবর্গের সেরেস্তায় লিখিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই বার্ব্বকের শাসনচিহ্ন।

১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে হাজি ইলিয়াস সামসুদ্দীন নামে বাঙ্গালার মসনদে বসিলেন। স্বাধীনতার প্রবল বাসনা তাঁহাকে মত্ত করিয়া তুলিল। আদমশুমারিতে স্থির হইল যে মাত্র ৩৪০০০ মুসলমান বঙ্গ, বেহার ও গৌড়ে অধিষ্ঠিত। মুষ্টিমেয় মুসলমানের সহযোগে হিন্দুর দেশে স্বাধীন হওয়া নিতান্ত কঠিন বুঝিয়া সমসুদ্দীন বর্ত্তমান বাঘা পাকুড়িয়ার(২) শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর পুত্র সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ ভাদুড়ীও সাঁতৈলের (৩) শিখাই সান্যালের সহিত মিত্রতা করিলেন। জগদানন্দ রাহু-উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেওয়ান হইলেন —সুবুদ্ধি, কেশব ও শিখাই খাঁ সাহেব খেলাত পাইয়া সেনাপতি সাজিলেন, ও তাঁহাদিগের সমবেত শক্তি প্রভাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত হিন্দু সৈন্যের সৃষ্টি হইল। সামসুদ্দীন স্বয়ং হিন্দুবলে বলীয়ান হইয়া স্বাধীন হইলেন।

সুবুদ্ধি, কেশব, জগদানন্দ ও শিখাই নামমাত্র এক টাকার নজর দিয়া প্রত্যেকে একলক্ষ বিঘা জমি পাইলেন। সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ প্রভৃতি তিন ভ্রাতার আদিম ভাদুড়ীর চক্র-ভাদুড়ীয়া বা ভাদুড়িয়া বলিয়া খ্যাত। এবং এই আদিম, মুলসীদকুলি খাঁ যখন চাকলা বিভাগ করেন তখন চাকলা ভাদুড়ীয়া নাম গ্রহণ করিয়াছিল। পরে এই চাকলা ভাদুড়ীয়া, তন্মে ব্যাস, তন্মে কুণ্ডরি এবং তন্মে ভাদুড়ীয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিনটী পরগণা হয়।

উক্ত হিন্দু সভাসদবর্গের মধ্যে কেহই স্বয়ং দরবারে উপস্থিত থাকিতেন না—কেবল তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি রাখিতে হইত,—তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বাদশাহ বুদ্ধি বাহির করিতেন—তবে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে তাঁহাদিগের স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইত। এই সকল প্রতিনিধির নাম ফৌজদার। সুবুদ্ধিদিগের পক্ষে সুবুদ্ধির তৃতীয় পুত্র, দুর্গাদাস খাঁর পুত্র, মধুখাঁ ও শিখাই সান্যালের পক্ষে তাঁহার তৃতীয় পুত্র, পুরাইদের পুত্র যাদব ঠাকুর ওরফে কংসরাম গৌড় বাদসাহের ফৌজদার ছিলেন। শিখাই সান্যালই সান্যাল রাজবংশের আদিপুরুষ।

সুবর্ণ গ্রামের ব্রজগোপিনী নাম্নী এক ব্রাহ্মণবিধবা অপহৃতা হইয়া গৌড় বাদসাহের কুলবতী বেগম হইয়াছিলেন। সামসুদ্দীন, মৃত্যুকালে নূতনত্বের মোহে কুলবতীর গর্ভজাত সন্তান সয়ফুদ্দীনকে বাদশাহী প্রদান করিয়া, পূর্ব্ব পত্নীর গর্ভজাত পুত্র গিয়াসুদ্দীনের কিছু মাসহারা অবধারণ করিয়া যান।

বাদসাহ সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই বেগমের বিবাদ বাঁধিল। কুলবতী পুত্রের অক্ষমতার কথা চিন্তা করিয়া, সেনাপতি জুনাখাঁকে তৃতীয় পতিত্বে বরণ করিয়া মধুখাঁ ও কংসরামের যুগ্ম মন্ত্রণায় গিয়াসুদ্দীনকে বধ করতঃ তাহার পত্নী ও আপন

(২) বাঘা পাকুড়িয়া—পাবনা জেলায়। (৩) সাঁতৈল—বড়াই গ্রাম থানার অন্তর্গত।

স্বপত্নীকে পাণ্ডুয়ার বাজারে পণ্যে পরিণত করিলেন। শিশু ময়জদ্দীন মাতৃগৌরবে গৌড়-তক্তে বসিলেন।

গৌড় সিংহাসনে বিশ্বস্ততার সহায় লইয়া কংসরায় হিন্দু রাজত্বের স্বপ্ন দেখিলেন। ঘাতকের গুপ্ত অসিতে প্রবল সেনাপতি জুনাখাঁ মর্ত্ত ছাড়িলেন—কংস পুত্র জনার্দ্দন পিতৃনির্দ্দেশে পাঠান সর্দ্দারবর্গকে অপসারিত করিলেন—কংস স্বয়ং ব্রাহ্মণকুমারী কুলবতীকে আপন হৃদয়তোষিণী করিয়া চতুর্থ পতিত্বের ডোর বাঁধিলেন। গৌড়সিংহাসনে হিন্দু রাজার স্থান হইল। কংস ময়জদ্দীনের অভিভাবক হইয়া সিংহাসনের পাশে বসিলেন।

সাঁতৈলের কংসের গৌড় শাসনকালে—মগেরা আরাকান রাজকে বিতাড়িত করিলে—রাজা কংসের সাহায্য প্রার্থী হন। ত্রি সহস্র সৈন্যসহ কংসপুত্র জনার্দ্দন, আরাকান হইতে মগ বিধ্বস্ত করিয়া আরাকান রাজকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে আরাকানরাজ জনার্দ্দনকে বজ্রবাহু উপাধি দিলেন, কংসরায় দিলেন শক্রজ এবং পাটনার নবাবি।

কংস, সুবুদ্ধি খাঁদিগের ভাতুড়ীয়া দখল করিয়া তাহাদিগকে নিষ্পেষ করিলেন। ময়জদ্দীন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেকন্দর নাম গ্রহণ করিয়া স্বয়ং শাসনভার লইয়া দেখিলেন—কংস বলে তাহার সিংহাসন টলায়মান; কংস নিহত হইল—ময়জদ্দীন সাঁতৈল ধ্বংসে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু মাতা ও মধুর্বার অনুরোধে সাঁতোল রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া বার্ষিক ১৪০০ শত টাকা কর ধার্য্য করতঃ কংসের পুত্র গণেশ, কার্ত্তিক ও রূপবন্ত্রকে প্রদান করিলেন; সাঁতৈলের খাঁসাহেব উপাধি নষ্ট হইল—সাঁতৈল রাজ কেবল মাত্র ভূঁইয়া হইয়া গেলেন।

কংসের মৃত্যু পর, মধুর্বা ময়জদ্দীন বা সেকন্দর সাহার দক্ষিণ হস্ত হইলেন। তাহার কার্য্যে তুষ্ট হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে সোনাবাজু, প্রতাপবাজু ও বড়বাজু আদি ৪টী পরগণায় জমীদারী প্রদান করিয়া তদীয় আত্মীয় স্বজনকে সরকারের কর্ম্মচারীরূপে নিয়োজিত করিলেন।

জনার্দ্দন, পিতার নিধনে সাঁতোলের রাজ্য লোপ ও উপাধি লোপে ক্ষুব্ধ হইয়া, সসৈন্যে গৌড় আক্রমণ করিলেন—সেকন্দরও ভীত হইয়া পড়িলেন, পুত্রের বিপদে কুলবতী মধুর্বাকে পঞ্চম পতিত্বে বরণ করিয়া তদ্দ্বারা জনার্দ্দনকে নিহত করেন।

কংসের পুত্র গণেশ "দিল্লীশ্বরং বশীকৃত্য ব্রহ্মোভস্ত প্রিয়োভবেৎ" ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল হইয়া গৌড় বাদশাহ সামসুদ্দীন দ্বিতীয়কে বধ করিয়া লক্ষরপুর তাহেরপুর ব্যতীত পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত সমস্ত গৌড়মণ্ডলীতে অধিকার বিস্তার করতঃ আপন অধিকারভুক্ত করেন (১)। পাণ্ডুয়া রাজধানী বিশেষভাবে সজ্জিত হইল। তিনি দ্বারবাসিগণের জন্য বৃহৎ দ্বারাবতী পুরী (বর্ত্তমান দ্বারিয়াপুর) নির্ম্মাণ করতঃ তাহার দ্বারে দ্বারবাসীনী ভদ্রকালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও মালদহবাসিগণ সেই মূর্ত্তি পূজা করেন।

(১) গণেশের অধিকৃত স্থান—সমস্ত ভাতুড়ীয়া, গোবিন্দপুর, আমরুল, ইসবসাহী, প্রতাপ বাজু, উজীরপুর, সারেস্তানাবাদ, সারেস্তানগর, রামপুর, শাসিবাবাদ, ইসলামপুর, গঙ্গাপথ, আজমনগর, বুপদি, কাটার মহল, গুড়িয়ানি, গঙ্গারামপুর, হিন্দাবাজ, সাহাজাদপুর, দিখা, মেহেমনসাহী, বাজরাম ও মহাম্মদপুর, ওগয়রহ পরগণার স্থান।

Stewart সাহেব এই গণেশকেই Kanis, the Zamindar of Bhaturiaবলেন। কাহারও মতে সেই গণেশই দিনাজপুরের রাজা গণেশ। কিন্তু এই গণেশ যে দিনাজপুরস্থ নহে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়; কারণ ভাতুড়ীয়া দিনাজপুরে নহে ইহা সাঁতোল রাজার রাজ্য ছিল। দিনাজপুর, এই গণেশের সময়েই উদ্ভূত হয়।

গণেশের গৌড়শাসনকালে তাঁহার সামন্ত এক বারেন্দ্র কায়স্থ রাজা অজবল উত্তর বরেন্দ্রে বর্দ্ধন কুঠীতে রাজত্ব করিতেন। হরিরাম ঘোষ নামে এক উত্তররাঢ়ী কায়স্থ তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। অজবল অপুত্রক হওয়ায় কাশীবাসী হইতে মনস্থ করিয়া আপন রাজ্য হরিরামকে দান করিয়া যান। বহুদিন পর ঈশ্বরানুগ্রহে কাশীধামে অজবলের একটী পুত্র জন্মে। হরিরাম, এই সংবাদ পাইয়া, প্রভুকে রাজ্য পুনঃগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। অজবল স্বীকৃত হইলেন না। পুত্রটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, হরিরাম অজবলের অনুমত্যানুসারে ঐ সম্পত্তির নয় আনা তাঁহাকে প্রদান করতঃ বর্দ্ধনকুঠীর রাজাসনে স্থাপন করেন। রাজা গণেশরাম অজবলের পুত্রকে লইয়া গিয়া "দীনরাজ" উপাধী প্রদান করতঃ তাঁহার উপপত্নীসুতার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে আরও কিছু ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। "দীনরাজের" নামানুসারে তদীয় আবাসস্থান "দীনাজপুর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

গণেশের পুত্র যদুরাম—মল্লযুদ্ধে পারদর্শী বলিয়া তিনি যদুমল্ল বা যেদমল নামে কথিত। গণেশের জীবিতাবস্থাতেই, যদু আজিম সাহেবের কন্যা আস্‌মানতারাকে বিবাহ করতঃ ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে গণেশ কবরস্থায়ী হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যদু জালালুদ্দীন হইয়া পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাহার পর, তদীয় পুত্র আহম্মদ সাহ রাজা হন; কিন্তু গৌড়তক্তে সাঁতোলের প্রতিপত্তি তাঁহার সহিতই (১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে) শেষ হইল।

তৎপর ফিরোজ সাহ আসিলেন। ফিরোজ সাহ দীনরাজের কার্য্যতৎপরতায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পেস্কারী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে বল্লালের স্থাপিত সামন্ত রাজ্যের অধস্তন ৮ম পুরুষে রাজা অচ্যুত কোন কমলাপুরীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী বর্ত্তমান বগুড়া জেলায়, ভবানীমাতার বাড়ীর উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। এখনও কমলাপুরী রাজধানী ও দুর্গের চিহ্নাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কমলাপুরী রাজ্যটী করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর হইতে আত্রেয়ী নদীর পূর্ব্ব তীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। রাজা অচ্যুতের কন্যা ভদ্রাবতী অধুনা দুর্ভাগিনী বঙ্গবালবিধবার বিশেষণরূপে পরিণত। ঐ ভদ্রাবতির মেয়ে দ্বারা অধুনা বঙ্গপ্রাঙ্গণ পূর্ণ। বিজয়বাহু, অচ্যুতের জনৈক বৃদ্ধমন্ত্রীর দৌহিত্র ভদ্রাবতীর লোভ করায় হতভাগা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। ঘৃণা ও ক্ষোভে বিজয় ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কামলা খাঁ হইয়া ফিরোজ পুত্র উচ্ছৃঙ্খল আহম্মদের শরণ লইল। আহম্মদ ভদ্রাবতীকে যাচিলেন, অচ্যুত অস্বীকার করিলে, মুসলমান কমলাপুরী আক্রমণ করিল। আত্রেয়ী-তীরে অচ্যুত সেনাপতি প্রতাপের বিক্রমে মুসলমানের রক্ত বহিল।

পিতার মৃত্যুতে আহম্মদ রাজা হইলেন। কামলাখাঁর উত্তেজনায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আহম্মদ আবার কমলাপুরী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। আবার আত্রেয়ী-তীরে রণধামা

বাহির। হিন্দুর শোণিতে সরিৎ সলিল রক্তমিত হইয়া গেল—রাজকুমারী ভদ্রাবতী শিশুস্বামীকে (১) সাজাইয়া রণযজ্ঞে আহুতি দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে করতোয়া তীরে চিতার সারি জ্বলিয়া উঠিল—সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যে হিন্দু ললনাগণসহ প্রবেশ করিলেন। এই হইতে কমলাপুরী রাজ্য গৌড় বাদসার খাসে গেল। আহম্মদ এই রাজ্যসহ সমস্ত উত্তর বরেন্দ্রের শাসন দীনরামার হস্তে প্রদান করিলেন। (২)

আলাউদ্দীন হোসেন সাহ, সাঁতোল রাজ কংসের ভ্রাতুষ্পুত্র সীতানাথ ও লালৌয়ের নরনারায়ণ চৌধুরীর সাহায্যে ও কৌশলে যশু গুলতানকে নিহত করিয়া, গৌড় সিংহাসনে বসিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সীতানাথ সমগ্র ভাতুড়ীয়ার ভূঁইয়া হইলেন ও নরনারায়ণ চৌধুরী ভগানগর পরগণা জাইগীর পাইলেন।

সীতানাথ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় সম্পত্তির শাসন-সংরক্ষণের ভার কনিষ্ঠ রামেশ্বরের হাতে পড়িল। সুবিস্তৃত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া রামেশ্বর দুর্ব্বৃত্ত হইলেন। তাঁহার পাপে সাঁতৈল রাজবংশ পঞ্চ-মহাপাপযুক্ত হইয়া পড়িল। উহার দুর্ব্বৃত্ততার বলে তিনি আপন কন্যার সহিত বলপূর্ব্বক পুঠিয়ার রাজা রামচন্দ্র ঠাকুরের বিবাহ দেন ও সমাজে আবদ্ধ হইয়া কতকগুলি কুলীন শ্রোত্রীয় লইয়া নূতন সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাহার চিহ্নস্বরূপ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে পাঁচুড়িয়াদোষগ্রস্ত অনেক লোক ও রামেশ্বরী পটী বলিয়া এক সম্প্রদায় কুলীন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁচুড়িয়াদোষযুক্ত ব্রাহ্মণ ও রামেশ্বরী পটীর কুলীনদিগের আচার ব্যবহার, সাধারণ বারেন্দ্র সমাজের ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহারের সহিত এখনও কিছু কিছু প্রার্থক্য রহিয়াছে।

রামেশ্বরের পরলোকান্তে, তাঁহার হস্তক-পুত্র রামকৃষ্ণ রায় সাঁতোলের রাজা হইলেন। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দগিরির অনুরোধে জগৎরাম নামক জনৈক বাণিজ্য-ব্যবসায়ীকে বার্ষিকপুর প্রদান করেন। জগৎরামের বংশধরেরাই আধুনিক দুবলহাটীর রাজা, শৈলগাছি ও কুলবাগিচার জমিদারগণ।

রামকৃষ্ণ তেমরায় রায়বংশের সর্ব্বানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভবানী নামে সর্ব্বানীর এক কনিষ্ঠ ভগিনী ছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকেও বিবাহ করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু সাঁতোল রাজপণ্ডিত জয়দেব রাজাকে বঞ্চনা করিয়া ভবানীকে বিবাহ করতঃ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন। ভাবনায় রামকৃষ্ণের রাজকার্য্যে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দেওয়ান হরিপুরের রামদেব চৌধুরী এ সুযোগে আপন সৌভাগ্য বর্দ্ধিত করিলেন। ক্রমে রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল।

নাটোরের রাইবাঁইয়া রঘুনন্দন রায় সর্ব্বানীর আপরা একটী ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি সাঁতোলের অবস্থা দেখিয়া, রামদেব দেওয়ানকে জানাইলেন—রামকৃষ্ণ বাকী রাজস্ব পরিশোধ না করিলে, তিনি পরিশোধ করিয়া দিয়া নবাব সরকারে আপন নামে পত্তন করাইয়া লইবেন। রাম-

(১) রাজা অল্পবয়স্ক ভদ্রাবতীর একটী শিশুর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। লোকে ভদ্রাবতীকে "ছেলে ভাতারী" বলিত।

(২) কমলাপুরী রাজ্য—বড়বাজু, নওগাঁ, নিয়াদিঘু পরগণা ভাতুড়ীয়ার উত্তরস্থিত স্থান সমূহ।

কৃষ্ণ দেওয়ান মুখে এই বার্ত্তা পাইয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইলেন, ভবানীর ভাবনা ও রাজ্য ভাবনা যুগপৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বসিল—ক্রমে উৎকট ব্যাধি আসিয়া দেখা-দিল রাজা ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিধামে চলিয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণের পরলোকান্তে তৎপত্নী রাণীসর্ব্বাণী দেওয়ান রামদেবের সাহায্যে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য সংরক্ষণ করেন; কিন্তু বাকী রাজস্ব সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হইল না। ওদিকে নবাব মুরসিদ্‌কুলির উপদ্রব বাড়িল, সেনা-পতি রেজা খাঁ মধ্যে মধ্যে সাঁতোলে আসিয়া উপদ্রব করিতে লাগিলেন, অপমানে ও ঘৃণায় রাণী সর্ব্বাণী আত্মহত্যা করিলেন।

রাণী সর্ব্বাণীর মৃত্যুর পর, রামকৃষ্ণের পিতৃব্য পুত্র বলরাম চৌধুরী দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেবের নিকট সাঁতোল রাজ্য বার্ষিক ২৫০২৪৩ টাকা রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া লন। সম্রাটের মৎলব ছিল, এই টাকাদ্বারা বঙ্গের সমস্ত কর্ম্মচারীর বেতন নির্ব্বাহ করিবেন, মুরসিদকুলিও এই আদেশ পাইলেন। আরঙ্গজেবের মৃত্যুতে বাহাদুর সাহ ভারতসম্রাটের আসনে উপবেশন করি-লেন। এই সময় বঙ্গের সুবেদার জানাইলেন—বলরাম চৌধুরী বৃদ্ধ, অন্ধ ও বধির। তাঁহার রাজ্য দেখিবার শক্তি নাই। তাঁহার রাজ্যমধ্যে লুঠ আরম্ভ হইয়াছে—রাজস্ব বাকী পড়াতে কর্ম্মচারীবর্গ বেতন পাইতেছেন না ও সেজন্য বঙ্গের কাজকর্ম্মও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিতেছে না—সাঁতোল খাসে লওয়া হউক।

তাই ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে সাঁতোল রাজ্য খাসে আনিবার জন্য নবাব মুরসিদকুলি খাঁ সেনা-পতি মহাম্মদ রেজাখাঁকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। সাঁতোল রাজ্য আক্রান্ত হইল—রাজার বিপদের সুযোগ লইয়া রামদেব রাজ-কোষের গুপ্তধন, মঙ্গলচণ্ডী, লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহসহ হরিপুরে প্রয়াণ করিলেন।

রাজা বলরামের সেনাপতি, কেউটের বেণী রায়ের দৌহিত্র যুগলকিশোর সান্যাল অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া ৭ দিন যুদ্ধের পর পরাজিত হইলেন। রেজাখাঁ রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করিলেন ও বলরামের সাঁতোল রাজ্য বেদখল হইয়া গেল। এই যুদ্ধে এত লোক নিহত হইল যে, সাঁতোল নগরী বিধবা দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। তাই এখনও লোকে সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের নাম "ভাতার মারির মাঠ" বলিয়া থাকে।

বলরাম হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, দেওয়ান রাম-দেবের পরামর্শে, রাণী সর্ব্বাণীর অপরা ভগিনী শিবানীর পুত্র নানৌরের রামনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে সাঁতোল রাজ্যের অর্দ্ধেক লিখিয়াদেন (১)। রামদেব এই বুঝাইলেন যে, নানৌরের চৌধুরীদিগের সহিত রাইরাঁইয়া রঘুনন্দনের বিশেষ আত্মীয়তা আছে। তাঁহারা গিয়া তাঁহাকে ধরিলে, তিনি অবশ্যই তাঁহাদিগের জন্য চেষ্টা করিবেন ও তাহা হইলেই সাঁতোল রাজ্যের অন্ততঃ অর্দ্ধেক তাঁহার দখল থাকিবে। কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত ঘটিল।

বাকী রাজস্বের কিছু সঙ্গে লইয়া রাম-নারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি চার ভাই মুরশি-

(১) নানৌরের চৌধুরীদিগের দখলে এখনও ভাতুড়ীয়া পরগণার ২৪ আনা মৌজা থাকা তাহাদিগের পুরাতন কাগজ দৃষ্টে দেখা যায়।

জাবাদ চলিলেন। রাইরাঁইয়া রঘুনন্দন নবাবের বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া দিলে সাঁতোল রাজ্য তাঁহাদিগের সহিতই বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াইবেন সম্মত হইলেন। কিন্তু যে টাকা বাকী থাকা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, অত টাকা রামনারায়ণ চৌধুরী-দিগের নিকট ছিল না—তাই তাঁহারা দেওয়ান রামদেব রঘুনন্দনকে অনুরোধ করিতে বলিলেন যে—রঘুনন্দন নবাবকে একটুকুন আরও অনুরোধ করেন যাহাতে অবশিষ্ট টাকার জন্য একখানি কিস্তিবন্দী লিখিয়া রাজ্য ছাড়িয়া দেন। চৌধুরীদিগের ইচ্ছা ছিল দেওয়ান রামদেবের অপহৃত অর্থের কিঞ্চিৎ আদায় করিয়া অবশিষ্ট রাজস্ব পরে পরিশোধ করিবেন।

দেওয়ান রামদেব সমস্ত বুঝিলেন—বুঝিয়া রাইরাঁইয়া রঘুনন্দনের নিকট গিয়া বলিলেন চৌধুরীগণের এমন অর্থ নাই যে বাকী রাজস্ব শোধ করিতে পারে, আপনি ঐ টাকা দিয়া সাঁতোল রাজ্য গ্রহণ করুন উহাদিগকে দুই চারি খানা মৌজা দেন। তাহাই হইল। জ্যেষ্ঠ রামজীবন দ্বারা নবাবসরকারের বাকী রাজস্ব পরিশোধ করাইয়া, রঘুনন্দন, সাঁতোল রাজ্যটী নবাব সেরেস্তায় তাঁহার নামে পত্তন করাইয়া দিলেন। এবং রামনারায়ণ চৌধুরী দিগকেও দুই চারি খানা মৌজা দেওয়াই-লেন। (১) তাই এখনও বলে "কান কথায় চৌধুরীদিগের ভাতুড়ীয়া নষ্ট।"

এই হইতেই সাঁতোল রাজের রাজ্য ধ্বংস হইয়া নাটোরের রাজার অধিকারভুক্ত হইল। *

শ্রীনৃত্যগোপাল রায়

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়

(১৫১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

শিশুদের ক্ষয়ব্যাধি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

আমরা যখন শিশুদের কথা বলছিলাম তখন খুব একটা দরকারী কথা বলতে ভুল হয়েছিল। ইউরোপে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে শিশু-দের দুধ খাওয়া থেকেই ক্ষয়ের উৎপত্তি হয়। উহা প্রায়ই গো-জাতীয় জীবাণুদ্বারা সৃষ্ট হয়। পেটের ভিতরকার বীচি ও গলার চতুষ্পার্শ্ব বীচিগুলি আক্রমণ করে। শিরা ও হাড় প্রভৃতির ক্ষয়ও এই জাতীয় জীবাণু দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই বলে শিশুদিগের মধ্যে যক্ষ্মাও বিরল নহে —অনেকেরই বিশ্বাস যে গো-জাতীয় জীবাণু দুধের সহিত খাদ্যপথে প্রবেশ করে এবং অভ্যন্তরে অবস্থান্তর ঘটায় এবং উহা মনুষ্য-জাতীয়তে পরিবর্ত্তিত হইয়া ফুস্‌ফুসকে আক্রমণ করিয়া যক্ষ্মা উৎপন্ন করে।

(১) নাটোরের চৌধুরীদিগের ঘরে এই দলিল এখনও রহিয়াছে।

* প্রবন্ধটী উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত হইবে বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু একথা একবারও ভেবে দেখা হয় না যে ছেলে পিলেরা সর্ব্বদাই মাটীতে হামাগুড়ি দিচ্ছে—গড়াগড়ি যাচ্ছে—আর এই মাটীতেই থুতুর সহিত পরিত্যক্ত জীবাণু শুকাইয়া ধূলিরূপে পরিণত হয়ে আছে। ছেলেদের স্বভাবই এই যে তারা হাতের সামনে যে জিনিষই পাক না কেন তাই মুখে তুলে দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দুধ ভিন্নও তাহারা এইরূপে একেবারে মনুষ্যজাতীয় জীবাণু গলাধঃকরণ করতে পারে। শিশুদের পাকস্থলীর রসের অম্লতা বয়স্কগণের চেয়ে ঢের কম সুতরাং উহার ভিতর ক্ষয় জীবাণু বর্দ্ধিত হবার বেশ সুযোগ পায় এবং এখান হতে পেটের ভিতর দিয়ে যেয়ে অবশেষে ফুস্‌ফুস অবধি যেতে পারে।

এবং এই একই কারণে ইহাও অধিক সম্ভব যে শিশুরা শ্বাসের সঙ্গে ধূলির সহিত ক্ষয়জীবাণু গ্রহণ করে এবং উহা সোজা শ্বাসপথে যেয়ে ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মা সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশের শিশুরা প্রায় সকলেই ফুটান (Boiled) দুধ খায় সুতরাং দুধের সহিত এদেশের শিশুদের মধ্যে ক্ষয়বীজ প্রবেশ করা তত সম্ভব নহে। জাপান ও চীনের লোকেরা দুধ একরূপ খায় না বল্‌লেই হয় কিন্তু তথায়ও শিশুদের মধ্যে এ ব্যাধির অভাব নাই।

যদিও আমাদের দেশে ছেলেদের গ্রন্থি-জাতীয় (glandular) ক্ষয় ব্যাধি তত না থাকুক তবে যক্ষ্মা একান্ত বিরল নয় উহা একমাত্র উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ব্যাধিগ্রস্ত মাতার স্তনপান সন্তানের উচিত কি না ?

আর একটী কথাও এই স্থানে উল্লেখ করিলে ভাল হয়। আমাদিগের দেশে শিশুদিগের মাতৃস্তন্যই প্রধান আহার্য্য। মাতার যদি যক্ষ্মা থাকে তবে উহার স্তনপানজনিত সন্তানেরও যক্ষ্মা হইতে পারে। এবিষয়ে এদেশে প্রায়ই সতর্কতা লওয়া হয় না। মাতার যক্ষ্মা থাকিলে সন্তানকে কোন ক্রমেই স্তনদান করিতে দেওয়া উচিত নহে। ইহাতে কেবল যে সন্তানের অনিষ্ট হয় তাহা নহে মাতারও অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। এই সব অবস্থায় দুধ খাইতে দিলে মাতা ক্রমেই হীনবল হইতে থাকেন ও ব্যাধির আক্রমণও বৃদ্ধি হয়।

অন্যান্য স্থানের ব্যাধি

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল ফুস্‌ফুসের ব্যাধি সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। হাত, গাঁট প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের ক্ষয় যে কিরূপে উৎপাদিত হয় সে সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। এ সম্বন্ধে সকল কথা আমরা জানিও না। প্রায়শই নিকটস্থ কোন ক্ষতমুখে ক্ষয়বীজ প্রবেশ লাভ করে এবং গাঁট প্রভৃতি আক্রমণ করে। ঐ ক্ষতগুলি সময় সময় এত সূক্ষ্ম থাকে যে আমরা উহার অস্তিত্বই উপলব্ধি করিতে পারি না—চোখে দেখা ত দূরের কথা। অথবা এমনও হতে পারে ক্ষয়বীজ ক্ষতমুখে কোন রক্তবাহী নাড়ীর (Blood vessels) ভিতর প্রবেশ লাভ করতে পারে এবং যেখানে কোনও দুর্ব্বল অঙ্গ পায় সেই স্থান আক্রমণ করে। মনে করুন একজনের হাঁটুতে আঘাত লেগে হাঁটুটা কমজোরী হয়ে আছে এমন সময় যদি যে শিরায় উহার রক্ত যোগায় তার মধ্যে কোনক্রমে ক্ষয়বীজ প্রবেশলাভ করতে পারে তবে সহজেই উক্ত হাঁটু আক্রমিত হতে পারে।

রসবাহী শিরা (Lymphatics) যোগেও এইরূপ আক্রমণ হতে পারে।

ব্যাধি আবার এইরূপে স্থানীয় আক্রমণ হতে সাধারণভাবে সমস্ত শরীরেও সংক্রমিত হতে পারে।

ব্যাধি নিবারণের উপায়

আমরা যদি এখন কতকগুলি বিষয় ভাল করে বুঝতে পারি তবে এ ব্যাধি নিবারণ করতে আমাদের বিশেষ কোন বেগ পেতে হবে না।

আমরা বুঝতে পেরেছি যে ক্ষয়জীবাণু ব্যতীত কখনও ক্ষয় উৎপাদিত হতে পারে না। আর এই ক্ষয়জীবাণু হয় থুথু না হয় দুধ না হয় মাংসের সহিত এসে আমাদিগকে আক্রমণ করে। ক্ষয়জীবাণু দেহে প্রবেশ করলেই যে আমরা ক্ষয়গ্রস্ত হব এমন কোন কথা নাই। আমাদের কোন অপকারে আসতে হলে উহাদের অনেকটির প্রয়োজন, হঠাৎ দু একটা এসে বড় কিছু একটা করতে পারে না। কিন্তু উহারা কখন আসে কখন বা না আসে তা জানবার ত সহজ কোন উপায় নাই। আমরা যাতে ক্ষয়বীজ হতে দূরে থাকতে পারি সর্ব্বদা সেই চেষ্টাই দেখা উচিত। আমাদের স্বাস্থ্য যখন সম্পূর্ণ ভাল থাকে, আমরা যখন বিশেষ সবল থাকি তখন হয়ত উহাদের ছোট খাট দল আমাদের দেহে প্রবেশ করে ও আমাদের কিছু করতে পারে না। কিন্তু যদি কোনও কারণে অসুস্থ হইয়া পড়ি, দেহের সাধারণ—আত্মরক্ষার শক্তি যদি কমে যায়, তবে হয়ত অল্পসংখ্যক শত্রু দ্বারাই নিষ্পেষিত হতে পারি। সুতরাং আমাদের অসুস্থতার সময় আমরা যাহাতে এই সব ক্ষয়রোগীর বা ক্ষয়জীবাণুর সংস্পর্শে না আসি তাহার জন্য বিশেষ সাবধানতা লওয়া আবশ্যক। দুধকে আমরা কিছুকালের জন্য ফুটাইয়া লইলেই উহার দোষ দূর হয়। তবে উহা যে সব স্থান হইতে সরবরাহ করা হয় এবং বাজারের যে সব স্থানে উহার বিক্রী হয় সে সকল জায়গা একজন স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টার দ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। মাংস সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। উহাকে সিদ্ধ করিয়া লইয়া এবং উহা পূর্ব্বে রীতিমত পরীক্ষিত হইলে উহাতে আর দোষ থাকা সম্ভব নহে।

থুথু সম্বন্ধেই বিশেষ সাবধানতা লওয়া প্রয়োজন। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে যখনই কোন যক্ষ্মারোগী কাসে, হাঁচে বা কথা কহে, তাহার চতুর্দ্দিকে থুথু সূক্ষ্মাকারে নিক্ষিপ্ত হয় ও তাহা ক্ষয়জীবাণুপূর্ণ। সুতরাং কোন যক্ষ্মারোগীর নিকট যাইতে হইলে এ বিষয়ে সাবধানতা লওয়া একান্ত আবশ্যক। যেহেতু ঐ সব জীবাণু শ্বাসপথে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করলেই যক্ষ্মা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অবশ্য যক্ষ্মা রোগীর নিকট গেলেই বা দু চারিটি যক্ষ্মাজীবাণু দেহে প্রবেশ করলেই যে যক্ষ্মায় আক্রমণ করবে এমন কোন কথা নাই তবে আশঙ্কা ত আছে? প্রতিবার কতটি জীবাণু দেহে প্রবেশ কচ্ছে তাত আমরা দেখতে পাই না? তবে সাবধানতা নিতে দোষ কি? এইরূপে একবারে না হয় দুবারে জীবাণু যদি ক্রমাগতই শরীরে ঢুকতে থাকে তবে উহার আক্রমণ হতে কতক্ষণ? সদ্য সদ্য ফল ফলে না বলেই কি এত অসাবধানতা? এ সম্বন্ধে লোকে এতই অসাবধান যে তা বলতে পারি না। তারা একত্রে বসে খাকবে, গল্পগুজব করবে, এক সঙ্গে খাবে, এক সঙ্গে বেড়াবে, এমন কি এক সঙ্গে পর্য্যন্ত শোবে। উহা যে কতদূর অন্যায় এবং কতদূর অর্ব্বাচীনের কাজ তা আমি বলতে পারি না। এই অসাবধানতা কেবল

যে অজ্ঞানতার দরুণ তাহাও নহে কারণ যাহাদিগকে এ সম্বন্ধে সবিশেষ বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে ইহা হইতে কত বিপদ আসিতে পারে—তা সত্ত্বেও তারা বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয় না। এ দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে এত গভীরভাবে বদ্ধমূল যে হাজার চেষ্টা করেও ইহা দূর করা যাচ্ছে না। ইহা কি কম পরিতাপের কথা!

যক্ষ্মারোগী যদি অসাবধান হয়ে যেখানে সেখানে থুথু ফেলে তার মত আপদ আর নাই। এ থেকে এ রোগ যত বিস্তৃত হতে পারে এরূপ আর কিছু থেকে নয়। থুথুগুলি আস্তে আস্তে শুকাতে থাকে এবং ধূলি বালু দ্বারা আবৃত হয়ে সূক্ষ্মকণাকারে যেখানে সেখানে বায়ু দ্বারা নীত হয়। অন্ধকার স্থানে নীত হলে ত কথাই নাই, সেখানে যে কতদিনের মত পীঠ স্থাপন হল সে কথা কেউ বলতে পারে না। আমরা ইচ্ছা করলে যক্ষ্মা রোগীর কাছে না যেতে পারি আর যদিই বা যাই তাহলেও খুব নিকটে না গেলে তেমন একটা আক্রমণের ভয় থাকে না। কিন্তু ধূলির সঙ্গে মিশে ক্ষয়বীজ কোথায় কোন স্থানে থাকে তাত আমরা জানতে পারি না। কাজেই এই ভাবে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। সুতরাং যেখানে সেখানে যক্ষ্মা রোগীর থুথু ফেলা যে সাধারণের পক্ষে একান্ত বিপদজনক একথাটি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত এবং উহা যাহাতে নিবারিত হয় সে সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য।

কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্রে থুথু ফেলাই ভাল, উহার ভিতর যদি কোন পচননিবারক লোসন্ (Antiseptic Lotion) থাকে তবে আরও ভাল হয়—একান্ত পক্ষে জল থাকিলেও চলে। কারণ যে পর্য্যন্ত থুথু না শুকাইবে সে পর্য্যন্ত তত ভয়ের কারণ নাই। উহা শেষে আগুনে ঢালিয়া পোড়াইয়া দিলেই শত্রু নির্ম্মূল হয়, একান্তপক্ষে ড্রেইনে ফেলিয়া দেওয়া উচিত। কোন কোন রোগী রুমালে থুথু ফেলেন—যদিও যেখানে সেখানে ফেলার চেয়ে উহা ভাল কিন্তু উহাও কর্ত্তব্য নয়।

কারণ রুমাল থেকে জীবাণুগুলি পকেটে লেগে থাকতে পারে, হাতে, জামায় এবং অন্যান্য স্থানেও লাগতে পারে। আর প্রত্যেকবার একখানি রুমাল পোড়াইয়া ফেলাও বড় একটা সহজ কথা নহে। তবে আজকাল খুব সস্তা একরূপ জাপানী কাগজের রুমাল পাওয়া যায়--উহা প্রত্যেকবার নূতন ব্যবহার করা যায় সত্য তবে উহা রাখিবার জন্য একটা আধার থাকা প্রয়োজনীয়। একটী থলে কি ব্যাগ। রাস্তায় রুমাল ব্যবহার করার পরই উহার ভিতর রাখিয়া দেওয়া যায় এবং বাড়ী ফিরিয়া রুমালগুলি পোড়াইয়া ফেলা যায়। এই থলে বা ব্যাগ এমন জিনিষের দ্বারা তৈয়ারী হওয়া কর্ত্তব্য যাহা পচননিবারক ঔষধাদি দ্বারা শোধন করিয়া লওয়া চলে।

রাস্তায় বেড়াবার সময় সঙ্গে নেবার জন্য বেশ সুবিধাজনক পাত্র আজকাল বাজারে পাওয়া যায়,—যেমন ডেট্‌ভিলারের (Dettveiler's pocket flask) পকেট ফ্লাস্ক। ইহার মধ্যে থুথু সহজেই ত্যাগ করা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

মফঃস্বলের বাণী

১। পল্লীবেদনা

আজকাল অনেক সাময়িক পত্রেই পল্লী-গ্রামের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে ইহা একটী সুলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহিবেন; কিন্তু আমাদের মনে তাদৃশ কোনও আশার সঞ্চার হইতেছে না। আমরা এরূপ অনেক জল্পনা কল্পনা দেখিয়াছি কিন্তু কোথাও যে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে এমন বোধ হয় না।

ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের লিখিবার ও বক্তৃতা করিবার শক্তির যে পরিমাণে অনুশীলন ও উন্নতিসাধন হইয়াছে, আমাদের কার্য্য করিবার শক্তি ও যে ঠিক সেই পরিমাণেই হ্রাস পাইয়াছে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। "মুখেন মারিতং জগৎ" এই প্রবাদ বাক্যটী শিক্ষাভিমানী আধুনিক বাঙ্গালী বাবুদের প্রতি যতটা প্রযুজ্য, পৃথিবীর আর কোনও জাতির প্রতি ততটা প্রযুজ্য নহে।

প্রকৃত আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার অভাবই যে এই সমস্ত বিফলতার মুখ্য কারণ তাহা বোধ হয় কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আমাদের তথা-কথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত বাবুরা নাম কিনিবার জন্য যতটা ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন, প্রকৃত কার্য্য সম্পাদনে তাহার শতাংশের একাংশও দেখান কি না সন্দেহ। শুধু তাহাই নয়, অনেকে আবার এই গোলেমালে হরিবোল দিয়া নিজেও বেশ "দু'পয়সা" করিবার তালে থাকেন। ইহাকে আর যাহাই বল না কেন, পবিত্র স্বদেশপ্রেমিকতা বলিও না। এতদ্দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইলেও দেশের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না ইহা নিশ্চয়।

তাই বলিতেছি যদি পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধনই কাহারও প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তবে সহরে বসিয়া বক্তৃতা ও উপদেশের মেকী অভিনয়ে আত্মশক্তির ক্ষয় না করিয়া অবসর মত পল্লীগ্রামে আসিয়া বসবাস কর, পল্লীর দশজনের একজন হও, জনসাধারণের অভাব ও অভিযোগ নিজের মত বিবেচনা করিয়া তৎপ্রতিকারকল্পে যত্নশীল হও। ছুটীর সময় "হোমে" বা বৃথা দেশভ্রমণে না যাইয়া সপরিবারে পল্লীগ্রামে যাও। যদি তাহাই পার তবেই পল্লীর উন্নতি সম্ভবপর। তাহা-হইলে দেখিবে, যে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য জেলাবোর্ডের দ্বারে দ্বারে পল্লীবাসীর করুণ আর্ত্তনাদ উঠিতেছে সে ব্যবস্থা অতি সহজেই সম্পন্ন হইবে, যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য রাশি রাশি কাগজ ও মণে মণে কালি কলম খরচ করি-তেছ তাহা আপনা হইতেই হইবে, যে বিলাত ফেরতের সমাজে গ্রহণের জন্য তোড়ায় তোড়ায় টাকা ঢালিয়াও কোনও কূল কিনারা পাইতেছ না সে সমস্যা অতি সহজেই সমাহিত হইবে। তাহাহইলে পল্লী-মাতার কুঞ্জকুটীর আবার আনন্দ সঙ্গীতে মুখরিত হইবে, পল্লীজননীর বিরসকৃষ্ণ বদন আবার শুভ্র হাস্যের কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; তোমাদের জ্ঞান ও বিদ্যার

বিনষ্ট করিলে পল্লীর অন্ধকার বিদূরিত হইবে। এখন এত বড় চেষ্টা করিয়াও দেশবাসীর নিকট যে সম্মান ও আদর পাইতেছ না—"নেতার" উপযুক্ত সেই সম্মান ও আদর আপনা হইতেই পাইবে।

এতদিন আমরা তোমাদের কথায় চালিত হইয়াছি, তোমাদের কথায় নির্ভর করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দেখিলাম তাহাতে কাহারও কোনও উপকার হইল না। এখন তাই তোমাদের কাছে আমরা নিবেদন করিতেছি, একটীবার তোমরা আমাদের কথা শুন, একবার মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়া আইস,—দেখ তাহাতে কিছু হয় কি না?

সুরাজ

২। বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

মহাকালের মহাভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। দারুণ দুর্ভিক্ষের জ্বালায় বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া মহা হাহাকার পড়িয়াছে। সকলেই বলিতেছে বাঁচিবার উপায় কি? উপায় একমাত্র ভগবান। বলিতে কি—সমগ্র বাঙ্গালা জুড়িয়া দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর যে করাল গ্রাস দেখা দিয়াছে, তাহা হইতে বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ও কৃষককুলকে রক্ষা করিবার জন্য আজ দেশে যথার্থ কর্ম্মী পুরুষের আবশ্যক। যাঁহার অর্থ আছে ও সামর্থ্য আছে, তিনি আজ তাহার সদ্ব্যবহার করুন—নরনারায়ণের সেবা করিয়া কৃত কৃতার্থ হউন। অনাহারের যে বিভীষিকা চতুর্দ্দিকে মরণের মহা আহ্বান জাগাইয়াছে তাহা হইতে এই নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, অর্থহীন দুঃস্থ দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য দেশের মহাপ্রাণ মহাপুরুষগণ অগ্রসর হইয়া আজ নরসেবাব্রত গ্রহণ করুন।

নচেৎ দরিদ্রের আর বাঁচিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার পল্লীভবনের যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য-আজ অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই চিরসুখী ও সদানন্দ পল্লীবাসী আজ ক্ষুধার তাড়নায়, রোগের যাতনায় কত বেদনাতুর, কত মর্ম্মক্লিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই মহানগরীর সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ইউরোপ ভূখণ্ডে যে মহাযুদ্ধ বা ধ্বংসের অভিনয় চলিতেছে, তাহা কতদিন চলিবে কে তাহা স্থির করিতে পারে? কিন্তু এই বাঙ্গালা দেশের প্রায় ঘরে ঘরে আজ যে মহা জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহার তীব্রতায় আজ আমরা অস্থির। আমাদের জীবন-সংগ্রামের উপসংহার কবে—তাহাই বা কে বলিবে? যে দেশের প্রতি ঘরে ঘরে অন্নাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে, যে দেশের প্রতি ঘরে ঘরে শিশু সকল অন্নের অভাবে, দুগ্ধের অভাবে, দিন দিন মরণের মুখে চলিয়াছে সে দেশের জীবন-সংগ্রাম সমস্যা যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর নহে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

দেশপ্রাণ কৃষককুল আজ সর্ব্বস্বান্ত। মহাজন ঋণ দান করে না, জমীদার খাজনা মাপ করে না, ক্ষুধা ও অক্ষমতার অজুহাত রক্ষা করে না। ইহাদের বাঁচিবার উপায় কি? এই হৃতসর্ব্বস্ব নিতান্ত নিরুপায় হীন প্রজাকুলের পানে চাহিয়া দেখিবার কেহ কি নাই? দেশে কত সভা সমিতি সম্মিলন বসিতেছে, চাঁদার ভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে, কিন্তু এই গরীব প্রজাকুলের জন্য একটী পয়সাও কি উঠিতেছে? সমগ্র বঙ্গ জুড়িয়া হাহাকার উঠিয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে হাহাকার, পশ্চিমবঙ্গে হাহাকার, উত্তর বঙ্গে হাহাকার। এই বাঙ্গালা দেশে অর্থশালী জমীদারের সংখ্যা কম নয়। তাঁহারা তাঁহাদের বিলাস-ভবনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুগ্ধ-ফেন-নিভ

শয্যায় বসিয়া বিলাসের স্বর্গ কল্পনা করিতেছেন। হায় বেতাব, তোমাকে লাভ করিবার জন্য এই লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ কত অর্থই না সান্ধ্য মজলিসে লুটাইয়া দিতেছেন! তাঁহাদের কর্ণরন্ধ্রে দুস্থ দেশবাসীর এ প্রাণান্তকর হাহাকার হয়ত পৌঁছায় না। যাহাদের সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল তাঁহারা উপভোগ করিতেছেন, তাহাদের মস্তকে তৈল নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, হস্তে অর্থ নাই, পেটে অন্ন নাই। হায় দরিদ্র, তুমি পৃথিবীর কেহ নও, কেহ তোমার পানে চাহিবে না।

যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত-প্রবাসী লোকগণের উপর অত্যাচার হইয়াছিল, তখন দেখিতে দেখিতে সমগ্র ভারতবর্ষে কত সভা, কত ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছিল। South African Indian League Fund বলিয়া আর্ত্তনাদ দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণকে সাহায্যের জন্য যে ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে কত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, অনেকেই হয়ত তাহার খোঁজ রাখেন না। বোধ হয় প্রায় লক্ষাধিক টাকা কেবল এই বাঙ্গালা দেশ হইতেই প্রেরিত হয়। কিন্তু এই সমগ্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে এই অনাহারে মরিবার বিষম সমস্যার দিনে সে সকল অক্লান্ত পরিশ্রম নেতৃবর্গ কোথায়? যাঁহারা কংগ্রেস মহাসভার রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা স্রোতে দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন,—এবং বক্তৃতা উপলক্ষে কত সহস্র টাকা বৃথা ব্যয় করাইয়াছেন, সেই নেতৃবর্গকে আজ আমরা এ দুর্দ্দিনে দেখিতে পাইতেছি না কেন?

বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমান সময়ে দুইটীমাত্র প্রধান শস্য,—একটী ধান্য, অপরটী পাট। গত বর্ষে অজন্মা গিয়াছে এবং যুদ্ধের কারণে পাট বুনিয়া কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। হালের গরু বেচিয়া, থালা, ঘটী, বাটী, বেচিয়া এতদিন তাহারা কোনমতে চালাইয়াছে। কিন্তু আর চলিল না। উপবাসী কৃষককুল অনেকস্থলে হালের গরু অভাবে চাষও করিতে পারে নাই। গত বৎসরের টাকা না পাইয়া মহাজনও ঋণদান করিতে পারে নাই। এইত অবস্থা! তবে কেমন করিয়া তাহারা বাঁচিবে? অধুনা দেশে দেশে চুরী ডাকাতির উপদ্রব ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা এক এক স্থান হইতে এরূপ সংবাদ পাইতেছি যে, বলিতে লজ্জা হয়, উপবাসী তস্কর গৃহস্থের সকল দ্রব্য ফেলিয়া কেবল ভাতের হাঁড়িটী চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় দেশে কি বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত। মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তানগণেরও কষ্টের মাত্রা চরম সীমায় উঠিয়াছে।

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে এই অনাহার বিভীষিকায় ধনকুবেরগণের অর্থ ও সামর্থ্য আজও যদি সেই দুর্ভেদ্য লৌহসিন্দুকে আবদ্ধ থাকে, তবে নিতান্তই বুঝিতে হইবে এদেশে আর মানুষ নাই—এদেশে প্রেতের বাসভূমি। ভাই, বাঙ্গালী যদি প্রকৃত মানুষের ন্যায় কাজ করিতে চাও,—তবে আজ কাজ করিবার দিন আসিয়াছে। আর অসার কল্পনা লইয়া বসিয়া থাকিও না। ঐ দেখ তোমাদের দ্বারে দ্বারে অনাহারক্লিষ্ট ভ্রাতৃগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের সাহায্য কর তাহাদের অন্ন দাও। তোমার যাহা সামর্থ্য তাহাই দাও। যদি একটী প্রাণও রক্ষা করিতে পার, তবেই তোমার অর্থ সামর্থ্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা। দেখিও ভাইয়ের সম্মুখে ভাই যেন অনাহারে প্রাণত্যাগ না করে। যাহার যতটুকু শক্তি, দেশের ও দশের সেবায় আজ তিনি তাহা নিযুক্ত করুন। শক্তি সামর্থ্য

সত্ত্বেও দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে যিনি নরনারায়ণের সেবায় ব্রতী না হইবেন, তাঁহাকে যে নরহত্যার নিরয় পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

৩। ব্যাধিপ্রপীড়িত পল্লীর শোচনীয় অবস্থা ও পল্লীবাসীর প্রার্থনা

দুর্ভিক্ষের হাহাকারের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি থামিতে না থামিতে চতুর্দ্দিকে মহাকালের করাল বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভেই এবার ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর যেরূপ অতুল বিক্রম পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, এখন হইতে প্রতিকারের কোন প্রকৃষ্টতর উপায় অবলম্বিত না হইলে, বঙ্গ পুরের পল্লীনিকেতনগুলি অচিরে শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইবে। একদিকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে লোক বিব্রত, অপরদিকে ওলাদেবীর ভীষণ সংহারলীলার অভিনয়ে মফঃস্বলের সর্ব্বত্র আতঙ্কের বিষাদগম্ভীর ছায়া সুপ্রকটিত। কুড়িগ্রাম মহকুমার অনেক স্থানেই কলেরায় বিস্তর লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। এক ফুলবাড়ী থানার অধীন আটীয়াবাড়ী, খড়িবাড়ী, জকারহাট, পাণিয়ালের কুঠী, চন্দ্রখানা, বরানদী প্রভৃতি ২০।২৫ খানি গ্রামে এই সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ অল্প বিস্তর বর্ত্তমান। সম্প্রতি নাওডাঙ্গার অদূরবর্ত্তী ভৈরুতলী গ্রামে কয়েক ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। শুনিলাম, এক সপ্তাহ মধ্যে উক্ত ক্ষুদ্র পল্লীখানিতে প্রায় ১৬।১৭ জন লোক এই দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। একখানি সামান্য গণ্ডগ্রামে কেবল ওলাউঠায় সাপ্তাহিক মৃত্যুসংখ্যা ১৬।১৭ জন, ইহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এক গৃহস্থের বাটীতে ৮টী লোকের মধ্যে, তিন দিনের ভিতর, ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কেবল স্থবির গৃহকর্ত্তা ও তাহার প্রৌঢ়া সহধর্ম্মিণী স্বজনবিয়োগে অচেতন প্রায় তৃণশয্যায় অবলুণ্ঠিত হইতেছেন। হতভাগ্যদিগের শোকে সান্ত্বনা বা তৃষ্ণায় একবিন্দু জলপ্রদানের লোক পর্য্যন্ত নাই। এ দেশের লোক প্রতিবেশীর বাড়ী দূরে থাকুক, নিতান্ত ঘনিষ্ট আত্মীয়ের বাটীতে কাহারও ওলাউঠা হইলে, তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব বর্জ্জন করে। ওলাউঠা পীড়িত ব্যক্তির বাটী হইতে কেহ কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে গেলে, দোকানদার তাঁহার নিকট হইতে মূল্য লইয়া সওদা দিতে অনেক সময় ইতস্ততঃ করে। লোকাভাবে মৃত ব্যক্তির সৎকার হয় না। নিকটে নদী থাকিলে, শবদেহ নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়, নতুবা গৃহপ্রাঙ্গণের অদূরে পুতিয়া রাখে। রোগীর মলমূত্র শয্যা পরিচ্ছদাদিও এইরূপে হয় নদীগর্ভে, নয় নিকটবর্ত্তী মাঠে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং পানীয় জল ও বায়ু এই প্রকারে দূষিত হইয়া বীজ ক্রমশঃ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। এ দেশের পল্লীগ্রামগুলিতে একেই চিকিৎসকের সংখ্যা নিতান্ত কম, দুই একজন হাতুড়ে চিকিৎসক যেখানে যিনি আছেন, তাঁহারা ওলাউঠার নাম শুনিলেই, "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" নীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। ফলে গ্রামে ওলাউঠা আরম্ভ হইলে, লোক একরূপ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এ দেশে এক শ্রেণীর ফকির আছে, নানারূপ দৈবানুষ্ঠানের দ্বারা ইহারা ওলাউঠা তাড়াইবার ভান করিয়া বিলক্ষণ দু পয়সা রোজগার করিয়া থাকে। নিরীহ গ্রামবাসিগণের তাহাদের উপর অটল বিশ্বাস।

গ্রামে ওলাউঠার আবির্ভাব হওয়া মাত্র প্রথমে গ্রাম রক্ষার জন্য ইহাদের ডাক পড়ে। শুনিতে পাওয়া যায়, বহুল উপার্জ্জনের আশায় ফকিরেরা অনেক সময় কলেরা রোগীর মূত্রপুরীষসংলিপ্ত বস্ত্রাদি গ্রামের কোন পুকুর বা কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রোগ বিস্তারের সহায়তা করে। ইহা সত্য হইলে, এই শ্রেণীর ফকিরদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের কঠোর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

এ দেশে কলেরায় যতলোক মারা যায়, তাহাদের অধিকাংশেরই কোনরূপ চিকিৎসা হয় না। মূর্খ জনসাধারণের অজ্ঞতার ফলেও রোগ অনেক সময় মারাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করে। কোন গ্রামে কলেরার আবির্ভাব সংবাদ পাওয়া মাত্র কর্ত্তৃপক্ষ যদ্যপি অবিলম্বে তথায় সুচিকিৎসক পাঠাইয়া পীড়া যাহাতে অধিক ব্যাপক না হইতে পারে, সুচনায় তাহার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে প্রতি বৎসর অনেক লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে। কোন স্থানে কলেরা আরম্ভ হইলে, তথাকার পানীয় জলের বিশুদ্ধতা যাহাতে রক্ষিত হয়, স্থানীয় চৌকিদার ও গ্রাম্য পঞ্চাইতগণকে তৎপ্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য করিতে হইবে। শবদেহ ও রোগীর মল মূত্র বস্ত্র পরিচ্ছদাদি যেখানে সেখানে প্রোথিত বা নিক্ষিপ্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারিগণ এ সকল বিষয়ে একটু অধিকতর মনোযোগী হইলে রোগের সংক্রামকতা অনেকটা হ্রাস হওয়ার আশা করা যায়।

আমরা শুনিয়াছিলাম, আমাদের সদাশয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর কলেরা পীড়িত স্থানে সবইন্‌স্পেক্টর, গ্রাম্য পঞ্চাইত ও দফাদারগণের যোগে কলেরা পিল বিতরণ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থানার্থ প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে কাঁচা কূপ খননের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা অন্ততঃ ফুলবাড়ী থানার এলাকার অধিবাসিগণ আজপর্য্যন্ত তাঁহার এ বদান্যতার পরিচয় পাই নাই। অবশ্য সে জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে দোষ দিতে পারি না, কারণ রঙ্গপুরের গ্রাম্য পঞ্চাইতগণ প্রায়ই অশিক্ষিত। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের ঘোষণা লিপির তাৎপর্য্য পরিগ্রহণ বা তদনুসারে স্থানীয় অবস্থা কর্ত্তৃপক্ষকে পরিজ্ঞাপনের ক্ষমতা অনেকেরই নাই। কাজেই আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই আছি। যাহা হউক, আমাদের সদাশয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা, ম্যালেরিয়া ও কলেরার সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি জনপদ ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে যাহাতে শান্ত ভাব ধারণ করে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া সাধারণের উদ্বেগ দূর করুন।

রঙ্গপুর দর্পণ

৪। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে ও অন্যান্য কারণে এদেশের পুরাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যে একটা দেশব্যাপী শৈথিল্য দেখা দিয়াছে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। সামাজিক ক্রিয়া কাণ্ডে ও আদান প্রদানে কৌলিন্যের যে গৌরব ছিল এখন আর তাহা নাই। এই শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ জাতির গৌরবেরও অনেকটা লাঘব হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে বড় একটা দেখা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই শৈথিল্যই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন। ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং প্রাচীন

ভাবাপন্ন কুলীন বৈদ্য ও কায়স্থগণ। ইংরাজী শিক্ষিত দলের মধ্যেও কেহ কেহ যে তাঁহাদের মতে সায় দেন না এমন নহে। তাঁহাদের মতে ইংরাজ জাতির অনুকরণে দেশটা রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। দেশের পদস্থ ব্যক্তিগণ ও ধনী জমিদারগণ তখনকার দিনে আপনাদের আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত উঠা বসা আহার বিহার করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। ইহাঁদের মধ্যেও ছোট বড় ছিল। কিন্তু সে কুল লইয়া অর্থ লইয়া নহে। যিনি যত বড় কুলীন ছিলেন তাঁহার আদর তত বেশী ছিল। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। এখন মান সম্মান টাকা লইয়া। কথাটি যদি সত্য হয় ইহার প্রতীকার করে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। যে দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞান ধর্ম্ম ও চরিত্রই সমাজের পূজালাভ করিয়া আসিয়াছে, যে দেশের জ্ঞানিগণ ভক্তগণ ও সাধু মহাত্মাগণ দেশের পূজা লাভ করিয়া আসিয়াছেন সে দেশে যদি ধনিগণই সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পূজালাভ করিতে থাকে তাহা হইলে দেশের জ্ঞানগৌরব ধর্ম্মগৌরব চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইবে। কিন্তু আমাদের মতে দেশের এমন দুর্দ্দশা এখনও হয় নাই এদেশে জ্ঞানিগণ কর্ম্মিগণ ও সাধুগণ সমাজের পূজালাভ করিতেছেন। দেশের ধনিগণও তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে লইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। এদেশে এই যুগেও মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা জগৎকিশোর আচার্য্য প্রভৃতি অভিজাত বংশীয় ধনিগণ জন্মিতেছেন যাঁহারা ধনী অপেক্ষা জ্ঞানীকে জ্ঞানী অপেক্ষা ধার্ম্মিককে এবং ধার্ম্মিক অপেক্ষা সাধু মহাত্মাগণকে অধিকতর সম্মান দিয়াছেন। তবে শুধু জাত্যভিমান লইয়া সমাজের পূজালাভ করিবার দিন আর নাই। সেদিন চলিয়া গিয়াছে। শত চেষ্টা করিলেও তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। জাত্যভিমানের উপর এদেশেই বহু দিন ধরিয়া যে আঘাত পড়িয়া আসিতেছে তাহার ফলে ইহা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। মুসলমান রাজত্বের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্বশেষে ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব আপন ধর্ম্মের অতুল শক্তিতে এই বর্ণভেদ প্রথার মূলোচ্ছেদের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণব সমাজে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভক্তগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানের অধিকারী। যখনই জ্ঞান ধর্ম্মের আসন ব্রাহ্মণ জাতির আভিজাত্যের উপরে উঠিল তখনই ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। মহাপ্রভু আপনার জীবনে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শিক্ষা দিলেন 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।' যদি দরিদ্র বলিয়া বঙ্গীয় সমাজে জ্ঞানিগণ, ভক্তগণ ও সাধুগণ যথোচিত ও ধর্ম্ম রূপে সমাদৃত না হন দেশের জ্ঞানহীনতা ও ধর্ম্মহীনতাই তাহার প্রধান কারণ। আমাদের কিন্তু সে বিশ্বাস নাই। আমরাও দেখিতেছি বৈষ্ণব সমাজে সাধু ভক্তগণ ইহার বাহিরে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এখনও সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তবে ধনের আবশ্যকতা সমাজে চিরদিনই থাকিবে ধনিগণও আপনাদের যোগ্য সম্মান লাভ করিবেন। বিশেষতঃ অর্থই যাহাদের পরমার্থ তাহারা ত সকল ছাড়িয়া ধনিগণের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিবে। আমাদের বিশ্বাস এক্ষণে কৃত্রিম জাতিভেদের পরিবর্ত্তে সমাজে জ্ঞানগত ও

গুণগত কৌলিন্যের সৃষ্টি হইতেছে। তাই জ্ঞানিগণ ও ধার্ম্মিকগণ দশের পূজা লাভ করিতেছেন। ভারতের জ্ঞাননিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিগণ এই উদ্দেশ্যেই ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই গূঢ় তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা। গুণগত কৌলিন্য কৃত্রিম কৌলিন্যে পরিণত হইয়া মহা অকল্যাণ সাধন করিয়াছিল। আধুনিক বর্ণভেদ প্রথা যে সকল সমাজে নাই তাহাদের মধ্যেই গুণগত কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে কারণ তাহা স্বাভাবিক এবং মানবের প্রকৃতিগত। মুসলমান সমাজে পীর ফকির ও মৌলবীগণের যে সম্মান ধনিগণ সে সম্মান পান না। চীন জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানী ও ধর্ম্মযাজকগণ সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট। ধনিগণ তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত। যে ইয়োরোপীয়গণের অন্ধ অনুকরণে আমাদের কোন কোন সম্প্রদায় অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছেন তাঁহাদের দেশেও আমরা জ্ঞানগত ধর্ম্মগত কৌলিন্যের প্রভাবই বেশী দেখিতে পাই। জ্ঞান ও চরিত্র বলে অসংখ্য লোক সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে উচ্চতম স্তরে উন্নীত হইতেছেন। কত দরিদ্র সন্তান শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক অধ্যাপক ও রাজনৈতিকের পদে উপবিষ্ট হইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরাও যদি জগতের অনুকরণে জ্ঞান ধর্ম্ম ও চরিত্রের আদর করিতে শিখি ঐশ্বর্য্যের মোহ আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না। যে দেশের জ্ঞান ও ধর্ম্ম জগতের লোককে সভ্যতার অধিকারী করিয়াছে সে দেশ আপনার জাতীয় বিশেষত্ব ভুলিয়া অর্থকেই পরমার্থ রূপে বরণ করিবে ইহাত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। মানবজীবনের সুখ শান্তি ধনে নহে, ঐশ্বর্য্যে নহে। খ্যাতি প্রতিপত্তিতেও নহে। সুখ শান্তি পাওয়া যায় একমাত্র জ্ঞানে, প্রেমে ও সাধুতায়। ভারতবাসীর প্রাণে প্রাণে এই বিশ্বাস জাগিয়া আছে। ঋষিগণের নিঃস্বার্থ নরহিতৈষণা চিরদিন ভারতবাসীকে কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিবে। তাঁহাদের অক্ষুরন্ত পুণ্যালোকে আকুমারী হিমাচল সমগ্র ভারত উদ্ভাসিত থাকিবে। আজ নানা উপায়ে সমগ্র পৃথিবী এক মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। কোন দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এই যুগে আর সম্ভব হইবে না। যাহা কৃত্রিম, যাহা সঙ্কীর্ণ, যাহা চিরন্তন ও সর্ব্বব্যাপী নহে তাহার আর রক্ষা করা যাইবে না। সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। যাহা চিরন্তন যাহা বিশ্বজনীন তাহাই গড়িয়া উঠিবে। যে গুণগত শ্রেণীবিভাগ বিশ্ব মানবের হিতসাধনের অনুকূল তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বরস্রোতা জাহ্নবী আজ সাগর সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত, তাহাকে পুনরায় হিমাদ্রির পদপ্রান্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করে এমন শক্তি কাহারও নাই।

রত্নাকর

৫। তুলসীর গুণ

আয়ুর্ব্বেদ বলেন—ইহা কফ নিঃসারক, মূত্রকারক, ম্যালেরিয়া নামক পারদপুষ্ট কীট নাশক, শুক্রকারক, পাচক, বিষনাশক, রক্তরোধক, বমনকারক, এবং প্রদাহ নিবারক। নির্ঘণ্টরত্নাকর, প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে তুলসীর দাহকারক, পিত্তজনক, দীপন, তীক্ষ্ণ প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, "শুক্লকৃষ্ণা চ গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা" অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণ ভেদে তুলসী গুণের বেলায় সমান।

বাত, কফ, শ্বাস, কাশি, কৃমি, বমন, দুর্গন্ধযুক্ত, মূত্রবিকার, গুল্ম, বিষদোষ, মূত্রকৃচ্ছ, রক্তদোষ, জ্বর, হিক্কা প্রভৃতি পীড়ায় ইহার ব্যবহার অনুমোদিত। সর্দ্দি জন্য বহুবিধ পীড়ায় এবং পার্শ্ববেদনা প্লুরেসি নিউমোনিয়া প্রভৃতি পীড়ায় ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা নিঃসরণ কার্য্যে ইহার শক্তি অতুল্য। কবিরাজ মহাশয়গণ জ্বর প্রদর ও শ্লেষ্মজ পীড়ায় তুলসী ব্যবহারের বড় পক্ষপাতী। সবিরাম ও অল্প বিরাম জ্বরে তুলসী ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত।

শীতলতা জন্য জ্বর হইলে মাত্র তুলসীপত্ররস একটু লবণ সহ উষ্ণ করিয়া খাইলে আর দ্বিতীয় মাত্রা ঔষধ আবশ্যক করে না। ম্যালেরিয়া জ্বরে বিলাতী ডাক্তারগণ আজকাল তুলসী ব্যবহার করিতে আর বাড়ীতে তুলসীর গাছ রাখিতে আদেশ করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের তুলসী ব্যবহার আর হিন্দুশাস্ত্রের তুলসীর পবিত্রতা আজকাল বহু বিলাতী ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতেছেন। পূর্ব্বে অনভিজ্ঞ ডাক্তারগণ আর অনুকরণকারী দেশীয় ডাক্তার তাহারা আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়া উপহাস করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রমি উন্নতি জন্য জগৎ এখন চাহিয়া দেখিতেছে যে হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন কথাই অবৈজ্ঞানিক নয়। আয়ুর্ব্বেদে ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের পূর্ণ পরিণতির পরিপূর্ণ উদাহরণ; হিন্দুর প্রত্যেক অনুষ্ঠানই বিজ্ঞানমূলক। শয্যা হইতে উঠিয়া পুনঃ নিদ্রা যাইবার সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক সাংসারিক খুটীনাটী পর্য্যন্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুমোদিত অনুষ্ঠান। তুলসীর পবিত্রতা আর হিন্দুগৃহীর বাড়ীতে তুলসীবৃক্ষ স্থাপন পদ্ধতি মানবশরীরের কীদৃশ হিতকারী তাহা এখন জগৎ চাহিয়া দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেছে।

ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন করিল; কিন্তু ইহা নূতন জ্বরের পথ নহে। যাহাকে আজকাল ম্যালেরিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় তাহা পূর্ব্বে শারদীয় জ্বর অর্থাৎ শরত ঋতুর জ্বর নামে অভিহিত ছিল। এই জ্বরের প্রতিষেধক তুলসীবৃক্ষরোপণ প্রথা কুইনাইন সিনকোনা হইতে কম নহে। যাহাহউক জ্বরপীড়ায় আমরা তুলসীর আশ্চর্য্য শক্তি বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি এমন কি অল্পপরিমাণে কুইনাইন তুলসীরসে বড়ী করিয়া খাওয়াইয়া এবং খাইয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি। এক সময়ে আমি কুইনাইনের অভাবে তুলসীর পত্রের রস ২ ড্রাম, গুলঞ্চেরপালো ২০ গ্রেণ, আতৈসচূর্ণ ১০ গ্রেণ একত্রে দুই বড়ী প্রস্তুত করিয়া অনেক ম্যালেরিয়াপীড়িত ব্যক্তির জ্বর আরোগ্য করিয়াছি। আমি নিজে অতঃপর আর কুইনাইন খাই নাই। জ্বর দমন করিতে তুলসী একটী অতিপ্রধান ঔষধ। আবার তুলসীপাতার গুঁড়া নাসিকা রোগে মহোপকারী ঔষধ নস্যরূপে ব্যবহার করিতে হয় বা রস টানিয়া লইতে হয়।

একটি ব্রাহ্মণ কামিনী দীর্ঘকাল নাসিকা পীড়া ভোগ করিয়া শেষে তুলসীপত্ররসেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বিষাক্ত জন্তুর দংশন যন্ত্রণা নিবারণ করিতে তুলসী অতি উপাদেয় ঔদ্ভিদ্।

বৃশ্চিক, বোলতা, ভীমরুল, চেলা এবং সিদ্ধিমৎস্যের আঘাত জন্য যন্ত্রণা নিবারণ করিতে তুলসীপত্রের রস এবং লবণ অমোঘ ঔষধ। আমাকে এক সময়ে রাত্রি ৩টার সময় চেলা নামক বৃশ্চিকজাতীয় জন্তুতে দংশন করে তখন যন্ত্রণায় সর্পদংশন হইয়াছে বলিয়া আমার পিতা এবং আত্মীয়গণ ব্যস্ত হইয়া উঠেন! কিন্তু একটী ১৫।১৬ বৎসরের ভৃত্য

বর্ণে যে চেলায় কাটিয়াছে তুলসীরস দিয়া দেখি। ৺কাশীতে রাত্রিতে তুলসী পাওয়া কঠিন হইল তখন ডাক্তারী "লাইকার। এমন ম্যাসিড" লাগান হইতে লাগিল কিছুতেই কিছু হয় না দেখিয়া ঠাকুরপূজার নিশ্মাল্য হইতে তুলসী কুড়াইয়া তাহার রস ২৩ বার লাগাইতেই যন্ত্রণা নিবারণ হইল। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে কাল তুলসী প্রধান। একটী বিধবা রাঁধুনীকে ভীমরুল নামক বোলতা-জাতীয় কীটে বাতাসার দোকানে কাটিয়াছিল আমি তাহাকে কাল তুলসীর রস দিয়া সুস্থ করিয়াছিলাম।

শিশুর কর্ণে বেদনা হইলে এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া বুকে সর্দ্দি বসিলে তুলসীপত্রই এদেশের গৃহিণীগণের একদিন প্রধান ঔষধ ছিল। এ অবস্থাতে কর্ণে ২।১ ফোঁটা রস দিতে হয়, আর মধুসহ অল্প লবণ এবং তুলসীরস খাইতে দিতে হয়। একরূপ অজ্ঞানব্যাধি আছে উহা অধিক উষ্ণতা ও পরিশ্রম জন্য রৌদ্রে ঘুরিলে উৎপন্ন হয় এই উৎপাতে তুলসীই উৎকৃষ্ট ভেষজ। সৈন্ধব-চূর্ণসহ তুলসীর মঞ্জরীর রস নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানতা নিবারণ হয়। যে সকল কিশোরী বা যুবতী হিষ্টিরিয়া নামক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ করে তাহাদের তুলসীর রস ও সৈন্ধব প্রধান ঔষধ। চর্ম্মের উপর এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ দাগ—ইহা অনেক সময় কুলক্ষণ উপস্থিত করে ও চাষীগণের রৌদ্রে অবস্থান জন্য অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া একরূপ দদ্রুপীড়া উপস্থিত করে। এই দুই ক্ষেত্রেও তুলসীপাতার রস উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

নূতন সর্দ্দি পীড়ায় তুলসী ও আদা প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় খাইলে সহজেই উপদ্রব নিবারণ হয়। তুলসীর মুরব্বা ও গরমজল খাইলে অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

শুনিয়াছি তুলসীস্থিত স্বর্ণবর্ণের পোকা কলায় ভরিয়া খাইলে কিন্তু শৃগাল ও কুকুরের দংশনজনিত বিষ দূর হয়। বলা বাহুল্য ইহা আমাদের পরীক্ষিত নহে। তুলসীর উপকারিতা সম্বন্ধীয় দুই একটী প্রত্যক্ষদর্শীর কথা এবার বলি।

বিবাহের ফুলসজ্জার দিন স্ত্রীর নাসিকায় ওজিনা নামক ব্যাধির দুর্গন্ধে বিরক্ত হইয়া, স্বামী ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত ডাক্তারী এবং কবিরাজী বহু ঔষধ ব্যবহারে হতাশহৃদয়ে চিকিৎসা জন্য কলিকাতা লইয়া যাইতেছিলেন, পথে দৈব দুর্য্যোগে বড় জল হওয়ায় এক সূত্রধরের বাড়ীতে গিয়া অবস্থান করেন। এই স্থানে সূত্রধরের জননী ভদ্রলোকের বালিকা স্ত্রীসহ কলিকাতা গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর শুনিয়া সূত্রধর-জননী বলে যে "বাবু দুই দিনে তোমার স্ত্রীর পীড়া আরোগ্য করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা একখানা তামার কুণ্ডীতে করিয়া ঔষধ লইয়া ভদ্রবালিকার নাকে ৪৫ ফোঁটা প্রদান করিল। আবার দুই ঘণ্টা বাদে ঔষধ প্রয়োগ করিল, এইরূপে সেই বড় জল থাকিতে থাকিতে ৪ বার নাসিকায় ঔষধ দেওয়া হয়। ভগবানের ইচ্ছায় ভদ্র লোকের স্ত্রীটী তখন হাঁচিতে হাঁচিতে চিলের মত অতিদুর্গন্ধযুক্ত একটী শ্লেষ্মার গলা নাসিকা হইতে ত্যাগ করিল। অমনি সেই ভদ্রবধূর নাসিকা পাতলা হইল। আর যে উৎকট গন্ধে মুখের নিকট মুখ লওয়া যাইত না তাহাও দূর হইল, মাথার নিরাংশ পাতলা হইল, কাশি থামিল, মাথা কামড়ান নিবারণ হইল।

তখন বাবুটি সেই বৃদ্ধাকে কিছু উপহার

দিয়া সেই ঔষধটি শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিলেন, বৃদ্ধা কৃষ্ণ তুলসীর রস আর সৈন্ধব চূর্ণ তাম্রপাত্রে উষ্ণ করিয়া নাসিকায় দিয়াছিল। সেই ভদ্র যুবতী বাল্যকাল হইতে মস্তকের শ্লেষ্মাপীড়ায় কষ্ট পাইতেন আবদ্ধ ক্রুর শ্লেষ্মা তাহার নাসিকার স্তানাল ফুসা অর্থাৎ নাকের মধ্যস্থ খাতের মধ্যে জমাট হইয়া নিঃসরণ হইত না। তাহাতে নাসিকায় ক্ষত হইয়াছিল। শ্লেষ্মাবদ্ধ আর ক্ষতের পূয় একত্রে দুর্গন্ধ জন্মাইয়া সময়ে সময়ে অতীব যন্ত্রণা দিত, তুলসী তাহা আরোগ্য করিল; ইহা প্রকৃত ওজিনা পীড়া নহে তখন তাহা জানা গেল। বলা বাহুল্য ওজিনা হইলে তাহাও ভাল হইত।

আর একটি ১৪।১৫ বৎসরের সাহা জাতীয়া কামিনী স্বামীগৃহে যাইবার অনিচ্ছায় পার্শ্ববর্তী একটী কায়স্থ যুবতীর হিষ্টিরিয়া পীড়ার অনুকরণ করিত। এইরূপ ব্যাধি হইলে যেরূপ ভাবভঙ্গী করিতে হয়, এই যুবতী তাহা সমস্তই নকল করিত। তখন স্বামী বেচারা বিপদাপন্ন হইয়া আমার শরণাগত হয়। আমি গিয়া দিবসে দুই বার যুবতীকে দেখিয়া বুঝিলাম যুবতীর পীড়া প্রকৃত নহে অনুকরণ মাত্র, তখন আমি কার্ব্বনেট অব এ্যামনিয়া শুঁকাইয়া যুবতীর হিষ্টিরিয়া ফিট নিবারণ করিলাম। কিন্তু আমার প্রস্থানের পর এক ঘণ্টা কাল বাদে নকল পীড়ায় আবার আক্রান্ত হইয়া প্রলাপচ্ছলে বলিতে লাগিল যে ডাক্তারের চুণ আর নিশাদলের গন্ধে আমার "আসন" আমি ছাড়িব না অর্থাৎ যুবতী বালিকা দেবীর আবেশে আবিষ্টার ভান করিতে লাগিল। তখন আবার আমার ডাক হইল। এবার আমি শুধু হাতে গিয়াছিলাম কিন্তু সেই বাড়ীতে তুলসীর বৃন্দাবন দেখিয়া কতকটা তুলসীর রস প্রস্তুত করিয়া সৈন্ধবচূর্ণসহ কলার পাতার নলযোগে ফুৎকারে যুবতীর নাসিকায় প্রবেশ করাইয়া দিলাম। অমনই কালীর আবির্ভাব দূর হইল স্বামীগৃহে যাইতে হইল।

আমার জনৈক পুত্র দুইবর্ষের শিশু রাত্রিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কর্ণের মধ্যে হাত দিতে লাগিল তখন তাহার ২।৪টী অর্দ্ধোচ্চারিত বুলি ফুটিয়াছে, সে বলিল যে 'জলে জলে কা।' অর্থাৎ কাণজ্বালা করে। এই সময় আমি চাল তলোয়ার হীন সর্দ্দার! ঔষধের নাম মাত্র আমার সঙ্গে নাই। বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। সহসা তুলসীর কথা মনে পড়িল, জনৈক কন্যাকে দিয়া তুলসী আনাইয়া তাহার রস আর ঘরের কোণের কার্পাসের কাঁচা ফলের রস উষ্ণ করিয়া কাণে কয়েক ফোঁটা দিলাম, শিশু নিদ্রিত হইল। এই দিন হইতে আমি বালক বালিকার কর্ণবেদনায় নিম্নের ব্যবস্থা অনুযায়ী চলিয়া আসিতেছি।

তুলসীর রস ৩০ ফোঁটা, কার্পাসের কাঁচাফলের রস ২০ ফোঁটা, রসুনের রস ৩০ ফোঁটা, মধু ১৪ ড্রাম একত্রে মিশাইয়া রাখিতে হয়। আবশ্যক মতে ২।৩ ফোঁটা কর্ণে দেওয়া বিধি। বলা বাহুল্য মধুর তত আবশ্যকতা নাই।

আমার কোন বন্ধু তুলসীর গুণ সম্বন্ধে তাঁহার পরিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত আরও কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়াতে তাহাও এইস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

বাবুই তুলসী প্রমেহ বা পুরোরিয়া পীড়ায় একটি মহৌষধ। তুলসী বীজ পূর্ব্বদিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া পরিষ্কৃত জল পরদিন প্রাতে রোগীকে খাইতে দিতে হয়। দুই তিন দিন ব্যবহারেই মূত্রত্যাগের সময় জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

উদরাময়েও তুলসী আশ্চর্য্য কার্য্য করে। এ পীড়াতেও ঐরূপ তুলসী বীজের সরবৎ ব্যবহার করিতে হয় কেবল তাহার সহিত পাকা কলা কিছু সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়।

উদরে কৃমি হইলে কৃষ্ণতুলসী পাতার রস ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

তুলসীর ব্যবহারিক ঔষধ স্বরূপ গুণের কথা মাত্র এবার এ প্রস্তাবে বলা হইল। কারণ তুলসী সম্বন্ধে আর আর জ্ঞাতব্য এবং আধ্যাত্মিক গুণ বা ইহার মাহাত্ম্য বিষয় হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে তাহা ত্রিশূল পত্রেরই তৃতীয়বর্ষের নবম দশমাদি সংখ্যায় যথা সম্ভব আলোচিত হইয়াছে।

মেদিনীপুর-হিতৈষী

৬। বরপণের ঔষধ

কলিকাতায় বিগত ২৭শে আষাঢ় রবিবার বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটী বরপণ নিবারণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু কালিপদ ঘোষ, রায় রাধাগোবিন্দ বাহাদুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা পণপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কিন্তু এই মূলোচ্ছেদ কি ভাবে করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহারা উদ্যোক্তা এবং শ্রোতা তাঁহারা কেহই প্রকৃত বরপণের তীব্র হলাহলে জর্জ্জরিত নহেন, তাঁহারা দয়াপরায়ণ হইয়া আমাদের কথা ভাবেন এই পর্য্যন্ত, অন্যথা তাঁহাদের পুত্র কন্যার বিবাহাদিতে আদান প্রদানের কথাও উঠে না, অভাবও হয় না। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা দূরে থাক তাঁহাদের বন্ধুবর্গও যে পরিমাণ যৌতুক প্রদান করেন তাহাতেও অনেক গরীবের বাড়ীর বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম এই সমস্ত সভাসদ বা সভাসমিতি দেশের প্রকৃত অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইবে না। এই বরপণ নিবারণের উপায় একমাত্র বরপণ সংগ্রহেই দেশ যদি গরীব না হইত, প্রত্যেক কন্যাকর্ত্তার যদি বরকে দিবার মতন যথেষ্ট টাকা থাকিত তবে এই বরপণ নিবারণের চেষ্টা করিতে হইত না। বরপণ প্রশ্ন এত তীব্র হইত না, আজ যাহার টাকা আছে সে জামাতাকে যথোপযুক্ত প্রদান করিতে আনন্দ ব্যতীত দুঃখ বোধ করেনা, যত ক্রন্দন কেবল গরীব কন্যাকর্ত্তার! এই দারিদ্র্যদোষ নাশ করিবার চেষ্টা কর, মূল ব্যাধি দূর কর। বহিঃলক্ষণ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে ফল কিছু হইবে না, অরণ্যে রোদন হইবে। বরপণ নাই কোথায়—? ছিলনা কোন যুগে? বর্ত্তমান সভ্যতার আদর্শ ইউরোপ ও আমেরিকায় বরপণের প্রাবল্য আছে কিন্তু তাহাতে দেশ গেল বলিয়া চীৎকার নাই। একবার ষ্টেটসম্যানে পড়িয়াছিলাম ইংরেজেরা বলেনঃ—

"In marriage matters no other consideration should be made except money বিবাহে টাকা ব্যতীত অপর কোনদিক বিবেচনা করিতে হইবে না! তাই তাহারা এমেরিকান ধনকুবেরগণের মেয়ে বিবাহ করিতে লালায়িত।

ভারতের প্রাচীনকালেও সাংকৃতা কন্যা এবং যৌতুক ইত্যাদি দান করিবার ব্যবস্থা ছিল। তবে তখন সমাজে একটা বাঁধ ছিল, কাহার কত প্রাপ্য তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল, আর আর কেহ সমাজে নিয়ামক নাই, কাহারও হইবারও উপায় নাই। রাজনৈতিক নেতা এই সমাজ নিয়ামক নহেন, বৃথাই তাঁহাদের বাগ্‌বিস্তার, কার্য্যতঃ ফল কিছুই হইবার নহে। তাই বলিতেছিলাম দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সমাজব্যাধি দূর হইবার নহে, শত স্বেচ্ছাচার মূলক এ প্রথা নিবারণ করিতে পারিবে না। বিবাহকার্য্যে উভয় পক্ষেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, বর ও কন্যাকর্ত্তা উভয়ই শ্রেষ্ঠ পরিবারে বিবাহ দিতে চান, তাই সর্ব্বত্রই আদান প্রদান বাড়িয়া যায়। আর যাহারা বিনা বরপণে বিবাহ করিতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে ঢক্কা নিনাদ করে তাহারা কেহ গরীবের মেয়ে বিবাহ করে না, সহস্রপতি, লক্ষপতি, অথবা বড় চাকুরীজীবি—যাঁহারা না চাহিতেই প্রচুর দিয়া থাকেন তাঁহাদের মেয়েই বিবাহ করে, গরীবের প্রতি দয়া বর্ষণ করে না। তাই বলিতেছিলাম বরপণ নিবারণ কল্পে বরপণ সংগ্রহই একমাত্র উপায়। দেশকে ধনী কর অন্যান্য বিপদের সহিত এ বিপদও কমিয়া যাইবে।

বরিশাল হিতৈষী

প্রবাসী

"চাহ, চাহ, মতিমান, দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া যায়!
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ!
মানুষের শক্তি লয়ে কাটিল কি ব্যর্থ করতারে?
বিধাতার পুণ্যদান—দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার?
একি—একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত!
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'। ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়—
দুয়ারে পাখীর মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি?"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	মাঘ, ১৩২২	চতুর্থ সংখ্যা।

আলোচনা

১। কংগ্রেসে আমাদের লাভ

প্রতি বৎসর যেরূপ কংগ্রেস বসিয়া থাকে, এবারও সেরূপ হইয়াছে, সভায় অন্যান্য বারের ন্যায় মন্তব্যও গৃহীত হইয়াছে। ভারতবাসীর উচ্চপদের জন্য প্রার্থনা, সমর বিভাগে প্রবেশ বা অস্ত্র আইন রদ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। মোটের উপর প্রার্থনা করিতে কোনটিই বাদ পড়ে নাই। তারপর সকল প্রার্থনা, সকল অনুরোধের মূল—যে স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য, আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ কত ধন আমরণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে প্রাণপাত করিয়াছেন, এবারকার তিনদিনের হুংকারে তাহা যেন উড়িয়া যাইবার মত হইল। ত্রিশ বৎসর যাবৎ দেশের অর্থ, কর্ম্মীর একাগ্রতা, সাধকের প্রাণপাতসাধনা—ভবিষ্যতের শুভ

আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াও আজ যেন বিফলীকৃত।

এবার কংগ্রেসে আমাদের লাভ হইল—প্রমাণিত হইল আমাদের অনুপযুক্ততা। বিগত বৎসর পর্য্যন্ত সভাপতিগণ যাহাকে ধরা পড়া বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে মেটা সাহেব পর্য্যন্ত পরলোকগত সভাপতিগণ কি এই ভ্রান্ত ধারণার পোষকতা করিয়া গিয়াছেন? তাঁহাদের আত্মা কি মাতৃমন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল—আমরা শাসনে অনুপযুক্ত? আমরা কোন্ সুদীর্ঘ কাল হইতে মহাতীর্থের জন্য যাত্রা করিয়া, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াও দেখি, আমাদের পথে শত শত কণ্টক বিদ্যমান। এই খানেই কি মহাতীর্থ দর্শনের বাসনা শেষ করিতে হইবে? কত আশা আমাদের হৃদয়-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে অবিরত ঘা দিতেছে "আমরা জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।" আমরা বৈষ্ণবীয় দর্শনশাস্ত্রের চূড়ান্ত মহিমা ঘোষণা করিব। এই সাম্যের যুগে, আত্মশক্তি প্রচারের মুহূর্ত্তে, আমরা জগতের জাতিসমূহের পশ্চাতে থাকিব ইহা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়। জগতের স্বাধীন জাতিসমূহের ন্যায় সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিব, ন্যায্য অধিকারে স্বত্ববান হইব, ইহাই আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের বাসনা। কংগ্রেসের এই বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই, আমাদের দেশবাসী নবীন ব্যবসায়িগণ বিভিন্নক্ষেত্রে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও, নবীন কর্ম্মিগণ নব নব কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াও পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন, দারিদ্র্যের বিরাট বদনে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া আপনার পথে চলিয়া যাইতেছেন। এইরূপে চলিতেই হইবে, জগতের অন্যান্য জাতিসমূহের সমকক্ষ হইবার নিমিত্ত আমরা অগ্রসর না হইলে চলিবে কেন? সকল রকম কর্ম্মে আমরা বুঝাইব, আমরা অনুপযুক্ত নহি। আমাদের বীর্য্য, আমাদের উজ্জ্বল ললাট ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত।

সভাপতি মহাশয়, আধুনিক ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র বাঙ্গালা দেশ হইতে ঋত্বিক্ পদে বৃত হইয়া, স্বরাজ-সেবক শিবজীর জন্মভূমির বুকে দাঁড়াইয়া তাঁহার ত্রিশকোটী দেশবাসীকে শক্তি-হীন বলিয়া প্রচার করিলেন।

তাঁহার এবম্বিধ প্রচার কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে কতটা ক্ষতিজনক তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আমরা তাঁহার অন্য অনেক মতবাদের সহিত একমত হইলেও এই মতবাদকে বড়ই ভীতির চোখে দেখিতেছি।

* *
*

পল্লী সমাজে চিকিৎসার ব্যবস্থা।

সকলেই অবগত আছেন যে বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে চিকিৎসার অভাবে কত জীবন নাশ হয় ও কত নবীন জীবন চির-কালের জন্য রোগ-গ্রস্ত হইয়া গ্রামখানিকে নিরাশার ছায়ায় ঢাকিয়া রাখে। আজকাল পল্লীসেবার জন্য আমাদের যুবকবৃন্দের মধ্যে একটী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। পল্লী-গ্রামকে কেবল কবিকল্পিত বেশভূষায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে হাজির করিয়াই সন্তুষ্ট থাকি-বার দিন গিয়াছে। সুতরাং গ্রামকে যদি পুনরায় সভ্যতার আলয়, চিন্তার আশ্রম করিয়া তুলিতে হয় তবে যাহারা এখনও পূর্ব্বপুরুষের ভিটা ধরিয়া বাস করিতেছে

তাহারা যাহাতে সুস্থদেহে থাকিতে পারে আমরা সেই দিকে পল্লীসেবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

গ্রামে গ্রামে যদি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে থাকিত তাহা হইলে ত কোন চিন্তাই থাকিত না। অথচ গ্রামে বাস এমন লোভনীয় নহে যে উপযুক্ত চিকিৎসকগণ সহরের বেশী আয়ের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক গ্রামে যাইয়া বাস করিবেন। আবার Medical Bill এর উপদ্রবে যে কয়টী বেসরকারী চিকিৎসা-বিদ্যালয় ছিল তাহাদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই পল্লীগ্রামে কোথা হইতে চিকিৎসক আমদানী হইবে তাহা একটা চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক। ডিসেম্বর মাসের Indian Reviewতে মহীশূরস্থ শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটী বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি এই প্রশ্নের যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট কার্য্যকরী বলিয়া মনে হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন—

"If simple medical assistance is to come within the reach of the great man of village population, we must think of an entirely different type of men. We must revert to something like the Native Doctor of the old times. We must have a set of men who, while able to render useful medical help in simple cases, will be satisfied to live as villagers amongst villagers on a modest income. Their education both general and professional may not be of a very high order on the theoretical side, but their training must have special reference to the peculiar requirements of the population amongst whom they will have to work. I think if we get hold of students who have read up to the lower secondary standard and train them in a special institution for a period of two years we may have the desired type of men. The course of instruction is to comprise of vaccination, Plague inoculation, diagnosis of simple medical cases, the use of drugs, first aid in accidents, a little surgery, a little midwifery and hygiene".

অনেকে বলিবে, "এত হাতুড়ে ডাক্তারের বন্দোবস্ত হইল।" আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এখন যে সব "হাতুড়ে" চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেই হয়ত কোনও শিক্ষা পান নাই। অশিক্ষিত হাতুড়ে অপেক্ষা শিক্ষিত হাতুড়ে কি ভাল নয়?

* * *

কুমারী মণ্টেস্‌সরীর শিক্ষাপ্রণালী

সমাজে 'পতিত জাতি'র উন্নয়নকল্পে বহুবিধ আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু সংসারের মধ্যে যাহারা পতিত রহিয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের

জন্ত কয়জনে কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন, তাহাও জানি না। শিশুরাই সংসারে 'পতিত জাতি' এবং তাহারাই অধিকাংশস্থলে বেশী অবজ্ঞাত। এই শিশুদিগকে প্রকৃত উপায়ে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্ত আমাদের একেবারেই চেষ্টা নাই। আমরা বিচারালয়ে দণ্ডিত অপরাধীর চরিত্র-সংশোধনে যত্নবান হই, যাবতীয় হীন প্রবৃত্তিকে সুপথে চালাইবার জন্ত চেষ্টা করি, কিন্তু শিশুদের জন্ত আমরা কিছুই করি না। পুতুলকে আমরা যে ভাবে দেখি, শিশুকেও দেখি সেইরূপ। বড় জোর কয়েদীদের মত গার্ডের তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে রাখি। ফলে হয় এই, যখন গার্ডের নজর তাহাদের দিকে থাকে না, তখন তাহাদের দৃষ্টি কুকর্ম্মের দিকেই প্রধাবিত হয়। কিন্তু এমন করিয়া বাহিরের ভয়ে নিয়ম শিক্ষা শিক্ষাই নহে। ভিতর হইতে নিয়মবোধ জাগ্রত হইলেই তাহা পালনেচ্ছা স্বভাবতঃ জাগিয়া উঠে। শিশুদিগকে সেইজন্ত এমন একটি আবেষ্টনের মধ্যে রাখা কর্ত্তব্য যেখানে তাহারা আপনা হইতেই সুপথ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেমন করিয়া সেই আবেষ্টনটি প্রস্তুত করিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহার মধ্যে শিশুদিগকে রাখিতে হইবে,তাহার এক প্রণালী কুমারী মণ্টেস্‌সরী আবিষ্কার করিয়াছেন। কুমারী মণ্টেস্‌সরী ইতালীর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম স্ত্রী-গ্র্যাজুয়েট।

তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষকের হস্তক্ষেপ যথাসম্ভব নিবারিত করা হইয়াছে। শিশুদিগকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহার ফলে তাহাদের স্বাভাবিক কর্ম্মগতি বাধা পায় না। অবশ্ত স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ ইহা নয় যে, শিশুদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করা। তাহাদিগের জন্ত শিক্ষক সযত্নে এমন একটি আবেষ্টন গড়িয়া তুলেন, যাহার মধ্যে শিশুরা তাহাদের স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে সুযোগ এবং আনন্দ পায়। তাহারা যে যে উপায়ে আত্মনির্ভর, আত্মসংযমী এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হইতে পারে, সেই সেই উপায় অবলম্বন করাই শিক্ষকের কায। সেইজন্ত জ্ঞানার্জ্জনের স্থান এই প্রণালীর মধ্যে দ্বিতীয়। কুমারী মণ্টেস্‌সরী মনে করেন, শিশুদের জন্ত সব কিছু করিয়া দিলে তাহাদের ব্যক্তিত্বকে অপহরণ করা হয়। তাহাদের ভিতরে যে মানবাত্মা আছে, তাহাকে স্পর্শ করাই যথার্থ শিক্ষার কায।

৪। ব্যবসায়ে জাপানীর সাধনা

উপাসনার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় লিখিত "নবীন জাপানে শিল্প ও ব্যবসা" নামক প্রবন্ধের একস্থানে দেখিতে পাই, তিনি বলিয়াছেন, "জাপানীরা নিজের কার্য্যফল নিজে পরীক্ষা না করিয়া বাজারে বাহির হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত সন্তোষজনক ফল পাওয়া না যায় ততদিন তাহারা পরীক্ষা অনুসন্ধান ইত্যাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকে। এই experimental stage এর জন্ত সময় ও অর্থ ব্যয় করা তাহারা অপব্যয় বিবেচনা করে না। এই জন্তই যখন তাহারা সত্যসত্যই কাজে লাগিয়া যায় তখন অল্পকালের মধ্যেই বিস্ময়জনক কার্য্য করিয়া ফেলে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীরা যে সকল জিনিস দেশে প্রস্তুত করিতে পারিত না আজ তাহারা সেই সমুদয় জিনিস স্বদেশে প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দিতেছে। জাপানের গত দশ বৎসরের সঙ্গে আমাদের "স্বদেশী আন্দোলনের" যুগ

তুলনা করিলে জাপানী ও ভারতীয় কার্য্য-প্রণালীর প্রভেদ বুঝিতে পারিব।

আমরা কোন এক ব্যক্তিকে ১৩ বৎসর কাল আমেরিকায় বা জার্ম্মাণীতে শিখাইয়া আনি। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ওস্তাদ করিয়া সুবৃহৎ কারখানা খুলিতে প্রবৃত্ত হই। জাপানীরা এইরূপ দু একজন ওস্তাদের উপর নির্ভর করে না। ওস্তাদের কার্য্যক্ষমতা প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে যাচাই করিয়া লইবার জন্য তাহাদের প্রয়াস থাকে। এইজন্য খরচপত্র করিতে তাহারা অভ্যস্ত। ভারতবর্ষে ১৯০৫ সালের আন্দোলন জাপানী-প্রণালীতে পরিচালিত হইতে পারে নাই—কারণ পরীক্ষা, অনুসন্ধান ও একস্‌পেরিমেণ্ট ইত্যাদি হইবার পূর্ব্বেই বিদেশী-বর্জ্জন সুরু হইয়াছিল।"

নীরব সাধনা ভিন্ন কোন কিছুতেই সফল কাম হওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের সব বিষয়েই বাহ্যাড়ম্বর এবং হঠকারিতা প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। ধৈর্য্য ধরিয়া লাগিয়া থাকার গুণ আমাদের একেবারেই নাই। সেই জন্য আমাদের অধিকাংশ আন্দোলন ও অনুষ্ঠান আজ বাজীর দশা প্রাপ্ত হইতেছে।

* *
*

৫। সন্ন্যাস ও ব্যবসায়

সন্ন্যাসী সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন, সকল মায়া-মুক্ত। ব্যবসায় বাণিজ্য তাঁহার নিকট ছেলে-খেলা। এই ভাব আমাদের জনসাধারণের মধ্যে ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত। বিদেশীগণও আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ সাধুগণকে other worldly ও misanthropic anchorite বলিয়া তুচ্ছ করেন। এরূপ anchorite আমাদের দেশে থাকিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিতেছি না। কিন্তু যে সন্ন্যাসীর অনুপ্রেরণায় আজ ভারতের জাতীয়তা ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিয়াছে, সেই সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর কাজ সম্বন্ধে কি মনে করিতেন তাঁহার একখানি নব প্রকাশিত পত্র হইতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

"Dear Swami Vivekananda,—I trust you remember me as a fellow-traveller on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India and the duty, not of destroying, but of diverting it into useful channels.

"I recall these ideas in connection with my scheme of Research Institute of Science for India, of which you have doubtless heard or read. It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than the establishment of monasteries or residential halls for men dominated by this sprit, where they should live with ordinary decency and devote their lives to the cultivation of sciences, natural and humanistic. I am of opinion that if such a crusade in favour of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science, and the good name of our

common country and I know not who would make a more fitting general of such a campaign than Vivekananda. Do you think you would care to apply yourself to the misson of galvanising into life our ancient traditions in this respect? Perhaps, you had better begin with a fiery pamphlet rousing our people in this matter. I should cheerfully defray all the expenses of publication.

"With kind regards, I am, dear Swami, Yours faithfully, Jamsetji, N. Tata, 23rd November, 1898, Esplanade House, Bombay."

এই সন্ন্যাস কি other worldly? এইরূপ সন্ন্যাসিগণ যদি এক একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সংসারে ছড়াইয়া পড়েন, যদি তাঁহারা সামাজিক জীবনের সকল বিভাগকেই শুপ-স্করণের ক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করেন তবে এই নবোদ্বোধিত হিন্দুত্ব এক বিশ্বপ্লাবিনী শক্তিদ্বারা সমগ্র সংসারকে আপনার লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত করিবে।

* *
*

৬। হাস্যরস ও জাতীয়তা

আমরা বিশ্বরূপকে আনন্দময় বলিয়া পূজা করি। প্রতি পূজায়, প্রতি উপাসনা ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ধ্যানীর যোগপরায়ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাই, অন্যদিকে আবার জনতার আনন্দ কোলাহল শুনিতে পাই। একদিকে যেমন মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠা, অপর দিকে আবার সেইরূপ হাস্যরসের কলকোলাহল। এই দুই বিপরীত ধারার মধ্য দিয়া আমাদের ধর্ম্ম জীবন বহিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ পূজার বাড়ীতে আমোদ নাই, নিষ্ঠাও কতদূর আছে জানি না। ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলে সাহিত্যেও হাস্যরস ছড়াইতে পারেন এরূপ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্র-লালের কোকিল-কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্য দুই একজন তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি করিতেছেন। সমস্ত দেশ অন্বেষণ করিলে ২।১ খানি বাতীত হাস্যরসের সাময়িক পত্রের খবর পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে অপর দেশে এ শ্রেণীর পত্রিকার অভাব অপেক্ষা বাহুল্যই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের অন্যান্য সাহিত্য সম্বন্ধেও যেমন সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন আবশ্যক ব্যঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধেও সেই পন্থা অবলম্বনই আবশ্যক। ব্যঙ্গসাহিত্য জাতীয় সাহিত্যের একটী প্রধান অঙ্গ। এক্ষেত্রে আমরা উহার বিষয়ে একেবারে উদাসীন।

অথচ আমাদের সমাজে যে লৌকিক ব্যঙ্গ-সাহিত্যের কখনও প্রচলন ছিল না তাহা নহে। সর্ব্বত্রই কয়েকটী ঠাট্টা বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য দেশে যেমন এই সকল লৌকিক ব্যঙ্গ প্রকাশিত হইয়া নিরন্তর সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে আমাদের দেশে তাহা দেখিতে পাইতেছি না। আমরা শুধু এক গোপাল ভাঁড় লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমাদের মধ্যেও Mark Twain ও Stephen Seaco'ck আছেন ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে উচ্চ আসন দান করিয়া লোকরঞ্জনার্থ আহ্বান করিতে হইবে। পূর্ব্বে রাজা জমিদারেরা "ভাঁড়" বা "বয়স্য" রাখিতেন। ইঁহারাই সমাজের হাস্য-রসের Vice-Chancellor ছিলেন। আজ কাল সাহিত্য ও সমাজ নূতন আকার ধারণ

করিয়াছে কাজেই পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করিলে এখন আর কাজ চলিবে না। এখন ব্যঙ্গসাহিত্যকে সাময়িক সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিতে হইবে।

অনেকে বলিবেন, এই দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে হাসি আসিবে কোথা হইতে? আমরা এ যুক্তির সার্থকতা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু দুঃখের ঝড়ে, লোকের ঘূর্ণিবায়ুর মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটানই কি বীরত্ব নয়? দুঃখকে আমরা দুঃখ বলিয়া মাথায় পাতিয়া লইব কেন? দারিদ্র্যকে আমরা আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে দিব কেন? শত উৎপীড়নের মধ্যেও বিশ্বরূপের শতমুখী আনন্দ আমাদের হৃদয় উৎস হইতে ঝরিয়া পড়িবে। আর যদি কিছু না পারি আমরা "হাস্যমুখে অদৃষ্টের পরিহাস" করিতেও পারিব না?

* *
*

৭। শিক্ষাপ্রচারে প্রতিবন্ধকতা

ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশের দেশীয় রাজ্যসমূহেই সম্প্রতি শিক্ষার বিস্তৃতি দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য লোকের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইলেও তাহা সাধারণকে আপনার পাশে টানিয়া লইতে পারে নাই। বরোদা প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবৃন্দের শিক্ষা প্রচারের কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় যাহা করিতে পারে নাই—বরোদার বিদ্যালয়সমূহে তাহা করিয়াছে। তাহার দেশব্যাপী সাধারণ পাঠাগার, তাহার সুপরিচালিত চলিষ্ণু পাঠাগার (Travelling Library) দেশের জনসাধারণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ নাই বা তাহাদের সারহীন মস্তিষ্কে শিক্ষার বীজ উপ্ত হইবে না এসব ধারণার বশবর্ত্তী হইলে বরোদা এত উন্নত হইতে পারিত না। জনসাধারণ পয়সার অভাবে বিদ্যালয়ে যদি পড়িতে না পারে তাহা হইলে উহার জন্য দায়ী কে?

আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রচারের প্রতিবন্ধকতার ২।১টী কারণ দেখিতে পাই। অশিক্ষিত সম্প্রদায় জমিদারগণের প্রজা অথবা শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের করতলগত। যাহারা শিক্ষিত তাহাদের ধারণা, এই সকল নিম্নশ্রেণীর লোক শিক্ষা লাভ করিতে থাকিলে চাকর পাওয়া যাইবে না; দ্বিতীয়তঃ ইহারা শিক্ষিত হইলে তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। জমিদারদিগের ভয় প্রজাকুল মামলাবাজ হইয়া উঠিবে; তাহারা আপন সামর্থ্যের মাত্রা বুঝিলে জমিদারগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে সাহস করিবে।

চাকর পাওয়া যাইবে না অথবা সাম্প্রদায়িক ক্ষমতা প্রয়োগের যথেচ্ছ সুবিধা হইবে না ভাবিয়া অন্য একটা সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ চাপিতে যাইয়া নিজেরাই চাপা পড়িয়া যাইতেছি। আমরা ভাবিতে পারিতেছি না যে সংসারে সকলেই এক শ্রেণীর বা এক পদবাচ্য হয় নাই, হইবেও না। নিম্নশ্রেণীরা আমাদের চাকর হইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে নাই। যাহারা চাকর হইবে তাহাদিগকে শত সুবিধা করিয়া দিলেও তাহারা আপন পথ বাছিয়া লইবেই। জগতের আদর্শ সারস্বত-কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ শিক্ষা দ্বারাও সকলেই সভাপতি হইবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারে নাই। সাধারণের ন্যায্য অধিকারকে আভিজাত্যের ক্ষমতায় কাড়িয়া লওয়াই উন্নত রুচির পরিচায়ক নহে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে সাধারণের

সুযোগ সৃষ্টি করাই উদারনীতির পরিচয়। ইহাই উন্নত জাতির, উন্নত হৃদয়ের কার্য্য।

পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যসমূহের মধ্যে সঙ্কীর্ণমনা রাজগণ যে না আছেন এমন নহে। বরোদার একনিষ্ঠ সাধনার মহদৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অল্প, মহীশূর ও ইন্দোরের রাজগণ সর্ব্বস্ব দান করিতে বসিয়াছেন আমরা আশাকরি, পশ্চিম ভারতীয় রাজ্যসমূহ অচিরেই এক একটী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। ভগবান্ তাঁহাদের উদ্দেশ্য জয়যুক্ত করুন। কিন্তু অসংখ্য জমিদারশাসিত বাঙ্গলাদেশে অনবরত তাঁহাদের মহদৃষ্টান্তের কথা বলিয়াও, শুনিতে পাইলাম না কোথাও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের প্রস্তাব চলিতেছে।

যাহাদিগকে লইয়া বাস করিতে হয়, যাহারা আমাদের সুখদুঃখের চিরসঙ্গী তাহাদিগকে শিক্ষা না দেওয়ায় আমরা বর্ব্বর জাতির প্রতিবেশী হইতে চলিয়াছি। শিক্ষায় লোক কখনও বিরোধ শিখে না। শিক্ষাদ্বারা মানব সমাজ সৌম্য, শান্ত হইয়াছে। যেখানে শিক্ষাপ্রণালী প্রাণ হইতে বাহির হইতে পারে নাই সেখানেই শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া পাপবিষ ভাব প্রবর্ত্তিত করে। দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে রাজার রাজশক্তি বৃদ্ধি পায়। একদিকে অনধিকার ও আভিজাত্যের শাসন, অপরদিকে প্রজার উন্নতিতে জমিদারের ভীতি উভয়ই একটা সম্প্রদায়ের অনিষ্টের মহা কারণ। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই ভিত্তিহীন ধারণা, অমূলক যুক্তি সবই দূর হইয়া যাক্। তিনি আমাদের হৃদয়ে নবীন আলোক দান করিয়া বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করুন। আমরা শুধু বরোদা প্রভৃতি রাজ্যের প্রশংসা কাণ ভরিয়া শুনিব ইহা কখনই হইতে পারে না।

আমরা বুকভরা আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিতে পারি ভারতের নবযুগের কর্ম্মভূমি, শতকোটী সন্তান সেবিত, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জননী বঙ্গভূমি অচিরেই বিরাট সারস্বত ক্ষেত্র হইবে। বাঙ্গালার জমিদারগণ আপন আপন ধন ও অপরিমিত উৎসাহ লইয়া আমাদিগকে আশা দিলে আমরা শীঘ্রই বাঙ্গলা দেশে বরোদা, ইন্দোর, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইব। প্রাচ্য ভারতও বাণী কমলার মিলনভূমি হইবে। বিক্রমশীলা ও নালন্দা আমাদের দেশেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

* *
*

৮। সাহিত্য-পরিচয়

"গৃহস্থের" মূল সূত্র সাহিত্যে সংরক্ষণ নীতি। পৃথিবীতে যাহা কিছু চিন্তাস্রোত বহিতেছে আমাদের মাতৃভাষার মধ্য দিয়া তাহার সব গুলিকেই প্রবাহিত করিতে হইবে। ইহার সার্থকতা এই যে আমরা আর নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকিব না। জগতে যে কোন জ্ঞানের আবিষ্কার হউক না কেন, যে কোন দর্শনের সৃষ্টি হউক না কেন আমরা সে সকলের মধ্যেই অবগাহন করিব। বিষয়টী যতই তুচ্ছ হউক না কেন আমাদের দেশবাসিগণ সে বিষয়ে তাঁহাদের কি বলিবার আছে, কি ভাবিবার আছে তাহা জগৎকে দান করিবেন। বিশ্বের চিন্তাক্ষেত্রে যে বিরোধ চলিতেছে, দর্শনের যে বিরুদ্ধগামী প্রবাহ ছুটিয়াছে, আমাদের আজ তাহার মধ্যে পূর্ণ প্রাণে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে ও বিরোধিগণের সহিত প্রবল উৎসাহে যুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন আমাদের জাতীয়ত্ব ফুটিয়া

উঠিবে, অন্যদিকে আবার আমরা যে বিশ্ব মানবত্ব হইতে পৃথক্ নহি, আমরা যে পৃথিবীতে একটা ব্যতিরেক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই তাহাই প্রমাণিত হইবে।

এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় "বৃহদ্" এখন হইতে একটী সাহিত্য পরিচয় প্রকাশ করিবে। আমরা বহুদিন হইতেই নানা দেশীয় চিন্তার দিকে দেশবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু সকল সময়—বিভিন্ন মতগুলির সম্যক আলোচনা করা সম্ভব হইয়া উঠে না। এই জন্য আমরা নূতন বিষয়ের সন্ধান যেখানে পাই তাহার একটা বিবরণ প্রতি মাসে প্রকাশ করিব। এ বিষয়ে আমাদের পাঠকগণের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

* *
*

৯। দরিদ্রের ক্রন্দন

জীবনের বিকাশের অর্থই এই যে মানব মনের প্রতি তুচ্ছ বিন্দু, মানব প্রাণের প্রতি ক্ষুদ্র পিপাসা একটী বড় ভাবের আলোকে একটী বলবতী অনুপ্রেরণায় সমগ্র জীবনের মধ্যে নিজের স্থান খুঁজিয়া লয়। ক্ষুদ্রের বৃহৎ উপলব্ধি একের সহিত সমগ্রের সমন্বয়—ইহারই নাম বিকাশ। আমাদের জাতীয় জীবনের মধ্যেও আজ আমরা এই বিকাশের সাড়া পাইতেছি। আমরা আজ কেবল একটা ভাবের অনুপ্রেরণায় সংসারে বৈষম্যযুক্ত ও দুঃখ যাতনাকে ভুলিয়া যাই নাই। কি উপায়ে সহস্র বেদনার মধ্যে জাতীয় আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কিরূপে শত আবর্জ্জনা শত বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া জাতীয় জীবনকে তাহার প্রাকৃতিক গতি পথে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে—এই চিন্তা কিছুদিন হইতে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির মনেই স্থান লাভ করিয়াছে। "দরিদ্রের ক্রন্দন" নামক পুস্তিকাখানি এই ভাবস্রোতের একটী আবর্ত্ত। পুস্তকখানির লেখক অর্থনীতিবিৎ। আজকাল পাশ্চাত্য জগতে যে সকল ব্যবসায় রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিশদ ভাবে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। কলকারখানা Large scale production এর সাথে সংস্রবে এদেশের উপযোগী নহে—তিনি আলোচনার ফলে এই মতে উপস্থিত হইয়াছেন; আমাদের দেশের ব্যবসায় Cottage industry তে আবদ্ধ রাখা আবশ্যক এই তাঁহার মত। তবে তিনি যে Large scale production এর বিরোধী তাহা নয়। যতদূর সম্ভব পারিবারিক জীবনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়গুলিকে বিনষ্ট না করিয়া আবশ্যকমত আমাদিগকে বড় বড় ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তবে Industrialism ও অর্থান্বেষণকেই জীবনের কেন্দ্র করিয়া তুলিলে আমরা জাতীয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইব। জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবনের আবাস পারিবারিক জীবনে। যাহাতে এই পারিবারিক জীবন ও তাহার আদর্শ কলুষিত না হয় এই ভাবেই আমাদের বৈষয়িক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কিন্তু পারিবারিক জীবন আমাদের দেশে আবহমান কাল হইতে পল্লীতেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে। পল্লীর মধ্য দিয়াই ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। কাজেই যাহাতে মৃতপ্রায় পল্লীসমাজ পুরাতন আদর্শে আবার উজ্জীবিত হইয়া উঠে, যাহাতে পল্লীর নরনারীগণ দুঃখ দারিদ্র্য মুক্ত হইয়া আবার সনাতন জীবন ধারায় জীবন মিশাইতে পারে, লেখক তাহারই পন্থা উদ্ভাবনে ব্রতী হইয়াছেন।

লেখকের এই ব্রতে বঙ্গদেশের সকল লোকেরই সহকর্মী হওয়া উচিত। উপায় নির্দ্ধারণে যতই মতভেদ হউক, জীবনের আদর্শ নির্ণয়ে যতই বিবাদ থাকুক, লেখক যে উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন সে সম্বন্ধে কেহই বিরুদ্ধ মত পোষণ করিবেন না।

লেখক পল্লীসেবার বিষয়ে এত চিন্তা করিয়াছেন ও তদ্বিষয়ে এত অনুসন্ধান করিয়াছেন যে তাঁহার নিকট হইতে আমরা আরও কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা প্রত্যাশা করি।

প্রথমতঃ প্রজাস্বত্ব বিষয়ক। "গৃহস্থের" এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় মহাশয় প্রজাদিগের যে দুঃখের বিবরণ দিয়াছেন ঐ সকল বিষয়ে আরও বহু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। পল্লীসেবায় ব্রতী হইলে পল্লীবাসিগণ আজকাল কত বিষয়ে দুঃখ ও অপমান সহ্য করিতেছে তাহা না জানিলে সেবা কার্য্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ আজকাল পল্লীতে পল্লীতে একটা দুর্নীতির আবহাওয়া উঠিয়াছে। পল্লীকে ধর্ম্মের নিকেতন ও সারল্যের আবাস বলিতে অনেক গ্রাম্যজীবনাভিজ্ঞ ব্যক্তিই সঙ্কুচিত হয়েন। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ফলে, দারিদ্র্যের তাড়নায় এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পল্লীসেবককে এ বিষয়ে অন্ধ থাকিলে চলিবে না। যে দুর্নীতিতে পল্লীর পারিবারিক জীবনকে কলুষিত করিতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাহার প্রকোপ কতখানি, তাহা কি কি কারণে উদ্ভূত, তাহার নিরাকরণ কি কি পন্থা অবলম্বনে সাধিত হইতে পারে সে বিষয়ে বহু অনুসন্ধান আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ পল্লীসমাজকে সভ্যতার কেন্দ্র করিতে হইলেই পল্লীতে যাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সন্তুষ্টচিত্তে জীবন-যাপনপূর্ব্বক দেশে নূতন নূতন চিন্তাজগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতে সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ অরণ্যকেই সভ্যতার নিকেতন, দর্শনের মন্দির করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজকাল এরূপ মুনি ঋষির নিতান্তই অভাব। কাজেই, আজকাল যাহারা চিন্তাবীর তাহাদিগকেই গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। নতুবা গ্রাম কখনই সভ্যতার কেন্দ্র হইতে পারিবে না। নগর যে আজ গ্রামকে চালন করিতেছে তাহার অর্থ ই এই যে নগর হইতে গ্রামে ভাবের প্রবাহ ছুটিয়া যাইতেছে; নগরেই সকল নূতন ভাবের মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। এখন এই সকল নূতন ভাবের ভাবুকগণ কি ভাবে গ্রাম্য জীবনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবেন, কিরূপে জীবন যাপন করিবেন তাহার সবিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

অন্নকাঙ্গাল

তোমরা তাহারে করিয়ো না হেলা,
আদর তাহারে করিয়ো দান,
খিদের তাড়ায় হারাল যে সব,
খিদের তাড়ায় খোয়াল মান !

শুভ্র তাহার আছিল জীবন,
গেছে কালি হয়ে খিদের চোটে,
চোর লম্পট সকলি সে আজ,
দুনিয়ায় তার ঘর না জোটে !

বক্ষ তাহার আশার বাগান
ছিল এক কালে, আজিকে হায় !
মরুর মতন জ্বলিছে সতত,
তপ্ত নিশাস উড়িছে বায় !

গর্ব্বে তাহার ছিল শির উঁচু,
আজি সে সবার পায়ের তলে,
মারিলেও রোষ করে না কখনো,
খোসামুদী চালে সতত চলে !

দেহে বুঝি তার তপ্ত শোণিত
ঠাণ্ডা হয়েছে অনেক কাল !—
উদ্যম আর নাইরে এখন
গাঁথিতে নিত্য কর্ম্ম-জাল !

নেশায় ডুবায়ে রাখিবারে চায়
চিন্তার যত দহন জ্বালা,
মায়া মমতার শত আহ্বানে
হইবারে চায় কঠোর কালা !

তা বলে' তাহারে তুচ্ছ ক'রো না,
অন্নকাঙাল কি করে আর ?
ফেলো তার তরে একটি নিশাস,
ফেলো এক ফোঁটা নয়নাসার !

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

প্রজার দুঃখ

বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইবার সময় কোম্পানী মনে করিয়াছিলেন বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইলে জমিদার প্রজার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে। প্রজারও খাজনা নির্দ্দিষ্ট হইলে প্রজা নিজের জমী মনে করিয়া উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবে। আইন প্রচলিত হইলে বহুকাল পরে গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন জমিদার প্রজাকে করতলগত করিয়া নানা প্রকারে অর্থ আদায় করিতেছে, প্রজার দুঃখের অন্ত নাই। ১৮৮৫ সালে তাই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন পাশ হইল। অত্যাচার কিছু কমিল কিন্তু প্রজা নিশ্চিন্ত হইল না। কারণ জমীদার আইন না মানিয়া টাকা আদায় করিলে প্রজাকে আদালতে যাইয়া নালিশ করিতে হইবে। তাহাতেও টাকা খরচ, বিচার-ফল অজ্ঞাত। আর জলে থাকিয়া কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করা প্রজার পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এ সকল কষ্ট প্রজার সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুই প্রকারের কষ্টে প্রজা "ত্রাহি মাম্ মধুসূদন" রবে চীৎকার করিতেছে। জানি না তাহাদের নীরব ক্রন্দন যথাস্থানে পৌঁছিবে কি না। রাজার নিকট জমীদারের দুঃখ কাহিনী জানাইবার জন্য জমীদার সভা আছে। কিন্তু প্রজার দুঃখ জানাইবার কোন সভাসমিতি তো নাই সংবাদপত্রেও তাহাদের দুঃখ নিবারণের জন্য যথারীতি আন্দোলন হয় না। আজ তাই প্রজার পক্ষ হইতে দু একটি কথা বলিব।

যেদিন পত্তনি প্রথার প্রথম প্রচলন হয় সেই দিনই প্রজার দুঃখের বিষবৃক্ষ জন্ম লইয়াছিল। প্রজা এখন সেই বিষবৃক্ষের ফল ভোজন করিতেছে। যে সকল পুরাতন জমীদার জমীদারি স্বত্ব রাখিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের প্রজার কোন দুঃখ নাই। কেন না তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখেন কেহ ১০০০৲ টাকা রাজস্ব প্রদান করিয়া খরচ খরচা বাদে কেহ ১০০০৲ কেহ ২০০০৲ কেহ বা ততোধিক টাকা বাঁচান ইহাই তাঁহাদের মুনফা। কাজেই তাঁহাদের অসন্তোষের বড় কারণ থাকে না। এতদ্ভিন্ন উৎপন্ন ফসলের মূল্য বৃদ্ধির সহিত প্রজাও কোথাও কোথাও বিনা ওজর আপত্তিতে সামান্য বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিয়া থাকে। এরূপ জমিদারি পত্তনি বিলি হইলে পত্তনিদার জমীদারকে যৎকিঞ্চিৎ সেলামী দিয়া থাকেন। এই সেলামীর টাকাটা সময়ে সময়ে বড়ই বাড়িয়া উঠে। মোট হস্তবুদের টাকা হইতে শতকরা ১০৲ হিসাবে যে সরঞ্জামী খরচ বাদ দেওয়া হইয়া থাকে অনেক সময় তাহাতে খরচ কুলায় না। কাজেই পত্তনিদারকে আয়ের আইনসঙ্গত পন্থা আবিষ্কার করিতে হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক নূতন পত্তনীদার যেরূপে এই আয়ের পন্থা বাহির করিয়াছিলেন তাহাই নিম্নে যথাযথ বর্ণনা করিতেছি।

সকলেই জানেন খিরাজী জমির প্রধানতঃ দুই প্রকার স্বত্ব। এক মৌরসী স্বত্ব আর এক অধিকারের স্বত্ব। প্রথমোক্ত স্বত্ব

হস্তান্তর ও দান বিক্রয় করা যাইতে পারে। ২য় প্রকারের স্বত্ব উত্তরাধিকারী ভোগদখল করিতে পারিবে কিন্তু দান বিক্রয় করিতে পারে না। প্রজা যদি কবুলতি দিয়া জমীদারের নিকট জমী লইয়া বা অন্য কোন প্রকারে ১২ বৎসরের অধিককাল ভোগ দখল করিতে পারে তাহা হইলে ২য় প্রকারের স্বত্ব জন্মে। জমীদার এরূপ প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারেন না। আর প্রজা যদি চেক দেখাইয়া প্রমাণ করিতে পারে যে সে ২০ বৎসরের অধিককাল বর্দ্ধিতহারে খাজনা না দিয়া এক খাজনা দিয়া আসিতেছে তাহা হইলে তাহার খাজনাও বাড়িতে পারে না তদ্ভিন্ন হস্তান্তর করিবার অধিকার আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় কিন্তু জমীতে প্রজার কোন প্রকারের স্বত্ব আছে ইহা লইয়া জমীদারের সহিত প্রজার মোকর্দ্দমা হইলে প্রজা এতদিনের চেক বাহির করিতে পারে না। কারণ যাহাদের সেরূপ স্বত্ব আছে তাহারা কোনদিনই ভাবে নাই যে জমীদারের সহিত এই বিষয় লইয়া বুঝাপড়া করিতে হইবে। অশিক্ষিত বাঙ্গালী প্রজার নিকট এরূপ দূরদর্শিতা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না কাজেই পত্তনীদার ধরিয়া লইয়া থাকেন তাঁহার জমীদারীর মধ্যে এরূপ স্বত্বের জমী একেবারেই নাই।

যখন ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন বিষয়টা ছিল কি না ঠিক বলিতে পারি না কিন্তু কিছুদিন হইতে জমীদার বলিতেছেন "আমার বিনা অনুমতিতে প্রজা তাহার কোন জমা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। যদি কোথাও চৌথ দিবার প্রথা থাকে তাহা হইলে বিক্রেয় জমীর মূল্যের চৌথ অর্থাৎ সিকি টাকা আমাকে দিলে আমার খুসী হয় প্রজাকে বিক্রয়ের অনুমতি দিতে পারি। আমার বিনা অনুমতিতে জমী বিক্রয় করিলে খরিদদারকে আমি প্রজা বলিয়া স্বীকার করিব না তাহাকে যেদিন ইচ্ছা উচ্ছেদ করিয়া দিব।" ইহার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিতেছি।

যে জমীদারীর কথা বলিতেছি সেখানে পুরাতন জমীদারের সদর কাছারীতে জমীদারকে ২।১৲ টাকা নজর দিয়া নায়েব মহাশয়ের প্রণামীস্বরূপ কিছু দিলেই নাম খারিজ হইত। জমীদারের নিকট কোন প্রকার আবেদন করিতে গেলেই এইরূপ নজর দিবার প্রথা ছিল। জমীদার জমীদারীতে পদার্পণ করিলে প্রজারা জমীদারের সাক্ষাৎ করিতে যাইত তখনও নজর দিত। সুতরাং নাম খারিজের জন্য যে নজর দেওয়া হইত তাহা নাম খারিজের মূল্য নহে। কিন্তু কোথাও কোথাও এই নজর পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সেলামী আখ্যা পাইয়াছে। যাহা হউক এই জমীদারীর প্রজারা স্মরণাতীতকাল হইতে তাহাদের জোতজমা বিক্রয় করিয়া আসিতেছিল। নাম খারিজের জন্য কেহ ভাবিতও না। বিক্রেতার নামেই জমা লেখা থাকিত। ক্রেতার গুজরতে খাজনা জমা হইত। পুরাতন জমীদার একদিনের জন্যেও উচ্ছেদের কথা তুলেন নাই।

নূতন পত্তনীদার পুরাতন মোহস্তার নিকট এই সকল বহুকালের হস্তান্তরিত জোত জমার সংবাদ লইয়া একজন প্রজার উপর উচ্ছেদের নালিশ করিলেন। প্রজা পুরাতন প্রথা সপ্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী জোগাড় করিতে লাগিল, পত্তনীদার মাতব্বর সাক্ষীদিগকে বলিলেন "আপনারা সাক্ষী দিবেন না, আপনাদিগকে কোন জমী হইতে

উচ্ছেদ করিব না।" সাক্ষী ভাঙ্গিয়া গেল। প্রজা বাধ্য হইয়া সিকি টাকা সেলামী ও বর্দ্ধিতহারে খাজনা দিয়া রেহাই পাইল। কেন না এই সময়ে বহু নজীর বাহির হইল, সিকি টাকা পণ দিয়া হস্তান্তরের পর নাম খারিজ করিবার প্রথা কোথাও সপ্রমাণ হইল না। বিচারপতিরা সর্ব্বত্র জমীদারের পক্ষে উচ্ছেদের ডিক্রী দিলেন। একজন প্রজা দায়ে পড়িয়া মিটমাট করিবার পর সকলেই উচ্ছেদের ভয়ে সেলামী ও বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিয়া নিষ্কৃতি পাইল। পত্তনীদার যত টাকা সেলামী দিয়া পত্তনী স্বত্ব বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ছিলেন প্রজার নিকট তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা আদায় করিয়া হস্তবুদ বাড়াইয়া জমীদারী দরপত্তনা দিলেন। নিজের বেশ দুপয়সা লাভ রাখিলেন বলাই বাহুল্য। এক মুর্শিদাবাদে একটা ডিহিতে যেরূপ কাণ্ড হইয়াছে জানিনা সমস্ত বাঙ্গালা দেশে সেইরূপ কত স্থানে প্রজাপীড়ন চলিতেছে।

এইবার দ্বিতীয় প্রকারের প্রজা পীড়নের কথা বলিব। কোন জমী বাকী খাজনার ডিক্রিতে নীলাম হইলে নীলাম খরিদদারকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে জমীদার বাধ্য কিন্তু অন্য কোন ডিক্রির নীলামের খরিদদারকে জমীদার প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। এখন প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে আছে বাকী খাজনার ডিক্রির জন্য প্রথার যে কোন জমা নীলামে বিক্রীত হইতে পারে। যে জমীর জন্য খাজনা বাকী পড়িয়াছে সেই জমী প্রথমে নীলামে বিক্রীত হইলে যদি ডিক্রির সমস্ত টাকা আদায় না হয় তাহা হইলে তাহার অন্য সম্পত্তিও নীলামে বিক্রীত হইতে পারে আইনে এইরূপ বিধান থাকিলেই ন্যায়সঙ্গত হইত। রাম যদুর ৫টা জমার মধ্যে একটা জমা খতের দেনার ডিক্রীর নীলামে অথবা যদুর নিকট হইতে খরিদ করিলেন। দেশের প্রথা অনুযায়ী নাম খারিজ করিতে রাম বিলম্ব করিলেন খাজনাও বাকী ফেলিলেন। জমীদার বাকী খাজনার দায়ে রামের জমী নীলামে না চড়াইয়া যদুর ৫টা জমার মধ্যে ২।১ টা জমা নীলামে চড়াইলেন। যদু দায়ে পড়িয়া ডিক্রির টাকা দাখিল করিলেন। রাম নির্ব্বিবাদে ক্রীত জমা ভোগ করিতে লাগিলেন। যদুর সাধ্য থাকে নালিশ করিয়া রামের নিকট হইতে এ আদায় করিতে পারেন। আপাততঃ কিন্তু তাহাকে স্বত্ব হইতে নয়দ টাকা বাহির করিতে হইল এ আইন কি সঙ্গত?

জমীদারের বিনা অনুমতিতে কিম্বা প্রথা প্রচলিত থাকিলে চৌথ বা সিকিটাকা সেলামী না দিয়া কোন জমা হস্তান্তর করিতে পারিবে না এইরূপ নজীর বাহির হওয়াতে প্রজার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে এইবার তাহাই দেখাইব। বাঙ্গলা দেশে "সম্পত্তি" বলিতে মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে কোন জমাই বুঝাইত। এই আইনে সম্পত্তি বলিয়া কিছু আর থাকিল না। প্রজা তাহার জমী বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদি জমীদার সিকি টাকা সেলামী লইয়া হস্তান্তরের অনুমতি দেন তথাপি এই সিকী টাকা ও কর্ম্মচারীদিগের দস্তুরী যোগাইতে অর্দ্ধেক টাকা চলিয়া যাইবে, কেননা কর্ম্মচারী বেশী টাকা না পাইলে জমীদারের নিকট রিপোর্ট করিবেন "ক্রেতা ৫০০৲ টাকায় জমী খরিদ করিয়াছে কিন্তু চৌথের পরিমাণ কমাইবার জন্য খতে ৩০০৲ টাকা লিখাইয়াছে।" আর যেখানে সিকি টাকা দিবার প্রথা নাই সেখানে জমীদারের অনুমতি লাভ

করা একেবারে অসম্ভব। জমিদার বলিবেন "তুমি জমী ছাড়িয়া দাও, আমি অন্য প্রজাকে বিলি করিব। আমি তোমাকে বিক্রয় করিতে দিব না।"

সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে তো এইরূপ ব্যাপার, বন্ধক দেওয়া সম্বন্ধেও সেই বিপদ। উত্তমর্ণ বলিবে "আমি তোমাকে টাকা ধার দিয়া ফিরিয়া পাইব কেমন করিয়া? নীলাম করিতে গেলে তুমি তো জবাব দিয়া বসিবে 'এ জমীতে হস্তান্তর যোগ্য কোন স্বত্ব আমার নাই।' তুমি যদি সেরূপ জবাব নাই দাও তোমার জমীদার যে নীলাম খরিদদারকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিবে না সুতরাং নীলাম খরিদদার পাইব কোথায়?"

ফল এই হইয়াছে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত প্রজা এতদিন যাহাকে সম্পত্তি বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে আজ দেখিতেছে তাহা সম্পত্তি নহে। সহর বাজারে দোকান বা ভাড়ার ঘর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় কি? পল্লীতে আর কিছু সম্পত্তি বলিয়া থাকিল না। টাকা সুদে খাটাইবার তিন প্রকার পন্থা ছিল। অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া, জমী বন্ধক রাখিয়া ও শুধু হাতে। শেষ প্রকারে টাকা ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ২য় প্রকারের উপায় তো বন্ধ হইল। থাকিল কেবল প্রথম উপায়। সামান্য পুঁজির লোকে যৌথ কারবারের অংশ কিনিয়া বা কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া কি আয় করিবে? বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত প্রজার টাকা খাটাইবার উপায় আর থাকিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিবে জমীদার, অথচ জমীর প্রকৃত মালিক প্রজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট পাইলেন মহাজনের সুদের অত্যধিক হারে প্রজা বড় বিপদে পড়িয়াছে তাহার জমীজমা নীলাম হইয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আইন করিতে চাহিলেন প্রজা জমী পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবে কিন্তু বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া প্রজাকে অত্যধিক সুদ ও তজ্জনিত মহাজনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু আপত্তি হইল। ইহাতে প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। অসময়ে বৎসর মহাজনের নিকট অত্যধিক সুদে টাকা লইয়া ফসল হইলে প্রজা শোধ দিতে পারে। বিবাহে বা শ্রাদ্ধে অর্থের প্রয়োজন হইলেও বেশী সুদেই হউক বা অল্প সুদেই হৌক প্রজা এখন মহাজনের নিকট টাকা পায়। সময়ে কেহ কেহ শোধও করে। কিন্তু মহাজন যদি জানে যে জমী বিক্রয় করিয়া সে টাকা আদায় করিতে পারিবে না তাহা হইলে হয় সে টাকা ধার দিবে না, নয় টাকা ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া বেশী সুদ চাহিবে। কাজেই ইহাতে প্রজার কষ্ট বাড়িবে। শুনিয়াছি এ প্রদেশে এরূপ আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় আইনের ধারায় একটু সামান্য পরিবর্ত্তনে প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

শ্রীরাখালরাজ রায়

ভক্তি-পুষ্প

"অনাঘ্রাত ফুল চাহিগো আজিকে
মায়ের পূজার তরে"—
বলিয়া নৃপতি পাঠাল তখন
চারিদিকে অনুচরে।

নানা দিক খুঁজি হতাশ হইয়া
ফিরিয়া আসিল সবে,
বেলা দ্বিপ্রহর, পূজার সময়
অতীত হয়েছে তবে!

ক্ষুণ্ণচিত্ত রাজা জিজ্ঞাসে তখন,
"কয়টি এনেছ ফুল?"
সবিনয়ে সবে কহিল, "হে প্রভু,
হয়েছে মোদের ভুল,—

যেখানে যে ফুল পেয়েছি দেখিতে,
দেখেছি তথায় হায়,
মধুপান করি অলিদল যত
গুঞ্জরিয়া চলি যায়!

বুঝিনি ত আগে অনাঘ্রাত ফুল
পাইব কেমন করে'?
বড় অপরাধ হয়েছে, রাজন,
ক্ষমা চাই যোড় করে।

ভকতি রয়েছে হৃদয়ে মোদের,
কুসুম তাহারে কয়,
অনাঘ্রাত সেই, দিতে পারি তারে,
অনুমতি যদি হয়!"

হাসিয়া নৃপতি বলিল তখন,
"অইত আমার চাই,
মায়েরে পূজিতে উহা ছাড়া আর
পবিত্র কুসুম নাই!"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

সাগরের ডাক

(নাটিকা)

ক

উল্টাডাঙা—গলি

বঙ্কিম। অত চুপচাপ কেন, মধু?

মধু। চুপচাপই আজ ভাল লাগ্‌ছে।

বঙ্কিম। এতদিন ত লাগেনি। আজ কেন?

মধু। চিরদিন কি একভাবেই যায়?

বঙ্কিম। তা যায় না বটে। কিন্তু অভ্যাস বলে' ত একটা জিনিষ আছে। তা হঠাৎ বদলায় কি? ছোটবেলা থেকেই তোমাকে দেখে আস্‌ছি—এমনতর ত কোনদিন দেখিনি; এমন তুমি হ'তে পার, তাও ত আমার ধারণা ছিল না। আজ তোমার হয়েছে কি?

মধু। কি হয়েছে, তা আমি নিজেই এখনো ধর্‌তে পারিনি। তবে আজ কারু সঙ্গ ভাল লাগ্‌ছে না, এটা বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

বঙ্কিম। কি হয়েছে, তাও টের পাওনি, অথচ কারু সঙ্গও ভাল লাগ্‌ছে না! কোন নতুন রোগের সৃষ্টি হল না কি? না, ভাই, খুলে বল, ব্যাপার খানা কি। তুমি নিশ্চিত আমায় গোপন কর্‌ছ।

মধু। গোপন ঠিক নয়, বঙ্কিম। মনের মধ্যে কখনও এক একটা ভাব জাগে, যা এত ঘোঁয়াটে যে নিজের কাছেই তার ঠিক মূর্ত্তিটা ধরা পড়ে না, এমন কি তার কারণটাও অস্পষ্ট থেকে যায়।

বঙ্কিম। তোমার ভাবান্তরের কারণটা কি, শুন্‌তে পারি? না, তাও টের পাও নি?

মধু। কি হবে শুনে?

বঙ্কিম। শুন্‌লে কি দোষ?

মধু। শুন্‌লে তুমি ঠাট্টা কর্‌বে।

বঙ্কিম। কেন, ঠাট্টাই কি আমার ব্যবসা?

মধু। শুন্‌বে?

বঙ্কিম। নইলে এত বক্তৃতা কর্‌ছি কি জন্যে?

মধু। যথার্থই শুন্‌বে?

বঙ্কিম। হাঁ গো হাঁ।

মধু। কাল বিকেলে একটা পথিক গান করে' যাচ্ছিল।

বঙ্কিম। তাই কি?

মধু। তার গান্‌টা বড় মিঠে—গলাটাও ভারী মিষ্টি।

বঙ্কিম। কিসের গান?

মধু। সাগরের।

বঙ্কিম। এই শুক্‌নো ডাঙার রাজ্যে সাগরের গান ত বিস্তর শোনা গেছে—সেটায় আর নূতনত্ব কি?

মধু। নূতনত্ব?—হাঁ, তা আছে বই কি। চিরপুরাতনই যে নতুন হয়ে মাঝে মাঝে আমাদের সাম্‌নে দাঁড়ায়। শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় সে বসে' থাকে।

আচ্ছা, ভাই, তোমার কি সাগর দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না ?

বঙ্কিম। না, অমন ইচ্ছেকে আমি ক্ষ্যাপামির মধ্যেই গণনা করি। তার চেয়ে কিসে দু' পয়সা আসে, তার উপায় চিন্তা কর্‌লে কায দেয়। সাগর দেখে আমার লাভ ?—অন্নের সংস্থান হবে ?—সংসার চল্‌বে ? এ ভাঙার দেশ, এখানে হাঁট্‌তে হবে, ফির্‌তে হবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাট্‌তে হবে। এখানে সাগরের কোন প্রয়োজন নেই—এখানে তার কথাটা পর্য্যন্ত অলসের স্বপন ছাড়া আর কিছুই নয়।

মধু। তাইত, তুমি প্রয়োজনের নিক্তিতে সব ওজন করে' বেড়াচ্ছ! তুমি আমার ভাবটা বুঝ্‌বে না, কেন না তার প্রয়োজনটা তোমায় আমি এখন ভাল করে' বুঝিয়ে দিতে পার্‌ব না।

বঙ্কিম। বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি। তোমার কাছে ধোঁয়াটে হলেও তোমার ভাবটা আমার কাছে আর ধোঁয়াটে নয়। তুমি সাগরের গান শুনে' সাগর দেখবার জন্যে পাগল হতে চলেছ—ঐ যা অনেকেই হয়েছেন। সংসারটা মাটি কর্‌বে দেখ্‌ছি। তোমাকে বুদ্ধিমান বলে' আমার ধারণা ছিল। সে ধারণাটা বদ্‌লিয়ে দাও কেন ?

মধু। না, আর কথা নয়। তোমার যা বল্‌বার বলে গেলে,এখন কায থাকে, সরে' পড়তে পার। কেবো লোক,—সময় নষ্ট কর্‌বে কেন ?

বঙ্কিম। তা ঠিক বলেছ। ক্ষ্যাপার সঙ্গে বেশীক্ষণ থাক্‌লে কায নষ্ট হবারই কথা। আমি যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে' যাই,—মনে রেখো। লেখা পড়া শিখেছ, বুদ্ধিও আছে, সে গুলোকে অপব্যয় ক'রো না। একটা খেয়ালের ঝোঁকে ঘুরে মরবার কোনই আবশ্যকতা নেই। সাগর আছে কি না আছে, কোথায় আছে, দেখ্‌তে কেমন—এ সব বাজে বিষয় ভেবে সাংসারটা অধঃপাতে দিয়ো না। সংসারটাই সত্য—তার উন্নতির জন্যেই চেষ্টা কর। যেটা থাকা না থাকা উভয়ই সমান—যেটা কোন দরকারেই লাগ্‌বে না, তার জন্যে জীবনপাত করা মানুষের ধর্ম্ম নয়।

(প্রস্থান)

মধু। কি উৎপাত! বেশ চুপচাপ ছিলাম, মনের এককোণে একটা আনন্দের আভাস জাগ্‌ছিল। হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় বুঝি সব ছিনিয়ে নিয়ে গেল রে!

সত্যি কি ?—এই উল্টাভাঙায় ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া, নাওয়া পরার মধ্যে ডুবে থাকাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, একমাত্র লক্ষ্য ? তা ছাড়া আর সব বাজে ? সাগর এখানে মিথ্যা ? তার কথা বলাও পাগলের প্রলাপ ? তবে সাগরের দিকে এত লোক ছুটবার কথা শুন্‌তে পাই কেন ? বাড়ীঘর বিকিয়ে দিয়ে, ধনদৌলত পায়ে ঠেলে কত লোক ত আজও ছুট্‌ছে। কোন্‌টা সত্য ?—সাগর, না ধনদৌলত ? পাগল কারা ?—যারা ছুট্‌ছে, তারা ? না, যারা এই সব আঁকড়ে ধরে' পড়ে আছে, তারা ?

ঐ যে নিবারণ দা আসছেন। দেখি, উনি কি বলেন।

[নিবারণের প্রবেশ]

নিবারণ। কিহে মধু, কি কর্‌ছ এখানে ?

মধু। কিছু না।

নিবারণ। এমন সময়টা কিছু না করে' কাটিয়ে দিচ্ছ ?

মধু। কি কর্‌ব, নিবারণ দা ?

নিবারণ। এই যা কিছু নিয়ে একটু আমোদ।

মধু। সেটা কি একটা কাম হবে?

নিবারণ। আমোদই ত দুনিয়ার কাম হে। তাছাড়া আর যা কিছু, সবই ত খাটুনি—ওতে তোমার নিবারণ দা নেই। চল, আড্ডায় চল, একটা কিছু খেলা যাবে।

মধু। না, নিবারণ দা, আজ মাপ কর্‌তে হবে।

নিবারণ। সে কি? মুখখানা অত গম্ভীর কেন? কি ভাব্‌ছ? আরে ভাবাটাও যে মস্ত একটা খাটুনি! ছি! ছি! শরীর নষ্ট কর্‌তে আছে? তার চেয়েও মূল্যবান সময় নষ্ট কর্‌তে আছে? দু দণ্ডের জীবন বইত নয়! আমোদ কর আমোদ —কর।

গান

(পিলু—বং)

নিমেষ তরে মনের বাটি
সাম্‌নে শুধু পাই,
ফেল্‌ব তারে কেমন করে',—
চাইব কারে ভাই?
থাক্‌বে গভীর তত্ত্ব-কথা,
থাক্‌বে কাবের মস্ত ব্যথা—
জীবনটারে পাও করা
সাধ্য মম নাই।
ঐ রসটা আমার সত্যি জেনে,
ভয়-ভাবনায় তুচ্ছি হেনে,
চুমুক দিব—নিমেষ বাদে—
রইবে পড়ে' ছাই।

কি গো, পেচক বাহাদুর, মনে লাগ্‌ল? আঁখি ত মুদ্‌তেই হবে, আর মুদ্‌লেই সব অন্ধকার, তখন আগে থাক্‌তে মুদে লাভ কি? না, যাবে বক্‌বার সময় নেই। যাবে কি না বল?

মধু। না।

নিবারণ। তবে থাক পড়ে' অন্ধকারে। সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়। আমি চ'ল্লাম।

মধু। শোন।

নিবারণ। কি?

মধু। আচ্ছা, তোমার কখনও কি কোন ভাবনা আসে না?

নিবারণ। না।

মধু। এ হ'তেই পারে না।

নিবারণ। তবে আসে!

মধু। না, না সত্যি বল।

নিবারণ। আসে,—যখন আমোদের বিঘ্ন জোটে।

মধু। তবে?

নিবারণ। তবে কি হে? আমি কি তাতে ডরাই? নতুন আমোদ সৃষ্টি কর্‌তে আমার কণামাত্রও বিলম্ব হয় না।

মধু। তুমি কেবল আমোদই চাও, নিবারণ দা।

নিবারণ। ঠিক বুঝেছ। আমোদই চাই।

মধু। তবে নতুন একটা আমোদ কর না।

নিবারণ। কি?

মধু। তুমি হাস্‌বে।

নিবারণ। বল না কি?

মধু। সাগর দেখ্‌বার—

নিবারণ। না—না, ওটা একেবারেই আমোদ নয়—বরং তার উল্টো। হাতের কাছে যা পাই, তাই নিয়েই আমার আমোদ। দূরের জিনিষে—অজানার রাজ্যে পা বাড়াবার সখ আমার কিছুমাত্র নেই।

মধু। তবে যাও।

নিবারণ। যাচ্ছি। কিন্তু এই সখটার জন্যেই কি তুমি মুখ ভার করে' রয়েছ?—ওটা ত সাগর দেখ্‌বার সখ নয়, জীবনটা তাড়াতাড়ি নষ্ট করবার সখ! দুদণ্ডকে একদণ্ডে নিয়ে যেতে আমোদ পাও, কর। কিন্তু আমি তা কর্‌তে পারব না। যাই—পালাই।

(সহসা তুড়ি দিয়া শীস দিতে দিতে প্রস্থান)

মধু। সাগরকে তবে কি কেউ চায় না? তাকে চাওয়াটাই মস্ত একটা ব্যর্থতা?

[গান করিতে করিতে ফুল দূর্ব্বা লইয়া কতকগুলি বালিকার প্রবেশ]

গান

পুণ্যিপুকুর করবি কেগা
চল্ লো ত্বরা চল্।
শুক্‌নো ডাঙা ভিজিয়ে দিব
এনে সাগর-জল।
বোশেখ মাসের দারুণ খরায়,
ছাতি সবার ফাট্‌ছে তিয়াষ
আগুন হাওয়া হল্‌কা হেনে
বইছে অবিরল!
চল্‌লো ত্বরা চল্।
"সাগর—সাগর" ডাক্‌লে পরে,
বান ডাকিবে শুক্‌নো সরে,
মরা নদী ছুট্‌বে ভরা,
মিল্‌বে হাতে ফল।
চল্‌লো ত্বরা চল্।

মধু। কিগো, বাছারা—তোমরা পুণ্যিপুকুর কর্‌তে চলেছ? কেমন করে' কর্‌বে?

একজন। সে কি গো!—তুমি পুণ্যিপুকুর দেখনি?

মধু। না।

একজন। তোমাদের বাড়ীতে বুঝি মেয়েছেলে নেই?

মধু। আছে।

একজন। তারা করে না?

মধু। না।

একজন। বা—রে—বা! পুণ্যিপুকুর করে না! শুন্‌ছিস লা?—কেমন ধারা মেয়ে!

মধু। বল—কেমন করে' কর্‌বে?

একজন। এই—খানিকটা মাটি খুঁড়ে' ছোট্ট একটা পুকুর কাটিব—একহাত লম্বা, একহাত চওড়া। তার বেশী বা কম হওয়া দোষের। তাতে জল ঢেলে ফুল দুর্ব্বো দিয়ে পুজো কর্‌ব। দক্ষিণ মুখো হয়ে' পুজো কর্‌তে হয়,—সকলে মিলে এক সঙ্গে।

মধু। তারপর?

একজন। তারপর সকলে সেই জলে হাত দিয়ে বল্‌ব—

"পুণ্যিপুকুর-জল—
পুণ্যিসাগর-জল,
এই জলে আজ ঠাণ্ডা হবে
তপ্ত ধরাতল!—
টিপ্ টিপ্ টিপ্"

তিনবার বলে' পড় করলেই পুজো সাঙ্গ হলো।

মধু। বেশ ত পুজো! একবার দেখ্‌তে যাব। কোথায় হবে?

একজন। গণ্ডীপাড়ায়।

মধু। আচ্ছা, তোমরা এস।

[বালিকাদের প্রস্থান]

পুণ্যিপুকুর করে' এরা সাগরকে ডাক্‌ছে—ভাব্‌ছে পুণ্যিপুকুরের জলেই সাগর জলের আবির্ভাব হবে! কি সরল বিশ্বাস! ঐ বিশ্বাসেই ওদের পুণ্যি, ঐ বিশ্বাসেই ওদের আনন্দ! কতকাল ধরে' এই ব্রতটা চলে' আস্‌ছে, কিন্তু আজও কেউ সাগর-জলের দেখা পেল না। কে এই ব্রতটা উদ্‌যাপন করে গেছে? সে কি সাগরের সন্ধান পেয়েছিল? সে কি সাগর দেখেছিল? না, মিথ্যা একটা কল্পনা দিয়ে এদের আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করে' গেছে? মিথ্যাই যদি হয়, তবে আজও সে মিথ্যা ধরা পড়্‌ল না কেন?—এমন ব্যর্থ বিশ্বাস এরা ধরাল না কেন? না—না, সাগর আছে। নইলে প্রাণ তাকে দেখ্‌তে চায় কেন?

সাগর—সাগর, তুমি নাই ? থাক্‌লে, কোথায় আছ ? আমি তোমায় দেখ্‌ব। দেখ্‌তে কি পাব না ?

গান

বেহাগ

ঘুমায় যাবে নয়ন,
(আমার) পথে আঁধার ছায়—
দেখ্‌তে যারে চাহি,
তারে দেখাই হ'ল দায় !
নানান্ জনের কথা খেটে,
দিবস আমার যাচ্ছে কেটে,
তাতায় দেশে
কেউ বলে না
সাগর কোথা—হায় !
জানে কি কেউ তাহার কথা ?
পায় না কি কেউ গভীর ব্যথা ?
হয় না কি প্রাণ
ব্যাকুল কারু
দরশ-লালসায় ?

—•—

খ

উল্টাডাঙা—গণ্ডীপাড়া

অচলদেব। কাযটা ভাল কর্‌ছ না, চঞ্চলকুমার।

চঞ্চলকুমার। মন্দই যে কর্‌ছি, তার প্রমাণ কি ?

অচলদেব। মন্দ নয় ?—বাপদাদারা যা করে' গেছেন, তা না করা মন্দ নয় ?

চঞ্চলকুমার। আপনারাই কি তা কর্‌ছেন ?

অচলদেব। করছিই ত মনে হয়।

চঞ্চলকুমার। শোওয়া বসা, ওঠা নামা, খাওয়া পরা, চলা ফেরা, আদব কায়দা সবই কি ঠিক আছে ? সময়-গুণে, সুযোগ বুঝে অনেক জিনিষ কি আপনাদের বদলাতে হয় নি ?

অচলদেব। তা কিছু কিছু বদ্‌লালেও মূলে আমাদের ঠিক আছে। তোমরা যে মূলপর্য্যন্ত উল্টিয়ে দিচ্ছ !

চঞ্চলকুমার। কোন্‌টা মূল আপনাদের ?

অচলদেব। ঐ ত—তা পর্য্যন্ত তোমাদের জানা নেই ! বলি, দেবাক্ষর পড়্‌তে পার ?

চঞ্চলকুমার। তার সঙ্গে মূলের কি সম্পর্ক ?

অচলদেব। তা পরে হবে। বল, দেবাক্ষর পড়্‌তে পার কি না।

চঞ্চলকুমার। দেবাক্ষর আবার কোন্ গুলো ?

অচলদেব। তা-ও জান না ? ওঃ—কপাল !

চঞ্চলকুমার। জানি খুব ভালই। কিন্তু আমি দেবাক্ষর বলি না। দেব দেবী আবার কি ? যত সব ছাই ভস্ম ! নরাক্ষর বলুন, মান্‌তে রাজী আছি।

অচলদেব। পাষণ্ড নাস্তিক কোথাকার ! তোর মুখ দেখ্‌লেও অশুচি হয়। তুই এতদূর গোল্লায় গিয়েছিস্ তা'ত জানতাম না। ঐ নবীন ছোড়েই তোর মাথাটা খেয়েছে, দেখ্‌ছি। দেবদেবী মান না এতখানি অহঙ্কার ? রোস, শীগ্‌গিরই টের্‌টা পাবে।

চঞ্চলকুমার। সেই টের্‌টা পাওয়ার জন্যেই ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাঁরা থাকেন ত বেশ সাম্‌নাসাম্‌নি এসে দাঁড়ান না, লড়াই করে' তাঁদের দেবত্বের পরিচয়টা নি ! শুধু নাম শুনে কি আর ভয় করা চলে ?

তা যা'ক। এখন কোন্‌টা মূল আপনাদের, বলুন, দেখি।

অচলদেব। তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করাও পাপ।

চঞ্চলকুমার। দশবার আচমন করলেই তা খণ্ডে যাবে ! কেমন, পুঁথিতেও ত তাই লেখে ?

অচলদেব। হুঁ, আবার ঠাট্টা হচ্ছে? আজ থাকত সন্ন্যাসের শাসনদণ্ড হাতে, তাহলে বুঝিয়ে দিতাম বেয়াদবির মজা।

চঞ্চলকুমার। দণ্ডটা দোর্দ্দণ্ড ভাবে ব্যবহার করাতেই আজ হাত থেকে খসে পড়ে গেছে। শূন্য হাত আর শূন্যে ঠুকিয়ে মরেন কেন?

এখন বলুন, মূলের কথাটা।

অচলদেব। আজ এমন শুভদিনটা মাটি হল, দেখ্‌ছি। কি কুক্ষণেই ভোর হয়েছিল!

চঞ্চলকুমার। মূল বুঝি আদপেই জানা নেই—তাই অত রাগ রঙ্গ!

অচলদেব। বেণাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ? অমন বিধর্ম্মী যারা, তারা তার এক বর্ণও বুঝ্‌তে পারবে না।

চঞ্চলকুমার। বলে'ই দেখুন বুঝতে পারি কি না।

অচলদেব। হাজার জন্ম সাধনা কর্, তারপর বুঝ্‌তে আসিস্। সোজা কথা কি না? এক বিন্দু শ্রদ্ধা নেই—অম্‌নি শুন্‌লেই হল? ন দেয়ং শ্রদ্ধাহীনায়—যা, তোকে কিচ্ছু বল্‌ব না।

চঞ্চলকুমার। তবে শোন্‌বার সম্ভাবনা নেই?

অচলদেব। না।

চঞ্চলকুমার। বেশ। তবে আসি। নমস্কার, ঠাকুর মশাই।

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

অচলদেব। বাঁচা গেল। কিছু দেখ্‌বে না, শুন্‌বে না, মান্‌বে না—গোঁয়ার গোবিন্দের মত ঘুরে' বেড়াবে, আর সেইটাই এরা বিজ্ঞত্বের লক্ষণ বলে' মনে করেছে। উচ্ছন্ন গেল! উচ্ছন্ন গেল! দেখ ত ছেলেটার আস্পর্দ্ধা—আমাকে এসেছে ঠাট্টা কর্‌তে! আর যাবার সময় দিয়ে গেল কি না "নমস্কার"! আরে, এ অচল শর্ম্মার পায়ের ধুলো পেলে কত লোক বহু জন্মের ভাগ্যি মনে করে—তাকে কি না অবহেলা? অধঃপাতে যাওয়ার আর কি বাকি আছে?

ঐ যে আর একটি নব্য যুবক আস্‌ছেন। ও বেটাদের দেখ্‌লেই গা জ্বলে যায়। সব গুলোই উচ্ছৃঙ্খলতার এক একটা জলন্ত মূর্ত্তি!

[মধুর প্রবেশ এবং অচলদেবের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম]

হুঁ—এটার একটু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, দেখ্‌ছি। কিরে বাপু, আছ কেমন? অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই।

মধু। আজ্ঞে, শারীরিক ভালই আছি।

অচলদেব। আর মানসিক?

মধু। তত সুবিধে নয়।

অচলদেব। কেন, কি হয়েছে তোমার?

মধু। তার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

অচলদেব। বেশ করেছ—ভালই করেছ। আমি ত চিরকালই তোমাদেরে আত্মীয় জ্ঞান করি। কি হয়েছে?

মধু। আমাদের এই ভাঙার দেশে সাগরের কোন দরকার আছে কি না তাই ভাব্‌ছি। কিছুই স্থির কর্‌তে পারছি নি।

অচলদেব। তা আবার ভাব্‌ছ কেন? নিশ্চিত দরকার আছে। ভাঙাটা মাথা উঁচু করে' বড় বেশী রকম তাঁকে অবজ্ঞা কর্‌তে আরম্ভ করেছে। অপেক্ষা কর, তাঁর আবির্ভাব হল বলে'। প্রলয়-বান ডেকে তিনি আসবেন। তাঁর হুঙ্কারে সব ভাঙা কেঁপে উঠ্‌বে—তাঁর তাণ্ডবে যত সব অবজ্ঞার কাঠিন্য ভেঙে চুরে যাবে—তাঁর রুদ্র চরণে যত সব অহঙ্কার অবিশ্বাসের উঁচু মাথা আবার নত হয়ে পড়বে। পুঁথিতে লিখেছে, সে কি আর ভুল হবার জো আছে হে?

মধু। তবে, সাগর আছে ?

অচলদেব। তাতে আবার সন্দেহ ? পুঁথিতে এমন সব যুক্তি তর্ক দিয়ে তা প্রমাণ করা আছে যে তার বিরুদ্ধে আর টুঁ শব্দটি করে—কার সাধ্য ?

মধু। তাঁকে দেখেছেন ?

অচলদেব। সে কি আর সোজা কথা, বাপু ? দেখা এক, আর আছেন, এই কথাটা মানা আর। তবে তাঁর তর্পণ নিত্য করে' থাকি। তার ব্যাঘাত হলে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তা কর্‌তেও কুণ্ঠিত হই না।

তুমি তর্পণ টর্পণ করে' থাক ত বাছা ? না, ও গুলোতে বিশ্বাস নেই বলে' ছেড়ে দিয়ে বসে' আছ ?

মধু। তর্পণ করি না। বিশ্বাস নেই বলে' নয়। মন ভিজে না, তাই।

অচলদেব। না না, অমন কর্ম্মও করো না। বাপ দাদারা যে বিধি দিয়ে গেছেন, তা সনাতন বিধি। তা উল্লঙ্ঘন করা মস্ত পাপ! পাপ করে' ভুগে মর্‌বে কেন ? আরম্ভ কর—আরম্ভ কর। তবে এতদিন না করায় যে পাপটা হয়েছে, তার জন্যে একটি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে। সে বেশী কিছু নয়। সহজে যা'তে হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা আমি করে' দিব।

মধু। তর্পণ করলেই সাগরকে পাব ?

অচলদেব। অত পাওয়া না পাওয়ার কথা ভাব কেন ? তাঁরা যেমন বলে' গেছেন, সেই অনুসারেই চল্‌তে থাক—তার এক তিল এদিক ওদিক করো না। আর দেখ, বাপী কূপ সরোবর—এঁরাও ত সাগর। এঁদেরে অমান্য করো না কিন্তু। বিধিমতে পূজো করো—ফল পাবে, পুণ্যি হবে। না করলেই বিপদ! —হঠাৎ কোন্‌দিন ক্ষেপে উঠে কি সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা কর্‌বেন, কে জানে ? পূজোর কোন অঙ্গহানি না হয়, সে বিষয়েও খুব সাবধান হতে হবে। সেবার সরোবর পূজোর শেষদিনে বিষ্ণুঘোষ ১০৮ টা রক্তজবার বদলে ৫০টা দিয়েছিল, সেই বছরের মধ্যেই তার বড় ছেলেটা রক্ত উঠে মারা গেল। বাকি রক্তজবাগুলোর বদলে ঐ রক্ত নিয়েই সরিৎদেবী শান্ত হলেন! এসব দেখে শুনেও আজকালকার পাষণ্ডগুলোর চোখ ফোটে না ?

মধু। তা হলে তর্পণ করা ভিন্ন আর কোন উপায় নেই ?

অচলদেব। না। বাপদাদারা যা করে' গেছেন তা ছাড়্‌বে কেন ? তুমি ত আর কুলাঙ্গার নও—বেশ সুবোধ শান্ত ছেলে! সনাতন বিধি লঙ্ঘন করা যে মহাপাপ, তা আর তোমাকে বুঝোতে হবে কেন ? পুঁথিতেই লিখেছে—

পিতরো যেন যাতাস্যঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেনৈব পথা গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

মধু। বেশ, তাই হবে।

চঞ্চলকুমার। অতি উত্তম! অতি উত্তম! আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—দীর্ঘায়ু হও—সুখে থাক। বাপদাদার নাম বজায় থাক্।

এখন তবে আসি, বাবা। বড় দেরী হয়ে গেল—আজ আবার কূপ-পূজো। তাতেও অতিক্রম না হয়।

[মধু প্রণাম দিল। আশীর্ব্বাদ দিয়া অচলদেব প্রস্থান করিলেন।]

মধু। বাপদাদারা যা করে' গেছেন, তাই-ই করে' দেখি। কিন্তু বড় একটা সন্দেহ হয়—ঐ অচলদেব উনি ত সনাতন বিধি-নিয়মের এক পা বাইরে যান না। উনি আজপর্য্যন্ত সাগরের দর্শন পেলেন না কেন ?

তবে কি ও পথে চল্লে সাগরকে দেখা যায় না? ও পথটা ঠিক নয়? কিন্তু কে এমন আছে, আমায় বলে দেয়—ওটা ঠিক কি বেঠিক? তবু ঐ পথে চলাই এখন সঙ্গত মনে কর্‌ছি—পিতৃপিতামহের প্রদর্শিত পথ হঠাৎ ত্যাগ করা বোধ হয় উচিত হবে না।

[চঞ্চলকুমারের পুনঃ প্রবেশ]

চঞ্চলকুমার। কি মধু, তুমি এখানে যে?

মধু। কায ছিল।

চঞ্চলকুমার। গণ্ডীপাড়ায় কায! এখানে কায বলে' কিছু হয় না কি?

মধু। হওয়ালেই হয়।

চঞ্চলকুমার। উহুঁ—তবে তুমি এ পাড়াটা ঠিক চিন্‌তে পার নি।

মধু। কেন?

চঞ্চলকুমার। চারদিকে দেয়াল তুলে দিয়ে, হাতে পায়ে শিকল এঁটে যদি কাউকে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া যায়, সে যেমন কায করতে পারে, এখানে কায হয়—সেই রকম!

মধু। অমন করে' বাড়িয়ে বলো না।

চঞ্চলকুমার। বাড়িয়ে?—এক বিন্দু নয়। পদে পদে বিধি-নিষেধের শিকল—চল্‌তে গেলেই চারিদিক হতে হাঁ—হাঁ করে' বেড়া তুলে দেওয়া,—এ ত চোখের উপর অহোরহ চল্‌ছে। এমন বদ্ধ জায়গায় কি দুর্গন্ধ, ভাই,—আমি ত এক দণ্ডও টিঁক্‌তে পারি নে!

মধু। বোধ হয় তোমার চল্‌বার মধ্যেই একটা গোল রয়ে' গিয়েছে, তাই পদে পদে অত শিকলের ঝন্‌ঝনা কাণে বাজে। আর দুর্গন্ধ?—তাও হয়ত মনের বিকার!

চঞ্চলকুমার। তুমি তা'হলে এ পাড়াটার ভক্ত হয়ে উঠেছ!—বেশ—বেশ! লেখাপড়া শিখে বুদ্ধিটাকে পঙ্গু করতে চাও—যেমন ইচ্ছে তোমার।

মধু। ভক্ত—অভক্তের কথা হচ্ছে না, ভাই। বহুকালের জিনিষগুলো এক মুহূর্ত্তে ছেড়ে দিব—কিসের লোভে?

চঞ্চলকুমার। বুদ্ধিটা ত আছে? সেটাকে একটু খাটাতে হয়,—একটু বিচার কর্‌লেই সব গলদ ধরা পড়ে।

মধু। আমি ত বিচার করে' কিছু স্থির কর্‌তে পারি নি।

চঞ্চলকুমার। নবীন বাবুর কাছে কোন দিন গিয়েছ?

মধু। না।

চঞ্চলকুমার। একবার যেয়ো তাঁর কাছে। কি সুন্দর তাঁর বিচার-প্রণালী!—একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে গণ্ডীপাড়ার গলদগুলো দেখিয়ে দেবেন। আমি ত বেশ আনন্দ পাচ্ছি সেখানে যেয়ে—খোলা জায়গায় খোলা হাওয়া লেগে গাটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

তুমি যাবে সেখানে? প্রতি শনিবারে বৈঠক হয়—কালকার বৈঠকের বিষয়—"সাগরের সন্ধান।" কাল যাবে?

মধু। সাগরের সন্ধান? তবে ত যাওয়াই চাই। সাগর!—সাগরের কথা সেখানে হয়?

চঞ্চলকুমার। নিশ্চিত। তা ছাড়া আর হবে কি? আর সে কি গণ্ডীপাড়ার মত কথা? শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। অমন জীবনে কখনও শোন নি।

মধু। শুন্‌ব। সাগরের কথা শুন্‌ব না?

চঞ্চলকুমার। তবে কাল যেয়ো কিন্তু। বল ত আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

মধু। বেশ, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

চঞ্চলকুমার। কাল বিকেলে তবে বাড়ী থেকো।

মধু। আচ্ছা।

চঞ্চলকুমার। খুব সুখী হলাম, ভাই। নিজে

যে তৃপ্তি পাচ্ছি, আরেকজনকে তা দিতে পার্‌লে জীবনটা সার্থক হয়। বাড়ী থাক্‌তে ভুলো না যেন। আমি কাল আস্‌ব।

মধু। এস।

চঞ্চলকুমার। তবে নমস্কার।

মধু। নমস্কার।

[চঞ্চলকুমারের প্রস্থান]

মধু। সাগরের সন্ধান! একেবারে সন্ধান? এত সহজে! এত নিকটে! সন্ধান যদি পাওয়া গেছে, দর্শনও তবে মিলেছে। আর ভাবনা কি?

গান

মন তুমি আর ভেবোনারে,
রতন তোমার আস্‌ছে হাতে।
অলস শয়ন ছাড়—ছাড়,
এনো না ঘুম নয়ন-পাতে।
আশার তরী ঘুরে ফিরে,
এত দিনে ভিড়বে তীরে,
বন্দরের ঐ বন্দনা-গান
ভাস্‌ছে বুঝি বায়ুর সাথে।

—•—

গ

উল্টাডাঙা—নূতন বস্তি

[বাগান মধ্যে একটি পাকা ঘর। দুয়ার জানালা সব খোলা। বেলা অপরাহ্ণ। নবীনচন্দ্র বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এক একটা ফুলের গন্ধ লইতেছেন। তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা।]

নবীনচন্দ্র। সন্ধ্যা হয়ে এল। বন্ধুবর্গ এখনি আস্‌বেন, তাঁদেরে আজ তৃপ্তি দিতে পার্‌লে হয়। বোধ হয় পার্‌ব—আজ বক্তৃতার বিষয়টা বেশ ভালই আছে। "সাগরের সন্ধান"—এ বিষয়টা নিয়ে আজ কতগুলো নতুন কথার অবতারণা করা যাবে। যা বল্‌ব ভেবে রেখেছি, তা বল্লে, প্রাচীন মতের অন্ধগুহা একটা নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে, আশা করা যায়।

[মালীর প্রবেশ]

মালী। হুজুর, আজ ত সাঁঝ লাগ্‌তেই জ্যোস্না উঠ্‌লে, বাইরে আজ আলো দেবার দরকার আছে কি?

নবীনচন্দ্র। দিবি বই কি? জ্যোস্নায় কি সব দেখা যায়? দে—দে আলো দে। সাঁঝ ত হয়ে এলরে, দেরী কর্‌ছিস্ কেন? দেখ্‌ছিস্ নি সন্ধ্যামণিরা সব ফুটে উঠেছে?

মালী। ওঃ—তাইত। দিচ্ছি আজ্ঞে।

নবীনচন্দ্র। একেবারে চোখ বুঁজে থাকিস্ না কি? না দেখিয়ে দিলে কিছুই দেখ্‌বি নি? তোদের দেশের ধরণটাই ঐরূপ। যা-যা, আলো আন্।

[মালীর প্রস্থান]

সমস্ত দেশের অবস্থাটা বাগানের ঐ মালীর গায়ে লেখা রয়েছে। চোখটা একেবারেই খুল্‌তে চায় না! পদে পদে কত যে ঠোকর খাচ্ছে—তবু হুঁস নেই। সেই মান্ধাতার আমলের ভাবগুলো একেবারে রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে নিজেরা বরফের মত জমাট বেঁধে উঠ্‌ছে, তীব্র উত্তাপ না পেলে কিছুতেই আর গল্‌ছে না, দেখছি।

[মালী আলো জালিয়া দিল। বন্ধুর দল আসিলেন, তন্মধ্যে চঞ্চলকুমার ও মধু। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের নমস্কার-বিনিময় হইল। চঞ্চলকুমার মধুকে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে "সাগর-পিপাসু" বলিয়া পরিচিত করিয়া দিল। নবীচন্দ্র মৃদু হাস্যে তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর সকলে খোলা ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন—সেখানে কতগুলি

বেরুপাতা, তদুপরি বন্ধুবর্গ উপবিষ্ট হইলেন এবং সকলের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে একটা উচ্চ বেদীতে নবীনচন্দ্র যাইয়া বসিলেন। ঘরটা খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। তারপর দলের দুই তিন জনের দ্বারা গীত-আরম্ভ।]

গান

(মিশ্রভৈরবী—একতালা)

অন্ধকারে যে তোমারে
খুঁজিয়া মরিছে হায়—
সে কেবলি ভ্রান্তি লভে,
মজে শুধু নিরাশায়।
হে সাগর, হে অরূপ,
নিখিলের রস-কূপ,
তোমারে দেখিতে হলে
নয়ন যে আলো চায়।
কে বলে গো তুমি দূরে?—
আছ ত অন্তরপুরে,
এই যে নূপুর তব
দিবারাতি শোনা যায়।
অদেহ পরশ তব
সদা করে অভিভব,
তাপিতে শীতল করে
ঘন-গূঢ় করুণায়।

[গীতান্তে গৃহ নীরব। কিছুক্ষণ নবীনচন্দ্র এবং মধু ব্যতীত দলের আর আর সকলে মুদিতনেত্রে, অবনতমস্তকে ধ্যানমগ্ন।]

নবীনচন্দ্র। সপ্তাহ পরে আজ আবার আমরা একস্থানে মিলিত হয়েছি। বোধ হয় কেহই আমরা ভুলি নি—আমাদের এ মিলনের উদ্দেশ্য কি। গণ্ডীপাড়া সাগর-সম্বন্ধে যে বিকৃত ধারণা লোকের মধ্যে প্রচার করছেন, আমরা তা রুদ্ধ করব—তাঁরা যে বিধি নিষেধের নাগপাশে লোকদেরে আড়ষ্ট করে' রাখছেন, আমরা বিচারের ক্ষুরে তা ছিন্ন করব। আমরা চেষ্টা করব যা'তে সাগরকে সকলে প্রাণে মনে অতি সহজে, অতি সরল ভাবে উপলব্ধি করতে পেরে ধন্য হয়।

আজ আমাদের বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে—"সাগরের সন্ধান।"

আমরা দেখছি—ডাঙার দেশে সাগরকে চায় প্রায় সকলেই। ইতিহাস খুঁজলেই দেখা যায়,—অসভ্য বর্ব্বর যারা, তারাও সাগরকে বিশ্বাস করে' আসছে। এ বিশ্বাসের অন্ত নেই। যতকাল মানুষ, ততকাল এ বিশ্বাস। এর একমাত্র কারণ—ডাঙা যে সাগর হতেই উদ্ভূত। তাই সাগরের দিকে তার এই আকর্ষণটা স্বাভাবিক—অনুরাগটা আন্তরিক। কিন্তু অনুরাগ ও বিশ্বাস এক, আর তাঁকে উপলব্ধি করা আর। বিচার-বুদ্ধিতে সেই অনুভব করবার প্রণালীটা স্থির করে' নিতে হবে। নইলে অন্ধকারে যাকে হাতের মাথায় পাব, তাকেই সাগর বলে' ভুল করে' বসব!

আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃপুরুষ—যাঁরা দ্রষ্টা ছিলেন, সাগরকে যাঁরা সদাসর্ব্বদা উপলব্ধি করতেন, তাঁরা বলে' গিয়েছেন—"সাগর অসীম।" কিন্তু তাঁদেরি বংশধর তাঁদের কথা অগ্রাহ্য করে' সাগরকে সসীম বলে' প্রচার করছেন! এ-ত কখনই হতে পারে না। অসীমকে সসীম করা—অনন্তকে সান্ত করা, এযে একেবারেই যুক্তিবিরুদ্ধ! এ করলে সাগরকে যে নিতান্তই অবমাননা করা হয়! আর সেই অপমান কখন কি তাঁর আরাধনা হ'তে পারে?

আমরা তাঁর সন্ধান করতে চাচ্ছি। কিন্তু কোথায়? তিনি ত দূরে ন'ন। তিনি ত আকার গ্রহণ করে' নিজের চারদিকে প্রাচীর তুলে প্রচ্ছন্ন থাকেন নি। তাঁর প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রতিনিয়তই ত হৃদয়-মধ্যে

স্পন্দিত হচ্ছে। এই যে তাঁর সুকোমল করস্পর্শ বায়ুর শৈত্যে অনুভব করছি! এই যে অবিরামবোধনোচ্ছ্বাস বর্ষাদেবীর নেত্রপ্রান্তে তাঁরই প্রেমাশ্রু-ধারা!—এই যে বিশ্বের কলকোলাহলের মধ্যে তাঁরই সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হচ্ছে! এমন যে তাঁর রমণীয় আবির্ভাব, এমন যে তাঁর নীরব ঘোষণা, তবু লোকে তাঁকে ভুল করে? বাইরে তাঁকে সন্ধান করলে ত তাঁকে পাওয়া যাবে না! ভিতরে জ্ঞানের আলো জেলে তাঁকে খুঁজলেই তাঁর দর্শন মিলবে। সে ত অতি সহজ —অতি সুলভ!

হে প্রাণের প্রাণ, হে নিখিলরত্নের আকর, হে ধরিত্রীর জনয়িতা, তোমাকে লোকে কত-না উপায়ে অহোরহ লাঞ্ছিত করছে। তুমি আছ, এ কথা মেনেও বাষ্পীকৃত সারোবর ভেবে তোমায় তারা নাস্তিত্বের কোঠায় বসিয়ে রাখছে। অরূপকে রূপের ফাঁদে ধরতে যাওয়া—সে কি ভীষণ বাতুলতা! হে করুণাময়, তুমি তাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর কর, তাদের চক্ষু ফুটিয়ে দাও, তারা একবার তাদের নিজের ভ্রান্তি-গড়া মোহ-প্রাচীর ভেঙে ফেলুক, তাদের এই বালসুলভ ক্রীড়াচপলতা ঘুচে যা'ক—বিধি-নিষেধের কাঁটাবন অপনীত হয়ে তাদের পক্ষে তোমাকে পাবার পথ একেবারে সুগম হয়ে উঠুক!

বন্ধুগণ, আমাদের মিলন সার্থক হতে চলেছে। এর ক্রমঃবর্দ্ধিত মাধুর্য্যে আমরা তাঁর আবির্ভাব যেন অনুভব করতে পারছি। আসুন, আমরা আজ এর জন্যে তাঁকে অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করি আর তাঁর চরণে প্রার্থনা করি তিনি যেন প্রতিদিন আমাদিগকে আনন্দের নব নব রসধারায় সঞ্জীবিত রাখতে বিরত না হ'ন, তাঁর প্রবল করুণায় আমাদের বুদ্ধির অমানিশা যেন ঘুচে যায়, আমরা যেন জ্ঞানের প্রদীপ্ত দিবালোকে বিচরণ করতে পারি!

[পুনর্ব্বার নবীনচন্দ্র ও তাঁহার দলের অবনতমস্তকে এবং মুদিত-নেত্রে অবস্থিতি। খানিকক্ষণ পরে দলের দুই তিনজনের দ্বারা সঙ্গীতারম্ভ।]

গান

(মিশ্র—যৎ)

দয়াময়ী সাগর এস
দুয়ার দিয়া এই ঘরে,
কোন বাধাই বাধবে নাক
তোমার আসা-পথের'পরে।
এস শাওন ধারা-পাতে,
এস মধুর বসু-রাতে,
এস শরৎ জ্যোছনাতে,
যখন খুসী বরষ ঘরে'।
দেখে তোমায় মনোলোভা,
ধরার গায়ে ফুটবে শোভা,
পুলক, সব তুচ্ছ ভোবা
মধুর হরষ লাভের ভরে!
মানুষ-গড়া প্রাচীর নাশি,
বাজবে তোমার জয়ের বাঁশী,
ফেলিল তব পুলক হাসি
জ্বালবে আলো সবার ঘরে।

[গীতান্তে সকলের নমস্কার-বিনিময় এবং বিদায়-গ্রহণ। নবীনচন্দ্র-প্রমুখ সকলের বাগান হইতে প্রস্থান। কেবল চঞ্চলকুমার ও মধুর বাহিরে বাগানে আসিয়া অবস্থিতি ও কথোপকথন।]

চঞ্চলকুমার। কেমন মধু, শুনলে ত? ভাল লাগল না?

মধু। কি শুনলাম, বোধ হয়, তা বুঝতে পারি নি।

চঞ্চলকুমার। সে কি? গণ্ডীপাড়ার যে

একেবারে গোড়ায় গলদ,—অমন করে' উনি ধরিয়ে দিলেন, তা বুঝ্‌তে পার নি ?

মধু। তুমি পেরেছ ?

চঞ্চলকুমার। তা আর পারি নি ? নইলে কি আর শুধু শুধু এ নতুন বস্তিতে আসা যাওয়া করছি ?

মধু। কি বুঝেছ ?

চঞ্চলকুমার। বুঝেছি যে গণ্ডীপাড়ায় অসীম সাগরকে সসীম করে', নিরাকারকে আকার দিয়ে, অরূপকে রূপ দিয়ে, বাতুলতা করা হচ্ছে।

মধু। বক্তৃতার মধ্যে সে কথাটা আমিও শুনেছি।

চঞ্চলকুমার। তবে ?

মধু। সাগরের সন্ধান মিল্‌ল কই ?

চঞ্চলকুমার। আর কি সন্ধান চাও ? বাইরে চাইলেই যে তাঁকে ভুল করবে !

মধু। অন্তরে ত তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

চঞ্চলকুমার। দেখ্‌বে কি ? অনুভব কর।

মধু। তিনি ত নিরাকার বল্‌ছ—তাঁকে অনুভব করব কিরূপে ?

চঞ্চলকুমার। অনুভব ? এই বিচার করে'—জ্ঞানের আলো জেলে।

মধু। ঐ খানেই ত গোল লাগ্‌ছে। বিচার করতে গেলে ত কতগুলো শুষ্ক কথার কাটাকাটি, যথা—তিনি সাকার নন,—নিরাকার, তিনি সসীম নন,—অসীম,—এই সবই মনে ভাস্‌বে। ওতে যা সাব্যস্ত হবে, সে-ও ত "বাপীকূপ সরোবরে"র মত ভিন্নধরণে সাগরের একটা শাব্দিক কল্পনা হয়ে দাঁড়াবে ! তোমিরা ধ্যানের সময় কি ঐ শব্দগুলো চিন্তা করছিলে ?

চঞ্চলকুমার। কি জানি, ভাই, তোমার হৃদয়টা কেমন ! আমি ত বেশ আনন্দ পাই।

মধু। ও আনন্দ কখনই বিচারের ফল নয়। যদি সত্যই আনন্দ পেয়ে থাক, তবে সেটা কল্পনারই খেলা। ক্ষণেকের অন্ধ উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু আমি চাই—প্রত্যক্ষের অনুভূতি। তা যতদিন না মিল্‌ছে, ততদিন গণ্ডীপাড়ার কাল্পনিক ভ্রান্ত উপায় ধরাও যা, তোমাদের এই নতুন বস্তির কাল্পনিক অনুভবের রাস্তাটাও তা-ই। না—না, এমন শূন্য নিয়ে প্রাণে আনন্দ পাব না। এখানে অসংখ্য বাক্‌বিতণ্ডার ঘনবিন্যস্ত মায়াজাল—আর সেখানে বিধি-নিষেধের কঠিন শিকল ! এখন কোথায় যাই ? তবু ঐ শিকলটা অনেকদিন হতে পর্‌তে পর্‌তে কিছু কিছু অভ্যস্ত হয়ে গেছে—এখন এই বাক্যজালের লোভে তাকে ছাড়লে ত আর অভীষ্টসিদ্ধ হবে না !

চঞ্চলকুমার। কি মাথা মুণ্ডু বক্‌ছ ? তুমি কিছুই বুঝ্‌লে না ছাই !

মধু। বুঝ্‌তে দিলে কই ?

চঞ্চলকুমার। তুমি কেবল বক্তৃতার কথাটাই ভাব্‌ছ, একবার দেখ্‌লে না ত এখানে কেমন স্বাধীনতা !

মধু। মিথ্যা ধারণা।

চঞ্চলকুমার। সে—কি ?

মধু। মিথ্যা নয় ? দল বেঁধে যখন তোমরা থাক্‌তে যাচ্ছ, তখনই ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তোমাদের লোপ পেয়ে গেছে। আংশিক স্বাধীনতা—সে-ত সামাজিক মানুষের কখনই মিল্‌তে পারে না—বিধিনিষেধ তাকে কোন না কোন স্থানে মান্‌তেই হবে। না মান্‌লেই তার স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার রূপ ধরে' তাকে পশুত্বে ঠেলে নিয়ে যাবে।

চঞ্চলকুমার। তুমি পুঁথির বিদ্যা আওড়াচ্ছ। একবার ভাল করে' দেখ দেখি—নতুনবস্তির ধরণ-ধারণ গুলো। একটু তলিয়ে মজিয়ে তুলনা করে' দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে—গণ্ডীপাড়ার চেয়ে এখানে স্বাধীনতা কত বেশী।

মধু। এ বিশ্বাস হয় না। হয়ত দেখ্‌তে পাব—হয় ত কেন?—নিশ্চিত দেখ্‌তে পাব—এখানে আরেক রকমের পরাধীনতা দেখা দিয়েছে—নতুন রকমের বাঁধনের আয়োজন চলেছে। বুঝ্‌তে পারছ না?—এ যে চল্‌বেই। বাঁধন ছাড়া মানুষ থাক্‌বে কিরূপে?

চঞ্চলকুমার। তোমার কথাগুলো একটু নতুন নতুন ঠেকছে। নবীনবাবুর সঙ্গে তোমার একবার ভাল করে' আলাপ হওয়া আবশ্যক। তিনি নতুন কথা খুব পছন্দ করেন।

মধু। আজ আর হয় না। আলাপ হওয়ার দরকারও আর মনে করছি না।

চঞ্চলকুমার। কেন?—তোমার ধারণাটা ভ্রান্ত ও ত হতে পারে!

মধু। তা-হোক। আমি তর্ক চাই না। আমি সাগর দেখ্‌তে চাই। তাঁর কাছে সে আশা নেই, তা তাঁর বক্তৃতা হতেই বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু কোথায় আছে? কেউ কি তার সন্ধান বল্‌তে পারে না?

চঞ্চলকুমার। তোমার গোঁড়ামীটা অসহ্য।

মধু। আর তোমার গোঁড়ামীটা খুবই সহ্য। যাও, ভাই, আর বৃথা বচসা দিয়ে কাষ নেই।

চঞ্চলকুমার। আমার আবার গোঁড়ামী দেখ্‌ছ কিসে? আমি ত সকল গোঁড়ামীর উপর খড়্গহস্ত।

মধু। এটাও একরকমের গোঁড়ামী—আর ওটা আরও ভয়ানক যে নিজের ত্রুটির দিকে একবারও লক্ষ্য করে না—যত লক্ষ্য সব অপরের উপর!

চঞ্চলকুমার। না—তোমার সঙ্গে আজ পেরে উঠবার জো নেই। মাথাটা তোমার আজ ঠিক আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু আর ত এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। ঐ যে মালী আস্‌ছে—বাগানের ফটক বন্ধ কর্‌তে। চল, বেরিয়ে পড়ি।

মধু। তাহ'লে দেখ্‌ছি এ বাগানের ফটকও বন্ধ হয়! বেশ—বেশ! যাও, ভাই, তোমার সঙ্গে আর আমি চল্‌ছি নি। তুমি যাবে ঐ মুখো—আমি যাব এই মুখো।

চঞ্চলকুমার। তবে চল্লাম।

[প্রস্থান]

মধু। বড় আশা করে' এসেছিলাম। এমন হতাশ হব, তা'ত ভাবি নি। তবে বুঝি আমার ভাগ্যে সাগর দেখা নেই! কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই যে আমি তাকে দেখবার জন্যে উতল হয়ে উঠ্‌ছি! কি গোপন বাঁশীর ডাকে সে আমায় এমন করে' ডাক্‌ছে! কিন্তু সে কোথায়? দেখা কি দেবে না? দেখা কি হবে না?

গান

(পটমঞ্জরী—একতালা)

ওগো সুনীল বন্ধু আমার
কোথায় ব'সে বাজাও বাঁশী?
তোমায় তবে এমন করে'
পরাণ কেন হয় উদাসী!
কি গান তুমি গেয়ে গেয়ে যাও,
অর্থ তাহার বুঝতে নাহি দাও,
দিগ্বিদিকে কেবল ধরাও
সুরে সুরে পুষ্পরাশি।

শ্রবণ নব শুন্‌ছে যত গান,
আকুল করে দিচ্ছে এ নয়ান,
সরস আশায় হায়রে দিননাথ
জলে জলে যায় সে ভাসি।
মিষ্টি যদি এমন বাঁশী-সুর,
প্রাণটা তব নয় কিরে মধুর!
আড়াল ধরে' এমনি রবে দূর,—
দাঁড়াবে না সাম্‌নে আসি?

—•—

ঘ

উল্টাডাঙা—চৌমাথা

নিবারণ। আচ্ছা কায়বার ফেঁদে ফেলেছ, বঙ্কিম। রাতদিন কেবল হুটোপুটি, দৌড়া-দৌড়ি, চেঁচামেচি,—যত রাজ্যের অকাল-কুষ্মাণ্ডদের ঠেলাঠেলি। কেবল খাই—খাই রব। একটু যে সোয়াস্তিতে থাক্‌ব—তার পথটা পর্য্যন্ত বন্ধ করে' দিয়েছ।

বঙ্কিম। তা না কর্‌লে চল্‌বে কেন, নিবারণ দা? টাকার দরকার ত সকলেরই। নইলে খাবে কি? সংসার চল্‌বে কিরূপে?

নিবারণ। আরে রাম বল—রাম বল। অমনতর খাটুনি! ওতে যে মৃত্যুকে তাড়া-তাড়ি নিমন্ত্রণ করে' আন্‌ছে! আর টাকা দিয়ে কি হবে ছাই? জীবনটাই যদি বৃথা চলে' গেল, তবে টাকার থলে নিয়ে কি মৃত্যুর পারে বাঁচতে যাবে? যত সব অনাসৃষ্টি তোমাদের!

বঙ্কিম। তবে কি কর্‌তে হবে?

নিবারণ। হেসে খেলে নাও—হেসে খেলে নাও। দুদণ্ডের জীবন অমন করে' ব্যর্থ করা কখনই উচিত নয়।

বঙ্কিম। তুমি তা বল্‌তে পার। বাপ-দাদার টাকা রয়েছে—বসে' বসে' খেতে পাচ্ছ, হাসিখেলা তোমার আস্‌বে না কেন? কিন্তু সকলে ত আর তোমার মত নয়,—তাদের টাকা রোজগার কর্‌তে হবে—খাট্‌তে হবে। নইলে, পথের কুকুর হয়ে' কাঙালবেশে পরের দরজায় লাঠিছাড়া আর কিছুই যে তাদের মিল্‌বে না! আমোদ তুমি কর্‌তে পার—কর, কিন্তু সকলকে তোমার দলে টেনো না—টান্‌তে পারবেও না।

নিবারণ। তাই ত বল্‌ছিলাম—আমার সোয়াস্তির পথটা তোমরা একেবারে কাঁটায় ভরে' দিচ্ছ। আমি এখানে থাকি কি করে'?

বঙ্কিম। থাকা চল্‌বে না। এখানে থাক্‌তে হলে, খাট্‌তে হবে। আর খাট্‌বেই বা না কেন? বাপদাদারা না খাট্‌লে তোমার ও টাকাটা আস্‌ত কেমন করে'? আর তুমি না খেটে, সেই টাকাটা ভোগ কর্‌বে? এ হ'তেই পারে না। লক্ষ লক্ষ লোক টাকার অভাবে ছটফট্ কর্‌ছে—ঘুরে মর্‌ছে—মারা যাচ্ছে, আর তোমার ঘরে টাকার পুঁজি, অনায়াসে অক্লেশে তুমি তা উড়োচ্ছ—ফূর্ত্তি কর্‌ছ! কে বলেছে, ঐ পুঁজি টাকায় তোমার অধিকার? মিথ্যা কথা। রক্তের দোহাই দিয়ে অলস লোকে কখনই ও টাকার অধিকারী হতে পার্‌বে না—ওর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ঐ দীন দরিদ্র অন্নহীন কর্ম্মক্লান্ত জনসংঘ।

নিবারণ। তোমরা ক্ষেপেছ, দেখ্‌ছি। অনবরত টাকা – টাকা করে' খাট্‌তে খাট্‌তে তোমাদের মাথা কি আর খারাপ না হয়ে যায়? আরে ভাগ্য বলে' একটা জিনিষ আছে, তা'ত মান? আমার ভাগ্যে আছে—আমাকে টাকার জন্যে ভাব্‌তে হবে না—আমোদ আহ্লাদেই আমার জীবনটা কাট্‌বে। তোমরা জোর কর্‌লে ত আর কপালটা কেড়ে নিতে পার না।

বঙ্কিম। ভাগ্যই যদি থাকে, তবে সে

ভাগ্যটা সকলের সঙ্গে সমান ভাগ বসাবে—এই-ই আমরা চাই।

নিবারণ। এ কখনই হতে পারে না।

বঙ্কিম। এই-ই হবে। ভাগ্যের নামে অমন বুজরুকী আমরা কিছুতেই আর চল্‌তে দেব না। মানুষ মাত্রেরই সমান অধিকার। কারু বেশী, কারু কম, এ সব দরদস্তুর এবার আর চল্‌ছে না।

নিবারণ। তুমি ত ভয়ানক লোক দেখ্‌ছি হে। ভাগ্য মান না? উঁচু নীচু—সুখ সুবিধে ও সব যে ভাগ্যেরই ফল! এই দেখ না কেন, তোমার ত অনেক রকম কারবার চল্‌ছে, তাদের কুলী মজুরদের খাটাতে হলে তোমাকেই হুকুম কর্‌তে হয়। কেন, সে বেটারাও ত তোমাকে হুকুম কর্‌লে পারে? এ হয় না। তাদের ভাগ্য —হুকুম খাটা, তোমার ভাগ্য—হুকুম করা।

বঙ্কিম। তাদের শিক্ষার দোষে তারা কুলী মজুর হয়েছে—হুকুম খাট্‌ছে। এমন শিক্ষা দেব যাতে আর তারা হুকুমের তলে না থাকে।

নিবারণ। এ হতেই পারে না। হাজার শিক্ষা দাও, ভাগ্যে যাকে কুলী বা কুলীর কর্ত্তা হতে লিখেছে, সে তাই-ই হবে,—তা আর উল্টোতে পার্‌ছ না।

বঙ্কিম। এ হতেই হবে। ভাগ্যটাকে না উল্টিয়ে আমরা কিছুতেই আর ক্ষান্ত হচ্ছি নি।

নিবারণ। যখন উল্টিয়ে দিতে পার্‌বে, তখন তোমাদের নিবারণদা তোমাদের দলে মিশ্‌বেন। আপাততঃ কিছুদিন আমোদ ভোগ করা যখন তার ভাগ্যে আছে, তা হ'তে আর তাকে বঞ্চিত কর কেন?

না আর কথা নয়। তোমার সঙ্গে বকে' বকে' আমার প্রাণের রসটা শুকিয়ে উঠ্‌ল। এইবার সরে' পড়া যা'ক্। (সহসা তুড়িদিয়া তান ধরিল)

"তুম্ তা-না-না-না-না প্রিম্,
প্রিম্ তা না-না-না—না,
প্রিম্‌তা না-না-না-না—"

হাঁ, এতক্ষণে ফুর্ত্তিটা আবার জমে আস্‌ছে—বাঃ বাঃ!

[প্রস্থান]

বঙ্কিম। কেমন সুখের পায়রা সব!—কেবল রাতদিন আরাম খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পরের দুঃখ কষ্টের দিকে একটুও লক্ষ্য নেই! যত লক্ষ্য সব নিজের সুখের দিকে! টাকাটা এক জায়গায় জড় হলেই এই সব উপদ্রব সৃষ্টি করে। তারপর ঐ সেকেলে স্বত্ব-আইন, কি বিষময় ফলই না ওতে সমাজে এনে ফেলেছে! সবটার একেবারে আমূল সংস্কার আবশ্যক, নইলে আর এ ভীষণ বৈষম্যের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

[প্রস্থান]

[অন্য দিক দিয়া চঞ্চলকুমারের প্রবেশ]

চঞ্চলকুমার। ও কে গেল?—বঙ্কিমদা নয়? ও—ও বঙ্কিম দা, আরে কোথায় যাচ্ছ হন্‌হন্ করে'? শোনই না।

[বঙ্কিমের পুনঃ প্রবেশ]

বঙ্কিম। ফিরে ডাক্‌ছিস্ কেন? দেখ্‌ছিস্ নি বেলা হয়ে গেল? কাযের সময়, এখন কি আর দেরী কর্‌তে পারি? বল্ চট্‌করে' —কি খবর।

চঞ্চলকুমার। আমাকে তোমার কারখানায় নেবে?

বঙ্কিম। সে কিরে? তোর আবার ও মতি হল কবে থেকে?

চঞ্চলকুমার। যবে থেকেই হোক। বল, নেবে?

বঙ্কিম। তুই কি পারবি? এর নাম কাষ রে কায—একেবারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা! এ ত আর বসে' বসে' স্বপন দেখা নয়?

চঞ্চলকুমার। তা জানি। ঐ কাযই এখন আমায় করতে হচ্ছে। নইলে খাব কি?

বঙ্কিম। কেন, সাগরের স্বপন দেখে? যত সব আকাটমূর্খ তোরা! আমি গোড়া থেকেই জানি—সাগর, সাগর বলে' চেঁচালে সাগর ত কোনদিন দেখা দেবেই না, লাভের মধ্যে মাথাটা যাবে খারাপ হয়ে, শরীরটা যাবে মাটি হয়ে', আর তার ফলে সংসার ও সমাজের বুকে জ্বলবে আগুন!

যা'ক। এখন তবে তুই বুঝতে পেরেছিস্—শরীরটাই আগে?

চঞ্চলকুমার। হুঁ।

বঙ্কিম। বেশ। কিন্তু যে "ফুরফুরে বাবু" হয়ে পড়েছিস্, কি কায তুই করতে পারবি, তা'ত বুঝতে পারছি নি।

চঞ্চলকুমার। এই যা হয় একটা কিছু। কিছুদিন শিক্ষানবীশীও ত করা চাই।

বঙ্কিম। তা'ত করতেই হবে রে। নইলে কি আর একচোটে কোন কাযের ভার তোকে দেওয়া যেতে পারে? আচ্ছা, কিছুদিন-সবুরই কর না—দেখি তোর মতিটা এর মধ্যে ফিরে যায় কি না!

চঞ্চলকুমার। না—না এবার আর তা হচ্ছে না।

বঙ্কিম। সেটা ফলেন পরিচীয়তে। তোর ত এর মধ্যেই কত পরিবর্ত্তন দেখলাম! এখন কোথায় যাচ্ছিস্, বল্?

চঞ্চলকুমার। তোমার কাছেই।

বঙ্কিম। তবে চল্, দুজনাই কারখানাটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

চঞ্চলকুমার। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

[অন্যদিক্ দিয়া মধুর প্রবেশ]

মধু। কিছু হল না—কিছু হল না। কই, সাগর কই? প্রাণটা যে একেবারে শুকিয়ে উঠছে! কতকাল আর এ শুষ্কতার মধ্যে পড়ে' থাকব? এযে বড়ই ভীষণ! না—না এমন করে' জীবনটাকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি চল্‌ছি কই? এ পথ কি তবে পথ নহে?—এটা কি একটা সোলোকধাঁ-ধাঁ—বদ্ধ ঘর? না, এ পথে চলবার মত সামর্থ্য আমার নেই? না, চালক অভাবে পথের সঠিক বার্ত্তাই আমার কাছে এখনও পৌঁছায় নি? বিষম সমস্যা! এ সমস্যার মীমাংসা করবে কে? কে আমায় ঠিক পথে চালাবে?—কে আমায় সাগরে নিয়ে যাবে?

[বঙ্কিমের কারখানার একজন নিরক্ষর সর্দ্দারের প্রবেশ]

সর্দ্দার। পেরণাম, দাদাঠাকুর।

মধু। কোথায় যাচ্ছিস্ এত সকালে? ভাল আছিস্ ত?

সর্দ্দার। আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বেদে ভালই আছি। গিয়েছিলাম আমাদের কর্ত্তাবাবুর খোঁজে। শুন্‌লাম তিনি বাড়ী নেই—কারখানায় বেরিয়েছেন। তাঁর দিয়ে খুব দরকার। এখনই চাই।

মধু। কেন, কি হয়েছে?

সর্দ্দার। আজ ভোরে তেলের কারখানার দরজা খুলতে গিয়ে দেখি, উঠানে পিপেগুলোর কাছে তিনটে মোহর পড়ে' রয়েছে। একবার ভাবলাম, সে গুলোয় হাত দেব না—কেজানে কার মোহর?—থাক্ পড়ে'। তারপর ভাবলাম, না—এ গুলো কর্ত্তাবাবুর হাতে দিই গিয়ে, তিনি খোঁজ ক'রে যার হয়, তাকে দিয়ে দিবেন। এই ভেবে মোহরগুলো বেই তুলেছি, অমনি রামু সর্দ্দার এসে উপস্থিত। সে দেখতে পেয়ে

ব্যাপারখানা কি জিগ্‌গেস কল্লে। আমি সবটা তাকে খুলে বল্লাম। সে কি বলে, দাদাঠাকুর, জানেন?—সে বলে, কুড়িয়ে পেয়েছিস্, আর দিতে যাবি কেন? লক্ষ্মীর ধন হাতছাড়া কর্‌তে নেইরে, হাতছাড়া কর্‌তে নেই।

মধু। তুই তাতে কি বল্লি?

সর্দ্দার। আমি বল্লাম, সে কি হয় রে রাম্? এটা যে পরের জিনিস! কোন্ ব্যাপারী হয় ত ফেলে গেছে, এতক্ষণ টের পেয়ে থাক্‌লে নিশ্চিত কান্নাকাটি খুড়ে দিয়েছে। এটা গোপন কর্‌লে, সাগর কি তা জান্‌তে পাবেন না? হয় ত এই পাপের জন্যেই কোন্ দিন তিনি ফুঁসে' উঠে আমার দফা রফা করবেন আর কি!

মধু। সাগর!—হাঁ, তারপর?

সর্দ্দার। রাম্ বল্লে—আর সাগরের ভয় কিরে? কর্ত্তাবাবু ত বলে'ই থাকেন, সাগর-টাগর ওসব বাজে—এখানে টাকাই হচ্ছে কাযের। তবে আর ডরাস্ কেন?

মধু। তুই কি উত্তর দিলি?

সর্দ্দার। আমি বল্লাম—আমরা মুরুখু লোক কর্ত্তাবাবুর ও সব কথা কি বুঝি? আমরা সাগরকে ডরাই।

মধু। তাই বুঝি ঠিক করেছিস্—মোহর-গুলো বাবুর হাতে দিয়ে দিতে?

সর্দ্দার। আজ্ঞে।

মধু। বেশ করেছিস্। যা শীগ্‌গির। সাগর বাজে নয় রে, সাগরই কাযের, এই কথাটা কখনই ভুলিস্‌নি। আর কর্ত্তাবাবুকেও তোর ভয়ের কথাটা একটু ভাল করে' জানিয়ে দিবি।

সর্দ্দার। যে আজ্ঞে—তবে চল্লাম, দাদা-ঠাকুর। পেরণাম। [প্রস্থান]

মধু। আজ বঙ্কিম একটু বুঝ্‌তে পার্‌বে—আর পরিণামে আরও ভাল করে' বুঝ্‌বে, উল্টাডাঙ্গায় তার মতবাদটা কি অনিষ্ট করেছে ও কর্‌ছে। সাগরে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা বা ভীতি না থাক্‌লে এ ডাঙায় যে কেবল বাঘ ভালুক ছাড়া আর কিছুই বাস করত না! আরে শিক্ষা—শিক্ষা করে' চেঁচাচ্ছিস,—তোর কেতাবী শিক্ষায় বুদ্ধিটাই যে কেবল ধারাল হবে, কিন্তু হৃদয়, তা উন্নত হবে কি করে'? তুই বল্‌ছিস্—মানুষ শিক্ষিত হবে, শিক্ষিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে একটা চুক্তি করে' নিয়ে সমাজে বেশ শৃঙ্খলা বেঁধে থাক্‌বে। কিন্তু সে কোন্ শিক্ষা-প্রণালী, যাতে মানুষ তার সমস্ত হীনস্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হবে? সেই শিক্ষার প্রকার নিয়েই ত যত গোল! শুধু কেতাবী শিক্ষায় মানুষ কি কখন মানুষ হতে পারে?

তারপর সমাজের বিলাসিতা তুই ত কখনই রোধ কর্‌তে পার্‌বি নি, কর্‌লে যে অনেক-গুলো ব্যবসা মাটি হয়ে যাবে! অর্থের দিক্ দিয়ে দেখ্‌লে—বিলাসিতা যে তোদের আদরের বস্তু! আর যারা সেই বিলাসিতা ভোগ কর্‌তে পারবে না—অথচ কর্‌তে চাইবে—তারা যে তারই জন্যে গুপ্তচোর হতেও ছাড়বে না, তা নিবারণের উপায় কি কর্‌ছিস্? ওসব চুক্তিফুক্তির চোখে ধুলো দিতে তারা ইতস্ততঃ কর্‌বে কেন? কিন্তু যার চোখে ধুলো দেওয়া যায় না—যে আড়ালে বসে' সব দেখ্‌ছে, শুন্‌ছে—সেই সর্ব্বশক্তিমান সাগরে বিশ্বাস নিয়ে কতকাল ধরে' এই ডাঙার রাজ্যের লোকগুলো সৎপথে চলে' আস্‌ছে—সে বিশ্বাস তাড়িয়ে দিয়ে লাভ ত হচ্ছেই না—বরং উল্টো হচ্ছে সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি!

কিন্তু যা'ক্—ও নিয়ে মাথা ঘামানো বিফল। যে যা বুঝেছে, সে তাই-ই করে' যাক্—ফলে যা হয়, পরে হবে। আমার কিন্তু আজ ঐ সর্দ্দারের বিশ্বাসের কাছে হাজার বার মাথা নীচু কর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। ঐ বিশ্বাসই সমাজের মেরুদণ্ড। যাক্—শিক্ষার অজস্র আলেয়া-আলো, তার চেয়ে মূর্খতার জমাট অন্ধকার ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়—ঐ অন্ধকারের বুক হতেই নবারুণের কিরণ-শতদল ফুটে ওঠবার সম্ভাবনা আছে! আর আলেয়ায়?—কেবলমাত্র পথ-ভ্রান্তি আর বৃথা শ্রান্তি! দাও—দাও আমায় সাগরে দৃঢ়বিশ্বাস—চুলোয় যাক্ আমার শিক্ষার যত আবর্জ্জনা—আমি একবার নব্যশিক্ষিতদের মধ্য হ'তে মরে' পুনর্জ্জীবন লাভ করি। আর পারি না—স্তূপীকৃত মতবাদের উপলখণ্ডে ঘা খেয়ে খেয়ে হৃদয় যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়্‌ল! এবার ছুটতে চাই—সংশয়ের কঙ্করকঠিন অন্ধগুহায় জীবনটাকে আর নষ্ট কর্‌ব না—কর্‌তে পার্‌ব না। এবার একেবারে সকলের বাইরে যেতে চাই—একেবারে মুক্ত হাওয়ায়, মুক্ত আলোয় অবগাহন করে' ধন্য হতে চাই। ঘনঘবনিকার অন্তরালে, হে বধিরতম ভবিতব্য, তুমি আমার জন্যে তোমার কোন রহস্য-কক্ষে সফলতার বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট একখানি মনোরম দৃশ্যপট কি রচ্‌ছ না?

গান

(মিশ্র—দাদ্‌রা)

সাগর যখন ডাক দিয়েছে,
থাক্‌ব না রে থাক্‌ব না,
সিন্ধি-গুহার অন্ধকারে
বন্ধ মোরে রাখ্‌ব না।
কঠিন শিলা ধসিয়ে দিয়ে,
চূড়ায় চূড়ায় লাফাইয়ে,
আপন মনে কল্‌কলিয়ে
নাম্‌ব—মানা মান্‌ব না।
হিমের দারুণ পরশ-ভারে
জড়িয়ে মোরে জমিয়ে মারে,
রবির কিরণ বরষ ধরে'
রাখেক তবে রাখ্‌ব না।
খোলাখুলি আলো হাওয়ায়,
খোলা নভে, খোলা ধরায়,
পুলক মগন রইব সদায়,
বাধ ত কারু বাধ্‌ব না!

৬

যাত্রা-পথ

[১]

প্রান্তরে

(মধুর প্রবেশ)

মধু। কি অন্ধকার রাত!—কালো বাঘের মত হাঁ করে' এ যেন আমায় খেতে এয়েছে!—একটুও দয়া মায়া নেই?—অন্ধকার এত নিষ্ঠুর—এ'ত জানতাম না! এর গভীর অন্তস্থলে চোখ বিঁধিয়ে দিচ্ছি, তবু ভোরের কোন চিহ্নমাত্র দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। সূর্য্যের আলোক-শিশুকে এ বুঝি গ্রাস করে' বসে' আছে? আমি চল্‌তে চেয়েছিলাম, কিন্তু অন্ধকার আমার দৃষ্টি আগ্‌লে বসে' থাক্‌ল! আমি কেমন করে' চলি?

আমি কোথায় আছি?—ঘরে না বাইরে? কিছুই ত ঠাওর করা যায় না, সব যে একাকার! উঃ শীতের কি কন্‌কনে হাওয়া—শরীরের সব রক্ত বুঝি জমে' গেল। একে অন্ধকার—তারপর শীত,—দুই-ই কি ভীষণ! এরা যুক্তি করে' আমার পায়ে শিকল বেঁধে দেবার আয়োজন করেছে। আমায় সাগর দেখ্‌তে দেবে না। কিন্তু এমন করে' সব সম্ভাবনা লোপ পেলেও, আমার সাগর দেখবার আশা ত লোপ পাচ্ছে না। আমি

তাকে দেখ্‌ব—দেখ্‌তে পাব—হৃদয়ের কাণে কাণে কে যেন অনবরত শুনিয়ে যাচ্ছে পাব—পাব, দেখ্‌তে পাব। এ অন্ধকার ঘুচে যাবে—এ শীতের হাওয়া সরে' যাবে,—পরিপূর্ণ আলো—বসন্তের সঞ্জীবনী সমীরণ-সুধা আমার জন্যে অপেক্ষা করে' বসে' রয়েছে! নিশ্চিত নিশ্চিত।

ও—কি?—পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না? ঘাসের উপর অতি মৃদু-মধুর পদধ্বনি? এমন অন্ধকারে কে আস্‌ছে? মানুষ না পশু? মানুষই বটে! এমন তালে লয়ে বাঁধা ধীরোত্থিত পদশব্দ মানুষ ছাড়া আর কার হতে পারে? কে আস্‌ছে? কেন আস্‌ছে? কেউ চল্‌ছে না—এমন অন্ধকারে এ চলে' আস্‌ছে কেমন করে'? অই—নিকট হতেও নিকটতর!—অই—অই! কেগা এই অন্ধকারে? কই, উত্তর ত দিচ্ছে না? কে তুমি? একেবারে গায়ের উপর এসে পড়লে যে? বাঃ, কে—তুমি? বধির না কি? শুন্‌তে পাচ্ছে না!

[কেহই আসিবে না। পূর্ব্ব হইতেই অন্ধকারের আড়ালে একজন দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহার গায়ে নাড়া দিয়া]

ওগো, তুমি কে? উত্তর দিচ্ছ না কেন? শুন্‌তে পাচ্ছ না?

অপরিচিত। পাচ্ছি।

মধু। তবে বল—তুমি কে?

অপরিচিত। আমি কে!—কেমন করে' পরিচয় দেব?

মধু। কেন, তোমার নাম?

অপরিচিত। নাম কি আর আছে?

মধু। সে—কি? তুমি কি কর?

অপরিচিত। কি যে করি—তাও ত বল্‌তে পার্‌ছি নি।

মধু। ভাল—বেশ নতুন রকমের লোক দেখ্‌ছি ত! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

অপরিচিত। কোথায়ও নয়।

মধু। বেশ!—এই যে তুমি এখানে চলে' এলে?

অপরিচিত। আমি এলাম?—না—তুমি এলে?

মধু। বাঃ আমি ত এখানেই দাঁড়িয়ে আছি! তোমারি ত পায়ের শব্দ শোনা গেল।

অপরিচিত। ভুল শুনেছ। ওটা আমার পায়ের শব্দ নয়। তোমারি পায়ের শব্দ পরের বলে' মনে হয়েছে।

মধু। আমার পায়ের শব্দ!!

অপরিচিত। হাঁ-গো-হাঁ, তোমারি পায়ের শব্দ। তুমিই ত চল্‌ছ—আমি ত আর চল্‌ছি নি।

মধু। আমি চল্‌ছি? ভীষণ অন্ধকার আমায় চল্‌তে দিচ্ছে কই? তবে চলবার ইচ্ছে আছে আমার।

অপরিচিত। ঐ ইচ্ছার তীব্রতাই তোমাকে চালাচ্ছে, তুমি বুঝ্‌তে পার নি।

মধু। এ ত বড় আশ্চর্য্য! আমি টের পাই নি, আর তুমি পেয়েছ?

অপরিচিত। না পেলে আর বল্‌ছি কি? আর এ টের-পাওয়াটা কঠিন কিসে? সাগরে যারা যেতে চায়, তারা এই প্রান্তরেই—এমন ভাবেই এসে উপস্থিত হয়ে থাকে।

মধু। সাগর?—সাগরে আমি যেতে চেয়েছি তাও তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ?

অপরিচিত। পেরেছি—প্রান্তরে যখন এসেছ।

মধু। তুমি—না—না তুমি নয়—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন—এই ভয়ানক অন্ধকারে?

অপরিচিত। দাঁড়িয়ে আমি আছি—এটা ঠিক। কিন্তু কখন কোন্ খানে তা'ত বল্‌তে পার্‌ছি নি।

মধু। কেন? এটা যে প্রান্তর তাত আপনিই বল্‌ছেন? আর অন্ধকার, তা কি আর আপনি দেখ্‌ছেন না?

অপরিচিত। প্রান্তর তোমার কাছে। অন্ধকার—সেও তোমার চোখে!

মধু। সে কিরূপ?

অপরিচিত। বুঝ্‌বে না। সাগর না দেখ্‌লে তা বোঝা যায় না।

মধু। আপনি তবে সাগর দেখেছেন? সাগরকে তবে দেখা যায়?

অপরিচিত। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) দেখ্‌তে চাইলেই দেখা যায়।

মধু। আমি দেখ্‌তে চাই। আপনি দেখাতে পারেন?

অপরিচিত। কিছু সাহায্য কর্‌তে পারি।

মধু। পারেন?

অপরিচিত। পারি বোধ হয়—যদি তুমি চল্‌তে চল্‌তে না থাম।

মধু। না—না থাম্‌ব না। আপনি আমায় দয়া করুন।

অপরিচিত। থাম্‌বে না?

মধু। না।

অপরিচিত। ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত কত কি বিপদ আস্‌বে!—ভয় পেয়ে থাম্‌বে না?

মধু। আজকার মন নিয়ে বল্‌ছি—থাম্‌ব না।

অপরিচিত। কত সৌন্দর্য্য—কত মাধুর্য্য তোমায় পদে পদে আট্‌কে রাখ্‌তে চাইবে—তুমি সে সবে ভুল্‌বে না?

মধু। ভুলও যদি করি, তবে আপনার সাহায্যে সে ভুল ভাঙ্‌বে না কি?

অপরিচিত। ভাঙ্‌বে—যদি সাহায্য উপেক্ষা না কর।

মধু। সাগরের পথে যেতে সাহায্য কর্‌বেন আপনি, তাই কর্‌ব উপেক্ষা?—এ ত কখনই মনে হয় না।

অপরিচিত। তবে সম্মত হলাম।

মধু। অই যে চাঁদ উঠ্‌ছে! কৃষ্ণনিবিড় সুপ্ত গ্রামগুলোর গাছের আগা শাদা হয়ে উঠ্‌ল—এই যে চারদিকে কেমন আধ আলো,—আধ ছায়া! এইবার আপনাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আপনি এত সুন্দর!

অপরিচিত। আলো দেখ্‌তে পেয়েছ, তাই সুন্দর লাগ্‌ছে।

মধু। আপনাকে কি বলে' ডাক্‌ব?

অপরিচিত। যা খুসী—তাই বলে'।

মধু। তবে যখন যা মনে আসে, তাই বলে'ই ডাক্‌ব। সাড়া দিতে হবে কিন্তু।

অপরিচিত। বেশ, তাই ক'রো। (খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) একবার ভাল করে' তাকাও দেখি আমার দিকে। (মধু তাকাইল, তাহার কাঁধে হাত দিয়া) দেখ্‌তে পাচ্ছ ঐ সদ্যপ্রসূত জ্যোৎস্নাজ্যোতি? ঐ ধরে' চলে যাও—এই এদিকে। ও জ্যোৎস্নাও থাক্‌বে না,—নিভে যাবে। ভোরের অন্ধকার আস্‌বে, তা'ও থাক্‌বে না। তারপর উঠ্‌বে সূর্য্য—তখন রাস্তাটা দেখ্‌তে পার্‌বে ভাল করে'। সূর্য্য উঠবে, জ্বলবে, আবার অস্ত যাবে। আবার আস্‌বে রাত্রি—কখনও অন্ধকার, কখনও জ্যোৎস্না। আবার আস্‌বে দিন। এমন করে' দিন আর রাত্রির মধ্য দিয়ে চল্‌তে হবে—কতকাল, কে বল্‌বে? কিন্তু তারপর পড়্‌বে গিয়ে এমন জায়গায়—যেখানে দিনও নেই, রাত্রিও নেই, অথচ চির আলো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তেমন আলো

চোখে কখনও দেখনি। জান্‌বে তখনই সাগর তোমার অদূরে। যাও চলে' যাও, কোন ভয় নেই। যত কাঁদবে, তত পথ এগিয়ে যেতে পার্‌বে। কান্নায় বিরাম দিয়ো না—দিতে পারবেও না যখন সাগরকে একবার প্রাণ দিয়ে দেখ্‌তে চেয়েছ! হাজার বৎসর ধরে' তর্পণ কর—বক্তৃতা কর, যা-ই কর না কেন—চোখের এক ফোঁটা জল না পড়্‌লে পথ কখনই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—তাই নানান্ পথের মুখে বসে'ও লোকে পথটা দেখ্‌তে পায় না। দেখ্‌তে পায় না বলে'ই কেবল জটলা করে—চেঁচামেচি করে—কিন্তু চলে না! সবাই অটল ভাবে বসে' থাকে। বসে' থাক্‌বে না কেন? অত গলদ! ভিতরে গলদ—বাইরে গলদ! সেই গলদে তাদের পা রয়েছে আটকা!—কেমন করে' চলবে? কেউ কেউ বা জোর করে' বাইরের গলদ ভাঙতে চায়—কিন্তু ভিতরের গলদ আগে না ঘুচলে—বাইরের গলদ ভেঙে কি হবে? সাগর যারা দেখ্‌তে চায়, অমন জোড়াতাড়া, অমন লুকোচুরি—অমন চালাকী করলে ত আর তাদের পক্ষে চল্‌বে না! একেবারে সবদিকে ধোয়ামোছা তক্‌তকে ধপ্‌ধপে্ হতে পারলে, তবে সাগর দেখবার পথে চলা যায়। —নইলে সব ব্যর্থ আড়ম্বর - সব ভুয়ো—সব ফাঁকি!

তোমার বেদনা যখন জেগেছে, তখন আর ভাবনা নেই! চোখের জলে ধূলির ধূসরতা ঘুয়ে মুছে ফেলো—চল্‌তে কোন বাধা পাবে না। (পিঠে হাত দিয়া) যাও—এগিয়ে যাও। ভয় কি?

—•—

[২]

লোকালয়ে

[মধুর প্রবেশ]

মধু। এ কি? আবার যে লোকালয়ে এসে পড়লাম! যেখান থেকে পরিত্রাণ চাই, পথ আমায় সেইখানেই টেনে আন্‌লে! ও কি ভীষণ জন কোলাহল!—ও কি প্রখর জনতা-স্রোত! ঐ যে হাট বাজারের দরদস্তুর চল্‌ছে—ঐ যে ধনীর ঘরে টাকার ঝন্‌ঝনানি—এই যে পাশের ঘরে নৃত্যরব—বিলাস-সঙ্গীতের অবিরল উচ্ছ্বাস! এ কোথায় এলাম?

বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি—হিংসুকের গুপ্ত ছুরিকা এখানে চক্‌মক্ করে' উঠ্‌ছে—ক্রোধীর আরক্ত চক্ষু কট্‌মট্ করে' চেয়ে আছে—লোভীর রসনা লক্ লক্ করছে—কামুকের রক্তগণ্ড নেশায় ভরপুর! না—না এখানে থাকা নয়! আমার মনটাকে এরা চারদিক হতে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ফেল্‌তে চাচ্ছে! এখান হতে পালানই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এ কি?—পালাতে চাইলেই এরা আরও ঘিরে' দাঁড়ায় যে! এ কি বিঘ্ন! এরা আমায় চল্‌তে দেবে না? না—আমি চল্‌বই চল্‌ব। কে আমার পথ আটকায় দেখা যাক্। (কিছু দূর অগ্রসর হইয়া) ঐ যে কতকালকার পরিচিত মুখচ্ছবি সব উঁকি মারছে! ঐ যে বাল্যকালের হরি, রামা, নন্দ—ঐ যে বীণু, শ্যামা, ললিতা—ঐ যে বিশে রাখাল, গোপাল গোয়ালা, মাধব মুদী—ঐ যে কেষ্টা চাকর—বিধু বি, কত-না পুতুলখেলা, কত লুকোচুরী, কত লাফালাফি, কত-না আষাঢ়ে গল্প! ঐ যে দিদিমার আদর—বাবার শাসন—গুরুমশাইয়ের ভয়! ঐ যে পরিণত বয়সের কত বন্ধু—বঙ্কিম,

চঞ্চলকুমার, নিবারণদা, ঐ যে নিজের সৃষ্ট কত না কর্ম্মজাল, কত অধ্যয়ন, কত অধ্যবসায়! বেশ লাগ্‌ছে! আমার প্রীতিকে এরা কত না উপায়ে গ্রহণ করেছে—এদের কথা কি ভোলা যায়? কি সুন্দর এরা! কি মধুর এরা!

না—না এ কি কর্‌ছি? আমি যে দাঁড়িয়ে গেলাম! এমন কর্‌লে ত সাগর দেখা ঘট্‌বে না। এরা সব ওলোই আমার পথের বিঘ্ন। ঠেলে ফেলে দিতে হবে—ঠেলে ফেলে দিতে হবে—এ সবে মন দিলে আর চল্‌বেনা। এতদিন ত এদেরেই মুখ্য করে' জীবনে মেনে নিয়েছিলাম, সাগর ছিল গৌণ। কিন্তু যে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাকে গৌণ করে' রাখ্‌লে, সে কি আর দেখা দেয়? ঐ অচলদেব, ঐ নবীনচন্দ্র তাই এখনও তার সন্ধান বল্‌তে অক্ষম। সংসারকে গৌণ করে' সাগরকে মুখ্য না করলে—কখনই তার পথে চলা হবে না। আমি যখন চল্‌তে চেয়েছি, তখন আর থামা নয়। সাগর—সাগর, তুমি আমার সব হৃদয়টাকে দখল করে' বস। এমন করে' দখল কর, যেন আর কিছু সেখানে ঢুক্‌তে না পায়!

গান

(ভৈরবী—কাওয়ালী)

হৃদয় দিতে চেয়েছিলাম,
দেইনি আলস ভরে,
আপন মনের স্বপন নিয়ে,
ঘুরেই আছি সরে'!
কত শত মুখের সাথে,
কত সুখের বেদনাতে
দিবস গেছে কাটি,
রসের ভিয়ান নানান মতে,
করেছি গো আপন মতে,
ভেবেছি এই বাটি—
সেই রসে আজ পা ডুবেছে,
ছাড়াই কেমন করে'?
ভাগর পরাণ ওগো সাগর,
বসে'ই আছ চিরজাগর,
দেখিছ মোর খেলা,
গুণ গুণিয়ে কেমন করে',
জীবনের এই বরষ ধরে'
ভালাই শুধু ভেলা।—
ভুল করেছি!—ভুল ক'রোনা,
দখল কর মোরে।

---

[৩]

বন-পার্শ্বে

[মধুর প্রবেশ]

মধু। পথ চল্‌তে আরম্ভ করে' এ কোথায় এসে সন্ধ্যা হল! সাম্‌নে ঐ যে বিরাট বন দেখতে পাচ্ছি। বনের ছায়ায় অন্ধকার এসে মিশল—এখন কি করি? কই পথ কই? তার রেখা পর্য্যন্ত মিলিয়ে গেল যে! দেখি ভাল করে'। (এ দিক ও দিক পরিক্রমণ)—না—না—পথ ত আর দেখা যাচ্ছে না। কেমন করে' চলি? হায়, হায়, এবার বুঝি এখানেই ঘুরে মরতে হল! পথ বুঝি আর নেই! এখানেই বুঝি পথের শেষ! তাঁর কথায় এতদূর চলে' এসেছি—কিন্তু এ যে ঠিক পথে এসেছি, তার নিশ্চয়তা কি? বুঝি আগাগোড়াই ভুল হয়ে গেছে রে—আগোগোড়াই ভুল! অপরিচিতের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে' কি মূর্খতার কাযই না হয়েছে! সব ভুয়ো!—সব ভুয়ো'! সাগরে যাওয়ার পথ কেউ জানে না! সকলেই সকলকে ঘুরিয়ে মারছে। হয় ত সাগরই বুঝি নেই রে, তাই এত গণ্ড গোল! আমার সব হাঁটা মিথ্যা, আমার লক্ষ্যটা মিথ্যা—আমার জীবনটাই একেবারে মিথ্যা হয়ে পড়ল? আজ সমস্ত অন্তরের আক্রোশ দিয়ে

বল্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে—সব মিথ্যা—সাগর মিথ্যা—সাগরে যাওয়ার পথ যারা বলে' দেয় —তারা মিথ্যা! সব মিথ্যা!

ওগো অপরিচিত, ওগো ভণ্ড, ওগো নিষ্ঠুর, আজ তুমি কোথায়? আমায় এমন করে' পথ ভুলিয়ে মারবার কি দরকার ছিল তোমার? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নি! তুমি আমায় পথ বলে' দিলে—আমি বিশ্বাস করে' নিলাম—কেন কর্‌লাম? —তোমার মূর্ত্তিটি দেখেছিলাম বড় সুন্দর,—উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নার মধ্যে স্থির বিদ্যুতে গড়া তোমার দেহখানি—দেখে মনে হল—এই-ই আমায় ঠিক পথ বলে' দেবার উপযুক্ত লোক। ভুল করেছি—ভুল করেছি। এঁ্যা, সত্যই কি ভুল করেছি? অমন সৌন্দর্য্য যার, তার মধ্যে কি কুটিলতা থাক্‌তে পারে? না-না, ভুল করি নাই। না—না, ভুল করেছি। না—না, কি করেছি, তাই-ই ভাল করে' বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।

ও—কি!—বনের মাথায় আগুন জ্বলে' উঠ্‌ল কেন? ওঃ—চাঁদ উঠ্‌ছে! যাক, বাঁচা গেল, অন্ধকারে আর ত অন্ধ হয়ে' থাক্‌তে হবে না। যদি পথ থাকে, তবে তাও একটু ভাল করে' দেখে নেওয়া যাবে। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ) এই যে পথ আছে! তার রেখাটা কিছু ধরা যাচ্ছে। ও কে পথের উপর বসে'? এমন বিজনতার মধ্যেও —জীবনের স্পন্দন! কেগো তুমি?

অপরিচিত। [অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পূর্ব্ব হইতেই বসিয়া থাকিবে] ভণ্ড—নিষ্ঠুর।

মধু। এঁ্যা—আপনি? আপনি এখানে বসে' রয়েছেন, তবু আমাকে সাড়া দেন নি?

অপরিচিত। দেখ্‌ছিলাম তুমি কি কর।

মধু। বড় অপরাধ হয়ে গেছে—আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন, (অপরিচিতের পদধারণ) ক্ষমা করুন।

অপরিচিত। পা ছাড়—পা ছাড়। ও কি কর?—পাগল হয়েছ!—তোমার দোষ কোথায়? ও ভুল যে কর্‌বেই—অমন সবাই করে' থাকে।

মধু। না—না দোষ হয়েছে। আমায় ক্ষমা নয়—শাস্তি দিন।

অপরিচিত। শাস্তি? হাঁ দিচ্ছি। (মধুর শিরশ্চুম্বন) কেমন,—হল?

মধু। এবার থেকে আপনি আর দূরে থাক্‌বেন না। দূরে থাক্‌লেই যত বিপদ।—আবার হয়ত কি সাঙ্ঘাতিক ভুল করে' বস্‌ব!

অপরিচিত। দূরে কোথায়?—নিকটেই ত রয়েছি। দূর মনে কর কেন?

মধু। কই, দেখ্‌তে যে পাই না!

অপরিচিত। ভাল করে' দেখনা, তাই দেখ্‌তে পাও না।

মধু। কেমন করে' ভাল করে' দেখা যায়?

অপরিচিত। আপ্‌নিই তা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

মধু। বুঝ্‌তে পার্‌ব?

অপরিচিত। পার্‌বে।

মধু। তবে আশীর্ব্বাদ করুন আপনার উপর আমার বিশ্বাস যেন অটল হয়।

অপরিচিত। অটল কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেই অটল হবে।

মধু। তবু আশীর্ব্বাদ করবেন না?—কি ভয়ানক লোক আপনি!—আপনাকে বুঝ্‌তে পারলাম না,——আপনি এখনও আমার অপরিচিত!

অপরিচিত। পাগল—একেবারেই পাগল! বড় কষ্ট হচ্ছে তোর—না রে? কষ্ট ত হবেই। শুয়ে বসে' আরাম করে' কি আর সাগর দেখা যায়?' কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র—কত

কুহক বৃহৎ বাধা এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়!—কোনটা আসে ভীষণ বেশে, কোনটা আসে মোহন রূপ ধরে', কিন্তু কোনটার কাছেই মাথা নোয়াতে নেই—সকলের সঙ্গেই লড়াই কর্‌তে হয়—আর সাহস রাখ্‌তে হয়,—রণে ভঙ্গ দেব না, জয়লাভ কর্‌বই কর্‌ব। সত্যই তাহলে জয়লাভ কর্‌তে পারা যায়।

মধু। সে কি আমার শক্তিতে কুলোবে? আমি যে বড়ই দুর্ব্বল!

অপরিচিত। সে কি রে?—নিজেকে অত দুর্ব্বল ভাবিস কেন? এই যে এতটা বাধা ঠেলে চলে' এলি, কেমন করে' এলি, বল্‌ত?

মধু। তা'ত বুঝ্‌তে পারি নি।

অপরিচিত। নিজের শক্তিতেই এসেছিস্‌।

মধু। আমার শক্তি? না—না এটা আপনারি দয়া!

অপরিচিত। পাগল!

মধু। তা যাই-ই বলুন, আমার কিন্তু বিশ্বাস, আপনার দয়া ছাড়া আমার এক পাও নড়্‌বার সামর্থ্য নেই। তাই ভয় হয়, কখন কি অপরাধ করে' সেই দয়া হ'তে বঞ্চিত হয়ে পড়ি!

অপরিচিত। আর ভয় কি রে? দুর্গম পথ ত প্রায় ফুরিয়ে এল, এখন জোর করে' চলে' যা।

—•—

[৪]

ঝরণা-তলে

[গাহিতে গাহিতে মধুর প্রবেশ]

গান

(পিলু বাঁরোয়া—যৎ)

ঐ ঘর-ছাড়া
মোরে করেছেরে ঘর-ছাড়া!
আজ পথের নেশা ঘুচিয়ে দিয়ে,
পথে এনে দেয় না সাড়া॥
পুঁজি-পাটা বসন-ভূষণ মোর
হাত পেতে সে চেয়ে নিয়ে,
পরিয়ে দিল ডোর,
কাঙাল করি কেমন করে'
কাঁদিয়ে মারে চোখ-তাড়া!
যতই তাহার নিঠুর ব্যভার পাই,
ততই তারে গভীর ভাবে
বুকের কাছে চাই
তাই আদরেতে এমন আমার
হৃদয়নাথে দেয় নাড়া।
বন-পথ-মাঠ কত নগর গাঁয়,
পথ যে আমায় দিবানিশি
ঘুরিয়ে মারে হায়!
তার শেষ-সীমানা পাই না কেন,
হলাম কিরে দিক্‌হারা?

ওগো অপরিচিত, ওগো স্বপরিচিত, ওগো নিষ্ঠুর, ওগো করুণ, ওগো শত্রু, ওগো মিত্র, ওগো আমার কি-যেন-কি, আজ তোমায় দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে কর্‌ছে। তুমি বলেছ, তুমি কাছেই থাক, ভাল করে' চাইলেই তোমাকে দেখা যায়। আমি ত চাচ্ছি, কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি কই? তবে বুঝি এ চাওয়াটা ভাল করে' চাওয়া হচ্ছে না! কেমন করে' ভাল করে' চাইতে হয়, আমায় শিখিয়ে দাও—আমি তোমায় প্রাণ ভরে' দেখি। তুমি এত সুন্দর!—এত মধুর!—তোমায় না দেখে থাকা যায়? সাগর কোনদিন দেখিনি, কোনদিন দেখ্‌তে পাব কি না, তা'ও জানি নি। কিন্তু তোমায় দেখেছি—আমার চোখে, মনে কি অপরূপ অঞ্জন লেগে গেছে!—তাই মুহূর্ত্তমাত্র তোমাছাড়া থাক্‌তে সাধ হচ্ছে না।

(খানিকটা গমন)

এই যে একটা ঝরণাতলায় এসে উপস্থিত হওয়া গেল। কত বনঝঙ্কার, মাঠ পেরিয়ে,

কত কত প্রাণহীন নগরীর সৌধশ্রেণী ছাড়িয়ে, কত কত নির্ব্বাক্ জনপদের শ্যামলতা এড়িয়ে, কত বিরাট মরুভূমির মারাত্মক শুষ্কতা সহ্য করে' এসেছি। বড়ই ক্লান্ত, তৃষার্ত্ত হয়ে পড়া গেছে। এখন ঝরণাতলায় খানিকটা বিশ্রাম করা যাক্। (উপবেশন) আঃ শরীরটা জুড়িয়ে গেল!—কেমন মিঠে ঠাণ্ডা হাওয়া এখনকার! আর পিপাসাও বুঝি থাকল না!

ওগো প্রাণ-প্রিয়, এখন একবার দেখা দাও। দুঃখে তোমায় ডেকেছি—কখনও দেখা পেয়েছি, কখনও পাই নি, আজ এই শান্তিতে তোমার সঙ্গ কত সুখের হয়, জান্তে ইচ্ছে কর্‌ছে। দেখা দাও— দেখা দাও।

এ-কি! সমস্ত ইন্দ্রিয় যে শান্তির রসে অবশ হয়ে পড়্‌ছে! চোখ যে আর তুল্‌তে পার্‌ছি নি! আঃ একটু ঘুমোই। (শয়ন ও মুদিত নেত্রে) এই যে বন্ধু আমার এসে দাঁড়িয়েছে! বেশ!—বেশ! দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে ভাল করে' দেখে নি। অনেকদিন দেখা দাও না, আজ ভেসে উঠেছ—একেবারে মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ! আর কি চোখ ফেরাতে পারি? দাঁড়াও—দাঁড়াও, সরে' যেয়ো না—দাঁড়াও। ওগো অপরিচিত, বহুদিনের না দেখায়, তোমার পরিচয় ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পেয়েছি—মনে হয়েছে, তুমিই আমার সব। কিন্তু তবু এখনও তোমায় ভাল করে' চিন্‌তে পারিনি—তুমি যে বড় রহস্যময়!—এখনও ভুল কর্‌বার আশঙ্কা আছে। দাঁড়াও—দাঁড়াও, তোমার স্মিতহাস্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা ছিন্ন করে' নি। (খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)

কই—কই? বন্ধু, কোথায় গেলে তুমি? এইযে এইমাত্র তোমায় দেখ্‌তে পেলাম—আবার লুকোলে কেন? একেবারে সব শূন্য হয়ে গেল যে! * * * ও আবার কার মূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌ল? এমন বিরাট বিশাল বপু ত কখন দেখিনি! ও কি রাগরক্ত চোখ! ওকি ভীষণ ভ্রুকুটি! ও কি বিস্ফারিত নাসা! কার এ রুদ্র মূর্ত্তি? ও—ও! এযে একেবারে মূর্ত্ত বিপদ!—একেবারে মূর্ত্ত মরণ!—প্রলয়ঙ্কর বদন ব্যাদান করে' গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে—আমায় গ্রাস করে' ফেল্‌বে—চরাচর গ্রাস করে' ফেল্‌বে—ও—ও—গেলাম, গেলাম—হৃদয়-বন্ধু, কোথায় তুমি? এস-এস—রক্ষা কর। একি! মূর্ত্তিটার মুখ যে আমার বন্ধুরই মত! এযে বন্ধুরই মুখ! এ্যাঁ, বন্ধু আমার এত ভীষণ? বেশ-বেশ! তবে ত আর ভয় নেই—আমার বন্ধু, সে ভীষণ হোক—যেমন হোক—সে আমারি বন্ধু! এই যে ভীষণ রূপ করে' পড়ে গেল! বন্ধু আমার যেমন, তেমন করে'ই দাঁড়িয়েছে—কি সুন্দর!

(খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)

বন্ধু, এ আবার কি হল? তুমিই যে পথ হয়ে আমার সাম্‌নে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়্‌লে! ও—কি? তুমিই যে গলে' গলে' সুনীল আকাশের মত তরঙ্গায়িত কি যেন-কি হয়ে পড়্‌ছ! এ কি পরিবর্ত্তন! একি মনোহর বিস্ময়! না—না এটা ভ্রান্তি! তুমি এ-নও—তুমি ও-নও—তুমি—তুমি! যেমন করে' আমার মন মাতিয়েছ, তোমায় তেমন করে' দেখ্‌লেই আমার ভাল লাগে! তেমন করে'ই আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াও।

এই যে দাঁড়িয়েছ! বেশ—বেশ! আমার কথা তবে তুমি শুনে থাক? শুন্‌বে না কেন? আমারই ত তুমি—তোমারি ত আমি, না শুন্‌লে চল্‌বে কেন? তুমি গোপনে গোপনে আমার অস্থিচর্ম্মে প্রবেশ করেছ, তুমি গোপনে

গোপনে আমার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়েছ, তুমি গোপনে গোপনে আমার সবটা দখল করে' নিয়েছ। এখন আমি ডাক্‌ছি—তুমি শুন্‌বে না!—এ কি কখন হয়? আমার মর্ম্মের ডাক, সে বুঝি এখন তোমারি ডাক। আর কি তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার? এখন একবার ভাল করে' তাকাও দেখি,—তোমার স্নিগ্ধ নয়নের মধ্য দিয়ে আমার হৃদয়ের সত্যকারের ছবিটা দেখে জীবন সার্থক করি!

—•—

[৫]

গিরি-গাত্রে

[বন্ধুসহ মধু]

মধু। ভিতরে 'আপনি'র বেড়া ভেঙে গেছে। তাই বাইরেও সেটা ভেঙে দিলাম। আজ আপনি—আমার তুমি। বন্ধু, আজ আর আমার আনন্দের সীমা নেই। তোমার কাছে কাছে থাক্‌তে পাচ্ছি, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর আমার কি হতে পারে? কাছে—এত কাছে যে অনেক সময় মনে হচ্ছে তুমি আমি এক হয়ে গেছি!—শরীরের ব্যবধানও বুঝি নেই!

তোমায় কাছে পেয়েছি বলে'ই আজ নির্ভয়ে সকল দিকে দৃষ্টি দিতে পারছি। এই যে চারদিককার তরুলতায় জীবনের সরসতা—শ্যামলতা! এই যে চরাচরে—জড়েজীবে মিলনের অদ্ভুত-আনন্দ। বুঝ্‌তে পার্‌ছি—বসন্ত এয়েছে। তার গোপন আবির্ভাবে স্থাবর জঙ্গমে আনন্দের বিচিত্র লীলামাধুর্য্য। আজ এই আনন্দে—এই মিলনের মাধুর্য্যে অবগাহন করে' ধন্য হলাম। কোথা হতে অদৃষ্ট ফুলরাশির সৌরভ ভেসে আস্‌ছে? প্রাণটা মাতাল হয়ে উঠ্‌ল, দেখ্‌ছি! কোথায় বাজ্‌না বাজ্‌ছে না? কেমন মধুর বাজ্‌না! কাণ পেতে কেবল শুন্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। বন্ধু, বড় সুন্দর জায়গায় আমাকে এনে ফেলেছ!

ঐযে এ কেমন আলো এখানে ফুটে উঠ্‌ল? এমন আলো ত চোখে কখনও দেখি নি! এ কিসের আলো?—সূর্য্যের? না—না, সূর্য্যের আলো ত এত স্নিগ্ধ নয়! এ কি চন্দ্রের আলো? না—না, চন্দ্রের আলোত এত শুভ্র নয়! বন্ধু, এ কি আলো? কিসের আলো?

বন্ধু। এই আলোর কথাই পূর্ব্বে বলেছিলাম।

মধু। এই আলোয় আজ নিকট, দূর দূরান্তর সব পরিষ্কার হয়ে দেখা দিচ্ছে। এদিকে এই পর্ব্বতের সানুদেশে, যেখান দিয়ে আমি চলে' এসেছি, সব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। সেখানে চলবার সময় কত উঁচু-নীচু, খালবন্ধ, কত ভেদ-ব্যবধান দেখা গিয়েছিল, এখন এখান হতে, এই আলোয় সাহারো দেখ্‌তে পাচ্ছি, সব এক রকম, কোথাও কোন ভেদ নেই, উঁচু নীচু সব সমান। বন্ধু, দেখ ত এদিকে, বল ত, আমার দেখাটা ভুল হল কি না?

বন্ধু। ভুল হবে কেন? ঠিকই দেখেছিস্। এখানে উঠে, এই আলো পেয়ে ঐরূপই দেখা যায়। এখানে না উঠে যারা অমন দেখার কথাটা বলে, তাদের সেটা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সেটা ভাঙতেও বিলম্ব হয় না। এই আলোকে ভিতর-বাহির সব একাকার করে' দেয় রে—সব একাকার করে' দেয়। এ আলোয় দেখা ভাঙে না, কখনও ভাঙে না। উঠে চল্, উঠে চল্—আরও কত কি দেখ্‌তে পাবি। এখানেই দাঁড়িয়ে যাস্ নি। সাগর দেখ্‌তে হবে—সাগরে সাঁতার

খেল্‌তে হবে—সাগরে ডুব্‌তে হবে—নাইতে হবে। তারপর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের আনন্দে ফিরে যেতে হবে আবার সেই উল্টাডাঙার রাজপথে। সেটা ঠিক ফেরা নয়, আপাততঃ ফেরা বলে'ই বল্‌তে হল।

তুই যেমন কেঁদেছিলি, তেমনি কত কত তৃষার্ত্ত—কত কত দুঃখদৈন্য মলিনতায় আচ্ছন্ন—কত কত স্বাস্থ্যহীন—শক্তিহীন—লাবণ্য-হীন সাগরের জন্যে কেঁদে মর্‌ছে। তাদের কাছে ফিরে না গেলে চল্‌বে কেন? এই পথের বার্ত্তা—আনন্দের সন্ধান তাদিগকে দিতেই হবে—নইলে তোর নিজের শান্তিই অসম্পূর্ণ হ'য়ে থাক্‌বে যে!

মধু। সে কি বন্ধু! আবার উল্টাডাঙা? আবার প্রত্যাবর্ত্তন? আবার জনকোলাহল?

বন্ধু। হাঁ, আবার সবই—কিন্তু নতুন ধরণে। ভয় নেই—এবার আর তোর বিক্ষেপ আস্‌বে না।

মধু। না—না আমায় এমন আদেশ ক'রো না।—আবার লোকসংসর্গ? বেশ চলেছি—নিজের আনন্দে! এ হতে আমায় বঞ্চিত হতে ব'লো না। বড়ই ভয় হয়।

বন্ধু। বল্‌ছি ভয় নেই। সাগরে সাঁতার কাট্‌লে কি আর ভয় থাকে রে? যে পূর্ণতা অর্জ্জন করে' তুই ফির্‌বি, উল্টাডাঙায় এমন কি আছে যে তার ক্ষতি কর্‌তে পারে?

তুই জানিস্ নি, প্রায় সকলকেই এমন করে' ফিরতে হয়। কেউ হয়ত অল্প দিনের জন্যে ফেরে, কেউ হয়ত ফেরে বেশী দিনের জন্যে। তারপর হঠাৎ কোনদিন তারা সাগরে এমন ডুব মারে যে আর তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না!

আচ্ছা, মনে করে' দেখ্‌ত, কারু কাছে ঠিক পথের বার্ত্তাটি না পেলে তোর কি দশা হ'ত?

মধু। বুঝ্‌লাম। তোমার যা ইচ্ছে—তাই-ই হবে।

[উভয়ের আরও উচ্চে আরোহণ]

মধু। বাঃ বাঃ ঐ দিক্‌কার দিগন্তের দৃশ্যটি ত বড় চমৎকার!—এমন অবাধ বিস্তার, এমন উন্মুক্ত দিক্‌চক্র ত কখনও দেখি নি! ওর সারা বুকটা জুড়ে এ কি প্রবল ধূম্র খেলা! আলোর ধূধূ!—সৌন্দর্য্যের ধূধূ! মাধুর্য্যের ধূধূ! গাম্ভীর্য্যের ধূধূ!—সব ধূধূময়! চোখ যে একেবারে ধূম্রর নেশায় জড়িয়ে গেল!

বন্ধু, বন্ধু, শোন ত একবার—ঐ নির্ব্বিকার দিগন্তের হৃদয় ভিন্ন করে' একটা, গর্জ্জন ভেসে আস্‌ছে না?—একটা ভীষণ মধুর গর্জ্জন? শোন—শোন, কি অবিরলোত্থ গর্জ্জন! যে বাতাসে ঐ বিপুলধ্বনি ভেসে আস্‌ছে, তাতে কি প্রাণস্নিগ্ধকর শৈত্য! এ-কি!—আমার সারা অঙ্গে স্বাস্থ্যের লাবণ্য ফুটে উঠ্‌ল যে!—একি আমি এমন শক্তিমান হয়ে উঠ্‌লাম কেমন করে'?—এ কি বিরাট বীর্য্য—এ কি বিপুল শান্তি—এ কি গভীর আনন্দ আমার মধ্যে আবির্ভূত হচ্ছে!—বন্ধু, বন্ধু, সাগর কি তবে ঐ?

বন্ধু। ঐ—ঐ। আরো ওঠ্—আরে যা।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

বর্ত্তমান জগৎ

(চতুর্থ ভাগ)

স্বাধীন এশিয়ার রাজধানী

(২৩৫ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

৭। নেভ্যাল মিউজিয়াম

হোটেলের অতি নিকটেই "নেভ্যাল মিউজিয়াম" বা নৌসংগ্রহালয়। একটা খাল পার হইয়া মিউজিয়ামে প্রবেশ করিলাম। গৃহের চারিদিকে বাগান—অট্টালিকা আধুনিক ধরণের। বাগানের চারিদিকে পোর্ট আর্থারে লুণ্ঠিত রুশ কামান টর্পেডো এবং জাহাজের অংশ-বিশেষ সাজান রহিয়াছে।

সংগ্রহালয়ের ভিতরও এইরূপ বহু trophy দেখিতে পাইলাম। ওসাকার কারখানায় প্রস্তুত কামান, গোলা ইত্যাদির সংগ্রহ মন্দ নয়। চীনা সংগ্রামে লুণ্ঠিত দ্রব্যের সংখ্যা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষোড়শ-শতাব্দীতে জাপানীরা কোরিয়া আক্রমণ করিতে যাইয়া বিফল হয়। সেই সময়ে ব্যবহৃত জাহাজের নমুনা মিউজিয়ামে রহিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রাণী জিঙ্গো কোরিয়া দেশ জাপানের অধীন করেন। সেই বিজয় কাহিনীর কোন নিদর্শন "মিলিটারী মিউজিয়ামে"ও নাই এখানেও দেখিলাম না।

কতকগুলি বন্দর, পোতাশ্রয়, ডকইয়ার্ড ইত্যাদির নক্সা ও মডেল কোন কোন প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হইতেছে। পোর্ট আর্থারের জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ বুঝাইবার জন্যই কয়েকটা ঘর বিশেষভাবে রক্ষিত। মানচিত্র, মডেল ইত্যাদি দেখিলে সকলেই যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সহজে বুঝিতে পারে। জাপানীরা কোথায় কতগুলি নিজেদের মালের জাহাজ ডুবাইয়া রুশ-রণতরীর পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল তাহা বেশ সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। একজন চিত্রকর রুশ যুদ্ধের কতকগুলি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। নোপালিয়ানী সময়ের যুগে ফরাসী চিত্রকরেরা এইরূপ সুকুমার শিল্পে সুদক্ষ ছিলেন। তিনটি চিত্রের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে (শিল্পীর নাম টোজো):—

1. The Battle of Port Arthur A. m. March 10, 1904.

The Bambardment of Port Arthur. August 19, 1904.

3. The Battling up of Port Arthur.

কয়েকটা গৃহে তড়িতের যন্ত্র বহুবিধ দেখা গেল—বর্ত্তমান সমুদ্র-যুদ্ধ এবং অর্ণবযানের জটিল কলসমূহের প্রদর্শনী-গৃহ স্বরূপ এই ঘরগুলি ব্যবহৃত হয়। মিউজিয়ামের পার্শ্বেই নেভ্যাল কলেজ—এই মিউজিয়াম ছাত্রগণের ল্যাবরেটরী।

মিলিটারি মিউজিয়ামে দেখিয়াছি সেদিনকার আর্থার-যুদ্ধে ব্যবহৃত আকাশযান জাপানীরা ইতিমধ্যেই সংগ্রহালয়ে তুলিয়াছেন। নেভ্যাল মিউজিয়ামেও আর্থার উপনিবেশ এবং দ্বীপপুঞ্জের trophy সমূহ রক্ষিত হইতেছে।

রুশ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপানীরা ইংরাজের নেপলিয়ান ধ্বংসের গৌরব অনুভব করিতেছে। সেনাপতি নোগি জাপানের ওয়েলিংটন, এবং এ্যাডমিরাল টোগো ইহাদের নেল্‌সন। ১৯০৫ সালের ২৭ মে তারিখে বেলা ১·৫৫ মিনিটের সময় টোগো চিরস্মরণীয় জয়লাভ করেন। তিনি যে জাহাজে বসিয়া সমগ্র নৌবিভাগের পরিচালনা করিতেছিলেন তাহার নাম "মিকাসা।" নেভ্যাল কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ ২৭ মে তারিখে উৎসব করিয়া থাকে। মিউজিয়ামের একগৃহে জাপানী নেল্‌সনের "ফ্ল্যাগ্‌শিপ" ঝুলান রহিয়াছে।

মধ্যযুগের কয়েকখানা রণতরীর নমুনা ও চিত্র একগৃহে দেখিতে পাইলাম। একটা জাহাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :—"The Ataka Maree was the biggest war-galley possessed by shogun before the new Navy was established. Her dimensions were 180 ft. long, 63 ft. broad and 22 ft. deep and proplled by 130 oars. She mounted five guns besides numerous small arms and the vital parts of the ship were protected by copper sheets."

বর্ত্তমান রণতরীর তুলনায় এই জাহাজ একখানা পান্সী বা বজরা মাত্র! চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীদের এই অবস্থা ছিল। অথচ আজ জাপানের হস্তে প্রশান্ত মহাসাগরের আধিপত্য—ইয়াঙ্কিরা জাপানী রণতরীর ভয়ে অস্থির—ইংরাজও আশঙ্কিত।

জলযুদ্ধে আজকাল শত্রুপক্ষীয় টর্পেডো-সমূহের আক্রমণই বিশেষ ভীতিজনক। এই যন্ত্রগুলি জলের ভিতর লুক্কায়িত থাকে—এবং অলক্ষ্যে আসিয়া বহু ব্যয়সাধ্য বিরাট জাহাজগুলিকে এক নিমেষের মধ্যে রসাতলে পাঠাইয়া দেয়। কাজেই টর্পেডো ধ্বংস করিতে পারা বর্ত্তমানকালে অত্যন্ত আবশ্যক। গাইড কয়েকটা আল্‌মারির নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন—"এই যে পদক, পেয়ালা, ফুলের বাটি ইত্যাদি দেখিতেছেন এগুলি প্রাইজ বা পুরস্কার। যে সকল নাবিক টর্পেডো ধ্বংস করিতে কৃতিত্ব দেখায় তাহারা নৌবিভাগ হইতে এই সকল পুরস্কার পাইয়া থাকে।"

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াঙ্কি নাবধ্যক্ষ পেরি জাপানে আগমন করেন। তখন জাপানে শোগুণী আমল। ইয়াঙ্কিদিগকে এবং অন্যান্য "ম্লেচ্ছ"গণকে জাপানে বসতিস্থাপন এবং বাণিজ্য বিস্তার করিতে দেওয়া হইবে কি না এই বিষয়ে দুই দল জাপানে দেখা দিল। শেষ পর্য্যন্ত মিকাডোর অনুমতি না লইয়াই শোগুণ পেরিকে দরবারে আহ্বান করিলেন। পেরির জাপানী দরবারে আগমন একটা সমসাময়িক চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। মিউজিয়ামে তাহা দেখিলাম। ক্লাইব মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট "দেওয়ানী"র সনন্দ লাভ করিবার সময়ে যে ভাবে দরবারে উপস্থিত ছিলেন তাহার এক চিত্র ভারতবর্ষে দেখিয়াছি। সদলবল পেরি চিত্র দেখিয়া সেই কাহিনী মনে পড়িল। দুই ঘটনায় প্রায় ১০০ বৎসরের ব্যবধান।

জাপানীরা বহুকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া "গৃহে চ মধু বিদ্যেত ক্ষিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" ভাবিতেছিলেন। বিদেশীয়গণকে ম্লেচ্ছ জ্ঞান করা তাহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল অবশেষে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সাত

আটজন জাপানীকে ইয়াঙ্কিস্থানে পাঠান হয়। এই কয়জন নব্য জাপানীর চিত্র দেখা গেল। ইহারা তখনও ম্লেচ্ছ পোষাক ধরে নাই—ইহারা হিন্দু মতেই খাঁটি স্বদেশী ভাবে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। ৩৩ বৎসর মাত্র বিদেশগমনের পর জাপানীরা Wireless telegraphy, আকাশযান, floating mines টর্পেডো ইত্যাদির ব্যবহার করিয়া ইয়োরোপের আশঙ্কাস্থল রুশজাতিকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই বিস্ময়জনক ঘটনার তুলনা জগতে নাই।

রুশযুদ্ধের পর ইংরাজেরা জাপানকে বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। এই বন্ধুত্বলাভ করা জাপানের পক্ষেও গৌরবজনক সন্দেহ নাই। বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করিবার জন্য ১৯১০ সালে ইংলণ্ডে এক বিরাট প্রদর্শনী খোলা হয়—যে কোন কার্য্যের জন্য প্রদর্শনী খোলা বর্ত্তমান যুগের রীতি। প্রদর্শনীর নাম Anglo-Japanese Exhibition, এই প্রদর্শনীর জন্য জাপান হইতে সকল প্রকার দ্রব্য লণ্ডনে পাঠান হইয়াছিল। জাপানকে ইংলিশস্থানে সুপ্রচারিত করিবার জন্য একজন জাপানী রাষ্ট্রনায়ক Japan Today, নামক সুবৃহৎ সচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার নাম মোচিজুকি। সেই মেলায় প্রদর্শিত কোন কোন দ্রব্য এই নৌসংগ্রহালয়ে দেখিলাম।

৮। চিত্রশালা ও ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়াম

বর্ত্তমান সম্রাটের বিবাহোপলক্ষ্যে টোকিও-বাসিগণ তাঁহাকে একটা অট্টালিকা উপহার দিয়াছিলেন। সেই অট্টালিকা আজকাল জাপানীদের সুকুমারশিল্পভবন। ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামের সংলগ্ন এই সৌধে গবর্মেণ্ট Fine and Industrial Arts এর নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন।

কতকগুলি প্রকোষ্ঠে চীনা অক্ষরে প্রাচীন চীনা সাহিত্যের লক্ষমান "কাকেমোনো" দেখিলাম। ইয়োরোপে এবং এশিয়ায় মধ্যযুগের লোকেরা লিপিচাতুর্য্যের জন্য জীবন কাটাইয়া ফেলিত। পার্শী, আরবী, ল্যাটিন, চীনা সকল ভাষারই সযত্নে লিখিত পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিউজিয়ামে যাহা দেখিলাম তাহার অধিকাংশই সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের চীনা অনুবাদ।

অন্যান্য গৃহে চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইতেছে—আগাগোড়া "কাকেমোনো"। এইগুলি সমস্তই মধ্যযুগের চীনাশিল্প। শুনিলাম—"মিউজিয়ামের কর্ত্তাদের নিকট এত বেশী চীনা চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে যে সেগুলি একসঙ্গে প্রদর্শন করা অসম্ভব। এই জন্য দুইতিন সপ্তাহ পর নূতন নূতন কাকেমোনোর তাড়া খুলিয়া দেওয়া হয়।" আজ প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রই দেখিলাম। একজন বলিলেন —" ইহার পূর্ব্বে চীনাদের বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।"

চীনারা উদ্ভিদ্ পর্ব্বত ইত্যাদি আঁকিতে যাইয়া প্রকৃতির অনুকরণ করে না। এগুলি দেখিলে স্বাভাবিক বস্তুর পরিচয় পাই না। কেবল বুঝিতে পারি যে—গাছপালা পাহাড় পর্ব্বত চিত্রিত রহিয়াছে কিন্তু কোন জাতীয় গাছ বা কোন পাহাড় আমার সম্মুখে বর্ত্তমান তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

কিন্তু ইহাদের অঙ্কিত জীবজন্তুগুলি সবই স্বাভাবিক। দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যায়। অঙ্কনেও যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

চিত্রশালায় জাপানী শিল্পের নিদর্শন একটাও নাই। কোন কোন গৃহে কৌরিয়ার

হস্তশিল্প এবং চীনমাটির কাজ প্রদর্শিত হইতেছে। এখান হইতে ইম্পিরিয়াল মিউজিয়ামে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই স্থাপত্য-গৃহ। এই গৃহে হিন্দু বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি দেখিয়া ভারতীয় মিউজিয়াম সমূহের অভ্যন্তর মনে আসিল। বিদ্যার দেবতা, দীর্ঘ আয়ুর দেবতা ইত্যাদিও অনেক রহিয়াছে। কিম্ভূত কিমাকার আকৃতি বিশিষ্ট দেব দেবীর মূর্ত্তিও কম নাই। এই সকলগুলি প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত। ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তির সংখ্যা অল্প। প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিলাম না—ধাতুর মধ্যে পিতলের ব্যবহার বুঝা গেল। কামাকুরা নগর হইতে এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইয়েডো বা টোকিওতে টোকুগাওয়া শোগুনেরা রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থাপন করিবার পূর্ব্বে কামাকুরায় শোগুনী দরবার অবস্থিত ছিল। সুতরাং মিউজিয়ামের এই মূর্ত্তিগুলি ষোড়শশতাব্দীর পূর্ব্বেকার যুগ উন্মুক্ত করিতেছে।

জাপানী স্থাপত্য সম্বন্ধে Chamberlain বলিতেছেন:—"Sculpture long remained exclusively in Buddhist hands—at first in those of Korean Priests or of descendants of Korean and Chinese Craftsmen—whence it not unnaturally exhibit Indian influence. Critics still hesitate as to the share to be attributed to native Japanese in a series of large wood and bronze images adorning the temples of Kyoto and Nara. Whatever their origin and date (some are attributed to the sixth and seventh centuries), these figures, by virtue of their passionate vitality of expression and of their truth to Anatomical detail, may claim a place among the world's masterpieces. The ideal they embodied has not again been reached on Japanese soil. Japan also possesses some early stone images and a few remarkable stone carvings in relief, but this brand of the art has remained comparatively unimportant."

৫৫২ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া হইতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আমদানি হয়। ইহাই জাপানী সভ্যতার প্রথম বর্ষ। জাপানের শিল্প, শিক্ষা, শাসন, ইত্যাদি সকল বস্তুই এই ঘটনার পর আরব্ধ হইয়াছে। এই ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্তসমূহকে প্রাগৈতিহাসিক বলা চলে। আমরা এখন পর্য্যন্ত খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর (অর্থাৎ বুদ্ধদেবের) পূর্ব্বেকার ভারত সম্বন্ধে প্রমাণসিদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি না। কাজেই বলিতে হইবে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালের ১১০০।১২০০ বৎসর পরে জাপানে সভ্যতার বীজ উপ্ত হয়। এই হিসাবে জাপানের দীক্ষাগুরু ভারতবর্ষ জাপান অপেক্ষা ১১০০।১২০০ বৎসর প্রাচীন। জাপান যখন কোরিয়ার নিকট ধর্ম্মগ্রহণ করিতেছিল তখন ভারতবর্ষে কালিদাস, বিক্রমাদিত্য, বরাহ, মিহিরের স্বর্ণযুগ প্রায় অতীত হইতেছে। তখনও হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যগৌরব সুরু হয় নাই। জাপানে কোন্ ধরণের ভারতীয় প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য এই সন তারিখটা মনে রাখা আবশ্যক। এই

কথা মনে না রাখিলে জাপানী বৌদ্ধধর্ম, জাপানী মূর্ত্তিতত্ত্ব, জাপানী চিত্র কলা ও অন্যান্য সূক্ষ্মশিল্প যথার্থরূপে বুঝা যাইবে না।

ইম্পিরিয়াল মিউজিয়ামের অন্যান্য গৃহে জাপানী চিত্রকলার নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য বৌদ্ধশিল্পের পরিচয়ই বেশী পাইলাম। কিন্তু জাপানী শিল্প একমাত্র ধর্ম্মশিল্পই নয়। বাস্তব জগৎ লইয়া ভারতবাসীর মত জাপানীরাও নাড়াচাড়া করিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্রনে জাপানীরা ক্ষমতা দেখাইয়াছে। অবশ্য জাপানী চিত্রকলার প্রত্যেক যুগেই চীন ও কোরিয়ার শিল্পীদিগের প্রভাব ন্যূনাধিক বর্ত্তমান।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত জাপানের বৌদ্ধ চিত্রকলা বোধ হয় আগাগোড়া বিদেশীয় শিল্পিগণের কৃতিত্বের সাক্ষী। এই যুগে প্রধানতঃ ধর্ম্মচিত্রই অঙ্কিত হইত। আর তখন কোন জাপানী সন্তান চিত্রবিদ্যায় হাত দেখাইতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। এই যুগে চীনে টাঙ্গ ও সুঙ্গ রাজবংশের আমল এবং ভারতবর্ষে হর্ষবর্দ্ধন ধর্ম্মপাল ও চোল সম্রাটগণের অভ্যুদয়। এই যুগের চীনে এবং ভারতে সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র ও বাণিজ্যের যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই সদর্পে বলা যায়—

"সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ।" সমগ্র এশিয়ায় ভারতমণ্ডল। (Indian sphere of influence) এই যুগেই স্থাপিত হইয়াছিল। জাপানের তখন প্রত্যেক বিষয়ে হাতে খড়ী হইতেছে মাত্র।

এই যুগের ভারত-শিল্প জাপান সম্বন্ধে Stewart Dick বলিতেছেন :—The chief centres of the new culture which spread over the land were the great Buddhist Monasteries. Just as our own mediœval cathedrals and monasteries were the nurseries of the arts, so in Japan arose a race of artists priests. Their work at first applied solely to religious purposes, but afterwards widened out till, along with the sacred, there existed also a secular school. For three or four hundred years under these benign and mellowing influences the country grew and prospered. The quiet and peaceful times from the eighth to the 10th century marked a period of great literary activity several of the most famous poets of Japan, whose writings still live in old tradition, flourishing during this period.

হিন্দুস্থানের সভ্যতা-তপন যখন মধ্যাহ্নগগন হইতে ক্রমশঃ অস্তাচলের পথে অগ্রসর, জাপানে তখনমাত্র সূর্য্যোদয় দেখা দিতেছে।

বড় বড় মিউজিয়ামে যাহা থাকা আবশ্যক টোকিওর ইম্পিরিয়াল মিউজিয়ামে তাহার সবই আছে। তবে ইহাকে প্রথম শ্রেণীর সংগ্রহালয় বলিতে পারি না। খনিজতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধানকার্য্যের ফল মুদ্রিত হইয়াছে দেখিলাম। জাপানী অধ্যাপকগণ আধুনিক বিজ্ঞানচর্চ্চায় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতেছেন। Zoology, Botany, Engineering, Electricity, Chemisty ইত্যাদি বিষয়ে জাপানী বৈজ্ঞানিকেরা মৌলিক গবে-

ঘণা প্রায়ই ছাপাইয়া থাকেন। মাকডেন কোম্পানী ইহাদের আলোচনা ও অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার তালিকা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। জাপানী বিজ্ঞান-সেবিগণের পক্ষে বসিয়া থাকা অসম্ভব।

৯। "কোকা" বা সুকুমার-শিল্পের পত্রিকা

একজন পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হইল। নাম সেইচিটাকি। ইনি কয়েক বৎসর হইল ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। ইংরাজী ও জার্মাণ ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিবার ক্ষমতা আছে—কিন্তু কোন বিদেশীয় ভাষায় লিখিবার ক্ষমতা নাই। ইনি ইংরাজীতে কথা বেশ বলেন।

ইহার আফিসে দেখা করিলাম। অতিশয় ক্ষুদ্র কার্য্যালয়। খাঁটি স্বদেশীভাবে কাজ কর্ম্ম চলিতেছে—সাধারণ ভারতীয় ছাপা-খানার অবস্থা এইরূপ। প্রথমেই দুগ্ধহীন চিনিহীন চা পান করিলাম। মিশরীয়েরা কাফি দিয়া আগন্তুককে আলাপ আপ্যায়িত করে—জাপানীরা চা দিয়া করে—আর ভারত-বর্ষের রেওয়াজ পান তামাক। ইয়োরামেরি-কানেরা যখন তখন কোন লোককে পান ভোজনের জন্য খোসামোদ করে না। যাহাকে আহারাদির জন্য নিমন্ত্রণ করা হয় সে যথা-সময়ে আসিয়া টেবিলে বসে। তবে যে কোন সময়ে সিগারেট প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

টেবিলের উপর কয়েকখানা মোটা বই পড়িয়া আছে। ভিতরে স্থানে স্থানে জাপানী লেখা—কিন্তু এগুলি চিত্রসংগ্রহের পুস্তক। শ্রীযুক্ত কুমারস্বামীর Selected Examples of Indian Art এর মত এই পুস্তকসমূহে চীনা শিল্পের নিদর্শন মুদ্রিত হইয়াছে। টাকি বলিলেন—এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ "কোকা" কার্য্যালয়ের অন্যতম কার্য্য। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা কি Archæology বা পুরাতত্ত্বের দিকেই বেশী নজর দিয়াছেন? সুকুমারশিল্পের æsthetics বা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে 'কোকা'য় আলোচনা প্রকাশিত হয় না কি?" টাকি বলিলেন, "আমি স্বয়ং চিত্রবিদ্যা শিখিয়া-ছিলাম। প্রথম বয়সে চিত্রাঙ্কনও করিয়াছি। পরে চিত্রসমালোচনায় লাগিয়াছি। এক্ষণে চিত্র বা স্থাপত্যের ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনায়ই বেশী মনোযোগ দিয়াছি। তবে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব একেবারে বাদ দিই না।"

টাকি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে Art-history বা সুকুমার শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস বিদ্যার প্রত্যেক ছাত্রকেই এই বিষয় শিখিতে হয়। এই হিসাবে টোকি-ওর বিশ্ববিদ্যালয় জগতের অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র। টাকি বলিলেন—"বোধ হয় একমাত্র জার্মাণীতে এই নিয়ম আছে।" বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে Art-history নামক একটা বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পাঠ্য তালিকায়ই এখনও স্থান পায় নাই।

টাকি এই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। কলি-কাতা, সারনাথ, লক্ষ্ণৌ, মথুরা ও লাহোরের মিউজিয়ামগুলি দেখিয়াছেন। অজন্তায় যাওয়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। টাকি বলিলেন—"আমি পূর্ব্বে Griffiths এর অজন্তাবিষয়ক গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছিলাম। তাঁহার শিষ্যবর্গের অঙ্কিত নকল চিত্রগুলি দেখিয়া অজন্তার একটা মোটা জ্ঞান লাভ

করি। কিন্তু স্বচক্ষে সেই বিরাট গহ্বর-শিল্প দেখিয়া সম্পূর্ণ নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমি এতদিন চীনা চিত্রকলার চর্চ্চা করিতাম। খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে দশম একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যুগের চীনা শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। অজন্তার চিত্রাবলী দেখিবা মাত্র আমি ভাবিলাম যেন চীনা কারিগরদিগের কারুকার্য্য দেখিতেছি। অথচ চীনা শিল্পের গৌরবযুগ অজন্তার যুগের বহু পরবর্ত্তী। কাজেই অজন্তার শিল্পিগণকে চীনা শিল্পীদিগের গুরু অথবা গুরু ভাই বলিতে আমার প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রিফিথ্‌সের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট চিত্রাবলী দেখিয়া আসল অজন্তার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যায় না। তাঁহার চিত্রকরগণ সকলেই পাশ্চাত্য চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন—তাঁহারা প্রাচ্য কায়দার অধিকারী ছিলেন না। এই জন্য অজন্তার নকল করিতে যাইয়া তাঁহারা অজ্ঞাতসারে পাশ্চাত্য-লক্ষণ-সমন্বিত রচনা সৃষ্টি করিয়াছেন। আসল অজন্তায় চীনা লক্ষণ পাই—অথচ গ্রিফিথ্‌সের পুস্তকে পাই না। এই সকল কথা আমি ভারত-ভ্রমণের পর কোন কোন জাপানী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি।"

টাকি সারনাথ ও মথুরার স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে বলিলেন—"এইগুলিই আমার ভাল লাগে। আর এই গুলিই খাঁটি ভারতীয়। দেখিবামাত্র ভারতবর্ষীয় মূর্ত্তি বলিয়া চেনা যায়। অধিকন্তু মূর্ত্তিসমূহের ভিতর দিয়া একটা গাম্ভীর্য্য ও শান্তিপ্রিয়তা ফুটিয়া বাহির হইতেছে বুঝিতে পারি। কিন্তু গান্ধার স্থাপত্যে বিদেশীয় প্রভাব যথেষ্ট। চীনা স্থাপত্যে খাঁটি-ভারতীয় এবং গান্ধার উভয় শিল্পেরই লক্ষণ বিদ্যমান।"

কোকা কোম্পানীর ছাপাখানা হইতে কয়েকদিন হইল একখানা সুবৃহৎ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ Stein যেমন খোটান তুর্কীস্থান ইত্যাদি অঞ্চলে খননকার্য্য করিতেছেন জাপানী বৌদ্ধ পণ্ডিত ওটানিও সেইরূপ করিতেছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যরাশি এই দুই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওটানিকে কি জাপান গবর্মেণ্ট এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন?" টাকি বলিলেন—"না। ওটানি আমাদের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। ইহার অধীনে প্রচুর অর্থের আয় ব্যয় হইয়া থাকে। ইহার পুরানাম ও বিবরণ Count Otani, Archbishop of Western Honganji Temple, Kyoto. ইনি স্বয়ং আধুনিক বিদ্যায় পারদর্শী—ইংলণ্ডে লেখাপড়া শিখিয়াছেন। ভৌগোলিক অনুসন্ধান exploration, excavation ইত্যাদিতে ওটানির আগ্রহ যথেষ্ট। ইনি দুই তিনবার তুর্কীস্থান অঞ্চলে শিষ্য সহ অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইঁহাদের সংগৃহীত পদার্থের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইল। সকল বস্তুই কিয়োটোর প্রধান মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে।" গ্রন্থদ্বয়ের ভিতর প্রধান শিল্প, মুদ্রা, মূর্ত্তি, বৌদ্ধসূত্র, অলঙ্কার ইত্যাদির ফটোগ্রাফ ছাপা হইয়াছে। খরচ হইল প্রায় দশ হাজার টাকা।

টাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোকা কোম্পানীর কার্য্য কি লাভজনক? গবর্মেণ্ট বোধ হয় আপনাদিগকে অর্থ-সাহায্য করেন।" অধ্যাপক বলিলেন—"গবর্মেণ্টের সাহায্য আমরা পাই না। অথচ আমাদের কার্য্য আদৌ লাভজনক নয়। প্রত্যেক বৎসরই

লোকসান দিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই কার্য্যের জন্য দুইজন বন্ধু পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা টোকিওর সর্ব্ববিখ্যাত "আসাহি" দৈনিক পত্রের স্বত্বাধিকারী। দৈনিক পত্রের পরিচালনায় লাভ যথেষ্ট থাকে। তাঁহারা এই লাভের কিয়দংশে কোক্কা কোম্পানীর কার্য্য চালাইয়া থাকেন। ইঁহাদের নাম মুরায়ামা এবং উয়েনো—উভয়েই ওসাকার অধিবাসী।" কোক্কা কোম্পানীর মাসিক খরচ প্রায় ৩০০০৲।

কোক্কা পত্রিকা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। "কোক্কা" শব্দের অর্থ "The flower of the naton" অর্থাৎ দেশের ফুল। সুকুমার শিল্পকে জাপানীরা ফুলের আখ্যা দিয়াছে। মাত্র ৩০০ কাপি প্রতিমাসে ছাপা হয়। ইংরাজী সংস্করণ ও জাপানী সংস্করণ—দুই সংস্করণ বাহির হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি ইংরাজী লিখিতে পারেন না বলিলেন—তবে ইংরাজী সংস্করণের সম্পাদক হইলেন কি করিয়া?" ইনি বলিলেন—"আমার বক্তব্য জাপানীতে লিখি। একজন বন্ধু তাহার অনুবাদ করেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাগজের কাট্‌তি কোন্ দেশে বেশী?" ইনি বলিলেন—"ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত বলিয়া ইহার বিক্রয় বিলাতেই বেশী হয়—আমেরিকায় অতি অল্প। ভারতবর্ষে Thacker Spink এর নিকট ৫।৬ খানা পাঠান হয়। ফরাসী ও জার্ম্মাণেরা আমাদের কার্য্য এবং প্রাচ্য চিত্র ও স্থাপত্য যথেষ্ট আদর করেন। প্রাচ্য শিল্পের যথার্থ সমাদর বিলাতে বেশী নয়। ইংরাজী সংস্করণের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় সমগ্র সংখ্যার সারাংশ ফরাসী ভাষায় দেওয়া হয়।"

ইঁহার গৃহে দেখিলাম—নন্দলাল বসুর "কৈকেয়ী"-চিত্র ঝুলিতেছে। টাকি বলিলেন—"কয়েক বৎসর হইল, কোক্কাতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং নন্দলাল বসুর কয়েকটা কার্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এক সংখ্যায় জন্য উড্‌রফের লিখিত Modern School of Indian Art নামক প্রবন্ধও বাহির হয়। এই দেখুন সেই সংখ্যা।"

টাকি বলিতে লাগিলেন—"ওকাকুরার প্রভাবে আজকাল যুবক জাপান নব্য ভারতীয় চিত্রকলার ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি তরুণ শিল্পিগণ অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত কলা-পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণও আরম্ভ করিয়াছেন। আমি নিজে আপনাদের নব্য শিল্প ভালবাসি—কিন্তু, মাপ করিবেন, আপনাদের চিত্রকরগণ এখনও তেজস্বিতা ও শক্তিমত্তার নিদর্শন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সকল চিত্রেই যেন একটা অত্যধিক কোমলতা ও মেয়েলি ভাব মাখান রহিয়াছে। কিন্তু রেখাপাত ও বর্ণ-সমাবেশ সর্ব্বথা প্রশংসাযোগ্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পাশ্চাত্য শিল্প আপনাদের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে?" টাকি উত্তর করিলেন,—"আমাদের দেশে শিল্পকলা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে দুই দল চলিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের দল—এবং বিদেশী অনুকরণের দল। বিদেশী অনুকরণপন্থীরা খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই—স্বদেশী ওয়ালারাই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া যাইবে।"

মধ্যযুগের জাপানী শিল্পে ওলন্দাজ বা ফরাসী শিল্পের প্রভাব সম্বন্ধে টাকি বলেন—"চিত্রকলায় সামান্য মাত্র প্রভাব পাই না। কোন কোন মূর্ত্তি-চিত্রনে রেখাবাহুল্য দেখিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব আন্দাজ করিতে পারি। কিন্তু ধাতুশিল্প, অলঙ্কার-শিল্প ইত্যাদি Minor

Arts এ ইয়োরোপীয়দিগের প্রভাব সহজেই ধরিতে পারি।"

আফিসে বসিয়া টাকি কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। কয়েকজন লোক ফটো তুলিতেছে—কয়েকজন ছবি আঁকিতেছে। কাঠ খোদাইয়ের কার্য্যে এবং রংলাগাইবার কার্য্যেও ২০।২৫ জন লোক নিযুক্ত। কোন কোন ছবি রঙাইতে প্রায় ১০০ বার স্বতন্ত্র প্রয়াস করিতে হয়। সমস্ত কাজই হাতে হইতেছে। কারিগরেরা এক প্রকার উলঙ্গ ভাবে ফরাসে বসিয়া কাজ করে। ল্যাঙ্গট-পরা আছে মাত্র—গায়ে কোন জামা নাই। কোন কোন কারিগরের মাসিক আয় ১০০।১৫০৲।

১০। রঙ্গালয়ে পাঁচ ঘণ্টা

মিকাডো-প্রাসাদের সম্মুখেই নব্য জাপানের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ রঙ্গালয় অবস্থিত। ইহার নাম Imperial Theatre. এই থিয়েটারে ইংলণ্ড ও আমেরিকার নূতনতম সাজ সরঞ্জাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মঞ্চ, গ্যালারি, চেয়ার, দারবান, দাসদাসী, টিকেট-গৃহ ইত্যাদি সবই ইয়োরামেরিকার ধরণের দেখিলাম। তবে টিকেট কিছু সস্তা—প্রথম শ্রেণীর মূল্য ৪৲ মাত্র। একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে পাঁচে ঘণ্টা করিয়া অভিনয় হয়। বিকাল পাঁচটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নাটক চলিতে থাকে। মাঝে মাঝে ১০।১৫।২০ মিনিট অবকাশ পাওয়া যায়। সেই অবকাশে পান ভোজনাদি সারিতে হয়। এই জন্য থিয়েটারের ভিতরেই জাপানী বিদেশীয় দুই ধরণের হোটেল রহিয়াছে।

থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী, নটনটী, পরিচালক ইত্যাদি সকলেই জাপানী। জাপানী ভাষায় জাপানী নাটকেরই অভিনয় হয়। গাইড্ বলিলেন—"মাঝে মাঝে ফরাসী, ইংরাজ বা আমেরিকান কোম্পানী আসিয়া গৃহ ভাড়া করিয়া লয়। তখন জাপানীরা বিদেশী থিয়েটার দেখিবার সুযোগ পায়।"

গাইড্ একখানা ইংরাজী ভাষায় লিখিত "প্রোগ্রাম" লইয়া আসিলেন। ইহাতে নাটকের সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া আছে। সুতরাং গল্প বুঝিয়া অভিনয় বুঝিবার সুযোগ ঘটিল। প্রথমে একটা তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক, পরে একটা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক অভিনীত হইল। বেশীক্ষণ আর বসিয়া থাকা গেল না। পরে আরও একটা ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয় ছিল।

আজকার অভিনয়ে অল্পবিস্তর নাচ গানও ছিল। জাপানী গান আমরা সহজেই বুঝিতে পারি—কিন্তু নিতান্ত এক ঘেয়ে বোধ হইল। যেন প্রত্যেক লাইনই ঝিঁঝিটের সুরে বাঁধা। জাপানীরা অভিনয়ের সময়ে আমাদের পরিচিত "গুলিখোরী" ভাঙ্গা গলা ব্যবহার করে ভাবিতেছি। ইহা কতটা কৃত্রিম কতটা স্বাভাবিক এবং কতটা জাপানীদের উপভোগ্য তাহা এত শীঘ্র বুঝিয়া উঠিবার যোগ্যতা হয় নাই। এইরূপ গলার আওয়াজ আহারে অনুষ্ঠিত অভিনয়েও লক্ষ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের যাত্রাদলের টানা নাকী সুরের মত কি না কে বলিতে পারে?

প্রথম নাটকের নাম "বারাঙ্গনা ও সামুরাই"। মধ্যযুগের জাপানী সমাজ এই কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখকও আধুনিক নন প্রায় ৩০.৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনও নব্য জাপানের জন্ম হয় নাই। নাটকের তিন অঙ্কে যেন তিনটা স্বতন্ত্র গল্প পাইলাম—পরস্পর-সম্বন্ধ অতি সামান্য মাত্র। কোন চরিত্রের বিকাশ অথবা জটিল সমস্যার সমাধান কাব্যের ভিতর নাই।

তবে জাপানের "কিউড্যাণ" যুগ বা নবাবী আমল সম্বন্ধে কয়েকটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেল। নটনটীদিগের সংখ্যাধিক্যে বেশ বৈচিত্র্য সৃষ্ট হইয়াছিল। ইংরাজেরা "গিস্-মেত" দেখিয়া মুসলমান সমাজ যেরূপ বুঝে, আমি "A Courtezan and a Samurai" এর গল্প পড়িয়া এবং অভিনয় দেখিয়া জাপানের শোগুণী আমল সেইরূপ বুঝিলাম। প্রথম অঙ্কে দেখা গেল জমিদার (ডাইমো) লাঠিয়ালে (সামুরাই) বেশ্যা লইয়া বিরোধ। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রধান বিষয় শোগুণীশাসনে রাস্তাঘাট, বিষয়সম্পত্তি রক্ষা, পান্থশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা। তৃতীয় অঙ্কে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস ইত্যাদি বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় নাটকের নাম "কোহারু এবং জিহেই।" ইহাও জাপানের শোগুণী আমলেরই চিত্র। নায়ক নায়িকার প্রেম এবং তাহার পরিণাম ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। মোটের উপর ইহাকে জাপানী সাহিত্যের "Romeo and Juliet" বলা চলিতে পারে। গল্পাংশ লইয়া জাপানী ও ইংরাজী কাব্যে কোন তুলনাই হয় না। দুই প্রেমিকের অবৈধ প্রণয়, এবং অবশেষে "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান" এই ভাবিয়া উভয়ের আত্মহত্যা—এই দুই লক্ষণ সেক্সপীয়ার ও জাপানী নাট্যকারের রচনায় দর্শকমাত্রই দেখিতে পাইবেন। ইংরাজী প্রোগ্রামে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে :—

Koharu and Jihei.

A Classic Love-tragedy in one Act by Chikamatsu Monzosmon.

Time : 1720. Place Osaka.

Scene : The Kwasho tea-house in the prostitute quarter of Sonesaki, Osaka.

গল্প অতি সহজ ও সরল—ইহাতে নাট-কোচিত উপকরণ কিছুই নাই। জিহেই একজন বিবাহিত যুবক। কোহারু একজন বেশ্যা—ওসাকা নগরের বেশ্যাপাড়ায় তাহার বাস। দুইজনে প্রণয় জন্মে কিন্তু বিবাহ অসম্ভব বোধেই দুইজনে আত্মহত্যার পরামর্শ করে। এই আত্মহত্যার সংকল্প লইয়াই নাটক সুরু হইয়াছে। এদিকে জিহেইয়ের ভাই ও পত্নী তাহাকে এই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গাইবার জন্য চেষ্টিত। কোন উপায় না পাইয়া জিহেইয়ের ভাই "সামুরাই" বেশে কোহারুর গৃহে প্রবেশ করিল। কোহারুকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া বেশ্যা-পাড়ার মালিককে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?" বেশ্যা-ব্যবসায়ী বলিল—"কোহারু পাগল হইয়াছে—একটা যুবকের পাল্লায় পড়িয়া প্রাণ দিবার আয়োজন করিয়াছে।"

সামুরাই বিশেষ করিয়া কোহারুকে বুঝাইল। কোহারু শেষ পর্য্যন্ত জিহেইকে ভুলিয়া যাইতে রাজী হইল। ইতিমধ্যে কোহারু জিহেইয়ের পত্নীর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছে। পত্নীর কাকুতি মিনতিতে বেশ্যার হৃদয় গলিয়া রহিয়াছিল। কাজেই আত্মহত্যা না করাই তাহার ইচ্ছা হইল।

জিহেই বেশ্যালয়ের বাহির হইতে কাণ পাতিয়া সামুরাই ও কোহারুর কথোপকথন শুনিতেছিল। রাগে অন্ধ হইয়া সে কাগজের দেওয়ালের ভিতর দিয়া ছোরা চালাইল—কিন্তু কোহারু বাঁচিয়া গেল। সামুরাই আসিয়া জিহেইকে বাঁধিয়া ফেলিল। এতক্ষণে জিহেইয়ের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কোহারুর গৃহ-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তাহার সঙ্গে

জিহেইয়ের কিছু বচসা ও মারপিট হইবার উপক্রম। সামুরাই জিহেইকে প্রতিদ্বন্দ্বীর আঘাত হইতে রক্ষা করিল। অবশেষে সে নিজের মুখোস খুলিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া জিহেই কিছু অপ্রতিভ এবং শান্ত হইল। কিন্তু কোহাকু যে তাহাকে এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল সেই দুঃখে জিহেইয়ের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অকস্মাৎ তাহার পত্নীর চিঠি জিহেই কোহাকুর গৃহে দেখিতে পাইল। তাহার দুঃখ আর থাকিল না। কিছুকাল বেশ দিনগুলি কাটিল। কিন্তু ভালবাসার স্মৃতি জিহেই ও কোহাকুর হৃদয় হইতে কোন মতেই উন্মূলিত হইল না। অবশেষে আত্মহত্যা ভিন্ন তাহাদের দুঃখ ঘুচিবার উপায় রহিল না। জাপানে আত্মহত্যা সুপ্রচলিত।

১১। জাপানের শোগুণী আমল

১৬৭০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। সেওাই প্রদেশের তাইমো এক বারাঙ্গনাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিল। বারাঙ্গনার নাম টাকাও। টাকাওকে বেশ্যা-ব্যবসায়ীর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাইমোকে টাকাওর সমান ওজনে স্বর্ণমুদ্রা বায় করিতে হইয়াছিল। টোকিওর বেশ্যা পাড়ার নাম জাপানী ভাষায় যোশীবাড়া। ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান।

যোশীবাড়া সম্বন্ধে I. E. De Beeker একখানা সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নাম "The Nightless City or the History of the Yoshiwara Tukwaku" ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন,—"I have compiled this book with the object of providing foreign students of Sociology, medical men and philanthropists, with some reliable *data* regarding the practical working of the system in the leading prostitute quarter of the Japanese Metropolis, and I leave my readers to form their own opinions as to the pros and cons of the successor otherwise achieved by the plan of strict segregaton adopted in this country."

ইয়োরামেরিকার অনেক দেশে স্বতন্ত্র বেশ্যাপাড়া নাই—বেশ্যা বলিয়া সমাজের কোন শ্রেণীও দেখা যায় না। তাহা বলিয়া সেই সকল দেশকে বেশ্যাহীন বা পুণ্যাত্মাগণের দেশ বলা উচিত নয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

To Japanese who may think that the Yoshiwara is a disgrace to Japan I would remark that this Empire has by no means a monopoly of vice; and to foreigners who declaim against the "immorality of Japanese" I would say frankly—"Read the History of Prostitution by Dr. W. W. Sanger of New York, also the *Maiden Tribute of Modern Babylon* which appeared in the Pall Mall Gazette fourteen years ago. You cannot criticise this country too closely, for you certainly dare not lay the flattering unction to your souls that you, as a race, have any monopoly of vice.

বারাঙ্গনা ও সামুরাই নাটকের ইংরাজী প্রোগ্রাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

An Historical Drama in three Acts plotted by Takenoya and adopted by Torahiko Migita.

Time 1673. Place Yedo and Shimotsake Province.

Act I. The pleasure-boat, Takamaru, on the Sumida river

Act II. Lord Date's procession on the Wohu highway

Act III. Scene 1. The Dwelling of Chosuke the father of Takao at Shiobara, Shimotsake province.

Scene 2. The Hokigawa river near the house of Chosuke.

টোকিও নগর সুমিদা নদীর উপর অবস্থিত। টোকুগাওয়া শোগুণদিগের আমলে টোকিওর নাম ছিল ইয়েডো। সুমিদার উপর একখানা সুবৃহৎ বিলাস-বজরা ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে—এই দৃশ্য প্রথমেই দেখিলাম। বেশ্যালয় হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত টাকাও বজরার দাঁড়াইয়া দূর হইতে আগত বংশীধ্বনি শুনিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটা ছোট নৌকা বাহিয়া তাহার পূর্ব্ব-বন্ধু সামুরাই বজরার নিকট উপস্থিত হইল। পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—টাকাও সামুরাইয়ের নৌকায় একখানা পত্র নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"যদি এই পত্রে লিখিত প্রস্তাবে, তোমার সম্মতি থাকে তাহা হইলে তোমার বাঁশী বাজাইয়া উত্তর দিবে।"

সামুরাই চলিয়া যাইতেছে এমন সময়ে সদলবল ডাইমো বজরা হইতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল—"খবরদার, তুমি টাকাওয়ের নিকট আর আসিও না। এখন সে আর বাজারের বেশ্যা নয়।" সামুরাই বলিল—"টাকাওকে জিজ্ঞাসা করুন, মহাশয়। দেখিবেন সে আপনার নহে—তাহার হৃদয়ে একমাত্র আমার আসন।" ডাইমো তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল—সামুরাইয়ের উপর ছোরা চালাইল। সামুরাই ছোরা সাম্‌লাইয়া বিদ্রূপ-হাস্য হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। খানিক পরে তাহার বাঁশী হইতে করুণ ধ্বনি উড়িয়া আসিল। টাকাও বুঝিল সামুরাই তাহার প্রস্তাবে সম্মত আছে।

টাকাও এক্ষণে ডাইমোকে বলিল—"মহাশয়, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আমাকে বিদায় দিন।" ডাইমো বলিলেন—"তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? এত অর্থ-ব্যয়ে তোমাকে মুক্ত করিয়াছি কি বনে ছাড়িয়া দিবার জন্য?" টাকাও আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিল। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। ডাইমো নিতান্ত বিরক্ত হইয়া টাকাওকে হত্যা করিল। মধ্যযুগের জমিদারগণের পক্ষে নরহত্যা করা অতি সাধারণ কথা।

দ্বিতীয় অঙ্কে ডাইমো ইয়েডো হইতে স্বকীয় জমিদারীতে গমন করিতেছেন। পথের দৃশ্য যেখান হইয়াছে। সেই যুগে গমনাগমন বিশেষ নিরাপদ ছিল না। চোর ডাকাইতের উপদ্রব প্রায়ই দেখা যাইত। যে পথে ডাইমো দলবলসহ যাত্রা করিয়াছেন সেই পথে সামুরাই ছদ্মবেশে বসিয়া আছে। তাহার প্রণয়িনীকে হত্যা করার প্রতিশোধ না লইয়া সে মরিবে না—ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। সামুরাইয়ের হাতে একটা বন্দুক। তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্য ডাইমোর লোকজন চারিদিকে ছুটিল।

রাস্তায় এক দাগী ডাকাইত একজন বৃদ্ধের সঙ্গে বচসা করিতে করিতে উপস্থিত। বৃদ্ধের সঙ্গে দুই কন্যা। বৃদ্ধ বলিতেছে—

"কাল রাত্রে আমি সরাইয়ে বাস করিবার সময়ে কিছু টাকা হারাইয়াছি। সে টাকা নিশ্চয়ই তুমি চুরি করিয়াছ।" ডাকাইত ধরা পড়িবার উপক্রম দেখিয়া টাকার থলেটা বৃদ্ধের অগোচরে একটা কোপের ভিতর ফেলিয়া দিল। বৃদ্ধের উপর ডাকাইত জুলুম করিতেছে এমন সময়ে ডাইমোর একজন অনুচর থলেটা বৃদ্ধকে ফিরাইয়া দিল। সে কোপ হইতে এটা তুলিয়া আনিয়াছিল। বৃদ্ধ প্রস্থান করিল।

ডাইমোর অনুচর দাগী ডাকাইতকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইল। ডাকাইতের ভ্রূক্ষেপ নাই—সে ইচ্ছা করিয়া অনুচরের ছোরার নিকট মাথা লইয়া গেল। তাহার সাহস দেখিয়া অনুচর প্রীত হইল এবং তাহাকে খুন না করিয়া কাজে নিযুক্ত করিল। অনুচরকে বলা হইল—"পুরোহিতবেশে একব্যক্তি ঐ সরাইয়ে বাস করিতেছে। তোমাকে ঐখানে থাকিয়া তাহার গাঁইয়ি অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার ভিতর বোধ হয় একটা বন্দুক আছে। সেটা যদি আমাকে আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে তোমার ইচ্ছানুরূপ বকশিষ পাইবে।" এইরূপ কথা-বার্ত্তার পর দুই জনে প্রস্থান করিল।

সামুরাই দেখিল রাস্তায় এখন কেহ নাই। অদূরে ডাইমোর লাঠিয়াল বরকন্দাজ, কুলী সহিস ও সেবকগণ আসিতেছে। কাহারও বাঁকে প্যাটরা, কাহারও ঘাড়ে বন্দুক—কেহ বা খাদ্যদ্রব্য বহন করিতেছে—কেহবা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। স্বয়ং ডাইমো পাল্কীর ভিতর বসিয়া আছেন। সামুরাই বন্দুকের গুলি ডাইমোর দিকে চালাইল। হঠাৎ এই আক্রমণে জমিদারের লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। পরে তাহারা সামুরাইকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে জাপানী লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, জিউজিৎসু ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। সামুরাই তাহার ভক্ত সেবককে সঙ্গে আনিয়াছিল। দুই জনেই লাঠি ছোরায় ওস্তাদ—কাজেই ডাইমোর বহুসংখ্যক অনুচরকে অতি সহজেই ধরাশায়ী করিল। রঙ্গমঞ্চের উপর বাহুযুদ্ধের এই দৃশ্য বেশ দেখাইল।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে টাকাওর পিতা তাহার পত্নীর সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতেছে। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কয়েকজন বন্ধু নিমন্ত্রিত। জাপানী পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা দেখা গেল। বৃদ্ধের গৃহে অতিথিগণের আহারাদি সমাপ্ত হইল। কথায় কথায় টাকাওয়ের কথা উঠিল। বৃদ্ধ বলিল—আমার দারিদ্র্যবশতঃ টাকাওকে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই সময়ে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। ভাবিয়াছিলাম সে একজন ধনবান্ ব্যবসায়ী। এই ভাবিয়া তাহার নিকট টাকাওকে গুস্তক প্রদান করি। পরে জানিতে পারি এই ব্যক্তি এক নরাধম দাগী বদমায়েস। সে টাকাওকে স্বগৃহে প্রতিপালন না করিয়া ঘোশীবাড়ায় বেশ্যালয়ে রাখিয়াছে। কি করিব আমার দুরদৃষ্ট। আমার পাপেই আমি আমার সোনার কন্যাকে জাহান্নামে পাঠাইয়াছি। তাহার কষ্টের জন্য আমিই দায়ী। আমি জীবনে এত পশুহত্যা করিয়াছি যে নরকেও আমার স্থান হইবে না। এই পাপেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এখন হইতে আমি বৌদ্ধধর্ম্মের সকল নিয়ম যথারীতি পালন করিব স্থির করিয়াছি। এই লও আমার বন্দুক আর জীবহত্যা আমার দ্বারা হইবে না।" অতিথিগণ বিদায় হইল।

খানিক পরে সেই ঘাগীকে পাকড়াও করিয়া বৃদ্ধের বন্ধুগণ ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ বলিল—"নরাধম, তুই আমার কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস। মৃত্যুই তোর একমাত্র শাস্তি।" পরক্ষণেই বৃদ্ধ ভাবিল—"অহিংসা পরমো-ধর্ম্মঃ। আমি খাঁটি বৌদ্ধ হইতে চলিয়াছি। সুতরাং নরহত্যার কারণ হইব কি করিয়া?" কাজেই বদমায়েসকে খুন করা হইল না।

সকলে চলিয়া গেলে বৃদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরে পত্নীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহার কন্যা যেন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রক্তমাংসের টাকাও যেন তাহাকে বলিতেছে—"আমি যোশীবাড়া হইতে মুক্তি পাইয়াই তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি।" মাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া টাকাও যেন শোকে অভিভূত হইল এবং মন্দিরে প্রার্থনা করিবার জন্য প্রবেশ করিল।

এই সময়ে পুরোহিতবেশধারী সামুরাই আসিয়া বৃদ্ধকে বলিল—"তোমার কন্যা আমার প্রণয়িনী ছিল। কিন্তু আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। আমার প্রভু ডাইমো তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছে। সেই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আমি এই ছদ্মবেশে ঘুরিতেছি।" বৃদ্ধ বলিল—"সে কিহে বাপু? টাকাও যে জীবিত—সে এই মাত্র আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। ঐ ঘরেই এখনও সে আছে।" বৃদ্ধ মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেখে—টাকাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

এইবার সামুরাই তাহার বাঁশী বাজাইতে লাগিল। ধ্বনি শুনিবামাত্র টাকাও আবার মূর্ত্তি গ্রহণ করিল। সামুরাইকে ধন্যবাদ দিল এবং জানাইল—"আমি এক্ষণে নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি।" এই বলিয়া টাকাও অগ্নিরূপে অদৃশ্য হইল। সামুরাই কিছুক্ষণ অচেতন ভাবে পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধ আসিয়া সামুরাইকে জাগাইল। এই সময়ে ডাইমোর অনুচরেরা সামুরাইকে পাকড়াও করিতে বৃদ্ধের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। উভয়ে সন্নিকটস্থ পর্ব্বতে পলায়ন করিল

হোকিগাওয়া নদীর ধারে ডাইমোর লোকজন সমবেত। ঘাগী ডাকাইতটা বৃদ্ধকে ধরিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—সামুরাইয়ের সন্ধান বলিয়া দিতেই হইবে। বৃদ্ধ কোন জবাব দিল না। ঘাগী তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত এমন সময়ে সামুরাই আসিয়া নরাধমকে ভূমিসাৎ করিল। কিন্তু ডাইমোর অনুচরবর্গ সামুরাইকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। ডাইমো বলিলেন—"উহাকে মারিয়া ফেলিও না। যদি পুরোহিতভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে উহাকে মুক্তি দিব।" সামুরাই বলিল—"আমার পক্ষে সেরূপ জীবন দুর্ব্বহ।" এই বলিয়া সে হারাকিরি করিল।

১২। য়ামাতোস্থানের স্বর্গ—হিন্দুস্থান

হোটেলের নিকটেই একটা আফিসে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হইল। কার্য্যালয়ের নিম্নতলায় সাইনবোর্ডে লেখা আছে South America Colonisation Company. ভাবিলাম প্যানামা খাল কাটার সুফল ভোগ করিবার জন্য জাপানীদের এই প্রতিষ্ঠান। ইতিপূর্ব্বেই জাপানীরা দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন। এক্ষণে ইহাদের উদ্যম বাড়িয়া যাইবারই কথা। অনুসন্ধানে বুঝিলাম—"ব্রেজিলের সঙ্গে সখ্য ঘনিষ্ঠভাবে মাতাইবার জন্য এই আয়োজন হইয়াছে।" পূর্ব্বে জাপান হইতে ব্রেজিল যাইতে হইলে

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। প্যানামা খালের প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের দিক হইতে অতি সহজেই জাপানীরা আটলান্টিক কূলের দেশসমূহে পৌঁছিতে পারিবে। কাজেই জাপানের ব্যবসায়ীরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর বহির্ব্বাণিজ্য এক প্রকার স্থগিত—ইংরাজও নূতন দিকে নজর দিতে অসমর্থ। এই সুযোগে জাপান চারিদিকে হাত পা বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ইহারই নাম একদম সর্ব্বনাশঃ অন্তস্তু পৌষ মাসঃ। আসিয়া অবধি ভারতবর্ষের প্রতি জাপানের সস্নেহ ভাব বেশ লক্ষ্য করিতেছি, দুই বৎসর পূর্ব্বে এতটা ছিল না। ব্যবসায়ের স্বার্থে জাপানের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুলক্ষণ বটে।

এই কার্য্যালয়ে একজন পত্রিকাসম্পাদকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন—দুই তিন খানা মাসিক পত্রের পরিচালনা ইঁহার হাতে রহিয়াছে। গত বৎসর একখানা কাগজ বাহির করিয়াছেন। তাহার নাম Twentieth Century. জাপানী ভাষায় ইহার প্রবন্ধাবলী লিখিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ ; গ্রাহক সংখ্যা ১৫০০। সম্পাদক বলিলেন—"মাত্র এক বৎসর চলিতেছে—এইজন্য গ্রাহকসংখ্যা এত অল্প।" ইঁহার নাম সাকুরাই—ইনি ইয়োরোপও দেখিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয় একজন ধর্ম্মপ্রচারকের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। দুইজনেই ইংরাজীতে কথা বলিতে পারেন। ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয় বহুকাল টোকিওর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছেন। অধ্যাপকের নাম কিছা কিজে হিরাই। হিরাই দোতলার ঘরে ছিলেন। উপরে উঠিবার পূর্ব্বে বাহিরের ঘরে বুট খুলিয়া প্রবেশ করিতে হইল। জুতা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করা জাপানীদের দস্তুর। ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর আর কখনও জুতা খুলিতে হয় নাই। জাপানীরা সাধারণতঃ কাঠের খড়ম অথবা খড়ো চটি ব্যবহার করে—চামড়ার জুতা জাপানের স্বদেশী জিনিষ নয়। ইয়োরামেরিকান প্রভাবে বিদেশীয় ছাতা, বিদেশীয় টুপি এবং বিদেশীয় জুতা ব্যবহৃত হইতেছে—এখনও জনসাধারণ এবং রাস্তার ঘাটে যত লোক দেখি তাহার অধিকাংশই প্রাচীন রেওয়াজই চালাইতেছে।

আমরা ভারতবর্ষকে "আর্য্যভূমি" বলিয়া থাকি—ভারতবাসীকে আর্য্য-সন্তান বলিয়া জানি। ভারতীয় চরিত্র বর্ণনা করিতে হইলে অনেক সময়ে আর্য্য-বীর্য্য, আর্য্য-শক্তি, আর্য্য-ধর্ম্ম ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করি। ইংরাজেরা সেইরূপ নিজেদের দেশকে য়্যাল্‌বিয়ন (Albion) বলিয়া বর্ণনা করে। আইরিশ জাতি তাহাদের জন্মভূমিকে Erin (এরিন্) নামে ডাকিয়া থাকে। জার্ম্মাণেরা তাহাদের Vaterland বা পিতৃভূমিকে Deutsch land "ডয়শল্যাণ্ড" নামে প্রচারিত করে। সেইরূপ জাপান সম্বন্ধে খাঁটি জাপানী নাম Yamato (য়ামাতো)। জাপানীরা তাহাদের সভ্যতার বিশেষত্ব সংক্ষেপে জানাইতে হইলে Yamato Spirit অর্থাৎ আমাতো শক্তি, য়ামাতো বীর্য্য, য়ামাতো ধর্ম্ম বা য়ামাতোর 'ধাত' ইত্যাদি শব্দের পারিভাষিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে। আমরা যেমন বলি—"যতক্ষণ আমার শরীরে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত ততক্ষণ আমার ধারা……"সেইরূপ জাপানীরা বলে—"আমাদের য়ামাতো-ধাতের সঙ্গে চীনা সভ্যতা,

ভারতীয় সভ্যতা এবং আজকাল ইয়োরো-মেরিকার সভ্যতা মিলাইয়া লইয়াছি। য়ামাতো-রক্ত সর্ব্বদা নূতন নূতন শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া পুষ্ট হইতেছে। এই জন্য জাপান চিরকাল উন্নতিশীল।"

অধ্যাপক হিরাই বলিলেন—"মহাশয়, কিছুকাল হইল আমি একখানে সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান দেখিতেছিলাম। হঠাৎ যমকোটি শব্দ চোখে পড়িল। অভিধানে যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় লঙ্কা দ্বীপের যতটা পশ্চিমে ও উত্তরে জাপান অবস্থিত যমকোটি শব্দে হিন্দুরা সেই দেশ বুঝিত। জাপানী য়ামাতো যমকোটি শব্দের অপভ্রংশ কিনা কে বলিতে পারে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভারতীয় ভাষা হইতে জাপানী শব্দের আমদানি হইয়াছে এরূপ বুঝিবার কোন কারণ আছে কি?" হিরাই উত্তর করিলেন—"কেবল ভাষা কেন, আমাদের জাতিও ভারতীয় জনগণেরই আত্মীয় এবং বংশসম্ভূত আমি এইরূপই বিশ্বাস করি। এতদিন পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে জাপানীরা মঙ্গোলিয় বা পীত জাতি। চীন ও কোরিয়ার জনগণকে এবং জাপানী নরনারীকে এক গোত্রভুক্ত করা ভাষাতত্ত্ববিৎ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রয়াস ছিল। জাপানের অধ্যাপক মহাশয়গণও জাপানী জাতিকে Mongolian বা Yellow race বলিয়া জানেন। আমি এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।" আমি বলিলাম—"আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিতেছেন—জাপানীরা মঙ্গোলিয় জাতিসম্ভূত নয়। তাহারা এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে অধিবাসী জনগণেরই আত্মীয়। চীনাদের সঙ্গে জাপানীদের রক্তগত অথবা ভাষাগত সম্বন্ধ কিছুই নাই। দুই সমাজকে এক পীতাঙ্গ জাতির দুই শাখা বিবেচনা করা চলে না।"

হিরাই বলিলেন—"আমিও চীনাদিগকে জাপানীর গোত্রভুক্ত করিতে পারি না প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতীয় জনগণের সঙ্গেই আমাদের আত্মীয়তা ছিল এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আমরা কোরিয়া হইতে আমদানি করি। তাহার পর হইতে কোরিয়া ও চীনের পীতাঙ্গ জাতির সঙ্গে আমাদের লেন-দেন বাড়িয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই য়ামাতো দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল? এ কথা সকলেরই জানা আছে যে জাপানের আদিম নিবাসিগণের নাম Aino (আইনো)। তাহাদের বংশধরেরা এক্ষণে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বোত্তর দ্বীপে বাস করিতেছে। এই আইনোদিগের জন্মস্থানে জাপানী ঔপনিবেশিকেরা বিদেশ হইতে আগমন করে। তাহার পর এই দেশের নাম হয় য়ামাতো। আর্য্যগণের আগমনের পর যেমন ভারতবর্ষের নাম আর্য্যস্থান, আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যভূমি, সেইরূপ বিদেশীয় আগমনের পর এই উদীয়মান সূর্য্যের দেশ য়ামাতোস্থান নামে পরিচিত হইল। কিন্তু এই বিদেশীয়েরা আসিল কোথা হইতে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বলিতে চাহেন যে ভারতবর্ষ য়ামাতোস্থানদিগের পিতৃভূমি? আপনাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে জাপানীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিত কি? কোরিয়া এবং চীনের সাহায্য পাইবার পূর্ব্বে জাপানীরা হিন্দুস্থানের পরিচয় পাইয়াছিল তাহার প্রমাণ কৈ?" হিরাই বলিলেন—"প্রথমেই আমি ধর্ম্মের প্রমাণ দিব। জাপা-

নীরা ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোরিয়ার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম আমদানি করে। তাহার পূর্ব্বে জাপানী সমাজে কি ধর্ম্মভাব আদৌ ছিল না? নিতান্ত অসভ্য ও বর্ব্বর সমাজে অল্পকালের ভিতর বৌদ্ধধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প স্থায়ী হইয়া গেল কি করিয়া? আমি বলিব—বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমান অথবা অনুকূল ধর্ম্ম য়ামাতো দেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বিরাজ করিতেছিল। য়ামাতোধাতে কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম্ম নূতন বোধ হয় নাই—বরং য়ামাতোবাসিগণ এই উদার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য অর্দ্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই অর্দ্ধ প্রস্তুত থাকিবার যুগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা এখনও বেশী হয় নাই। যখন হইবে তখন দেখা যাইবে যে সেই যুগের য়ামাতোস্থানে এবং হিন্দুস্থানে অতিশয় গভীর ও নিকট সম্বন্ধ ছিল। সেই যুগের হিন্দু-জাপানী সংমিশ্রণে চীনের সাহায্য আবশ্যক হয় নাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে হিরাই amanopara (আমানোপারা) শব্দের উল্লেখ করিলেন। এই শব্দ সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের জাপানী লোক-সাহিত্যে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ স্বর্গভূমি। য়ামাতোবাসিগণ তাহাদের পিতৃস্থান সম্বন্ধে এই আখ্যা প্রয়োগ করিত। য়ামাতোর প্রাচীনতম লোক-সাহিত্যে বহু ভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ পাই। প্রাচীন জাপান এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য তুলনা করা এইজন্য বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু এইদিকে কোন পণ্ডিতেরই দৃষ্টি পড়ে নাই। সকলেই চীন-জাপানের আদান প্রদান বুঝিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু চীনাযুগের পূর্ব্বে য়ামাতোস্থানের একটা ভারতীয় যুগ আছে এ কথা কাহারও মনে আসে নাই। হিরাইয়ের নিকট এই তথ্য প্রথম জানা গেল। ভারতীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোরিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিল্প আমদানির পূর্ব্বে আমাতোবাসিগণ অনেকটা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল—আপনার এই মত সমর্থন করা সম্ভব কি?" হিরাই বলিলেন—"উপনিষদের গূঢ় অধ্যাত্মবাদ ও Esoteric Religion এবং Mysticism য়ামাতোস্থানে পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এইরূপ ছিল বলিয়াই জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম সহজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। Eninokini (এনিনোকিনি) নামক একব্যক্তি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে আমাদের সমাজে অর্দ্ধ-বৌদ্ধ অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া যান। এইরূপ অধ্যাত্মবাদিগণের সংখ্যা একাধিক।"

ভাষার প্রমাণ সম্বন্ধে হিরাই বলিলেন—"এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি। জাপানী ভাষা গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত এবং পার্শী ভাষাসমূহের ন্যায় আর্য্য-ভাষা। ইহা কোন মতেই মঙ্গোলিয় শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। বাক্যে পদ সন্নিবেশের রীতি, বিভক্তি, ব্যাকরণ, শব্দসম্পদ ইত্যাদি সকল বিষয়েই জাপানীরা আর্য্যভাষাভাষী। আমরা চীনালিপি আমদানি করিয়াছি বলিয়া আমাদিগকে চীনাভাষাভাষিগণের পর্য্যায়ভুক্ত করা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিমূলক। ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণ যে সকল প্রমাণের সাহায্যে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে পারিবারিক ঐক্য স্থাপন করিয়াছেন আমি সেই সকল প্রমাণের সাহায্যেই জাপানী ভাষাকে আর্য্য বা ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারি। আমি বহু-

সংখ্যক জাপানী শব্দের সংগ্রহ করিয়াছি। এই গুলির সঙ্গে Indo-Aryan বা Indo-European বা Aryan অন্তর্গত অন্যান্য ভাষার শব্দের তুলনা সাধনও করিয়াছি। এই সকলগুলির উৎপত্তি যে এক এই বিষয়েও আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু Philologistগণ এত শীঘ্র তাঁহাদের সংস্কার বর্জ্জন করিয়া আমার নূতন মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। বলা বাহুল্য জাপানী ভাষাবিজ্ঞানবিদ্‌গণ সকল বিষয়েই এখনও ইয়োরামেরিকানদিগের অনুচর মাত্র। তাঁহারা আমার এই স্বাধীন মত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতেও প্রস্তুত নন।"

হিরাই একখানা পুস্তিকার * ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"It has generally been accepted almost as a truism that the Japanese language belongs to the Ural-Altaig or Turanian family. * * * In the face of this deep rooted opinion even a suggestion that our tongue is affiliated to the Indo-European branch would excite laughter. * * *

I wrote a brief treatise comparing the Japanese and Indo-European grammars, which, I think, must convince a careful reader of an undoubted family connexion between the two languages. * * * But as it was written in Japanese and cannot be widely read, I am now re-writing it in English at somewhat greater length than the original, in which I have compared our grammar mostly with the Bengali and Assami pointing out a great similarity between them. Having studied the Persian grammar since then, I have found it still more like our grammar. I have also examined the Nepali grammar. It is akin to the Bengali and Assami, as all other Indo-Aryan dialects, Marathi, Hindusthani etc. bear close resemblance to them. All of them will be fully compared with our grammar in my treatise in English. Even the Greek and Sanskrit grammars should be consulted, as, to take a single example, the enclitic particles in them are nothing more nor less than our particles, known under the name of *Tenivoha*, and considered by most of us the only peculiarity of the Japanese language."

কয়েকটা জাপানী শব্দের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

Akir—clear luminous, obvious.

Greek, aigle (glitter, splendour, lustre, brightness), hence glad, aglaos, hence English glow. Latin acclaro (to make clear, to reveal); hence Eng. clear. Sanskrit and Hindusthani agurh (evident, easy of comprehension).

Ame—heaven, sky. Sanskrit Amar (immortal), amit (undying). Persian and Hindusthani Asman (sky, heaven). Pali Amata (immortal).

Aka—water, Sanskrit ap, Persian ab (water), Gothic ahwa (river), Old High German aha, Anglo-Saxon Ea, Lat. aqua (water).

* A Vocabulary of the Japanese and Aryan languages hypothetically compared.

Haruka—far, distant, remote. Sanskrit pāra (far, distant) Zend pāra, Greek pera, Lat. peren-die, Gothic fairra, German feru, English far.

Hiko—an echo, GK. eko, Lat. and English echo.

Musi—Insects, worms, bugs, Eng. Moth, Dutch mot, German motte.

Mugi—Barley, wheat, Swedesh muga (heap, esp of hay).

Kami—hair of thehead, Sanskrit ka (head), GK. Kome (hair) coma (foliage), Kometes (comet) English comet (lit. long haired).

কতিপয় শব্দের উচ্চারণ গত সাদৃশ্য দেখা-ইতে পারিলেই বিভিন্ন ভাষার ঐক্য স্থাপিত হয় না। ব্যাকরণের ঐক্য প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। এই জন্য চিরাই বলিতেছেন :—

"I am not sanguine enough that my hypothesis will be taken into serious consideration until detailed grammatical evidence should be presented to the public. For the present I shall rest satisfied with this statement, that supposing the identification of our words with the Indo-European a mere chimerical fancy it will at least furnish aid in no small degree to linguists interested in the study of either the Japanese or the Indian or the European languages, as suggestions and helps to the memory of foreign words by Association."

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

কর্ম্ম-ভূমি

(গান)

শান্তি-হারাণায় ঘুম পাড়িয়ে রেখো না মা, দিনের বেলায়।
বিশ্ব-ভরা লোকের সাথে মানুষ আমি ধূলা-খেলায়।

তোমার-ই যে হাতের গড়া,
খাটি তাই এ মাটির ধরা ;
আমাদের-ও স্নেহ-প্রীতি রচেছ ত মাটির ভেলায়।

সারাটা দিন ঘরে' খাটাও,
যেথা হ'ক ছুটিয়ে পাঠাও,
ক্লান্তি এলেও আমায় হাটাও বিশ্ব-বাসের লোকের মেলায়।

স্বর্গটি ত স্বার্থে রচা ;
সে কূপে যে পঙ্ক পচা !
নর-সেবার কর্ম্ম-ভূমি কেমন করে' ঠেল্‌ব হেলায় ?

শান্তি আনে সুখের সাজা ;
শক্তি-হানে বজ্র তাজা !
ঝড় তুফানে দিব পাড়ি অকূল সাগর, ক্ষুদ্র ভেলায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কার্য্য-কারণ তত্ত্ব

জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলেই, কিছু বুঝিতে গেলেই,—কোন বিষয় সম্বন্ধীয় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে গেলেই, যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। এই যুক্তিপ্রণালী স্থূল বা লৌকিক এবং সূক্ষ্ম বা অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। স্থূল যুক্তিতর্কের অবতারণা স্থূলদর্শী বৈষয়িক ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিই স্থূলদর্শী। তাহারা যেন বিষয়টাকেই বিশেষভাবে জানে, বিষয়ীর সম্বন্ধে যেন তাহাদের ঔদাসিন্যই অধিক, এই প্রকার মনে হয়। এমন কি বিষয়-জগৎকেই যেন তাহারা সত্য স্বতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, আর জগৎটাকে তাহার একটা গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল বলিয়া মানিয়া লয়। যাহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রণালী বলা যায়, তাহা ব্যবস্থিত ও মার্জ্জিত স্থূলবুদ্ধিসম্ভূত যুক্তিপ্রণালী ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেবল বিশুদ্ধ দার্শনিক প্রণালী আত্মবোধমূলক সূক্ষ্ম বিচার। তাঁহারা বিষয়জগৎ অপেক্ষা জ্ঞানজগতেরই অধিক আলোচনা করেন, আত্মপ্রত্যয়ের উপরই নিতান্ত নির্ভর করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের বিচার প্রণালী অধিকতর জ্ঞান সম্পর্কিত। অতএব বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় যুক্তিই প্রযুক্ত হইবে। প্রতিপক্ষ যে প্রণালীর যুক্তি প্রদর্শন করিবেন, তাহার সমর্থন বা খণ্ডনও যথা সম্ভব সেই প্রকার প্রণালী অবলম্বনে করিতে হইবে।

বিষয়জগৎ সম্বন্ধে কোন তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই আমরা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করি। তাই কার্য্য কারণ সম্বন্ধে আপাততঃ দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। কার্য্য কাহাকে বলে?

ইহার উত্তরে কেহ বলেন, "যৎ সাবয়বং তৎকার্য্যং"। অর্থাৎ যাহা অবয়বারব্ধ—যাহা অনেক দ্রব্য সংযোগে উৎপন্ন তাহাই কার্য্য। কিন্তু এপ্রকার লক্ষণ সর্ব্বস্থলে ঠিকমত খাটে না। তাই কেহ কেহ বলেন, "প্রাগভাব প্রতিযোগিত্বং কার্য্যত্বং।" অর্থাৎ যাহা ছিল না হইল,—ঈদৃশ বুদ্ধির বিষয় তাহাই কার্য্য। যথা ঘট পট প্রভৃতি।

Mill প্রমুখ দার্শনিকেরাও কার্য্যের ঈদৃশ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কার্য্য, ঘটনা, পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সমপর্য্যায় শব্দ। Mill বলেন, "The matter composing the universe, whatever philosophical theory we hold concerning it, we know by experience to be constant in quantity; never beginning or ending, only changing its forms. But its forms have a beginning and ending and it is its forms, or rather its changes of form—the end of one form and beginning of another—which alone we seek a cause for, and believe to have a cause. It is *events*, that is to say, *changes*, not substances, that are subject to the law of causation."

বৈজ্ঞানিকেরাও বোধ হয় কার্য্যের এই প্রকার লক্ষণই স্বীকার করিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যাহা **বিকার, পরিবর্ত্তন** বা **ঘটনা** তাহাই কার্য্য।

একণে দেখা যাউক কারণ কাহাকে বলে? কারণের স্বরূপ সম্বন্ধে বহুল মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সত্যতা এবং দৃঢ়তা বিষয়েও সকলে একমতী নহেন। কারণ কাহাকে বলে? তাহার উত্তরে ন্যায়-বিদেরা বলেন, "অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং।" ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠকেরা এই লক্ষণের সহিত John Stuart Millএর লক্ষণের অবিকল সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। Millএর মতে যাহা invariable and unconditional antecedent তাহাই কারণ। কিন্তু আবার অনেক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, নিমিত্ত সামগ্রী—যদ্ব্যতীত কার্য্য উৎপন্ন হয় না—তাহাই কারণ। নিমিত্ত সামগ্রীর অর্থ,—"Sum-total of all the conditions." অতএব দেখা যাইতেছে Millও কেবল কালিক পূর্ব্ববর্ত্তিতাকেই কারণ বলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার "unconditional" শব্দ প্রয়োগই তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা যে কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, তাহা হইলে অনেক পূর্ব্ববর্ত্তিতাকে কারণ বলা যাইতে পারিত যাহা প্রকৃত পক্ষে কারণ নহে। বিদ্যুতের পরে বজ্রধ্বনি, দিনের পর রাত্রি, স্রোতের পর স্রোত, ক্ষণের পর ক্ষণ—ইত্যাদি স্থলে অব্যবহিত নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা বর্ত্তমান, কিন্তু ইহারা সকলেই পরতন্ত্র ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী, নিরপেক্ষ ভাবে নহে। অন্য কারণকে অপেক্ষা করিয়াই ইহাদের উপপত্তি। সেই জন্য ইহারা ক্রমান্বয়ে একটি অপরটির কারণ হইতে পারিতেছে না।

আর একটি কথা বিবেচ্য। নিমিত্ত সামগ্রী (sum-total of all the conditions) এবং নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা এ দুইটি জিনিষ কি একার্থবোধক? কখনই নহে। একটির মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যের গন্ধ মাত্র নাই; অপরটিতে পৌর্ব্বাপৌর্য্যই সর্ব্বস্ব। অতএব Mill এই উভয় লক্ষণ স্বীকার করিয়া তাঁহার কারণতাকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন বলিতে হইবে।

একণে কারণের পূর্ব্ববর্ত্তিতা সম্বন্ধে একটু চিন্তা করা যাউক। পূর্ব্ববর্ত্তিতার অর্থ যে ক্ষণে কার্য্যের আরম্ভ তাহার পূর্ব্বক্ষণে বিদ্যমানতা। ইহাদ্বারা কি ইহাই সূচিত নহে যে, যেক্ষণে কার্য্য আরব্ধ, সেক্ষণে কারণের অভাব; এবং যে ক্ষণে কারণের বিদ্যমানতা, সে ক্ষণে কার্য্যের অভাব? কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা নির্যুক্তিক। যদি কারণ স্বক্ষণে কার্য্যের উৎপাদন করিতে না পারে, তবে পরক্ষণেই বা কি প্রকারে পারিবে, ইহা বুঝা যাইতেছে না। হইতে পারে এক ক্ষণাবচ্ছেদে কারণ সামগ্রীর সম্মিলন ঘটে না; কিন্তু তাহাতে কি হইল? ধরিয়া লওয়া যাউক যে কারণ সামগ্রীর সম্মিলন ঘটিতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল আবশ্যক হয়। কিন্তু কথা হইতেছে, যে কালে কারণসামগ্রীর মিলন ঘটে, সেই কালেই কার্য্যোৎপন্ন না হয় কেন? অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের ভিতরে কালের ব্যবধান থাকিবে কেন? সমগ্র কারণ বিদ্যমান সত্ত্বেও যদি তৎক্ষণাৎ কার্য্যোৎপত্তি না ঘটে, তবে কস্মিন কালেও কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারিবে না। কেন না, কারণ সামগ্রী কার্য্য জননে অশক্ত, ইহাই সূচিত হইতেছে।

অন্যদিক দিয়াও আর এক প্রকার আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। জগতে ঘটনাপ্রবাহ অনাদি। অনাদি প্রবাহের প্রত্যেক ব্যক্তিই অপরের অপেক্ষা রাখে। অতএব অনবচ্ছিন্ন ঘটনা পরম্পরার মধ্য হইতে কতকগুলিকে নির্ব্বাচন করিয়া অপরগুলিকে পরিত্যাগ করা যায় না। কারণসামগ্রী সুতরাং অনাদি ঘটনা পরম্পরাকেই বলিতে হয়। তাহা হইলে কার্য্য কারণের সীমাবধারণ অসাধ্য হইয়া পড়ে। অথচ ব্যবহার বিষয়ে আমরা কার্য্য কারণের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি; কিন্তু এ প্রকার ব্যবহারের মূলে কোন যুক্তি আছে কি না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কেন না যুক্তি এ ব্যবহারকে সমর্থিত করে না। এ সম্বন্ধে মহাত্মা ব্রাডলীর কোন গ্রন্থ হইতে দুই এক পংক্তি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি।

"Do you mean that what we commonly call the 'conditions' of an event are really complete? In practice certainly we leave out of the account the whole background of existence; we isolate a group of elements, and we say that, whenever these occur, then something else always happens; and in this group we consider ourselves to possess the 'sum of the conditions.' And this assumption may be practically defensible, since the rest of existence may, on sufficient ground be taken as irrelevant. We can therefore treat this whole mass as if it were inactive. Yes, but that is one thing, and it is quite another thing to assert that really this mass does nothing. Certainly there is no logic which can warrant such a misuse of abstraction. The background of the whole world can be eleminated by no sound process, and the furthest conclusion, which can be logical, is that we need not consider it practically.

But to give out this working *doctrine as theoretically true is quite illegitimate*". • আরও একটি কথা। যদি ঘটনারই কারণ অনুসন্ধেয় হয় তবে ঘটনা পরম্পরারও কারণ অনুসন্ধেয় হওয়া উচিত। কিন্তু যদি ঘটনা মাত্রই কার্য্যস্থানীয় হয়, তবে কারণ কোথায়? যে ঘটনাপরম্পরাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তাহা ত প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্যই, কেননা ঘটনা, পরিবর্ত্তন, রূপান্তর ইহারা সমপর্য্যায়। ঘটনাই যদি কার্য্য হইল, তাহার কারণও কি ঘটনা। ইহা স্ববিরোধী। Martineau বলেন:—"Changes have only to be *change*, and the question is asked about them; and no answer is given till you go beyond the category of change, and instead of stepping from one member of it to another with endless beat, refer its whole contents, as such, to that which is other than phenomenon." অতএব কার্য্যত্বের লক্ষণই যখন ঘটনা (phenomena)

• Appearance and Reality—Activity, p. 67.

দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু উন্মীলিত চক্ষুও কি বিষয় দর্শন করিবে না? যাহা হউক, আত্মার যথার্থ কর্তৃত্ব আছে কি না এবং থাকিলে তাহার স্বতঃ প্রকাশ কোথায়—ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টি অন্যত্র নিক্ষেপ করা আবশ্যক,—ইচ্ছাকৃত দৈহিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে, বা ইচ্ছার পরিচালনে তাহার সম্যক অবগতির উপায় নাই। ইচ্ছার পরিচালনায় তাহার কতকটা আভাস পাইলেও সেখানে উহার স্বতঃ প্রকাশ অবিদ্যমান। আত্মার পূর্ণ কর্তৃত্ব বিষয়গ্রহণে, বুদ্ধির ব্যাপারে পরিস্ফুট। আত্মার কর্তৃত্ব ব্যতীত বিষয়বোধই (perception) অসম্ভব। কেন অসম্ভব তাহা স্থানান্তরে আলোচিত হইবে। প্রত্যেক ভাবনায়, প্রত্যেক বিষয়াবগতিতে এই আত্মকর্তৃত্ব স্বতঃসিদ্ধ। বুদ্ধি-ব্যাপার-বর্জ্জিত বিষয় গ্রহণের অযোগ্য ভাবিয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে। বিষয়ের অবগতিই আত্মার কর্তৃত্ব এবং এই কর্তৃত্ববোধ স্বতঃসিদ্ধ। ইহাই কারণতাবোধের মূল সূত্র। বহির্জগতে আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, সমস্তই কার্য্য। এই কার্য্য-দর্শনে আমরা কারণের অনুমান করি বটে, কিন্তু কোন ঘটনায় প্রত্যক্ষে কারণকে অব্যবহিত ভাবে উপলব্ধি করি না এবং কি প্রকার কার্য্য উৎপন্ন হইল, কিম্বা কল্পিত কারণের সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কি প্রকার, বহির্বিষয় বিশ্লেষণে তাহা অবগত হইতে পারি না। বলিতে কি, এই স্বতঃসিদ্ধ কারণতার জ্ঞান লইয়াই আমরা বহির্বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করি; তাই বহির্জগতে আমরা কারণের অনুসন্ধান করি। অনুসন্ধেয় বিষয়ের কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে অনুসন্ধানই অসম্ভব হয়। এবং এই জ্ঞান আত্মার বিষয়াববোধে প্রকট। এই ক্রিয়া ও কর্তৃত্বের জ্ঞান যদি অপরোক্ষভাবে লব্ধ না থাকে, তাহা হইলে বহির্জগতে ক্রিয়া ও কর্তৃত্বের ধারণাই সম্ভবপর নহে; এবং আত্ম-কর্তৃত্ববোধ যদি মিথ্যা হয়, তবে জগৎ-ব্যাপারের জ্ঞানও মিথ্যা ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না; তাই একজন দার্শনিক বলিয়াছেন:—"For we ourselves are the only cause of whose mode of action we have immediate knowledge, through inner intuition. In the case of every other, though we may perceive its effects, we can only infer from the facts, and cannot immediately learn by perception of the facts, the mode and kind of way in which those effects arise, and the connection of them with their cause."*

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি বিষয়ের অবগতিই আত্মার কর্তৃত্ব। এই কথাটি আরও একটু বিশদ করিয়া দেখিতে গেলে প্রতীয়মান হইবে, অবগতি একটা Passive ব্যাপার নহে পরন্তু সম্পূর্ণ active ব্যাপার, এমন কি যে প্রকারে আত্মা বিষয়কে বিশিষ্ট রূপে অবগত হয়, সেই প্রকারেই ইহা বিষয়ের উৎপাদক অর্থাৎ আত্মার পক্ষে বিষয়াবগতি ও বস্তুসৃষ্টি একই কথা। খণ্ডজ্ঞানে বিষয়ের স্বতন্ত্রতা প্রতীয়মান হয় সত্য; কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে কোন এক অখণ্ড স্থির অন্বয়ী জ্ঞান ব্যতীত খণ্ডজ্ঞানের পক্ষেও বিষয়বোধ সম্ভাব্য নহে। যে স্বতঃব্যাবর্ত্তকী সংশ্লেষণী ক্রিয়া বস্তুতঃ

* Quoted by Dr. Martineau, chap. I, vol. I, p. 189.

বিষয়াববোধ সম্ভাব্য তাহাই আত্মপ্রসূত এবং তাহাতেই আত্মার স্বতঃ কর্তৃত্ব প্রস্ফুটিত বিষয়াবদ্ধদৃষ্টি ব্যক্তিরা ইহা না বুঝিয়া বিষয়-জগৎকে স্বতন্ত্র মনে করে এবং তাহার মধ্যে কার্য্যকারণ অন্বেষণ করে। যাহা হউক এ তত্ত্ব আলোচনার স্থল অন্যত্র।

কারণতার স্বরূপ যাহাই হউক না কেন তাহা লইয়া আর বিবাদ না করিয়া এক্ষণে উহার সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। Hume, Mill প্রভৃতি দার্শনিকেরা ঐ সম্বন্ধকে নিয়তসহ-চারিতা সম্বন্ধ বলিয়া থাকেন এবং উহাকে পুনঃপুনঃদর্শনজাত ভাবসংসর্গের ফল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কার্য্যকারণের মধ্যে যে একটা অনিবার্য্য সম্বন্ধ (necessary relation) পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ভাবসংসর্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহাকে অভ্যাসজনিত সংস্কার বিশেষও বলা যায়। Hamilton যখন বলিলেন— * "The *necessity* of so thinking cannot be derived from a custom of so thinking. The force of custom, influential as it may be, is still always limited to the customary; and the customary never reaches, never even approaches to the necessary." Mill তাহার উত্তরে বলিলেন —"If this were so, not only could an inseparable association generate no necessity of belief, but there could be no such thing as inseparable association between two mental states." অর্থাৎ তাঁহার মতে ভাব-সংসর্গই এই অনিবার্য্য বিশ্বাসের উৎপাদক। তবে ইহা অচ্ছেদ্য ভাবসংসর্গ হওয়া চাই। এই অচ্ছেদ্য বা অবিযোজ্য ভাবসংসর্গই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের অবশ্যম্ভাবিত্বের জনক। তিনি বলেন, "If there be any one feeling in our nature which the laws of association are obviously equal to producing, one would say it is that." পুনশ্চ—" Necessary, according to Kant's definition, and there is none better, is that of which the negation is impossible. If we find it impossible by any trial, to separate two ideas, we have all the feeling of necessity which the mind is capable of. Those, therefore, who deny that association can generate a necessity of thought, must be willing to affirm that two ideas are never so knit together by association as to be practically inseparable. But to affirm this is to contradict the most familiar experience of life. Many persons who have been frightened in childhood can never be alone in the dark without irrepressible terrors." কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এখানে যে অবি-যোজ্য ভাবসংসর্গের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ন্যায়, সার্ব্ব-ভৌমত্ব কোথায়? এগুলি সর্ব্বমানবগত সম্বন্ধ নহে, ব্যক্তি বিশেষের ভাবসংসর্গ মাত্র।

* Examination of Hamilton's philosophy—Inseparable Association ignored.

যদি অবিযোজ্য ভাবসংসর্গই কার্য্যকারণ সম্বন্ধের জনক হয়, এবং যদি ঐ ভাবসংসর্গ ঐ সম্বন্ধের অনিবার্য্যত্বই উৎপন্ন করে তাহা তেই বা ক্ষতি কি? অনিবার্য্যত্ব (necessity) অর্থে, যদি Kant এর লক্ষণই অর্থাৎ "of which the negation is impossible"—গৃহীত হয়, তাহা হইলে Mill যে বলিতেছেন

"Now, as to real necessity, we do not know that it exists in the case (১) .....what experience makes known, is the fact of an invariable sequence between every event and some special combination of antecedent conditions, in such sort that wherever and whenever that union of antecedents exists, the event does not fail to occur. Any *must* in the case, any necessity, other than the unconditional universality of the fact, we know nothing of—" (২) এ বাক্য গুলির অর্থ কি? Real necessity ও necessity of thought, এ উভয়ের পার্থক্য কি? Mill কি বলিতে চাহেন যে,অবিযোজ্য ভাবসংসর্গ প্রকৃত necessityর উৎপাদনে অশক্ত? তাহা হইলে প্রকৃত necessity কাহাকে বলে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক। যদি প্রকৃত necessity = necessity of thought হয়, তবে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে তাহা তিনি অস্বীকার করেন কেন? তিনি necessity of thought ও স্বীকার করিবেন অথচ 'must' বা অবশ্যম্ভাবিতাও মানিবেন না, ইহা কি প্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে তাহা বুঝা যাইতেছে না। তিনি যে বলিতেছেন, যেখানে এবং যখনই কারণ সামগ্রী বিদ্যমান, সেখানে তখনই কার্য্য ঘটে—ইহাই কি অবশ্যম্ভাবিতার পরিচায়ক নহে? যদি না হয়, তবে 'বর্ত্তমান ক্রিয়াপদ' প্রয়োগ করিবার অধিকারই বা তাঁহার কোথায় তাহা ত বুঝা যাইতেছে না। তিনি বড় জোর অতীত ঘটনা সম্বন্ধে এই প্রকার সার্ব্বভৌম বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন, বর্ত্তমান বা ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে যদি তাঁহার সংশয় থাকে, তবে সে সম্বন্ধে ঐ প্রকার সার্ব্বভৌম বাক্যই তাঁহার অপ্রযোক্তব্য।

Mill এখানেই নিরস্ত হন নাই। তিনি আরও বলিতেছেন—"A volition is a moral effect, which follows the corresponding moral causes as certainly and invariably as physical effects follow their physical causes. Whether it *must* do so, I acknowledge myself entirely ignorant, be the phenomenon moral or physical; and I condemn, accordingly, the word Necessity as applied to either case. All I know is, that it always *does*. *.

পাঠক এখানে "All I know is that it always does" এই বাক্যটির প্রতি মনোযোগ করিবেন। এই বাক্যটি কি কেবল বর্ত্তমান সম্বন্ধ বাচক? 'always' শব্দটা

(১) Examination—Theory of causation.
(২) " Do —Freedom of the will.
*. Do Do

কি কালত্রয়কে অন্তর্গত করিতেছে না? এ বাক্য প্রয়োগ করিবার তাঁহার অধিকার কি? তাঁহার কি বলা উচিত ছিল না—All I know is that it always *did*? কেবল ইহাই নহে; এই বাক্যটিকে আর একটু বিশেষিত করিয়া তাঁহার বলা উচিত ছিল—"so far as our experience goes"—অর্থাৎ "যতদূর আমাদের অভিজ্ঞতার প্রসার।"

এক্ষণে Mill এর সর্ব্বার্থসাধক অবিযোজ্য ভাবসংসর্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। Mill বলেন—"When two phenomena have been very often experienced in conjunction, and have not, in any single instance, occurred separately either in experience or in thought, there is produced between them what has been called Inseparable, or less correctly, Indissoluble Association! by which is not meant that the association must inevitably last to the end of life—that no subsequent experience or process of thought can possibly avail to dissolve it; but only that as long as no such experience or process of thought has taken place, the association is irresistible; it is impossible for us to think the one thing disjoined from the other." * ইহাকে বলে Association by contiguity.

দ্বিতীয়—Association by similarity অর্থাৎ similar phenomena tend to be thought of together এই দুই প্রকারেই ভাবসংসর্গ সাধিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক এই সিদ্ধান্তদ্বয় সমীচীন কি না। Mill বলিতেছেন "when two phenomena have been very often experienced।" কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে একটি অনুভূতি বা ভাব কি বারবার উপস্থিত হইয়া থাকে? যাহা একবার অনুভূত হইয়াছে, বারান্তরে কি ঠিক সেই ভাবটিই অনুভূত হয়? তাহা কখনই হয় না। অনুভূতির পুনরাবৃত্তি ঘটে না। যাহা পুনরায় উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বানুভূতির সদৃশ হইতে পারে, কিন্তু ঠিক সেই অনুভূতিই পুনর্ব্বার উপস্থিত হয় না। সুতরাং একই অনুভূতির পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি—এই বাক্যই অযথার্থ। তাই Bradly ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন—"The fundamental objection to this is that ideas or impressions once experienced do not recur; they are particular existences, and as such, do not persevere to recur or be presented." †

Mill এ কথা স্বীকার করেন। তিনি বলিতেছেন—"The sweet taste of to-day, and the similar sweet taste of a week ago which it reminds me of, have not 'previously constituted parts of the same act of cognition', unless we take literally the expression by which they are spoken of as the *same* taste, though they

* Examination. Psychological theory of belief in an external world.
† Encyclop. Brit. 4th Edition under 'Association.'

are no more the same taste, than two men are the same man if they happen to be exactly alike." * অতএব Mill এর মতেও একই অনুভূতি কালান্তরে অনুভূত হইতে পারে না—ইহা বুঝা যাইতেছে।

মহামতি Bradly সাদৃশ্যজনিত ভাবসংসর্গের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিজে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"When we have experienced (or even thought of) several pairs of impressions (simultaneous or successive), which pairs are like one another ; then whenever an idea occurs which is like all the impressions on one side of these pairs, it tends to excite an idea which is like all the impressions on the other side. The statement is destructive of the title of the law, because it appears that what were contiguous (the impressions) are not associated and what are associated (the ideas) were not contiguous ; in other words the association is not due to contiguity at all."

Association by similarity সম্বন্ধেও Bradly দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—"As regards the law of similarity it involves an even greater absurdity ; if two ideas are to be recognised as similar, they must both be present in the mind. If one is to call up the other, one must be absent." †

Bradly প্রচারিত প্রথম নিয়মটির অর্থ এই প্রকার—পরস্পর সদৃশ অনেক বিজ্ঞান-যুগল অনুভবের পর, এমন একটা নূতন ভাবের যদি উদয় হয় যাহা ঐ অনুভূত যুগলের একপদের অনুরূপ, তাহা হইলে ঐ নূতন ভাবটি অপর একটি ভাবকে উপস্থিত করায় যাহা ঐ যুগলের অপরপাদের অনুরূপ। এই নিয়ম হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যে ভাব-যুগল যুগপৎ অনুভূত তাহারা সংসক্ত নহে ; পরন্তু যে ভাবদ্বয় সংসক্ত তাহারা যুগপৎ অনুভূত নহে ; অর্থাৎ ভাবসংসর্গ ভাবদ্বয়ের যৌগপদ্যজনিত নহে।

দ্বিতীয় নিয়মটির অর্থ এই প্রকার—ভাবদ্বয়কে সদৃশ বলিয়া জানিতে হইলে, উভয় ভাবকেই মনে উপস্থাপিত করিতে হইবে। উভয় ভাব যুগপৎ মনে উপস্থাপিত না হইলে তাহাদের সাদৃশ্য বোধ বা বিকার অসম্ভব। পক্ষান্তরে যদি একটি ভাব অপরটিকে মনে উপস্থিত করায়, তবে বুঝিতে হইবে উহা উপস্থিত ছিল না।

যাহা হউক, Mill অবিচ্ছেদ্য ভাবসংসর্গকেই কারণতার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই অবিচ্ছেদ্য ভাবসংসর্গের উৎপত্তি বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা হইতে, ভাবসংসর্গ আদৌ অবিচ্ছেদ্য হইতে পারে কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ রহিয়া যাইতেছে।

* "Examination—Inseparable Association ignored by Messrs Hamilton and Mansel. ch. XIV.

† Encyclo. Brit. 4th Edition under Association.

তিনি বলেন—"No frequency of conjunction between the phenomena will create an inseparable association, if counter-associations are being created all the while." পুনশ্চ—"Nature as known in our experience, is uniform in its laws but extremely varied in its combinations. *" অর্থাৎ যদি বিরুদ্ধ প্রতীতি না থাকে, তবেই অসকৃৎ ভাবসংসর্গ অবিযোজ্য ভাবসংসর্গে পরিণত হইতে পারে; কিন্তু বিরোধী প্রতীতি অবিযোজ্য ভাবসংসর্গ উৎপত্তির প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকীভূত প্রতীতির পার্শ্বে ভূয়োদর্শনও ভাবসংসর্গকে অবিযোজ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃতির বৈচিত্র্য স্বীকার করিলে, এ প্রকার প্রতিবন্ধক কি নিতান্ত সুলভ নহে? প্রকৃতি একদিকে যেমন ভাবসংসর্গের অনুকূল আদর্শ প্রদান করে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিকূল আদর্শও উপস্থাপিত করে। আমি ত এমন কোন ভাবসংসর্গ দেখিতে পাই না, প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে যাহার বিরোধী আর একটা আদর্শ পাওয়া না যায়। এই আদর্শটা যথার্থতঃ বিরুদ্ধ হউক বা না হউক তাহার কথা হইতেছে না; আপাত বিরুদ্ধ হইলেই যথেষ্ট হইল। কার্য্যকারণ নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া দেখিতে পাই, অনেকস্থলে কার্য্য আছে কারণ নাই; আবার অনেকস্থলে কারণ আছে কার্য্য নাই। বৃন্তচ্যুত ফলের পতন দেখিয়াছি, তাহার কারণ কোন দিন প্রত্যক্ষ করি নাই; ক্ষিতিস্পন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহার কারণ কোনদিন দেখি নাই। নির্ম্মল গগনে মেঘোদয় দেখিয়াছি, তাহার কারণ লক্ষ্য করি নাই; বসন্তে নব পুষ্পোদ্গম দেখিয়াছি, তাহার কারণ দেখি নাই। অগ্নিতে তৃণরাজীকে দগ্ধ হইতে দেখিয়াছি, কাহাকেও দগ্ধ হইতে দেখি নাই; জলে লৌহের নিমজ্জন দর্শন করিয়াছি, নৌকার নিমজ্জন দর্শন করি নাই; অথবা নৌকার নিমজ্জন দর্শন করিয়াছি, লোহার নিমজ্জন দর্শন করি নাই; অহিফেন সেবনে রামকে মরিতে দেখিয়াছি, শ্যামকে মরিতে দেখি নাই; রৌদ্রে কৃষকের ব্যাধি দেখি নাই; কিন্তু রসিক বাবুর শিরঃপীড়ার কথা শুনিয়াছি। কুইনাইন সেবনে প্রফুল্ল বাবুর জ্বর নিবৃত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু কুমুদ বাবুর জ্বর দূরীভূত হয় নাই; ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের নিপতন দেখিয়াছি বটে, কিন্তু পক্ষীর উৎপতনও দেখিয়াছি। ইত্যাদি

Mill বলেন—"Associations derived from experience are doubtless separable by a sufficient amount of contrary experience; but, in the cases we are considering, (অর্থাৎ কার্য্য কারণ সম্বন্ধে) no contrary experience is to be had.

The whole process of acquiring our belief in causation takes place at an age of which we have no remembrance, and which precludes the possibility of testing the matter by experiment."

কিন্তু স্মরণাতীত শৈশবের অন্ধকার অবস্থায় যখন কার্য্যকারণের জনক ভাবসংসর্গ দৃঢ়ীভূত হইতেছিল, তখন কি সে দৃঢ়বন্ধন শিথিল করিবার পক্ষে কোন বিরুদ্ধ প্রতীতি

* Examination. Inseparable Association ignored.

উপস্থিত ছিল না? দেখা যাউক Mill স্বয়ং ঐ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। তিনি একস্থলে বলিতেছেন—"The uniformity is, the first stages of our experience, an actual paradox; first appearances are against it; they seem to show that some events do indeed succeed each other with an approach, though only an approach, to uniformity, but that a far greater number have no fixed order whatever." যদি ইহা সত্য হয়, তবে শৈশবের দোহাই দিয়া, আশৈশব উপার্জ্জিত ভাবসংসর্গের দোহাই দিয়া, তিনি অভাবনীয়তার (inconceivability-র) ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত কেন?

কেবল ইহাই নহে; কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কি কেবল ভূয়োদর্শনজাত ভাবসংসর্গদ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে? অনেক স্থলে সকৃৎ পরীক্ষাই কি ঐ সম্বন্ধ নির্দ্ধারণে যথেষ্ট নহে? রাশি রাশি স্থল প্রত্যক্ষ করিয়াই কি সর্ব্বত্র কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়া থাকে? Mill এ সম্বন্ধে তাঁহার Logicএ কি বলিতেছেন, পাঠক শ্রবণ করুন। "Why is a single instance, in some cases, sufficient for a complete induction, while in others myriads of concurring instances, without a single exception known or presumed, go such a little way towards establishing a universal proposition? Whoever can answer this question knows more of the philosophy of logic than the wisest of the ancients, and has problem of induction."

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে Mill ভাবসংসর্গ দ্বারা কার্য্যকারণ সম্বন্ধের মীমাংসা করিতে পারেন নাই। Millএর মতে বিজ্ঞানগুলি দলবদ্ধ হইয়া বিরাজ করে; কিন্তু বিজ্ঞানপ্রবাহ ক্রমবর্ত্তী (successive)। সুতরাং তাহারা স্বয়ং কি প্রকারে সংহত হইতে পারে? যখন একটি বিজ্ঞান পূর্ব্ব সংসক্ত বিজ্ঞানের সাহচর্য্যে লক্ষিত না হয়, তখন ভাবসংসর্গ শিথিল বা ভগ্ন না হয় কেন? এবং সেখানে সাপেক্ষধ্রুবতা * সূচিত হইবারই বা তাৎপর্য্য কি? আমি অগ্নির ঔজ্জ্বল্য ও উত্তাপ—এই বিজ্ঞানদ্বয় যুগপৎ বা অব্যবহিত পৌর্ব্বাপর্য্যে বহুবার অনুভব করিয়াছি; কিন্তু যখন আমি কেবল ঔজ্জ্বল্যই দেখিতেছি, উত্তাপ অনুভব করিতেছি না, তখন ঐ ভাবসংসর্গ বিচ্ছিন্ন হইবে না কেন? অবস্থান্তর কল্পনা করিয়া অর্থাৎ "যদি আমি অগ্নির সন্নিধানে থাকিতাম তাহা হইলে উহার উত্তাপও অনুভব করিতে পারিতাম"—এ প্রকার সাপেক্ষধ্রুবতা স্বীকার পূর্ব্বক ভাবসংসর্গের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিব কেন? যদি এ প্রকার স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে নিশ্চিতই বুঝিতে হইবে আমি যে ক্রমে বিজ্ঞানগুলিকে ব্যবস্থিত ও সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি সেই ক্রমভঙ্গের পরিহার করিতে যাইয়াই আমি পূর্ব্বাপর বিজ্ঞানের সঙ্গতি অন্বেষণ করিতেছি। আমার জ্ঞানধারার ক্রমভঙ্গ (break of continuity) আমার উদ্বেগজনক। বিজ্ঞানরাশির সম্বন্ধ সংস্থাপক এই আত্মকর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলে, যুগপৎ উৎপন্ন ক্ষণ-বিধ্বংসী বিজ্ঞান-

* Conditional certainty.

রাশির সমন্বয় বা সম্বন্ধ অথবা তাহাদের পরাক্রমে উদ্ঘোষন কিছুই ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

অতএব ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের উৎপত্তি ভাবসংসর্গ হইতে পারে না; ভাবসংসর্গই আত্ম-কর্তৃত্বের ফল; আত্মার যে সংযোজনী ক্রিয়া ব্যতীত পদার্থাবগতিই অসম্ভব, সেই ক্রিয়া দ্বারাই ভাবসংসর্গ নিশ্চিত। তাই পণ্ডিত Ward বলিয়াছেন—"Association of ideas is determined, not mechanically, but by subjective selection and interest."

এক্ষণে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব! আমরা যুক্তি তর্কের সময় প্রায়শই সম্ভাব্যতা, অসম্ভাব্যতার দোহাই দিয়া থাকি! জিজ্ঞাস্য, এই সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার মাপকাঠি (standard) কি?

প্রথমতঃ অসম্ভাব্যতার দিকেই লক্ষ্য করা যাউক। অসম্ভাব্য কি, জানিতে হইলে সম্ভাব্যের একটা ধারণা থাকা আবশ্যক। যেখানে সম্ভাব্যের কোন ধারণা নাই, সেখানে অসম্ভাব্যও কিছু নাই। এক্ষণে দেখা যাউক সম্ভাব্য শব্দের অর্থ কি? সম্ভাব্য শব্দটি 'ভূ' ধাতু নিষ্পন্ন। 'ভূ' ধাতুর অর্থ সত্তা অতএব সম্ভাব্য অর্থে "সত্তাসম্বন্ধীয়।" সত্তাসম্বন্ধীয় অর্থ কি? না, সত্তার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। "সত্তার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট" অর্থে কি বুঝিব? "সত্তামূলক" ইহাই বুঝিব। Bradley বলিয়াছেন—"Without an actual basis in, and without a positive connection with, Reality, the possible in short, not possible at all." (১) পুনশ্চ "It must be developed from, and relative to a real basis. And hence, there can be no such thing as unconditional possibility. The possible, in other words, is always relative." (২)

এক্ষণে 'সত্তামূলক' শব্দের প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। সত্তা কি? সত্তা বলিতে আমরা "অবাধিত অনুভবকেই" বুঝিয়া থাকি। অতএব 'সত্তামূলক' বলিলে এই অবাধিত অনুভবের সহিত অন্বিত (connected) ইহাই বুঝিয়া থাকি। অর্থাৎ যাহার ভিত্তি বা মূল অনুভবে প্রতিষ্ঠিত নহে, অনুভব কর্তৃক সমর্থিত নহে—তাহা সত্তামূলক নহে; সুতরাং তাহা সম্ভাব্যও নহে।

অন্যপ্রকারে বলিতে গেলে আমরা বলিতে পারি সম্ভাব্যতা—নিমিত্তাধীন নিশ্চয়তা (conditional certainty)। অর্থাৎ কোন কারণ উপস্থিত থাকিলে যাহা অনুভবের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য তাহাই সম্ভাব্য। ফলতঃ যাহা অনুভব বা অনুভবমূলক হেতু-পরম্পরা সাধ্য তাহাই সম্ভাব্য। এ প্রকার অর্থ ব্যতীত উহার অন্য কোন প্রকার অর্থও সিদ্ধ নহে।

সমস্ত তর্কের চরম আশ্রয় অনুভব। ইহাই আমাদের সর্ব্ব প্রকার মুখ্য আদর্শ। অপরাপর প্রমাণের নিশ্চয়ত্ব বা প্রামাণ্য পরম্পরাক্রমে পরিশেষে এই অনুভব ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। Mill বলেন অনুভবের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ; ইহাই অসন্দিগ্ধতার একমাত্র

(১) Appearance and Reality—p. 391.
(২) Appearance and Reality—p. 389.

আদর্শ (our model of certainty)। তিনি বলেন— "When I say I am convinced of it, I mean that the evidence is equal to that of my senses. I am as certain of the fact as if I had seen it..... We mean by knowledge, and by certainty, an assurance similar and equal to that afforded by our senses : if the evidence in any other case can be brought up to this, we desire no more. If a person is not satisfied with this evidence, it is no concern of any body but himself, nor, practically, of himself, since it is admitted that this evidence is what we must, and may with full confidence, act upon. Absolute scepticism, if there be such a thing, may be dismissed from discussion, as raising an irrelevant issue, for in denying all knowledge it denies none. The dogmatist may be quite satisfied if the doctrine he maintains can be attacked by no arguments but those which apply to the evidence of the senses. If his evidence is equal to that, he needs no more ; nay, it is philosophically maintainable that by the laws of *psychology we can conceive no more, and that this is the certainty which we call perfect.*"

অপিচ অন্যত্র ;—"By contingent sensations are meant, sensations that are not in our present consciousness and individually never were in our consciousness at all, but which virtue of the laws to which we have learnt by experience that our sensations are subject, we know that we should have felt under given supposable circumstances, and under those same circumstances, might still feel..... These possibilities which are conditional certainties, need a special name to distinguish them from *mere vague possibilities, which experience gives no warrant for reckoning upon.*" †

অতএব সম্ভাব্যতার অর্থ যে, অনুভবযুক্ত হেত্ববয়বসাধ্যতা ‡ তাহা Mill ও স্বীকার করিতেছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক অসম্ভাব্যতা শব্দের অর্থ কি ?

চিন্তার তিনটি মৌলিক অনতিক্রমনীয় (fundamental and inviolable) তথ্য (principles) আছে। এই তথ্যত্রয়কে লঙ্ঘন করিয়া কোন প্রকার চিন্তাই হইতে পারে না। ধারণায় (conception) স্ফুট ভাবেই হউক, কিম্বা অস্ফুট ভাবেই হউক,

* Examination of Hamilton's philo-Interpretation of Consciousness.
† Examination—Psychological theory of belief in an external world.
‡ Inferribility from premises based on experience.

চিন্তা অনুস্যূত থাকে। যে ধারণায় চিন্তার কিছুমাত্র কার্য্যকারিতা নাই তাহা ধারণা কি না তাহাও সন্দিগ্ধ। অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে চিন্তার সম্বন্ধে যাহা মূলতত্ত্ব, ধারণার সম্বন্ধেও তাহা মূলতত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলি চিন্তাপাতে স্বতঃসিদ্ধ; সমুদয় প্রমাণের ভিত্তিস্বরূপ। এই তিনটি মূল তথ্যের নাম যথাক্রমে, তাদাত্ম্য তত্ত্ব (principle of identity) বিরোধ তত্ত্ব (principle of contradiction), এবং মধ্যাভাব তত্ত্ব (principle of excluded middle)। দেখিতে গেলে, প্রথম তত্ত্বটির মধ্যেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় তত্ত্ব দুইটি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, উপলব্ধ হইবে।

যাহা হউক। এই তিনটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব সমগ্র চিন্তাকে নিয়মিত করে। ইহারা প্রমাণ পুঞ্জের উপজীব্য বা আশ্রয়। যে কোন বিষয় এই মৌলিক তথ্যের কোন একটির বিরুদ্ধ হইবে, তাহা অসম্ভব। অন্ততঃ চিন্তার জগতে তাহা অসম্ভব। চিন্তানিরপেক্ষ জগৎ যদি একটা থাকে, তবে সেখানে চিন্তাবাধিত বিষয় সম্ভাবনীয় হইবে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

Mill বলেন—"Any assertion, therefore, which conflicts with one of these laws—any proposition, for instance, which asserts a contradiction, though it were on a subject wholly removed from the sphere of our experience, is to us unbelievable. The belief in such a proposition is, in the present constitution of nature, impossible as a mental fact."*

পুনশ্চ। "Now in respect to phenomenal attributes, no one denies the three 'Fundamental Laws' to be universally true. Since they are the laws of all Phaenomena and since Existence has to us no meaning but one which has relation to Phaenomena, we are quite safe in looking upon them as laws of Existence.

এখানে Millএর সহিত আমার একটু প্রভেদ আছে। আমি যখন চিন্তানিরপেক্ষ জগতের কথা বলিতেছি, তখন আমি চিন্তানিরপেক্ষ বিষয়জগতের কথাই বলিতেছি। চিন্তানিরপেক্ষ চিন্তার উপজীব্য স্বয়ংপ্রভ যদি কোন সত্তা (Existence) থাকে, তবে তাহা অস্বীকার করিতেছি না। Mill হয় ত চিন্তাগ্রাহ্য সত্তার অতিরিক্ত সত্তাই স্বীকার করিবেন না। যাহা হউক যাহা চিন্তার বিষয়, চিন্তাবাধিত হইলে তাহার সত্তা যে অসম্ভব Mill তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এবং কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই বা তাহা অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন?

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি—যে বিষয় এই তথ্যত্রয়ের বিরোধী, তাহা অসম্ভব। এই সিদ্ধান্ত হইতে আমরা ইহাও পাইতেছি যে, যে বিষয় এই তথ্যত্রয়ের অবিরোধী তাহাই সম্ভাব্য বা সম্ভাবনীয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে—এই প্রকার সম্ভাব্যতা ও প্রাগুক্ত সম্ভাব্যতা কি একই পদার্থ? তাহা ত নয়। প্রথম লক্ষণটি অনুসারে যাহা সম্ভাবনীয় বা অসম্ভাবনীয়, দ্বিতীয় লক্ষণানুসারে হয়ত তাহাই অসম্ভাবনীয় বা সম্ভাবনীয়। প্রথম লক্ষণানু-

* Examination—The Fundamental Laws of thought according to Sir W. Hamilton.

সাহে দেখিতে গেলে, মনগড়া বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভাব্য নহে; নৃসিংহের অস্তিত্ব সম্ভাবনীয় নহে। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষণানুসারে—মৌলিক চিন্তার বা কল্পনার তথ্য বাধিত না হওয়ায়—উহা সম্ভাবনীয় হইতেছে।

এ সমস্যা অবশ্যই গুরুতর। যাহা হউক, আমার মনে হয় দ্বিতীয়ঃ সম্ভাবনীয়তা ও প্রাগুক্ত সম্ভাবনীয়তায় যে বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে তাহা আপাত বিরোধ, যথার্থ বিরোধ নহে। দ্বিতীয় সম্ভাবনীয়তা সম্ভাবনীয়তার সীমা নির্দ্দেশক। এই সীমার মধ্যে কোন পদার্থ বস্তুগত্যা সত্য তাহারই মাপকাটি প্রথমটি। অর্থাৎ সম্ভাবনীয় মাত্রই বস্তুগত্যা (actually) সত্য নহে; এই বস্তুগত্যা সত্যতার সম্ভাবনাই প্রাগুক্ত সম্ভাবনীয়তা। যাহা চিন্তা ব্যাঘাতক তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; যাহা চিন্তা ব্যাঘাতক নহে, তাহা সম্ভাবনীয়; তন্মধ্যে যাহা অনুভব ও তর্ক কারণ হইতে পাইবার যোগ্য তাহার সত্তাই সম্ভবপর অর্থাৎ কি না বাস্তব।

আপাততঃ এখানেই নিরস্ত হওয়া আবশ্যক। তবে এখানেও একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন, চিন্তার এই মূল তথ্যত্রয় বস্তুসত্তাকে স্পর্শ করে না; কেবল সত্তাঘটিত চিন্তাকেই নিয়মিত করে সুতরাং বস্তুসত্তা চিন্তা নিয়মের অতীত। ইহার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য, যে সত্তা চিন্তানিরপেক্ষে প্রতিভাত হয় না, সে সত্তা সম্পূর্ণরূপে চিন্তার নিয়মাধীন; কিন্তু যে সত্তা স্বয়ং সিদ্ধ, চিন্তার উপজীব্য—চিন্তানিরপেক্ষ, কেবল সেই সত্তাই চিন্তা নিয়মের অতীত; তদতিরিক্ত চিন্তা-সিদ্ধ সকল সত্তাই চিন্তার নিয়মাধীন। এ হিসাবে চিন্তার বিরোধী চিন্তা-সাধ্য কোন সত্তা সম্ভাবনীয় নহে।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী, বি, এ

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটি কয়েক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়

(২৭৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ইহার (Dettveiler's pocket flask) উপরে ও নীচে উভয় দিকেই খোলা যায়। মুখ যোগে আটকান থাকে। উপরের দিকে খুলিয়া ভিতরে থুথু ত্যাগ করিতে হয়। নীচের দিকে খুলিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। কতক কতক বোতলের ভিতর যেরূপ থাকে ইহার ভিতরেও সেইরূপ একটী কানেলের মত আছে (funnel)। ইহা থাকাতে পকেটে রাখিয়া দিলে, এমন কি সময় সময় উহার মুখটা খোলা থাকিলেও থুথু পড়াইয়া পড়ে না।

মক্ষিকার কার্য্য

এই বিংশশতাব্দীর অশেষ কঠোরতার মধ্যে মানবজীবন রক্ষা একেই ত দুরূহ তার উপর চাক্ষুষ অচাক্ষুষ সমস্ত প্রাণীই যদি ইহার বিরুদ্ধে একভাবে না হয় অন্যভাবে দাঁড়ায় তবে নিরীহ মানুষগুলি যে একান্তই নিরুপায় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে মশার দৌরাত্ম্য প্রতাপের কথা কে না শুনিয়াছে? কিন্তু মাছির ভন্‌ভনানি ভিন্ন যে উহার অপর কার্য্য আছে

এ কথা কে ভাবিয়াছিল? মক্ষিকা দংশন করে না সত্য কিন্তু যেরূপ ভাবে শত্রুতা সাধন করে তার চেয়ে যে দংশনের জ্বালাও ভাল ছিল। নানাবিধ ব্যাধি এই মক্ষিকা সহযোগে বিস্তৃত হয় এখানে সে সকলের কথা না বলিয়া শুধু ক্ষয় কিরূপে বিস্তৃত হয় সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। মাছিগুলি সচরাচর ক্ষয় জীবাণুপূর্ণ থুথুগুলির উপর বসে এবং তথা হইতে যাইয়া কোন খাদ্য সামগ্রীর উপর পড়ে এবং এই খাদ্য সামগ্রী সহযোগে জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং ক্ষয় উৎপাদন করে।

মাছিগুলি থুথুর উপরে যখন বসে তখন শান্ত শিষ্ট ক্ষিবালকের মত বসে না—যে কিছুই খাইবে ছুঁইবে না—পরন্তু উদরপূর্ত্তী করিয়া থুথুগুলি বা ক্ষয় জীবাণুপূর্ণ অন্য খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করে এবং উদরাভ্যন্তরে ক্ষয়-জীবাণুর একটী বস্তী সৃষ্টি করে—ইহা শুধু কল্পনার কথা নহে যেহেতু ইহাদের উদরাভ্যন্তরে এই জীবাণু জীবন্ত অবস্থায় দেখা গিয়াছে। সে এক স্থানে যাইয়া এই জীবাণু সংগ্রহ করে এবং অপর খাদ্য সামগ্রীর উপর বসিয়া উহা বমন করে এবং ক্ষয়জীবাণু সংসৃষ্ট করে। এইরূপে মাছি ক্ষয় বিস্তারে সহায়তা করে। সুতরাং কোন ক্ষয়জীবাণুপূর্ণ স্থানে যাহাতে ইহা না বসিতে পারে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং ততোধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে উহারা আমাদের আহার সামগ্রীর উপর না বসিতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতেই এ ব্যাধি কিরূপে দূর করা যাইতে পারে এবং সংক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

জনসাধারণের শিক্ষা

সর্ব্বাপেক্ষা আগে এই ব্যাধি সম্বন্ধে জনসমাজকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহারা যদি একবার বুঝিতে পারে এই ব্যাধির কারণ কি—কি কারণে উহা সংক্রামিত হয় এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সংক্রমণ নিবারিত হয় এবং ব্যাধি আসিয়া পড়িলে কিরূপে উহার সহিত সংগ্রাম করিয়া উহাকে বিনাশ করা যায় তবে এই ব্যাধিকে দূর করিতে বেশী কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। উহা নিম্নলিখিত কয়েক উপায়ে হইতে পারে।

১। এই ব্যাধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা জনসমাজে বক্তৃতা দেওয়া।

২। ছায়াবাজী সাহায্যে ইহার মূল মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া।

৩। সহজ সরল ভাষায় এই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যবিষয়পূর্ণ পত্রাবলী বা পুস্তিকা বিতরণ।

ব্যাধি সংক্রামক কিন্তু ছোঁয়াচে নহে

এই স্থানে আর একটী প্রয়োজনীয় কথা বলা দরকার। এই ব্যাধি একজন হইতে অপর জনে সংক্রমিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও উহা ছোঁয়াচে নহে।

বসন্ত রোগীকে ছুঁইলেই যেমন ঐ রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে ক্ষয়রোগে উহা আদৌ নাই। ক্ষয়রোগীর নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিলে উহার জীবাণুপূর্ণ থুথু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা আছে এবং মাত্র এই রূপেই উহা সংক্রামক।

থুথু সম্বন্ধে যে সব সাবধানতা লওয়া আবশ্যক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আলোক ও বায়ুর উপকারিতা

আমরা সূর্য্যের আলোক ও নির্ম্মল বায়ুর উপকারিতা সম্বন্ধেও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্ষয়

জীবাণু সূর্য্যের আলোকে ও উন্মুক্ত বায়ুতে অধিকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং যাহাতে সর্ব্বস্থানে উভয়ই প্রচুর পরিমাণে আসিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই কারণে এই ব্যাধি আমরা সহরে বেশী দেখিতে পাই। সহরে বাটী নির্ম্মাণ সময়ে আলোক ও বায়ুর গমনাগমনের সম্বন্ধে বিশেষ কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। এক বাটীর গায় আর এক বাটী উঠিতেছে উভয়ের মধ্যে একটু নিশ্বাস ছাড়িবার মত স্থানও থাকে না। চারিদিকে খোলা জায়গা ত প্রায় কোন বাটীতেই নাই। কেবল যে পাশাপাশিই এইরূপ বাড়ীর উপর বাড়ী তা নয় বাটীর পেছনেও এইরূপ। কলিকাতায় এবং অন্যান্য বড় সহরে জায়গার দর দুর্ম্মূল্য সত্য এবং আমাদের দেশের লোকের যেরূপ সামান্য আয় ও সাংসারিক দুরবস্থা তাহাতে তাহাদের খোলা জায়গা রাখা বড় সহজ বিষয় নহে। তবে জীবনের চেয়ে কিছুই বেশী নয়। একটী আলোক বায়ুশূন্য বাটীর জন্য যে কেবল নিজকেই ভুগিতে হয় তাহা নহে, পুরুষানুক্রমে সকলকে ভুগিতে হয়। এই সব বিশেষরূপে চিন্তা করা আবশ্যক।

মিউনিসিপালিটির কর্ত্তব্য

আমাদের মিউনিসিপালিটিরও এবিষয়ে বিশেষ ত্রুটি আছে। কমিশনারগণ হয়ত আইন করিলেন যে বাটীর খানিকটা অংশ অবশ্যই খোলা রাখিতে হইবে কিন্তু তা দেখে কে? এইত আইন আছে যে বাটীর অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ খোলা রাখিতে হইবে কিন্তু কয় খানা বাটীতে তাহা রাখা হয়? আইনের প্রায়ই অপপ্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় ও দেশের বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। আমরা যারা রোজ রোজ বাড়ী ঘুরে বেড়াই এবং দেখিতে পাই যে সহরের অধিকাংশ ব্যাধিই এই সব আলোক বায়ুহীন বাটীতে সূচনা হইয়া থাকে—তাহাদের এসব কথা একটু জোরের সহিত বলিবার অধিকার আছে। এই সব বাড়ী হইতে যদি রোগীকে ভাল বাড়ীতে লওয়া যায় তবে তাহাদের কিরূপ দ্রুত উন্নতি হয় তা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আশাকরি মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইবেন। বাটীর চতুষ্পার্শ্বেই কতকটা খোলা জায়গা থাকা দরকার, অন্ততঃপক্ষে এক তৃতীয়াংশ ভূমি খোলা থাকা আবশ্যক। যাহাতে গৃহে রীতিমত বায়ু জানালা থাকে তাহাও দেখা আবশ্যক। এমন অনেক গৃহ আছে যাহার মধ্যে কস্মিন কালেও আলোক যাইবার সুযোগ পায় না—এমন অনেক ঘর আছে যাহার একটীমাত্র দরজাই সম্বল এবং উহা বন্ধ করিলে বায়ু চলাচলের কোন পথই থাকে না। ইহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে।

রান্নাঘরের ব্যবস্থা

রান্নাঘরগুলি বসত ঘর হইতে পৃথক হইলে ভাল হয়। অনেক স্থানেই বসত ঘরের নীচের ঘর হয়ত রান্নাঘর। উহাতে ঘর বাড়ী কাপড় চোপড়ই যে শুধু অপরিষ্কার হয় তাহা নহে, স্বাস্থ্যও চিরকালের মত ভগ্ন হয়। ছাতের উপরে রান্নাঘর হইলে কতক বিষয়ে অসুবিধা থাকিলেও স্বাস্থ্য বিষয়ে ভাল। রান্নাঘর যদি পৃথক রাখা একান্তই সম্ভবপর না হয় তবে উহা হইতে যাহাতে সহজে ধূম নির্গত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা একান্ত সঙ্গত। ধূম বহির্গমনের চিমনী থাকিলে বেশ ভাল হয়। যাহারা আমাদের রান্নাঘরের

অবস্থা জানেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের মেয়েদের বারো আনা ব্যারামই এইখানে সূত্রপাত হয়।

গৃহে লোকবাহুল্যের অপকারিতা

এই স্থানে আরও দু একটী আবশ্যকীয় কথা বলার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। আমি এখন যে বিষয়টি বলতে যাচ্ছি সে সম্বন্ধে সকলের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই। কথাটি হচ্ছে যে আমাদের গৃহে যেরূপ লোক বাস করার বন্দোবস্ত আছে সর্ব্বদাই তথায় তা থেকে বেশী লোক থাকে। যেখানে ১০ জন লোক থাকবার মত জায়গা আছে সেখানে যদি বা ২০ জন নাই থাকুক অন্ততঃ ১৫ জন ত অবশ্যই থাকে। ইহা যে কতদূর অপকারী তা আমি বলতে পারি না। লোকের যে কেবল নানা বিষয়ে অসুবিধা হয় তাহা নহে, অনেকের স্বাস্থ্য শুধু এই কারণে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে—জন্মের মত আর তা সোধরায় না। আমাদের দেশ যেরূপ গরীব এবং এখানে একান্নবর্ত্তীতা প্রথা থাকায় এ বিষয়ে কিছু একটা করে উঠা বড় সহজ ব্যাপার নহে, বলতে গেলে এ একটী কঠিন সমস্যা। কিন্তু আমরা যখন বুঝতে পাচ্ছি এ থেকে আমাদের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তখন এ বিষয়ে প্রতিকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ধরুন কোন ভদ্রলোক বাসের জন্য একটী বাড়ী তৈয়ারী করলেন, তাঁর তিনটি ছেলে আছে। তাঁর মরবার সময় উহাদের প্রত্যেকের হয়ত ৩,৪ টী করে ছেলেমেয়ে জন্মেছে, পোষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৃহবিস্তারের আদৌ ব্যবস্থা হয় নাই। এখন তিন জনে তিনটি বাটীতে থাকলে তবে সঙ্কুলান হয়—তা না করে যারা একের ছিল তাই যেখানে তিনের উপযোগী করা হ'ল। হয়ত বাটীতে রান্নাঘর একটীর বেশী দুটী ছিল না, এখন রান্নাঘরই চাই তিনটি, এখন কোথায় বা রাঁধে, কোথায় বা খাকে? এই ত অবস্থা! ঐ বাটীতে যদি এখন এতটি লোক বসবাস করা যায় তবে উহা অনাকীর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ও ব্যাধি হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ অনাকীর্ণ গৃহে অনেক সময় মলমূত্র ত্যাগের অসুবিধা ও স্নানাহারের অনিয়ম ও তজ্জনিত ব্যাধি হতে অনেকবার লক্ষ্য করেছি সুতরাং গৃহ যাতে অনাকীর্ণ না হয় সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয়।

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব

এই স্থানে আরও একটি কথা বলবার আছে। বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন, সকলেরই আছে এবং তাদের যাতায়াত একান্তই স্বাভাবিক এবং সকলেই তাহাতে আহ্লাদিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমনই হইয়া পড়িয়াছে যে এ সম্বন্ধে আমরা একটা খবর দেওয়াও অধিকাংশ সময়েই আবশ্যক বোধ করি না। আমরা মনে করে থাকি যে অমুক ত আমার নিকট আত্মীয় তার বাড়ীতে যাব তার আবার একটা খবর কি? কিন্তু পাড়াগাঁ হইলে কোন কথা ছিল না, তথায় স্থানের একেবারেই অভাব নাই। সহরে নিজেরাই হয়ত অতি কষ্টে—অসুলান স্থানে বাস করিতেছে তার উপর যদি আত্মীয় ও বন্ধুরা বিনা খবরে আসিয়া উপস্থিত হন তবে তাহাদের যে কি পরিমাণ কষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। যদি শুধু কষ্টের কারণই হইত তবে এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন হইত না। ইহা হইতে যে কত সময় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় তাহা বলিতে পারি না।

উঁহারা আবার অধিকাংশ সময়ই পীড়িত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আসেন—সে সময়ে কষ্টের একশেষ হয়। এই অভ্যাস আমাদের দূর করিতে হইবে। এ অভ্যাস হয়ত এক-দিনে দূর হইবে না—কিন্তু যাহার দরুণ শুভ হইতে অশুভ অধিক তাহা যেমন করিয়া হউক দূর করিতে হইবে। আমি এমন কথা মোটেই বলি না যে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে কেহ স্থান দিবেন না—যেখানে স্থান আছে—সেখানে সচ্ছন্দে আসুন—কিন্তু যেখানে স্থান নাই সেখানে না যাওয়াই ভাল, অন্ততঃ পূর্ব্ব হইতে খবর দিয়া এবং তাহাদের কোন অসুবিধার কারণ হইবে কি না এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে জানিয়া তবে যাওয়া দরকার। আমা-দের দেশ চির অতিথিবৎসল, নিজেরা নিত্যই সহস্র কষ্ট সহিয়া আত্মীয় বন্ধুদের আদর ও তুষ্টির জন্য সকলে সততই উদ্‌গ্রীব সুতরাং তাহাদের কথা আর অধিক কি বলিব। আমরা সকলেই এ বিষয়ে অপরাধী। আমাদের সকলের অভ্যাসই পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

দেশ দরিদ্রপ্রধান

আমাদের দেশ দরিদ্রপ্রধান। এখানকার অধিকাংশ লোকের এমন শক্তি নাই যে, যে সব গৃহে সচ্ছন্দে আলোক ও বায়ু প্রবেশ করে সেরূপ গৃহে তাহারা বাস করে। সুতরাং উহাদের জন্য উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন।

মিউনিসিপালিটি ও ধনীদিগের কর্ত্তব্য

মিউনিসিপালিটির এইরূপ গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া বিনা লাভে অল্প টাকায় ভাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ধনী, পরদুঃখকাতর দয়ালু ব্যক্তি-গণ ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। আমাদের আফিস, কাচারী, স্কুল, কলেজ, বায়স্কোপ, থিয়েটার, কল কারখানা প্রভৃতি স্থান যে সব স্থানে বহু জন-সমাগম হইবার সম্ভাবনা তথায় আলোক ও বায়ু চলাচলের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন! বাসগৃহ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল যে গৃহেরই এই সব ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহা নহে। রাস্তাঘাটগুলিও সরল ও সুপ্রশস্ত হওয়া দরকার। সহরে নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য নানা স্থানে খোলা জায়গা ও উদ্যান থাকা একান্ত আবশ্যক। সহরের এই মুক্ত স্থান গুলি দেহের ফুস্‌ফুস্ স্থানীয়। ফুস্‌ফুস্ যেমন দেহের দূষিত রক্তকে শোধিত করিয়া জীবন রক্ষার সহায়তা করে—এই মুক্ত স্থানের বায়ুও গৃহের দূষিত বায়ুসেবী লোকদিগকে নির্ম্মল বায়ুদানে জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দেয়।

সর্ব্বত্রই যদি সূর্য্যের আলো যাবার বন্দো-বস্ত করা যায় তবে ক্ষয়রোগ অনেকটা কম হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে সূর্য্যের কিরণের তেজ খুব বেশী, এইজন্য ইউরোপ হতে উহা দ্বারা আমরা বেশী উপকার পাই। কিন্তু সংসারে কোন জিনিসই অবিমিশ্র ভাল নয়। আমরা বেশী আলো পাই সত্য কিন্তু সেই কারণে—আমাদের জায়গাগুলি বেশী শুকনো ও ধূলি হইবার বেশী সুবিধা। ক্ষয় জীবাণুগুলি কিয়ৎক্ষণ আলোর সংস্পর্শে এলেই মারা পড়ে কিন্তু এখানে বেশী ধূলো থাকার দরুণ সহজে উহার আবরণ পায় ও জীবন রক্ষার একটা উপায় হয়। আমাদের দেশে বায়ুর গতিও বেশী সেইজন্য এই ধূলি-বিমণ্ডিত জীবাণুগুলি সহজে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হয় এবং ব্যাধি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বার সুবিধে পায়। সুতরাং আমাদের

রাস্তাগুলি ভাল করে তৈয়ারী করা উচিত এবং যাহাতে উহাতে তৈল, আলকাতরা বা জলসেচন দ্বারা উহার ধূলি উড়তে না পারে তাহার বন্দোবস্ত আবশ্যক।　　ক্রমশঃ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্য-পরিচয়

মশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

প্রাচীন যুগ হইতে পাঠান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাস এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য ঐ দুইটি জেলার ইতিহাস বলিতে গিয়া গ্রন্থকারকে যোগসূত্রে বঙ্গের অন্যান্য স্থানের ইতিবৃত্তকেও উল্লেখ করিতে হইয়াছে। তাহা না করিলে চলেও না। যে ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসের উৎপত্তি, সেই সব ঘটনা যে এক ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া সেখানেই আবদ্ধ থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। তাহাদের বিস্তৃতি হয়, এবং সেইজন্য তাহাদের ইতিহাসও বিস্তৃত হইয়া থাকে। জেলা হিসাবে যাঁহারা ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই এই পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। খণ্ড সমগ্রের দিকে, সমগ্র খণ্ডের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে পরিপূর্ণ সত্য উপলব্ধ হইতেই পারে না।

গ্রন্থকার এই ইতিহাসকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক। প্রাকৃতিক অংশে দুইটি জেলার নদীনালা, জলবায়ু, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা প্রভৃতির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই অংশের মূল্য না বুঝিলে, ইহার ঐতিহাসিক অংশও বুঝা কঠিন। বাহিরের আবেষ্টন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও বাহ্যপ্রকৃতি—তাহার রীতিনীতি, ক্রিয়াকলাপ, আচার-ব্যবহারের উপর কতখানি কায করে, তাহা যাঁহারা একটু চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই ধরিতে পারেন। সেই আবেষ্টনের বিবরণ দিয়া সতীশবাবু আমাদের দেশীয় ঐতিহাসিকদিগকে একটা সুন্দর পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক অংশে ভ্রমপ্রমাদ আছে কি না, তাঁহার বিচারপ্রণালী সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে কিনা, ইহা বিজ্ঞেরা বিচার করিবেন। তবে তিনি যে প্রণালীতে এই ইতিবৃত্ত গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই খুব প্রশংসনীয়। অদম্য অধ্যবসায়ে তিনি যে সব মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এই তথ্যসংগ্রহের যুগে অগ্রাহ্য করিবার জো নাই। বাঙ্গালার এখনও খাঁটি ইতিহাস রচনার সময় বহু দূরে। যখন সে সময় আসিবে, তখন এবম্বিধ খণ্ড ইতিবৃত্তই যে বিপুলভাবে ব্যবহৃত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

হিন্দী তরঙ্গিণী। আমাদের এই নূতন হিন্দী সহযোগীকে আমরা সাদরে ভারত-সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করিতেছি। আপাতের সংখ্যা খানি (যে খানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে) কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একেবারেই প্রশংসাহ নহে। প্রায় অর্দ্ধেক পত্রিকাখানিই কবিতাপূর্ণ। কবিতা-

গুলি সাধারণ হিন্দী কবিতা হইতে উচ্চ প্রকৃতির। "প্রাবৃট্ বর্ণন" কবিতাটী অতি দীর্ঘ হইলেও সৌন্দর্য্যপূর্ণ। "সাময়িক প্রবাহ" নামক আলোচনাতে "নারীকী প্রতিযোগিতা" নামক একটী রচনা আছে। রচয়িত্রীর নাম দেখিয়া মনে হইতেছে যে ইনি বঙ্গ মহিলা। যদি আমাদের অনুমান সত্য হয় তবে ইহা বড় আনন্দের বিষয়। যদি বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী এইরূপ পরস্পরের ভাষায় চিন্তার আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয়েন তবে ভারতে যে নূতন জাতীয়তা ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা অচিরেই দেশের প্রতি নগরে সুপ্রভাব বিস্তার করিবে।

মর্য্যাদা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক। মর্য্যাদার এই দুই সংখ্যাই আমাদের নিকট অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। দুই সংখ্যাই বৈচিত্র্য ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ দ্বারা পুষ্টকলেবর। "সম্পাদকীয় টিপ্পণী" নামক আলোচনা ভাগ অতি উৎকৃষ্ট। আজকাল দেশ বিদেশের নানা সংবাদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে কয়খানা হিন্দী পত্রিকার বিষয় প্রদত্ত হইল, সবগুলিই সচিত্র। চিত্রগুলি দেখিয়া মনে হয় যে নবোদ্বোধিত ভারতীয় চিত্রকলা এখনও আমাদের হিন্দুস্থানী ভ্রাতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করে নাই।

সরস্বতী নবেম্বর ১৯১৫। এই সংখ্যার সরস্বতীতে বৈচিত্র্যের নিতান্ত অভাব। জীবন চরিত, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও যুদ্ধের খবরের চর্ব্বিত চর্ব্বণ ব্যতীত কিছুই নাই। কবিতাগুলিও নিতান্ত প্রাণহীন। "সবল ঔর নিবল," "তুলসীদাস ঔর রামায়ণ" নামক যে দুইটী কবিতা আছে তাহা নিতান্ত বালকের প্রবন্ধ লেখার ন্যায়। বরং "সুমন" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটীর মধ্যে কিছু ভাব আছে। হিন্দী সাহিত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কেবল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বা চলিত সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত থাকিলে চলিবে না। নূতন সৃষ্টি আবশ্যক। এই সংখ্যায় "ভারতমে শিক্ষা প্রচার" নামক আলোচনাটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অশোক অনুশাসন। শ্রীচারুচন্দ্র বসু ও শ্রীললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এম্, এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। (১৩২২) মূল্য ১৷৷০ টাকা। প্রাপ্তি স্থান—মেট্‌কাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপরোক্ত পুস্তকটি বাহির হওয়ায় বঙ্গভাষায় একটি বহুদিনের অভাব দূর হইয়াছে। ইংরাজী ও অপরাপর য়ুরোপীয় ভাষায় বহুকাল আগেই এই প্রসিদ্ধ ভারতীয় সম্রাটের অনুশাসনগুলি অনূদিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন ভারতীয় আধুনিক ভাষায় এতকাল এগুলির অনুবাদ হয় নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পরিপুষ্টির জন্য এই অনুশাসনগুলির প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা এ স্থলে বলাই বাহুল্য। সেকালীন ভারতের আর্থিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতীক অনেক তথ্য, ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব ও উচ্চাসন বিষয়ক নানা সংবাদ এই অনুশাসনগুলিতে নিহিত আছে। সুতরাং প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে ইহার তথ্যসমূহ যাহাতে সহজলভ্য ও সুবোধ্য হয় তাহা ভারতীয় ইতিহাসক্ষেত্রে কর্ম্মীগণের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আলোচ্য পুস্তকটিতে অনুশাসনগুলির সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিরা যে কেবল উপকৃত হইবেন তাহা নহে, সংস্কৃত অনুবাদ

হইতে ভারতীয় অপরাপর ভাষায়ও অনুবাদ অল্প আয়াসেই হইতে পারে।

"উপক্রমণিকা"য় ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইয়াছে, ও "পরিশিষ্টে" অনুশাসনের শক্ত কথাগুলির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ডাক্তার টমাস্ প্রভৃতি মনীষিগণ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে ইদানীং অনুশাসন-নিহিত অনেক কথার বিশদতর অর্থ করিয়াছেন। সেগুলি পুস্তকটিতে অঙ্গীভূত হয় নাই। তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এগুলি ভবিষ্যতে ব্যবহার করিলেও হইতে পারে। কিন্তু কয়েকটি অনুশাসনের সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়া হয় নাই, যথা পঞ্চম গিরিলিপি (পৃঃ ৪৪), দশম হইতে ত্রয়োদশ গিরিলিপি (পৃঃ ৪৭), চতুর্থ হইতে সপ্তম স্তম্ভলিপি (পৃঃ ৪৯) ইত্যাদি। অথচ পৃষ্ঠার সংখ্যা ধারাবাহিক দেখিতে পাই। ইহাতে বোধ হয় ঐ ঐ সংস্কৃত অনুবাদ আদৌ গ্রন্থে নিহিত হয় নাই। যাহা হউক ইহা সংযুক্ত হওয়াউচিত।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। বাঙ্গলা সাহিত্যিক-জগতে অশোক অনুশাসনগুলির এক বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থরচয়িতারাও উল্লেখ করিয়াছেন যে অনুশাসনগুলির ভাষাকে মাগধী প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যাইতে পারে ও কথিত বাঙ্গালা মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের দিক হইতেও এগুলির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। আলোচ্য পুস্তকটি এইরূপে আদি আর্য্যভাষার সহিত বাঙ্গলা ভাষার সম্বন্ধ বঙ্গের সাধারণ নরনারীর নয়নপথে আনিয়া তাহাদের মনে এক অভিনব স্বভাষা-গৌরব জাগাইয়া তুলিবে।

মফঃস্বলের বাণী

১। বঙ্গে ম্যালেরিয়া ও তৎ-প্রতিকারে দেশবাসীর কর্ত্তব্য

যে ম্যালেরিয়ার পৈশাচিক অত্যাচারে বাঙ্গালার শান্ত, স্নিগ্ধ পল্লীগুলি আজ মহাশ্মশানে পরিণত, যাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বাঙ্গালী পল্লীভিটা পরিত্যাগ করিয়া আজ সহরবাসী, সেই ম্যালেরিয়ার নিদান নির্ণয়ের জন্য অনেক সময় অনেক চেষ্টা হইয়াগিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিগণের মতে জলাভূমিতে লতাগুল্মাদি পচিয়া যে বিষ-বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহাই ম্যালেরিয়ার কারণ। আবার কেহ কেহ বলেন বিগলিত উদ্ভিদ্ হইতেই এই রোগবীজাণুর জন্ম হয়। গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সৈনিক দলের ডাক্তার ল্যাভেরন্ এই রোগের প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত করিয়া জগদ্বাসীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এক প্রকার জীবাণুই এই দুরন্ত জ্বরের জনয়িতা। ঐ জীবাণুগণ অণুদেহী এবং এক কোষযুক্ত। ইহারা মানবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া রক্ত

মধ্যস্থিত রক্তকণিকার ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তথায় বংশবৃদ্ধি করিয়া আমাদের প্রাণ বিনাশোপযোগী বল সঞ্চয় করিতে থাকে। যে ভাবে ইহারা দেহমধ্যে বংশবৃদ্ধি করে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রথমে একটী জীবাণু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটী হয়। ঐ দুইটী আবার বিভক্ত হইয়া চারিটী হইয়া থাকে। এইভাবে অল্পকাল মধ্যে একটী জীবাণু হইতে বহুসংখ্যক জীবের সৃষ্টি হয়। রোগ-জীবাণু দেহপ্রবিষ্ট হইলেই যে সকল সময় আমরা পীড়িত হই, এমত নহে। প্রকৃতি আমাদের শরীরে এমন একটী প্রতিষেধক শক্তি দিয়াছেন, যাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক সময় রোগ পরাভূত হইয়া পড়ে ঐ ব্যাধি-প্রতিষেধক শক্তি আমাদের মধ্যে না থাকিলে আমরা ক্ষণকালও বাঁচিতাম কি না সন্দেহ। জনাকীর্ণস্থানে বাস, দুশ্চিন্তা, কদাহার, অনাহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মাদক দ্রব্য ব্যবহার, শীতাতপ সেবন প্রভৃতি যে কোন কারণে স্বাস্থ্য-হানি ঘটিলেই আমাদের আত্মরক্ষা করিবার শক্তি কমিয়া যায়। তখন সমস্ত রোগ-জীবাণুই স্বচ্ছন্দে দেহমধ্যে বংশবৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে পীড়িত করিয়া ফেলে।

কিউলেক্স (culex) জাতীয় মশকগণ গোদের জীবাণু বহন করে। ইহা দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমেই মহামতি ম্যান্‌সন্ অনুমান করেন যে ম্যালেরিয়া-জীবাণুও বোধ হয় ঐরূপ কোন জাতীয় মশকের দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ দেহে সংক্রামিত হয়। তাঁহার অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার রস্ নানা জাতীয় মশক লইয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত মহাত্মা সপ্রমাণ করিলেন যে এনোফিলিস্ জাতীয় মশকই ম্যালেরিয়া-জীবাণুর বাহক।

এনোফিলিস্ মশক রোগীর দেহে হুলবিদ্ধ করিয়া রক্তপান কালে রোগ-জীবাণু টানিয়া লয়। কয়েক দিবস পরে মশক-দেহে রোগ-জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে মশকের লালায় জীবাণুগণ আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ অবস্থায় ঐ মশক কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলেই ম্যালেরিয়া-জীবাণু দষ্ট ব্যক্তির রক্তে প্রবিষ্ট হইয়া রোগোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। পরীক্ষা দ্বারা আরও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এই জাতীয় মশক কখন দিবাভাগে দংশন করে না এবং ইহাদের মধ্যে স্ত্রী জাতীয়াই বিষবাহক।

সাধারণ মশক হইতে এনোফিলিস্ মশকের অনেক পার্থক্য আছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে সকলেই ইহা বুঝিতে পারেন। এই মশকের হুলে উভয় পার্শ্বে দুইটী শুঁড় ও পক্ষোপরি ছিট ছিট শ্বেতকৃষ্ণ চিহ্ন দেখা যায়। এই শ্রেণীর মশক গৃহভিত্তিতে কখনই সোজা হইয়া বসিতে পারে না—ইহারা বাঁকা ভাবেই বসে। ডাক্তার রস্ বলেন যে দেশে এনোফিলিস্ নাই, তথায় ম্যালেরিয়া নাই। যে কোন উপায়ে দেশ এনোফিলিস্ শূন্য করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়া শূন্য হইবে। এই কথার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। সে কালে কলিকাতায় বন, জঙ্গল, জলাভূমি ও মশকের বড়ই প্রাদুর্ভাব্ ছিল। "রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলিকাতায় আছি"—এই প্রচলিত বাক্য অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কলিকাতায় তখন জ্বরেরও একাধিপত্য। লোক ঐ জ্বরকে "পাকা জ্বর" বলিত। কোন কোন বৎসর বর্ষাকালে এই জ্বরে তথাকার

য়ুরোপীয় অধিবাসিবর্গের তিনভাগ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যে একভাগ জীবিত থাকিত, তাহারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রতি বৎসর ১৫ই অক্টোবর তারিখে একটী আনন্দ-ভোজের অনুষ্ঠান করিত। পূর্ব্বকালে আফ্রিকার কোন জনপদে ম্যালেরিয়ার অতি-শয় প্রাদুর্ভাব ছিল। অনেক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ কর্ম্মোপলক্ষে ঐ স্থানে গিয়া অল্পকাল মধ্যেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতেন। এইজন্য ঐ স্থানকে লোকে শ্বেত মনুষ্যের গোরস্থান বলিত। এক্ষণে তথায় ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, ঐ স্থানে আর মশক নাই। ১৮৯৫ হইতে ১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালয় উপদ্বীপে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব বিলক্ষণ ছিল। মশক ধ্বংসের ফলে সে স্থানেও ম্যালেরিয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। প্যানেমার অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখুন। একণা রেল রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য আফ্রিকা হইতে এক সহস্র নিগ্রো আনিয়া প্যানেমায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে তাহারা সকলেই জ্বররোগে ভবধাম পরিত্যাগ করে। আর একবার ঐ উদ্দেশ্যে তথায় এক সহস্র চীনবাসীকে পাঠান হইল। তাহারাও ছয় মাসের মধ্যে নিগ্রো-দিগের অনুগমন করিয়াছিল। এনোফিলিস্ শূন্য করিয়া ঐ স্থানের স্বাস্থ্য এখন অনেক ভাল হইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তথায় হাজার করা ৮ জন মাত্র ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া ছিল। প্যানেমাতে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে যে উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা এই :—

১। প্রত্যেক বাড়ীর একশত গজের মধ্যে এনোফিলিস্ জাতীয় মশকের ডিম পাড়িবার স্থানগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

২। বাড়ীর সান্নিধ্যে যাহাতে মশককুল আশ্রয় লইতে না পারে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। যে সকল স্থানে মশক আশ্রয় লইতে পারে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৩। প্রত্যেক লোক বাড়ীর দরজা জানালা আয় নির্ম্মিত এক প্রকার চাল দ্বারা এরূপ-ভাবে আবদ্ধ করিয়াছিল, যাহাতে উহার মধ্যে মশক প্রবেশ করিতে না পারে

৪। মশকের ডিম পাড়িবার যে স্থানগুলি নষ্ট করা সম্ভব হয় নাই তথায় কেরোসিন্ তৈল বা মশকের ডিম নাশক অন্য কোন বিষপদার্থ মধ্যে মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইত।

আমাদের বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৪৫৩২ ৯২৪৭। তন্মধ্যে তথা হইতে প্রতি বৎসর এক জ্বর রোগে প্রায় নয় দশ লক্ষ লোক মহাপ্রস্থান করে। ম্যালেরিয়াই এখন একাকী সহস্র বদন হইয়া অবাধে আমাদিগকে গ্রাস-করিতেছে। আর আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বসিয়া আছি। দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিবেশী, আত্মীয়, স্বজনকে মৃত্যুর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া নিজেরা মনের সুখে প্রবাসেই কাল কাটাইতেছেন। বাঙ্গা-লার যে পল্লীগ্রাম একদিন তপোবন তুল্য মনে হইত, আজ তাহা প্রেত নিকেতন বলিয়া বোধ হয়। কেবল জন কয়েক অস্থিচর্ম্মসার ব্যক্তি গৃহ মধ্যে যন্ত্রণার বোঝা বহিয়া তথায় বিচরণ করিতেছে। পল্লীগ্রাম এখন নিস্তব্ধ, নিরানন্দ, ব্যাঘ্র ভল্লুকের বিহার স্থান। সে দৃশ্য দেখিলে মৃত কবির সেই শোকোচ্ছ্বাস মনে পড়ে,—

"কি দুর্দ্দশা! ছিল যথা বাসগৃহ শ্রেষ্ঠ কত
কোলাহলে মুখরিত মধুকর চক্রবত,

খানক'ত জীর্ণঘর রহিয়াছে সেথা আজি,
ঘিরিয়াছে চারিদিকে তৃণগুল্মবন রাজি !
ধনীর প্রাসাদ চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়েছে ভূমে,
মন্দির, প্রাচীর, স্তম্ভ সকলি মেদিনী চুমে !
ভাঙ্গিয়াছে বাঁধাঘাট, নিবিড় শৈবাল জল
করিয়াছে জলাশয় সমল পঙ্কিলতল !
জন যাতায়াত শূন্য পল্লীপথগুলি পাশে,
দু'ধারে ঘিরিছে বনে, বিকট কণ্টক হাসে !
যে হয়েছে কৃতবিদ্য, লভেছে সম্পদ বল
সেই করিয়াছে ভিটা স্বাপদ ভ্রমণ স্থল !"

যে ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালী যৌবনে বৃদ্ধ হইয়া অকালেই ভবসংসারের লীলাখেলা সাঙ্গ করিতেছে—যে ম্যালেরিয়ায় বঙ্গপল্লী শ্রীসম্পদ হারাইয়া উৎসন্নের পথে ধাবিত হইতেছে, আমরা চেষ্টা করিলে সেই মানব শত্রুকে অনায়াসেই দেশ হইতে বিদূরীত করিতে পারি। ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে পল্লীভবনে আসিয়া বাস করুন; মামলা-মোকর্দ্দমার সভাগুলি গ্রাম হইতে উঠাইয়া সেই স্থানে স্বাস্থ্য-সভা স্থাপিত করুন, সকলে সমবেত হইয়া নিজ নিজ বসত বাড়ীর নিকটস্থ মশকের আবাস-স্থান বন জঙ্গল পরিষ্কৃত করুন; বাসগৃহগুলি যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং উহাদের মধ্যে সমানভাবে বাতালোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করুন; বাড়ীর জল যাহাতে সহজেই নিকাশ হয়—বাড়ীর সান্নিধ্যে যাহাতে একবিন্দু জলও কোন স্থানে জমিতে না পারে, তদ্বিষয়ে খরদৃষ্টি রাখুন; খানা ডোবা ভরাট করিয়া ফেলুন; অসমর্থ হইলে মধ্যে মধ্যে তাহাতে কেরোসিন্ তৈল নিক্ষেপ করুন; রাত্রিকালে মশারি ব্যবহার করিয়া মশকের দংশন হইতে আত্মরক্ষা করুন; কূপের পানীয় জলের সংস্থান করুন, আর বাবুগিরির সাজ কামিজ কোট রুমাল-এসেন্সের বায় কমাইয়া তদর্থে পবিত্র ঘৃত দুগ্ধাদি পুষ্টিকর সামগ্রী আহার করিয়া আবার নব বলে বলীয়ান্ হউন। দেখিবেন ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য—কৃতান্তের অনুকম্পা—বঙ্গপল্লীতে আর অধিককাল থাকিবে না। হে বঙ্গীয় যুবকগণ! তোমরাই দেশের আশা ও ভরসাস্থল। দেশ উৎসন্ন যাইল বলিয়া বৃথা বসিয়া আর হা হুতাশ করিও না। সকলে একত্র হইয়া প্রাক্তন বিজ্ঞানানুমোদিত পন্থা অবলম্বন কর—স্বাস্থ্যবিধি মান্য কর। আবার পল্লীবাসীর পাণ্ডুবর্ণ আস্যে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠুক—আবার পল্লীজীবন শান্তিময় হউক।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

মধ্যবিত্তের অবস্থা ও তাহার প্রতিকার

দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। দুর্ভিক্ষের ও অন্নকষ্টের সময় ইহাদের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় আকার ধারণ করে। দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের ভিক্ষা করিয়া বা প্রকাশ্যে দান গ্রহণ করিয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করিবার পথ উন্মুক্ত আছে, কিন্তু দরিদ্র মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের সেইরূপ পন্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। তাহারা অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তবু প্রকাশ্যে সাধারণের দান গ্রহণ করিতে চাহিবে না। সুতরাং তাহাদের অভাব লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায়। ইহাদিগকে তাই বলিয়া কোনরূপ সাহায্য প্রদান করিতে হইলে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এ নিমিত্ত বিশ্বস্ত লোক দ্বারা গোপনে ইহাদিগের

অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সকল মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ইহাদিগকে অল্প সুদে ঋণ প্রদান করা। ইহাতে ঐ সকল ভদ্রলোক অন্যের নিকট হইতে দান গ্রহণ করার হীনতা হইতে মুক্ত থাকিবে; অপর দিকে যাহারা টাকা প্রদান করিবে তাহারাও একটা লাভে টাকা খাটাইতে পারিবে; তবে এখন প্রশ্ন এই টাকা পাওয়া যাইবে কোথায়? এ নিমিত্ত পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী ত্রিপুরা জেলার জমীদারদিগের উপরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিহিত রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে পশ্চিমবঙ্গের মহাজনদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া আপন আপন প্রজার মধ্যে তাহা লগ্নি করিতে পারেন। নিজ নিজ প্রজার নিকট টাকা লগ্নি করিলে উহা আদায় করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না। সুতরাং তাহারা নিরাপদে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আপন জমীদারীর দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের মহৎ উপকার সাধন করিতে পারেন। এই বিপদের সময় যদি তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে পতিত না হয়, তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্যে বিশেষ ত্রুটি হইয়াছে বলিতে হইবে। আশা করা যায়, তাঁহারা এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করিবেন।

ত্রিপুরা হিতৈষী

৩। পল্লী-প্রসঙ্গ

সোনার বাঙ্গালার সুফলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শস্যশ্যামলা তাল-তমাল-বনরাজিনীলা, সুখ-শান্তির চির লীলা-নিকেতন, সোনার পল্লীগ্রামগুলি যেন ক্রমশঃই ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই ধ্বংসের মুখ হইতে পল্লীগ্রামগুলিকে রক্ষা করিবার কি কোনই উপায় নাই? বাঙ্গালার সোনার পল্লীসমূহ কি এইরূপেই দিন দিন শ্মশান হইয়া যাইবে? পল্লীর দুঃখ-দুর্গতির কথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। পল্লীর করুণ কাহিনী লইয়া আমরা বহুবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি,—জানিনা, তাহাতে কয়জনের প্রাণ আর্দ্র হইয়াছে,—জানি না, তাহাতে কয়টী হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছে? সেকথা জানি, আর না জানি,—একথা নিশ্চয় জানি যে, পল্লীই বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার প্রাণ—পল্লীবাস উঠাইলে বাঙ্গালী বাঁচিবে না। পল্লী পরিত্যাগ করিয়া—পল্লীর প্রতি অমনোযোগী হইয়া—পল্লীলক্ষ্মীর প্রতি অযত্ন করিয়া বাঙ্গালী বস্তুতঃই আজ মনেপ্রাণে মজিতে বসিয়াছে। যদি বাঁচিতে হয়, বাঙ্গালীকে আবার পল্লীর সুখ-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। পল্লীর প্রতি অমনোযোগী হইয়াই বাঙ্গালীর আজ এই মহাদুর্দ্দশা! বাঙ্গালার এক একটী উন্নত পল্লী, ক্রমে কিরূপ শ্মশানের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে,—আজ পাঠক বর্গকে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থাদি স্বচক্ষে দর্শন এবং উহার অভাব অভিযোগ ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার জন্য আমরা আপাততঃ এ জেলার কতকগুলি পল্লী পরিভ্রমণের সংকল্প করিয়াছি। সঙ্কল্পানুযায়ী সম্প্রতি আমরা গোবরডাঙ্গা গ্রামে গমন করিয়াছিলাম। গোবরডাঙ্গায় প্রায় দুই দিন অবস্থানপূর্ব্বক আমরা উক্ত গ্রামের অবস্থাদি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং উক্ত গ্রামের অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি,—নিম্নে তাহাই পত্রস্থ করা হইল।

গোবরডাঙ্গা যমুনানদীতীরস্থ একটী প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামটী কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইলের ব্যবধান মাত্র। গ্রামটী দেখিলেই মনে হয়,—এক সময় উহা সর্ব্ব প্রকারেই সুখ-সমৃদ্ধির লীলা-নিকেতন বলিয়া পরিচিত ছিল কিন্তু ইদানীং সেই সুখ-সমৃদ্ধির আর বিশেষ কিছুই নাই। কেবল সেই সুখ সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ বুকে লইয়া গ্রামটী পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র। সুখের যাহা কিছু উপাদান,—গ্রামটীতে তাহার সকলই বর্ত্তমান আছে,—কিন্তু সুখের উপাদান সত্ত্বেও, লোকের মনে যেন সুখ নাই। নিদারুণ ম্যালেরিয়া লোকের সকল সুখেই বাদ সাধিয়াছে। গ্রামে রাশি রাশি ফুলের বাগান,—তাহাতে

অসংখ্য-অগণ্য আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল ও খেজুর গাছ, লতা পাতা ও জঙ্গলে পরিবেষ্টিত হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তাঘাটগুলিও একটী গ্রামের পক্ষে যতদূর সম্ভব, উৎকৃষ্ট। কিন্তু পথগুলি প্রায়শঃ নির্জ্জন। দুরন্ত ম্যালেরিয়া রাক্ষসী ক্রমেই গ্রামটীকে জনশূন্য করিয়া তুলিতেছে। গ্রামে অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে,—কিন্তু তাহার অধিকাংশই জলশূন্য, কোনটীতে জল যৎসামান্য যাহা আছে তাহাও পানের অযোগ্য এবং অব্যবহার্য্য। গ্রামটীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া যমুনা নদী প্রবাহিতা,—কিন্তু নদীটীর বর্ত্তমান অবস্থা যাহা দেখিলাম, তাহাতে উহাকে নদী না বলিয়া একটী ক্ষুদ্র খাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নদীতে স্রোত এক রকম নাই বলিলেও চলে। স্থানে স্থানে জলজ জঙ্গল ও লতাগুল্ম উৎপন্ন হইয়া নদীবক্ষ প্রায় আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। নদীবক্ষে যৎসামান্য জল। ফাল্গুন চৈত্র মাসে নদীর কোন কোন স্থান একেবারে শুষ্ক হইয়া মাঠের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। অথচ এই নদীর জলই সমস্ত গ্রামবাসীর পানাহার ও স্নানের একমাত্র সম্বল!

গ্রামটীতে রাজা না থাকিলেও রাজপ্রতিম দুই এক ঘর সম্ভ্রান্ত জমীদার আছেন। ইঁহাদের রাজপ্রাসাদতুল্য সুবৃহৎ অট্টালিকা ও উদ্যান বাটী প্রভৃতি আছে। রায় শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখার্জ্জি বাহাদুর এবং তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন মুখার্জ্জি প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ এক্ষণে গোবরডাঙ্গার জমীদার পদে সমাসীন আছেন। ইঁহারা বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক এবং সৎকার্য্যের চির উৎসাহদাতা। ইঁহারা আছেন বলিয়াই গ্রামটী মরিতে মরিতেও আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে। গোবরডাঙ্গার যে কোন সদনুষ্ঠানের মূলে ইঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি বিদ্যমান আছে। বলিতে গেলে ইঁহারাই এ গ্রামের প্রাণ স্বরূপ।

এ গ্রামের অন্যান্য প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই অতি পুরাতন পাকা গৃহ ও পাকা প্রাচীর দেখিলাম। কিন্তু অধিকাংশই জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায়। গ্রামে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বাস। কিন্তু অধিকাংশই এক্ষণে দরিদ্র। কেবল তাঁহাদের প্রাচীন ও জীর্ণ পাকা গৃহগুলি এবং ভগ্নপ্রাচীরসমূহ তাঁহাদের অতীত সৌভাগ্য-সমৃদ্ধির পরিচয় দান করিতেছে। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী দেখিলাম,—জনমানবশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে! শুনিলাম,—গৃহস্বামীরা চির সহরবাসী! কাজেই উহা এক্ষণে পশুপক্ষীর আবাসস্থলে পরিণত হইতে চলিয়াছে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রামটী এক সময়ে বেশ সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে একেবারেই যেন ধ্বংসোন্মুখ। গ্রামবাসীর চেহারা দেখিলেই মনে হয় ম্যালেরিয়া ক্রমশঃই যেন তাঁহাদিগকে অন্তঃসারশূন্য ও একেবারে অসার করিয়া ফেলিতেছে। কেবল ম্যালেরিয়াই যে সকল পল্লীর অবনতির কারণ, এমন কথাও বলা যায় না। এমন অনেক গ্রাম দেখা যায়, যেখানে ম্যালেরিয়া নাই অথচ সে সকল গ্রামও ধ্বংসের পথে অগ্রসর। ইহার কারণ পল্লীর প্রতি পল্লীবাসীর অমনোযোগ। যতদিন পর্য্যন্ত সহরের ভোগ-বিলাসিতার মোহমদিরায় আমরা আত্মহারা থাকিব, ততদিন আমাদের কল্যাণ নাই।

ভোগ-বিলাসিতা ত আমাদের সহিবে না। ত্যাগী ও বৈরাগীর আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত সন্তান আমরা,—আমাদের এ ভোগ সহিবে না। ভোগবিলাসিতায় আমাদের যথার্থ শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া অসম্ভব। ত্যাগের পথে বৈরাগ্যের পথেই আমাদের চলিতে হইবে। যতদিন আমরা একথা না বুঝিব ততদিন সহরের প্রতি আমাদের মোহমায়া ঘুচিবে না। যেদিন বুঝিব, ত্যাগই কল্যাণের পথ,—বৈরাগ্যই শান্তির পথ, সেদিন আবার পল্লীর প্রতি আমাদের মায়া হইবে। সেদিন আবার পল্লীর শ্রী ফিরিবে।

এই যে ভীষণ ম্যালেরিয়া রাক্ষসী গ্রামের পর গ্রাম, আজ একেবারে উজাড় করিয়া ফেলিতেছে, চেষ্টা করিলে এই রাক্ষসীর হাত হইতে আমরা কি অর্দ্ধেক লোককেও উদ্ধার করিতে পারি না? মানুষের অসাধ্য যে কর্ম্ম নাই। চেষ্টা বলে অসাধ্যকেও সুসাধ্য করা

যায়। গোবরডাঙ্গার কত ভদ্রলোকের বাসবাটীর চতুর্দ্দিক যে জঙ্গলাকীর্ণ দেখিলাম—কত বৃহৎ বাটীর আশে পাশে ম্যালেরিয়ার আকরস্থল দূষিত জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত যে ডোবা দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। চেষ্টা করিলে আমরা ইহার কি কোনই প্রতীকার করিতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। নিজের কার্য্য নিজে করার লজ্জার বিষয় আর কি আছে? কেবল গোবরডাঙ্গা সম্পর্কেই যে আমরা এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে। প্রায় প্রতি গ্রামেরই এই অবস্থা। আর প্রতি গ্রাম সম্পর্কেই আমাদের এই পরামর্শ। আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আমাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে—আমাদিগের কল্যাণের জন্য আমাদিগকেই চেষ্টিত হইতে হইবে,—আমাদিগের নিজকার্য্য আমাদিগের নিজ হস্তেই সম্পাদন করিতে হইবে। শক্তি সত্ত্বেও নিজের কার্য্যের জন্য যাহারা পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, তাহাদের মত হতভাগ্য আর নাই। নিজের কার্য্য নিজেরা করাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। আত্মশক্তির প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন না হইলে কোন জাতীরই কল্যাণ নাই। প্রতি পদে সরকার বাহাদুরের সাহায্য চাহিলে চলিবে না। যাহা নিজেরা পারিব, তাহা নিজেরাই করিব, এ প্রতিজ্ঞায় সকলকে আবদ্ধ হইয়া আজ আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। অন্যথা, আমাদের অবস্থোন্নতির আর উপায়ান্তর নাই।

অবশ্য এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা আমাদের আত্মশক্তির সাধ্যাতীত। কিন্তু একথা ঠিক যে পরস্পর ঐক্য ও আন্তরিকতা থাকিলে কোন কার্য্যই সংসারে অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

এই যে যমুনা নদী আজ মজিতে বসিয়াছে ইহার প্রতিকার কল্পে আমরা দেশবাসী আজ একমত ও একপ্রাণ হইয়া যদি সমবেত সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করি, তাহা হইলে, মনে হয় সে আবেদন কখনই অরণ্যরোদনে পর্য্যবসিত হয় না। রেলপথ হওয়ার পর হইতেই গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে যমুনার গতি মন্দীভূত হইয়াছে। যমুনার উপর দিয়া লৌহময় রেলবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে। যমুনার সে উদ্দাম গতি আজ আর নাই। যমুনা যেন আজ পাশবদ্ধা—মলিনা—কৃশা, যমুনার তীরে সেদিন বেড়াইতে গিয়া,—যমুনার দুই তীরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমাদের কবির সেই করুণ সঙ্গীত মনে পড়িল! মনে মনে গাহিলাম:—

"যমুনে,—এই কি তুমি সেই যমুনে, প্রবাহিনী,
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্তমণি।
কোথা সে সুনীল তনুর বেণু
মা যশোদা রোহিণী।
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি;
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী।—
ও যার মোহন স্বরে উজান ভরে
বইতে তুমি আপনি।
তোমার তটে তটে, তোমার ঘাটে ঘাটে
তোমার নিকটে কই সে ধনী!"

হায়! নদীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মনে বড়ই ক্লেশ হইল। নদী একসময়ে যে বেশ প্রশস্ত ছিল নদীর তীর দেখিলেই বর্ত্তমান সময়ে তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নদী যে শীঘ্রই মরিয়া বা মজিয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নদী মজিয়া গেলে গ্রামটী অচিরকাল মধ্যেই জনমানবশূন্য এক ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইবে। আমরা আজ এবিষয়ের প্রতীকারার্থ বিশেষভাবে আমাদের মহামান্য সরকার বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গোবরডাঙ্গা গ্রামে এক সময় প্রায় শতাধিক চিনির কারখানা ছিল। এই সকল কারখানায় শত শত লোক কাজ করিত। এ সকল কারখানায় এত চিনি প্রস্তুত হইত যে সে চিনি দেশ বিদেশে চালান দিয়া স্থানীয় ব্যবসায়িগণ লাভবান হইত। বৈদেশিক চিনি ব্যবসায়িগণের প্রতিযোগীতায় আজ সেই সকল কারখানার প্রায় সকলগুলিই বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা দুইটী মাত্র চিনির কারখানা এক্ষণে বিদ্যমান্ দেখিলাম। একটী কারখানার কাজ কর্ম্ম আপাততঃ বন্ধ আছে, —অপরটী "নঞ্জ্যৌ ন তদ্যৌ" হইয়া কোন-

রূপে টিকিয়া আছে মাত্র। কারখানার প্রাচীর পরিবেষ্টিত বৃহৎ বাটী, উহার বিভিন্ন প্রকোষ্ঠাদি, সুবৃহৎ উনুনসমূহ, উহার অভ্যন্তর ভাগ, এবং সাজ সরঞ্জামাদি দেখিয়া মনে হইল যে একসময় অতি সুশৃঙ্খলরূপে এইসকল কারখানা পরিচালিত হইত। গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী খাঁটুরা নামে একটী স্থান আছে। এস্থানে বহুসংখ্যক ধনী ব্যবসায়ীর বাস। ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া এই স্থানের অধিবাসিগণ ধনসম্পদে এক সময় বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন। এখনও এখানে ধনীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এস্থলেও আছে। খাঁটুরায় কিছুদিন হইল একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু লাইব্রেরীর অবস্থা এখন পর্য্যন্ত বিশেষ আশাপ্রদ নহে। পল্লীগ্রামে একটী লাইব্রেরীর যথেষ্ট আবশ্যকতা রহিয়াছে। আমরা আশা করি, খাঁটুরার ধন-সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে উক্ত লাইব্রেরী শীঘ্রই পুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস ভট্টাচার্য্য এবং স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক এবং সুলেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহোদয়দ্বয় গোবরডাঙ্গায় অবস্থানকালে আমাদের সুখ-সুবিধার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া এবং পরিদর্শন ও পরিভ্রমণ কার্য্যে বিশেষভাবে আমাদের সহায়তা করিয়া, আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

৪। আত্মনীতি

স্বরাষ্ট্রনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বড় বড় কথা ছাড়িয়া আমরা সময়ে সময়ে আমাদের পাঠকবৃন্দের মন নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করি। পল্লীগ্রামে আমার বাস, আমার ঘরগুলি সবই খড়ের, বাড়ীর অদূরে কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে, তাহা হইতে চাল ডাল ঘরে আসে, বাড়ীর বাগানে ফুল ফল তরকারী রহিয়াছে, পুকুরে প্রচুর মাছ আছে, গোয়ালে ৫।৭ টা গরু আছে, দুধ ঘি যথেষ্ট পাই। পরিবারে পিতা মাতা খুড়া খুড়ী ভাই ভগ্নী অনেক। তদুপরি আত্মীয়বন্ধুদের ঘটা। শক্তি অনুসারে খাটি, যাহা পাই তাহাতেই সকলে মিলিয়া মিশিয়া সংসার চালাইয়া যাই। আমাদের পল্লী জীবনের চিত্র প্রায়ই এইরূপ ছিল। আত্মশক্তিগুণে যদি কেহ প্রাধান্য লাভ করিতেন, তাঁহার সে প্রাধান্য দেশের বিবিধ সৎকর্ম্মে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রকাশ পাইত। সে প্রাধান্য শুধু নিজের বাসের জন্য সুরম্য সৌধ নির্ম্মাণে, গাড়ী ঘোড়ার দাপটে, পোষাক পরিচ্ছদের বাহারে আর শুধু নিজের ও নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যার বিলাস সম্ভোগে পর্য্যবসিত হইত না। এখন কি দেখিতেছেন? আমাদের যাহা কিছু শক্তি সাধনা শুধু নিজের ঐ কয়টির জন্যই। বিদেশী ভিন্ন জাতির নিকট যাহা দেখিলাম যাহা পড়িলাম যাহা শুনিলাম মনে করিতে লাগিলাম তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তেমনটি হওয়ার জন্য লালায়িত হইলাম। বিদেশীয়েরা যে যে উপায়ে অর্থোপার্জ্জন ও তাহার সম্ভোগ করে ক্রমে ক্রমে আমাদেরও দু'চার জন সেই সেই উপায়ে অর্থোপার্জ্জন ও সেই সেই প্রণালীতে তাহার সম্ভোগ আরম্ভ করিলাম। আমি যখন দেখিলাম যে অপর পল্লীর রামনাথের পুত্র এমএ, বিএল, পরে ডি, এল হইয়া খুব অর্থ রোজগার করিতেছেন, তাঁহার বাড়ী গাড়ী জুড়ি, জমিদারী হইয়াছে;—লোকে তাঁহাকে খুব জবরদস্ত লোক বলিতেছে। আমিও তাঁহার মত বড় লোক সাজিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম, যে কোনরূপে অর্থাগমের উপায় করত সহরে আসিয়া পাকা এমারত করিলাম, জাঁকালো সাজসজ্জা হইল, জুড়ি মটোর হাঁকাইতে লাগিলাম, বাড়ীতে রাত্রে বৈদ্যুতিক আলো ঝপ্ ঝপ্ করিতেছে, বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া চলিতেছে। নিজের পত্নী ও ছেলে মেয়েদের নিয়ে পরিপাটী আহারবিহারে দিন কাটিতেছে। আমার সুরম্য হর্ম্ম্যে পল্লীর আত্মীয় স্বজনের বা পাড়া প্রতিবেশীর হাট বসে না। পল্লীগ্রামের আমার সেই

জীবন, আর রাজধানীর এই জীবনে পার্থক্য কত হিসাব করুন।

শেষোক্ত প্রকারের জীবনযাত্রাই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ হইয়াছে। এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমরা কি হইতেছি তাহাই ভাবিবার বিষয়। এই আদর্শের অনুসরণে দেশের অনেক লোক গ্রাম ছাড়িয়া নগরে গিয়া বাস করিতেছেন; দীন হীন স্বজনগণের সংস্রব ত্যাগ করিয়া, নিজের পুত্র কন্যাদেরে বিদেশী আদর্শে গঠিত করিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহারা জগতের শ্রেষ্ঠ সুসভ্য লোক হইয়া উঠিতেছেন। এইরূপ সুসভ্যতার মূল্য কতটুকু তাহা বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এই উৎকট অনুকরণের প্রথম ফল দেশের দশের সহিত সম্পর্কত্যাগ; দ্বিতীয় ফল স্বকীয় চিরাগত আচার ধর্ম্ম বর্জ্জন; তৃতীয় ফল স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন। প্রথমটি বুঝিবার জন্য কাহাকেও কষ্ট করিতে হইবে না। প্রত্যেক পল্লীগ্রামের হিসাব লইয়া দেখুন যিনিই উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠেন, তিনিই গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যভোগের জন্য ছুটেন। পূর্ব্বে যিনি বিদ্যা বুদ্ধিবলে প্রধান হইতেন, তিনি স্বগ্রামের পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতেন, রাস্তাঘাটের উন্নতি করিতেন, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডে ও উৎসবে আত্মীয় স্বজনের ও প্রতিবেশীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। তাঁহা হইতে নানা জন নানা প্রকারে সাহায্য লাভ করিত। তদ্দ্বারা দশ জনের উপর তাঁহার প্রাধান্য স্থাপিত হইত। তিনি গ্রামের লোকের বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দিতেন বলিয়া সামান্য বাদ বিসম্বাদ বা স্বার্থসংঘর্ষ তুমুল যুদ্ধে পরিণত হইতে পারিত না। এক গ্রামের ঐরূপ এক প্রধান ব্যক্তির জীবদ্দশায় ৩০ বৎসরকালে ১০টী মামলাও হইয়াছিল না। আর তাঁহার মৃত্যুর পর ৫ বৎসরের মধ্যে ঐ গ্রামের লোকেরা শতাধিক মামলা করিয়াছে। উহার জীবনের প্রারম্ভে উচ্চপদস্থ ৩।৪ জন লোক গ্রামে ছিলেন, বর্ত্তমান যুগের গ্রাজুয়েট একজনও ছিলেন না। আর এইক্ষণ ২০।২৫ জন গ্রাজুয়েট, বিএল, উকীল প্রভৃতি আছেন। তখন একজন মাত্র বৈদেশিক সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া স্বগ্রাম স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতা নগরীর আশ্রয় লইয়াছিলেন, আজ গ্রামের শিক্ষিত উপার্জ্জনরত প্রায় সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং গ্রামবাসী জনসাধারণের যে কি দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বর্ত্তমান যুগকে সভ্যতার ও উন্নতির যুগ বলা হয়। প্রতি বৎসর শত শত গ্রাজুয়েট, আণ্ডার গ্রাজুয়েট সৃষ্টি হইতেছে, বাড়ীঘরে পোষাকে পরিচ্ছদে সকলেই কেমন সুন্দর সাজিতেছে; কে বড় কে ছোট জানিবার উপায় নাই। সুতরাং ধরিয়া লই সকলেই বড়, সকলেই উন্নত, সুসভ্য।

এই উন্নতি ও সভ্যতা আমাদেরে লইয়া কোথায় ছুটিয়াছে, আমরা কি পাইতেছি, কি হারাইতেছি, আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় শক্তি কতটুকু পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, আর কি পরিমাণ বিনষ্ট হইতেছে,—আমাদের প্রত্যেক ভবিষ্যৎ কর্ম্ম কোন্ দিকে ফলপ্রসূ হইবে, সংসারপ্রবিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির নিবিষ্টভাবে তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

জ্যোতিঃ

৫। "সাধের ঘুম ঘোর"

প্রভাতে অর্দ্ধজাগরণে শুনিতে পাইলাম, আমার গবাক্ষের নিম্ন দিয়া কে গাহিয়া চলিয়াছে "সাধের ঘুম ঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না!" সহসা তন্দ্রা বিদূরিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে যুগযুগান্তের স্মৃতি হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গেল। আমার হৃদয়রাজ্যে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে, কে যেন তখনও গাহিতেছিল, 'সাধের ঘুমঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না!'

ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদিগের এ ঘুমঘোর সহসা ভাঙ্গিবার নহে। আমরা যেন এক বিরাট অন্ধকারের মধ্যদিয়া কোন এক অজানিত অজ্ঞাত দেশে চলিয়াছি। এত আঘাতেও আমাদিগের চৈতন্য হইতেছে না।

বাঙ্গালার পল্লীভবন কম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিতেছে, "স্বরাজ চাই"; কিন্তু এ ধ্বনি

কি নূতন? ইহারও পূর্ব্বে একাধিকবার কি এই ধ্বনি শুনিতে পাই নাই? ঐ যে অনল ধংস সৌধাবলি মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, উহার পরাক্ষ প্রান্তে কিছুক্ষণের জন্য কাণ পাতিয়া থাক, শুনিতে পাইবে, নির্জ্জীব ইট পাথর ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে, "মহি ভুখাহুঁ।"

অন্যদিকে দৃষ্টিপাত কর, যেখানে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তাহার আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিতেছেন, যেখানে প্রতিনিয়ত মৃত্যু ও জীবনের সংগ্রাম চলিতেছে, সেখানে একবার পদার্পণ কর, স্থিরদৃষ্টে চতুর্দ্দিকের অবস্থাবলি চিন্তা কর, সেখানেও দেখিবে, এক অনাহুত "মহি ভুখা হুঁ" ধ্বনি পবিত্র গৃহাশ্রমের নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে।

তারপর সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরে দৃষ্টিপাত কর, সেখানেই দেখিবে, সেই 'মহি ভুখা হুঁ।'

বাস্তবিকই আমাদিগের এ অবস্থা সহজে ফিরিবার নহে। আমরা এখনও যদি আমাদিগের সনাতন প্রাচীন আদর্শ অবলম্বন করিতে না পারি, এখনও যদি প্রজ্জ্বলিত লালসবহ্নি বক্ষে ধারণ করিয়া অন্ধের ন্যায় ছুটিতে থাকি, তবে এই হৃদয়নিহিত প্রচ্ছন্ন বহ্নিই আমাদিগকে একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে।

আমাদিগের পিতৃপুরুষের সুচিরার্জ্জিত প্রধান সম্পত্তি "সন্তোষ" আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আজ কয়দিন হইল বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধদিবস চলিয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর কি ছিলেন। সেই তালতলার চটি আর উড়ানী যাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল, দেশের লাট বেলাট একদিন তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। আজ আমরা চটি চাদর বর্জ্জন করিয়াছি, আমাদিগের সুট না হইলে চলে না! কিন্তু এই সুট পরিয়াও বিদ্যাসাগরের পদধূলি লাভের যোগ্য হইয়াছি কি?

কেহ বলিবেন, রাজদরবারে রাজ পরিচ্ছদ না হইলে চলিবে কেন? স্বীকার করিলাম, কিন্তু গৃহে আমরা কয়জন "রাজা নবকৃষ্ণের" ন্যায় আটহাতি ধুতি পরিয়া থাকি? 'অর্থাভাব! অর্থাভাব!! দারুণ অর্থাভাব!!!' 'মহি ভুখা হুঁ' আমরা ইতস্ততঃ কেবল এই আলোময়ী ধ্বনি করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কি উপায়ে এই অর্থাভাব দূর হইতে পারে তাহা কি চিন্তা করিতেছি? আমরা নিজের দোষ পরের স্কন্ধে চাপাইতে চাই, হীরা বলিয়া কাঁচে তুলিয়া লই। আমাদিগের দুঃখ হইবে না? আমরা দুর্ভিক্ষে মরিব না? যদি তাহাই না হইবে, তবে কি করিয়া যুগযুগান্ত সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে!

জার্ম্মাণি আসিয়া আমাকে বলে না, 'ওগো এই ডিটমারের আলোটা কিনিয়া তোমার গৃহের শোভা বর্দ্ধন কর।' কিন্তু আমার ত ডিটমার না হইলে চলে না! ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমার পিতৃপুরুষ, যাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে জগতে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ঘরে কয়টা ডিটমার ছিল? কুম্ভকারের মৃত্তিকানির্ম্মিত ধীপাধার ও ধীপ কে বর্জ্জন করিল? ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমার পিতৃপুরুষ এই ডিমটারের আলো না হইলেও জ্ঞান বিজ্ঞানে, তত্ত্বোদর্শনে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে আমার অপেক্ষা কত উন্নত ছিলেন?

একজন ইউরোপীয়ের ক্ষুদ্র গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে গৃহের প্রতি ক্ষুদ্র অংশটুকু কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সিন্দুরবিন্দুকণা পড়িলে তখনই তুলিয়া লওয়া যায়। প্রত্যেক জিনিষ যথাস্থানে সুবিন্যস্ত, যেন শৃঙ্খলা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। আর তোমার স্বগৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমার গৃহপ্রাঙ্গণের অপরিচ্ছন্নতার বিষয়, তোমার গৃহের, তোমার বাক্যের, তোমার কার্য্যের উশৃঙ্খলতার চিন্তা কর। তারপর ভাবিয়া দেখ তুমি তোমার প্রতিবেশী ইউরোপীয়ের অপেক্ষা আপনাকে অধিকতর গৌরবান্বিত মনে করিতে পার কিনা? একদিন তোমার পল্লীভবন এত বিলাস সম্ভারে অনাবশ্যকের তাড়নায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু তোমার জীবন ধারণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহারও ত অভাব হয় নাই। তুমি পাইতেছ পাশ্চাত্য সভ্যতা, কিন্তু হারাইতেছ তোমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আধ্যা-

স্থিক সম্পদ, দেবদ্বিজে ভক্তি, ভগবানে আত্ম-নির্ভর, দীনপ্রতিপালন স্পৃহা। তোমার স্বার্থের গণ্ডী উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট হইতেছে, কিন্তু তুমি ত কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছ না। সেই অনাহত "মযি ভুখা হুঁ" ধ্বনি তোমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

তোমার গৃহে অন্ন নাই কিন্তু বাজারে গিয়া তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ইলিশ মৎস্যটী ক্রয় করিয়া তোমার ঔদার্য্যের পরিচয় প্রদান করিলে—কারণ আজ তুমি তোমার বেতন পাইয়াছ, অথবা তোমার বালক গৃহে পদার্পণ করিয়াছে। আজ তুমি তোমার দীনতা ঢাকিয়া রাখিতে পার, কিন্তু একদিন না একদিন উহা ফুটিয়া উঠিবে—প্রকৃতি একদিন তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে।

আমরা মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছিয়াছি। যদি বাঁচিতে হয়, যদি এই 'মযি ভুখা হুঁ' ধ্বনি নিবারণ করিতে হয়, তবে একবার অতীতের সন্তোষরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, কি ছিল কি নাই, কিসে রক্ষা পাইব, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া তদনুসারে আমাদিগের জাতীয় জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, নচেৎ যুগ-যুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তর শেষে, সুখশয্যায় শয়ন করিয়া শুনিতে থাকিবে, "সাধের ঘুমঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না?"

সুরাজ

ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ পণ্য রপ্তানি বিষয়ে বাঙ্গালার কি ক্ষতি করিয়াছে।

বিগত বৎসর ইয়ুরোপে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় বাঙ্গালার বাণিজ্য কারবারে যে বিষম আঘাত লাগিয়াছে তাহার ফলে এদেশে অর্থাগম অনেক কম হইয়াছে। নানা প্রকারের বহু কাঁচা মাল বঙ্গদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে ইয়ুরোপের বাণিজ্যপ্রধান দেশ সমূহে প্রতি বৎসর রপ্তানি হয় এবং তাহাতে অনেকটা বাঙ্গালার আর্থিক পুষ্টি সাধিত হয়। বিগত বৎসর তৎপূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এদেশ হইতে বিদেশে মাল রপ্তানি অনেক কম হইয়াছে, সুতরাং অর্থলাভও কম হইয়াছে। ১৯১৪-১৫ সনের বঙ্গীয় নৌবাণিজ্যের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিম্নে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিতেছি, ১৯১৩-১৪ সনের তুলনায় ১৯১৪-১৫ সনে বঙ্গের পণ্য রপ্তানির কি পতন হইয়াছে এবং অর্থাগম কত কম হইয়াছে।

রপ্তানি করা মালের নাম	১৯১৩-১৪ সনে কত টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।	১৯১৪-১৫ সনে কত টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।
পাট নির্ম্মিত বস্ত্র	২৮১৯৯৫৭০২৲	২৫৭৭২৮৮১১৲
কাঁচা পাট	২৮০৯৯৩৪০৲	১১৮২৮৮৫০২৲
চা	৮৯৭৫৯৪৯৫৲	৫২০১১১৭৫৲
কাঁচা চামড়া	৮৩৩৫৬১১৫৲	৮৪৭৫৯৪৯৫৲
বীজ	৩৫৯০৭৬১০৲	৩৬২৬৯০২২৲
শস্য, কলাই, মটর	৬৮৫৬০৩৩০৲	৩৩২০১১২২৲
আফিং	২০১৩৭৯৬২৲	১৭৩৪৫৮৫৲
লাক্ষা	১৯১৪৬৪১৭৲	১৫৯৪০৯৮৩৲
কাঁচা কার্পাস	২০২০১৪৭২৲	১০৬৪১৪৮৫৲
নীল	১৭৭৪৮৭৯৲	৬৯৪৪৩৯৯৲
কয়লা, কোক কয়লা	৬৯১৩৪৩৬৲	৫২৭৮৮০৩৲
কাঁচা শন	৫৬৪০৭৪৯৲	৪৬৬৭৮৯৯৲

রপ্তানি করা মালের নাম	১৯১৩-১৪ সনে কত টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।	১৯১৪-১৫ সনে কত টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।
ধাতু	৫৯২৬৩৩১৲	৪১৭৪১৮৮৲
সোরা	২৯৯৪১৮০৲	৪১৪০৭৬২৲
তৈল	২২৬৬২৩৩৲	২৩৬১৪৪২৲
অভ্র	৩৪৫১৪৮১৲	২৩০৪২৭২৲
খৈল	৪২২৭৭৭১৲	২২৭৭৮৬৫৲
সার	৩৩৪১৯১২৲	২১০৯১১৯৲
রং করিবার জিনিষ (নীল ব্যতীত)	২৮৬১৭০৭৲	২০৯৬৫১৪৲
মসলা	৩৭১৯৬৮৲	৯৩০৪০৫৲
পাক দেওয়া কার্পাস	৩১১৫০৫৬৲	৮২৯৯১৭৲
পশম নির্ম্মিত দ্রব্য	১৩৫৪৩৩৫৲	৭০২২২০৲
ভেষজ পদার্থ	৯১৯১৭৮৲	৬৩২৮৪৪৲
গুড়ি কাছি	৬৯২৯২১৲	৬১৮৮৮০৲
কাঁচা রেশম	৯১৭১৪৮৲	৪৭৮৩০৩৲
নানা রকম মোম্	৫৫৭৯৩৪৲	৩৪৯৩২২৲
শিং	৪৬২৩৪৯৲	৩১৪৬৮২৲
পরিষ্কৃত চর্ম্ম	১১৯০৪৬৲	৩০৪৬১৯৲
তামাক	৩৭৬৪৮৭৲	২৫৮৯২৫৲
কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র	২০২৪৩৪৲	১১১৬৭৭৲
কাঠ, বুটী	২৮৭৯০৩৲	১০৩৯০৮৲
কাঁচা রবার	৮০৯৬৪৲	১৭৭৬৩৲
কাঁচা পশম	৫২০৲	৬১৩০৲

বিগত বৎসর মোট যে পরিমাণ দেশীয় মাল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার মূল্য তৎপূর্ব্ব বৎসরের রপ্তানি মালের মূল্যের তুলনায় শতকরা ২৭.৬৬ টাকা কম হইয়াছে। তবেই, গত বৎসর কলিকাতার বন্দর হইতে বিদেশে যে পণ্য রপ্তানি হইয়াছে তাহাতে তৎপূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে এক চতুর্থাংশেরও বেশী আয় কম হইয়াছে। ইয়ুরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় এদেশের চামড়া, কার্পাস, ধাতু, কয়লা প্রভৃতি মাল রপ্তানিতে বিস্তর ক্ষতি ঘটিয়াছে। তবে, যুদ্ধের ফলে কোন কোন মালের যে রপ্তানি আবার না বাড়িয়াছে এমনও নয়; চা, নীল, সোরা, এই সকল জিনিষের রপ্তানি বরং যুদ্ধ হেতু পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার কাষ্টম্ কলেক্টর-এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিগত বৎসর কাঁচা পাট, পাট নির্ম্মিত বস্ত্র, শস্য, ও আফিং এর রপ্তানি যে কম হইয়াছে তাহার সহিত যুদ্ধের কোন সংস্রব নাই।

বিশ্ব-বার্ত্তা

"চাই, চাই, মতিমান, দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া যায় !
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ !
মানুষের শক্তি লয়ে কীটসম ব্যর্থ কর তারে ?
বিধাতার পুণ্যদান—দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার ?
একি—একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত !
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি' । ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়—
দুয়ারে পাখীর মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি ?"

সপ্তম খণ্ড
সপ্তম বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩২২

পঞ্চম সংখ্যা।

আলোচনা

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন হইয়া গেল। দেশের চতুঃসীমা হইতে এ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা উঠিতেছে। কেহ ইহার স্বপক্ষে কেহ বা বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। সকলেই ধরিয়া লইতেছেন যে হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় একটী সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বপক্ষ ও বিপক্ষবাদিগণ অনেক-স্থলেই এই আদর্শ লইয়াই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপ আন্দোলনের একটী দোষ আছে। ইহার পর যখন কয়েক বৎসর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ চলিবে, তখন দেখা যাইবে যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলি অনেক অংশে পরিবর্ত্তিত, পরিত্যক্ত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সেসময় একটা কলরব উঠিবে যে হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় আদর্শচ্যুত হইয়া

পড়িতেছে। কিন্তু এইরূপ সমালোচনা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অবিচারপূর্ণ।

মানুষের আদর্শ দ্বিতিশীল নয়। কার্য্যের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শও বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এ কথাটী কোনও সমিতি বা সঙ্ঘের বিষয়ে বিশেষভাবে সত্য। যেখানেই একাধিক ব্যক্তির সম্মিলন সেখানেই মতভেদ অনিবার্য্য। এই মতভেদই সঙ্ঘের জীবনের লক্ষণ। কাজেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রাণবন্ত কার্য্যতৎপর জনসমূহের কার্য্য ও চিন্তার ফল হয় তবে আমরা ক্রমেই আশা করিব যে ইহার আদর্শ আশা ভরসা সমস্তই নূতন আকারে ফুটিয়া উঠিবে।

দেশের লোকের অনুষ্ঠিত কোনও একটী কাজ যদি কিছুদিনের জন্য পূর্ণ বেগে চলিতে না থাকে তবে অনেকেই "হা হতোস্মি" আরম্ভ করেন। এরূপ ব্যবহারের পরিচয় আমরা জাতীয় শিক্ষাপরিষৎদের সম্পর্কে পাইয়াছি। হয়ত এই "হা হতোস্মি"র ফলেই সমিতিবিশেষের মন্দীভূত কার্য্যক্ষমতা নিঃশেষ হইয়া আসে। কারণ বিদ্যালয় ও শিক্ষাসঙ্ঘ Bankএর মত জনসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় পরিপুষ্ট। Bankএর উপর লোকে সন্দিহান হইলে যেমন Bank ফেল পড়িতে পারে, বিদ্যালয় প্রভৃতিরও সেইরূপ দশা হইতে পারে। কাজেই সময় অসময়ে সম্যক বিবেচনা না করিয়া অযথা একটা অবিশ্বাসের ছায়া কোনও একটা সমিতি বা সঙ্ঘের উপর ফেলাটা নিতান্তই অনিষ্টজনক।

আমরা জনসাধারণের অনুষ্ঠিত শিক্ষাসঙ্ঘের পরিচয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে পাইয়াছি। এখন হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠাতৃগণের উচিত এই যে তাঁহারা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পথে যে যে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে যে যে কারণে পরিষদের কার্য্য-পরিসর সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা সম্যক্ অবধারণ পূর্ব্বক তদনুসারে নিজেদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করেন।

* *
*

২। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দুত্ব

একটা কথা উঠিয়াছে যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুত্বের প্রকাশ বিশেষ। এই হিন্দুত্বের অর্থ কি একথাটা কেহ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। অনেকের মনের ধারণা এই যে শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের বন্দোবস্ত করিয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্বনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবে। অনেকে আবার মনে করেন যে সকল শিক্ষার সহিত হিন্দুধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান ও সকল বিষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্বের অনুভূতি সাধন করিতে পারিলেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান সার্থক হইবে। অপর একদল আছেন তাঁহাদের ধারণা যে ভারতের প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা ও নানা বিষয়ে হিন্দু জাতির পুরাতন গৌরব-স্মৃতির পুনরুজ্জীবন—ইহাই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হিন্দু culture এর আলোচনাই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষত্ব হইবে। আমাদের মতে এ সকল মতের প্রত্যেকটীই অতিশয় সঙ্কীর্ণ। এ ভাবে দেখিলে হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অত্যন্ত খাটো করিয়া দেখা হয়।

হিন্দু cultureএর অনুশীলন বা হিন্দু ধর্ম্মসাহিত্য অধ্যয়ন যে কোনও বিদ্যালয়ে চলিতে পারে। ভারতবর্ষের বাহিরেও অনেকস্থলে

এ কাজ বিশেষ যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার জন্য ভারতে একটা নূতন বিদ্যালয় এত ধুমধাম করিয়া স্থাপন করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু নব স্থাপিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কেবল উল্লিখিত বিষয়গুলিতেই আবদ্ধ নহে; যদি হইত, তবে বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য বিদ্যানুশীলনের কোনও বিশেষ অর্থ থাকিত না। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়কে সার্থকনামা করিতে হইলে ইহাকে নূতন হিন্দুধর্ম্মের উৎস ও প্রতিষ্ঠানভূমি রূপে পূজা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে যে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে হিন্দু ধর্ম্মে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। যেমন পুরাকালের আরণ্য বিদ্যালয় হইতে আর্য্য ধর্ম্মের নানামুখী স্রোত সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল যেমন দ্রষ্টৃগণের জ্ঞানোজ্জ্বল দৃষ্টিতে জীবনের প্রতি তুচ্ছ অংশ, উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল আজ হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট হইতেও ভারত সেইরূপ নানামুখী চিন্তার স্রোত, সেইরূপ নির্ব্বিকল্প চিত্তের জ্ঞানধারা প্রত্যাশা করে। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় কেবল প্রত্নরত্নের কোষাগার নহে, ইহা হিন্দুত্বের নূতন জীবনের উৎস। এই জন্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সকল বিষয়গুলিই হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আলোচ্য বিষয়ীভূত হইয়াছে। যে হিন্দুত্ব আজ ভারত প্রত্যাশা করিয়া আছে তাহা কেবল একটা শাস্ত্রগত সূত্র নহে। নব হিন্দুত্ব একটী জীবনের ধারা। আমাদের সমাজের প্রত্যেক বিভাগে এই হিন্দুত্ব নূতন প্রেরণা নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিবে। এই হিন্দুত্ব হিন্দুকে জগতের মধ্যে কেবল একটা ব্যতিরেক বা Exception করিয়া ঘিরিয়া রাখিবে না। এই নূতন জীবন-ধারার স্রোত বিশ্ব-মানব-সাগরের মধ্যে যাইয়া পড়িবে ও এই জীবনের প্রেরণায় হিন্দু পৃথিবীর সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সঙ্গে বুঝা পড়া করিয়া লইবে—সকলের সমক্ষে নির্ভয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করিতে দণ্ডায়মান হইবে। যদি হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় এইরূপ একটী নূতন জীবনের ধারা সৃষ্টি করিতে পারে, যদি অচলতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া না ফেলে, তবেই হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম সার্থক হইবে।

* * *

৩। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দুর ঐক্য

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান উৎসবে ভারতের নানা প্রদেশের প্রতিনিধিসমূহ সমবেত হইয়াছিলেন। করদভূপতি বৃন্দ, শিক্ষানায়কগণ ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারির দল ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইতে বারাণসীতে একত্র হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার হইতে অনেকে বলিবেন যে বিশ্ববিদ্যালয়টীর মূলে একটী একতা, একটা fundamental unity রহিয়াছে। কাজেই মনে হইতে পারে যে বিদ্যালয় সঙ্ঘের কর্ম্মের গতি প্রতিহত হইবে সে সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে ঐকমত্য কাজের আরম্ভে বিদ্যমান থাকে তাহার উপর নির্ভর করা—অযৌক্তিক। কোনও কাজেই প্রথমের ঐক্য বজায় থাকে না। এটী কেবল ভাবের ঐক্য—জ্ঞানের ঐক্য নয়। সংসারের শত বিঘ্নের প্রতিঘাতে স্বার্থের বিরোধে নিরন্তরই ভাবের ঐক্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কঠোর সত্যের আঘাত সহ্য করিতে পারে এরূপ ভাব ও ভাবুক অতি বিরল। কাজেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানের পর নানারূপ বিরোধের মধ্য দিয়া যে একতার ভিত্তি স্থাপিত হয় তাহাই প্রকৃত একতা।

এই নিয়ম যে আমরা কেবল ব্যক্তি-সঙ্ঘের কার্য্যে দেখিতে পাই তাহা নহে। জাতি গঠনেও এই নিয়মেরই উদাহরণ দেখা যাইতেছে। জার্ম্মাণী ও আমেরিকা এ বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই দুই দেশেই কতকগুলি প্রদেশের সংযোগের ফল। এই সংযোগ-সাধন একদিনে হয় নাই। আমেরিকা যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন বিভিন্ন states গুলির একটা ঐক্য ছিল বটে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই আবার বিরুদ্ধ মত জাগিয়া উঠিল। War of Independence হইতে Civil War এর পর পর্য্যন্ত এই প্রায় একশত বর্ষ ব্যাপিয়া যুক্তরাজ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হইল। Germanyতেও সেই zolleverein এর দিন হইতে ১৮৭০ এর পর পর্য্যন্ত রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ঐক্যের আদর্শ প্রচার করিতে হইয়াছে। এইরূপে ঐকমত্য স্থাপন বিরোধের মধ্য দিয়া বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াই সম্ভব। কাজেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও আমরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম আশা করিতে পারি না। আজকাল জননায়কগণ একভাবের ভাবুক হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাই বলিয়া তাঁহাদের যে মতদ্বৈধ হইবে না তাহা নয়। অনেক বিরোধ হইবে, অনেক দলাদলি হইবে। আমরা যদি তাহা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ লইয়া অগ্রসর হইতে পারি, যদি বিরোধ সত্ত্বেও আদর্শ সৃষ্টির পথে চলিতে পারি তবেই ঐক্য স্থাপন সম্ভব।

৪। বঙ্গসাহিত্যে দুর্ব্বলতা

বহুদিন পূর্ব্বে আমরা বঙ্গসাহিত্যে কাঠিন্য ধর্ম্ম কামনা করিয়া কতকগুলি কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি যাদের নব্যভারতে 'বঙ্গসাহিত্যে কলঙ্করেখা' নামক প্রবন্ধেও অনেকটা সেই ধরণের কথা বলা হইয়াছে। লেখক বলেন "বর্ত্তমান যুগের বঙ্গ সাহিত্য পড়িয়া মনে হয়, বঙ্গ সাহিত্য বুঝি কোন মেরুদণ্ডহীন ভাবসর্ব্বস্ব মধুলেহী জাতির প্রেম গুঞ্জন। পাশ্চাত্য দেশের ছায়াবলম্বনে গঠিত হইলেও বঙ্গ সাহিত্যে কর্ম্মনিপুণতা, দৃঢ়তা, স্থির-প্রতিজ্ঞতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের আদর্শ আমরা দেখিতে পাই না। নায়িকার প্রেম বিহ্বল আত্মহারা নায়ক নিজ সুখ দুঃখের আবর্ত্তে ভ্রান্ত। প্রেম কর্ম্মশক্তিতে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়া কর্ম্মকুশলতা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেয়! পুষ্প অপেক্ষাও কোমল হইলেও স্থান বিশেষে প্রেম বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। শত সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরস্পরের ঈপ্সিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেমের সাফল্য। ভবভূতি উত্তর রামচরিতে রামচন্দ্রের প্রেমপূর্ণ চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো বা বিজ্ঞাতুমর্হতি।" বাস্তবিক প্রেমের এই কঠোর এবং মৃদু মধুরমূর্ত্তি একান্ত স্বাভাবিক; কিন্তু বর্ত্তমানে সাহিত্যে আমরা প্রেমের কঠোর এবং অবিশ্রামমূর্ত্তি দেখিতে পাই না। যে উৎকট কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা সমগ্র জাতীর জীবনের জীবনীস্বরূপ, যাহার ক্ষণিক স্ফুরণে ক্ষণপ্রভার হাস্যের ন্যায় দ্যুলোক এবং ভূলোক চমকিত করিয়া থাকে; বঙ্গ সাহিত্যে তাহার স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই না।"

কিন্তু সাহিত্যের এই দুর্ব্বলতা লেখক কেবল সাহিত্যিকদিগের ঘাড়েই চাপাইয়াছেন, আমাদের মনে হয় সাহিত্যিকদিগের দোষেই যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা নহে, ইহার জন্য বাঙ্গালী সমাজই দায়ী। বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র ও

জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহা হইতে কিঞ্চিৎ তুলিয়া দিয়াই এই কথাটা পরিষ্কার করিতেছি,—"তোমরা যদি বাঙ্গালা সাহিত্যকে বড় করিতে চাও, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া তোল। বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া যদি সকল ভাব প্রকাশ করিতে চাও, সকল কথা বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বাঙ্গালার সমাজকে সকল বিষয়ে গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা কর, বাঙ্গালার লোকগুলিকে দূরদর্শী, প্রশস্তহৃদয় ও চরিত্রবান্ করিবার আয়োজন কর। যদি বাঙ্গালীর সাহিত্যকে বিশাল ও বিপুল বিস্তৃত দেখিতে চাও, তাহা হইলে নানা উপায়ে বাঙ্গালা দেশটাকে মানব-সমাজে পূজ্য বরেণ্য মহনীয় করিয়া তোল। বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হউক, বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্য বাড়িয়া উঠুক, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য মানবজাতির সারস্বতক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। বাঙ্গালার সমাজ হইতে ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কথা, স্বার্থের কথা, নীচাশয়তার কথা দূর করিয়া দাও। তাহার পরিবর্ত্তে অসাধারণ চিন্তা, অসামান্য আলোচনা, অনন্ত কর্ম্মের কথা, অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টা, অসীম প্রেম ও অফুরন্ত জ্ঞানের কথা বাঙ্গালার জনগণের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে স্থান পাউক। বাঙ্গালার জেলায় জেলায় পঞ্চনদের কথা, মহারাষ্ট্রের কথা, দ্রাবিড়ের কথা, সিংহলের কথা আলোচিত হউক। পঞ্চনদের জেলায় জেলায়, দ্রাবিড়ের অঞ্চলে অঞ্চলে, সিংহলের নগরে নগরে বাঙ্গালার অনুষ্ঠান, বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালার ইতিহাস-কথা, বাঙ্গালীর শিল্পনৈপুণ্য, বাঙ্গালীর কাজকর্ম্ম আলোচিত হউক। বাঙ্গালার বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে চীনের সাহিত্য, জাপানের শিল্প, আমেরিকার ব্যবসায়, ইউরোপের রাষ্ট্র বাঙ্গালী শিশু ও যুবকের প্রতিদিনকার শিক্ষণীয় বিষয় হউক। চীন-জাপানের বিদ্যামন্দিরে, বার্লিন হার্ভার্ড কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর রীতিনীতি বিভিন্ন দেশবাসীর পাঠ্য তালিকায় সন্নিবিষ্ট হউক। বাঙ্গালী দুঃসাধ্য কর্ম্ম আরম্ভ করুক, অসম্ভব সাধনায় নিযুক্ত হউক, বাঙ্গালী তাহার কর্ম্ম-রাজ্য বিস্তৃত করুক, বিশাল জগৎকে তাহার চিন্তার আয়ত্ত করুক, তাহা হইলে বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্মিলনগুলি সার্থক হইবে।"

* *
*

৫। কৃষি-সমস্যা

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

এই কথা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের দেশে ভদ্র-লোকে কৃষিকার্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ঐ কার্য্য যে ভদ্রলোকের উপযুক্ত হইতে পারে তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। পনের টাকা বেতনে পরের কার্য্যে ভদ্রসন্তান দ্বাদশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিবে তথাপি কৃষি-কার্য্যে মন দিতে পারিবে না।

ভদ্রলোকের কৃষি-কার্য্যে অবহেলার জন্য আমাদের সমাজ অনেকটা দায়ী। বাল্যকাল হইতে আমরা ঐ কার্য্যকে ঘৃণা করিতে শিখি। "লেখাপড়া শেখ নতুবা চাষ করে খেতে হবে" বাল্যকালে গুরুজনের এই তাড়না আজীবন মনে থাকে।

আমরা পরিশ্রমের মর্য্যাদা জানিনা। শারীরিক পরিশ্রম মাত্রকেই নিন্দার কার্য্য বিবেচনা করি। শ্রমজীবী লোক ভদ্র-সম্প্রদায় বহির্ভূত এইরূপ আমাদের ধারণা।

অন্যান্য সভ্যদেশে শ্রমজীবি-সম্প্রদায়কে সমাজের নিম্নস্থানে পড়িয়া থাকিতে হয় না ইংলণ্ডে এই সম্প্রদায় (Labour Party) রাজ্যের একটী প্রধান অঙ্গ। গবর্ণমেণ্টকে এই দলের মতামত মানিয়া চলিতে হয়।

হাউস্ অফ্ কমন্স (House of commons) নামক মহাসভায় শ্রমজীবিদলের নেতারা সভ্যপদ পাইয়া থাকেন। শ্রম মর্য্যাদা জ্ঞানের অভাব বশতঃই আমরা কৃষি-কার্য্যকে ঘৃণা করি। ইহাতে যে শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত বিদ্যা বা বুদ্ধির বিশেষ আবশ্যক ইহা আমরা ভাবি না।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে কৃষি-কার্য্যকে কেহ ঘৃণা করিত না। কোন কোন পণ্ডিত আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে অনুমান করেন যে যাঁহারা ভূমিকর্ষণ করিতেন তাঁহারাই আর্য্য নামে অভিহিত হন। রামায়ণে আমরা পাঠ করি যে রাজা জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবার সময় সীতাদেবীকে পাইয়াছিলেন।

কৃষি-কার্য্যে ভদ্রলোকের অনাসক্তির জন্য দেশে বিষম অপকার হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে উদ্ভিদ্ বিদ্যার গভীর গবেষণা হইতেছে, নব নব আবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা কৃষি-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে কিন্তু আমাদের দেশে বিংশতি-পুরুষ-পরম্পরা-প্রচলিত সেই হল ও কোদালি আজও প্রধান যন্ত্র। অন্যান্য দেশে বিবিধ প্রকার সার প্রয়োগে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে আর আমাদের দেশে প্রকৃতিপ্রদত্ত উর্ব্বরতা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। আমরা যাহাদের হস্তে চাষের ভার রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছি তাহাদের প্রত্যহ দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইবার সুস্থান নাই, উপযুক্ত পরিধেয় বস্ত্র কিনিবার উপায় নাই। কোন্ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইবে এ জ্ঞান ত দূরের কথা, বর্ণমালার সহিত পরিচয় পাইবার অবসর তাহারা পায় না। অতিবৃষ্টি হইলে দেশে জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত নাই, অনাবৃষ্টি হইলে জল দিবার আয়োজন সর্ব্বত্র নাই।

এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় মহাত্মা গোখ্‌লে কোন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—

"The exhaustion of the soil is fast proceeding, the cropping is becoming more and more inferior and the crop-yield per acre already the lowest in the world is declining still further." অর্থাৎ ভারতবর্ষে জমির উর্ব্বরতা শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস পাইতেছে। দিন দিন ফসল অধিক খারাপ হইতেছে। পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে প্রতি একরে কম পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। ঐ পরিমাণ আরও কমিয়া যাইতেছে।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার তাঁহার Economics of British India নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে প্রতি একরে মাত্র ১৩ বুশেল গম উৎপন্ন হয় কিন্তু ঠিক ঐ পরিমাণ জমিতে ক্যানাডায় ২২ বুশেল ও গ্রেটবিটনে ৩২ বুশেল গম হইয়া থাকে।

আমরা বিদ্যার কার্য্যকরী শক্তি প্রয়োগ করিতে জানি না। গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত কৃষিবিদ্যালয় খুলিয়াছেন সেখানে উপযুক্ত ছাত্র পাওয়া যাইতেছে না এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। যে সকল ছাত্র সেখানে শিক্ষালাভ করিতে যায় তাহাদের চাকরীর অনুসন্ধানই মুখ্য উদ্দেশ্য। মাননীয় মিষ্টার লি গত বিহার শিল্প সমিতির অধিবেশনে

এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"Institutions which provide an agricultural training in England and elsewhere have as students, the sons of landowners who wish to be suitably trained for the profession they intend to follow. In India most of the students are attracted to agricultural colleges for some government appointment and with no expectation of making use of their training in conducting agricultural operation অর্থাৎ ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে যে সমস্ত বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয় সেইখানে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া স্বতন্ত্র ব্যবসা করিবার জন্যই জমিদারের ছেলেরা যোগ দিয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষে অধিকাংশ ছাত্রই সরকারের অধীনে কর্ম্ম পাইবার জন্য কৃষি বিদ্যালয়ে যোগ দেয়।

মিষ্টার উল্‌ফ তাঁহার People's Banks নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে কৃষি কার্য্যের বিবিধ সুবিধা সত্ত্বেও এ বিষয়ে উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। সার না দিলেও এখানকার জমিতে প্রায় অন্যান্য দেশের সার দেওয়া জমির ন্যায় ফসল উৎপন্ন হয়। এ দেশে ভূমির যে উর্ব্বরতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে আজ পর্য্যন্ত তাহার বিকাশের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই।

মস্তিষ্ক ও অর্থের সাহায্য ব্যতীত কৃষি কার্য্যের উন্নতি অসম্ভব। শিক্ষিত ও ধনবান লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে সোনার ভারতে প্রকৃতই সোনা ফলিবে।

* *
*

৬। আমাদের ভবিষ্যৎ

আমাদের এটা ধারণা হইয়াছে এবং যথার্থ উপলব্ধিও করিয়াছি যে, কলকারখানার দ্বারা ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে যাইয়াই, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষণে ইউরোপে এই বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে। ইউরোপ ভোগের রাজ্যে বাস করিতেছে সত্য, কিন্তু আমাদের কথা ভাবিতে গেলেও নিতান্ত সহজ বলিয়া মনে হয় না। আমরা ইউরোপীয় ভাবে এতটা মোহিত হইয়াছি যে তাহা ছাড়া জীবন ধারণ করা কষ্টকর বলিয়া মনে করি। আমাদের এখনও ভোগের মাত্রা পূর্ণ হয় নাই। যদি আমাদের সমাজ প্রকৃতই ইউরোপীয় সভ্যতায় অভিভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কি হইবে? ইউরোপীয় রাজন্যবৃন্দ এখন কালশক্তির উপাসক। তাঁহারা সম্পূর্ণ তামসিক ভাব ছাড়াইতে না পারিলেও, রাজসিক ভাবে তরপুর হইয়া জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের জন্য ফিরিয়াছেন। এই যুদ্ধের দ্বারা, এই যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ ভাবে না হউক কতকাংশে, ইউরোপীয়েরা নূতনভাবে দেখা দিবেন বলিয়া ধারণা হয়। তখন হয়ত ইউরোপের সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ অথবা নবযুগ আরম্ভ হইবে। আমরা তামসিকতাকে পবিত্র সাত্ত্বিকতার নামে চালাইতেছি, উহাই আমাদের জাতীয় অনিষ্টের এক মহা কারণ। তামসিকভাব আমাদিগকে এতদূরে লইয়া গিয়াছে যে, আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না ভোগে বিপুল উদ্যমের প্রয়োজন হয় এবং সে উদ্যম জীবন-সংগ্রামে প্রকৃত চরিত্র পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করে।

সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, অল্প বিস্তর ভাবে ভোগের প্রয়োজন আছেই।

সেই ভোগকে যিনি নিজের ইচ্ছাধীন করিতে পারিবেন, তিনিই সত্ত্বরাজ্যে আগে পৌঁছিতে পারিবেন।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি আমাদের জাতীয় আদর্শ কাহা এখন ইউরোপীয় ভাবে মুগ্ধ, এবং আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছি যেখানে সত্ত্বগুণের কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না। আমরা দুই শিখরের মাঝখানে এমন জায়গায় দণ্ডায়মান যেখানে ইউরোপীয় কলকব্জার দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়াছি, ভোগে আকৃষ্ট হইয়াছি, কিন্তু ভোগ করিতে যে সুদৃঢ় অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহা আয়ত্ত করিতে পারি নাই।

আমাদের ভোগ এখন তামসিক কিন্তু ইহাতে রাজসিক ভাব না আনিলে ভোগেরও পরিপূর্ণতা হইবে না, সত্ত্বেরও কোন সন্ধান মিলিবে না। ভোগের রাজসিকতা যে কেবল সামরিকতার মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠে, ইহা কেহ মনে করিবেন না। উদ্যমেই রাজসিকতার সূচনা, তাই আমাদের নাই এবং সেই জন্যই ভোগেও আমরা বিড়ম্বিত হইতেছি।

লোক রাজসিক অবস্থায় প্রবেশ না করিলে সত্ত্বরাজ্যে পৌঁছিতে পারে না। ইউরোপের ক্ষাত্রবীর্য্য বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলে আমাদের তমসাচ্ছন্ন সমাজেও একটা পরিবর্ত্তন আসিতে পারে। বিংশশতাব্দী মানবজাতির পরিবর্ত্তনের চিত্র লইয়াই দেখা দিয়াছে। এই যুগে পরিবর্ত্তন এত বেশী হইতেছে, তাহার কারণ লোক কোনটী ছাড়িয়া কোনটী ধরিবে কোন্ পথে যাইয়া শান্তি পাইবে তাহার পথ পাইতেছে না। মানবজাতি চির শান্তির জন্য ব্যগ্র বলিয়াই তাহাকে দৈব দুর্দ্দশার চক্রে বারংবার প্রতিহত হইয়াও আপনার পথ বাহির করিয়া লইতে হয়। শান্তি পাইবার জন্যই ইউরোপীয় জাতি নিচয় আপনাকে বড় করিয়া আপন আপন শক্তি বুঝিয়া সমরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন—তাই আজ তাঁহারা মহাপ্রস্থানের পূর্ব্ব আয়োজন করিতেছেন। লোক ক্রমেই যেন শূন্যবাদের পাকে পড়িতেছে। এত বিদ্যা, এত যুক্তি, অসীম ক্ষমতা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তাঁহারা শান্তির রাস্তা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভগবানের মহিমা, জাতির গৌরব, আবিষ্কারকের পাণ্ডিত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারে কিন্তু তাহার একমাত্র লক্ষ্য শান্তির দিকেই।

ইউরোপের এই যুদ্ধের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের অধ্যায় বৃদ্ধি এবং ভৌগলিক বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। তাই দেখিতেছি ইউরোপীয় যুদ্ধের দ্বারা আমাদের সমাজেও নূতন রকমের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী এবং সেই পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্তে আমরা শুনিতে পাইব। "আমি নূতন নহি আমি পুরাতন আমি শুধু সেই বাক্যমাত্র।" যত দিন আমরাও একটা নূতন আশ্রয় পাই না ততদিন আমাদিগকেও শান্তির জন্য হাবুডুবু খাইতে হইবে।

৭। স্বদেশীর অদূরদর্শিতা

ভগবানের চক্রে কা'র ভাগ্য কি ভাবে ঘুরিতেছে কে বুঝিতে পারে। তবুও মানুষ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়াই সে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তান, এবং সময় বুঝিয়া মানুষের মধ্যেই অবতার বা আদর্শপুরুষ সমাজের নায়করূপে দেখা দেন। নায়ক-বিহীন সমাজ চলিতে পারে না। যেমন তেমন হইলেও একজন নায়ক চাইই।

আমরা সম্প্রতি জীবনধারণের এমনাবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, যেখানে চারিদিকেই শুধু অভাবের বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি—জটিল সমস্যা বর্ত্তমান। চারিদিকের ভীষণ সমস্যার মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া নিত্যব্যবহার্য্য কাগজ পেন্সিলের এতটা অভাব বোধ করিতেছি তাহা এই লেখনী সঞ্চালিত দেশে বেশী বলা অনাবশ্যক। প্রথমেই আমরা কোন জিনিষের অভাব বোধ করি নাই; কারণ জিনিষ দুষ্প্রাপ্য হইলেই মূল্য বৃদ্ধি হয়, পরে তাহার অভাব বোধ করি। আমরা তালপাতাতে লেখা পুঁথির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সভ্যতার সোপানে পদার্পণ করিতে না করিতেই তথা হইতে চ্যুত হইয়া পড়িতেছি। এ পতন হইতে রক্ষা পাওয়াও সহজ কথা নহে। কাগজ, পেন্সিল কালির অভাবে যদি লেখা পড়া ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেই। ব্রিটেনিয়া ও জার্ম্মাণীর সুলভপণ্য ব্যবহার করিবার সুযোগ আমরা আবার লাভ করিব; কিন্তু যদি যুদ্ধ আরও ২।৩ বৎসর চলে তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কি হইবে এখনই যেন সে আতঙ্ক আসিতেছে। কিছুদিন যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আন্দোলন করিয়াছিলাম তাহাতে নিরাশ হইয়াও যেন নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয়, যাহার অভাবে প্রাণের ভাব ফুটিয়া বাহির হয়, তাহাকে চাপিয়া রাখা যায় কতক্ষণ।

তাই ভাবিতেছি—এগার বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে 'বয়কট' বা বিদেশী বর্জ্জন করিয়াছিলাম, সেটা কি ব্রিটেনিয়া বা জার্ম্মাণীর কাঁচামাল (Raw material) পাওয়া যাইবে এই ভাবিয়া? তাহা না হইলে আমাদের যাঁহারা নায়ক তাঁহারা ইহার ব্যবস্থা করেন নাই কেন? তাঁহারা ভাবেন নাই কেন যে জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমাদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইবে? আমরা পণ্য সম্বন্ধে ইউরোপের ছোট বড় সকল দেশের কাছেই ঋণী। বহুদিন হইতেই শিক্ষিত-সম্প্রদায় জানিতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিদ্বয় ইহারাই এবং ইহাদের মধ্যে একটা সংঘর্ষণ উপস্থিত হইবে, তবে এতটা গড়াইবে এটা বোধ হয় ধারণা ছিল না। এই যুদ্ধের ছোটখাট ভূমিকা ইতঃপূর্ব্বে অনেকবারই দেখিয়াছি। এখন "রাজায় রাজায় লড়াই হয় উলু খড়োর প্রাণ যায়।" এই এগার বৎসর লিখিয়া পড়িয়া নানাভাবে লোকমতকে খণ্ডন করিয়া কাটাইয়াছি, আর যে কয়দিন যুদ্ধ চলে হা-হুতাশে কাটাইলেই বেশ শান্তি লাভ করা যাইবে।

আমরা নবীন উদ্যমে নবীনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশীর পূজা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা মন্ত্রপাঠ করিতেছিলাম সন্দিগ্ধ চিত্তে। যাঁহারা পুরোহিত ছিলেন তাঁহারা ঠিক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারেন নাই। তাই আজ আমরা কোথায় সফলকাম হইব, আর কোথায় দূরে অতিদূরে বিফলতার দিকে সরিয়া যাইতেছি। আমরা ভারতের সাগরোপকূলে দাঁড়াইয়া বিদেশী দ্রব্যের আমদানী রপ্তানি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। এক পা ছিল ডাঙ্গায়, অন্য পা ছিল জলে। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, "দেশী জিনিষ পাইলে বিদেশী জিনিষ লইব না।" দেশী জিনিষ পাইবার উপায় করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করি নাই। যদি সেই সময় হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতাম তাহা হইলে আজ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের কৃপাকণার ভিখারী হইতাম না।

যুদ্ধ থামিয়া গেলে সন্ধির সঙ্গে সঙ্গেই গোলাগুলির পরিবর্ত্তে আবার বাণিজ্যার্থ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবে; কিন্তু আমাদের জোর করিবার মত আর কিছু রহিবে না। যদি কেহ এখনও বলেন এই দেড়শত বৎসরের লুপ্ত বাণিজ্য-শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে আরো দীর্ঘকালের প্রয়োজন। আমরা বলিব—আমাদের সর্ব্বনাশিনী ভ্রান্তি-ধারণাই সকল পতনের—এই মূঢ়তার কারণ। বিগত এগার বৎসরের মধ্যে আমাদের বাণিজ্য-সম্ভার পুনরুজ্জীবিত না হইলেও নিজেকে গুছাইয়া লইবার মত সাজ সরঞ্জাম জোগাড় করিতে পারিতাম। আমরা এখন যে ধাক্কা পাইব তাহা সাম্‌লাইতে যে কতকাল যাইবে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। "এ জাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।" বাঁচিয়া থাকিব বটে কিন্তু আধমরার মত। তবে কি আমাদের আর কোন আশাই নাই? আমাদের সমাজে কি তবে নায়কের মত নায়ক নাই?

* *
*

৮। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষাদান

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষাদানের প্রস্তাব চলিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সৈন্যগঠন করিবার নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আগামী জুনমাসের মধ্যে কর্ম্মচারী তৈয়ার করা অসম্ভব, কাজেই প্রস্তাবিত নিয়মানুসারে যতদূর সম্ভব কাজ চলিতে থাকিবে। ইহার দ্বারা সাধারণের মধ্যে সৈনিক-বৃত্তি জাগ্রত হইবে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার মাত্রা বুঝিতে পারিবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে কয়েকটী নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে আমরা তাহাই সাধারণকে দেখাইতেছি।

১। সৈন্যদিগকে দলবিভাগ হইয়া সপ্তাহে দুই ঘণ্টাকাল ড্রিল্ করিতে হইবে। শীত কালে হিমেনওয়ে জিমন্যাসিয়াম বা বেস্‌বল্ কেজ্ (Hemenway gymnasium or Baseball Cage) এর ভিতরে ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া কাজ করিতে হইবে। বায়ু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ড্রিলের সময় কমাইয়া অন্য কাজ করিতে হইবে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দলবদ্ধ সৈনিক-দিগের ছোট খাট রকমের রণকৌশলের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইবে। প্রত্যূষে ৭—৯টা এবং বিকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ড্রিলের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সুতরাং সামরিক সভ্যগণ নিজেদের সুবিধা বুঝিয়া ড্রিলের সময় ও দিন ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। কোন একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সৈনিক কর্ম্মচারীর উপর ড্রিল করাইবার ভার দেওয়া হইবে।

২। সৈনিক বিভাগের প্রত্যেক সভ্যকে প্লাট্‌স্‌বার্গ (Plattsburg) এ সৈনিক সমিতি দ্বারা পরিচালিত সংবাদ-বিভাগের সভ্য হইতে হইবে। প্রতিমাসের মানচিত্র ও রণসমস্যা মীমাংসা করাই এই বিভাগের কাজ। সংবাদ মাত্রেরই উত্তর সামরিক বিভাগে প্রেরিত হইবে। যদি সেখানে উহার বিষম ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হয় বা আরও কিছু বিশেষ জ্ঞাতব্য থাকে তাহা হইলে উহার সদুত্তর পরবর্ত্তী সমস্যাপ্রেরণের সময় পাঠাইতে হইবে।

৩। কেম্ব্রিজের কোন স্থানে সাব কেলিবার রাইফ্‌ল্ (Sub-calibre Rifles) বন্দুক দ্বারা বন্দুক শিক্ষার বন্দোবস্ত হইবে। অথবা নিকট বর্ত্তী কোন সেনানিবাসের নিকট স্থান লওয়া হইবে। প্রচুর পরিমাণ বন্দুক সংগৃহীত হইয়াছে।

৪। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৎসরের শেষার্দ্ধে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত,সমর-বিজ্ঞান পড়িতে হইবে। সমরবিভাগের কার্য্যপ্রণালীর এরূপ বন্দোবস্ত হইবে, যাহাতে কলেজের অন্য কোন শিক্ষার ব্যাঘাত না হয়। সমর বিভাগে শিক্ষাদানের ভার বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের উপর ন্যস্ত হইবে। রণবিজ্ঞানও এই পাঠ্যপ্রণালীরসহিত সন্নিবেশিত হইবে। যাহারা কোন একটী সৈনিক শিবিরে বা তদনুরূপ অন্য কোন সামরিক শিক্ষাশ্রেণীতে যোগদান করিবে তাহারাই শুধু সামরিক উপাধি পাইবে।

৫। সময়ে সময়ে আমেরিকার সামরিক ইতিহাস ও বর্ত্তমান সেনা সন্নিবেশ প্রণালী এবং অন্যান্য বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

৬। অন্যান্য সময়ে সামরিক পরিচ্ছদের কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু সকলকেই নিজের জন্য একটি করিয়া সামরিক পরিচ্ছদ রাখিতে হইবে।

সমরবিজ্ঞান শিক্ষার্থী ছাত্রগণ কিরূপ ভাবে পরিগৃহীত হইবে, তাহার একটি প্ল্যান সামরিকব্যাপারসম্বন্ধীয় ষ্টুডেণ্ট কাউন্সিল কমিটি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, যথা—

১। আমি আমার নাম, হার্ভার্ড সৈনিক বিভাগের তালিকাভুক্ত করিতেছি। বিশ্ব বিদ্যালয়ে আমার নির্ব্বাচিত পাঠ্যে অবহেলা না করিয়া সপ্তাহে তিন ঘণ্টা মৌখিক ও ব্যবহারিক সমর শিক্ষা পাইতে যত্নবান্ হইব। আমি আরও স্বীকার করিতেছি—ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্ সমর-বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত সমর সংবাদ বিভাগের জন্য প্রতিমাসে একখানি করিয়া মানচিত্র প্রস্তুত করিব এবং মানচিত্র বিষয়ক জটিল সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিব।

২। যতদিন পর্য্যন্ত সামরিক শিক্ষা পাইব এবং আমার নাম হার্ভার্ড সৈনিক বিভাগের তালিকা ভুক্ত থাকিবে ততদিন উর্দ্ধতন সৈনিক কর্ম্মচারীর আদেশ পালন করিব।

৩। আমি আরও বলিতেছি যে, যদি আমি কোন ড্রিলে বা সমর-শিক্ষা শ্রেণীতে উপস্থিত না হই তাহা হইলে উপযুক্ত কারণ দেখাইতে না পারিলে প্রথম অপরাধের জন্য বিনা আপত্তিতে, শৃঙ্খলা সমিতি (Disciplinary committee) আমার নাম সৈনিক বিভাগের পত্রিকায় লিখিয়া রাখিবেন এবং ঐরূপ দ্বিতীয় অপরাধের জন্য সৈনিক শ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইব; এবং আমার নামে মন্তব্য প্রকাশিত হইতে পারিবে।

৪। সৈনিক বিভাগে মনোযোগ দিতে এবং অন্যলোককে ১৯১৬ অব্দের গ্রীষ্ম হইতে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিতে আমি আমার সামর্থ্যের ত্রুটী দেখাইব না।

৫। এই সর্ত্তানুসারে ১৯১৬ অব্দের ৩১ এ মে পর্য্যন্ত আমার নাম তালিকাভুক্ত থাকিবে।

বৎসরের শেষার্দ্ধে সৈনিক বিভাগে বক্তৃতা প্রদানের বিষয় ও সংখ্যা—

১। সাধারণ সামরিক নীতি এবং সৈন্যের বৃদ্ধি ও পুষ্টি প্রণালী সম্বন্ধে ১টী বক্তৃতা দেওয়া হইবে।

২। পদাতিক সৈনিকদিগের নিমিত্ত ৪টী বক্তৃতা।

৩। গোলন্দাজী সৈন্যদিগের জন্য ৩টী।

৪। সামুদ্রিক গোলন্দাজী সেনার জন্য ৩টী বক্তৃতা দেওয়া হইবে।

৫। অশ্বারোহী সৈন্যদিগের জন্য ৩টী বক্তৃতা হইবে।

৬। বিভিন্ন শ্রেণীর সামরিক ইঞ্জিনিয়ারদিগের জন্য ৪টী বক্তৃতা।

৭। শারীরবিজ্ঞান এবং শিবির স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ১টী বক্তৃতা।

৮। সৈনিকদিগের সঙ্কেত এবং বায়ুযানে গমনাগমন বিষয়ক ২টী বক্তৃতা।

৯। জিনিষপত্র স্থানান্তর করণ ও সরবরাহ সম্বন্ধে ২টী বক্তৃতা।

১০। বৃহৎ গোলন্দাজীদিগের জন্য ১টী বক্তৃতা।

১১। যুদ্ধের জন্য সজ্জিত সৈন্যদিগের কর্ম্মচারি ও এঞ্জিনিয়ারগণ যেরূপ নিপুণ ভাবে গতিবিধি করে তাহা শিক্ষা দিবার জন্য ৬টী বক্তৃতা দেওয়া হইবে।

* * *

৯। স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা পূর্ব্বেও একবার মহারাষ্ট্রের সমাজ সেবক অধ্যাপক কার্ব্বের কথা বলিয়াছি। তিনি অক্লান্ত কর্ম্মী, অক্লান্ত ভাবে মহারাষ্ট্রদেশকে নানা উপায়ে সেবা করিতেছেন। মহারাষ্ট্রের 'নিষ্কাম কর্ম্মমঠ' ও 'হিন্দু বিধবা আশ্রম' তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। মহারাষ্ট্রের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার সেবা ও প্রীতির কাহিনী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি তিনি মহারাষ্ট্রে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ব্যাপকভাবে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। শুধু কথায় বা কল্পনায় তাঁহার চিন্তারাশিকে পুষ্ট করেন নাই। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যও প্রকাশিত করিয়াছেন। যথা—

(ক) মারাঠি ভাষার সাহায্যে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্ব্ব শিক্ষা-প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিশেষভাবে স্ত্রীপাঠোপযোগী পুস্তক সমূহ পাঠ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

(গ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের জন্য শিক্ষকদিগের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(ঘ) স্ত্রী শিক্ষার উপযোগী এই ধরণের অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি সেনেট সময়ে সময়ে যোগ করিয়া দিতে পারিবেন।

শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের কতটা সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা কার্য্যক্ষেত্রে না নামিলে বুঝা যায় না। নিজকে বাঁচাইয়া রাখিতে যাইয়াই নানা প্রকারে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ পাইয়াছে। হিন্দুর জ্ঞানবিজ্ঞান যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা কয়েকজন বিশেষজ্ঞের আলোচনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই, পরন্তু উহা যেখানে নিত্য ব্যবহৃত হইতে পারে, প্রতিমুহূর্ত্তে যেখানে পরীক্ষা করা সম্ভব সেই হিন্দুরমণীদের আলোচনার মধ্যেও স্থান পাইয়াছিল। সেই সকল আবিষ্কার আমাদের মাতৃজাতির মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই আজও হিন্দুর সংসারে তাহার কোন কোনটীর ব্যবহার দেখা যায়। আধুনিক সময়ে জ্ঞানরাজ্য যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছে, স্ত্রীজাতিও লেখাপড়ায় বেশ উন্নত হইতেছেন, কিন্তু আবিষ্কর্ত্তা বা তাঁহার সমশ্রেণী দুই একজন ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে না। আমাদের মাতৃজাতির মধ্যে সকলেই বিদুষী ছিলেন না কিন্তু শারীরবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির নিয়মাবলী ব্যবহারিকভাবে যথেষ্ট আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে সুবিধা হইয়াছিল এই, বিদ্যাশিক্ষা না করিয়াও নিজের সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিজের হাতেই ছিল। মা সন্তানের স্বাস্থ্য যতটা ভাল

বুঝেন, ডাক্তার কবিরাজগণ ততটা ধারণা করিতে পারেন না। ছেলের প্রাথমিক শিক্ষা মায়ের আঁচলের ধারেই হয়। মায়ের চরিত্রের ভালমন্দ সন্তানের চরিত্রে অনেকটা বর্ত্তিয়া থাকে। এজন্য সুশিক্ষিতা মাতা সমাজে একান্ত আবশ্যক। জগতের ইতিহাসে বীর চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদান মায়ের নিকট হইতেই প্রাপ্ত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে সুশিক্ষিতা মাতৃজাতি সন্তানের চরিত্রের উপর নিজেদের বিশেষত্ব ফুটাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা যেন একটা নূতন উপাদানে গঠিত হইতেছেন বলিয়া মনে হয়। সেই জন্যই অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীতে পৌরাণিক ও ধর্ম্মসাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষা দিতে চাহেন। তিনি আরও বলিতে চাহেন " আমরা তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিতা করিতে যাইয়া যেন তাঁহাদের মন হইতে ধর্ম্মভাবকে দূর করিয়া না দেই।" আমাদের সমাজ যতই কেন শিক্ষিত হউক না, রমণীদিগের সুশিক্ষার অভাবে যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তাশীল লোক পাইব না। আমাদের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিয়া যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে সেই দিকেই আমাদিগকে নজর রাখিতে হইবে। আমাদের সমাজের প্রকৃত সুর সেইখানেই। হিন্দুর পারিবারিক জীবন, হিন্দুর সাহিত্য, হিন্দুর প্রবাদকাহিনী গুলি তাঁহাদের নিকট পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে। মহাকালী পাঠশালা জাতীয়ত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। অধ্যাপক মহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীকে এই নিয়মে পরিচালিত করিবেন ইহাই আমাদের সমাজের আশার বিষয়।

১০। ম্যালেরিয়ার প্রাচীনতা

আমরা এতদিন জানিতাম ম্যালেরিয়া আধুনিক যুগের ব্যাধি। কিন্তু কবিরাজ ভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় "স্বাস্থ্যসমাচারে" লিখিয়া জানাইয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদেও এই ব্যাধির লক্ষণ পাওয়া যায়। যাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রাভিজ্ঞ তাঁহারা তাঁহার উদ্ধৃত বচন-প্রমাণের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। আজকাল ম্যালেরিয়াজ্বরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলেই ডাক্তারেরা রোগীর মাথায় শীতল জলের পটি বা বরফ দিতে বলিয়া থাকেন। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়েরা অধিকাংশস্থলেই এরূপ শৈত্য প্রয়োগ বড় পছন্দ করেন না। সেনগুপ্ত মহাশয় যে সব বচন উঠাইয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে এবম্বিধ শৈত্যপ্রয়োগ আধুনিক নহে—বহুকালের প্রাচীন। আমরা কবিরাজ মহাশয়ের কথাগুলি তুলিয়া দিতেছি :—

"ম্যালেরিয়ার নাম আমাদের দেশের সকলেই অবগত আছেন। ডাক্তার ও কবিরাজগণ সকলেই উক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া কি? তাহার লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদে কোন লক্ষণের সহিত সামঞ্জস্য হয় ইহাই আমার প্রধান বক্তব্য বিষয়—

ম্যালেরিয়া জ্বরটী আমাদের বিষম জ্বরের অন্তর্গত শীত-পূর্ব্ব-জ্বরের সঙ্গে যেন সামঞ্জস্য হয়।

ত্বক্স্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ
জনয়তোজ্বরে।
তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্ত মন্তে দাহং
করোতিচ॥
করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বক্স্থঃ
দাহ মতীবচ।
তস্মিন্ প্রশান্তে শ্বিতরৌ কুরুতঃ
শীত মন্ততঃ॥

অর্থাৎ দুষ্ট শ্লেষ্মা ও বায়ু অবরুদ্ধ (রসস্থ) হইলে প্রথমে শীত হয় পরে জ্বর হয়। শ্লেষ্মা ও বায়ুর বেগ প্রশান্ত হইলে দুষ্ট পিত্ত দাহ উৎপাদন করে, এবং দুষ্ট পিত্ত রসস্থ হইলে প্রথমে অত্যন্ত দাহ হয়। সেই পিত্ত প্রশমিত হইলে কফ ও বায়ু শেষে শীত উৎপাদন করে।

গাত্র বেদনা প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণ বায়ুর কর্তৃত্বহেতু উপস্থিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বেষু চ বিষম জ্বরেষ্ববশ্যম্ভাবী বায়ু :—যথাহ সুশ্রুতঃ—নর্ত্তেঽনিলাদ্ বৈ বিষমজ্বরঃ সমুপজায়তে। বায়ুর কর্তৃত্ব ভিন্ন বিষম জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে না।

উক্ত দাহাদি ও শীতাদি জ্বরের মধ্যে দাহ-পূর্ব্ব-জ্বর কষ্টসাধ্য ও কষ্টপ্রদ। শীতাদি অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জ্বর সুচিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া থাকে।

উত্তাপাধিক্যে কর্ত্তব্য—বাস্তবিকপক্ষে ম্যালেরিয়া জ্বরে যেরূপ সন্তাপের আধিক্য দেখা যায়, আমার বিশ্বাস আর কোনও জ্বরে প্রায় এরূপ হয় না। তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগী পাগলের ন্যায় হইয়া পড়ে, প্রলাপ বকিতে থাকে এবং ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অত্যধিক উত্তাপ দেখিলেই রোগীর সেই উত্তাপ হ্রাসের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে চেষ্টা করা সঙ্গত। এই উত্তাপ দীর্ঘ সময় থাকিলে নানা প্রকার উৎকট ও ভীষণ উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে এমন কি রোগীর জীবন নাশের খুব সম্ভাবনা, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। এই উত্তাপ হ্রাসের নিমিত্ত, মাথায় শীতল জলের পট্টি বা বরফ দেওয়া সঙ্গত। ইহাতে উত্তাপ হ্রাস না হইলে গরম জল দ্বারা রোগীর সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিলে ভাল হয়। পৃষ্ঠদেশের চামড়া খুব পুরু ও অনেক মাংসপেশী দ্বারা আবৃত থাকায় সহসা তাপ বাহির হইতে পারে না, সুতরাং পৃষ্ঠদেশ খুব ভাল করিয়া মুছাইয়া দেওয়া সঙ্গত।

সর্ব্বাপেক্ষা শীতল জল দ্বারা উত্তাপ হ্রাস করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। আমাদের দেশের সাধারণে এমন কি অনেক চিকিৎসক গাত্রে জল দিতে বড়ই ভয় পান। বাস্তবিক ভয়ের কোনই কারণ নাই।

আবশ্যক হইলে রোগীর গাত্র উত্তমরূপে ধৌত বা মর্দ্দন করিয়া দেওয়া সঙ্গত। ইহাতে শরীরের ভিতর হইতে গরম রক্ত চর্ম্মের উপরে আসিবে ও শীতল হইবে। উক্ত প্রক্রিয়ায় শরীরের যন্ত্রগুলির রক্তাধিক্য হ্রাস পায়, রোগীর সুনিদ্রা হয়, এবং অস্থিরতা দূর হওয়ায় রোগী বেশ আরাম বোধ করে। আয়ুর্ব্বেদে এরূপ অবস্থায় শৈত্য প্রয়োগ বা শীতল জল প্রদানের ব্যবস্থা নানাস্থানে দেখিতে পাই। যথা—

উত্তান সুপ্তস্য গভীর তাম্র,
কাংস্যাদি পাত্রং প্রণিধায় নাভৌ।
তত্রাম্বুধারা বহুলা পতন্তী,
নিহন্তি দাহং ত্বরিতং জ্বরঞ্চ॥

অর্থাৎ রোগীকে চীৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহার নাভিদেশে গভীর তাম্র কিম্বা কাঁসার পাত্র রাখিয়া তাহাতে শীতল জলের ধারা দিলে শীঘ্রই দাহ ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

অন্যত্র—কাঞ্জিকার্দ্রপটোনাবগুণ্ঠনং
দাহনাশনম্।

কাঞ্জি দ্বারা বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা রোগীর গাত্র ঢাকিয়া রাখিলে দাহ ও জ্বরের হ্রাস হয়।

অন্যত্র চরকে—

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্
সাবগাহনান্।
বিভজ্য শীতোষ্ণ কৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণ
জ্বরে ভিষক্ ॥
তৈ রাশু প্রশমং যাতি বহির্মার্গ
গতো জ্বরঃ।
লভন্তে সুখ মঙ্গানি বলংবর্ণশ্চ
বর্দ্ধতে ॥

অর্থাৎ চিকিৎসক জীর্ণ জ্বরে বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে শীতল বা উষ্ণ অভ্যঙ্গ প্রদেহ অথবা স্নেহযুক্ত অবগাহন ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ করিলে বহির্মার্গ গত জ্বরের শীঘ্র উপশম হইয়া থাকে এবং সমুদায় অঙ্গের সুখ, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কিরূপ জ্বরে কিরূপ অভ্যঙ্গ প্রদেহ ও পরিষেক করিবে তাহার প্রমাণ এই যথা, চরকে—

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ পরিষে-
কাংশ্চ কারয়েৎ।
যথাভিলাষং শীতোষ্ণং বিভজ্য
দ্বিবিধং জ্বরম্ ॥
সহস্র ধৌতং সর্পির্বা তৈলং বা
চন্দনাদিকম্।
দাহজ্বর প্রশমনং দদ্যাদভ্যঞ্জনং
ভিষক্ ॥

অর্থাৎ—উষ্ণজ্বরে শীতল অভ্যঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক এবং শীত জ্বরে উষ্ণ অভ্যঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক প্রয়োগ করিবে। সহস্র ধৌত ঘৃত কিম্বা চন্দনাদি তৈলের দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে দাহযুক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

ফলতঃ উক্ত উপায়ে উত্তাপাধিক্য জ্বর ছাড়াইবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। বলা-বাহুল্য আমার উদ্ধৃত মত কফ সংশ্লিষ্ট জ্বরের জন্য নয়।

পল্লীগ্রামে যে সমস্ত তথাকথিত কবিরাজ মহাশয়গণ আছেন, আমরা আশা করি, এই ধরণের আলোচনায় তাঁহাদের মনগড়া ব্যবস্থা-প্রণালীর অনেকটা সংস্কার সাধিত হইবে।

* * *

১১। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের জাগরণ

বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বঙ্গীয় বৌদ্ধগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আজকাল সকল সমাজেই একটা জীবনবত্তার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই সময়ে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজ যে পশ্চাৎপদ রহেন নাই, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। সম্প্রতি তাঁহাদের একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার নাম "বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা"। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই সমিতি গঠিত, তাহা সম্যক সাধিত হইলে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই দেশের একটি পুরাতন মৃতপ্রায় সমাজকে সকলদিকে পুনরুজ্জীবিত দেখিতে পাইব, বুঝিতে পারিব অতীত ও বর্ত্তমানকে বাঁধিবার জন্যই সেতুর মত এই সমাজের উদয় প্রযুক্ত হইয়াছে। নিম্নে আমরা এই সমিতির উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত করিতেছি। আমাদের মনে হয় কেহই এ উদ্দেশ্যকে মহনীয় মনে না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

(১) বঙ্গীয় বৌদ্ধের সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থার উন্নতিবিধান। (২) বৌদ্ধ বালক বালিকাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। (৩) বৌদ্ধনীতি এবং পালি ও

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি (৪) গয়া, কুশীনগর প্রভৃতি তীর্থযাত্রীদিগের পথে উপযুক্ত পরিচালক ও স্থানাভাবে সাতিশয় অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হয়, এই অসুবিধা দূরীকরণ। (৫) মানসিক ও নৈতিক উন্নতি-সাধন, উক্ত বিষয়ের অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয়, টোল, চতুষ্পাঠী স্থাপন। (৬) বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ ও পালি ভাষার প্রচার ইত্যাদি। (৭) জগজ্জ্যোতিঃ নামক মাসিক পত্রের প্রচার ও পরিচালন। (৮) যথোপযুক্ত স্থানে শাখা সমিতি, ধর্ম্মশালা ও বিহার স্থাপন। (৯) বৌদ্ধ ধর্ম্মমূলক আলোচনা ও বক্তৃতার জন্য সুবন্দোবস্ত। (১০) তীর্থযাত্রীদিগের যাতায়াত পথে ধর্ম্মশালা স্থাপন। (১১) দরিদ্র ও যোগ্য বৌদ্ধছাত্রগণকে অর্থ সাহায্য করা। (১২) ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় পালি সাহিত্যের অনুবাদ এবং পালিগ্রন্থ প্রচারের জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন। (১৩) গুণালঙ্কার লাইব্রেরী ও রূপান্তরণ ফ্রি ইনষ্টিটিউসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও পরিচালন (১৪) স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় ভাড়া বা সংগ্রহ। (১৫) সমান উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমিতির সহিত যোগদান। (১৬) সমিতির এক বা ততোঽধিক উদ্দেশ্যের জন্য দান গ্রহণ এবং (১৭) উপরোক্ত যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়োচিৎ কার্য্য করা।

ভারত লক্ষ্মী

(মালিনীছন্দে—সঙ্গীত)

জয় জয় অয়ি মাগো ভারত ক্ষেম লক্ষ্মী।
অগণন সুত রক্তে ও পদে রক্ত রক্তে
শত বুধ কবি ছন্দে পূজিছে লক্ষ ভক্তে,
তিরপিত চিত বন্দে, পুণ্য আশীষ বর্ষে
চরণ কমল গন্ধে মুগ্ধ এ চিত্ত মক্ষী।
জয় জয় অয়ি মাগো ভারত ক্ষেম লক্ষ্মী।

সুতগণ চির হাসে, তৃপ্ত যে নিত্য অন্নে,
তরণি নিকর ভাসে দৃপ্ত গো বিত্ত পণ্যে
তবু তুমি অতি দীনা কে কহে মত্ত গর্ব্বে?
নহ নহ তুমি হীনা চৌদিকে লক্ষ রক্ষী।
জয় জয় অয়ি মাগো ভারত ক্ষেম লক্ষ্মী।

সুগঠিত শত বর্ষে দেউলে শঙ্খ ঘণ্টা
সুললিত মধু হর্ষে ভারতী মুক্ত কণ্ঠা
ধরম করম হারা কে কহে তোরি পুত্রে?
পশু শিশু তরু বল্লী গায় যে তত্ত্ব পক্ষী।
জয় জয় অয়ি মাগো ভারত ক্ষেম লক্ষ্মী॥

শ্রীকালিদাস রায়।

ভবিষ্যতের মানবধর্ম্ম

এক কথায় ধর্ম্মের প্রকৃত সংজ্ঞা প্রদান করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। নানা লোক ও নানা জাতি যুগে যুগে মানবাত্মা, জীবন-প্রক্রিয়া, বিশ্বশক্তি এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা হৃদয়ঙ্গম করতঃ ধর্ম্মের বিচিত্র ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ক অনুভূতিসমূহ যতই বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী হউক না কেন, এই বৈচিত্র্য ও বিরোধের মধ্যে একটী সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্যের উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ দৃষ্ট হয়। ইহাকেই মূলভাবে ধর্ম্মের সাধারণ সংজ্ঞারূপে প্রদান করা যাইতে পারে। সত্যটি এই যে চিরকালই মানব এক ঐশী বা আধ্যাত্মিক শক্তির অস্তিত্বে ও উপকারিতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিয়াছে, এবং এই বিশ্বাস মানবপ্রকৃতির এক প্রকৃত অভাববোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যতদিন কোনও এক বিশেষ ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতির এই অভাব পূরণে সমর্থ হইয়াছে, ততদিন ইহা জীবিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, যখনই যে কোন ধর্ম্মানুশীলন এ অভাবমোচনে সমর্থ হয় নাই, তখনই ইহার শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়া মানব-সমাজ হইতে একবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে,—অথবা অন্য এক উচ্চতর ও অধিকতর শক্তিমান্ ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

কিন্তু সন্নীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের সমাজ ধর্ম্মের প্রকৃতি ও প্রসার অনুমান করিতে হইলে, আমাদিগকে অতীত ও বর্ত্তমান্ সমাজের ধর্ম্মাবস্থার সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচিত হইতে হইবে। আদিম সমাজের মানুষ স্বপ্নদৃষ্ট প্রেতাত্মার (animism) অস্তিত্বে ও শক্তিমত্তায় বিশ্বাসে কম্পিত এবং ইহার কুদৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত বহু অদ্ভুত প্রকারে ইহার পূজা করিত। শুধু তাহাই নয়,—ইহাদের অনেকে আবার দিবা দ্বিপ্রহরে ও ঘোর নিশীথে মাঠে, ঘাটে ও বনে অদ্ভুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট বহু ভূত প্রেতের সাক্ষাৎ-লাভ করিত। বালাকালে আমি বহুলোকের নিকট এরূপ শতাধিক গল্প শুনিয়াছি ও ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। অবশ্য নিজে একটীরও দর্শন লাভ করি নাই। কিন্তু এই প্রেতাত্মাগুলির অধিকাংশই অপকারী—উপকারী মাত্র দুই চারিটী। আমাদের দেশের পল্লীসমাজে, আমেরিকার আদিম অধিবাসী লাল-জাতির মধ্যে ও পৃথিবীর অন্যান্য অনেক নিম্নতর মানব-সমাজে এই প্রেতাত্মামূলক ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রভাব এখনও অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, য়ুরোপ ও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজে 'ভূতের গল্প' ও ঠিক এই প্রকারের প্রেতাত্মায় বিশ্বাস এখন অতীতের কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে এবং প্রাচ্য সমাজের লোকের নিকট কখনও কখনও উপহাসচ্ছলে ব্যক্ত হইয়া থাকে মাত্র।

মনের 'ঝোপঝা' কাটিয়া যাওয়ার জন্যই হউক বা অতীতলোকে অসমর্থ হওয়ার জন্যই হউক, কালক্রমে কতক কতক লোকের মনে

এই প্রেতাত্মার বিশ্বাসের বল ক্ষীণ হইয়া আসিল। কিন্তু দুর্ব্বল মানবচিত্ত তো একেবারে শূন্যে অবস্থান করিতে পারে না; সুতরাং আর এক প্রকারের ধর্ম্মভাব মানবান্তরে জাগ্রত হইয়া বিবিধ প্রকারে বাহ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এবার প্রকৃতির দীপ্তিমান্ প্রকাশগুলির (nature worship) প্রতি মানবচিত্ত আকৃষ্ট হইল। ভারতবর্ষের বৈদিক যুগের সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির উপাসনা এরূপ ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উপাসকগণ প্রকৃতির এই ঘটনাগুলির কোন কোনটীকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন এবং কোন কোনটীর স্রষ্টক ও পরিচালকরূপে কতিপয় দেবতার কল্পনা করিয়া লইয়া সশঙ্কচিত্তে তাহাদের আরাধনা করিতেন। এই পূজা ও আরাধনার মূলে বিশ্বশক্তির নিরপেক্ষ বোধ, স্বার্থসাধন ও অমঙ্গল হইতে নিষ্কৃতিলাভ—ত্রিবিধ ভাবই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ প্রকৃতিপূজকের সংখ্যা ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য দেশেও নিতান্ত বিরল নহে।

তারপর প্রতিমাপূজা (Idolatry)। শুনিতে পাই মানুষ প্রথমাবস্থায় নিরাকার ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ধারণা ও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না—পূজা করিবে কাহার? সুতরাং পণ্ডিতগণ নিজেদের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কল্পনা বলে মূর্খের ধর্ম্মপিপাসা নিবারণের জন্য নানা দেবদেবীর সৃষ্টি করিলেন। ত্রিতল গৃহের ছাদের উপর চড়িতে হইলে সোপান বহিয়া উঠিতে হয়। আমার কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কথা মনে পড়ে। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসকগণ বা উপনিষদ্‌কারগণের দ্বারা এত সাধ্যের অদ্ভুত মূর্ত্তিমান্ দেবদেবীর সৃষ্টি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। খুব সম্ভব, এই সমস্ত দেবদেবীর সৃষ্টি নিম্নস্তরের জাতিগণ কর্ত্তৃকই সম্পন্ন হইয়াছিল। মানব-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে এই বাক্যটীর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমাজধর্ম্ম ও পূজা পদ্ধতি আর্য্য অনার্য্যের অথবা সভ্যাসভ্যের মিশ্রণজাত—ইতিহাসের উপদেশ মানিতে হইলে এ কথাটীও মানিতে হইবে। উৎপত্তি যে স্থান হইতে ও যে প্রকারেই হউক না কেন, প্রতিমাপূজা ভারতীয় হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্তরেই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত ধর্ম্মানুশীলনের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের মানবসমাজে আমরা আরও বিশেষ বিবিধ ধর্ম্মবোধের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। একটী পার্থিব অভাবমূলক (Prudential religion) ও অপরটী আধ্যাত্মিক অভাবমূলক (Mystical religion). মানুষের পার্থিব জীবনের সুখ, সাচ্ছন্দ্য ও সংরক্ষণের বাসনা হইতে প্রথম প্রকারের ধর্ম্মবোধটি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক জড় ও প্রাণিজগতের পদার্থ-সমূহ ও শক্তিরাশির ব্যবহার দ্বারা মানুষ তাহার এই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে। ঋতুপরিবর্ত্তন, উদ্ভিদের বিকাশ বৃদ্ধি ও ফলোৎপাদন, জন্তুর খাদ্য ও সন্তানোৎপাদন, শস্যের বপন ও কর্ত্তন প্রভৃতি প্রকৃতির অধিকতর পরিচিত নিয়ম ও ক্রিয়াগুলি তাহার চিন্তা ও কর্ম্ম নিয়োজিত করিয়া থাকে। কাঠ, পাথর, লোহা প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়া তদ্দ্বারা কৃষির যন্ত্রাদি ও গৃহ নির্ম্মাণ করে। কিন্তু সব সময়ই মানুষ প্রকৃতির এই শক্তিরাশি ও উপকরণগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক চলিতে পারে না।

ইহাদের অনিশ্চিত ও অচিন্তিত ক্রিয়ায় অনেক সময় তাহার আশাভরসা নির্ম্মূল হইয়া যায়, তাহার স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। অনাবৃষ্টি তাহার শস্য নষ্ট করিয়া ফেলে, মহামারী তাহার পশুগৃহ শূন্য করিয়া দেয়। অগ্নি ও ঝড়ে তাহার বাসগৃহ ভস্মীভূত ও ভূমিসাৎ হইয়া যায়। এই প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক শক্তিরাশির নির্ম্মম ভ্রূকুটি হইতে পরিত্রাণলাভ পূর্ব্বক তাহার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা নিরাময় রাখিবার জন্য মানব স্বভাবতই এক দেবতার শরণাপন্ন হইয়া পড়ে। এই দেবতা অসভ্য জাতিগণের এক অবোধ্য ছায়াময় শক্তি বা অদ্ভুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট কোনও এক প্রাণী নয়, পরন্তু ইহা ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যযুক্ত মঙ্গলময় ভগবান্। যে ব্যক্তি এই শক্তিমান্ ভগবানের ইচ্ছা বা বিধানানুসারে কার্য্য করিবেন, তাহাকে তিনি সঙ্কটে বিপদে রক্ষা করিবেন ও ধনধান্যে ভূষিত করিয়া রাখিবেন। ভগবান্ কেবল শক্তিমান্ই নহেন, তিনি ন্যায়পরায়ণও বটেন, সুতরাং তিনি পাপীকে দণ্ডিত ও ধার্ম্মিককে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। সৎব্যক্তির পার্থিব সুখসাচ্ছন্দ্যভোগই ভগবানের পুরস্কার। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, ইহজগতে অবিশ্বাসী ও অসৎ ব্যক্তিও বিশ্বাসী ও সৎব্যক্তি অপেক্ষা বেশী সুখ ভোগ করিতেছে, তখন ভগবান পরজন্মে ইহার বিচার করিবেন—এই বিশ্বাসে সাধু ব্যক্তিগণ শান্তমনে দিন যাপন করেন। কিন্তু ভগবান্ ন্যায়পরায়ণই হউন বা মঙ্গলময়ই হউন, মানুষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ উভয়স্থলেই সমান।

তারপর আধ্যাত্মিক অভাবমূলক ধর্ম্মবোধ। মানুষের মধ্যে আদর্শ সৌন্দর্য্যবোধ ও অবিমিশ্রিত সত্যের জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা আত্মার উৎকর্ষসাধনের আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনের মূলেই তাহার আধ্যাত্মিক ধর্ম্মবোধের অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ পারিপার্শ্বিক জগৎ হইতে বহু আন্তরিক চেষ্টা দ্বারাও তাহার ন্যায্য বা স্বাভাবিক ফললাভে অনেক সময় বঞ্চিত হয়; তখন তাহার চিত্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। পার্থিব ধন, মান, যশঃ ও সুখের অনিশ্চয়তা ও অপ্রাপ্তিতে ক্ষুণ্ণ হইয়া সে স্বভাবতই অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে; কারণ এগুলি অচল ও নিশ্চিত এবং ইচ্ছা করিলেই সে ইহাদিগকে লাভ করিতে পারে। মানুষ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগৎকে হতাশকারী ও সারশূন্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া এক আধ্যাত্মিক জগতের কল্পনা করিতে এবং ইহাকে তাহার 'খাঁটি ঘর' বিবেচনা করিতে বাধ্য হয় কিন্তু কিছুদিন পরে এই কল্পিত আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তাহার বিশ্বাস অটল রাখা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্থূল জগৎ তাহাকে সর্ব্বদাই নিষ্পেষিত করিতেছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীতাতপ, জরামৃত্যু নিয়তই তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিতেছে। আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি ভরসা দৃঢ় রাখিবার জন্য মানুষ আবার এক ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়া পড়ে। এবার সে এমন এক দেবতার কল্পনা করিতে বাধ্য হয়, যিনি অতি প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তবতার উপলব্ধিতে সহায়তা করিতে পারেন। এ দেবতা নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল ও পবিত্র এবং জীব জগতের পাপ তাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এ হেন দেবতার ন্যায়বত্তা ও শক্তিমত্তা গুণদ্বয়ে এবার আর একটী গুণ যুক্ত হয়। সেটী

পবিত্রতা। তিনি মানবের কর্ম্ম ও চিন্তা-রাজ্যে সর্ব্বদাই অধিষ্ঠান করেন। কিন্তু মানুষ পার্থিব জঞ্জালের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার মঙ্গলময় অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং পার্থিবের সহিত অপার্থিবের সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক মানুষকে তাঁহার মঙ্গলময় অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একদল বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই বিশেষজ্ঞ, পুরোহিত, ধর্ম্মযাজক বা ধর্ম্মগুরু-গণের সাহায্যে মানুষ স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হয়—সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ পায়। এইরূপে সাংসারিক ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ স্বভাবতই "প্রতারণাময় মানব সমাজ" হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করে এবং পারলৌকিক সুখের আশায় ঐহিক জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টী যাপন করে।

অতীতকে ছাড়িয়া বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া আমরা উপরোক্ত সমস্ত ধর্ম্মানুশীলন-প্রণালীরই স্বতন্ত্র বা মিশ্রিত অস্তিত্ব দেখিতে পাই। এইমাত্র বিশেষ যে কোনও সমাজে একটীর প্রভাব বেশী, অপর কোন সমাজে অন্যটীর। অন্যান্য দেশাপেক্ষা ভারতবর্ষে এই স্বাতন্ত্র্য বা মিশ্রণের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এখানে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা—এমন কি নাস্তিকতা—পর্য্যন্ত প্রত্যেকটীরই অস্তিত্ব স্বতন্ত্র ও মিশ্রিত ভাবে বিদ্যমান্। পাশ্চাত্য সভ্য-সমাজে কেবল শেষোক্ত দুই প্রকারের ধর্ম্মানুশীলনই স্বতন্ত্র ও মিশ্রিতভাবে বিরাজমান্ দৃষ্ট হয়। অপরগুলির অস্তিত্ব একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু যে কেহই আধুনিক সভ্যসমাজের ইতিহাসের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত, তিনিই ইহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিবেন যে সভ্য ও শিক্ষিত মানবের নিকট, শেষোক্ত দ্বিবিধ ধর্ম্মানুশীলনও শক্তিশূন্য ও মূল্যহীন হইয়া আসিতেছে এবং প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক নির্ব্বাচনের নিয়মে সমীপ-ভবিষ্যতের মানব-সমাজ হইতে যে ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্ত হইবে, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

এই শক্তিশূন্যতা ও লোপপ্রাপ্তির কারণ ইহা নয় যে, যে যে অভাববোধ হইতে উক্ত দ্বিবিধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সেই অভাব এখন মানবসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য মানুষ পূর্ব্বাপেক্ষা এখন কম পরিশ্রম করে না, আধ্যাত্মিক সুখলাভের বাসনাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। লোপের কারণ হইতেছে যে, এই সমস্ত অভাব মোচনের জন্য মানুষ অন্যান্য অনেক অধিকতর ফলপ্রদ উপায় ও উপকরণ উদ্ভাবিত করিয়াছে। আধুনিক মানুষ প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জের হাত এড়াইবার জন্য ভগবানের সঙ্গে আর 'চুক্তি' না করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে বিশ্বশক্তির সহিত 'বোঝাপড়া' আরম্ভ করিয়াছে—পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান, উদ্ভাবনী শক্তি ও ব্যবহারিক জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। 'নৌকাডুবি' হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের বিধান বা পরিণাম-দর্শিতার ভরসায় 'চুপ' করিয়া না থাকিয়া বাষ্পীয় পোত, দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র ও তারহীন বার্ত্তাবহ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে ও কাতরস্বরে ঈশ্বর সমীপে কেবল প্রার্থনা না করিয়া বিবিধ জলসেচন প্রণালী বাহির করিতেছে। ওলাউঠা হইতে রক্ষা পাইবার

জন্ত 'রক্ষা কালী'র পূজার আয়োজন না করিয়া ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে যত্নপর হইতেছে এবং রোগকর বপুর অধিকার ও বিনাশের উপায় উদ্ভাবিত করিতেছে। আধ্যাত্মিক অভাবমোচনের জন্ত ছায়াবাদ বা মায়াবাদের অনুগত না হইয়া এবং সংসারিক ক্রিয়াকলাপ হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন না করিয়া, সংসার ও সমাজের মধ্যে থাকিয়াই এ সুখলাভের চেষ্টা করিতেছে—এবং বুঝিতেছে যে পরস্পরের যথাবিধি সম্বন্ধ ও সহানুভূতি দ্বারাই এই অভাব মোচিত হইতে পারে। এই প্রকারে আধুনিক মানবসমাজ এরূপভাবে তাহার ক্রিয়াকলাপ শৃঙ্খলিত ও পরিচালিত করিতেছে যে সকলের অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধনে নিয়োজিত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যসাধন কল্পে ইহা লোকশিক্ষা ও স্বাধীন মতপ্রচার প্রবর্ত্তন করিতেছে, অনুসন্ধিৎসায় ও উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান করিতেছে, শিল্পের উন্নয়নে ও স্বাস্থ্যকর ব্যায়ামচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেছে।

অতএব আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শিল্পে, বিজ্ঞানের প্রয়োগদ্বারা প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব, বিষয়ভাগে ও শিক্ষাবিধানে সমান সুযোগ প্রদান দ্বারা ব্যক্তির মর্য্যাদারক্ষা, শাসনকার্য্যে সাধারণতন্ত্রের অবলম্বন দ্বারা দেশের সাধারণ উন্নতি এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবিধ সামাজিক ক্রিয়াকলাপদ্বারা ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষসাধন—'ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ' রূপ এই চতুর্বর্গই আধুনিক মানব-সমাজের ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। আধুনিক ডেমোক্রেসি বা সাধারণতন্ত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা ইহারই নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ডেমোক্রেসির কার্য্য ও সাধনা; কারণ ডেমোক্রেসি কেবল সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও নিষ্কলঙ্ক সমাজসাম্যের আদর্শই নয়, অধিকন্তু ইহা মানব-সমাজের এক নির্দ্দিষ্ট অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। এই সামাজিক কার্য্য, সাধনা ও সম্বন্ধদ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বকীয় ক্ষমতার সহজ পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এই ডেমোক্রেসি কেবল একটী নির্দ্দিষ্ট আদর্শ বা কর্ত্তব্যই নয়, পরন্তু ইহা একটী নির্দ্দিষ্ট নীতি বা প্রণালীও বটে। জনগণের সমবেত কার্য্য ও অনুষ্ঠান দ্বারা মানবসমাজের পার্থিব সুখ ও প্রয়োজন বিধান ইহার আদর্শ সাধনের অন্যতম প্রণালী। সমাজে কোনও বিশেষ শ্রেণীর লোকগণ অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত জনগণের সুলভ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আয়াসে উপভোগ করিতে পারিবে না। এই সমবায়-মূলক বিজ্ঞান-শ্রম-শিল্পানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহাতে সকলে আধ্যাত্মিক সুখ উপভোগ করিতে পারে, তাহারও উপায়-সমূহ ডেমোক্রেসিই উদ্ভাবন করিবে। কোন শ্রেণীরই লোকগণ শ্রম হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন আলস্যসুখ ও আরাম-চিন্তা ভোগ করিবার অবকাশ পাইবে না। আধ্যাত্মিক সুখলাভের বাসনা সমাজ-জীবনের সাধারণ ও বিশেষ কর্ত্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়াই পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। ইহাই সর্ব্ববিধ সমাজধর্ম্মের মূল উৎস, কারণ বিজ্ঞান, শ্রম ও শিল্পবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাভজনক করিতে হইলে সমবায়-মূলক করিতে হয় এবং সমবায়-মূলক করিতে হইলে জনসাধারণের মধ্যে সহানুভূতি, সংযোগিতা ও সদ্ভাবের প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত প্রাথমিক সামাজিক গুণ হইতেই প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জগতের বৃত্তি গুণগুলি লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব আমরা

বুঝিতে পারিতেছি যে, অতীতের বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানগুলি যে সমস্ত অভাবমোচন করে আবির্ভূত হইয়াছিল, আধুনিককালে শ্রমে, শিল্পে, শিক্ষায় ও শাসনে সমান সুবিধাবাদ ও সাধারণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি তাহা অধিকতর যুক্তিযুক্ত, ফলপ্রদ ও প্রত্যক্ষভাবে পূরণ করিতেছে। সুতরাং ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে আধুনিক সমাজের কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানতপস্বী যাগ-যজ্ঞ-পূজা-পার্ব্বণ-মূলক ধর্ম্মের আসনে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে এই ডেমোক্রেসিকেই বসাইবে।

কিন্তু যদি নৈতিক উন্নতিসাধন ও পার্থিব সুখবিধান ব্যতীত মানবসমাজে ধর্ম্মের আর কোনও প্রয়োজন না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা সফলকাম হইয়া কালক্রমে মানব-সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইবে, অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত এমন কোনও অচিন্তিতপূর্ব্ব নূতন অভাবের আবির্ভাব না হয় যাহা বর্ত্তমানের বৈষয়িক, সামাজিক ও নৈতিক অনুষ্ঠানগুলি দ্বারা মোচিত হইতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত মানবসমাজে আর কোনও বিশেষ ধর্ম্মের প্রয়োজন থাকিবে না। এমন কোনও অভাবের আবির্ভাব হইয়াছে কি? অর্থাৎ লৌকিক ও নৈতিক অভাব মোচন করিয়া ডেমোক্রেসি এমন কোনও অভাবের সৃষ্টি করিয়াছে কি যাহা কেবল কোনও বিশুদ্ধ ধর্ম্মযোগ বা ধর্ম্মানুশীলন দ্বারাই মোচিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিতে গিয়াই আমরা ভবিষ্যতের মানবধর্ম্মের আভাষ পাইতেছি।

জীবজগতের বৈষম্য প্রকৃতির নিয়ম। ব্যক্তিগত শক্তির তারতম্যও প্রকৃতিগত কিন্তু ডেমোক্রেসিকে ব্যক্তিগত ক্ষমতার পুষ্টিসাধন করত এই বৈষম্যপূর্ণ সমাজে সাম্য, মৈত্রী ও জ্ঞান আনিতে হইলে কিরূপ শক্তি সঞ্চয় ও প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে? উত্তরে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা ও সুবৃহৎ সমাজজীবনের প্রতি ব্যক্তিগত জীবনের অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস। ব্যক্তিগত নৈতিক ক্ষমতার উৎকর্ষসাধন ও বিশ্বশক্তির পরিচালনার জন্য মানবজাতির মধ্যে যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন, তাহা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থের খর্ব্বতা সাধন দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। প্রাকৃতিক শক্তি করতলগত করিতে গিয়া মানব-সমাজ যে সমস্ত নূতন ক্ষমতা ও গুপ্ত তথ্যের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে কত সাধকেরই না স্বাস্থ্যনাশ ও জীবনপাত ঘটিয়াছে। রেলপথ নির্ম্মাণ, সেতুগঠন, খাল-কর্ত্তন, ব্যোমযান উদ্ভাবন প্রভৃতি মানবসমাজের অশেষ উপকারী কার্য্যগুলির জন্য কত কর্ম্মীই না প্রাণ-দান করিয়াছে। নূতন জীবাণুর (disease germ) আবিষ্কারে ও বিনাশে কত লোকই না স্বীয় জীবন বিপদাপন্ন করিয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতিসাধনেও কম জীবন ব্যয় হয় নাই। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্যের জীবনকাহিনী কে না জানে? অনেক সময় এই মহাত্মাগণের জীবন সঙ্কটাপন্ন না হইয়া থাকিলেও, ইঁহাদিগকে প্রাণের ন্যায় প্রিয় স্বকীয় জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং নিন্দা, অপযশ, ভ্রূকুটি ও গালাগালিও কম সহ্য করিতে হয় নাই।

সমাজজীবনের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে গিয়া এইরূপে অনেক মহাত্মাকেই দুঃখ, কষ্ট ও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, শক্তিমান্ ব্যক্তিগণ সমাজজীবনের উন্নতি ও

আদর্শ সাধনের জন্য কেন নিজ নিজ স্বার্থ, সুখ, সময় ও জীবন উৎসর্গ করিবে? একটী মাত্র কারণে এরূপ জীবনদান সম্ভব। সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হউক যে, ব্যক্তির চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী আত্মসুখ ও ক্ষুদ্র স্বার্থের বাহিরে আর একটী বৃহত্তর সমাজজীবন ও বিশ্বমানবের জগৎ রহিয়াছে, যাহা অধিকতর অচল, অমর ও মহান্। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে এতাদৃশ আত্মোৎসর্গে ব্যক্তির লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই; কারণ কেবল এই প্রকারেই মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্ত্তে বৃহত্তর স্বার্থ ও নীচতর জীবনের পরিবর্ত্তে উচ্চতর জীবনের সন্ধান পাইয়া থাকে—এইরূপেই মানুষ বিশ্বমানবের গৌরবময় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু এই 'জীবন গেলে জীবন পা'ব, হোক জনম সফল' বাক্যটীর সত্যতা ও মূল্য সব সময় 'দাঁড়ি-পাল্লা-বাটকারা' দ্বারা ওজন করা সম্ভব হইবে না—ন্যায়ের যুক্তিও পরাভব মানিবে। তথাপি ইহা মানবচিত্তের তীব্র উন্মাদনা ও প্রিয় আদর্শরূপে সমাজজীবনে টিকিয়া থাকিবেই এবং ধর্ম্মের প্রকৃত আসন অধিকার করিয়া যুগে যুগে সমাজজীবনকে দীপ্ত, গৌরবময় ও প্রভাবান্বিত করিবেই। এই ধর্ম্মবোধের উপরই ডেমক্রেসি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ডেমক্রেসি নিজে ইহা উৎপাদন করিতে পারে না। ইহা আত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম—জীবনের বিশিষ্ট লক্ষণ। 'সেচাকেনার' সমানুপাতে ইহাকে আনা যায় না। ডেমক্রেসি-সৃষ্ট আধুনিক মানবসমাজে ইহাই একটী নূতন অভাব এবং ধর্ম্মই এই অভাব পূরণে সমর্থ। সমাজজীবনের উচ্চতর সত্তা ও বাস্তবতার বিশ্বাস এবং সামাজিক কার্য্য ও আদর্শসাধন করে ব্যক্তিগত জীবনের উৎসর্গকে অতিপ্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রদান করা—ইহাই ভবিষ্যতের মানবধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের অসংখ্য সূক্ষ্ম নিয়মগুলি অনুমান করা আমাদের পক্ষে এখন একরূপ অসম্ভব—কেবল সংক্ষেপে ইহার কয়েকটী বিশেষত্ব প্রদান করা যাইতে পারে মাত্র।

প্রথমতঃ, এই বৃহত্তর সমাজজীবনের ঐকান্তিক সেবায় ব্যক্তিত্বের অমরত্ব উপলব্ধি এবং সমাজজীবনের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের একত্ববোধ। পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কারের জন্য মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণে, অর্থাৎ কর্ম্মমূলক জন্মান্তরবাদে আধুনিক মানুষ আর আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। বিশ্বমানবের উন্নয়ন বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বকীয় ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন উৎসৃষ্ট করিয়া যাঁহারা আত্মশক্তির উৎকর্ষসাধন ও অমরত্ব-উপলব্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আর কি উচ্চতর নৈতিক, ধর্ম্মবিষয়ক বা মানবীয় আদর্শ থাকিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, যে মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ নীরবে ও অম্লান বদনে বিশ্বমানবের উন্নয়নের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, মৃত্যুর পরেও যাঁহাদের আদর্শ সতত মানবজাতিকে ত্যাগ ও বীরত্ব শিক্ষা দিতেছে এবং যাঁহারা নিয়ন্তরে থাকিয়াও অম্লানবদনে ও বিশ্বস্তভাবে সামাজিক কর্ত্তব্যগুলি সাধন করিতেছেন—তাঁহাদেরকে লইয়া একটী আধ্যাত্মিক সমাজের সৃষ্টি হইবে এবং এই আধ্যাত্মিক সমাজের উজ্জ্বল আদর্শ ও দীপ্তিময় প্রভাব ক্রমে ক্রমে সাধারণ মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত হইবে। তৃতীয়তঃ, সমাজজীবনের ক্রমবিকাশের পরিচালকরূপে এক ঈশ্বর বা ঐশী শক্তির বিশ্বব্যাপিত্ব ও মঙ্গলময়ত্বের উপলব্ধি এবং বিশ্ব-বিবর্ত্তনে ইহার নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি বোধ।

people for education we believe it is the duty of the republic to open the way for all her citizens to all the education that is necessary for a large and noble citizenship. We believe also in a democracy of wealth. We believe in a common wealth that really means what that noble word means, a wealth that is common. The problem of Political Economy in the past has been how to accumulate wealth; the problem in the future is how to distribute wealth. Therefore we believe in such a reform in taxation as will give us taxes on wealth, not on expenditure, and taxes direct, not indirect. We believe that capital and labor are partners, and that it is the right of labor to organise for their own protection and the enhancement of their wages. We believe that the people must control the Corporations, not the Corporations the people. and that the great high ways of the Nation, its iron and steel muscles, and the electric wires of the Nation, its nerves, must be under the control, if not under the ownership, of the body politic. We do not believe that Government is a necessary evil and the less we have of it the better. We have no wish to go back to a paternal Government nor to go back of that to the barbarism of individualism. We look forward to a fraternal Government in which the people shall have learned to do by their common will and their common industry the things that are for their common well-being. With me this belief is a religion. I hold that it is a infidel to deny the brotherhood of man as to deny the Fatherhood of God and the first infidelity is far more common in this country than the second." কিন্তু আমরা জানি যে কোনও এক মানুষের শক্তি ও সামর্থ্য অন্য একজনের শক্তি ও সামর্থ্যের সমান নয়; সুতরাং এই অসম-শক্তি ব্যক্তিগঠিত মানব-সমাজে কেবল আইন প্রণয়ন দ্বারা রাষ্ট্রে, অর্থে ও কর্মে পূর্ণ সাম্য আনা যাইতে পারে না। এবং এরূপ সাম্য আনিবার চেষ্টায় ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই—কারণ ইহা অস্বাভাবিক। সমাজে এই সাম্যের আদর্শ কেবল মানবচিত্তের এক বিশেষ প্রকারের ধর্মবোধ দ্বারাই লব্ধ হইতে পারে। ইহাই ত্যাগধর্ম। এই ত্যাগের অর্থ কেবল ঈশ্বর সমীপে আত্মসমর্পণই নয়; এণ্ড্রু কার্নেগী, রাসবিহারী ও তারকনাথের কেবল অর্থদানই নয়,—পরন্তু ইহা বিশ্বমানবসেবায় ব্যক্তির আত্মোৎসর্গ, মানবত্বের নিকট ব্যক্তিত্বের 'ধূলায় আসন' ও 'ভক্তিপূর্ণ প্রণাম'। এই নূতন প্রকারের ত্যাগধর্মের সহিত প্রাচীন ভারত কিয়ৎ পরিমাণে পরিচিত থাকিলেও, বর্তমান ভারত

বহু পরিমাণেই অপরিচিত—অবশ্য আমার স্রোত ফিরিয়াছে; আর পাশ্চাত্য জগৎ তো তাহার শত শত ডেমোক্রেসি ও সহস্র সহস্র অর্থদান সত্ত্বেও ইহার সন্ধানই পায় নাই। এই ত্যাগপ্রসূত আত্মার অমরত্ববোধই সন্নীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের মানবধর্ম্ম।

পাশ্চাত্যজাতির সাধনালব্ধ ডেমোক্রেসির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আলোচনা হইতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতিসাধন জন্য আমরা যে সমস্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারি, সে সমস্ত 'সূত্রগুলির' সাহায্যে বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া ভারতবাসীর নিকট ক্রমে ক্রমে উপস্থাপিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস

নবীন এশিয়ার জন্মদাতা

এশিয়ার ম্যাঞ্চেষ্টার

১। দেহাত্মক বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ারাম

জাপানী ঐতিহাসিকগণ ওসাকাকে শোতোকুতাইশি এবং কোরিয়ার বৌদ্ধ প্রচারকগণের প্রথম কর্ম্মকেন্দ্ররূপে গৌরব প্রদান করিবেন। তেন্নোজির প্যাগোডা দূর হইতে দেখিয়া এইরূপ ভাবিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখি চারিদিকে "চিম্‌নির" জঙ্গল। অসংখ্য ধূমনির্গমের নলে ওসাকাকে একটা সুবৃহৎ কারখানায় পরিণত করিয়াছে। জাপানের প্রাচীনতম কেন্দ্রে বর্ত্তমান জগতের নবীনতম নিদর্শন পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। টোকিওর কলযন্ত্রফ্যাক্টরি ইত্যাদি দেখিয়া ওসাকার রূপ কল্পনা করা যায় না। টোকিওতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিহ্ন এখনও অনেক আছে—ওসাকা পুরাপুরি আধুনিক নগর। এখানে তেন্নোজি-বিহার আজকাল একটা খাপছাড়া পদার্থ। ইয়াঙ্কিস্থানের শিকাগো অথবা ইংরাজের ম্যাঞ্চেষ্টার যেন নিম্ননদেশের এই সাগরকূলে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

শ্রাবণ মাসে ওসাকাতে যেরূপ গরম পাইতেছি কলিকাতায়ও এত দেখা যায় না। রাস্তার দুই ধারের দোকানদারেরা ছাদে ছাদে তার লাগাইয়া কাপড়ের আবরণ প্রস্তুত করিয়াছে। এই কারণে গলির ভিতর সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এইরূপ করিবার প্রয়োজন হয়—মিশরের কাইরোতেও এইরূপে গলি ঢাকিবার ব্যবস্থা দেখিয়াছি। যাঁহারা বলিয়া থাকেন ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া ভারতীয় চরিত্র উন্নত হইতে পারে না তাঁহারা একবার ওসাকায় আসিয়া বাস করুন। ত্রিশ বৎসরের ভিতর নিতান্ত গ্রীষ্মপীড়িত মশকপ্রধান ম্যালেরিয়া বাথানেও

একটা ম্যাকেষ্টার গড়িয়া উঠিয়াছে—ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন।

আমরা ভারতবর্ষে মুক্তি, নির্ব্বাণ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, ইন্দ্রিয়দমন, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি শব্দ অত্যধিক ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সমুদয়ের ব্যবহার আরও বেশী ছিল। বর্ত্তমান কালে ব্যক্তিগত জীবনে, এবং সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই সমুদয় তত্ত্বের প্রয়োগ হউক বা না হউক, এগুলি মুখে আওড়ান এখনও আমরা বন্ধ করি নাই। "ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে"—এ কথা আমরা বোধ হয় চিরকালই বলিব। কথাটা যেন ভবিষ্যতে কার্য্যেও পরিণত হয়।

দুনিয়ার অন্যান্য সমাজে এই সকল শব্দ অথবা তত্ত্বের রেওয়াজ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। ইংরাজ ও ইয়াঙ্কি—কেহই ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়দমন ইত্যাদির ধার ধারে না। জাপানেও দেখিতেছি এখানকার লোকেরা "ইন্দ্রিয়ারাম" এবং "দেহাত্মক বুদ্ধি"কে ভারতবাসীর আদর্শানুসারে গর্হিত বিবেচনা করে না। খাওয়া দাওয়া ফুর্ত্তিকরা—সকল প্রকার ভোগ প্রবৃত্তির চূড়ান্ত প্রশ্রয় দেওয়া—দুনিয়ার মানবের স্বধর্ম্ম দেখিতেছি। তথাপি দুনিয়ার লোক উন্নত মস্তকে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। তথাপি ইহাদের শারীরিক শক্তি এবং সামরিক বলের হ্রাস হইতেছে না। তথাপি ইহারা প্রয়োজন হইলে একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ দিতেছে। পরকালে ইহাদের কি হইবে তাহা ত জানি না—ইহকালে দেখিতেছি জাপানী বল, ইংরাজ বল, ইয়াঙ্কি বল সকলেই পার্থিব সুখের কোন বস্তুতে বঞ্চিত হইতেছে না। আর ভারতবাসী পরকালে নন্দন কাননে বিচরণ করিবেন কি না কে বলিতে পারে? বর্ত্তমানে ত দেখিতেছি সুখ, আনন্দ, ফুর্ত্তি, ভোগ ইত্যাদি কাহাকে বলে ভারতবাসীর অভিধানে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতবাসীর না আছে শরীরে বল, না আছে চিত্তে শক্তি, না আছে ঘরে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়, না আছে হাটে বাজারে বাগানে পাহাড়ে খেলা ধূলা আমোদ প্রমোদ। ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াও দুনিয়ার লোক "ফার্ষ্ট-ক্লাশ পাওয়ার" হইবার উপযুক্ত হইতে পারে। আর আমরা সংযম সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি আওড়াইয়াও একটা বড় ধরণের ব্যবসায় চালাইতে অসমর্থ হইতেছি। আমরা দেশে যেসকল কার্য্যকে নিতান্ত ঘৃণিত অধম ও পাশবিক বিবেচনা করি তাহা সত্ত্বেও জগদ্বাসী পৃথিবীতে কৃতকার্য্য হইতেছে। আমাদের হিসাবে যে সকল নরনারী চরিত্রহীন অথবা নীতিভ্রষ্ট সেই সকল নরনারী বাদ দিলে বর্ত্তমান জগতের কোন সমাজে লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই কথাটা সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের গভীর ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

কাম, কাঞ্চন, কীর্ত্তি—এই তিন বস্তু আমাদের ভারতীয় চিন্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরায়। এগুলিকে পুরাপুরি না হউক—অন্ততঃ খানিকটা দাবিয়া রাখা আমাদের দেশে চরিত্রবত্তার লক্ষণ। ইয়োরামেরিকার লোকেরা এবং জাপানীরাও কোন বিষয়েই সংযমপালনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে স্বীকারই করে না। "জন্ম গ্রহণ করিয়াছ—যে ক্ষেত্রে যাহা পার করিয়া যাও"—ইহাই সকল জাতির ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত নীতি। কীর্ত্তির কথাই ধরা যাউক—ইহা ত "last infirmity of noble minds."

যশের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে জগতে কয়জন পারে? ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ কীর্ত্তির বাসনা বর্জ্জন করিয়াছেন এবং করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু জগতের লোক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার জন্যই ব্যস্ত। তাহারা জানে—"সেই বস্তু নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে।"

তাহার পর কাঞ্চনের কথা। টাকা পয়সার প্রতি লোভ নাই ইংলণ্ডে, আমেরিকায় অথবা জাপানে এরূপ লোক আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ভারতবর্ষে এরূপ লোক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইবে না। "ঘুষ খাওয়া" দুনিয়ার সর্ব্বত্র প্রচলিত। আমেরিকায় অর্থগৃধ্নুতা বা "Corruption" আবহাওয়ার সঙ্গে যেন এক প্রকার মিশিয়া রহিয়াছে। বিলাতের কার্য্যালয়সমূহে ঘুষ দিবার ও লইবার রেওয়াজ বেশ আছে। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও "টিপ্" পাইলে মিষ্টভাবে "Thanks" শব্দ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। ট্যাক্সির গাড়োয়ান হইতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পর্য্যন্ত সকলেই পদমর্য্যাদা অনুসারে "টিপ্" অর্থাৎ বক্‌শিষ অর্থাৎ ঘুষ লইয়া থাকেন। সরকারী কাজে চুরি বাটপাড়িও সর্ব্বত্রই সুপ্রচলিত। বৎসর দুএক হইল জার্ম্মাণ গবর্ম্মেণ্টের সেনাবিভাগে এইরূপ Corruptionএর কলঙ্ক প্রচারিত হয়। একজন উচ্চপদস্থ সেনাধ্যক্ষ চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত হন। এই জার্ম্মাণ অর্থগৃধ্নুতার সঙ্গে জাপানী অর্থগৃধ্নুতা লিপ্ত ছিল। জার্ম্মাণ সরকারের অনুসন্ধানে একজন জাপানী নাবাধ্যক্ষের চৌর্য্যবৃত্তি ধরা পড়ে। জাপান সরকারকে তৎক্ষণাৎ জানান হয়। জাপানী নাবাধ্যক্ষের শাস্তি হইয়াছে। জাপানে আসিয়া অবধি প্রতিদিন শুনিতেছি আজ অমুক পার্ল্যামেণ্ট সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—আজ অমুক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে জেলে পাঠান হইল ইত্যাদি। ইহাদের অপরাধ—সরকারী টাকা "মারিয়া লওয়া," embezzlement, ঘুষ খাওয়া, অর্থপৈশাচিকতা ইত্যাদি এমন কি এখানে মন্ত্রি-পরিষৎকেও বিশ্বাস করা চলে না। বহুক্ষেত্রে বহু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ হইয়াছে। বর্ত্তমান ওকুমা মন্ত্রি-পরিষদের আমলে নাকি কর্ম্মচারিগণের চরিত্র খানিকটা নিষ্কলঙ্ক। তথাপি কাণাঘুষা বেশ চলিতেছে। কাগজ পত্রে প্রকাশিত হয়—"মন্ত্রিবর ওকুমা চিরকাল ন্যায়পরায়ণতা, চরিত্রবত্তা, লোভহীনতা, কাঞ্চন-সংযম ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। তথাপি তাঁহার আমলে অমুক অমুক বিভাগে উৎকোচ গ্রহণের জনরব প্রকাশিত হয় কেন?" শেষ পর্য্যন্ত একদিন কাগজে পড়িলাম—ওকুমার প্রধান সহকারী ভাইকাউণ্ট মহাশয়ের বিরুদ্ধে ঘোরতর অভিযোগ তোলা হইয়াছে। এই কারণে ওকুমা-মন্ত্রি-পরিষৎ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। কাঞ্চনের স্পৃহা জাপানে কম কি? তথাপি জাপান "ফার্ষ্ট ক্লাশ পাওয়ার"! সুতরাং অর্থপিশাচ বলিয়া ভারতবাসী অবনত একপ ভাবা অনুচিত।

কীর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা বা কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর চিন্তায় পাপস্বরূপ—কিন্তু জানিয়া রাখা আবশ্যক যে এই পাপ ভারতবাসীরই একচেটিয়া নয়।

এইবার কামের কথা—এ বিষয়ে আলোচনা না করাই ভাল। ইয়োরামেরিকার সমাজে কামবিষয়ক সংযম কাহাকে বলে তাহা জানা নাই। আমাদের "ব্রহ্মচর্য্য" পালন এবং সতীত্ব এ সকল দেশের পারিবারিক ও

সামাজিক নিয়মে স্থান পাইতেই পারে না। সকলেই যথাসম্ভব চোখ বুজিয়া জীবনযাপন করে—পরস্পর পরস্পরের ভিতরকার কথা না জানিলেও সহজেই অনুমান করিয়া লয়। অসংযম, অনিয়ম বা ব্যভিচার ইত্যাদি মারাত্মক দোষরূপে গৃহীত হয় না। যে কোন ভারতবাসী ইহাদের কাণ্ড দেখিলে শিহরিয়া উঠিবেন।

জাপানেও এই কথা—উচ্চ শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী, নিম্ন শ্রেণী সকল শ্রেণীর লোকই বেশ্যাসক্ত। প্রকাশ্যভাবে বেশ্যালয়ে যাওয়া আসা নিন্দিত নয়। ইয়োরামেরিকার খৃষ্টানেরা বেশ্যা শব্দ ব্যবহার করিতে নারাজ—কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহা জাপানে যেরূপ পাশ্চাত্য সমাজেও সেইরূপ। অতএব দেখা-যাইতেছে বেশ্যাসক্ত সমাজও পোর্টআর্থরে প্রাণ দিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে পাঠাইতে পারে। আর আজ এইরূপ সংযমহীন সমাজ-সমূহ হইতেই বহুলক্ষ যুবক ও প্রবীন লোক ইয়োরোপের কুরুক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়া মল্লযুদ্ধ করিতেছে। কাজেই কথায় কথায় ভারতীয় চরিত্রের অবনতিকে আমাদের অকৃত-কার্য্যতার কারণরূপে সপ্রমাণ করা উচিত নয়।

বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ, সংযত ইন্দ্রিয়ারাম, নির্ম্মল আনন্দভোগ ইত্যাদি ত এই সকল দেশে আছেই। ভারতবাসীর মত নিরানন্দ ও নির্জ্জীবভাবে দুনিয়ার কোন লোক জীবন-যাপন করে না। ওসাকাতে হোটেলের জানালা হইতে দেখিতেছি শত শত বালক যুবক বৃদ্ধ মোদোগাস্তরা নদীতে একসঙ্গে দল বাঁধিয়া সাঁতার দিতেছে। সন্ধ্যার পর সহর দেখিতে বাহির হইলাম। প্রত্যেক রাস্তায় ও গলিতে নরনারীর সংখ্যা অত্যধিক। সকলেই নৈশ ভোজনের পর বেড়াইতে বাহির হইয়াছে—কাহারও চিত্তে উদ্বেগ নাই আশঙ্কা নাই—দৈন্য নাই। কেহ রাস্তার আলো দেখিতেছে—কেহ দোকানগৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরকার সাজান জিনিষগুলি দেখিতেছে—কেহ ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছে। নৈশ ওসাকার লোকজন, গতি-বিধি এবং আলোকমালা দেখিয়া নৈশ শিকাগো মনে পড়ে। থিয়েটার, বায়স্কোপ, নাচগান বাজনা ইত্যাদি বহির্ম্মুখী জীবনের সকল অনুষ্ঠানই জাপানের এই নবীন নগরে রাশীকৃত। পার্কে যাইয়া দেখি সেখানেও লোকের ভিড়। প্যারির Eifel Towerএর অনুকরণে ওসাকায় একটা টাওয়ার আছে। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক বাতির শোভায় ইহা সমুজ্জ্বল থাকে। ইলেকট্রিক লিফ্টের সাহায্যে লোকেরা শিখরে উঠিতে পারে—সেখান হইতে সমগ্র নগরের নৈশদৃশ্য দেখা যায়।

একবার রাত্রিকালে নৌকায় বাহির হইলাম। ক্ষুদ্র তরণী বিদ্যুতের শক্তিতে চলিতেছে। এইরূপ প্রমোদতরী ওসাকায় সহস্র সহস্র দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত বহু-সংখ্যক বজরা, পান্সি, ছিপ ইত্যাদিও নানা চীনা লণ্ঠনের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া খালে ও নদীতে ভাসিতেছে। কোনটা হোটেল বা রেস্তরাঁ বা সরাই—কোনটা বা গৌখীন নর-নারীগণের বিহার-নৌকা। সহরের ভিতর দিয়া খাল ও নদী অনেক গিয়াছে। ওসাকায় স্থলপথের সংখ্যা বেশী কি জলপথের সংখ্যা বেশী বুঝিয়া উঠা কঠিন মনে হয়। এই কারণে ওসাকাকে এশিয়ার ভেনিস বলা হইয়া থাকে। রাত্রিকালে নৌকা হইতে দুই-দিকে দেখিতেছি নাচগান বাজনা আমোদ-

প্রমোদ বিশ্রাম, আনন্দ ইত্যাদির আয়োজন। নৈশ ওসাকায় কুত্রাপি চিন্তা, উদ্বেগ, আশঙ্কা, দুঃখ নাই।

সহর হইতে কিছু দূরে একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। মেপল্ তরুর জঙ্গলে এই পাহাড় সমাবৃত। মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ঝরণা বাহিয়া যাইতেছে—দুইধারে উচ্চ পাড়। বক্র পথে পাদদেশ হইতে প্রায় ১৫০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিলাম। ঝরণার উৎপত্তি স্থানে একটা সুবৃহৎ জলপ্রপাত। প্রায় ১০০ ফিট নিম্নে জল ঝাকাইয়া পড়িতেছে। এই পথে বহু জাপানী নরনারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সকলেই গরমের দিনে বৃক্ষসমাচ্ছাদিত পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে চলিয়াছে। অনেকে কিছুকাল এইখানে কাটাইবে। এজন্য বহু সরাই এবং হোটেল পার্ব্বত্য কুঞ্জবনে দেখিতে পাইলাম। জলপ্রপাতের সম্মুখস্থ একটা সরাইয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটান গেল। একটা তাজা মিষ্গেস মাছ ধরাইয়া বাঙ্গালী ঝোল প্রস্তুত করান হইল। বেগুন, আলু, কাঁচালঙ্কা ইত্যাদির ঝোল বহুদিন পরে আস্বাদন করিলাম। দোভাষী মহাশয় কাঁচা মাছই খাইলেন।

জাপানীরা সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুরক্ত। জাপানের ভিতর যতগুলি রমণীয় স্থান আছে সকলগুলির নাম ও বিবরণ ইহাদের সকলেরই জানা থাকে। ইহারা মাসের নাম করিতে হইলে সেই মাসে যে ফুল বেশী ফুটে তাহার উল্লেখ করে। ইহাদের চিত্রকলায় দেশের নদনদী, বনউপবন, পর্ব্বত, হ্রদ, সাগর কূল ইত্যাদি সবই চিরস্থায়ী হইয়াছে। আজ দেখিলাম কতিপয় চিত্র-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই ঝোরায় আসিয়া চিত্রাঙ্কন করিতেছে। Feudal and Modern Japan নামক গ্রন্থে Knapp লিখিয়াছেন—"It is not uncommon to read the public journals that some prominent noble or minister of state journeying to view some famed cherry blossom grove, and there soon follows the poem which the vision of beauty is sure to evoke from his pen."

জাপানীদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা এবং প্রকৃতি-পূজা দু'একদিনের জিনিষ নয়। অষ্টম শতাব্দীতেও জাপানী গ্রন্থকারেরা দেশের বৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া প্রকৃতির সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিবৃত করিতেন। এই সকল ভৌগোলিক পুস্তক পাঠ করিয়া জনসাধারণ স্বদেশের প্রকৃত মূর্ত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিত। এবং দেশের পরিচয় লাভ করিবার জন্য পর্য্যটনে বাহির হইতে উৎসাহিত হইত। স্বদেশ-প্রেম জাগাইবার পক্ষে এইরূপ ভূগোল-রচনা এবং প্রকৃতি-পূজা অল্প সাহায্য করে নাই। প্রকৃতি-সেবক রামাতো-সন্তান আপনা আপনিই স্বদেশভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

২। ওসাকার ফ্যাক্টরি ও মিউনিসিপ্যালিটি

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ওসাকাতে একটিও কল কব্জা যন্ত্র ইত্যাদি ছিল না। আজ এখানে কলের চরকাই আছে বিশলক্ষেরও অধিক। বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টারে চরকার সংখ্যা ইহার দ্বিগুণ মাত্র।

চীনে, কোরিয়ায় এবং এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে মাল যোগান ওসাকার মহাজনগণের কার্য্য। ভারতবর্ষের বাজার দখল করিবার জন্যও ইহারা লালায়িত। এশিয়ার এই ম্যাঞ্চেষ্টার আসল ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে।

ওসাকার একজন জাপানী খ্রীষ্টান ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হইল। নাম তানাকা। ইনি কিয়োটোর দোশিষা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন। পৃথিবী পরিভ্রমণও ইহার হইয়াছে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"চীনারা ত কয়েক মাস হইল জাপানী মাল বয়কট সুরু করিয়াছে। তাহার ফলে আপনাদের ক্ষতি হইতেছে কি?" তানাকা বলিলেন—"যথেষ্টই হইতেছে। আমাদের বহু মহাজনের ঘরে মাল পচিতেছে। ইয়োরোপীয় যুদ্ধের ফলে জার্মাণ এবং অষ্ট্রিয়ান মাল ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি দেশে আসিতে পারিতেছে না। এই সকল বাজারের কিয়দংশ জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু চীনা বয়কটে আমাদের যত অনিষ্ট হইতেছে তাহা পূরণ হওয়া সহজ নয়। চীনেই জাপানের বৃহত্তম বাজার। ওসাকার সমৃদ্ধি চীনের উপরই নির্ভর করে।"

জাপানে তুলার চাষ নাই—বিদেশী তুলা আমদানি করা হয়। ওসাকা তুলার কাপড়ের কলের জন্যই বিখ্যাত। ভারতীয় ধুতি প্রস্তুত করিতে এখানকার শিল্পীরা জানে না। তানাকা ধুতি দেখিবার জন্য একবার হোটেলে আসিলেন।

ছোট বড় মাঝারি সকল প্রকার কারখানার সংখ্যা ৭০০০এর কম হইবে না। পশম, ধাতু, তেল, জাহাজ, দিয়াশলাই, যন্ত্র, সাবান, সিগারেট, ঔষধ, ছাতা, রং, কাগজ, বাতি, ল্যাকার, কার্পেট, থলে, লোহার সিন্দুক, বাদ্যযন্ত্র, ঘড়ি ইত্যাদি নানা বিষয়ের কারখানা ওসাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। বেশমের ফ্যাক্টরি এখানে নাই। পাঁচ আট হাজার টাকা মূলধনের কারবার নিতান্ত কম নয়। কোটি টাকা মূলধনের কারবার বোধ হয় দশ বারটা মাত্র হইবে। লক্ষ টাকা মূলধনের কারবারই সাধারণতঃ দেখিতে পাই।

একটা বৃহৎ চামড়ার কারখানায় গেলাম। এখানে আজকাল রুশ গবর্মেণ্ট যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করাইতেছেন। ম্যানেজার বলিলেন—"মহাশয়, ফ্যাক্টরি দেখান সম্প্রতি অসম্ভব। কোন বিদেশীয় লোককে রুশ সেনাবিভাগের দ্রব্যাদি দেখিতে দিলে রুশ গবর্মেণ্ট দুঃখিত হইবেন।"

একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক ব্যবসায়ী চামড়ার কারখানা দেখাইতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইনি বলিলেন—"মহাশয়, আমার মাতা যদি জানিতে পারেন যে, আমি এই ফ্যাক্টরিতে আসিয়াছিলাম তাহা হইলে আমাকে শুদ্ধ না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে কি রকম?" যুবক বলিলেন "চামারেরা জাপানে অস্পৃশ্য জাতি। ইহাদিগকে ইতা বলে। ইহাদিগকে যদি স্পর্শ করি তাহা হইলে আমরা অশুদ্ধ হইয়া যাই। পুনরায় শুদ্ধ করিবার জন্য আমাদের উপর নুন ছিটান হইয়া থাকে।"

একটা কাচের কারখানা দেখিলাম। বড় বড় কাচের পাত এখানে তৈয়ারি হয় না। নানা প্রকার গ্লাশ, বাটি, ইত্যাদি ঢালাই করা তৈজসপত্র এই ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত হয়। বালু ও চূণ কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিশাইয়া আগুনের ভাটিতে গলান হইয়া থাকে। এই গলান বস্তুই কাচ। পরে ইহা নানা আকারের ছাঁচে ঢালিতে হয়। নানা ভাটির সম্মুখে এই ঢালাই কাজ দেখিলাম। নিতান্ত শিশুগণকে এই কারখানায় কষ্টজনক কাজ করিতে দেখা গেল। এখান হইতে বহু বাক্স

কাচের বাসন কলিকাতায় ও বোম্বাইয়ে রপ্তানি হইতেছে শুনিলাম।

ওসাকায় লোক সংখ্যা ১,৪০০,০০০। তাহার মধ্যে মজুরের সংখ্যা লক্ষাধিক। ম্যাঞ্চেষ্টারের মত এই নগরে বড় বড় "tenement house" ব্যারাকের ভিতর কুলীদিগকে থাকিতে হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে ইহারা বাস করিবার সুযোগ পায়। এই জন্য শ্রমজীবী মহলে স্বাস্থ্যহানি বেশী হয় না।

প্রতি বৎসরই এই শিল্প ও ব্যবসায়-কেন্দ্রের উন্নতি সাধিত হইতেছে। কাঠের বাড়ী আগুনে প্রায়ই পুড়িয়া যায়। নূতন গৃহ নির্ম্মাণের সময় মিউনিসিপ্যালিটি প্রশস্ত রাস্তা তৈয়ারি করিবার ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বে যেখানে সঙ্কীর্ণ গলি ছিল আজ সেখানে কলিকাতার হ্যারিসন রোড দেখিতে পাই। আমেরিকার রীতিতে বড় বড় ইষ্টক প্রাসাদও সর্ব্বত্র মাথা তুলিতেছে। বহির্ব্বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ওসাকাবন্দরে বিরাট পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইতেছে। আগামী বৎসর ইহা কার্য্যোপযোগী হইবে। নবীন জাপানের নবীনতম জীবন বুঝিতে হইলে ওসাকাতে আসা আবশ্যক।

কয়েক বৎসর হইল এই বৈদেশিকোন্নতিশীল নগর সম্বন্ধে The Far East নামক সাপ্তাহিক পত্রে Osaka revisited শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"But Osaka still has its narrow streets, mile after mile of shops, factories, warehouses, and markets, with goods of every conceivable description blocking up the way and myriads of toilers active as bees in a hive. How do these people live, what do they make, and with whom do they trade? Countless thousands busily employed outside the modern factories, engaged in home industry, each supplying its quantum of goods for consumption in Japan, in China or in India. Countless thousands inside the big factories at spindle and loom, grimy beings young and old, bottle flowers, machine shop denizens, soap makers, all these and thousands more are concentrated on the few square miles of Osaka. * * * Away beyond the crowded city, in the harbour districts are more miles of shipping and shipmakers, carpenters and block makers, iron works and iron workers, more grime and activity; all representing the real Great Powers of the world, Capital and Labour; away beyond the crowded city landward the twinkling lights in the farmer's houses in the evening show them to be still at work. The day's work in the fields is done, but they are still busy—they are factory workers, too, busy at home with articles for export, tooth-brushes and all sorts of things for what they provide cheap labour, and which find a market

in far away Australia, South America and even in London itself. Toilers by day and toilers by night, the industry of the race is typified in Osaka."

বয়ন-ফ্যাক্টরির কয়েকজন পরিচালকের সঙ্গে আলাপ হইল। একজন টোকিওর টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। নাম হিরাগা। ইঁহার কারখানা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাকাই-বন্দরের নিকট অবস্থিত। সাকাই বর্ত্তমানকালেও বাণিজ্য-কেন্দ্র রহিয়াছে। এখান হইতে নৌকা চালাইয়া কোরিয়া যাইবার প্রথা এখনও চলিতেছে। কয়েকজন কোরিয়াযাত্রী মাঝির সঙ্গে দেখা হইল।

ওসাকার ট্রামগুলি মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি। ম্যাঞ্চেষ্টারেও এইরূপই দেখিয়াছি। মেয়রের একজন সহকারী বলিলেন—"আমি কয়েক বৎসর ফ্রান্সে ও বিলাতে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি। বিলাতী স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী ওসাকাতে অবলম্বন করা একপ্রকার অসম্ভব দেখিতেছি। বিলাতে পায়খানার ময়লা নলের সাহায্যে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু জাপানীরা এই ময়লা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের দেশে জমির সারের জন্য এই সকল ময়লা রক্ষা করা হইয়া থাকে। কাজেই পাশ্চাত্য দেশের মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা জাপানে প্রবর্ত্তিত হওয়া এখনও সুদূর ভবিষ্যতের কথা।"

এখানকার ডেপুটি-মেয়র শ্রীযুক্ত ডাক্তার সেকি ওসাকার একজন প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞান-বিৎ। ইনি বলিলেন—"এতদ্ভিন্ন টোকিও কিয়োটো এবং ওসাকা এই তিন নগরের মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। অল্পদিন হইল জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।" সেকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওসাকা জাপানের শিল্পকেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিল কেন?" উত্তর পাইলাম—"ওসাকার অপর পারে কিউসিউ দ্বীপ। এই দ্বীপে কয়লা ও লৌহের খনি আছে। জাপানে আর কোথাও এই দুই ধাতু উৎপন্ন হয় না। কিউসিউ হইতে ওসাকার ভিতর অতি সহজে কয়লা আমদানি করা চলে। খালের ভিতর দিয়া সাধারণ নৌকাগুলি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। এই জন্যই ওসাকানগরে এতগুলি কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। অধিকন্তু আমাদের বাজার প্রধানতঃ চীনে ও কোরিয়ায়। ইয়োকোহামা হইতে ওসাকা এই দুই বাজারের নিকটে তাহা ছাড়া জাপানের প্রাচীনতম যুগেও এই নগর বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বস্তুতঃ কিউসিউ হইতে জাপানের সর্ব্বপ্রথম মিকাডো প্রধান দ্বীপের এই বন্দরেই পদার্পণ করেন। তাহার পর যোদো গাওয়া নদী বহু খালের জন্মদাত্রী হয়। সে আজ আড়াই হাজার বৎসরের কথা। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের যুগেও এশিয়ার সঙ্গে ভাবের ও কর্ম্মের আদান প্রদান এই কেন্দ্রেই সাধিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হিদেয়শি ওসাকাতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন—সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের উন্নতিও সাধন করেন। এই অঞ্চল হইতেই জাপানী নেপোলিয়ন কোরিয়ায় অভিযান পাঠাইয়া ছিলেন। এবং জাপানের দুর্দ্দান্ত ডাইমোগিগকে সন্ত্রস্ত রাখিতেন। হিদেয়শির দুর্গ আজও দেখিবার জিনিষ।"

অবশ্য তোকুগাওয়া যুগে জাপানের সঙ্গে

বিদেশের বাণিজ্য পুরাপুরি স্থগিত থাকে কিন্তু শোগুণেরা ওসাকাকে শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করিতে এবং এখানে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সুবিধা সৃষ্টি করিতে যারপর নাই চেষ্টিত ছিলেন। প্রাচীন খালগুলি ইহাদের আমলে বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

কিউসিউ দ্বীপে যত লৌহ উৎপন্ন হয় তাহাতে জাপানীদের অভাব পূরণ হয় না। জাপানকে বিদেশ হইতে প্রচুর লোহা আমদানি করিতে হয়। চীন ও মাঞ্চুরিয়ার খনিসমূহ হস্তগত করিবার নিমিত্ত এই জন্যই জাপানের এত আগ্রহ। বর্ত্তমান যুগে কয়লা ও লৌহ যে দেশের আয়ত্ত নহে তাহার উন্নতি দ্রুত চলিতে পারে না।

হোটেলের পার্শ্বেই একটা প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে। সমগ্র মেজের লোহার কাঠামো খাড়া করা হইয়াছে। এই লৌহ "ফ্রেমের" উপর ইট পাথরের গাঁথনি বসান হইবে। আমেরিকাতে এবং ইয়োরোপেও এই ধরণের গৃহনির্ম্মাণই আজকাল বেশী দেখা যায়। বহুতলবিশিষ্ট উচ্চ ভবনসমূহকে ভূমিকম্পের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য লোহার কাঠামো বিশেষ উপকারী।

শুনিলাম টাউনহলের জন্য এই সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে। খরচ হইবে ১৫ লক্ষ টাকা। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নীপতির সঙ্গে আলাপ হইল। ইনিও একজন ধনী মহাজন। নানাপ্রকার কারবারে ইহাঁর টাকা খাটিতেছে।

মহাজনটি সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ইনি একজন গোঁড়া বৌদ্ধ। আমাদের দেশে যেমন গৃহদেবতা, ঠাকুরঘর ইত্যাদি থাকে জাপানী গৃহেও সেইরূপ "কামিদান," "বুৎসুদান" ইত্যাদি দেব-মন্দির থাকে। মহাজন তাঁহার গৃহের বৌদ্ধ মন্দির যত্নসহকারে দেখাইলেন। একটা সোনালি ল্যাকারমণ্ডিত আলমারির ভিতর একখানা গোটা মন্দিরের সকল আসবাব রহিয়াছে। মূর্ত্তি, বাতি, ধূপদান, ফুল, নৈবেদ্যের বাসন, ঘণ্টা, ধর্ম্মগ্রন্থ ইত্যাদি সকল বস্তুই দেখিলাম। হিন্দু পূজা পদ্ধতিতে আর জাপানী বৌদ্ধ পূজা পদ্ধতিতে কোন প্রভেদ নাই। কয়েকখানা পুস্তক দেখাইয়া বন্ধুটি বলিলেন—"এই গুলি চীনা অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত পুস্তক। আমিদা বুদ্ধ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও রসাতল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। সেই উপদেশ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।"

৩। বৌদ্ধ মন্দিরে এক রাত্রি (৭ই আগষ্ট, ১৯১৫)

টোকিওতে পৌঁছিয়া দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ। ছুটির সময়ে জাপানী অধ্যাপকগণ মফঃস্বলে যাইয়া গ্রাম্য বিদ্যালয় খুলিয়া বসেন। জনসাধারণের ভিতর এই উপায়ে উচ্চতম বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের উপদেশ প্রচারিত হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক তাকাকুসু, নানাস্থান ঘুরিয়া কিছুকালের জন্য কোয়া পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। এখানে ইহাঁর বক্তৃতা নাই। মন্দিরে মন্দিরে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য কয়েক সপ্তাহ এখানে কাটাইবেন।

তাকাকুসুর পত্র পাইয়া কোয়া পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। ওসাকা হইতে চল্লিশ মাইল যাইতে হয়। ট্রামে ও রেলে কিছু দূর আসা গেল। এইখানে একটা পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী—অপর পারে উপত্যকা ও পাহাড়। এই পার্ব্বত্য পথে ১২।১৪ মাইল যাইতে হইবে—রেল অথবা ট্রাম নাই।

পরমে অস্থির—নদীর কিনারায় একটা সরাইয়ে তরমুজ খাওয়া গেল। পরে খেয়া নৌকায় পার হইয়া রিক্‌শতে বসিলাম। ভুট্টা, বাঁশ, ধান ও তুঁতের ক্ষেতের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছি। চারি দিকে উচ্চ পাহাড়। গ্রাম্য কুটীর, রাস্তা, দোকান ও বালক বালিকা ভারতীয় পার্ব্বত্য পল্লীর দৃশ্যই স্মরণ করাইয়া দেয়। জাপানের এত জায়গা দেখিলাম—কোথাও পশুপক্ষীর পরিচয় বেশী পাইলাম না। মাঝে মাঝে দুই চারিটা কাকের ডাক শুনিয়াছি মাত্র—অবশ্য মাছের ঝাঁক সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আজ দুএকটা সর্পও চোখে পড়িল।

রিক্‌শ বদলাইয়া তুলিতে বসিলাম। এখান হইতে পার্ব্বত্য বক্রপথে ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। আলমোড়া যাত্রার কথা মনে পড়িল। তবে ভারতীয় পাহাড়ে ব্যবহৃত ডাণ্ডি জাপানী তুলি অপেক্ষা অধিকতর আরামদায়ক। এখানকার তুলি আমাদের স্বদেশী তুলিরই মত।

আসুমোড়ার পথে পাইনের সারি সর্ব্বত্র দেখা যায়—এখানে পাইন এবং ক্রিপ্‌টোমেরিয়া এই দুই জাতীয় তরুবর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। উভয়ই দেখিতে অনেকটা এক প্রকার। এদিকে রাস্তার নিম্নে পার্ব্বত্য ঝরণা বা নদী বহিয়া যাইতেছে। কোয়া পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে সর্ব্বদা হিমালয়ের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্যে কোন প্রভেদ নাই। এইরূপে তিনহাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিলাম। এখন বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

এক জায়গায় দেখি আকাশে মালপত্র পাঠান হইতেছে। কোয়া পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের সঙ্গে নিম্নতম উপত্যকার যোগ সাধন করা হইয়াছে। টেলিগ্রাফের তার যে ভাবে পাহাড় হইতে পাহাড়ে লইয়া যাওয়া হয় সেই ভাবে মোটা তারের সাহায্যে শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংযোগ সাধিত হইয়াছে। এই তারের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ চুপড়ি ঝুলিতেছে। এই গুলির ভিতর মাল রাখিয়া দেওয়া হয়। চুপড়িগুলি তড়িতের শক্তিতে উর্দ্ধে আপনা-আপনি চলিয়া যায় এবং নিম্নে আপনা আপনি নামিয়া আসে। শুনিলাম এই ধরণের চুপড়িতে মানুষের যাতায়াতও নাকি সুরু করা হইবে। অভিনব দৃশ্য বটে।

সন্ধ্যাকালে যথাস্থানে পৌঁছিলাম। পথে বহু তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে—কেহ উঠিতেছে কেহ নামিতেছে। কেহ পদব্রজে, কেহ তুলিতে। এই নগর বা পল্লী একটা বিরাট তীর্থক্ষেত্র। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কোবো দাইশি এই সুরম্য স্থানে মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ-সম্প্রদায় আজ পর্য্যন্ত কোয়া পাহাড়কে তাঁহাদের প্রধান তীর্থস্থান বিবেচনা করেন। শুনিলাম এখানে নয়শত মন্দির আছে বলিয়া জনশ্রুতি। বর্ত্তমানে প্রায় ৫০টা ছোট বড় মাঝারি মন্দির বা মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ এক মন্দিরে রাত্রিবাস করিলাম। তাকাকুসু পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরে বাস করিতেছেন।

দার্জ্জিলিঙ্গে তিব্বত পর্য্যটক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাসের গৃহে জাপানী বৌদ্ধ পুরোহিত কাওয়া গুচি বাস করিতেন। তাঁহার সঙ্গে একজন জাপানী যুবকও ছিলেন। ইনি তিন বৎসর কাল ভারতবর্ষে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া কোয়া পাহাড়ের বৌদ্ধবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইয়াছেন। ইহার নাম হাসেবে। পূর্ব্বে ইনি ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পাইয়াছিলেন। হাসেবে বলিলেন—"মন্দিরসমূহের পুরোহিত-

গণের জন্য এখানে একটি মহাবিদ্যালয় আছে। আমি ছাত্রগণকে সংস্কৃত শিখাইয়া থাকি। প্রায় ৪০০ পুরোহিত সংস্কৃত শিখিতেছে।" হাসেবে সংস্কৃত বেশী জানেন না—তাঁহার-কার প্রণীত "সংস্কৃত-পাঠ" পর্য্যন্ত ইহার বিদ্যা। এই গ্রন্থই এখানে পড়ান হইতেছে। যাহা হউক, বুঝা যাইতেছে, জাপানীরা একটা ভারতীয় আন্দোলন শীঘ্রই পাকাইয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর। নানা মহলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মন্দিরে আশ্রম বালকেরা অতিথিসেবা করিতেছে। রান্নাবাড়ি, ঘর ঝাড় দেওয়া, বিছানা করা ইত্যাদি সবই যুবক পুরোহিতগণ স্বহস্তে করিল। মঠে মন্দিরে নারী জাতির প্রবেশ নিষেধ। পুরোহিতেরা সকলেই অবি-বাহিত থাকিতে বাধ্য। মৎস্য মাংসের ব্যবহারও মন্দিরে চলিতে পারে না। মন্দিরাবির অভ্যন্তরস্থিত গৃহসমূহের সাজসজ্জা আসবাব পত্র সবই অন্যান্য জাপানী গৃহের অনুরূপ। একটা সুন্দর বাগানও আছে। দোভাষী বলিলেন—"এই মন্দিরে আমি সাত বৎসর পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিলাম। সঙ্গে ছিলেন সপত্নীক ফরাসী পর্য্যটক। তাঁহাদের জন্য হোটেল হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিতে হইয়াছিল।"

প্রত্যূষে মন্দিরের দেবগৃহে "সাম-গান" আরম্ভ হইল। যুবক পুরোহিতগণ যথোচিত পোষাক পরিধান করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। ভাষা বুঝিলাম না—আওয়াজে বুঝিলাম হিন্দু উপাসনা আর বৌদ্ধ উপাসনা আর গ্রীক রীতির খৃষ্টীয় উপাসনা সবই এক জাতীয়। ধরণ ধারণ, আদবকায়দা, কণ্ঠস্বর, কোন বিষয়েই পার্থক্য লক্ষ্য করা কঠিন। পৃথিবীর সকল লোক যদি কোন এক ভাষায় কথা কহিতে পারিত তাহা হইলে দুনিয়ায় কোন প্রকার দ্বন্দ্ব থাকিত কি না সন্দেহ।

কয়েকটা মন্দির দেখিয়া প্রধান মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম "কোন্দো"। কোয়া পাহাড়ের কোন মন্দিরে আমিরা বুদ্ধের মূর্ত্তি নাই। কোবো দাইশি য়াকুশি দেবকে বুদ্ধ-বিগ্রহভাবে পূজা করিতেন। তাঁহার সম্প্রদায়ে য়াকুশি-বুদ্ধের মূর্ত্তি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্দোতেও তাহাই দেখি-লাম। এইখানে ধ্যানোপবিষ্ট কোবোর মূর্ত্তিও রহিয়াছে। কোবো তাঁহার সম্প্রদায়ে বুদ্ধের অবতাররূপে পূজিত হন।

এই বিরাট মন্দির-নগরের সর্ব্বত্র কোবো-দাইশির কীর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছে। তিনি কোথায় বসিয়াছিলেন, কোথায় হাত ধুইয়া-ছিলেন ইত্যাদিও সগৌরবে প্রদর্শিত হয়। কোন্দো হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক সুবিস্তৃত গোরস্থান দেখিলাম। ক্রিপ্টো-মেরিয়া তরুর কুঞ্জের ভিতর বহুসংখ্যক কবর ও স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে। দোভাষী বলিলেন—"কোবোদাইশি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই গোরস্থানে সমাধিপ্রাপ্ত হইবার জন্য লালা-য়িত। জাপানের নানাস্থান হইতে মৃত ব্যক্তির চুল, নখ বা বেশভূষার কিয়দংশ এখানে পাঠান হয়। এই সমুদয় চিহ্নের উপরই কবরাকৃতি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।"

গোরস্থানের অন্তে একটা মন্দির—তাহার মধ্যে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলিতেছে। একটা প্রদীপ দেখাইয়া পুরোহিত বলিলেন—"কোবোদাইশি স্বহস্তে ইহা প্রজ্বলিত করিয়া-ছিলেন। তখন হইতে ইহা একবারও নির্ব্বাপিত হয় নাই।" এই মন্দিরের পশ্চাতে কোবোদাইশির কবর।

পথে একস্থানে কতকগুলি জিজো মূর্ত্তি

দেখিলাম। দোতারা কাঠের হাতার করিয়া মূর্ত্তিগুলির মস্তকে জল ছিটাইতে ছিটাইতে বলিলেন—"শিশুগণের আত্মার হিসাব রাখিতে রাখিতে বিজোদেব ক্লান্ত। এইজন্য জননীরা ইহাকে এইরূপে ঠাণ্ডা করিয়া থাকেন।"

৪। জাপানে সংস্কৃত-প্রবর্ত্তক কোবো দাইশি

জাপানী বৌদ্ধ মহলে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর হইতেই পুরোহিত কোবো দাইশির নাম শুনিতেছি। কাল সেই জাপানী মহাত্মার প্রতিষ্ঠিত তীর্থক্ষেত্রে রাত্রি যাপন করিলাম। কোবো দাইশি খৃষ্টীয় ৭৭৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কোরিয়ার বৌদ্ধ প্রচারকগণ জাপানে আসিয়া নূতন ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সম্রাট শোতোকু তাইশি এই বিদেশীয় প্রচারকগণের সংরক্ষক ছিলেন এবং স্বয়ং বৌদ্ধ আদর্শে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাকে জাপানের অশোক বিবেচনা করা যাইতে পারে।

কোবো দাইশির পূর্ব্বে চীন, কোরিয়া ও ভারতবর্ষ হইতে সমাগত সুধীবৃন্দই জাপানে জ্ঞানালোক বিস্তার করিতেন। খাঁটি যামাতো সন্তানের কৃতিত্ব হরিলুজিযুগে (অর্থাৎ ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে) দেখা যায় না। অষ্টম শতাব্দীতে অর্থাৎ নারাযুগেও জাপানের স্বদেশী শিল্পী, পুরোহিত ও অধ্যাপকগণ বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন নাই। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে নিম্নবাসী কোবো দাইশি প্রাদুর্ভূত হন। ইনি একাধারে কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, দার্শনিক, শিক্ষক ও লিপিকর ছিলেন। ইনি চীনে যাইয়া মূলকেন্দ্র হইতে সকল প্রকার বৌদ্ধ বিদ্যা শিখিয়া আসেন এবং পরে স্বসমাজে তাহা সুপ্রচারিত করেন। চীনে ভারতপথাটক চীনাপণ্ডিত হুয়েন সাংয়ের স্থান যেরূপ, জাপানে চীনপর্য্যটক নিম্নসন্তান কোবো দাইশির স্থান সেইরূপ। ইনি জাপানের সর্ব্বপ্রথম "স্বদেশী" পণ্ডিত। ষষ্ঠ শতাব্দীর শোতোকুতাইশির পর অষ্টম শতাব্দীর কোবো দাইশি আজও জাপানী সমাজের সকল মহলে সাধুসন্ত পীর বা বুদ্ধাবতাররূপে পূজা পাইতেছেন। এই দুই মহাত্মার জীবনকথা না জানিলে জাপানী সভ্যতার গোড়ার কথা জানা হয় না।

আজকাল জাপানীরা কোবোদাইশির জন্ম তিথি উপলক্ষ্যে মহোৎসব করিয়া থাকেন। সাত আট বৎসর হইল এইরূপ উৎসবে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানাধ্যাপক তানিমোতো জাপানী ভাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার ইংরাজী অনুবাদ Japan Chronicleএ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধের নাম—"Kobo Daishi—His position in the history of Japanese civilisation."

কোরিয়া এবং চীনের ভাষা জাপানে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষার প্রবর্ত্তনও আবশ্যক হইয়া উঠে। কোবো দাইশির পূর্ব্বে কোন কোন জাপানী পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টায়ই সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ জাপানে বদ্ধমূল হয়।

তানিমোতো বলিতেছেন—"Though this language had been known in some small degree before, it was due to the efforts of the great Kobo Daishi that Sanskrit took deep root in this country.

In the book published during

the Kyobo era (about 1716 entitled Sittan-san-mitsu-sho it recorded that Sanskrit first inculcated Japan by Kobo Daishi. Among Kobo Daishi's various works there remains still a book concerning the Sanskrit language entitled Sittan-jibo—narabini—Shakugi.

This book, of course, apart from the deep secret meaning attached thereto, is quite simple and naive from the stand point of language, being the translation of the first number of Sanskrit spelling books consisting of twelve volumes, and may well be compared to an English primer."

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে জাপানে "কানা" নামক নূতন লিপি প্রচারিত হইয়াছে। লিপি-সংস্কারকগণ জটিল এবং দুর্বোধ্য বহুসংখ্যক চীনা চিত্র-লিপির স্থানে ৫০ টী সহজ ও সরল অক্ষর উদ্ভাবন করেন। এই অক্ষরগুলি দেখিতে দেবনাগরী অক্ষরের মত। অধ্যাপক তানিমোতো বলেন—"When one compares them with the Sanskrit, one will be impressed with the striking similarity. • • • If the fifty syllable table were taken from the Sanskrit it would not be unreasonable to conclude that the first Sanskrit Scholar Kobo Daishi was the inventor of these new characters."

কাল রাত্রে তাকাকুসুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোবো দাইশির মত সংস্কৃত প্রচারকের নাম জাপানী ইতিহাসে পাওয়া যায় কি?" ইনি বলিলেন—"খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে তোকুগাওযুগের শেষ অর্থাৎ বর্ত্তমান মেজি-যুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত আমি ৩০০ জাপানী সংস্কৃত বৈয়াকরণিকের নাম পাইয়াছি। অবশ্য ইহারা অনেকেই পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের অনুকরণ মাত্র করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে জাপানী ইতিহাসের কোন যুগেই আমাদের দেশে সংস্কৃত চর্চ্চা বন্ধ ছিল না। আমি আজকাল জাপানে সংস্কৃত প্রচারের তথ্যসমূহই অনুসন্ধান করিতেছি।" এই বলিয়া সহকারীকে একখানা কাপড়ে ঢাকা পুঁথি আনিতে বলিলেন পুঁথিখানার ভিতর জাপানী কানা এবং চীনা চিত্রলিপি দেখিলাম: তাকাকুসু কোন কোন পংক্তি দেখাইয়া বলিলেন—"এই দেখুন দেবনাগরী অক্ষর। দুঃখের কথা আমার গৃহে এক্ষণে নাগরী লিপিতে লিখিত জাপানী সংস্কৃত গ্রন্থ একখানাও নাই। নাগরী লিপি জাপানে সুপ্রচলিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রত্যহ পাইতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জাপানীরা ভারতীয় বিদ্যাসমূহ চীনা গুরুগণের নিকট শিক্ষা করিত। চীনারা সংস্কৃত ভাষা তাহাদের চিত্রলিপিতেই প্রচার করিত না কি? চীনে বোধ হয় দেবনাগরী কখনও সুপ্রচলিত হইতে পারে নাই। তাহা হইলে জাপানীরা সংস্কৃতভাষা শিখিবার সময়ে দেবনাগরী শিখিত কোথা হইতে?"

তাকাকুসু বলিলেন—"জাপানীরা চীনে যাইয়া শিখিত বটে কিন্তু চীনারাই চীনে একমাত্র গুরু ছিলেন না। চীনের বিদ্যালয়ে

মঠে ও মন্দিরে বহুসংখ্যক Brahmin Bishop বা ভারতীয় পুরোহিত বাস করিতেন। জাপানী শিষ্যেরা চীনের যেখানেই বিদ্যার্জ্জনের জন্য যাইত সেখানেই একসঙ্গে চীনা এবং হিন্দু অধ্যাপকের সংস্রবে আসিত। কাজেই ভারতীয় মূল প্রস্রবণের পরিচয়ও জাপানে পৌঁছিত। অধিকন্তু বহু ভারতীয় অধ্যাপক চীন হইতে জাপানেও আসিয়াছিলেন। সুতরাং দেবনাগরী অক্ষর শিখিবার সুযোগ জাপানীরা যথেষ্টই পাইয়াছিল বলিতে হইবে।"

সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন্‌সাঙ ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। তিনি যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার নিকটও জাপানী ছাত্রেরা ভারততত্ত্ব শিক্ষা করে। এইরূপ দুই জনের নাম শুনিলাম—দোশো এবং গেম্বো। কোবো দাইশির একশত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

দক্ষিণ চীন সম্বন্ধে তাকাকুসু বলিলেন—"বৌদ্ধপ্রধান আসল চীন ক্যাণ্টন-অঞ্চলে পাইবেন। ক্যাণ্টন বন্দরে বস্তুতঃ সমগ্র এশিয়ার প্রভাব পৌঁছিত। কেবল ভারতবর্ষ নয়, পারস্য এবং সুদূর আরব হইতেও এই নগরে লোক জনের আসা যাওয়া ছিল।" প্রাচীনকালের জাপানীরা ক্যাণ্টনকে "port of white and dark barbarians" বলিত। ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লেন দেন বেশী ছিল কি না বলা যায় না। ভারতীয় বণিকগণ দৈবক্রমে একবার জাপানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা জাপানী সমাজে তুলার বীজ বিতরণ করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর "কোজিকি" নামক জাপানী ইতিহাস গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। তাকাকুসু বলিলেন—"আজকাল আমাদের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতে দুইটি ভারতীয় সুর ও তালের নাচ গান বাজনা রক্ষিত হইতেছে। চম্পাদেশ (আধুনিক কালে যাহার নাম কোচিন চায়না বা করাসী চীন) হইতে ভারতীয় বাদক ও গায়ক আসিয়া নারা নগরের এক মন্দিরে এই রীতি প্রবর্ত্তন করেন।"

আমাদের দেশে যাঁহারা পালের বাঙ্গালা, চোলের দাক্ষিণাত্য, ভারতীয় জাহাজ ও বহির্ব্বাণিজ্য এবং বৃহত্তর ভারত ইত্যাদি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের পক্ষে হরিমূজিনারা এবং শোতোকু-তাইশি-কোবোদাইশি ইত্যাদির মূল বিশেষরূপেই আলোচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। অজন্তার চিত্রকলা বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য মহাযান সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদির প্রভাব বুঝিতে হইলে সমগ্র এশিয়া খণ্ডে বিচরণ করিতে হইবে। এইজন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের চীনে আড্ডা গাড়া আবশ্যক।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

জগন্নিত্যত্ববাদ

(Theory of the Eternity of the world.)

একদল দার্শনিক আছেন যাঁহারা মনে করেন, জগৎ যদি কার্য্যই হয় তবে না হয় ইহা কারণ জন্যই হইল, কেন না কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না ইহা সম্যক প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু জগৎ যে কার্য্য তাহারই বা প্রমাণ কি? একটা নিত্য অবিনশ্বর বস্তু সকল সম্প্রদায়কেই স্বীকার করিতে হইবে; যদি তাহাই হয় তবে জগৎকে সেই বস্তু বলিলেই ত সমস্ত গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। তাঁহারা সেইজন্য বলেন, "জগৎ কার্য্য (effect) নহে; ইহা সৎ, নিত্য বস্তু (uncaused and eternal entity)। যদি ইহা তোমরা অস্বীকার কর, তবে তোমাদেরই বা বিশ্রামস্থল কোথায়? তোমরা নিত্য বলিয়া যে বস্তু নির্দ্দেশ করিবে, আমরা জিজ্ঞাসা করিব, তাহারই বা কারণ কি; এই প্রকারে প্রশ্ন করিয়া তোমাদিগকে কোথায়ও বিশ্রামলাভ করিতে দিব না। অতএব নিত্য বস্তু যদি একটা মানিতেই হয়, তবে জগৎই সেই নিত্য বস্তু, ইহা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।" মীমাংসা দর্শনকারও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ"।

এক্ষণে দেখা যাউক ঐ সিদ্ধান্ত বিচারসহ কি না। আলোচনার প্রারম্ভেই তিনটি প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয়। ১। কার্য্যের লক্ষণ কি। ২। জগৎ শব্দের অর্থ কি? ৩। জগৎ কার্য্য কি না? কার্য্য কাহাকে বলে তাহার উত্তরে বলিতে পারা যায়,—যাহার উৎপত্তি (beginning) ও বিনাশ (dissolution) আছে, যাহা সাবয়ব (composite) তাহাই কার্য্য। প্রত্যেক ঘটনা (event), প্রত্যেক আরম্ভ (commencement), প্রত্যেক পরিবর্ত্তন (change) কার্য্য-শব্দের বাচ্য। জগৎ কাহাকে বলে, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্য কার্য্যকারণশৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয় সমষ্টিই জগৎ। তৃতীয় প্রশ্ন,—জগৎটা কার্য্য কি না? এক্ষণে এই তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতেছে।

জগৎটা কার্য্য কি না,—বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে জগতে কার্য্যের কোন চিহ্ন বা নিদর্শন পাওয়া যায় কি না। দেখিতে হইবে, জগৎ আরব্ধ বস্তু কি না—উহার উৎপত্তি বিনাশ আছে কিনা; উহা সাবয়ব কি না। আমরা দেখিতে পাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের কোনটিই নিত্য, নির্ব্বিকার নহে। কোনটিই স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভূ নহে। সমস্তই কার্য্য-কারণরূপী সার্ব্বভৌম শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও নিয়মিত। প্রত্যেক বস্তুই সঙ্ঘাত, সাবয়ব, আবির্ভাবতিরোভাবশীল। প্রত্যেক বস্তুই, অপরিমাণ অপেক্ষা অণুতর পরিমাণ সংযোগারব্ধ। অতি তীক্ষ্ণ বীর্য্যসম্পন্ন যন্ত্রাদি সাহায্যে ইহা প্রতীয়মান হইতে পারে। স্থূল বস্তুকে সূক্ষ্ম অবয়ব রাশিতে বিশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে। সূক্ষ্ম অবয়ব রাশিকেও আবার সূক্ষ্মতর অবয়বে বিচ্ছিন্ন করা যায়; এই প্রকারে সূক্ষ্মতর অবয়বকেও সূক্ষ্মতম উপাদানে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে। এই সূক্ষ্মতম উপাদানই

যে চরম উপাদান তাহাও সাহসপূর্ব্বক বলা যায় না; কেন না সেখানে যন্ত্রাদির বিশ্লেষণী-ক্ষমতা পরাহত হইয়াছে এই মাত্র, প্রত্যুত বিভাগের একান্ত (absolute) সীমা (limit) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে একথা বলা যায় না। যন্ত্রাদির শক্তি বর্দ্ধিত হইলে, যাহাকে এক্ষণে চরম উপাদান বা মূলভূত বলা যাইতেছে, দেখা যাইবে তাহা চরম উপাদানও নহে, মূলভূতও নহে; তাহাও সাবয়ব, কার্য্য। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বিজ্ঞান সত্তর পঁচাত্তরটি অবিশ্লিষ্ট ভূতকে (elements) মূলভূত (primary or simple elements) বলিয়া প্রচার করিয়াছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান সে ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করিতে তৎপর। আরও দ্রষ্টব্য; যদি মূল উপাদানগুলির সত্তাই স্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা জগদ্বিত্যত্তার সাহায্য হয় কি প্রকারে? ঐ মূলভূতগুলিই কি জগৎ! তাহারা জগদারম্ভক বটে, কিন্তু তাহারাই জগৎ নহে; তাহারা অতীন্দ্রিয় পদার্থ; তাহারা যখন মিলিত হইয়া স্থূলত্বে উপস্থিত হয় তখনই আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়; যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ তাহারা জগৎ শব্দবাচ্য নহে। অতএব আমাদের অভিজ্ঞতায় এমন কোন বস্তু পতিত হয় না, যাহাকে মূল, অবিশ্লেষণীয়, অবিভাজ্য নিত্য বস্তু বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

দুঃখের বিষয় John Stuart Mill—যাঁহার মতে বাহ্যজগতের অস্তিত্বই অসিদ্ধ—যাঁহার মতে জড় is the permanent posibility of sensations—এ সম্বন্ধে এক অভিনব মতের প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন:—

"There is in nature a permanent element, and also a changeable: the changes are always the effects of previous changes; the permanent existences, so far as we know, are not effects at all. It is true we are accustomed to say not only of events, but of objects, that they are produced by causes, as water by the union of hydrogen and oxygen. But by this we only mean that when they begin to exist, their beginning is the effect of a cause. But their beginning to exist is not an object, it is an event. • • • But that which in an object begins to exist, is that in it which belongs to the changeable element in nature; the outward form and the properties depending on mechanical or chemical combinations of its component parts. There is in every object another and a permanent element—viz., the specific elementary substance or substances of which it consists and their inherent properties. These are not known to us as beginning to exist: within the range of human knowledge they had no beginning, and consequently no cause: though they themselves are causes or uncauses of every thing that takes place. Experience, therefore, affords no evidences, not even analogies,

to justify our extending to the apparently immutable, a generalisation grounded only on our observation of the changeable."

[Three Essays on Religion – pp. 142-143.]

ইহার মর্ম্মার্থ এই প্রকার—"প্রকৃতির মধ্যে দুই শ্রেণীর বস্তু আছে। এক শ্রেণীর বস্তু নিত্য, অপর শ্রেণীর বস্তু অনিত্য। বস্তুর মধ্যে যেটা আগন্তুক অংশ তাহাই বিকার বা পরিবর্ত্তন; আর উহার মধ্যে যে অংশটা স্থির, তাহাই নিত্য এবং সনাতন। সাধারণ কথায় আমরা বস্তুমাত্রকেই কার্য্য বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কথা ঠিক নহে; বস্তুর আকৃতি, অবয়ব প্রভৃতি আগন্তুক ধর্ম্মই কার্য্য উহার ভিতরে যে স্বয় একটি সত্তা আছে তাহা কার্য্য নহে। আমাদের অভিজ্ঞতার এমন কোন প্রমাণ বা সাদৃশ্য নাই যাহার বলে আমরা এই অনিত্য অংশ সম্পর্কিত কোন নিয়মকে বস্তুর নিত্যসত্তাতেও প্রসারিত করিতে পারি।"

অন্যত্র (Examn.—Theory of causation) Mill এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—"The matter composing the universe, whatever philosophical theory we hold concerning it, we know by experience to be constant in quantity; never beginning or ending, only changing its forms. But its forms have a beginning and ending: and it is its forms, or rather its changes of form—the end of one form and beginning of another—which alone we seek a cause for, and believe to have a cause. It is *events*, that is to say, *changes*, not substances that are subject to the law of causation."

এক্ষণে দেখা যাউক Millএর এ মতটি যুক্তিসঙ্গত কি না। Mill বলেন কার্য্য নামধেয় বস্তুর মধ্যে যাহা প্রকৃত কার্য্য তাহা বস্তুর আকৃতি, অবয়ব প্রভৃতি আগন্তুক ধর্ম্ম। কিন্তু ইহা ব্যতীত ঐ বস্তুর মধ্যে একটা নিত্যসত্তা (substance) আছে, যাহা কার্য্য-পদবাচ্য নহে। জিজ্ঞাসা করি প্রকৃতি-রাজ্যে এই যে নিত্যসত্তার (substance) কথা বলা হইল, ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য, না প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য? ইহার সহিত কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ-ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ঘটিয়াছে কি? জগতে বস্তু-সত্তার সমষ্টি অপরিবর্ত্তনীয় এ সত্যটা যে স্বতঃসিদ্ধ বা প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য নহে তাহা Millএর নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতেও বুঝা যাইতে পারে। "But we can conceive both a beginning and an end to all physical existence. As a mere hypothesis, the notion that matter cannot be annihilated arose early; but as a settled belief, it is the tardy result of scientific enquiry. All that is necessary for imagining matter annihilated is presented in our daily experience."

বিশেষতঃ Mill এখানে স্পষ্টতঃ বস্তুসত্তা ও আকৃতি বা রূপের প্রভেদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা কি এই আকৃতি বা রূপ ব্যতীত আর কিছু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি? এই আকৃতি বা রূপের অতিরিক্ত যে একটা বস্তুসত্তা আছে,

আমরা কখন কি তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি। যাহাকে পরমাণু বলা হয়, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে; এবং যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হওয়া ইহাদের পক্ষে কখনো সম্ভাবনীয় হয়, তথাপি উহার আগন্তুক আকৃতি বা রূপের অতিরিক্ত সত্তা যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে না তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। বাহ্যজগতে আকৃতি ও বস্তু-সত্তা পরস্পর আপেক্ষিক। যাহা একটির অপেক্ষায় আকৃতি তাহা অপরটির অপেক্ষায় বস্তুসত্তা; আবার যাহা একটির অপেক্ষায় বস্তুসত্তা তাহা অপরটির অপেক্ষায় আকৃতি বা রূপ। বস্তুসত্তা, বাঁধা কপির ন্যায়, কাল্পনিক পদার্থ। কপি ও তাহার পত্র, কথায় প্রভিন্ন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ পত্র ব্যতীত যেমন কপির সত্তা নাই, বস্তুসত্তা ও রূপ সম্বন্ধেও সেই প্রকার। বলিতে কি, বহির্জগতে মূলাপি বস্তুসত্তার সহিত আমাদের পরিচয় নাই; আমরা দেখি রূপ, জানি রূপ। Mill একথা নিজেও অবগত আছেন। তিনি অন্যত্র বলিতেছেন—

"It would be quite warranted by the practice of metaphysicians, to call any compound the form of its component elements; water, for instance, the form of hydrogen and oxygen. And since there is nothing that may not be regarded as matter relatively to something which can be constructed out of it, and which is form relatively to it, but matter relatively to some thing we have form within form, like a nest of boxes." (১)

পরমাণুর দোহাই দিয়া বস্তুসত্তা সিদ্ধিকরাও দুর্ঘট। তাহা পরমাণুবাদ প্রস্তাবে আলোচিত হইবে। কিন্তু Mill বস্তুসত্তা অর্থে শক্তিসত্তা—শক্তির অবিনাশিত্ব ও অপরিবর্ত্তনীয়তাই লক্ষ্য করিয়াছেন। কেন না তিনি বলিতেছেন—(২)

Whenever a physical phenomenon is traced to its cause, that cause when analysed is found to be a certain quantum of force, combined with certain collocations. And the last great generalisation of science, the conservation of force, teaches us that the variety in the effects depends partly upon the *amount* of the force and partly upon the diversity of the collocations. "The force itself is essentially one and the same; and there exists of it in nature a fixed quantity, which (if the theory be true) is never increased or diminished. Here then, we find, even in the changes of material nature, a permanent element, to all appearance the very one of which, were in quest. This it is apparently to which, if to anything, we must assign the character of First Cause, the cause of the other material universe. পুনশ্চ—"The

(1) Examination. ...s Logic the science of the Laws or forms of thought?
(2) Mill's Three Essays on Religion.

First cause can be no other than force."

শক্তির অবিনাশিত্ব ও অপরিবর্ত্তনীয়তা সম্বন্ধেও স্থানান্তরে আমার আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে; সুতরাং এস্থলে সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তবে Mill যে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, সেইটুকু মাত্র আমি প্রদর্শন করিতেছি। শক্তির নিত্যতা সম্বন্ধে যতদূর বলা সম্ভাব্য তাহা তিনি এস্থলে বলিয়াছেন। কিন্তু আবার স্থানান্তরে তিনি এ কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া বসিয়াছেন। সেখানে শক্তির সত্তা ও সত্যতা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রবন্ধে আলেকজাণ্ডারের প্রতিবাদে তিনি কি বলিয়াছেন শুনুন—(৩) "Ability and force are not real entities which can be felt as present when no effect follows; they are abstract names for the happening of the effect on the occurrence of the needful conditions, or for our expectations of happening."

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, যদি শক্তি কার্য্যগম্য—কার্য্যের পূর্ব্বে অসৎ—পদার্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের সহিত এ বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? উপরে বলা হইয়াছে শক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা—সকলের মূল কারণ—নিত্যসত্তা। এক্ষণে বলা হইল—উহার কিছুমাত্র সত্তা নাই; উহা কার্য্য ঘটনারই একটা কাল্পনিক নাম। Millএর কোন বাক্য বিশ্বাস্য তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি কারণতাবাদ প্রভাবে শক্তির সত্তা খণ্ডন করিতে বদ্ধপরিকর। তাই তিনি সেখানে শক্তির বোধই অস্বীকার করিতেছেন। এখানে আবার তাহার উল্টা সুর ধরিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।

কোন কোন দার্শনিক হয় ত বলিয়া বসিবেন—"স্বীকার করিলাম জগৎ সাবয়ব অতএব প্রাগভাবপ্রতিযোগি অর্থাৎ কার্য্য। এই কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত বক্ষ্যমান প্রকার।

অসংখ্য পরমাণু অনন্তশূন্যে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করিতে করিতে একদা অকস্মাৎ দলবদ্ধ হইয়া এই বিশাল বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। পরমাণুগুলি স্বতঃ নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়; আপনা আপনি দল বাঁধিতে পারে না। কিন্তু অকস্মাৎ (fortuitously) পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সাবয়ব (compound) বস্তুর কারণ হইয়া থাকে। এই যে পরমাণুর কথা বলিলাম অনুমানগম্য পদার্থ, ইন্দ্রিয়গোচর নহে। একবার দলবদ্ধ হইলে তখন উহাদের মধ্যে শক্তির উদ্ভব হয়, এবং সেই শক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ চৈতন্যের বিকাশ হইলে পরমাণুগুলি জৈব ও অজৈব organic ও inorganic এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। জগতে তখন নিয়ম সংস্থাপিত হয়, এবং সেই নিয়মাধীন অন্যান্য সকল কার্য্যই হইতে থাকে।"

এ প্রকার যুক্তি-হেতু-বিরহিত অসার কল্পনার প্রতিবাদে সময়ব্যয় যত অল্প হয় ততই মঙ্গল। তাই দুই একটি কথা মাত্র বলিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

১। পরমাণুগুলি সিদ্ধ পদার্থ (demonstrated facts) কি না সে তর্কে আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই। তাহা স্বীকার করি-

(3) Exam. Freedom of the will.

যুই লইতেছি। প্রথমতঃ কার্য্য স্বীকার করিলে যে কার্য্যের কারণ থাকাটাও স্বীকার করিতে হয় এই ভাবুকবৃন্দ তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। কার্য্যকারণ আপেক্ষিক (correlative) শব্দ; একটি থাকিলেই অপরটি থাকিবে—ইহা ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। বাধ্য হইয়া জগতের একটা কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া ইঁহারা পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু উহারা স্বতঃ পরস্পর মিলিত হইতে পারিবে না, উহাদিগকে নিষ্ক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় বলিয়া তাহারও একটা ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। অথচ মিলন ব্যতীত সংঘাত বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না ইহাও তাঁহারা জানিতেন। অগত্যা, এই সংযোগ সিদ্ধ করিতে যাইয়া, আকস্মিক আরম্ভবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু কার্য্য তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে কচিৎ সহেতুক কচিৎ অহেতুক হইবে জগতে এমন একটা নৈসর্গিক বিধান আছে কি? পরমাণুই বা ইহারা স্বীকার করেন কেন? জগৎ ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য নহে কি? যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদিগকে হয় স্বতঃপ্রবৃত্ত (spontaneously active) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, আর না হয়, তাহাদের মিলনকে কারণান্তর সাপেক্ষ বলিয়া মানিতে হইবে। ইহা না মানিলে, পরমাণুসত্তা স্বীকার করিবার যে উদ্দেশ্য তাহা ব্যর্থ হয়। এই দার্শনিকেরা যখন পরমাণুকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তখন কারণান্তর স্বীকার ব্যতীত কদাচ ইহাদের সংযোগ সংঘটিত হইতে পারে না।

২। দলবদ্ধ হইলে পরমাণুর মধ্যে শক্তির আবির্ভাব হয়, কিন্তু দলবাঁধন ক্রিয়াটা আকস্মিক, অহেতুক; অথচ পশ্চাৎ উৎপন্ন কার্য্যগুলি নিয়ম ও কারণ পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়—ইহা বড় আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত। জিজ্ঞাসা করি, এই যে কচিৎ কারণাপেক্ষা (dependence on a cause) এবং কচিৎ কারণ অনপেক্ষা (independence of a cause) ইহার কোন নিয়ামক (determinant factor) আছে কি না? যদি না থাকে, তবে কিছুই ব্যাখ্যাত হইল না; যদি থাকে, তবে 'অকস্মাৎ' শব্দই নিরর্থক।

৩। অকস্মাৎ উৎপত্তি চিন্তাবিরুদ্ধ, অতএব অসম্ভব। ইহা শূন্যোৎপত্তিবাদ প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। * ইত্যাদি যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উক্তমতবাদটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অতঃপর পরমাণুর স্বভাব, ও নিত্যতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী

---

* উপাসনা মাঘ—দ্রষ্টব্য।

বর্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ

(৪)

ক্ষীরগ্রামের মেলা

ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন পল্লী। এই স্থান নবনির্ম্মিত বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলপথের দুই মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই রেলপথে নিগনগ্রামে যে ষ্টেশন হইয়াছে তাহারই নাম ক্ষীরগ্রাম ষ্টেশন।

ভারতবর্ষীয় ৫১ পীঠস্থানের মধ্যে ক্ষীরগ্রাম একটী মহাপীঠ, এখানে বিষ্ণুচক্র-ছিন্ন ভগবতীর দক্ষিণ-অঙ্গুষ্ঠ পতিত হইয়াছিল। এখানকার শক্তি যোগাদ্যা (যুগাদ্যা) ও ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠক। যথা :—

"কৃতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃক্ষীরকণ্ঠকঃ।
যোগাদ্যা সা মহাদেবী দক্ষাঙ্গুষ্ঠপদে নমঃ॥
(সংস্কৃত পীঠমালা।)

"ক্ষীরগ্রামে ডানি পায় অঙ্গুষ্ঠ ভৈরব।
যোগাদ্যা দেবতা ক্ষীরকণ্ঠক ভৈরব॥"
(অন্নদামঙ্গল)

ক্ষীরগ্রামের পশ্চিমে অবস্থিত নিগনগ্রামে লিঙ্গেশ্বর, পূর্ব্বে অবস্থিত গীরগ্রামে গীরেশ্বর, দক্ষিণে অবস্থিত পুঁইনী পলাসীতে পাতালেশ্বর এবং উত্তরে অবস্থিত শীতলগ্রাম বা সিদ্ধলগ্রামে সিদ্ধেশ্বর নামে চারিটী সয়ম্ভুশিবলিঙ্গ আছেন; কথিত আছে যে, ক্ষীরগ্রামের মহাপীঠ রক্ষার জন্যই এই চারিটী অনাদি লিঙ্গ শিবের আবির্ভাব।

ক্ষীরগ্রামের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির এখন আর কিছুই নাই; সর্ব্বগ্রাসী কাল সমস্তই গ্রাস করিয়াছে।

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্র ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালনের জন্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত বনে গমন করেন, সেই সময় লঙ্কাধিপতি রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। ভগবান রামচন্দ্র হনুমানকে সীতা অন্বেষণে লঙ্কায় প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, হনুমান লঙ্কায় উপস্থিত হইলে রাবণের উপাস্যা লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী উগ্রচণ্ডা হনুমানকে স্বর্ণলঙ্কা প্রদান করিয়া স্বয়ং পাতালে মহীরাবণের গৃহে গমন করেন, এবং তথায় ভদ্রকালী নামে পরিচিত হন। তৎপরে মহীরাবণ যখন রাম লক্ষ্মণকে নিহত করিবার বাসনায় পাতালে লইয়া যান, সেই সময় হনুমান পাতালে গমনপূর্ব্বক মহীরাবণকে নিহত করিয়া রাম লক্ষ্মণের উদ্ধার সাধন করেন এবং রাম লক্ষ্মণসহ দশভূজা উগ্রচণ্ডা দেবী ভদ্রকালীকে মহাপীঠ ক্ষীরগ্রামে লইয়া আসেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা ক্ষীরগ্রামে এক বিচিত্র দেউল নির্ম্মাণ করেন এবং সেই মন্দিরে স্বয়ং রামচন্দ্র সেই দশভূজা উগ্রচণ্ডা দেবীকে স্থাপন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। পীঠেশ্বরী যোগাদ্যার নামানুসারে উগ্রচণ্ডা দেবী যোগাদ্যা নামে পরিচিত হন। সেই সময় ক্ষীরগ্রামে হরিদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। দেবী ভগবতী রাজা হরিদত্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রত্যহ একটী করিয়া নরবলি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে আদেশ দিলেন। যথা :—

৺বাহারাম বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "যোগাদ্যাবন্দনা"য়—

"বন্দিবে যোগাদ্যা ঘুগ আদ্যাশক্তি মাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ দাতা॥
ভয়ঙ্কর ঘোর মূর্ত্তি তীক্ষ্ণ খড়্গ হাতে।
উগ্রচণ্ডা নামে দেবী আছিল লঙ্কাতে॥
তাঁর পূজা রাবণরাজা ক'রে বহুকাল।
বাহু বলে স্বর্গ মর্ত্ত্য জিনিল পাতাল॥
দৈবযোগে বনবাসে গেলেন শ্রীহরি।
দণ্ডকারণ্যেতে রামের সীতা কৈল চুরি॥
সীতা হারা হয়ে রাম মনে পেয়ে শঙ্কা।
অন্বেষণে হনুমানে পাঠাইলা লঙ্কা॥
হনুমানে স্বর্ণ লঙ্কা সমর্পণ করি।
পাতালে মহীর ঘরে গেলেন শঙ্করী॥
রাবণতনয় সেই মহীরাবণ নাম।
পাতালে হরিয়া নিল লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥
হনুমান গেলা তথা রামের উদ্দেশে।
রামের উদ্ধার কৈল বধিয়া রাক্ষসে॥
সঙ্গে করি নিয়া হরি আনিল দশভুজা।
ক্ষীরগ্রামে আসিয়া দেবীর কৈল পূজা॥
বিশ্বকর্ম্মা রামাজ্ঞায় হয়ে আগুয়ান।
বিচিত্র মেউল এক করিল নির্ম্মাণ॥
মহাপীঠে মহামায়া করিয়া স্থাপনা।
যোগাদ্যার নামে নাম করিলা ঘোষণা॥
হরিদত্ত নামে রাজা আছিল শুইয়া।
স্বপ্নেতে কহিল মাতা শিয়রে বসিয়া॥
কত নিদ্রা যাও রাজা হয়ে অচেতন।
কৈলাস ছাড়িয়া আইনু তোমার ভবন॥
তোমারে সদয় আমি দেবী ভদ্রকালী।
মোর পূজা কর নিত্য দিয়া নরবলি॥
বহুস্তুতি করে রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে।
করিব তোমার পূজা নিজ সুত দিয়ে॥"

রাজা হরিদত্তের সাত পুত্র ছিল। তিনি সাত দিন নিজের সাত পুত্রকে বলি দিয়া দেবীর পূজা করিলেন। তৎপরে প্রত্যহ একটী করিয়া নরবলির জন্য ঘরে ঘরে পালা করিয়া দিলেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী সকলেই আপন আপন "পালামত" নরবলি প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবীর পূজারি ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের একটী মাত্র পুত্র ছিল। ব্রাহ্মণ সেই প্রাণাধিক পুত্রকে বলি দিতে পারিবেন না ভাবিয়া রাত্রিকালে স্ত্রী পুত্র লইয়া গোপনে গ্রাম হইতে পলায়ন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। তখন দেবী যোগাদ্যা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে মধ্য পথে ব্রাহ্মণকে গমনে বাধা প্রদান করিয়া কহিলেন "ব্রাহ্মণ, কি জন্য রাত্রিকালে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছ?" ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"মা, বলিতে ভয় পাই, আমাদের গ্রামে যোগাদ্যা নামে এক রাক্ষসী এসেছে, সেই রাক্ষসীর করাল কবল হইতে প্রিয়তম পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করিতেছি।" যথাঃ—

"সাতদিন পূজা করে দিয়ে সাত বালা।
অবশেষে ক'রে দিল ঘরে ঘরে পালা॥
সকল লোকের পালা শেষ হৈয়া গেল।
পূজারি ব্রাহ্মণের পালা একদিন হৈল॥
এক পুত্র বিনা মোর আর পুত্র নাই।
কি দিয়া পূজিব আমি অভয়ার ঠাঁই॥
প্রাণ রক্ষা নাহি পাই ক্ষীরগ্রামে রয়ে।
স্ত্রী পুত্র লয়ে দ্বিজ যায় পলাইয়ে॥
রাত্রে উঠে দ্বিজবর পলাইয়ে যায়।
মন্দিরে বসিয়া দেবী দেখিবারে পায়॥
আমার ভয়েতে দ্বিজ পলাইয়ে যায়।
মন্দিরে বসিয়া দেবী মনে বিচারয়॥
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে দাঁড়াইলা গিয়া।
মায়া করি মহামায়া পথ আগুলিয়া॥

দ্বিজের নন্দন হয়ে কেন এ সময়।
এত রাত্রে কোথা যাও প্রাণে পেয়ে ভয়।
ব্রাহ্মণ বলেন মাতা কহিতে ভয় বাসি।
যোগাদ্যা নামেতে এক এসেছে রাক্ষসী।
প্রাণ রক্ষা নাহি পাই ক্ষীরগ্রামে রয়ে।
স্ত্রী পুত্র লয়ে তাই যাই পলাইয়ে।"

(যোগাদ্যা বন্দনা)

এই কথা শুনিয়া ছদ্মবেশধারিণী যোগাদ্যা কহিলেন—

"যার ভয়ে পলাইছ সেই দেবী আমি।"

তখন ব্রাহ্মণ অতিশয় ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলী-পুটে কহিলেন, "আপনি যে ভগবতী একথা বিশ্বাস হয় না, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করান তবে বিশ্বাস করি।" তখন ভগবতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিজ মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া কৃতার্থ করিলেন। যথা :—

যোগাদ্যা বন্দনায়—

"তুমি ভগবতী দেবী প্রত্যয় না হয়।
ছলনা করিয়া কেন ভণ্ডাহ আমায়॥
• • • •
ভকতবৎসলা মাতা দেবী কাত্যায়নী।
হইলেন বিপ্র অগ্রে মহিষমর্দ্দিনী॥"

সেই দিন হইতে দেবীর আদেশে বাধ্যতা-মূলক নরবলি প্রথা বন্ধ হইল; কিন্তু নরবলি প্রথা একবারে রহিত হইল না। যথা :—

"আজি হতে ভয় আর না করিহ মোরে।
আনন্দে করগে বাস ফিরে যাও ঘরে।
বৎসর অন্তর নর আপনি আসিবে।
মহাপূজার দিনে তারে বলিদান দিবে॥"

(যোগাদ্যা বন্দনা)

ক্ষীরগ্রামের নরবলি প্রথা ইংরাজরাজের আমলেই একবারে বন্ধ হইয়াছে।

ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদত্ত দেবীর নিকটে নিজের যে সাত পুত্রকে বলি দিয়াছিলেন, দেবীর কৃপায় ঐ সময়—তাঁহারাও পুনর্জীবন লাভ করিলেন। এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সন্দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভগবতী যোগাদ্যাও অন্তর্দ্ধান পূর্ব্বক স্বমন্দিরে গমন করিলেন। যথা :—

"হরিদত্ত সাত পুত্রে বলি দিয়ে ছিল।
দেবীর কৃপাতে তারা জীবন পাইল।
দেখিয়া শুনিয়া দ্বিজ ফিরিয়া আসিল।
ভগবতী অলক্ষ্যে আপন ঘরে গেল॥"

(যোগাদ্যা বন্দনা)

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মহা জাগ্রৎ দেবী বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে এক সময়ে দেবী যোগাদ্যা ভানুদত্ত নামক এক শাঁখারীর নিকট 'ধামাচে' নামক পুষ্করিণীর ঘাটে শাঁকা পরিয়াছিলেন। এই 'ধামাচে' পুষ্করিণীতে পূর্ব্বে যোগাদ্যা অবস্থান করিতেন। এক্ষণে পুষ্করিণীটী মজিয়া গিয়াছে, উহাতে আর বেশী জল থাকে না, সেই জন্য বর্দ্ধমান মহারাজের "ক্ষীরদীঘি" নামক পুষ্করিণীতে যোগাদ্যাকে রাখা হয়। যোগাদ্যা সমস্ত বৎসরই জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকেন, কেবল মাত্র বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন মহাপূজার সময় একদিনের জন্য উত্তোলিত হইয়া থাকেন। যথা :—

"একদিন মহেশ্বরী সরোবর তটে।
স্নান ছলে বসিয়াছে ধামাচের ঘাটে॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা বসে করেন শঙ্করী।
হেন কালে শঙ্খ লয়ে আইল শাঁখারী॥
ডাক দিয়া-বলে দেবী শাঁখারীর তরে।
কিসের পসরা তব মস্তক উপরে॥
শাঁখারী বলিছে ভানুদত্ত মোর নাম।
শঙ্খ বেচিবারে আমি যাব ক্ষীরগ্রাম॥
শঙ্খ নামে শঙ্করীর ভুলে গেল মন।
আনহ শাঁখারী শঙ্খ দেখিব কেমন॥

এত শুনি এল বেণে ধামাচের ঘাটে।
শঙ্খ নামাইয়া দিল দেবীর নিকটে।
শ্রীরাম নামেতে শঙ্খ দেখি দুই বাই।
শঙ্খ দেখি মহামায়ী হৈল মহা মাই।
দেবী বলেন দুই বাই শঙ্খ সব আমি।
ইহার উচিত মূল্য কত লবে তুমি।
শঙ্খের উচিত মূল্য পাঁচ গণ্ডা লয়ে।
দুই বাই শঙ্খ মোরে দেহ পরাইয়ে।
বণিক বলিল তুমি বসে আছ একা।
তোমারে পরাতে শঙ্খ মনে পাই শঙ্কা।
কাহার বহরি তুমি কাহার ঝিয়ারি।
তুমি শঙ্খ পরিলে কে দিবে টাকা কড়ি।
দেবীবলে শুন বেণে পরিচয় দি।
পূজারী ব্রাহ্মণ আছে আমি তার ঝি।
এই কথা বলো মোর পিতার নিকটে।
তব কন্যা শঙ্খ পরে ধামাচের ঘাটে।
গন্ধীরের কোলদাতে পাঁচ গণ্ডা আছে।
শঙ্খ পরাইয়ে টাকা লবে পিতার কাছে।
অভয়ার মায়া বেণে বুঝিতে নারিল।
দেবীর নিকটে শঙ্খ পরাতে বসিল।"

(যোগাদ্যা বন্দনা)

দেবীকে শাঁখা পরাইয়া পূজারী ব্রাহ্মণের নিকট শাঁখার মূল্য লইতে আসিয়া শাঁখারী জানিতে পারিল যে, সে দেবী যোগাদ্যাকে শাঁখা পরাইয়াছে। তখন শাঁখারী প্রতিজ্ঞা করিল "যতদিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন মহাপূজার দিন স্বয়ং যাত্রা ভগবতীকে শাঁখা যোগাইব এবং আমার বংশধরগণকে আদেশ করিয়া যাইব যেন তাহারা আমার মৃত্যুর পর যে কোন কালে যে কেহ আমার বংশে থাকিবে সেই মহাপূজার দিন মহামায়াকে শাঁখা যোগায়।" যথাঃ—

"শঙ্খ পরাইয়ে বেণে করিল গমন।
দ্বিজের নিকটে আসি দিল দরশন।
কি কর সো দ্বিজবর গৃহেতে বসিয়া।
তোমার কন্যাকে এলাম শঙ্খ পরাইয়া।
টাকা দিয়া বিদায় কর বসে কর কি।
ধামাচের ঘাটে শঙ্খ পরিল তব ঝি।
ব্রাহ্মণ বলিল বেণে তোরে আমি কই।
কার কন্যা শঙ্খ পরে মোর কন্যা নাই।
বণিক বলিল ঠাকুর ক্ষমা দেহ মোরে।
পাঁচ গণ্ডা দেখ গিয়া গন্ধীরা ভিতরে।
এত শুনি দ্বিজবর দেখিবারে যায়।
গন্ধীরার কোলদেতে পাঁচ গণ্ডা পায়।
বণিকের কথা দ্বিজ মনে বিচারিয়া।
টাকা পেয়ে বণিকের পায়ে ধরে গিয়া।
শাঁখারী বলিল ঠাকুর পা ছেড়ে দাও।
কে শঙ্খ পরিল দ্বিজ সত্য করে কও।
দ্বিজ বলে ওরে বণিক কি বলিব আর।
শতেক পুরুষ তব হইল উদ্ধার।
তোমার ভাগ্যের কথা কিবা দিব লেখা।
যুগের যোগাদ্যা মাকে পরাইলি শাঁখা।
মাথার পসরা বেণে ফেলে টান দিয়া।
চলিল ধামাচের ঘাটে মা, মা, বলিয়া।
ব্রাহ্মণ বণিক দোঁহে উর্দ্ধমুখে ধায়।
ঘাটে নাহি জগদম্বা দেখিতে না পায়।
যোড় হস্তে ব্রাহ্মণ দেবীকে করে স্তুতি।
কৃপাকরি দরশন দেহ ভগবতী।
যদি দরশন মাগো না দিবে আমারে।
ব্রহ্মহত্যা হব আমি তোমার উপরে।
ব্রাহ্মণের বাক্যে দেবী মনে পাই ভয়।
জল হ'তে দুই বাই শঙ্খ যে দেখায়।
বণিক বলিল আমি যত কাল জীব।
মহাপূজা দিনে শঙ্খ দুই বাই দিব।
কালেতে আমার বংশে যে কেহ রহিবে।
পূজার দিবস শাঁখা অবশ্য যোগাবে।

(যোগাদ্যা বন্দনা)

এই শাঁখারীর বাটী বর্দ্ধমান জেলায় কতুই

গ্রামে ছিল। এখন তাঁহার বংশধরগণ ঐ গ্রামে বাস করেন।

দেবী যোগাদ্যার "জটাজুট সমাযুক্তাং অর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাং লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাং অতসী পুষ্পবর্ণাভ্যাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাং।" ইত্যাদি—শাক্তদীক্ষা দুর্গার ধ্যানে পূজা হইয়া থাকে। ক্ষীরগ্রামে দেবী যোগাদ্যার পূজার সম্বন্ধে যে সকল বিধিনিষেধ প্রচলিত আছে তাহার বিবরণও আমরা নিম্নে "যোগাদ্যা বন্দনা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথাঃ—

"শুন রাজা পূজার নিয়ম আমি বলি।
কদাচ ভুলনা ইহা পালিবে সকলি॥
সমস্ত বৈশাখ হিংসা না করিবে মাটী।
সলিতা না পাকাবে অগ্নি না দিবে কাটি॥
চক্রাকার যেন ক্ষীরগ্রামে নাহি বেশ।
স্ত্রীপুরুষে শয়ন নাহি সমস্ত বৈশাখ॥
পূর্ণগর্ভা নারী যার হবে শুভ ঘরে।
সমস্ত বৈশাখ তারে রেখ স্থানান্তরে।
পাকচক্র কভু ক্ষীরগ্রামে নাহি রেখ।
দিবে না মাথায় ছত্র সমস্ত বৈশাখ॥
আর যাহা বলি আমি শুন সাবধান।
সমস্ত বৈশাখ মাসে না ভানিবে ধান॥
আদি অন্ত বৈশাখের পক্ষ পক্ষ দিনে।
লিখিবেনা কভু আর লগনের দিনে॥
অন্যদিনে আলতায় লিখ সর্ব্বজন।
কালিতে লিখিলে হবে নিয়ম লঙ্ঘন।
সমস্ত বৈশাখ মাসে না বহিবে হাল।
সংক্রান্তি দিবসে পূজা হবে চিরকাল॥
উত্তর দুয়ারি ঘরে না করিবে বাস।
সন্ধ্যাকালে আরতি করিবে বারমাস॥"

সামাজিক ভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দেবী যোগাদ্যার পূজার যে সকল বিধি নিষেধ প্রচলিত আছে সেইগুলিই ক্ষীরগ্রাম সমাজের রক্ষক, চালক এবং সংস্কারক।

ক্ষীরগ্রামে দেবীর যে প্রাচীন আদি শ্রীমূর্ত্তি ছিল, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই আদি শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া বর্দ্ধমান মহারাজের ব্যয়ে বর্দ্ধমান জেলার দাঁইহাট নিবাসী ভারতবিখ্যাত প্রস্তরশিল্পী ৺নবীনচন্দ্র ভাস্কর দেবীর বর্ত্তমান মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নবনির্ম্মিত মূর্ত্তি অবিকল প্রাচীন আদি মূর্ত্তির অনুরূপ হইয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় মূর্ত্তিই দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখেই একথা শুনিয়াছি।

এক্ষণে দেবী যোগাদ্যার সেবা বর্দ্ধমানাধিপতির ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সেবার বন্দোবস্ত ভালরূপই আছে। প্রত্যহ উদ্দেশে দেবীর নিয়মমত পূজা, ভোগ ও শীতলাদি হইয়া থাকে। যোগাদ্যাদেবীর ভোগের জন্য যে মাষকলাইএর ডাল পাক হইয়া থাকে, তাহা বড়ই উপাদেয়, ঐরূপ অমৃতের ন্যায় ডাল বোধ হয় কোথাও হয় না।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরগণের ব্যয়েই যোগাদ্যার বর্ত্তমান মন্দির ও গম্ভীরা প্রভৃতি নির্ম্মিত। বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত যোগাদ্যার প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন মাত্রও নাই, কেবল পাতাল হইতে যে সুরধুনীর ধারা হনুমান দেবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন সুরধুনীর একখানি বৃহৎ প্রস্তর আচ্ছাদিত অবস্থায় আছে। কেহ কেহ বলেন নরবলি দিয়া সেই ছিন্ন নরদেহ ঐ সুরধুনীতে নিক্ষেপ করা হইত।

বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি দেবী যোগাদ্যার মহাপূজার দিন। ঐ দিন ভোরে দেবীকে ক্ষীরদীঘির জল হইতে উত্তোলন করা

হয় এবং রাত্রিতে পুনর্ব্বার দেবীকে ক্ষীর-দীঘির জলে ডুবাইয়া রাখা হয়।

দেবীকে ক্ষীরদীঘির জল হইতে উত্তোলন করিয়া প্রথমে ক্ষীরদীঘির পূর্ব্বপাড়ে উথান মন্দিরে রাখা হয়। উথান মন্দিরে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের, কৃষ্ণনগরের মহারাজের, পাটুলির (বর্ত্তমানে সেওড়াফুলির) রাজাদের ও চুপীর সেওয়ান মহাশয়দিগের পূজা ও বলিদান হয়। তৎপরে "মাচ" পূজা হয়। ক্ষীরগ্রামে ক্ষীরদীঘির নিকটেই দুইটী "মাচ" আছে। একটী পুরাতন "মাচ", আর একটী নূতন "মাচ"। এক্ষণে নূতন মাচেই পূজা হইয়া থাকে।

"মাচ" গৃহেই সর্ব্বসাধারণের পূজা ও বলিদান হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে পূজার দিন বর্দ্ধমান জেলার প্রায় সমস্ত গ্রাম হইতেই যোগাদ্যার পূজা আসিত, এখনও অনেক গ্রাম হইতেই পূজা আসিয়া থাকে। পূর্ব্বে "মাচ" পূজার সময় বড়ই গোলযোগ হইত। লোকের ভিড়ে "মাচ" দখল করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল, সেইজন্য প্রত্যেক গ্রাম হইতেই পূজাদি দিতে আসিবার সময় একদল করিয়া বলিষ্ঠ লাঠিয়াল যুবক সঙ্গে আসিত। এই যুবক সম্প্রদায়ে ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীরই লোক থাকিত। প্রত্যেক গ্রামেই একজন করিয়া দলপতির অধীনে কতকগুলি বলিষ্ঠ যুবক সমস্ত বৎসর ধরিয়া লাঠি খেলা শিক্ষা করিত এবং পূজার সময় ক্ষীরগ্রামে আসিয়া অগ্রে 'মাচ' দখল করিবার চেষ্টা করিত। অগ্রে যাহারা "মাচ" দখল করিতে পারিত তাহাদের বীরত্বের বিশেষ সুখ্যাতি হইত। এই খ্যাতি লাভের জন্য প্রতিযোগিতার অত্যুদয় অবশ্যম্ভাবী, প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে জয়লাভের বাসনা এতদূর প্রবল ছিল যে, শারীরিক বল-চর্চ্চার প্রতি বর্দ্ধমান জেলার প্রত্যেক পল্লীর জনগণের বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছিল। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, এক্ষণে আর সেরূপ ভাব নাই, এক্ষণে ভদ্রসন্তানগণের মধ্যে আর কেহই সেরূপভাবে লাঠিখেলা শিক্ষা করেন না। ইতর শ্রেণীর লোকের সহিত লাঠিখেলা শিক্ষা অপমানের কাজ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে। হায়, অধঃপতিত বর্দ্ধমানবাসি।

'মাচ' পূজার সময় বর্দ্ধমান-মহারাজের একটী মহিষবলি হইয়া থাকে। "মাচ" তলায় এবং ক্ষীরদীঘির আশেপাশে প্রায় হাজার বার শত পাঁঠা বলি এখনও হইয়া থাকে।

ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদত্ত কত বড় রাজা-ছিলেন, তাঁহার ক্ষমতা কি প্রকার ছিল, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার অর্থব্যয়ে খনিত "ধামাচ" পুষ্করিণীর আকৃতি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি একজন অর্থশালী লোক ছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত নরবলি প্রথা হইতে প্রতীয়-মান হয় যে, তিনি একজন অসাধারণ ক্ষমতা-শালী লোকও ছিলেন। তাঁহার হাত হইতে দেবীর পূজার ভার কোন্ কোন্ রাজার হাতে পড়িয়াছিল তাহা ঠিক্ জানা যায় না। কৃষ্ণনগর ও পাটুলীর রাজাদের হাতে কিছুদিন এই সেবার ভার ছিল; তৎপরে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আমলে এই সেবার ভার বর্দ্ধমান মহারাজদিগের হাতে আসিয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

"মাচ" গৃহের পূর্ব্বদিকে একটী উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত বেদীকা আছে। সেই বেদী-কার নাম 'যজ্ঞকুণ্ড'। মহাপূজার দিন সেই যজ্ঞকুণ্ডে হোম হইয়া থাকে। হোমান্তে সামাজিক সম্মানানুসারে পর

পর সকলে হোমের তিলক গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সর্ব্ব শেষে গম্ভীরা বা যোগাদ্যার আরাধনা মন্দিরের সম্মুখে সকলে একত্র সমবেত হইয়া বাদ্যভাণ্ড ও নৃত্যগীতাদিসহ দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন।

মহাপূজার দিন ক্ষীরগ্রামবাসিগণ দ্বারে দ্বারে মঙ্গল ঘট স্থাপন ও কদলীবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন এবং আম্রশাখা দ্বারা গৃহের সম্মুখভাগ ও রাস্তাঘাট সজ্জিত করিয়া থাকেন।

ঐ সময়ে প্রত্যেক বৎসর ক্ষীরগ্রামে একটী বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। ঐ মেলা পূজার পরও কএক দিন থাকে। মেলায় মিষ্টান্ন, মনোহারী দ্রব্য প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যেরই বেশ খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। তবে পিতল কাঁসার দ্রব্যের খরিদ বিক্রয়ই কিছু বেশী হইয়া থাকে। পূজার পর প্রায় মাসাধিক কাল পিতল কাঁসার বাসনের দোকান থাকে এবং প্রত্যহ সমান ভাবে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া, দাঁইহাট প্রভৃতি স্থান ও নবদ্বীপ হইতে কাঁসারীর দোকান আসিয়া থাকে। জুতা, জামা প্রভৃতির দোকান বর্দ্ধমান হইতে আসে। কলিকাতা হইতে সার্কাস, থিয়েটার প্রভৃতি খেলা আসিয়া থাকে।

এখানকার মেলায় বালক, যুবা বৃদ্ধ, বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা, বাবু, সৌখীন, ফেসান দুরস্ত, অবাবু, অসৌখীন, নেংটিগ্রস্ত সকলেই সম্মিলিত হয়। এই মহাপীঠস্থানে যেন সে সময় ভেদাভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। তবে পূর্ব্বকালের লোক এই সব মেলায় যে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিত, আমরা আজকাল তাহার শতাংশের একাংশও উপভোগ করিতে পারি না; কারণ সেকালের লোক খাঁটি যাহা তাহারই আদর করিত, কিন্তু আমরা হতভাগ্য এ কালের লোক অন্তঃসার-বিহীন বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ কৃত্রিমভাবেই আদর করিয়া থাকি। সে কালের লোক মেলায় আসিত দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিতে, আর আমরা হতভাগ্য একালের লোক পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমানে আত্মহারা হইয়া ঠাকুর দেবতা না মানিয়া মেলায় যাই তামাসা দেখিতে। শুনিয়াছি পূর্ব্বে ক্ষীরগ্রামের জনসাধারণ মেলার সময় সমাগত আহূত অনাহূত সকলকে সমাদর করিয়া নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইতেন এবং সাধ্যমত পান ভোজনাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন, আর আজকাল মেলার সময় যদি কোন লোক কাহার গৃহে অতিথি স্বরূপে গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গৃহস্বামীর একটা জঞ্জাল বলিয়া বোধ হয়। এটা ক্ষীরগ্রামবাসীর দোষ নহে, এ কালের লোকের প্রবৃত্তির দোষ। কারণ একালের লোক অবশ্য-প্রতিপাল্য আত্মীয়বর্গের ভার গ্রহণ করিতেই যখন নারাজ, তখন অতিথি-সৎকার তো বহুদূরের কথা। এক্ষণে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া যাহা উপার্জ্জন করি, তৎসমস্তই অভিমানিনী অর্দ্ধাঙ্গিনীর বাক্সজাত করিতে পারিলেই জীবনে একটু শান্তি পাই, নতুবা গৃহিণীর সপ্তমেচড়া স্বরতরঙ্গাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া গৃহ হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হই। হায়, সভ্য সমাজ তোমাকে ধিক্!

অতিশয় ঘৃণা, লজ্জা ও দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এখানেও মেলার সময় বড়ই মদের ছড়াছড়ি ও মাতালের হুড়াহুড়ী হইয়া থাকে।

ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমানাধিপতির বিশাল জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীবাটীর বিখ্যাত "চক্র" বাবুরা ইহার পত্তনি স্বত্বের মালিক ছিলেন, কিন্তু কএক বৎসর হইল ইহা তাঁহাদের হাত ছাড়া হইয়াছে। বর্দ্ধমানের বিখ্যাত উকীল, সাহিত্যজগতে সুপরিচিত গঙ্গাটিকুরী-নিবাসী স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণ এক্ষণে ক্ষীরগ্রাম লাটের পত্তনী স্বত্বের মালিক। মেলার সময় যাহাতে তাঁহাদের প্রজাগণের নৈতিক অবনতি না হয় তৎপ্রতি একটু দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ

কৃষি-রসায়ন *

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমাগত সাহিত্যসেবী বন্ধুবর্গ বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আরম্ভে, আমি আপনাদিগকে প্রবন্ধ সম্পর্কে, দু'একটী আত্মকথা বলিব। আশাকরি তজ্জন্য আপনারা কেহ আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

সম্মিলনীর উদ্যোক্তাগণ তাঁহাদের নির্দ্ধারিত (১) "বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অভাব ও তন্নিবারণের উপায়।"

(২) "বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-রসায়ণ ব্যবহারের উপায়।"

(৩) "বর্ত্তমান দর্শন ও বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার প্রভাব।"

(৪) "পালরাজগণের সময়ে বাঙ্গালা ইতিহাসের উপকরণ।" এই চারিটী বিষয়ের কোন একটা বিষয়ে আমাকে প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি সত্য কিন্তু বিদগ্ধজন-তীর্থ এই সারস্বত-ক্ষেত্রে, প্রবন্ধ রচনায় যে কৃতিত্ব প্রকাশ করিলে, সাহিত্য সেবিগণের হৃদয়রঞ্জন সম্ভবপর হইয়া থাকে, আমার নিকট আপনারা তাহার কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারেন না। আমি প্রায় সমগ্র জীবন—চত্বারিংশৎ বর্ষকাল—বাঙ্গালার একটী নগণ্য পল্লীতে হৃদয়ের একটী দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় কৃষি-চর্চ্চা করিয়াছি। জীবনের শেষ ভাগে মাত্র, কৃষি-সাহিত্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। অদ্যাপি অনেক বিষয় আমার অনধীত রহিয়াছে। অধিকন্তু বিষয়টীও নীরস ও জটিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্যোপন্যাসের ভাষাসম্পদের তুলনায়, কৃষি-সাহিত্য বড়ই দরিদ্র এবং বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবীর পক্ষে বড়ই অরুচিকর। সুতরাং কৃষি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা সুকর নহে। ফলে বৈজ্ঞানিক-কৃষি-সাহিত্যে একটা নীরস প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়া, আমি সর্ব্ব প্রথমেই আমার ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতেছি। যদিও আমার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ কাল কৃষি সাধনায় কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি মনে হয়, সমস্ত জীবনের উপার্জ্জিত প্রায় লক্ষাধিক

* বর্দ্ধমান নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

টাকা মূল্যের বিত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে, আমি কৃষি বিষয়ে যে সামান্য একটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আর তাহাই মাত্র সম্বল লইয়া, দুঃসাহসে বুক বাঁধিয়া, আপনাদের সমক্ষে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছি। কিন্তু আমি জানি—

"মন্দঃ কবি যশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্
প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিববামনঃ।"

সুতরাং আমি যে আপনাদের নিকট উপহাসাস্পদ হইব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোন মৌলিকতা নাই; তথাপি আমার নার্শেরী-উদ্যানে এবং কৃষিক্ষেত্রে, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল, হাতে হেতেরে বৈজ্ঞানিক কৃষি-চর্চ্চায় এবং বিভিন্ন দেশের নানারূপ উদ্ভিদের পরিচর্য্যায়, যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধ তদ্দ্বারাই পুষ্টিপুষ্ট করিব আমার তাদৃশী শিক্ষাও নাই। পরন্তু, কৃষি সাহিত্যের ভাষা এরূপও সর্ব্বাংশে সুগঠিত হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রবন্ধে আপনারা ভাষা নৈপুণ্যের প্রত্যাশা করিবেন না। এবিষয়ে আমি আমার অক্ষমতা প্রকাশ করিতেছি।

আমি কখনও কৃষি-কলেজে অধ্যয়ন করি নাই। প্রকৃতি বিরচিত কৃষি-বিদ্যালয়ের আমি একজন অকৃতি শিক্ষার্থী। প্রকৃতির পাঠশালায় আমি যৎসামান্য কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি সম্পর্কে কাহারও কাহারও জীবনব্যাপী সাধনার কথা বা কৃষি-সাহিত্য যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াছি মাত্র। সুতরাং আপনারা আমার নিকট কোনরূপ গবেষণামূলক প্রবন্ধও প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যাহা হউক সভার উদ্যোক্তাবর্গ, সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত সাহিত্যিক বন্ধুবর্গকে, এই শুভ সম্মিলনের জন্য, অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এইক্ষণ আমি আমার বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়—বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায় নির্দ্ধারণ। বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা কি? কৃষির সহিত রসায়নের সম্বন্ধ কতটুকু বর্ত্তমান, এবং সাহিত্যের হিসাবে, অথবা অর্থের বা শিক্ষার হিসাবে ও বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায় কি? প্রথমতঃ এই তিনটী বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিতেছি। ইহাতেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমাধান হইবে।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বুঝাইতে হইলে, এখন আর বিশেষ বাগ্মীতা বা সূক্ষ্মদর্শীতার আবশ্যক করে না। বর্ত্তমান অন্নসমস্যা সম্বন্ধে সমগ্র দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা হইতেই আমরা বাঙ্গালার আভ্যন্তরীন্ অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। অধুনা উদর পূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে গিয়াই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া দেশের অবস্থা বুঝিতে হইতেছে। গৃহে অন্নাভাব হইলে, গৃহিণীর ভ্রূকুটি কুটিলমুখ এবং শিশু সন্তানগণের অনশন বা অর্দ্ধাশনজনিত ক্লিষ্টতা ও রোদন-ধ্বনিই আমাদিগকে দেশের অবস্থার বিষয় বুঝাইয়া দিতেছে। এতদিনে, আমরা কবি কালিদাসের "অন্নচিন্তা চমৎকারা।" শ্লোকটীর সার্থকতা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি। "দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ। অন্ন চিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ।"

একদা কবি কালিদাস, গৃহ হইতে বহির্গত

হইয়া সভায় যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আজ গৃহে তণ্ডুল নাই।" কালিদাস ভাবিতে ভাবিতে রাজ-সভায় গমন করিলেন। সে দিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে যে সকল সমস্যা পূরণ করিতে বলিলেন, কালিদাস তাহার কোনটীই পূরণ করিতে পারিলেন না। তখন বিক্রমাদিত্য বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কালিদাস উল্লিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! দরিদ্রের গুণসমূহ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ অর্থাৎ তাহার স্ফুরণ হয় না। অন্ন চিন্তা চমৎকারা, সে চিন্তায় যে কাতর তাহার আর কবিতা শক্তি কিরূপে বিকসিত হইবে?" কালিদাসের ন্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী কবি, সামান্য সময়ের অন্ন চিন্তায় জ্ঞান-বিমূঢ় হইয়াছিলেন। আমাদের জীবনব্যাপী উদর-জ্বালার ত এক মুহূর্ত্তও বিরাম নাই। তথাপি আমাদের চৈতন্য নাই। তথাপি আমরা বাবু? চাষার ছেলেও শিক্ষাভিমানী আমাদের আদর্শানুসরণে চাষা নাম ঘুচাইয়া চাষবাস ছাড়িয়া বাবু হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে উদরের পীড়নে, অভাবের তাড়নে আমাদের কৃষির প্রতি সে ঘৃণার ভাব, অনেক লঘু হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্র লোকের ছেলেও কেরাণীগিরি ছাড়িয়া এক্ষণে হাতে হেতেরে চাষবাসে মন মজাইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের মূলেও বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থার ক্ষীণালোক পরিলক্ষিত হইতেছে।

বড়ই আনন্দের ও সুখের বিষয়, কৃষিপ্রাণ দেশের উপেক্ষিত কৃষিতত্ত্ব বা কৃষিকথা, আজকাল বঙ্গীয় সাহিত্যালোচনী সভাতেও স্থানলাভ করিতে পারিয়াছে এবং প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা জানি "কৃষিধর্ম্মা কৃষির্ম্মেব অস্তনাং জীবনং কৃষি:" তথাপি এই শাস্ত্রীয় বচনটী এতকাল শিক্ষিত-সমাজে উপেক্ষিত হইতেছিল। কৃষিকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিতে ছিলাম। কিন্তু সুখের বিষয় হইলেও এতদ্বারা ইহাই প্রতিয়মান হয় যে "সুফলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা" দেশের অধিবাসী হইয়াও বাঙ্গালী প্রকৃতই এক্ষণ অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের মাতৃরূপিণী এই মহিমান্বিতা বঙ্গভূমি চিরকালই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। বাঙ্গালী কখনও পেটের দায়ে, পরের কাছে হাত পাতিয়া দাঁড়ায় নাই। বাঙ্গালীকে কখনও অন্নাভাবে অশ্রুসিক্ত নয়নে, একান্তে বসিয়া, অদৃষ্টের গতি চিন্তা করিতে হয় নাই। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী বলিয়া কেহ কখনও অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিতে সাহস করে নাই। সে বাঙ্গালী অন্নপূর্ণার সন্তান হইয়াও আজি সকলের কাছেই অন্নের কাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণিত। দুই চারিজন প্রাসাদবাসী ধনাঢ্যপুষ্ট বাঙ্গালীর কথা আমি কহিতেছি না। বাঙ্গালী সাধারণের কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। দেশে এই যে একটা অতৃপ্তি, অসন্তোষ ও অন্নাভাবের হাহাকার উঠিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালী দেশ না চিনিলেও দেশের অবস্থা কি এইক্ষণে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, সুতরাং দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমার বলিবার আর বেশী কিছুই নাই।

বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিবার প্রকৃত কারণ কি? দেশব্যাপী অভাবের প্রকৃত তত্ত্ব চিন্তা করিলে পরিলক্ষিত হইবে যে, কৃষিবৃত্তির বিকৃতিই ইহার মুখ্য কারণ। সকল

দেশেরই ধনাগমের উপায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, তন্মধ্যে কৃষিই সকলের মূল ভিত্তি। কৃষিতে অশন-বসনোপযোগী যাবতীয় সামগ্রী এবং শিল্পের অধিকাংশ উপকরণ বা কাঁচামাল উৎপন্ন হয়। এই সকল কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে এবং শিল্পোচিত ব্যবহারে শ্রম-শিল্প, তথা ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে। কৃষিই বাণিজ্যের এবং বাণিজ্যই অর্থের মূল। অর্থ ইহলৌকিক সুখ-সম্পদের এবং জাতীয় উত্থানের হেতু। সুতরাং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে একমাত্র কৃষিই সর্ব্ববিধ উন্নতি ও সকল প্রকার সুখ-সম্পদের সৌকার্য্যসাধক। কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি ও মানব-সমাজের মুখ্য বন্ধনী। ফলতঃ কৃষি লইয়াই সমাজ; কৃষিকার্য্যের উন্নতিই সমাজের সৃষ্টি ও স্থিতি; এবং কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। কৃষিই বাঙ্গালীর জীবন। একমাত্র কৃষিই বাঙ্গালীর সম্পদ ও বল। কৃষিই অন্ন-সংস্থানের একমাত্র উপায় এবং অন্নই মানুষের বল এবং প্রাণ; বল অন্নেই প্রাণ; অন্নাভাবেই বলাভাব এবং বলাভাবেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"অন্ন মূলং বলং পুংসাং বল মূলাহি জীবনম্।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষেৎ বলঞ্চ কৃশলোভিষক॥"

ভিষক অর্থাৎ বৈদ্যকেও যাহাতে রোগীর বল বৃদ্ধি হয়:এরূপ উপায় বিধান করিতে হয়। আমাদের গৃহে অন্নাভাব প্রতি নিয়ত বিদ্যমান। অন্নাভাবে দেশ সারহীন হইতেছে, সম্বল আছে কেবল বাগাড়ম্বর ও বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।

এই কৃষির সহিত গো-জাতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই গোজাতিই একদিন গোধন নামে পরিচিত ছিল। বস্তুতঃ গোজাতিই বাঙ্গালীর প্রকৃত ধন। এই ধনের অভাবেই আজ বাঙ্গালী এত নির্দ্ধন ও অন্নের কাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছে, কৃষিই বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের যে একমাত্র উপায় তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। একদিন, বেশী দিনের কথা নহে, বঙ্গের কৃষক অথবা কৃষিজীবি ভদ্রলোক যদি বৎসরে ২।৩ শত মণ ধান ঘরে আনিতে পারিত এবং আপনার গোশালায় ২।৩টী গাভী রাখিত এবং বাড়ীর পুকুরে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পুষিতে পারিত, তাহা হইলে সে, সারা বৎসরই মিষ্টান্ন, পরমান্ন, পিঠা, পায়স, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ও মৎস্যের নানাবিধ সামগ্রী ভোজন করিত এবং আপনার পরিবারস্থ সকলকেই পরমা তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে সমর্থ হইত। অধিকন্তু আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিও তাহার অন্নে সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইত।

"ক্ষেতের ধান, পালের গাই
পুকুরের মাছ, যার আছে ভাই
তার সমান সুখী নাই।"

এইক্ষণে হিসাব করিয়া দেখুন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণই সুখী ছিলেন, না আমরাই সুখী? এইক্ষণে পিতা মাতাও যে সন্তানের প্রদত্ত শাকান্ন দ্বারায় উদর পূরণ করিবে, এমন সৌভাগ্যই বা কয়জনের ঘটে। কেন এমন হইল, তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে গেলেই বুঝিতে পারিবে, ধান্য ধন ও গোধনের অভাবেই বাঙ্গালীর ধর্ম্ম গিয়াছে, শক্তি গিয়াছে, বল গিয়াছে, সাহস গিয়াছে, জাতীয়তা গিয়াছে, স্বাস্থ্য গিয়াছে, সুখ গিয়াছে, শান্তি গিয়াছে এবং তৃপ্তি গিয়াছে। আছে কি? আছে কেবল ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন বিশেষতঃ হৃদয়হীন বাঙ্গালীর পিতৃদত্ত প্রাণটী ও

অস্থিকঙ্কালসার, আর আছে সেই কঙ্কালের ভিতর বাক্যের প্রবল তরঙ্গ ও ভাবের লহরী। যতদিন এদেশে কৃষির আদর ছিল, যতদিন পল্লীগ্রামের করিম সেখ ও পরাণ মণ্ডলকে করিম দাদা, পরাণ কাকা বলিয়াই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতি মাত্রই সম্বোধন করিত, করিম দাদা ও পরাণ মণ্ডলকে গ্রামের সকলেই ভয় করিত, আদর করিত, তাহাদের সুখ, দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিত, ততদিন বাঙ্গালার প্রকৃত অভাব ছিল না।

অভাব কাহাকে বলে তাহাও বোধ হয় অনেকেই জানিত না।

কৃষিপ্রিয় প্রাচীন কবি মুকুন্দরাম, তাঁহার কবিকঙ্কন চণ্ডী কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন।

"ধন্য অগ্রহায়ণ মাস, ধন্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জীবন তার নাহি যার চাষ।"

ইহাই যতদিন বাঙ্গালীর প্রাণের কথা ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত এদেশে অন্ন-কাঙ্গালের সংখ্যা বড় কম ছিল, ছিল না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কবি আপন বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁহার উক্ত কাব্যের অন্যত্র, ধর্ম্মের ও সম্মানের কথা তুচ্ছ করিয়া অকাতরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

সহর ছেলিনা রাজ, তাহাতে সজ্জন রাজ,
নিবসে নিউগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যায় চাষ চষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।"

সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তানেরাও যতদিন হালের কোটী বা মুঠা ধরিয়া চাষ বাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ঘিণা বোধ করিতেন না, হালের কোটী ধরিলে যতদিন বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেণীর লোকেরও জাতি যাইত না, যতদিন চাষের কাজ বা চাষার কাজ বঙ্গদেশে গৌরবের সামগ্রী ছিল ততদিন পর্য্যন্তও বাঙ্গালীকে বাঙ্গালি আখ্যা পাইতে হয় নাই। কিন্তু যে দিন হইতে বাঙ্গালী বাবু নামিতে শিখিয়াছে, যে দিন হইতে চাষা কথাটা এদেশে গালি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে দিন হইতে করিমদাদা, পরাণ কাকা পাড়াগেঁয়ে ভূতের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বাবুদের জাঁক জমক কেবল কৃষকের হালের উপরই নির্ভর করে, ইহা যে দিন হইতে বাবুরা ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতেই বাঙ্গালীর পোড়া কপালের সূত্রপাত হইয়াছে।

কৃষির আবশ্যকতা

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষির আবশ্যকতার কথা আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যে কৃষি আমাদের অশন-বসন যোগায়, যে কৃষি আমাদের শ্রম-শিল্প বা পণ্য-সম্ভারের জন্মদাতা সেই কৃষি বৃত্তিতে আমাদের বিজাতীয় ঘৃণার ফলেই যে দেশে অন্ন-সমস্যা ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে তাহা স্বীকার্য্য। এই অন্ন-সমস্যা সাধনের প্রধান উপায় কৃষি। সুতরাং এদেশে কৃষির আবশ্যকতা রহিয়াছে যথেষ্ট। কৃষি-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিলে আমাদের কর্ম্মজীবন স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার দিনে, আমরা আত্মরক্ষায় ও সমাজসেবায় অধিকতর কার্য্যক্ষম হইতে পারিব এবং আত্মপোষণে সর্ব্বাংশে বা অনেকাংশেই নির্ভরশীল হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিব। চাষের নেশা লইয়া চাষে বাসে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে আমাদের নূতন কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারিব এবং তাহাতে চাকুরী সমস্যাও অনেকাংশেই নিরাকৃত হইতে পারে। শ্রমাধিক্য ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ক্ষেত্রজাত বস্তুর প্রকার, পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি ভিন্ন, বাঙ্গালার আর গত্যন্তর নাই।

কৃষির সহিত কৃষি-রসায়নের সম্বন্ধ

একমাত্র কৃষিই যখন ইদানীং বঙ্গের একমাত্র আশার স্থল তখন কিসে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে তাহা দেশের ও দশেরই প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয়। কৃষির সহিত কৃষি-রসায়নের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। ফলে কৃষি শিখিতে হইলে কৃষি-রসায়ন সম্বন্ধেও মোটামুটী ভাবে সকল তথ্যই জানিতে হয়। আত্মরক্ষার ও এদেশের অশিক্ষিত অনশন-ক্লিষ্ট ও অর্দ্ধনগ্ন কৃষক কুলকে রক্ষা করিতে হইলে, ক্ষেত্রের শস্যের উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চাহিলে কৃষকদিগকে কৃষি-রসায়ন শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানেরাও হাতে হেতেরে চাষ বাস আরম্ভ না করিলে আদর্শস্থলবর্ত্তী হইয়া কৃষককে সকল বিষয় বিশেষতঃ কৃষি-রসায়নের বিষয় শিক্ষা না দিতে পারিলে, পৃথিবী ক্রমাগতই শস্য হরণ করিয়া বাঙ্গালার দুঃখ-দুর্গতির মাত্রা ক্রমশই বর্দ্ধিত করিয়া তুলিবেন। যে কৃষির উপরই আমদের জীবন-মরণ সমস্যা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সেই কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, কৃষি-রসায়ন ব্যবহার সাপেক্ষ। সুতরাং কৃষি-রসায়ন শিক্ষা না করিয়া কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কৃষি-রসায়নকে কৃষি-কার্য্যে সাফল্য লাভের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন বলা যায়।

কৃষি-রসায়ন

উদ্ভিদের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝাইতে হইলেই উদ্ভিদের ও মৃত্তিকার রাসায়নিক তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। কৃষির সহিত মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের চির সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং ইহাদের রাসায়নিক তত্ত্ব অবগত হওয়াই কৃষি-রসায়ন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কি কি উপাদানে মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ গঠিত হইয়াছে এবং মৃত্তিকার কোন্ কোন্ উপাদান কোন্ কোন্ জাতীয় উদ্ভিদের জীবন-রক্ষক, তাহা অবগত হইতে না পারিলে কৃষি-কার্য্যে সুফল লাভ করা যায় না। কৃষির প্রধান অবলম্বন মৃত্তিকার উপাদানগুলির দুই বা বহু পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত হইলে উহারা এক বস্তুতে পরিণত এবং গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিদদেহে কার্য্যকরি হইয়া থাকে। যে শাস্ত্র পাঠে এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান জন্মে তাহাকেই কৃষি-রসায়ন বলে। প্রথমতঃ মৃত্তিকার উপাদানের সংবিশ্লেষণ, গুণান্তর প্রাপ্তি এবং উদ্ভিদের পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তার কথাই বলিতেছি। তৎপর কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায় নির্দ্দেশ করিব।

মৃত্তিকার ও উদ্ভিদের রাসায়নিক তত্ত্ব

ভূমি চাষ করিয়া তাহাতে ফসল উৎপন্ন করার নাম কৃষিকার্য্য। কৃষিকার্য্য নানারূপে সাধিত হইতে পারে। যে উপায়ে, অল্প ব্যয়ে, অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহার নাম অর্থকরী কৃষিকার্য্য (Economical agriculture.)

অর্থকরী কৃষিকার্য্য করিতে হইলে (১) ভূমিতে যে ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে, তাহার দৈহিক উপাদান ও স্বভাব এবং (২) মৃত্তিকার উপাদান ও উদ্ভিদদেহে তাহার কার্য্যকারিতা প্রধানতঃ এই দুইটী বিষয় সর্ব্বাগ্রে অবগত হওয়া আবশ্যক।

নানা জাতীয় উদ্ভিদ দেহের বিশ্লেষণ করিয়া তন্মধ্যে প্রায় বিংশতি প্রকার ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য একই উদ্ভিদে উক্ত বিংশতি প্রকার ধাতব পদার্থের সমাবেশ নাই। ধাতব পদার্থ সকল তরলাবস্থায় উদ্ভিদের মূল কর্ত্তৃক শোষিত

হইয়া উহার পত্রে নীত এবং তথায় জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। পত্রকে উদ্ভিদের পাকস্থালী-বিশেষ বলা যায়। এই পাকস্থালীতে নীত খাতব পদার্থের যে অংশ জীর্ণ হয় তদ্দ্বারাই উদ্ভিদের পুষ্টিপুষ্টতা সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু খাতব পদার্থের কিয়দংশ উত্তাপে তরলাবস্থা প্রাপ্ত বা জীর্ণ হয় না। উহা পত্রেই রহিয়া যায়। এই অজীর্ণ অংশ অনায়াসেই পত্র হইতে বাহির করিয়া লওয়া যায়। বৃক্ষের শুষ্ক পত্রে অগ্নি সংযোগ করিলেই উহা পুড়িয়া যাইবে এবং ওজনে কম হইবে। যে পরিমাণ ওজন কমিয়া যাইবে, তাহা জৈবিক পদার্থ, আর পুড়িবার পরও যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাই খাতব পদার্থ। পত্র ভস্মের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে তন্মধ্যে গন্ধক, ফস্ফোরাস (Phosphorus), পোটাস (Potash), চূণ (Lime) এবং সাইলেকস (Silex) নামক অগ্নি-প্রস্তরের (চকমকি পাথরের) অংশই অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। কিন্তু উহাদের প্রত্যেকের অংশ অতি সামান্য।

উদ্ভিদের ন্যায় প্রাণীদেহে খাতব পদার্থের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ জীবদেহ অজৈব (Inorganic) বা খাতব-পদার্থ-হীন উপাদানেই গঠিত। উল্লিখিত কতিপয় খাতব পদার্থের সংমিশ্রণেই যে উদ্ভিদ দেহ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। তন্মধ্যে আরও কতকগুলি পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিলে উহাতে প্রধানতঃ অঙ্গারজান (Carbon), অম্লজান (Oxygen), জলজান (Hydrogen) এবং যবক্ষারজান (Nitrogen) নামক পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কয়েকটী পদার্থ উদ্ভিদের ন্যায় জীবদেহেও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা যৌগিক পদার্থ। সুতরাং প্রত্যেকেই পরস্পর সম্পৃক্ত ভাবে জীব ও উদ্ভিদ্ শরীরে বর্ত্তমান আছে। ইহাদের অস্তিত্বই জীবন এবং অভাবই মৃত্যু। এই জন্যই উহাদিগকে জৈব উপাদান (Organic elements) বলা যায়। জৈব উপাদান সকল পরস্পর বিমিশ্রভাবে থাকিতে পারে না। অঙ্গারজান, জলজান, অম্লজান একত্রে সংযুক্ত হয়। এই তিনের সংমিশ্রণকে ত্রিসংযোগ-মিশ্র (Ternary compound) কহে। এই ত্রিবিধ মিশ্র পদার্থের সহিত যবক্ষারজান ও গন্ধক সংযুক্ত হইলে যে মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি হয়, উহার নাম জৈবের বা জীবাঙ্কুর-মিশ্র (Protoplasm)। ইহাই উদ্ভিদের সজীবতা ও তেজস্বিতা বৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহ, পরস্পর বিষমভাবে বিদ্যমান থাকিয়া, উদ্ভিদদেহ গঠন করিয়া থাকে। এতন্মধ্যে অঙ্গারজানই উদ্ভিজ্জীবনের প্রধান উপাদান। ইহা জলের সহিত সহজেই মিশ্রিত হয়। অম্লজানের সংযোগে অঙ্গারজান তরলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদবস্থায় উহা অঙ্গারাম্লরূপে পরিণত হয়, অঙ্গারজান তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই, উদ্ভিদের মূল দ্বারা শোষিত বা গৃহীত হইয়া থাকে। অঙ্গারাম্ল বাষ্প (Carbonic acid gas) বায়ুতে বিদ্যমান রহিয়াছে। বৃক্ষের সবুজ পত্রসমূহ, সূর্য্যোত্তাপের সাহায্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ু হইতে উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রাণিগণের প্রকৃতির সহিত উদ্ভিদের এই বিষয়েই অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদ, পত্র দ্বারা অঙ্গারাম্ল গ্রহণ এবং অম্লজান ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে মনুষ্যাদি প্রাণীসমূহ শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত অঙ্গারাম্ল ত্যাগ ও অম্লজান গ্রহণ করিয়া থাকে। পত্র দ্বারা উদ্ভিদের আংশিক পরি-

মাণে নাসিকার কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে। বায়ুতে যে পরিমাণ অঙ্গারাম্ল বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং প্রাণিগণ প্রতিমুহূর্ত্তে যে পরিমাণ অঙ্গারাম্ল ত্যাগ করে, উদ্ভিদেরা তাহা গ্রহণ না করিলে, প্রাণী-জগৎ এতদিন অঙ্গারাম্ল বাষ্পে পূর্ণ হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। কিন্তু বিশ্ববিধাতার অত্যাশ্চর্য্য বিধানে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে উক্তরূপ অসামঞ্জস্য থাকাতেই পৃথিবী হইতে সজীব প্রাণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে পারিতেছে না। উদ্ভিদেরা যে পরিমাণ অম্লজান ত্যাগ করে, সেই পরিমাণ অঙ্গারাম্ল বাষ্পও গ্রহণ করিয়া থাকে। ফলে কোন কালে কোনটীরই আধিক্য না হইয়া দুইটীরই সমতা রক্ষিত হইতেছে।

উদ্ভিদপত্রে অগ্নি সংযোগ করিলে, উহা প্রথমতঃ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। উহাতে অঙ্গারের ভাগ রহিয়াছে বলিয়াই ইহার বর্ণ-পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। অঙ্গার দাহ্য পদার্থ, পত্র পুড়িয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট রহে, উহাই ভস্ম। ভস্ম যে ধাতব পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহা পুড়িয়া গেল উহা জৈবিক পদার্থ। প্রাণীর অস্থি, মাংস বা দেহের অন্য কোন অংশ পোড়াইলেও জৈবিক ও ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকা অগ্নিদগ্ধ করিলেও তাহাতে এতদুভয় পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব হয়।

জৈবিক ও ধাতব পদার্থসমূহ (১) সরল ও (২) মিশ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত। সরল পদার্থ মাত্রই একটী মূল উপাদানে গঠিত। সুতরাং উহাদিগকে বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু মিশ্র পদার্থগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া পুনরায় মৌলিক পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে, পৃষ্ঠ ও উপরিভাগে যে সকল পদার্থ রহিয়াছে উহারা মোট ৬৫টী মৌলিক পদার্থের সমবায়েই সৃষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৫টী জৈবিক এবং ৪৮টী ধাতব পদার্থ। জৈবিক ও ধাতব পদার্থসমূহের কোনটী বাষ্পাকার, কোনটী তরল, কোনটী কঠিন এবং কোনটী বা আকার পরিবর্ত্তনশীল। জলের আকার তরল। কিন্তু উহা জমিয়া গেলে কঠিন বরফে পরিণত হয়। আবার অধিক উষ্ণ হইলে বাষ্পের এবং শৈত্য সংস্পর্শে শিশির বা তুষারের আকার ধারণ করে। সুতরাং ইহার আকার পরিবর্ত্তনশীল। জৈবিক পদার্থের অধিকাংশই উত্তাপ ও বায়ু সংস্পর্শে পচিয়া যায়। উত্তাপে মিশ্র পদার্থ সংকীর্ণ হইয়া মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। যেমন কাষ্ঠ পোড়াইয়া উহা হইতে আলকাতরা (Tar) জল (Water) ও পাইরোলিগনিয়াস অম্ল (Pyroligneous acid) ও কয়লা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাণিগণ খাদ্য দ্রব্য হইতে, উদ্ভিদেরা মৃত্তিকা হইতে এবং মৃত্তিকা প্রস্তর পাহাড় (Rock) হইতে ধাতব পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে প্রাণিগণ খাদ্য হইতে, উদ্ভিদ মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে এবং মৃত্তিকা মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের শেষ পরিণতাবস্থা হইতে জৈবিক পদার্থ প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকায় যে জৈবিক ও ধাতব পদার্থ আছে, তাহা হইতেই উদ্ভিদের সংরক্ষণ, পরিপোষণ এবং জীবনধারণোপযোগী খাদ্য গৃহীত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ দেহ বিশ্লেষণ করিলে যে সকল ধাতব ও জৈবিক উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, কৃষি হইতে উহাই উদ্ভিদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং মৃত্তিকায় উহার কোন উপাদানের অভাব হইয়া পড়িলে, তাহা মৃত্তিকার সহিত সংযোগ করা আবশ্যক হয়। নতুবা যথোচিত

খাদ্যের অভাবে উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে বা মরিয়া যায়। মৃত্তিকায় উদ্ভিদের খাদ্য আবশ্যকানুযায়ী রহিয়াছে কি না, তাহা যদ্দ্বারা জানিতে পারা যায় তাহাই কৃষি-রসায়ন-বিদ্যা। কৃষি-রসায়ন সাহায্যে উদ্ভিদের খাদ্য, খাদ্যের পরিমাণ এবং মৃত্তিকায় তাহার অস্তিত্ব ও উহাকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিবার প্রণালী অবগত হওয়া যায়। সুতরাং কৃষিকার্য্যে সাফল্য বা সন্তোষজনক ফললাভ সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে। বিষয়টা আরও একটুক স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইতেছি। ধান্যের চাষে সন্তোষজনক ফললাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ চাউলে কি কি উপাদান রহিয়াছে, তাহা চাউল বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। বিশ্লেষণের ফলে চাউলে কতকগুলি জৈবিক এবং কতকগুলি ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়।

এই সকল উপাদান ধানগাছ, মৃত্তিকা হইতেই যে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং যে মৃত্তিকায় এই সকল উপাদান সুলভ, সেই মৃত্তিকাই ধান্যের চাষ পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া জানিবে। আবার যে ভূমিতে ধানের চাষ করিতে হইবে, উহার কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলেই উহাতে ধানগাছের খাদ্যোপযোগী কোন্ কোন্ উপাদানের অভাব আছে, তাহা জানিতে পারা যায়। উহার অভাব কি, তাহা জানিতে পারিলে, কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ সার প্রদান দ্বারা এই অভাব পূরণ করিয়া দেওয়া যায়। মৃত্তিকার খাদ্যের সংস্থান করিয়া রাখিয়া, তাহাতে ধানের চাষ করিলে ধানগাছগুলি যে সতেজ বর্দ্ধিত হইয়া আশানুরূপ ফল প্রসব করিবে তাহা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। মৃত্তিকায় যে সকল উপাদানের অভাবে, যেরূপ সারে ঐ সকল উপাদান সুলভ তাহাই ভূমিতে প্রয়োগ করিতে হইবে। কৃষি-রসায়ন-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি-লাভ করিতে না পারিলে উদ্ভিদের খাদ্য এবং খাদ্যের অভাবপূরক সুলভ সারের বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায় না। সুতরাং কৃষিকার্য্যেও সাফল্য লাভের আশা থাকে না। যাহা হউক সারের কথা পরেই বলিব। বিশ্লেষণ (Analysis) ক্রিয়া দ্বারা কি তরল, কি কঠিন, কি বাষ্পীয় সকল প্রকার পদার্থেরই মৌলিক উপাদানসমূহ পৃথক্ করিয়া লইতে পারা যায়। বিশ্লেষণ ক্রিয়া দ্বারা যেমন পদার্থের সৃষ্টির উপকরণসমূহ বিমুক্ত করা সম্ভব-পর তদ্রূপ প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে বিযুক্ত মৌলিক পদার্থগুলিও একত্রিত করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করা যায়। পরস্পর বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের সংযোগ, যে ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়, উহাকে সংযোজক বা রাসায়নিক সম্বন্ধ (Affinity) কহে। কৃষি-রসায়নের সহিত এই বিশ্লেষণ ও সংযোগ ক্রিয়ার নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু এই উভয় কার্য্যই যন্ত্র-পরীক্ষা সাপেক্ষ এবং রসায়ন-তত্ত্ববিদের পক্ষে সহজসাধ্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

কৃষকের ফসল মাত্রই ভূমির উপরিভাগ হইতে উহাদের পোষণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষাদি ভূমির অনেক নিম্নভাগ হইতেও উহা গ্রহণ করিতে পারে। উদ্ভিদেরা মূল দ্বারা ধাতব এবং পত্র দ্বারা জৈবিক পদার্থসমূহ গ্রহণ করে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহে সুশৃঙ্খলভাবে বহুসংখ্যক ছিদ্র আছে। এই সকল ছিদ্রকে শারীর-যন্ত্র (organ) কহে। এই সকল ছিদ্র দ্বারা আলো, উত্তাপ ও বায়ু উদ্ভিদদেহে প্রবেশ

করিয়া থাকে। এই তিনের কোন একটীর অভাবে উদ্ভিদ সুস্থতা ও তেজস্বিতা লাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু পরীক্ষা দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে অধিক পরিমাণে খাদ্যব ও লবণাক্ত (Saline) পদার্থসমূহ উল্লিখিত ছিদ্রের সাহায্যে উদ্ভিদ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এবং অনাবশ্যকীয় অংশ পুনরায় ঐ সকল ছিদ্র দ্বারাই ঘর্ম্মাকারে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। প্রাণীদেহের ছিদ্র দ্বারা ঘর্ম্ম ও শরীরের মল ইত্যাদি বহির্গত হয়। লোমকূপের ছিদ্র সকল কোনরূপে রুদ্ধ হইলে শরীরের মল বহির্গত হইতে পারে না। সুতরাং নানারূপ ব্যাধির উৎপত্তি হয়। সেই জন্যই মাঝে মাঝে শরীর পরিষ্কার করিয়া লোমকূপের ছিদ্র উন্মুক্ত রাখিতে হয়। এই সকল ছিদ্রই উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহের মল নির্গমন পথ বা বাহুদ্বার স্বরূপ। ইহা দ্বারাই আলো ও উত্তাপ দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই শরীর যন্ত্রদ্বারা যে খাদ্যব ও লবণাক্ত পদার্থ উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে, উহা পুনরায় উহাদের পত্রের সহিত আংশিক রূপে মৃত্তিকায় ফিরিয়া আইসে। পত্রগুলি পচিয়া গিয়া মৃত্তিকার খাদ্যব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এইভাবে প্রতি নিয়তই প্রকৃতির সহিত আদান প্রদান চলিতেছে। এবং সেই জন্যই মৃত্তিকা কখনও একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িতে পারে না।

উদ্ভিদ, প্রাণী ও মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিলে উহাদের প্রত্যেকটীতেই প্রধানতঃ (১) অঙ্গার (carbon) (২) অম্লজান (Oxygen) (৩) জলজান (Hydrogen) এবং (৪) যবক্ষারজান (Nytrogen) এই চারিটি মৌলিক পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদ্ভিদে অত্যল্প পরিমাণে গন্ধক (Sulpher), ফস্ফোরাস (Phosphorus অন্ধকারে জ্বলনশীল দাহ্যবস্তু বিশেষ), ক্লোরাইন (clorine লবণ উপাদান বিশেষ) এবং সিলিকন (Silicon ইহা একরূপ বর্ণহীন বা শ্বেতবর্ণের পদার্থ বিশেষ। ইহা প্রস্তর পাহাড় জাত বালুকাত্মক স্ফটিকাভ পদার্থ বিশেষ) নামক পদার্থও আছে। ইহাদিগকে খৈনিক পদার্থ কহে। উদ্ভিদের সম্যক্ পরিপুষ্টি সাধনের জন্য উক্ত আটটি পদার্থই অত্যাবশ্যকীয়। কোন ভূমিতে এই আটটি পদার্থের কোনও একটীর অভাব এবং অন্যটীর আধিক্য হইলে চলিবে না। কেন না উদ্ভিদের পক্ষে, উহার প্রত্যেকটীরই আবশ্যকতা রহিয়াছে। উক্ত আটটী পদার্থের কোনটি দ্বারা উদ্ভিদের কাষ্ঠ-তন্তু (Woody-tissue or fiber), কোনটি দ্বারা শ্বেতসার (starch), কোনটি দ্বারা শর্করা (sugar), কোনটি দ্বারা আঠা (gum), কোনটি দ্বারা এলবুমেন (Albumen ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ) এবং কোনটি দ্বারা গ্লুটেন (Gluten গম প্রভৃতি শস্যের ময়দার যবক্ষারজানযুক্ত কোমল আঠার ভাগ। ইহা জলে অদ্রবনীয়) এবং কোনটি দ্বারা ইহার তৈলাক্ত পদার্থ বা চর্ব্বি (fat or oil) সৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি অর্থাৎ উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং ফল মূল প্রভৃতির পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইলে অঙ্গার প্রভৃতি উল্লিখিত আটটি পদার্থেরই আবশ্যকতা রহিয়াছে। ইহার কোন একটির অভাব হইলেই উদ্ভিদ অঙ্গহীন হইবে এবং ফল প্রদান করিবে না। যদি মৃত্তিকায় উহার কোন একটির পরিমাণ আবশ্যকের চারিগুণ অধিক থাকে, তাহা হইলে যে জাতীয় উদ্ভিদের জন্য উহা আবশ্যক সেই জাতীয় উদ্ভিদের চাষ উহাতে ক্রমাগত চারি-

যায় হইতে পারিবে। উদ্ভিদেরা প্রথমবার আবশ্যক মত উহার একভাগ গ্রহণ করিলেও ৪ ভাগ মৃত্তিকায়ই রহিয়া যাইবে। ইহা দ্বারা ঐ উদ্ভিদ ঐ ভূমিতে আরও তিনবার উৎপন্ন হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য উক্ত আটটি পদার্থের মধ্যে একটির পরিমাণ, আবশ্যকাতিরিক্ত রহিয়াও যদি অন্যটির অভাব হয় এবং তাহা সারক্রপে মৃত্তিকায় প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ উদ্ভিদ অঙ্গহীন বা অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে।

আবশ্যকীয় পদার্থগুলি কেবল ভূমিতে বর্ত্তমান থাকিলেই চলিবে না। কারণ উহা তরলাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, উদ্ভিদেরা মূল দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং যাহাতে উদ্ভিদ খাদ্যসমূহ মৃত্তিকায় দ্রবনীয় অবস্থায় থাকে, তাহারও উপায় বিধান করিতে হইবে। এই কার্য্যে জলের আবশ্যক। পক্ষান্তরে যেটির অভাব পরিলক্ষিত হইবে, তাহাও সারক্রপে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। যে ফসলের জন্য শতকরা দুইভাগ অঙ্গারের প্রয়োজন, সেই ফসলের চাষ করিয়া সুফল লাভ করিতে হইলে চাষের জমীতে ঐ পরিমাণ অঙ্গার থাকা প্রয়োজন। যদি তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থাৎ দুইভাগ অঙ্গারের অভাব হয়, তবে যে সারে ঐ অভাব পূর্ণ হইতে পারে, সেই সারই ভূমিতে প্রদান করা আবশ্যক। একই ভূমিতে উপর্য্যুপরি একই ফসলের চাষ করিলে এই ফসলের জন্য মৃত্তিকায় স্বতঃই প্রকৃতিদত্ত পদার্থের অভাব হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত্তিকায় যে পদার্থের অভাব হয়, তাহাই পূরণ করিয়া দিতে হইবে। সার দ্বারা এই কার্য্য সাধন করিতে হয়।

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন প্রকৃতি স্বতঃই মৃত্তিকায় উহা প্রদান করিতেছেন। তথাপি একই ভূমিতে পুনঃপুনঃ ফসলের চাষ করাতে ঐ ভূমিতে উদ্ভিদের খাদ্যের অভাব উপস্থিত হয় এবং খাদ্যের অভাবে মাটিও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় উহাতে আবশ্যক মত সার প্রদান না করিলে, মৃত্তিকা উর্ব্বরতা লাভ করিয়া সজীব হইতে পারে না। সার প্রয়োগ করিয়া, মৃত্তিকাকে উর্ব্বর করিয়া লইতে পারিলেই, উহা হইতে সুস্থ, সতেজ ও পুষ্ট ফল শস্যাদি লাভ করা যায়। সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা এককথায় বুঝাইতে হইলে, এই মাত্র বলা যায় যে, উদ্ভিদের জীবনধারণোপযোগী খাদ্যের অভাব দূর করাই সার প্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভূমিতে সার প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই কৃষিকার্য্যের সুফল লাভের জন্য ভাবিতে হয় না।

কৃষিকার্য্যে সারের প্রয়োজনীয়তা কি? এবং শস্যের খাদ্যাভাব দূর করিতে হইলে, কিরূপ খাদ্যের জন্য কিরূপ সার ব্যবহার করিতে হইবে, মোটামুটী ভাবে এই সকল তথ্য অবগত হওয়া কৃষক মাত্রেরই পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের কৃষকেরা নির্ধন ও নিরক্ষর। বিশেষতঃ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার লোকও এদেশে নাই। এই জন্যই সাধারণতঃ এ দেশের কৃষকদিগকে প্রকৃতির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। ফলে কোন বৎসর প্রকৃতি প্রতিকূল হইলে এদেশে অন্নাভাব জনিত হাহাকার ধ্বনি উপস্থিত হইয়া থাকে। এদেশের কৃষকেরা মোটামুটী কৃষি-রসায়ন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে এবং তাহারা মৃত্তিকায় যথোপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ না করিতে পারিলে

দেশের অন্নাভাব কষ্ট যে দিন দিন ভীষণাকার ধারণ করিবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। যদি এদেশের কৃষকেরা সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে কখনও অন্নের কাঙ্গালী সাজিতে হইত না।

আমাদের মাতৃরূপিণী সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি প্রকৃতই স্বর্ণপ্রসবিনী। ইহার জলবায়ু কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুকূল। বিশেষতঃ প্রকৃতি-প্রদত্ত সারে, ইহা স্বতঃই উর্ব্বরা। এমন সোনার দেশের লোকও যে অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বস্তুতঃই দুঃখের বিষয়। কৃষির প্রতি ঘৃণাই ইহার মুখ্য কারণ। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশের মৃত্তিকা, এ দেশের মৃত্তিকার তুলনায় কৃষিকার্য্যের পক্ষে তত অনুকূল নহে। তথাপি কৃষি-রসায়নের সাহায্যে উক্ত দেশবাসিগণ, একই ভূমি হইতে বারম্বার প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করিয়া কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে সমর্থ হইতেছে। এ দেশের কৃষককে পাশ্চাত্য দেশের কৃষকদিগের ন্যায় অত্যধিক অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় না। এ দেশের কৃষকেরা যদি কৃষি-রসায়ন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে ও উহার মূলসূত্রগুলির উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয়, ফসল উৎপন্ন করিতে তাহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইত না। পক্ষান্তরে, একই ভূমি হইতে পুনঃ পুনঃ একই ফসল উৎপন্ন করিয়া তাহারা দেশের ও দশের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতে পারিত।

আমাদের দেশের কৃষকেরা কোন কোন সময় ভূমিকে বিশ্রাম দিয়া থাকে বটে, অর্থাৎ তাহাতে কোনরূপ শস্যের চাষ না করিয়া পতিত রাখে, ক্রমাগত ২।৪ বৎসর ভূমি পতিত রাখিয়া তৎপর উহাতে ফসলের চাষ করে। ভূমিকে বিশ্রাম দিতে পারিলে যে তাহাতে অধিক ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না বিশ্রামকালে ভূমিতে প্রকৃতিস্থ সার ক্রমে ৩।৪ বৎসর সঞ্চিত হইয়াই উহার উর্ব্বরতা শক্তি কিয়ৎ পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। কিন্তু কৃষি-রসায়ন ব্যবহার করিতে পারিলে ভূমিকে বিশ্রাম দিয়া কৃষককে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না, বরং বিশ্রাম না দিয়াও তাহারা একই ক্ষেত্র হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণে ফসল প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাতে তাহাদের অধিক লাভও যথেষ্ট হয় এবং দেশে ধনাগমের পথও প্রশস্ত হয়। এই প্রণালী অবলম্বনে কৃষি-কার্য্যে লাভের পরিমাণ অধিক হয় বলিয়াই, ইহাকে অর্থকরী কৃষি-কার্য্য বলা যায়। এ দেশের হীনদশাপ্রাপ্ত কৃষির উন্নতি করিতে হইলে, দেশে অর্থকরী কৃষিরই প্রচলন করিতে হইবে। কিন্তু এদেশের কৃষকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে না পারিলে এবং দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে, অর্থকরী কৃষিকার্য্যে বিস্তার সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য দেশের দশেরই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরা হাতে হেতেড়ে চাষ-বাস না করিয়াও যদি দেশের নিরক্ষর কৃষকদিগের মধ্যে অর্থকরী কৃষি-শিক্ষা বিস্তারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন এবং সার, সারের গুণ ও ব্যবহার প্রণালী বিষয়ে যাহাতে কৃষকেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গলজনক কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

তাঁহারা এই বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, কৃষকেরাও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, কৃষি-সাধন শিক্ষা করিতে আগ্রহের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইবে।

সার। (Manure)

কি কৃষিকার্য্য, কি ঔদ্যানিক কার্য্য, কি সারবান বৃক্ষের চাষ ইহার প্রত্যেকটী কার্য্যেই সার ব্যবহার অতিশয় প্রয়োজনীয়। অন্ন, রুটী, ডাল, তরকারী, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যের অভাবে আমরা জীবিত থাকিতে পারি না। পরন্তু অভাব হইলে প্রকৃতির সহায়তায় এবং নিজের চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। কিন্তু উদ্ভিদাদিই কি খাদ্যাভাবে বাঁচিতে পারে? প্রকৃতি স্বয়ং তাহাদের আহার্য্য সম্ভার প্রস্তুত করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহার অভাব হইলে তাহাদের পক্ষে উহা সংগ্রহ করিবার উপায় কি? তাহারা আমাদের মত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারে না; বা কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিতেও পারে না। সুতরাং তাহাদিগকে জীবিত রাখিতে হইলে, তাহাদের খাদ্যসংগ্রহকারিণী প্রকৃতিকে, অপ্রাকৃতিক উপায়ে আমাদেরই সহায়তা করিতে হইবে। উদ্ভিদ আমাদের নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সেইজন্য বাধ্য হইয়াই আমাদিগকেই উহাদের খাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধের জন্য আমরা গোপালন করিয়া থাকি, গাভী হইতে দুগ্ধ পাইতে হইলে উহাকে রীতিমত আহার দিতে হয়। মাংসের জন্য ছাগ ও কুক্কুট প্রভৃতি পশু পক্ষী পালন করিতে হইলে উহাদিগকেও রীতিমত আহার দিতে হয়। উহারাও স্বকীয় খাদ্য বস্তু আপনারাই অনুসন্ধান করিয়া লইতে সমর্থ। কিন্তু উহাদের খাদ্যের অভাব হইলে আমাদিগকে তাহা যোগাইয়া দিতে হয়। বলিতে গেলে আমাদের খাদ্যও প্রায় ভূমি হইতেই উৎপন্ন হয়। দুগ্ধ ও মাংসকেও ভূমিজাত খাদ্য বলা যায়। ভূমি আমাদের আহার যোগাইতেছে। সুতরাং সার স্বরূপ খাদ্য প্রদান করিয়া উহার উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিলেই আমরা উহা হইতে আশানুরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হই। ভূমিতে উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত আছে। ভূমি ভিন্ন বায়ুমণ্ডলেও উদ্ভিদের আহার বিদ্যমান আছে। কিন্তু উহা উদ্ভিদের সম্যক পরিপুষ্টি সাধনের জন্য সর্ব্বদা যথেষ্ট হয় না। কোন কোন উদ্ভিদ কেবল ভূমি ও বায়ুমণ্ডলস্থিত স্বাভাবিক আহার দ্বারাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেমন রবিশস্যের জন্য সারের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। উহারা সাধারণতঃ প্রকৃতিসুলভ স্বাভাবিক আহার দ্বারাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তথাপি ভূমিতে সার প্রয়োগ করিলে, উহাদেরও বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে, এবং উহাদের ফলন ও বৃদ্ধি হয়। যেরূপ মটর ও ছোলা প্রভৃতি শিম্বি-ধারী উদ্ভিদের জন্য এদেশে কোন সার ব্যবহার হয় না। কিন্তু আমেরিকায় ভূমির টীকা (Inoculation of the Soil) দিয়া এই জাতীয় ফসলের ফলন দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। ভূমির টীকা দেওয়া কাহাকে বলে এই প্রবন্ধে সে প্রশ্নের সম্যক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে মোটামুটি ইহা বলা যাইতে পারে যে, জীবাণুর ক্রিয়া দ্বারা ভূমিতে নাইট্রোজেন সংগ্রহের উপায় বিধান করাকেই ভূমির টীকা দেওয়া বলে। কৃষিজ ফসলের পক্ষে যবক্ষারাম্ল (Nitric acid) অত্যাবশ্যক। যবক্ষারাম্লজাত নাইট্রেট (Nitrate) উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট আহার্য্য। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জৈবিক নাইট্রোজেন ও এমোনিয়া

ভূমি নাইট্রোজেন ভূমিস্থিত একরূপ জীবাণু (Bactaria) দ্বারা যবক্ষারাম্লাকারে পরিণত হয়। এই সকল জীবাণু ভূমিতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকাতে উহাদের দ্বারা প্রতিনিয়তই বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগৃহীত হইয়া ভূমিতে প্রদত্ত হইতেছে। ফলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তিও সেই জন্য অনেকাংশেই রক্ষিত হইতেছে। আমেরিকায় কৃত্রিম উপায়ে এই সকল জীবাণু সংগৃহীত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডাক্তার মুর (Dr. Moore) বৈজ্ঞানিক উপায়ে নাইট্রোজেনহীন একরূপ তরল পদার্থ (Solution) প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে এই জীবাণু সকল সংগৃহীত হয়। তৎপর এই তরল পদার্থ তুলাতে সিঞ্চন করিয়া দিয়া তাহা শুষ্ক করিয়া ঐ শুষ্ক তুলাতেই জীবাণু-গণকে রক্ষা করা হয়। জীবাণুগণ এই শুষ্ক তুলাতে রক্ষিত হইলে দীর্ঘকাল উহাদের প্রচ্ছন্ন জৈবশক্তি (dorment, অকার্য্যক্ষম) অবস্থায় থাকে। জীবাণুগণ যে তুলাতে রক্ষিত হয় উহাতেও এই সকল জীবাণুর আহারোপযোগী খাদ্য রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করিয়া প্রদত্ত হয়। এইরূপে রক্ষিত জীবাণু-পূর্ণ তুলা পূর্ব্বোক্ত সলিউসনে আবশ্যক মত ভিজাইলেই জীবাণু সকল পুনরায় সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া, আরও বহু-সংখ্যক নূতন জীবাণুর উৎপত্তি করিয়া থাকে। এই সলিউসনে বীজ ভিজাইয়া রোপণ করিলে ঐ বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের মূলে বহু-সংখ্যক গুটী (Nodules) সৃষ্ট হয়। এই সকল গুটীই নাইট্রো ব্যকটারিয়া (Nitro Bacteria) সংগৃহীত নাইট্রোজেন। উক্ত জীবাণু সকল উদ্ভিদের বর্দ্ধন ও পরিপুষ্টি ক্রিয়া সাধন করিয়া ভূমিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে। উপরোক্ত সলিউসনে বীজকে ভিজাইয়া উহা ভূমিতে রোপণ করিলেই ভূমির টীকা দেওয়া হইল। এই সকল জীবাণু, শিম্বিধারী উদ্ভিদের পক্ষে মহোপকারী। আমেরিকায় ১৫ বিঘা জমী এই জীবাণুদ্বারা উর্ব্বর করিতে হইলে ১৫৲ টাকার অধিক ব্যয় হয় না। এদেশে শণ ও ধঞ্চে প্রভৃতির মূলে যে গুটী দৃষ্ট হয় উহাও ঐ সকল জীবাণুকর্ত্তৃক সংগৃহীত নাইট্রোজেন সমষ্টি মাত্র।

ভূমিতে যে পরিমাণ উদ্ভিদের আহার সঞ্চিত আছে, ইহা ক্রমে উদ্ভিদকর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় পরিশেষে একবারে নিঃশেষিত হয়। উহা নিঃশেষিত হইলেই ভূমি অনুর্ব্বর হয় এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে। উহাতে আর কোন ফসল জন্মে না। আমাদের খাদ্যের অভাব হইলে আমরা যেমন ক্রমে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়ি, পরিশেষে মৃত্যু মুখে পতিত হই, উদ্ভিজ্জাতিরও সেই গতি হইয়া থাকে। উদ্ভিদের খাদ্যাভাব ঘটিলে আমাদের খাদ্যাভাব হওয়াও অবশ্যম্ভাবী, কেননা উদ্ভিদই আমাদের খাদ্য যোগাইবার প্রধান উপায়. উদ্ভিদের খাদ্য সার। ভূমিতে সার প্রদান করিলেই উহাদের খাদ্য প্রদান করা হয়। সারও রসায়ন দ্রব্য খাদ্যে পরিগণিত। রসায়ন দ্রব্যের সহিত সারের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কৃষি-রসায়ন বলিতে আমরা কি বুঝিব? ভূমিতে উদ্ভিদের যে সকল খাদ্য সঞ্চিত আছে, তাহাতে বায়ু-মণ্ডলস্থিত উদ্ভিদ-খাদ্য ও বৃষ্টির জল প্রভৃতি পতিত হইয়া উহাদের নানাবিধ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। তত্ত্বানুশীলন দ্বারা ইহা আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। প্রস্তরগিরি ও মৃদ্গিরি সকল নৈসর্গিক ক্রিয়া দ্বারা অহরহঃ রূপান্তরিত

হইতেছে, ইহাদের রূপান্তরের মূলেও প্রচ্ছন্ন ভাবে রাসায়নিক ক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল নৈসর্গিক ক্রিয়া দ্বারা ভূমির সৃষ্টি হইতেছে এবং ভূমিতে ও উদ্ভিদ পোষণোপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য সকল অল্প বা অধিক পরিমাণে স্বভাবতঃই মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও তেজস্বিতা সম্পাদন করিতেছে। এই সকল রসায়ন দ্রব্যও সারের মধ্যে পরিগণিত। রসায়ন দ্রব্য মাত্রই যৌগিক বা মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সংমিশ্রণ জনিত পরিবর্ত্তনের নামই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। রসায়ন দ্রব্য সকল, এই রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের প্রভাবে, কৃত্রিম উপায়ে, তরলতা প্রাপ্ত হইলেই উহারা উদ্ভিদের ভোগ্য হয়। সাধারণতঃ নৈসর্গিক ক্রিয়া দ্বারাই এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন গোলাবাড়ী বা গোশালা-জাত তাজা সারে অতি অল্প পরিমাণে এমোনিয়া (Ammonia) ও যবক্ষারজান (Nytrogen) তরল অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যবক্ষারজান পদার্থ তাজা মলে কঠিন অবস্থায় বিদ্যমান থাকিলে, উহা উদ্ভিদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না। ঐ সার পচিয়া গেলে, উহাতে এমোনিয়া আকারে যবক্ষারজানের ভাগ বৃদ্ধি হয়। উহা তরল অবস্থায় অক্সাইডের (Oxide) গুণ প্রাপ্ত হইয়া ফসলের মূল কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে।

গোশালা ও গোলাবাড়ীজাত সার ফুটিবার (Fermentation) সময়ে, উহার নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। খড় ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ গোশালা এবং গোলাবাড়ীর আবর্জ্জনা, পশুাদির মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দর্শনীয় একরূপ জীবাণু (Micro-organism) দ্বারা এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনকে যবক্ষারত্ব-প্রাপ্তি (Nitrification) কহে। ভূমিতে অল্প অধিক সংখ্যায় এই সূক্ষ্মতম জীবিত প্রাণী বিদ্যমান আছে। ইহারাই বস্তুর যবক্ষারত্ব-প্রাপ্তির কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ব্যাকটারিয়া (Bactaria) নামক একরূপ জীবাণু জৈবিক পদার্থকে নাইট্রেট (Nitrate) আকারে পরিণত করে। এই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম জীব সকল প্রকৃতপক্ষে জীবিত উদ্ভিদাণু কি কীটাণু তাহা এ পর্য্যন্ত অবিসংবাদিতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। প্রাণীদেহেও ইহার অস্তিত্ব কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়া নানা রোগের উৎপত্তি করে। ইহাদিগকে ব্যাসিলাস (Bacillus) নামেও অভিহিত করা হয়। উদ্ভিদ কীটাণুকে (Schizolyctes or Fungoid plant) বিভাগ দ্বারা অতি সূক্ষ্মতম অংশে পরিণত করিলে, যত অংশে উহাকে বিভাগ করা যায়, ততটী নূতন কীটের উৎপত্তি হয়, উহারা প্রকৃতপক্ষে জীবিত উদ্ভিদাণু কি জীবাণু যাহাই হউক না কেন আমি উহাদিগকে এস্থলে কীটাণু শব্দেই অভিহিত করিলাম। উপরে যে কয়েকটী ক্রিয়ার উল্লেখ করা হইল, উহাদ্বারাও বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। জল, কৃষি ও উদ্যানিক কার্য্যের প্রধান সহায়। ইহার অভাবে উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে না। জল ভূপৃষ্ঠে নানা আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। জলকে তরল, বাষ্প, গ্যাস (Gas) ও জড়পদার্থ আকারে সচরাচর দেখা যায়। বৈদ্যুতিক তেজ, জলে প্রবেশ করাইয়া উহার মৌলিক পদার্থগুলি পৃথক করা

যায়। পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে জলে দুই ভাগ অম্লজান ও এক ভাগ উদজান আছে। সজীব উদ্ভিদে জলের ভাগ অর্দ্ধেকেরও অধিক। জল দ্বারাও পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ইহাতে অম্লজান ও উদজানের ভাগ থাকা হেতুই এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে মৃত্তিকাতে যে সকল মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে উহারা উদ্ভিদ দেহেও সুলভ। সুতরাং উদ্ভিদ দেহ যে উপাদানে গঠিত, মৃত্তিকাতে ঐ সকল উপাদানের অভাব হইলে মৃত্তিকাকে উহা দিতে হইবে। জীবদেহ পঞ্চভূতাত্মক। অর্থাৎ পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশ এই পাঁচটী ভূতই জীবদেহ গঠনের প্রধান হেতু। উদ্ভিদের পক্ষেও এই পঞ্চভূত অত্যাবশ্যকীয়। তন্মধ্যে পৃথিবীই সর্ব্ব প্রধান।

আধুনিক মতে, পৃথিবী সূর্য্য হইতে সম্ভূত। পৃথিবী বা মৃত্তিকাই উদ্ভিদের প্রাণ। সুতরাং আমাদেরও প্রাণ। আমরা ভূপৃষ্ঠে বাস করি, উদ্ভিদও ভূপৃষ্ঠেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্থ পাহাড় (Rock) সকল হইতেই মৃত্তিকার উৎপত্তি হইতেছে। এই সকল পাহাড় প্রস্তর রচিত। এই প্রস্তর সকল হইতেই মৃত্তিকার সৃষ্টি হইতেছে। প্রস্তর সকল, বালি প্রভৃতি কতকগুলি ধাতব পদার্থ ও একরূপ আঠা (cement) দ্বারা রচিত। এই আঠা রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা বিযুক্ত হইলেই প্রস্তর হইতে কঙ্কর, কঙ্কর হইতে বালি এবং বালি হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। এই মৃত্তিকাই উদ্ভিদের প্রাণ। মৃত্তিকাস্থিত উদ্ভিদ-পোষণোপযোগী উপাদান সকল রূপান্তরিত হইয়া উদ্ভিদ দেহে এবং উদ্ভিদ দেহ হইতে জীব দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে।

ক্ষয় প্রাপ্ত উদ্ভিজ্জাতি পচিলে হিউমাস নামক একরূপ পদার্থের সৃষ্টি হয়। আর্দ্রতা ও উত্তাপের উপরেই উহার উৎপত্তি সর্ব্বোতভাবে নির্ভর করে। এই পদার্থ একরূপ পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়া বিশেষ। বাহ্যবীয় ক্রিয়া দ্বারা প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। অতিশয় সরস ভূমিতে ইহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহের পচন ক্রিয়া অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পরিশেষে ইহা তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উপরোক্ত ক্রিয়া দ্বারা অঙ্গারাম্ল বাষ্প ও এমোনিয়ার উৎপত্তি হয়। ইহা উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এই উপাদান সকল পরিশেষে এরূপ একটী কালাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে যাহা জীবন এবং মৃত্যুর দুইটী অবস্থাভেদ মাত্র।

"Humus is obtained from decayed and well decomposed vegetable matter. Its composition chiefly depends upon certain conditions of moistdre and temperature. As the decay progresses the nature of the Humus changes and is eventually liquidified evating cerbonic acid gas and ammonia which are the best plant food. These elements again enter into the cycle of which life and death are two different phases." এখন চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন, জীবন এবং মৃত্যু একই পদার্থের দুইটী ভিন্ন অবস্থা মাত্র। উদ্ভিদ ও প্রাণী মরিলে উহাদের

রসসারশেষ যাহা থাকে উহা মৃত্তিকায় মিশিয়া যায়। পরে কোন কোন নৈসর্গিক ক্রিয়া দ্বারা উহার অবস্থার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। উহা মৃত্তিকাতে মিশ্রিত হইয়া পুনরায় উদ্ভিদ-দেহে এবং উদ্ভিদ-দেহ হইতে প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। উহাদের সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় নাই। আমরা যাহা খাইয়া জীবন ধারণ করি উহার অধিকাংশই উদ্ভিদ হইতেই প্রাপ্ত হই। উহারাই আমাদের দেহ গঠন করিয়া থাকে। আবার আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উহারা মৃত্তিকায় প্রবেশ করিয়া থাকে। এই জন্য লোকে বলে মাটীর দেহ মাটীতেই বিলীন হয়।

একখণ্ড কাষ্ঠকে ফেলিয়া রাখুন উহা উই কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া পুনরায় মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। উহা যে উপাদানে গঠিত হইয়াছিল, সেই উপাদান সকল পুনরায় মৃত্তিকাতেই মিশিয়া যাইবে। পুনরায় নৈসর্গিক ক্রিয়া প্রভাবে উহারা উদ্ভিদ দেহে এবং উদ্ভিদ হইতে প্রাণী দেহে প্রবেশ করিবে। ভগবানের এই নিয়তি পৃথিবীর সৃষ্টির আদি হইতেই চলিতেছে। যদি উদ্ভিদই আমাদের জীবন হয়, তাহা হইলে উদ্ভিদের পুষ্টিবর্দ্ধনকল্পে আমাদিগকে বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে।

সার কি পদার্থ ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। সুতরাং আমি অতি সংক্ষেপে উহার মূলতত্ত্ব এস্থলে সন্নিবেশিত করিতেছি। সাধারণতঃ সার শব্দে আমরা পশুর বিষ্ঠা, নর-বিষ্ঠাকেই বুঝিয়া থাকি। বাস্তবিক ইহা ভিন্ন আরও নানাজাতীয় সার আছে। সারকে নিম্নলিখিত চারিটী ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। জৈবিক সার (Organic manure).

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ হইতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই স্বাভাবিক সার। মনুষ্য বিষ্ঠা, গোবিষ্ঠা ও অন্যান্য পশুবিষ্ঠা এবং মূত্রাদি উদ্ভিজ্জ সার মাত্রই ইহার অন্তর্গত।

২। ধাতব সার Mineral or inorganic manure.

এই সার নানাবিধ ধাতু হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা লৌহ, এলিউমিনাম, চূণ, ম্যেগনিসিয়াম, সোডিয়াম ও পোটাসিয়াম ইহারাও স্বাভাবিক সার মধ্যে পরিগণিত।

৩। কৃত্রিম সার Artificial manure.

জৈবিক পদার্থের সহিত ধাতব পদার্থের সংযোগ বা সংমিশ্রণ দ্বারা যে সার প্রস্তুত হয়, তাহাকে কৃত্রিম সার কহে। এক কথায় বলিতে গেলে বাজারে যে সকল সার প্রাপ্ত হওয়া যায় উহার অধিকাংশই কৃত্রিম সার। ভূমিতে মূলত প্রকৃতিদত্ত সার ব্যতীত আর প্রায় সকল সারই অল্পাধিক পরিমাণে কৃত্রিম, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমোনিয়া লবণ (ammonia salt) নাইট্রেট অব সোডা (Nitrate of soda) অক্সাইড-অব-আয়রণ (Oxide of iron) এবং কার্ব্বোনেট অব লাইম (Carbonate of lime) প্রভৃতি সারও কৃত্রিম সার মধ্যে পরিগণিত। সাধারণতঃ তরল (liquid) ও চূর্ণ (Powder) এই দুই আকারেই কৃত্রিম সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। উপরোক্ত কয়েকটী সারও মৃত্তিকার উৎকর্ষসাধক উদ্ভিদের পুষ্টিকর খাদ্য। অসংখ্য প্রকারের কৃত্রিম সার আছে। রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা উহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং কৃষি-রসায়ন-

বিদ্যা শিক্ষা না করিলে ইহাদিগকে প্রস্তুত ও ব্যবহার করা যায় না।

ফস্ফেটযুক্ত সার
(Phosphatic manure)

ফস্ফোরাস সংযুক্ত সারদ্বারা উদ্ভিদের বীজোৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারাই বীজের বৃদ্ধি ও উহার গুণের উন্নতি সাধিত হয়। নিম্নে কয়েকটী ফস্ফেটিক সারের নামোল্লেখ করা হইল।

(ক) অস্থি-সুপারফস্ফেট (Bone Super-Phosphate)—অস্থি দ্রব করিয়া এই সার প্রস্তুত করা হয়। (খ) অস্থি ভস্মযুক্ত সুপার ফস্ফেট। (Bone ash Super-Phosphate). ইহা অস্থি ভস্মদ্বারা প্রস্তুত হয়। (গ) দ্রব অস্থি মিশ্র সার (Dissolved Phosphate-bone compound). (ঘ) খাতব ফস্ফেট (Mineral Phosphate). (ঙ) খাতব সুপারফস্ফেট (Mineral Super-Phosphate). (চ) রিট্রোগ্রেড্ ফস্ফেট (Retrograde Phosppate). (ছ) টমাস ফস্ফেট (Thomas Phosphate). (জ) গোয়ানোসার (Guano manure).

ইহারা নানা জাতি।

সালফেটযুক্ত সার (Sulphatic manure).

নানাবিধ সালফেটযুক্ত সার বাজারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা প্রান্তরজাত ফসলের (field crop) পক্ষে বিশেষ উপকারী সার। নিম্নে ইহাদের কয়েকটীর নামোল্লেখ হইল।

(ক) এমোনিয়াম্-সালফেট (Ammonium Sulphate). (খ) এমোনিয়া লিকার (Ammonia Liquor). (গ) সোডিয়াম সালফেট (Sodium Sulphate). (ঘ) মোগনিসিয়াম সালফেট। (Magniciam Sulphate). (ঙ) লৌহ সালফেট (Iron Sulphate).

নাইট্রোজেন যুক্ত সার
(Nitrogenous manure)

উদ্ভিদ জীবনের জন্য নাইট্রোজেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ইহা ব্যতিরেকে উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি অসম্ভব। ইহা দ্বারা উদ্ভিদের মূল, পত্র, কাষ্ঠ ও বীজের সৃষ্টি হয়। ইহা দ্বারা নানাবিধ কৃত্রিম সারও প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান।

১। নাইট্রেট অব সোডা (Nitrate of Soda).

২। নাইট্রেট অব পোটাস (Nitrate of Potash).

বিশেষ সার
(Special manure)

ইহাও কৃত্রিম সার। বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্নরূপ সারের প্রয়োজন হয়। যে সার ব্যবহার করিলে ফসল বিশেষের বিশেষ উপকার সাধিত হয় উহাকে উহার বিশেষ সার বলা যায়। ফসল বিশেষের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সাধন জন্য যে বিশেষ উপাদানের প্রয়োজন হয়, উহা যে সারে আছে, তাহাই উহার বিশেষ সার। যেমন গোবিষ্ঠা গোল আলুর পক্ষে উপকারী সাধারণ সার কিন্তু গোল আলুর জন্য যে পরিমাণ পোটাস, নাইট্রোজেন, ফস্ফেট, লৌহ-ফস্ফেট ও মোগনিসিয়ার প্রয়োজন, গোবিষ্ঠায় উহার অভাব। এইজন্য ঐ সকল উপাদান্ দ্বারা আলুর চাষের জন্য যে সার প্রস্তুত করা যায় উহাই উহার বিশেষ সার।

উপরে যে সকল সারের উল্লেখ করা হইয়াছে উহারা এদেশে সুলভ নহে। সুতরাং

এদেশী কৃষকের পক্ষে ইহা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। উহারা যে যে উপাদানে প্রস্তুত হয় তাহা জানিলে এদেশে উহা প্রস্তুত করিয়া কৃষকদিগকে যোগাইতে পারা যায়। উহা প্রস্তুত করিতে কৃষি-রসায়ন-বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রসায়ন-বিদ্যার সহিত কৃষির নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সুতরাং কৃষি-রসায়ন দ্রব্য প্রস্তুত ও উহা ব্যবহার করার প্রণালী কৃষক মাত্রেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ভূমিস্থ খাতব পদার্থ, অঙ্গার ও যবক্ষার-জান সকল প্রকার ফসলেরই উপকারসাধন করিয়া থাকে। সুতরাং উহারাও সার। ইহাদের পরস্পর সংযোগে যে সার উৎপন্ন হয়, উহারা যৌগিক সার। বায়ুমণ্ডলস্থিত সারের সহিত ইহাদের সম্মিলন হইলে রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে ইহারা যৌগিক সাররূপে পরিণত হইয়া ফসলের উপকার-সাধন করিয়া থাকে। এই সম্মিলন কার্য্যকেও কৃষি-রসায়ন বলা যাইতে পারে। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে উর্ব্বরা ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ফসল জন্মিয়া থাকে। এইক্ষণে উর্ব্বরতা ভূমি কাহাকে বলে নিম্নে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। যে ভূমিতে উদ্ভিদের পুষ্টিকর সকল পদার্থই প্রয়োজনানুরূপ বিদ্যমান আছে উহাই উর্ব্বরা ভূমি।

২। প্রতি ফসলের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল পদার্থের কিয়দংশ ব্যয়িত হয়। এই সকল পদার্থের ব্যয়িত কতকাংশ ভূমি বায়ুমণ্ডল হইতে স্বভাবতঃই পুনরায় প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্টাংশের কতকাংশ একবারে নষ্ট হইয়া লোপ পায়। উহা আর প্রকৃতি কর্ত্তৃক ভূমিতে প্রত্যর্পিত হইতে পারে না। প্রতি ফসলের শেষে এই অপূরণাংশ পূরণ করিয়া দিলেই ভূমি উর্ব্বরা হয়।

৩। এইরূপে ফসলের পরিপুষ্টি বর্দ্ধক পদার্থ সকল ভূমিতে প্রত্যর্পিত হইলে, কখনও ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হয় না। উহা ফসল কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি চিরকালই সমভাবে থাকে।

৪। ভূমিতে পোটাশ, চূণ, ফস্ফরিক-এ্যাসিড্ ও লৌহের ভাগ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও উহারা তরল অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। কেন না ঐ সকল পদার্থ তরলতা প্রাপ্ত না হইলে উদ্ভিদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না।

৫। ভূমির মৃত্তিকার অাঁশ এরূপ ভাবের হওয়া প্রয়োজন যে উহাতে বায়ু, আলো ও উত্তাপ অনায়াসে প্রবেশলাভ করিতে পারে। কিন্তু ভূমির অাঁশ আবার অধিক হাল্কা হইলে, উদ্ভিদ ঐ ভূমিতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সুতরাং আবশ্যক পরিমাণের অপেক্ষা ভূমির অাঁশ অধিক হাল্কা হওয়া সঙ্গত নহে।

৬। ভূমিতে জল রক্ষার উপায় থাকা প্রয়োজন, কিন্তু আবশ্যকতারিক্ত জল নির্গমন পথ উন্মুক্ত রাখা চাই।

৭। ভূমিতে কিয়ৎ পরিমাণে জৈবিক পদার্থ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কেন না উহা ভূমির কাঠিন্য নষ্ট করিয়া উহাকে কোমল ও হাল্কা রাখে। ভূমি কোমল হইলেই উদ্ভিদ তরলীভূত যবক্ষারজানকে সহজেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভূমিতে অধিক পরিমাণে, অম্লপদার্থ বিদ্যমান থাকিলে উহা ফসলের পক্ষে উপকারী না হইয়া বরং অপকারীই হয়।

৮। কৃষি কার্য্যের দ্বারা স্বভাবতঃ যে সার উৎপন্ন হয়, উহা চিরস্থায়ী রূপে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। প্রতি ফসল হইতেই শস্য ও খড় ইত্যাদি আকারে, ভূমিস্থিত সারের অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে। তজ্জন্য ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির সমতা রক্ষা করার জন্য সার দেওয়া প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া কৃষিকার্য্য করিলে উহাতে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সুতরাং ভূমিতে রসায়ন দ্রব্য ব্যবহারের বিশেষ আবশ্যক হয়। এদেশে রসায়ন দ্রব্য প্রস্তুত, ব্যবহার করা সম্বন্ধে কোন আইন কানুনই নাই কিন্তু ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে এই বিষয়ে বিধিবদ্ধ আইন (Law) ও কানুন (Regulation) আছে। এই সকল আইন দ্বারা সারের ব্যবসায় পরিচালিত হইয়া থাকে। ইংরাজি ১৮৯৩ অব্দে, ইংলণ্ডে এ সম্বন্ধে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। উহার নাম সার ও পশুখাদ্য বিষয়ক আইন (Fertiliser & feeding Stuff Act.) ইহাকে ডিকেটারিয়া ৫৬ এবং ৫৭ অধ্যায় কহে। ইহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জারী হইয়াছে। এই আইন মত কেহ কোন অপরাধ করিলে ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। যাহারা কৃত্রিম সারকে অকৃত্রিম বলিয়া বিক্রয় করিবে তাহাদের প্রতি ঐ দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধে ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন আরও বহু কানুন জারী হইয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ কোন আইন বা কানুন বিদ্যমান নাই এবং বর্ত্তমান সময়ে এরূপ আইনের বিশেষ প্রয়োজনও দেখা যায় না।

কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায় নির্দ্দেশ

আমরা ইংরাজের প্রসাদে, উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছি সন্দেহ নাই। কিন্তু যে শিক্ষার সহিত আমাদের জীবন-মরণ সম্বন্ধ, সে শিক্ষা আমরা কোথায় পাইব? এ বিষয়ে আমাদের গভর্ণমেণ্ট উদাসীন, শিক্ষিত সমাজ উদাসীন, ধনকুবেরগণ উদাসীন এবং ভূম্যধিকারিগণও উদাসীন। তাহা হইলে কঃ পন্থা?

দেশের লোককে, বিশেষতঃ কৃষককে বৈজ্ঞানিক মতে কৃষিকার্য্য ও কৃষি-রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এদেশবাসীর সমবেত চেষ্টাই এই অভাব দূরীকরণের একমাত্র পথ। এদেশে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে কৃষিজীবির সংখ্যাই অধিক। তাহারা উৎপাদক (Producer) আমরা পরান্নপুষ্ট উদ্ভিদ (Parasites) বা জলৌকা বিশেষ। আমরা তাহাদের রক্তমাংস শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। কি ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়, কি বণিক সম্প্রদায়, কি কুসীদজীবিগণ, কি ব্যবহারজীব সম্প্রদায় সকলের জীবনই ইহাদের উপর নির্ভর করে। ইহাদের সুখে আমাদের সুখ, ইহাদের দুঃখে আমাদের দুঃখ ও ইহাদের মৃত্যুতে আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহাদের উন্নতিকল্পে আমরা বিন্দুমাত্রও চেষ্টা বা যত্ন করিতেছি না। বঙ্গের কৃষক মাত্রই নানা কারণে দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ঋণজালে জড়িত। তাহাদের জমি জমা ক্রমে কুসীদজীবিদের হস্তগত হইতেছে। সুতরাং কালে এই কৃষিকুল নির্ম্মূল হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহারা আর কৃষক থাকিবে না। ইহারা হইবে কুলি আর কুসীদ-ব্যবসায়িগণ হইবে ইহাদের

প্রভু। কেবল ইহাদের প্রভু কেন সকল সম্প্রদায়েরই প্রভু হইবে। সুতরাং এখন হইতেই কৃষিকুলের উন্নতিকল্পে আমাদের স্বরান্বিত হওয়া প্রয়োজন এবং যাহাতে উহারা বৈজ্ঞানিক মতে কৃষিকার্য্য করিয়া, নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে সক্ষম হয় সে জন্য তাহাদিগকে আমাদিগের সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। এজন্য উচ্চ শিক্ষা বিধানের আবশ্যক নাই। উচ্চ শিক্ষালাভ করিলে তাহারা আর কৃষক থাকিবে না তখন আমাদের ন্যায় তাহাদেরও উচ্চাভিলাষ স্বতঃই উৎপন্ন হইবে। আমরাও উচ্চাভিলাষে ও চাকরীর লালসার তরঙ্গে একেবারে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এইক্ষণ কূল না পাইয়া অন্ন চিন্তার স্রোতে হাবুডুবু খাইতেছি, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের চরমের পরম পন্থা একমাত্র কৃষি। অতএব এই জন্য কৃষকদিগকে কৃষিকার্য্যেই লিপ্ত রাখিয়া, উহাদিগের কৃষি-শিক্ষার দ্বার সহজে প্রকাশ্যভাবে উদ্ঘাটন না করিলে অচিরে আমাদেরও পরিণাম ঘোর অন্ধকারময় হইয়া দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। কিরূপে এই কার্য্যে ফললাভ করা যাইতে পারে তাহার পন্থা আমাদিগের অগ্রেই নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

দেশে ২।৪ টি কৃষি-বিদ্যালয় ও কৃষি-কলেজ আছে সত্য। কিন্তু আমাদের কৃষকসন্তানগণের পক্ষে তাহা সুগম্য নহে। এই সকল বিদ্যালয় বা কলেজ কেবল নামকা ওয়াস্তে। উহাতে পাঠ করিয়া যে কাহারও কার্য্যকরী শিক্ষালাভ হইয়াছে আমার এরূপ বিশ্বাস নাই এবং ভবিষ্যতে যে হইবে আমি এরূপ আশাও পোষণ করি না। সুতরাং যাহাতে কৃষক ও কৃষকসন্তানগণ ঘরে বসিয়া কৃষিকার্য্য ও কৃষিরসায়ন বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। কৃষিরসায়ন কি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে উহার ব্যবহার-প্রণালী কিরূপ, তাহা হাতে হেতেড়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। কেবল উচ্চমঞ্চে উপবেশন করিয়া উচ্চ ভাষায় বক্তৃতা দিলে তাহাতে ফলের সম্ভাবনা কোথায়? দেশের সর্ব্বত্র ২।৪টী গ্রাম লইয়া একটী গ্রাম্য সমিতির সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রত্যেক সমিতির হস্তে কৃষকগণের শিক্ষার ভার অর্পণ করিতে হইবে। প্রত্যেক সমিতিতে একটী কৃষি-পাঠশালার সৃষ্টি করিতে হইবে। এই সকল পাঠশালায় কৃষকগণকে সরল ও ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকাতত্ত্ব ও কৃষি-রসায়ন-বিদ্যা সম্বন্ধীয় মূলতত্ত্বগুলি, শিক্ষা দিতে হইবে। যখন কৃষকগণ এই সকল বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারিবে, তখন তাহাদের মন কৃষি-রসায়নের উপকারিতা পরীক্ষা করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইবে। আমি যে পথের উল্লেখ করিলাম, উহা শুনিতে সুগম্য বলিয়া বোধ হয় সত্য, কিন্তু উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে বহু দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে। সর্ব্বাগ্রে একটী কৃষি-সম্বন্ধীয় অধ্যক্ষ-সভা (Agricultural Syndicate,) গঠিত করিতে হইবে। উহার অধীনে বড় বড় সহরে, জেলায় ও উপরি বিভাগসমূহে, এক একটী কৃষি-সমিতির (Agricultural Society) সৃষ্টি করিতে হইবে। এই সকল সমিতির তত্ত্বাবধানে গ্রাম্যসমিতি সকল পরিচালিত হইবে। গ্রাম্য পাঠশালাসমূহে রাসায়নিক পরীক্ষা-ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখিতে হইবে এবং উহাতে রাসায়নিক দ্রব্য (chemicals) ও যন্ত্রাদি যতদূর সম্ভব রাখিতে হইবে। অধ্যক্ষসভা (Syndicate) কর্ত্তৃক এই সকল সমিতি ও

পাঠশালার কার্য্যপ্রণালী ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইবে। শিক্ষকগণ ঐ ব্যবস্থা ও নিয়মানুসারে কৃষকগণকে শিক্ষা দিবেন। শিক্ষার জন্য কতকগুলি সরল কৃষিগ্রন্থ—উদ্ভিদতত্ত্ব, কৃষিরসায়নতত্ত্ব, মৃত্তিকাতত্ত্ব ও সারতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক-প্রণয়ন করিতে হইবে। এই সকল পুস্তকের অভাবে কৃষিপাঠশালাসমূহের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ঢাকার স্বর্গগত নবাব বাহাদুর মাননীয় খাজে সলিমুল্লা সাহেব, কয়েক বৎসর হইল আমাদের প্রস্তাবানুসারে এ বিষয়ের একটী অধ্যক্ষ সভা গঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি আর এক্ষণ ইহলোকে নাই।

এই সিণ্ডিকেট-সমিতি ও পাঠশালাসমূহের কার্য্য পূর্ব্বোক্তরূপে পরিচালিত হইতে বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং দেশের ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়, শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং ধনী ও বণিক সম্প্রদায় এই বিষয়ে অগ্রসর না হইলে এবং তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার আশা করা যায় না। অথচ এইক্ষণ হইতেই এ বিষয়ে অগ্রসর না হইলে অদূর ভবিষ্যতেই বর্ত্তমান সমস্যাপেক্ষা মহা দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিলে বোধ হয় আমরা শীঘ্রই বাঙ্গালার কৃষিক্ষেত্রে কৃষি রসায়ন ব্যবহারের সফলতা দেখিতে সমর্থ হইব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ

প্রাচীন ইজিপ্তের সহিত ভারতীয় ভাবের সৌসাদৃশ্য

ভারতীয় আর্য্যদিগের প্রভাব যে অতীব প্রাচীনকালে পৃথিবীর নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহার সম্যক না হউক আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের বহিঃপ্রদেশে প্রাচীনকালের অতীব সভ্যতম সুদূর প্রদেশের যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইতেই ইহা উপলব্ধি হয়।

হিন্দু, বিশেষতঃ তান্ত্রিক শাক্ত হিন্দুগণ কামাখ্যা দেবীর যোনিপীঠ মহাপীঠের মধ্যে গণ্য করেন। আদ্যাশক্তি মহামায়ার পীঠাবলীর মধ্যে কামরূপে কামাখ্যাপীঠ মহাশক্তিপীঠের শ্রেষ্ঠ পীঠ বলিয়া পরিগণিত।

কালিকাপুরাণ অতীব প্রাচীনকালের কামরূপ প্রদেশের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক প্রভৃতি নানাবিধ তথ্য সম্বলিত একখানি পুরাণ গ্রন্থ। উক্ত পুরাণ হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় সেগুলি প্রাচীন কামরূপের সংস্রবে উল্লিখিত।

কালিকাপুরাণেই উল্লেখ আছে কামরূপেশ্বর নরকাসুর অপ্রতিহত আসুরিক শক্তিতে যখন কামরূপ প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন, সে সময় স্বীয় শক্তি প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে মহা মহাবীর অসুরদিগকে আনয়ন করেন। ইন্দ্র বরুণাদি নরপতিগণ তাঁহার উৎপীড়ন ও পরাক্রম ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন।

মহাভারতে উল্লেখ আছে নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত পশ্চিমসমুদ্রান্তরালবর্ত্তী যবনদেশেও প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন। এই সকল আভাষ "গৃহস্থে" প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি।

ইন্দ্রদেশ, বরুণদেশ, যমরাজ্য, কুবেররাজ্য প্রভৃতি পুরাণোল্লিখিত দেশ ও রাজ্যাদি আধ্যাত্মিক জগতের কোন লোক বা দেশ বলিয়া ধারণা করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। ঐ গুলি এই পৃথিবীর অন্তর্গত নানা-দেশ মাত্র।

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয়াংশ তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিভক্ত— ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বরুণ, এবং এই সাগর সংবৃত দ্বীপ ভারতবর্ষ তাহাদের মধ্যে নবম।

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিবোধত।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সংবৃতঃ॥

এতদ্বারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ সীমার বাহিরেও অনেক দেশ ভারতান্তর্গত ছিল বুঝা যায়। শানরাজ্য, ব্রহ্মদেশ, ইন্দ্রদ্বীপ, শ্যামরাজ্য সৌম্য, বর্ণিও, বারুণদ্বীপ বলিয়া অনুমান হয়।

মহাভারতে উল্লেখ আছে মহারাজ শান্তনু ইন্দ্রপদাধিকারী হইয়াছিলেন। ইন্দ্রদেশাধিপতিকে ইন্দ্র বলিয়া অভিহিত করা হইত। ভারতীয় অনেকানেক নরপতির সাহায্য যেরূপ ইন্দ্রকে লইতে হইত এবং তাঁহাদের শক্তি সাহায্যে ইন্দ্র বিপন্মুক্ত হইতেন, তদ্রূপ আবার ইন্দ্রদেশাধিপতি হওয়াও অনেকানেক ভারতীয় নরপতির ঐকান্তিক বাঞ্ছা অর্থাৎ তপস্যাধীন ছিল। পুরাণে কাব্যেতিহাসে এ সকল উল্লেখ আছে। এ সকল বিষয় ক্রমশঃ প্রবন্ধান্তরে অল্পবিস্তর আলোচনা করিব।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত অধ্যায়ে উল্লেখ আছে সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত ভারত দ্বীপ বিস্তারে নব সহস্র যোজন, উত্তর দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ। ইহার পূর্ব্ব-দিকে কিরাতগণ ও পশ্চিমে যবনেরা অব-স্থিত। বিষ্ণুপুরাণ অতীব প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে হয় না। তবে আধুনিক বলিতে ইতি-হাসের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বলিয়া মনে হয়। পুরাণ শ্রেণীর অন্তর্গত আধুনিক বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। উক্ত অধ্যায়ে ভারতের নদনদী জনপদাদির উল্লেখ, নানাবিধ জাতির বসবাসের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কামরূপ নিবাসিগণ বলিয়াও উল্লেখ আছে।

কালিকাপুরাণে অবগত হওয়া যায় কিরাতাদি জাতিগণ শৈবোপাসক ছিলেন। বিষ্ণুদ্বেষী দানব অসুরাদি জাতিগণ শিব শক্তির উপাসনা করিতেন বলিয়া অনেকানেক পুরাণে আভাষ পাওয়া যায়।

এইরূপে শৈবোপাসনা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ভারতীয় ব্রাহ্মণানুগত আর্য্যধর্ম্মের প্রভাব পৃথিবীর কতদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল উহার ধারণা করিলে, প্রাচীনতম-কালের ভারতীয় প্রভাব বোধগম্য হয়।

পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন সুরাসুর প্রভেদ ও ভিন্ন প্রকৃতিজাত বিদ্বেষ সত্ত্বেও সুর অথবা অসুর দানবাদি জাতিনিচয় সকলেই ব্রাহ্মণানু-মোদিত দেবদেবীর উপাসনা করিতেন। মূলে প্রভেদ ছিল না।

রূপকাভাষে যতই যেন প্রচ্ছন্ন থাকুকনা কেন তথাপি যেন মনে হয় পুরাণ অতীব প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক আভাষ প্রদান করিতেছে।

যখন যে দেশে যাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় তাহাদের ভাল মন্দ সকলগুলিই অল্প বিস্তর ব্যবহারিকতা মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়।

ভারতীয় উৎসবগুলিও যে অতীব প্রাচীনকালে ভারতের অতীব দূরবর্ত্তী সুদূরতম প্রদেশে নীত হয় নাই একথা কেহ বলিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। ঐ সকল দেশ হইতে অবশ্য ভারতীয় সংস্রব আভাষ প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, কেন না সে সকল বিবরণ যাহা অবগত হওয়া যায় সেগুলি বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় দেশ হইতে দেশান্তরে নীত, নানা দেশ ঘুরিয়া উপনীত হইয়াছে। আবার সে সকল বিবরণ যে সময়ে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের বহিঃপ্রদেশ হইতে রাষ্ট্রীয় শক্তি হারাইয়া দিন দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছিল। মহাভারত বর্ণিত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাযজ্ঞ ভারতে আর দ্বিতীয়বার হয় নাই। কাযেই পৃথিবীর দূরতম প্রদেশে ভারতের মহিমা বিস্মৃত হইয়াছিল। হয়ত কতক কারণ বিদ্বেষ-সম্ভূত আর কতক কারণ সংস্রবচ্যুত হইয়া। ভারতের উল্লেখ ঐ সকল দেশে যাহা ঈষৎ দেখা যায় তাহা অদ্ভুত কাহিনীর ন্যায় শ্রুত কথা। ভারতের পৌত্তলিকতা, ইন্দ্রজাল ও মানসকল্পিত স্বপ্নবৎ ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি। মানস-কল্পিত কেন না উহা তাহাদিগের দৃষ্ট কল্পনা নহে শ্রুতিমাত্র।

এক্ষণে ইজিপ্ত সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি।

ইজিপ্তীয়গণ বহুবিধ দেব দেবীর পূজা করিতেন। তন্মধ্যে Sati, Horus, Seb, Kartak, Anata, সতী, হর, শিব, কার্ত্তিক, অনন্ত নামের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। উক্ত ইতিহাসে উল্লেখ আছে ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; "all these deities are represented by distinct forms, and have distinct attributes." আর একস্থলে আছে "The Egyptians themselves speak not unfrequently of "the thousand Gods," sometimes further qualifying them, as "The Gods male, the Gods female, those which belong to the land of Egypt." স্ত্রী পুরুষ ভেদে সংস্র সংস্র দেবদেবী উপাসনা করিত জানা যায়।

৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, "The Egyptian was taught to pay a religious regard to animals." বৃষ, গাভী, মার্জ্জার, কুম্ভীর, ছাগ, বানর, কুকুর প্রভৃতিকে ধর্ম্মসংস্কারমূলক শ্রদ্ধার্পণ করিত বলিয়া জানা যায়। এমন কি ভগবানের অবতাররূপে পশুদিগকে সম্মান করিত উল্লেখ আছে। "The animal-worship reached its utmost pitch of grossness and absurdity when certain individual brute beasts were declared to be incarnate deities and treated accordingly."

রাজাকে ও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করিত, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য "The Egyptians had also a further God incarnate,—this was the monarch, who for the time being occupied the throne." Each king of the Egypt not only claimed to be "Son of the Sun," but to be an actual incarnation of the Sun."

রাজাগণ সূর্য্যবংশীয় বা সূর্য্যের অবতার বলিয়া গণ্য হইতেন। আমরা যেমন মনুদের হইতে মানবের আদি বংশপরম্পরা গণ্য করি এবং মন্বন্তর নিরূপণ করি, ঈজিপ্তীয়গণেরও ঐরূপ ধারণা ছিল অনুমান হয়। ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, "The Egyptians believed in Menes as a man; they placed him at the head of their dynastic lists." গ্রীসদেশে "Minos" জর্ম্মনীতে "Manmes" লিডিয়ায় "Manes" নামে মনুদের অভিহিত হইতেন। Man বা মানব শব্দ মনু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

ঈজিপ্তদেশে সৌরোপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনতম কালের সৌর উপাসনার মন্দিরাদির বিবরণ উক্ত গ্রন্থে জ্ঞাত হওয়া যায়। সৌরমণ্ডলও পূজিত হইত। রোম কনষ্টাণ্টিনোপল হেলিপোলিস প্রভৃতি নানাস্থানে Thothoes III তৃতমি (তৃতীয়) নরপতির প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভাদি দৃষ্ট হয়। ২০১।২০২ পৃঃ এবং ২২৯।২২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনতমকালের ঈজিপ্তের ইতিহাস আমাদিগের পুরাণের ন্যায় অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ। মহাভারত রামায়ণাদি পুরাণের অন্তর্গত যেমন অলৌকিক ঘটনা ও দেবতাদির বংশসম্ভূত বা দেবতাগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত নরপতিদিগের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঈজিপ্তের ইতিহাসেও তদ্রূপ দেখা যায়।

আশিয়া মহাদেশ হইতে ঈজিপ্তাভিমুখে জনস্রোত বসতিস্থাপন করিতে গমন করিয়াছিল জানা যায়। "There are signs of a presence upon the north-eastern frontier of Egypt on the part of the Asiatic needing a home"—১৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অসুরদিগের পীড়ন ঈজিপ্ত দেশেও হইয়াছিল জানা যায়। ১৩৩ পৃঃ—"Asahur had had to go forth out of the land of Shinar, and to make himself a habitation further to the northward, which must have pressed painfully upon other races."

উক্ত গ্রন্থের ৩৩৬ পৃঃ উল্লেখ আছে Asshur-banipal, অসুর বাণীপাল অসুরদল লইয়া ঈজিপ্ত বিধ্বস্ত করিয়াছিল।

উক্ত গ্রন্থের ৪৩।৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আমাদিগের জাতিভেদের ন্যায় ঠিক না হউক, জাতিভেদ ছিল। "Social ranks in Egypt were divided somewhat sharply. There was a large class of nobles, who were mostly great landed proprietors living of their estates, and having under them a vast body of dependents, servants labourers, artisans &c. There was also a numerous official class, partly employed at the court, partly holding Government posts throughout the country, which regarded itself as highly dignified, and looked down *de haut en bas* on "the people". Commands in the army seem to have been among the prizes which from time to time fell to the lot of such persons. Further, there was a literary class, which was eminently respectable, and which viewed with contempt those who were engaged in trade or

handicrafts. অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের ন্যায় শ্রেণীভেদ ছিল। যাঁহারা জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, ভূস্বামীবর্গ, রাজপুরুষগণ এবং যোদ্ধৃকার্য্যে নিরত ব্যক্তিগণ উচ্চ সম্মান লাভ করিতেন। তদধীনে শিল্পী ও বণিকগণ গণ্য হইতেন বলিয়া মনে হয়। তদ্ব্যতীত ইতর শ্রেণী যথা শ্রমজীবি গোপালন বা কৃষি আদি কর্ম্মে সম্ভ্রান্তবর্গের অধীনে জীবিকার্জ্জন করিত। নৌজীবি, মৎস্যজীবি, ভাস্কর, তন্তুবায়, চর্ম্মকার, সূত্রধর, স্থপতিকার্য্যকর, ধনরক্ষী, চিত্রকর, ধাতুদ্রব্য নির্ম্মাতা, কুম্ভকার প্রভৃতি নগণ্য ইতর শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইত।

"But all these employments, "Stank" in the nostrils of the upper classes, and were regarded as unworthy of anyone who wished to be thought respectable." তবে পরবর্ত্তী বিবরণ হইতে জানা যায় সকলে এক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইত এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তি যোগ্যতানুসারে উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়া সম্ভ্রান্ত মধ্যে গণ্য হইতে পারিত। সাধারণতঃ বংশানুক্রমে জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা করিত। গ্রন্থকার স্পষ্টতঃ বলেন জাতিভেদ প্রথা ছিল না। বিভিন্ন স্তরের মর্য্যাদা পার্থক্য জাতিভেদের প্রকারান্তর ব্যতীত কি বলিব। শ্রমজীবি-সম্প্রদায় রাজকার্য্যে "বেগারী" দিতে বাধ্য হইত। রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের খোস-খেয়াল বা সুখ-সুবিধার জন্য প্রাণ গেলেও কথা ছিল না। সুখ স্বচ্ছন্দ জীবন পরসেবায় নিযুক্ত থাকিত।

ইজিপ্তীয়গণ আত্মা অবিনাশী বলিয়া স্বীকার করিতেন বলিয়া মনে হয়। জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করিতেন। এমন কি পশ্বাদি-যোনি ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মনাশ করিতে করিতে ক্রমে-উন্নতি দ্বারা উচ্চস্থান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেন। ইহকালের কৃতকার্য্যের ফলাফল পরলোকে প্রাপ্ত হইতে হয়। জীবনান্তে পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া স্বর্গ নরক ভোগ হইয়া থাকে। যম চিত্রগুপ্তের ন্যায় Osiris, Thoth, Anubis দেবতা পরকালে বিচার করেন।

তাঁহারা কর্ম্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন এবং হিন্দুগণের ন্যায় তাঁহারাও অন্নদানাদির ন্যায় দান, হিংসাদি বর্জ্জন পৃথিবী কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন জানা যায়।

ভারতীয় মন্দিরাদিতে অশ্লীল চিত্র প্রকটনের ন্যায় চিত্র প্রকটিত করিতেন। দেবতাদিগের দোহাই দিয়া অগম্যগমনও দোষণীয় হইত না। ৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য—"The religious Sculptures of the Egyptians were grossly indecent; their religious festivals were kept in an indecent way; phallic orgies were a part of them, and phallic orgies of a gross kind, the Egyptians tolerated incest, and could defend it by the example of the Gods."

ইজিপ্তে পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) সম্প্রদায় উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, একতৃতীয়াংশ প্রদেশ ব্রাহ্মণ ও দেবত্র সেবায় বৃত্তিরূপে নিয়ামিত ছিল, কর দিতে হইত না। ২৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য—"The position of the priests in Egypt was, from the first, one of high dignity and influence." —"they formed a very distinct order or class, separated by important previleges, and by their

habits of life, from the rest of the community, and recruited mainly from among their own sons, and other near relatives. Their independence and freedom was secured by a System of endowments." দেবালয় ছত্রাদিতে ব্রাহ্মণগণ (priests) বৃত্তিভোগী হইয়া স্বাচ্ছন্দ-জীবনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন বলিয়া ধারণা হয়। রাজাও তাঁহাদিগের অভিসম্পাৎ ভয়ে ত্রস্ত থাকিতেন "The Kings lived always in a considerable amount of awe of the priests."

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের ন্যায় ঈজিপ্তেও রমণীগণ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। রমণী শুধু শয্যাসঙ্গিনী বা সহচারিণী নহেন। সহধর্ম্মিণী এই ভারতীয় ভাব ঈজিপ্তেও ছিল বলিয়া ধারণা হয়। ১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

"Women in Egypt had been, it is true, from very early times held in high estimation, were their husbands' companions, not their play things, or their slaves, appeared freely in public, and enjoyed much liberty of action."

ঈজিপ্তে Ramesses রামেসিস নামক এক রাজবংশ অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ উহাদিগের আদিবংশধর আসিয়া মহাদেশ হইতে গমন করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলেন। এই বংশের রাজত্বকালে ঈজিপ্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থাপত্য পূর্ত্তাদি নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া প্রভূত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

ঈজিপ্তের অনেক নরপতির কপোলদেশে সর্পাকৃতি মুকুট ধারণের প্রতিকৃতি দেখা যায়।

প্রায় হিন্দুমাত্রেরই ধারণা মন্ত্র তন্ত্র যাদুবিদ্যা কামরূপ প্রদেশ হইতে উদ্ভূত। কামাখ্যা তান্ত্রিকতা মন্ত্রতন্ত্র ইন্দ্রজাল বিদ্যার উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্রাচীন বিঘোষিত হইতে জানা যায়। মারণ বশীকরণাদি মন্ত্রও মায়া বিদ্যার জন্য কামাখ্যা কামরূপের প্রসিদ্ধি প্রাচীনকাল হইতে জানা যায়। শ্রীশ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য দেবের উপরও মন্ত্র প্রভাব প্রবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাকে পীড়িত হইতে হইয়াছিল।

কালিকাপুরাণে দেবীপূজার প্রসঙ্গে মন্ত্রাচার প্রসঙ্গ দেখা যায়। পিঠুলীর পুতুল করিয়া অভিচার করিতে হয়।

ঈজিপ্তদেশের বিবরণ উক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায় ৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য "A belief in magic was general, and men endeavoured to destroy or injure those whom they hated by wasting their waken effigies at a slow fire to the accompaniment of incantations."

২৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে "Magic was practised by some of the chief men in the state, and the belief was widely spread that it was possible by charms, incantations, and the use of waxen images to bewitch men, or paralyse their limbs, or even to cause their deaths."

ডাকিনী যোগিনীর ন্যায় উহাদেরও ডাইনের ভয় ছিল। "Hags were to be found about the court as wicked

as Canidia, who were willing to sell their skill in the black art to the highest bidder."

উক্ত গ্রন্থের ৩১২—৩১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য :— Magical Texts :—"When Horus weeps, the water that falls from his eyes grows into plants producing a sweet perfume. When Typhon let fall blood from his nose, it grows into plants changing to cedars, and produces turpentine instead of the water"—ইত্যাদি—ইন্দ্রজাল মন্ত্র উল্লেখ দেখা যায়।

To make a magic mixture : Take two grains of incense, two fumigations, two jars of Cedar oil, two jars of tas, two jars of wine, two jars of spirit of wine, "apply it at the place of thy heart. Thou art protected against the accident of life. Thou art protected against a violent death ; thou art protected against fire ; thou art not ruined on earth, and thou escapest in heaven." মন্ত্র অভিচার ও প্রকরণ ঘটিত কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল।

হিন্দুদিগের বহু দেবতার ন্যায় ঈজিপ্তীয়দিগের দেবদেবীগণ কেহ কেহ সুখ শান্তি ঐশ্বর্য্যবিধান কেহ কেহ পীড়াদায়ক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। দেবদেবীগণের আধিপত্য ও অধিষ্ঠান স্থানেরও পার্থক্য স্বীকার করিত। বহু দেবদেবীর উপাসনা সত্ত্বেও উহারা একেশ্বরবাদ স্বীকার করিত। ৩৪-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন ঈজিপ্তীয়গণের আকৃতি ও পরিচ্ছদাদির সহিত ভারতবাসী তথা আমাদিগের সহিত সাদৃশ্য অনুমান হয়। ৬০-৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আড়ম্বর বিহীন বেশভূষা, উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও বড় আড়ম্বর বা অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন না। মস্তক মুণ্ডিত করিতে হইত। প্রধানগণ মস্তকে পরচুলা ধারণ করিতেন।

"But otherwise his customs was of the simplest and scantiest, ordinarily, when he was employed in the common duties of life, a short tunic, probably of white linen reaching from waiste to a little above of knee, (কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বিত শ্বেতবস্ত্র) was his sole garment. His arms, chest, legs, even his feet were naked. গলায় পদকসহ হার বিলম্বিত থাকিত। হস্তে বলয় এবং বাহুতে যষ্টি ধারণ করিত। এই আকৃতি বর্ণনা অনেকটা দুর্গামাতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত প্রতিমার অসুরের ন্যায় বোধ হয়।

"The Egyptian *materfamilias* of the time wore her hair long, and gathered into three masses, one behind the head, and the other two in front of either shoulder. Like her Spouse, she had but little garment a short gown or petticoat reaching from just below the breasts to half way down the calf of the leg, and supported by two broad straps passed over the two shoulders. She exposed her arm

and bosom to sight, and her feet were bare, like her husband's. Her only ornaments were bracelets." নিম্নশ্রেণীর অবনীতা রমণীগণ যেরূপ মেখলা পরিধান করে অনুমান হয় তদ্রূপ পরিচ্ছদ।

স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা ছিল না "She is his associate in all his occupations," স্বামীর সহচারিণী ভাবে সর্ব্বকার্য্যে অধিকার ছিল।

ঈজিপ্ত হইতে পাশ্চাত্য দেশ সভ্যতালোক প্রাপ্ত হয়। মূরজাতি প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বহু শতাব্দী যাবৎ ইয়ুরোপখণ্ডে আধিপত্য করে। জ্ঞান সভ্যতা, ধর্ম্ম নানা বিষয়ক প্রভাব পাশ্চাত্য মহাদেশে ঈজিপ্ত হইতেই গৃহীত হয়। সুতরাং ঈজিপ্তের সহিত প্রাচীনকালের ভারতের ব্যবহার প্রণালী সৎ অসৎ সকল বিষয়ের সাদৃশ্য আলোচনায় অঙ্গাঙ্গিভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারত ও পুরাণ আভাষে যবন দেশের সহিত ভারতীয় সম্প্রবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

যে ভারতবাসীর শ্লীল অশ্লীল সকল প্রকার উৎসব আমোদ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগদ্ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অন্য প্রভাব ত দূরের কথা, যে ভারতবাসী একদা আত্মসম্প্রসারণ করিয়া সমগ্র জগতকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। যাহার নিদর্শন বহুধা বহুপ্রদেশে বিভক্ত বহুজাতি আচার ব্যবহার সমন্বিত ভারতে অদ্যাপি ক্ষীণ আভাষে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভারতবাসী সম্প্রসারণশীল শক্তি হারাইয়া আজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও পরমুখাপেক্ষী; ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে।

অন্য পৌরাণিক প্রবন্ধালোচনায় ঈজিপ্সিয়ানগণের বর্ণ বিচার (race) সম্বন্ধে উল্লেখ করিব। ইজিপ্ত দেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া "মিশ্রণ ভাব" প্রাপ্ত হইয়াছে। নচেৎ উহারা Nigritic race" "They were darker, had thicker lips, lower foreheads, larger heads, more advancing jaws, a fatter foot, and a more attenuated frame."

প্রাচীনকালের নরকপাল তুলনা করিয়া কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বাঙ্গালী মুণ্ডের সহিত তুলনা করিয়াছেন। হিন্দু Vide Hindu Superiority.

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে গুটিকয়েক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়

(৩৭১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

যে সব কাজে ক্ষয় হওয়ার আশঙ্কা

কতকগুলি ব্যবসা আছে যাতে লিপ্ত হলে অনেক সময় ক্ষয়রোগকে উদ্যোগ করে ডেকে আনা হয়। যে সব কাজে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা উৎক্ষিপ্ত হয় এবং নিকটে থাকিলেই উহা ফুসফুসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেই সব কাজ করতে গেলে ক্ষয় হওয়ার সমূহ আশঙ্কা। যারা ছুরি কাঁচি প্রভৃতি শান দেয় বা তৈয়ারী করে, চীনা মাটীর বাসন প্রস্তুত করে, টিনের কাজ করে, বা অন্যান্য

ধাতুর খনিতে কাজ করে, কয়লার খনিতে বা অভ্রের খনিতে কাজ করে, চুণ সুরকীর গুদামে কাজ করে, সুতা ও কাপড়ের কলে কাজ করে, পাটের আঁশ ছাড়ায়, পাট বা শণের গুদামে কাজ করে এবং তুলা ধোনে তাদের প্রায়শঃই ক্ষয়ে ভুগ্‌তে দেখা যায়। সুতরাং যারা এই সব কাজ করতে বাধ্য হয় তাদের বিশেষ সাবধানতা লওয়া আবশ্যক।

যে সব ব্যামো হলে ক্ষয়কাসি হওয়ার আশঙ্কা

এ ছাড়া কতকগুলি ব্যামো আছে যা হলে পরে ক্ষয় হবার আশঙ্কা থাকে। সুরিসির কথা পূর্ব্বেই বলেছি। হাম, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হুপীংকাসি, নিউমোনিয়া, প্রভৃতি রোগের পর ক্ষয়রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এই সব ব্যাধির পর শরীর যাহাতে সত্বর সবল হয় তাহাতে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ এই সব ব্যাধিতে শরীর এত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করে যে ক্ষয় অতি সহজেই আক্রমণ করতে সমর্থ হয় উপদংশ (Syphilis) ও বহুমূত্রের উপর এই পীড়া হইলে বা এই পীড়ার উপর উহাদের আক্রমণ হইলে ইহার গতি অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং আরোগ্য হওয়ার কম আশা থাকে। অতিরিক্ত মদ্যপান ও ব্যভিচার করিলেও এই ব্যাধি সহজেই শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়।

দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতা

এ ছাড়া আরও কতকগুলি কারণে এ ব্যাধি প্রকাশ পাইবার সুবিধা পায়। ইহার মধ্যে দরিদ্রতা ও দুর্ব্বলতাই প্রধান। দরিদ্র হইলেই অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে হয়, ভাল আলো বায়ুর ব্যবস্থা হয়ে উঠে না, পুষ্টিকর খাদ্য দূরে থাকুক দুবেলা পেট পুরিয়া খাওয়াই দুঃসাধ্য। আজকাল জীবনসংগ্রামের কঠোরতা বাড়িয়া গিয়াছে—লোকের কাজও বাড়িয়া গিয়াছে সর্ব্বদাই একটা ব্যস্ততার ভাব লাগিয়াই আছে।

আধুনিক সভ্যতার ফল

আধুনিক সভ্যতার ফলে সর্ব্বদাই একটা দৌড়াদৌড়ি একটা ছুটোছুটির ভাব লাগিয়াই আছে। জীবনের তার এত টানায় থাকে যে আর একটু টান পড়িলেই যেন ছিঁড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে শরীরের কিছুমাত্র থাকে না—ব্যাধিকে দূর করিয়া দিবার শরীরের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা তাহা সম্পূর্ণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় জীবনটা স্ফূর্ত্তিহীন ও ভার বিশেষ বলিয়া অনুমান হয়। ইহাদের যে সন্তানসন্ততি জন্মে তাহাদের দেহও সবল ও সুস্থ হইতেছে না এবং সহজেই এই ব্যাধির আক্রমণে ধ্বংস হইতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেদের কষ্ট আরও বেশী হইয়া পড়িয়াছে এবং এ ব্যাধির প্রকোপও তাদের মধ্যেই বেশী পড়িয়া যাইতেছে। উহারা একদিকে বাহিরের ভদ্রলোকের খোলস রাখিতে গিয়া অন্যদিকে অভাবের দারুণ নিগ্রহে একেবারে জীর্ণ হইতেছেন। যে পর্য্যন্ত ইহার একটা উপায় না হইতেছে সে পর্য্যন্ত এ ব্যাধি দূর হইবার সম্ভাবনা নাই।

ম্যালেরিয়া

ইহার উপর আবার ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিতে লোককে একরূপ অধমরা করিয়া রাখিয়াছে।

বাল্য-বিবাহ ও বিসদৃশ বিবাহ

বাল্য-বিবাহ দেশে প্রচলিত থাকায় এই বিবাহের অধিকাংশ সন্তানই দুর্ব্বল ও ক্ষীণতেজ জন্মিতেছে এবং এই সব ব্যাধির দ্বারা

অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। সুখের বিষয় যে এ বিষয়ে দেশের লোক সজাগ হইয়াছে এবং ইহারই মধ্যে বিবাহের বয়স পূর্ব্ব হইতে অনেকটা স্বাভাবিকের দিকে আসিয়াছে। যাঁহারা সবল ও সুস্থ সন্তান আশা করেন এবং যাঁহারা দেশের ও জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আশা করি তাঁহারা এ বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা দ্বারা বাল্য-বিবাহের অপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। বাল্য-বিবাহ ছাড়া আরও একটা দোষ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' কথাই শুনা যাইত। এখন তা ত আছেই অধিকন্তু 'প্রৌঢ়স্য বালিকা ভার্য্যাও' চলিত হইয়াছে। আজকাল এমন অনেক পুরুষ আছেন যাঁহারা ৩০।৪০ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহিত হইতে চাহেন না অথচ কন্যা ১২।১৩ বৎসরের অধিক মিলে না। এই অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ বিবাহজনিত সবল ও সুস্থ সন্তান উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত নহে। বয়সের এতটা বেশী পার্থক্য হইলে অনেক সময়ই বালিকা বধূর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে দেখা যায় এবং উহার অধিকাংশই ক্ষয়ে পরিসমাপ্তি হয় সুতরাং বিবাহের বয়সের অসামঞ্জস্যও দূর করিতে হইবে দেশের লোকের যে পর্য্যন্ত সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দরিদ্রতা দূর না হইতেছে সে পর্য্যন্ত এ ব্যাধি দূর হইবার আশা দুরাশা মাত্র।

বায়ু পরিবর্ত্তন

ক্ষয়রোগের প্রথম অবস্থায় স্বাস্থ্যকর স্থানে গেলে রোগ আরোগ্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমাদের বাঙ্গলা দেশের দুর্ভাগ্য যে ইহার নিকটে বিশেষ কোন স্বাস্থ্যকর স্থান নাই। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে সাঁওতাল পরগণার গিরিধি, মধুপুর, বৈদ্যনাথ, সিমুলতলা, রাঁচী, হিহিজাম, জামতাবা, কার্ম্মাটার প্রভৃতি স্থান বেশ ভাল ও স্বাস্থ্যকর। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে পুরী ও কক্স বাজারই নিকটবর্ত্তী, ওয়ালটেয়ার ভিজাগাপাটাম, বম্বে, কলম্বো প্রভৃতি দূরবর্ত্তী ও ব্যয়সাধ্য। শৈলাবাসের মধ্যে দার্জ্জিলিং ও কার্সিয়ংই নিকটবর্ত্তী; সিমং, সিমলা, উটাকামণ্ড, কাশ্মীর, বিন্ধ্যাচল, নৈনীতাল প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর হইলেও দূরবর্ত্তী। রাঁচী, হাজারীবাগ, পুরুলিয়া, ঘাটশিলা, চক্রধরপুর, ডেরী অন্ সোন, কামরানগর, ধানবাদ, বেনারস, চুনার, কটক প্রভৃতি স্থানও স্বাস্থ্যকর। উত্তরভারতের অধিকাংশ স্থানই স্বাস্থ্যকর। ওদেশটা উঁচু ও খট্‌খটে শুকনো সেই জন্যই স্বাস্থ্য ভাল। আমাদের বাঙ্গালার মত যে সব স্থান স্যাঁৎ স্যাঁতে ও নীচু এবং বৎসরের অধিকাংশ সময়েই জলে ডোবা থাকে সেই সব স্থানই ব্যাধির আবাসভূমি।

এ সব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সময়ান্তরে করার আশা রহিল। সকলের সকল স্থান সহ্য হয় না—সব সময়ে সব স্থান ভাল নহে। রোগীর দেহের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা প্রয়োজন। এবিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া স্থান নির্ব্বাচন করাই কর্ত্তব্য।

স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা

অল্পদিন পূর্ব্বেই স্যানাটোরিয়াম (Sanatorium) চিকিৎসার একটা ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। স্যানাটোরিয়ামে না গেলে ক্ষয়রোগের চিকিৎসাই যেন অঙ্গহীন থাকিয়া যাইত। ইউরোপ যেমনটা বড়ই হুজুগে, একবার যদি একটা নূতন কিছু হল অমনি সমস্ত লোক তাতে ঝুঁকে পড়ল। এই স্যানাটোরিয়ম চিকিৎসা সম্বন্ধে সকলেরই বোধ হয় অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে। উহা প্রধানতঃ কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে, যেখানে

নির্ম্মল বায়ু পাওয়া যায় সেইরূপ স্থানে থাকিতে হয়। প্রায় সর্ব্বদাই বাহিরে উন্মুক্ত বায়ুতে থাকিবার ব্যবস্থা এবং উহাতেই ব্যাধি নিরাকৃত হয়। যাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলো পাওয়া যায় তাহার বন্দোবস্তও করা হয়।

এ ছাড়া এখানে একটী সুচিকিৎসকের অধীনে ও তাহার তত্ত্বাবধানে থাকিতে হয়। ইহা হইতে যতটা ফল আশা করা গিয়াছিল ততটা ফল পাওয়া যায় নাই। স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসার যে উপকারিতা আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহাতে বায়ু পরিবর্ত্তন ত হয়ই, তার উপরে একটী সুদক্ষ, ও এই রোগ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে থাকিয়া জীবনটাকে নিয়মিত করা হয়। সুতরাং ভাল ডাক্তার ভাল স্থান ও সুনিয়ম তিনটি জিনিসেরই ফল ভোগ হইয়া থাকে এমত অবস্থায় উপকার না হইবার কোন কারণই নাই। বহুলোক এই সব স্যানাটোরিয়ামে আসিয়া রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছে। তবে সব অবস্থার রোগীরই উপকার হয় না। যাহারা প্রথম অবস্থায় আসে তাহাদেরই বিশেষ উপকার দর্শে। এই স্যানাটোরিয়মে থাকিলে আর একটী এই উপকার হয় যে ব্যাধি সম্বন্ধে রোগীদের বিশেষ জ্ঞান জন্মে এবং যে সব সাবধানতা লওয়া আবশ্যক তাহা উহারা সহজে শিক্ষা করিতে পারে।

কাজেই উহারা লোকশিক্ষার সহায়তা করে এবং চিরদিনের মত নিজেদের জীবনও নিয়মিত করিতে পারে। স্যানাটোরিয়ামে যতদিন থাকে অধিকাংশ রোগীই বেশ থাকে। উহা হইতে ফিরিয়া আসিলে কতক রোগী বেশ সুস্থ থাকে কিন্তু অনেকেরই পুনরায় ব্যাধি বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে স্যানাটোরিয়ামে থাকিতে উহারা ভাল স্থানে থাকে, ভাল খায়, কিন্তু বাহিরে আসিয়া হয়ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে হয়, আলো ও বায়ুর সুবন্দোবস্ত হয় না হয়ত সেরূপ আহারও জোগাইয়া উঠে না সুতরাং ব্যাধির প্রকোপ যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই সব কথা মনে রাখিতে হইবে এবং যাহাতে এই সব লোক ফিরিয়া আসিয়া ভাল ভাবে থাকিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। মিউনিসিপালিটি ও গবর্ণমেণ্টের এই সব লোকদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাড়ীর বন্দোবস্ত করা উচিত। যাহাতে উহারা উহাদের পুরাতন বাটীর ভাড়ায়ই এই সব ভাল বাড়ী পাইতে পারে তাহা করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের ধনকুবেরদের সহায়তা একান্ত আবশ্যক। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের অপেক্ষা কম সৌভাগ্যবান দরিদ্র ভ্রাতাদের ও দেশের কি উপকারই না করিতে পারেন। আমাদের এই পরদুঃখ কাতর দেশে দয়ার্দ্র লোকের কি এতই অভাব হইয়াছে?

স্যানাটোরিয়াম ও বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রধান অসুবিধা এই যে লোকটিকে একেবারে কার্য্য ত্যাগ করিয়া দীর্ঘদিনের জন্য দূর দেশে যাইতে হয় কতদিনে শরীর ভাল হইবে তাহার ত ঠিকানা নাই। হয়ত ইহার উপরই সংসারের সমস্ত নির্ভর করিতেছে কাজ ত্যাগ করিয়া গেলে বহুলোক অন্নাভাবে মারা পড়িবে। যাহাতে ইহারা নিশ্চিন্ত মনে চিকিৎসার জন্য যাইতে পারে সেজন্য ইহাদের অর্থ সাহায্যের জন্য যদি বন্দোবস্ত করা যায় তবে বড়ই ভাল হয়।

ব্যাধি হইলে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন কি না ? (Notification)

এই ব্যাধি প্রকাশ পাইলে কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা থাকিলে বড়ই ভাল হয় এবং যাহাতে উহা নানা স্থানে ব্যাপ্ত না হইতে পারে তাহার উপায় হইতে পারে। প্রথম অবস্থায় সংবাদ পাইলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার চেষ্টা চলিতে পারে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সংবাদ দেওয়া সহজ নয়। ডাক্তারেরাই অনেক সময় সে সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত মত দেন না। যখন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আইসেন তখন হয়ত ব্যারাম বেশ আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সুযোগ এবং যাহেন্দ্রক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও ব্যাধিকে অনেকটা সীমাবদ্ধ করা যায় এবং যাহাতে একজন হইতে অপরের সংক্রমন না হইতে পারে সে বিষয়ে সতর্কতা লওয়া যায়। সংবাদ দিলে যদি কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সংবাদ দিতে কাহারই দ্বিধা বোধ করিবার কারণ দেখি না। অনেক সময় সংবাদান্তে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের তাড়নায় এত বিপদে পড়িতে হয় যে তখন কেবলই মনে হয় কেন খাল কাটিয়া কুমীর আনিলাম ? সুতরাং সংবাদ জ্ঞাপনের প্রথা অবশ্য কর্ত্তব্য (Compulsory) না হইয়া যদি ইচ্ছামত (Voluptary) হয় তবে বোধ হয় উপকার হইতে পারে। এ সম্বন্ধে এত বেশী কথা বলিবার আছে যে উহার জন্যই একটী স্বতন্ত্র পুস্তিকার প্রয়োজন!

ইহার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় দরকার

আমাদের দেশে আপামর সাধারণের জন্য যে হাতব্য চিকিৎসালয়গুলি আছে তথায় এ রোগের সব সময়ে সুবিধামত চিকিৎসা হয় না। ইহার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করা উচিত। এ সম্বন্ধে এত বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে নিত্য এতই নূতন জ্ঞান সঞ্চয় হইতেছে যে ইহার জন্য বিশেষজ্ঞের (Specialist) একান্ত দরকার। সাধারণ চিকিৎসাগারগুলিতে ইহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত মনোযোগ দেওয়ার সুবিধা ত হয়ই না বরং ইহাদের সংস্পর্শে অপরাপর রোগীদের এই ব্যাধি হওয়ার সর্ব্বদাই আশঙ্কা থাকে। ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে বহুদিন হইল ইহার স্বতন্ত্র চিকিৎসা চলিতেছে আমাদের এ হতভাগ্য দেশে কি ইহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে ? ইহা যে আমাদের কেবল লজ্জার বিষয় তাহা নহে এই অবহেলার দরুণ অনেকের যাহাদের আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল—তাহারা অকালে মৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে। ইহা কি কম পরিতাপের কথা !

লোকশিক্ষা

যে সব উপায়ে লোকশিক্ষার সহায়তা হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কাজ গবর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণ উভয়েরই একযোগে করা কর্ত্তব্য। ডাক্তারগণ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন।

গবর্ণমেণ্ট

গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে এই ব্যাধির জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসাগার খুলিয়া—এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞান বিস্তার করিয়া, দরিদ্রেরা যাহাতে অল্প ভাড়ায় অপেক্ষাকৃত ভাল ঘরে বাস করিতে পারে এবং এই চিকিৎসা লোকের পক্ষে যাহাতে সহজ হইতে

পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া ইহার প্রকোপ কমাইতে পারেন। এই ধরুন থুথুটা যদি বিনা পয়সায় পরীক্ষার বন্দোবস্ত হয় তবে দেশের একটা মহা উপকার হয়, থুথুটা একবার পরীক্ষা করাইতে গেলেই ৵ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। ক্ষয়রোগে এমনও দেখা গিয়াছে যে ২০।২৫ বার পরীক্ষার পরে তবে হয়ত থুথুতে জীবাণুর দর্শন মিলিয়াছে। তা আমাদের মত দীন দরিদ্র দেশের লোকের এমন কি অবস্থা আছে যে ১০০৲।১২৲ টাকা খরচ করিয়া ২০।২৫ বার থুথু পরীক্ষা করাইবে, অনেকের একবার ডাক্তার দেখাইবার অর্থ ই জোটে না যদিই বা ডাক্তার দেখান হইল অনেক সময় ঔষধ আনা ঘটিয়া উঠে না। বিনা অর্থে থুথু পরীক্ষা আকাশ কুসুমের কথা নহে। আজকাল ইউরোপের প্রায় সকল স্থানেই ইহা নিত্য হইতেছে এবং এই সব কারণেই স্বতন্ত্র চিকিৎসালয়েরও এত প্রয়োজন।

অর্থ

এই সব কার্য্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। একা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা হইবার নহে। আমাদের দেশের ধনীদুঃখকাতর দয়ার্দ্র ব্যক্তিদের—লক্ষ্মীর যাঁহারা বরপুত্র তাঁহাদের এবং জনসাধারণেরও এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই কমলার সন্তানগণ—তোমরা যে ইহাদ্বারা কেবল দরিদ্রেরই উপকার করিবে তাহা নহে। দরিদ্রগণকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া নিজ নিজ জীবন রক্ষারই উপায় বিধান করিবে। সংসারে থাকিতে গেলে সকলের ভাল মন্দেই যে সকলের পা তাহা ধ্রুব। তাই নিজের শুভ ইচ্ছা করিলে অপরের মন্দটা দূর করিতে হইবে। উহাদের ব্যাধি কম হইলে সংক্রমণের ভয় কম হইবে সুতরাং ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে যাহারা সুযোগোপম তাহাদের এ বিষয়ে মুক্তহস্তে সাহায্য করা উচিত।

সমিতি গঠন

ইউরোপে অনেক স্থানে জনসাধারণে মিলিয়া সমিতি গঠন করিয়া এই ব্যাধি নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। তাহারা সংবাদ পাইলেই যেখানে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন সেখানে অর্থদান করে, যেখানে চিকিৎসকের অভাব সেখানে চিকিৎসক পাঠায়, যেখানে শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজন সেখানে তাহাদিগকে নিয়োগ করে। কেমন করিয়া বাস করিতে হইবে, কোথায় থুথু ফেলিতে হইবে, কি করিলে শরীর ভাল হইবে, কিসে অন্য লোকের অনিষ্ট না ঘটিতে পারে এ সব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে বহু লোক রোগমুক্ত হইয়া জাতির সংখ্যা ডবল বৃদ্ধি করিতেছে। ভাই সব, আমাদের দেশে কি এই সমিতি গঠন ও কার্য্য গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব! আজ দেশে এই ব্যাধির তাড়নায় ঘরে ঘরে যে হাহাকার উঠিতেছে তাহার কি প্রতিকার হইবে না? আমরা কি নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিয়া ও মাত্র গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া ধ্বংস পাইব?

আশার কথা

যাঁহারা এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন তাঁহাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এক সময় না এক সময় এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হই কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলেই মরিয়া যাই? আমাদের শরীরের অনেক ক্ষমতা আছে; প্রকৃতি তাহাকে রোগ নিবারণের স্বাভাবিক অস্ত্র ক্ষমতা দিয়াছেন। আমরা যদি সাবধানতার

সহিত চলি—যদি এই ব্যাধি দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি—তবে উহাতে বেশীক্ষণ লাগে না। আমি বহু লোককে এই রোগ হইতে মুক্ত হইতে দেখিয়াছি; এমন কি যে সব রোগীর জীবনের আশা মাত্র করি নাই তাহার মধ্যেও অনেকে এমন আরোগ্য হইয়াছেন যে একেবারে আশ্চার্য্যান্বিত হইতে হইয়াছে। সুতরাং এ ব্যাধি আক্রমণ করিলে জীবনে নিরাশ হইবার কারণ নাই।

আমাদের কর্ত্তব্য

এই ব্যাধিগ্রস্ত হইলে আমাদের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। নিজের জীবন নিজের নিকট যেমন অতিশয় প্রিয় সেইরূপ অন্যেরও। আমরা যাহাতে অপরকে সংক্রামিত না করি সে বিষয়ে একান্ত সচেষ্ট হইতে হইবে এমন কি উহা একটী ব্রতস্বরূপ মনে করিতে হইবে। আমরা যাহাতে ব্যাধিগ্রস্তের সহিত একত্রে আহার বিহার না করি, একত্রে নিদ্রা না যাই এক পাত্র হইতে পানীয় পান না করি বা একই থালায় না খাই সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য সব জিনিসই স্বতন্ত্র থাকা প্রয়োজন। এক হুঁকায় তামাক খাওয়া সঙ্গত নহে। অপরকে চুম্বন নিষিদ্ধ বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগকে কারণ উহারা অতি অল্পতেই সংক্রামিত হয়। সর্ব্বোপরি আমাদের যেখানে সেখানে থুথু ফেলা অনুচিত। ইহাতে যে কেবল সাধারণের উপকার করা হইবে তাহা নহে, নিজের অভ্যাসও ফিরিয়া যাইবে এবং উহাতে নিজেরও পরোক্ষভাবে উপকার আছে। অনেকের থুথু গিলিয়া খাইবার অভ্যাস আছে উহা অত্যন্ত খারাপ। ঐ জীবাণুপূর্ণ থুথু রক্তপথে যাইয়া নানা স্থানে নীত হইতে পারে এবং নানা স্থানের ক্ষয় উৎপাদন করিতে পারে এবং কোন কোন স্থান হইতে পুনরায় ফুসফুসকে আক্রমণ করিতে পারে—সুতরাং এ সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। এই সব বিষয়ে ভ্রিয়মাণ হইবার কিছুই নাই। ব্যাধি হইলে লোকের মনে স্বতঃই কষ্ট হয় তাহার উপর এইরূপ কঠিন ব্যাধি হইলে আরও বেশী কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তাই বলিয়াই কি হাইল ছাড়িয়া দিতে হইবে, সমস্ত কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দিতে হইবে? যে ভারতবর্ষ পরের উপকারের জন্য নিজকে অর্ঘ্য দিতে চিরদিন শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে, সেখানে কি এ সামান্য বিষয় এতই কঠিন? কখনই না। আমার বিশ্বাস সকলেই প্রফুল্লচিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবে এবং যাহাতে অপরে আক্রমিত না হইতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হইবে।

সতর্ক হইবার লক্ষণসমূহ

যখনই বিশেষ কারণ ব্যতীত শরীর খারাপ বোধ হইবে হয়ত উহাতে ভয়ের কোনও কারণই নাই, হয়ত বিকেলে একটু একটু জ্বর হইতে থাকিল, কি প্রায়শঃই সর্দ্দি হইতে থাকিল—কি খুস্ খুসে কাসি দেখা দিল কিংবা রাত্রিতে অতিরিক্ত পরিমাণ ঘাম হইতে থাকিল—শরীরের নানা স্থানে বিশেষতঃ বুকে পিঠে বেদনা করিতে থাকিল, হঠাৎ গলা দিয়া রক্ত উঠিতে আরম্ভ হইল, শরীরটা খামাখা দুর্ব্বল হইয়া চলিল—হঠাৎ ক্ষুধাটা বা কমিয়া গেল, শরীরের ওজন হয়ত বিনা কারণে কমিতে আরম্ভ হইল বিশেষ, জ্বর নাই বা অন্য উপসর্গ নাই অথচ শরীরটায় সোয়াস্তী বোধ হইতেছে না—এই সবের কোনও একটী যদিও কঠিন লক্ষণ নয় বা উহাতে ভয়ের আদৌ কারণ নাই কিন্তু তবুও একটা মস্ত অসুবিধা ত? শারীরিক অসুস্থতা বোধ

করিতে হইতেছে ত ?—এমত অবস্থায় বৃথা কালক্ষেপ বা উপেক্ষা না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশ লওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য।

ডাক্তারদের কথা

আমাদের দেশে এই ব্যাধি নিরূপণ সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ দেখিতে পাই। ইহার চিকিৎসার ফল প্রত্যাশা করিলে এবং ইহার বিস্তার বন্ধ করিতে হইলে এই ব্যাধির সূত্র পাতেই ইহাকে ধরিতে হইবে। কিন্তু এই স্থানেই যত বিপদ! প্রায়শঃই প্রথমাবস্থায় অনেককেই এসম্বন্ধে একটা মত দিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিতে পাই। থুথুতে জীবাণু বা ফুস্‌ফুসে ক্রেপিটেসন্ (crepitation) প্রভৃতি না পাইলে এই রোগ সম্বন্ধে উহারা কোন মত দেন না। যখন ঐসকল পাওয়া যায় তখন ব্যাধি বহুদূর অগ্রসর হইয়া থাকে এবং ব্যাধির প্রতিকার করাও কষ্টসাধ্য। সুতরাং যাহাতে প্রথম অবস্থায় একটা মতামত দেওয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। একজনে যদি বলেন যে হাঁ ব্যাধি সন্দেহ হইতেছে বটে—অপরে হয়ত বলিয়া বসেন—না হে এ সম্বন্ধে এখনও ঠিক বলা যায় না—ইহা যে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। একেবারে প্রবল অবস্থায় ধরা যায় না সত্য তবে কিছুদিন বাদেই এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় যাহা হইতে একেবারে নিশ্চয়রূপে বলা না গেলেও সন্দেহের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান থাকে। রোগী শিক্ষিত হইলে সন্দেহ হওয়া মাত্রই তাহাকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্ক হইতে বলা সঙ্গত এবং তাহাকে যে মাঝে মাঝে দেখা আবশ্যক এসম্বন্ধেও বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বার বার দেখিলে হয়ত সন্দেহের কারণ দূরীভূত হইবে নতুবা যাহা সন্দেহের ছিল তাহা পূর্ণ ব্যাধিরূপে প্রকাশ পাইবে, মানবজীবন বড়ই মূল্যবান—উহা যাহাতে আমাদের অবহেলায়, আমাদের মূর্খতায় বিনষ্ট না হয় তাহার যথোচিত চেষ্টা প্রয়োজন। আমরা হয়ত সব সময় সব কথা বুঝি না—মানুষ সদাই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ—এমত অবস্থায় অধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। অন্ততঃ একজনের মাথার চেয়ে যে দুজনের মাথার মূল্য বেশী তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্য পরিচয়

ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার প্রতিকার—শ্রীআশীশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এস্ সি, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—২৭ নং বকুল বাগান রোড, ভবানীপুর। মূল্য ।৵০ আনা।

ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা কি প্রকারে খারাপ হইয়া পড়ে এবং কিসে খারাপ না হয়, তাহা দেখানই লেখকের উদ্দেশ্য। ছেলেদের উপযোগী বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপায় পুস্তকখানিতে বিবৃত করা হইয়াছে। পুস্তকখানা শুধু ছেলেদের জন্য লিখিত নহে—অভিভাবকগণও ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন। সমাজের উন্নতিকল্পে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। পুস্তকখানার নাম 'ছাত্রগণের নৈতিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীমদ্‌গোমঙ্গলম্—

শ্রীবিভূতীপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—২৩ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা মাত্র। গোজাতির মঙ্গলকল্পে পুস্তিকাখানি লিখিত। প্রত্যেক গৃহস্থেরই গোসেবা একটি অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম। অতএব গৃহস্থ পত্রিকা এই পুস্তকের অনাদর করিতে পারে না।

হাম্মির (ঐতিহাসিক উপন্যাস)—শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

যে প্রসিদ্ধ রাজপুতবীরের নামে এই আখ্যায়িকার নামকরণ হইয়াছে, তাঁহার চরিত্রবত্তা এবং বীর্য্যবত্তার উজ্জ্বল চিত্র উপন্যাস খানিতে আমরা আশা করিয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম, হাম্মিরের চরিত্রে আমরা এমন সকল গুণ দেখিতে পাইব, যাহাতে মুগ্ধ হইয়া রাজপুতগণ তাঁহার পতাকার তলে সমবেত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু লেখক সে বিষয়ে আমাদিগকে একেবারে নিরাশ করিয়াছেন। শুধু নিপুণ যোদ্ধার বেশে হাম্মিরকে সাজাইয়া তিনি তাঁহাকে বীর বলিয়া মানিয়াই ক্ষান্ত। কিন্তু যুদ্ধে নিপুণত্ব যে বীরত্বের একটা আংশিক পরিচয়, একথা ভুলিলে ত চলিবে না। হাম্মিরকে যে লোকে নেতার পদে বরণ করিয়াছিল, সে কি কেবল এই গুণে? তাঁহার ত্যাগস্বীকার, তাঁহার সাহসিকতা, তাঁহার উদ্যম, তাঁহার সকল সফলতার মূলে। ইতিহাস সে সব তথ্য সম্বন্ধে নীরব থাকিলেও ঔপন্যাসিকের কল্পনা সে সকলকে টানিয়া বাহির করিতে পারে—ইহা ত নিশ্চিত।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই। তাহাদের কোন কোনটি বেশ ভালই ফুটিয়াছে। লেখকের ভাষার উপর বেশ দখল আছে। রচনার এবং গল্প বলিবার ভঙ্গীটি পুরাতন ধরণের হইলেও আধুনিক যুগেও একেবারে কম উপভোগ্য নহে। গল্পের স্থানে স্থানে লেখক রসিকতার বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ঐ সব স্থলে আরও একটু সংযত হইলে মানাইত ভাল।

মঙ্গলনির্ঘোষ—কলিকাতা ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল হইতে শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কতিপয় বৈষ্ণব-প্রধান একজন ধর্ম্মব্যবসায়ী

মুচিকে উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করাই এই নির্ঘোষের উদ্দেশ্য। এ নির্ঘোষে মঙ্গল কি অমঙ্গল সমাজপতিরা তাহা স্থির করিবেন। আমরা এ বিষয়ে কোন মতামত দিতে অক্ষম।

১। হিন্দী সরস্বতী—

জানুয়ারী ১৯১৬। সরস্বতীর এই সংখ্যা পূর্ব্বালোচিত সংখ্যাদ্বয় হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। "হর্বর্ট স্পেন্সরকী অজ্ঞেয় মীমাংসা" একটী গতানুগতিক দার্শনিক তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি। "কালিদাসকা সময় নিরূপণ" ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত পঞ্চানন মিত্র মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের আলোচনা। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ঐতিহাসিক বৃন্দ যে পরস্পরের গবেষণার সন্ধান রাখিতেছেন ইহা বড়ই সুখের বিষয়। ইহা ব্যতীত অন্যান্য গদ্য প্রবন্ধগুলিও সুপাঠ্য ও চিন্তাপূর্ণ। কিন্তু আমরা পদ্যগুলির একেবারেই প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

২। সংস্কৃত শারদা—

জানুয়ারী ১৯১৬। এখানি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত। আমরা আমাদের এই নবীন সহযোগীকে সাদরে সাহিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। এই সংখ্যায় ১০টী প্রবন্ধ ও পুস্তক পরিচয় আছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে সকলগুলিই অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেকগুলিই সুপাঠ্য। এই পত্রিকার প্রবন্ধগুলির দ্বারা একটা কথা বেশ উদাহৃত হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ সুধীমণ্ডলী পাশ্চাত্য বিদ্যা ও পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু এই পত্রিকাখানি পাঠ করিলে সে ভ্রম নিরাকৃত হইবে। "ছায়াপথ" নামক প্রবন্ধটীতে ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্বৃন্দের চিন্তার ফল আলোচিত হইয়াছে। পুস্তক পরিচয়ের মধ্যে সক্রেটিসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। নবাবিষ্কৃত মহাকবিভাসের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে একটী সুপাঠ্য প্রবন্ধ আছে। কিন্তু আমরা সংস্কৃত সাহিত্য রথিবৃন্দের নিকট হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ আশা করি।

৩। ইংরাজী—

Central Hiudu College Magazine. ভারতের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠবিদ্যালয় প্রকাশিত পত্রিকা যেরূপ হওয়া উচিত এই পত্রিকাখানি তাহা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বিষয়ের বৈচিত্র্য নাই। পত্রিকার অধিকাংশই সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত বক্তৃতাদি পূর্ণ। আশা করি Central Hindu Collegeএর অধ্যাপকগণ ছাত্রগণকে পত্রিকা খানির উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করিবেন।

মফঃস্বলের বাণী

১। বঙ্গে ম্যালেরিয়া

দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যে ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুইচারিটী জেলার ম্যালেরিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় সমগ্র বঙ্গেই প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। এখনও এই দুর্জ্জেয় রোগের কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে দেশ রক্ষা পাইবে—নতুবা আমাদের সকল উন্নতির চেষ্টা বৃথা।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ও বিশ্বাস ডাক্তার বেন্টলীর ন্যায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিশারদও তাহার অধিকাংশের সমর্থন করিয়াছেন। স্থূল চক্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল সেখানেই পূতিগন্ধ, কীট ও মশকাদির বাস। জল, রৌদ্র ও অগ্নি এই তিনটিই শুদ্ধিকরণের প্রধান উপায়। আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি রীতিমত বর্ষার সময় ম্যালেরিয়া থাকে না। যাহা কিছু অপবিত্র, যাহা কিছু অস্বাস্থ্যকর, জলস্রোতে সমূহ ধুইয়া লইয়া যায়। আমাদের দেশের নদী, নালা প্রভৃতি প্রকৃতির স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী। এগুলি যতদিন কার্য্যকরী ছিল ততদিন দেশে বিষ সঞ্চয়ত হইতে পারে নাই—কিন্তু ইহারা শুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ দেখা দিয়াছে। এটা শুধু আমাদের বিশ্বাস নহে, আমরা বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার সমর্থন করিতে পারি। মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার অবস্থা অতি শোচনীয়; গঙ্গা পদ্মের কলুষ গ্রহণ করিতেছেন বটে কিন্তু তাহা বিদূরিত করিবার শক্তি আর গঙ্গার নাই। সকল পাপ সকল আবর্জ্জনা ভাগীরথীর নীরে ও কূলের স্তরে স্তরে সংক্রমিত হইয়া এক মহাবিষের সৃষ্টি করিতেছেন। সে বিষে বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। পূর্ব্বে রঙ্গপুর জেলার তিস্তার তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ স্বাস্থ্যকর ছিল, কিন্তু তিস্তা সেতু নির্ম্মিত হইবার পর হইতে ত্রিস্রোতার সকল শক্তি অন্তর্হিত, তিস্তা প্রায় মরা-নদীতে পরিণত। তাই মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ন্যায় তিস্তার চারিদিকেও ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। পদ্মার অবস্থাও ষাড়াসেতু নির্ম্মাণের পর হইতে শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে —তাই পাবনা জেলাতেও গত বৎসর ভীষণ ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছিল। দিনাজপুরের প্রাকৃতিক পয়ঃপ্রণালী নদী প্রভৃতির অবস্থাও শোচনীয়। শুষ্কীকারক বারির সহিত দেখা নাই ধূলিরাশির শত শত রোগ, বীজাণু পথ ঘাট, মাঠ এমন কি গাছ পাতা পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে—তাই সেখানেও এবার ভীষণ ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে।

যখন বর্ষা বেশী হয় তখন মরা নদীতেও স্রোত বহে, দেশের আবর্জ্জনা বিধৌত হইয়া যায়। এটা দৈবকৃপা। এবার পাবনা জেলায় বেশী বর্ষা হইয়াছে, তাই সে জেলায় এবার ম্যালেরিয়া নাই, কিন্তু এবার রঙ্গপুর দিনাজপুর জেলায় সেরূপ বর্ষা হয় নাই, তাই দেশের বিষ দেশের স্তরে স্তরে সংক্রমিত হইয়া ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার মশকহেতুত্ব স্বীকার করি বা না করি, দেশের আবর্জ্জনা বিধৌত না হইলেই যে এই আপদের সৃষ্টি হয় তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি—তবে ডাক্তারেরা বলিতে পারেন, আবর্জ্জনা বৃদ্ধি হইলে মশক বংশও বৃদ্ধি পায়। জলনিকাশ ভালরূপ হইলে যে ম্যালেরিয়া হ্রাস পায়, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত রঙ্গপুর সহরের ক্যানাল বা খাল। এই পয়ঃপ্রণালী খাত হইবার পূর্ব্বে রঙ্গপুর যমপুর ছিল, কিন্তু ইহার পর হইতে রঙ্গপুরের স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। তবে রেলসেতু নির্ম্মাণে দেশের পয়ঃপ্রণালী মূল নদীগুলি নিস্তেজ ও রেলের রাস্তা বৃদ্ধিতে জলনির্গমের পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় দেশের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে। কেহ কেহ পাটকে ম্যালেরিয়ার কারণ বলেন, কিন্তু

পাটের উৎপত্তি স্বাস্থ্য হানির কারণ নহে—পাট পচিয়া যে দুর্গন্ধের ও বিষের সৃষ্টি করে, তাহাও আংশিক কারণ। এই বিষ স্রোতে বাহির হইয়া গেলে তত ভয়ের কারণ থাকে না। বেন্টলি সাহেব যে বলিয়াছেন,—পাট ও ধান যে স্থানে অধিক উৎপন্ন হয় তথায় ম্যালেরিয়া কম, এ উক্তি সত্যবিরোধিনী। রঙ্গপুর দিনাজপুরে এবার খুব ম্যালেরিয়া দেখা গিয়াছে। তবে পাটপচানের বিষ ও সেই বিষ নির্গমের উপায়াভাব এই উভয় কারণেই এই দুই জেলায় এবার এত বেশী ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে।

দেশে যাহাতে জঙ্গল বৃদ্ধি না পায় সূর্য্যের কিরণ যাহাতে সকল স্থানকে পবিত্র করিতে পারে, অগ্নিশিখা যাহাতে দূষিত পদার্থকে শুদ্ধ করে এ সমুদয় বিষয়ে দেশবাসী মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন। অগ্নি ও সূর্য্য প্রকৃতই বিশোধক—এই নিমিত্তই অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। ডাক্তারেরাও নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ক্ষত প্রভৃতিতে সূর্য্যরশ্মির উপকারিতা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু নদীগুলির সংস্কার বহুব্যয় সাপেক্ষ—এদিকে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রাণ রক্ষা না করিলে গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য সকল কার্য্যে ব্যয়ই নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ

পল্লী-সেবার অন্তরায় ও উপায়

প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই আজ পল্লীগ্রামের দুরবস্থা চিন্তা করিয়া কাতর হইতেছেন এবং সেই দুরবস্থা দূরীকরণার্থ সাহিত্যে প্রবল আলোচনা সৃষ্টি করিতেছেন। ইহারা ভাবুক ইহারা কর্ম্মীও বটেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পল্লীগ্রামবাসী কি না সন্দেহ। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে লিখিত আছে—

তত্র মিত্র ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম।
ঋণদাতা চ বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয় সজলা নদী॥

অর্থাৎ হে মিত্র যেখানে ঋণদাতা চিকিৎসক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সজলা নদী এই চারিটী বস্তু নাই সেখানে বাস করিবে না। আজ পল্লীজননীর সেবক বৃন্দ মাত্রই লক্ষ্য করিয়াছেন যে পল্লীগ্রামে ইহার প্রত্যেকটীর অভাব ঘটিয়াছে। গ্রামে আজ ঋণদাতা নাই। যাহারা আছে তাহারা চাষী প্রজার রক্তশোষণকারী। চিকিৎসক পয়সা পয়সা বলিয়া প্রায় গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। শত গ্রামসমূহেও আজ কোনও সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক নাই। উপাধিধারী ডাক্তার গ্রামে বাস করেন না। কারণ গ্রামে তাঁহাদের খরচ পোষায় না। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আজ প্রায় কোথাও নাই। সে টোল এখন আর নাই, সেই বিনা বেতনে শিক্ষা প্রায় লোপ পাইয়াছে। সে গুরু দক্ষিণা আর কেহ দেয় না। যাজনিক ব্যবসায় আর কাহারও সংসার চলে না। সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদ্যায় নাই, সে কর্ম্মঠতা নাই শাস্ত্র পাঠ নাই। সজলা নদীর কথা আজ না বলিলেও চলে। নদী সব মজিয়া গিয়াছে। জলাশয়সমূহ জঙ্গলাকীর্ণ। এখন আর পিতৃপুণ্যে মাতৃপুণ্যে কেহ জলাশয় খনন করায় না। লোকহিতার্থেও নহে।

এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লোক সকল গ্রামে বাস করিতে চায় না। তাই পল্লীগ্রাম সমূহ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে কেন এমন হইল? এই অবস্থাই পূর্ব্বে হইয়াছে তারপর লোক সকল গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে কি লোক সকল পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়াছে বলিয়াই পল্লীগ্রাম সমূহের অবস্থা এমন হইয়াছে। আমাদের মনে হয় দুই কারণ ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ লোক সকল শিক্ষিত হইবার আশায় পল্লীগ্রামের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে। ইংরেজী শিক্ষারম্ভের প্রথম ভাগে শিক্ষাভিলাষী বালক মাত্রকেই বাল্যে পল্লীজননীকে ত্যাগ করিতে হইত, আজ কোনও কোনও গ্রামের সে অবস্থা দূরীভূত হইয়া থাকিলেও অনেক গ্রামের অবস্থা এখনও তদ্রূপ আছে। তারপর শিক্ষার যতই উন্নতি

হইল ততই গ্রাম হইতে সহর, সহর হইতে রাজধানী গমন করিতে হইল। ছাত্র-জীবনের অবসানে অর্থাগমের জন্য পল্লীগ্রামের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সহরবাসী হইতে হইল। কাজেই পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশা ঘটিল। এই সমস্ত অবস্থাই মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে ঘটে কারণ চাষীপ্রজা আজও গ্রামে বাস করে, মধ্যবিত্ত আর গ্রামে বসিয়া জীবনোপায়ের সন্ধান করিতে পারে না। পূর্ব্বেকার ভূমির আয় এখন আর অনেকের নাই। তদুপরি বিলাসিতা ও অবশ্য কর্ত্তব্য ব্যয়ের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

এখন ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন করা কতদূর সম্ভবপর তাহাই দ্রষ্টব্য। আমরা আগামী সপ্তাহে সেই বিষয় আলোচনা করিব।

বরিশাল হিতৈষী

৩। আমাদের কর্ত্তব্য

স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির উপকারের জন্য দেশের সকলেরই একটা ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য দিন দিন কত সভা সমিতির সৃষ্টি হইতেছে, তাহাদের গণনা করা অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে; বিলাতে, এদেশে, লাট সভায়, টাউন হলে, জমীদার সভায়, বাগানে, বিপিনে, নদী সৈকতে, পুস্তকাগারে, চারি দিকেই বক্তৃতার স্রোত প্রবাহিত, প্রস্তাব উত্থাপন অনুমোদন, সমর্থন, ঘন ঘন করতালি প্রদান কিছুরই ত্রুটি নাই। কত লীগ, কত কনফারেন্স, কত সঙ্ঘ, কত সম্মিলন, কত পরিষদ কতই দেখিতেছি, আজ কাল আবার সমিতির নামের পূর্ব্বে 'সমগ্র ভারত' বা 'ভারত জোড়া' এই আখ্যার বাহারও দেখিতে পাইতেছি; এই রূপ 'ভারত জোড়া' সমিতিও অনেক গুলি হইয়াছে। ভারতে যত জাতি আছে দেখিতেছি প্রত্যেক জাতির উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন সমিতি গঠিত হইতেছে; আবার ব্রাহ্মণের সকল জাতিই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব পতিপন্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর; বেদাদি গ্রন্থ হইতে কত প্রমাণাদি সংগ্রহে তৎপর। কোন সমিতি বা রাজভক্তি উদ্দীপনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কোন সমিতি অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য সচেষ্ট, কোন সমিতি একলিপি বিস্তারের জন্য ব্যগ্র, কোন সমিতি নীচ জাতীয় লোকদিগের উন্নয়নের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কোন সমিতি বিবাহে পণ প্রথা রহিত করিবার জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্য এক করিতেছেন; কোন সমিতি আয়ুর্ব্বেদ বিস্তারের জন্য ব্যস্ত; কোন সমিতি বা সাহিত্যের দুঃখে নয়ন নীর ফেলিতেছেন; কোন সমিতি বা শিল্পোন্নতির জন্য ব্যগ্র; কেহবা শিক্ষা বিস্তারের পথের পথিক, মোট কথা আমাদের যেন একটা ছট্‌ফটানি ধরিয়াছে, আমরা যেন পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না, কোন পথ ধরিলে দেশের প্রকৃত হিত সাধন করা হইবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, কাজেই অগণন শত শত সমিতি সঙ্ঘ গঠিত হইতেছে, কত গলাবাজী হইতেছে, কত মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইতেছে।

কিন্তু নিয়তির এমনই উপহাস, বিধাতার এমনই বিধান যে উন্নতির মার্গ হইতে আমরা যেন দিন দিন দূরে গিয়া পড়িতেছি বনজঙ্গল অপসারিত হইয়া নূতন নগরের নির্ম্মাণ, রেল বিস্তার, মোটর গাড়ীর বাহুল্য, বৈদ্যুতিক আলোক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মুষ্টিমেয় জনপদে পরিস্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা, দুই চারিটা গগনস্পর্শী অট্টালিকায় চিকিৎসালয় স্থাপন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত করণ, লাট সভার সম্ভাষণ ইত্যাদিকে যদি উন্নতির মাপকাটি বলা যায় তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বাস্তবিক আমরা দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছি। কিন্তু দারুণ সত্যকে লুক্কায়িত করিয়া বলিলে ত চলিবে না, যে ইহাই প্রকৃত উন্নতি এই অভিধানের যোগ্য। বলুন দেখি, সুস্থ শরীর ও সচ্ছন্দ চিত্ত এই যদি যাবতীয় উন্নতি বিধানের লক্ষীভূত হয়, তাহা হইলে ভারত দিন দিন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছে কি না। জগতে সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে শারীরিক সুস্থতা যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা কে অস্বীকার করিবে? শরীর সুস্থ না

থাকিলে কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ যে অসম্ভব, উন্নতি প্রয়াসী আমরা আমাদের সর্ব্বদা ইহা স্মরণপথে পতিত হয় কই!

আমরা উন্নতি উন্নতি বলিয়া চীৎকার করিতেছি, কিন্তু দেশের স্বাস্থ্য যে দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতেছে তৎপ্রতি যে মুদ্রিত নেত্র; দেশে ব্যাধির প্রাবল্য যে দিন দিন অধিক হইতেছে তাহার প্রতিকারের জন্য বদ্ধ পরিকর হইতেছি কই? দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশা সর্ব্বাগ্রে ঘুচাইবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে। পল্লীগ্রামের অবস্থা যে দিন দিন শোচনীয় হইতেছে তাহা দেখিয়া আমাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে কই?

আগে দেশের লোক শারীরিক সুস্থতা লাভ করুক তাহার পর শিক্ষা বিস্তার রাজনৈতিক অধিকার লাভ, সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত হওয়া, ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে। যাহাতে দেশের লোক সুস্থ শরীর ও সচ্ছন্দচিত্ত হইতে পারে তাহার জন্য আমাদের সকল চেষ্টা সকল উদ্যমকে একমুখী করাই আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য।

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী

৪। ভারতে অশিক্ষিতের সংখ্যা

অনেকের ধারণা, শিক্ষা বিষয়ে রুসিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশ অপেক্ষা বহু পশ্চাতে অবস্থিত। শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ সকল জগতে যেরূপ খ্যাতি ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, রুসিয়া তদ্রূপ করে নাই। রুসিয়ার মত প্রকাণ্ড দেশ ঐ সকল ক্ষুদ্র দেশের সমকক্ষ হইতে পারে নাই বলিয়া লোকের ঐরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু রুসিয়ার অশিক্ষিতের সংখ্যা ভারতের অশিক্ষিতের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। গত ১৮৭০ অব্দে ইউরোপীয় রুসিয়ায় শতকরা ৯৮ জন লোক অশিক্ষিত ছিল। ৩০ বৎসর পরে ১৮৭০ অব্দে প্রকাশ পায়, রুসিয়ায় শতকরা ৮৫ জন লোক অশিক্ষিত। গত ১৯০০ অব্দের হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ দেশে শতকরা ৭৮ জন লোক অশিক্ষিত। এসিয়াস্থ রুসিয়ায় শতকরা প্রায় ৮৭ জন লোক অশিক্ষিত। ভারতের অবস্থা ইহাপেক্ষা অত্যন্ত শোচনীয়। গত ১৯০১ সালের হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতে শতকরা প্রায় ৯২ জন লোক অশিক্ষিত। যে দেশের লোকশিক্ষার অবস্থা এই প্রকার, সে দেশ হইতে শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে উন্নতির কি আশা করা যাইতে পারে? শিক্ষার অভাবেই ভারতবাসী এই সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না।

গত ১৮৭০ অব্দে ভারতে ১৬ হাজার ৪ শত বিদ্যালয়ে ৬ লক্ষ ১৭ জন ছাত্র পাঠাভ্যাস করিত। ১৮৮১ অব্দে ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৮৩ হাজার বিদ্যালয়ে ও ২০ লক্ষ ৬১ হাজার ছাত্রে দাঁড়ায়। ১৯০৭ সালের হিসাবে দেখা যায় যে ভারতে ৫৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬ শত ৩২টি ছাত্র পাঠাভ্যাস করে। ১৯১২ অব্দে ঐ সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া ৬৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৭ শত ২১ দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষা বিষয়ে ইহা ক্রমোন্নতির পরিচায়ক বটে, কিন্তু ভারতের লোক সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা নগণ্য মাত্র। যে দেশে ত্রিশ কোটি লোকের বাস, সেই দেশের মাত্র ৬৮ লক্ষ লোক লেখাপড়া করে। ইহা যেমন লজ্জাকর, তেমনি হাস্যজনক।

লর্ড লরেন্স বলিয়াছিলেন, "Among all the sources of difficulties in our administration and of possible danger to the stability of our government, there are few so serious as the ignorance of the people." ভারতবাসীর অশিক্ষিতাবস্থা যে কেবল তাহাদেরই কষ্টপ্রদ ও উন্নতির অন্তরায় তাহা নহে, উহা গবর্ণমেণ্টেরও ভবিষ্যৎ আশঙ্কার বিষয়। সুতরাং এ দেশের শিক্ষা প্রচারে গবর্ণমেণ্টের আরও অধিক আগ্রহশীল ও যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

পল্লীবার্ত্তা

৫। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

গত দুই বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় সাহিত্য-

সম্মিলনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কয়েকটী বিশেষজ্ঞের আড্ডায় পরিণত করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—এই সকল আড্ডায় বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ তিন দিন বিশেষজ্ঞগণ স্ব স্ব কণ্ঠশক্তির আখড়াই দিতে পারেন। বিশেষজ্ঞগণ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন—অবিশেষজ্ঞ আমরা তাহাতে কোনও আপত্তি করি না। কিন্তু তাঁহারা যে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইবেন ইহা আমরা কোনও মতে সহ্য করিতে পারিব না। বিশেষজ্ঞগণের সম্মিলনের দরকার হইয়া থাকিলে তাঁহারা অন্য সময়ে ও নিজ নিজ ব্যয়ে তাহা করিতে পারেন—যাঁহাদের ইচ্ছা হয় তাঁহারাও সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু সরল বিশ্বাস লোকদের চক্ষে ধূলা দিয়া তাঁহারা নিজেদের মতলব হাসিল করিয়া লইবেন কেন?

বিশেষজ্ঞদের আলোচনার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের লাভ কি? দেশের লোক শতকরা নিরানব্বই জনই অশিক্ষিত,—যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদেরও অধিকাংশই মধ্যশিক্ষিত ও নিম্নশিক্ষিতের দল। বিশেষজ্ঞগণ সাধারণতঃ যে ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিয়া থাকেন, মধ্যশিক্ষিত ও নিম্নশিক্ষিত লোকের তো দূরের কথা, অবিশেষজ্ঞ বি, এ, এম, এ, পাশওয়ালারাও তাহা বুঝিতে পারেন না। তবে এজন্য সর্ব্বসাধারণের কাণমলিয়া টাকা আদায় করা কেন? বিশেষজ্ঞগণ কি মনে করেন আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা রোজগার করি, তাহা কি তাঁহাদের শুধু হিলি মিলি খেলিবারই জন্য? শুধু টাকা দিলেই কি অব্যাহতি আছে? একবার যেখানে একটা সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, সেখানকার লোকেরাই অম্লানবদনে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের বুকের উপর দিয়া কি ঝড়টাই না বহিয়া গিয়াছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই—সর্ব্বদাই সসম্ভ্রমে কর্ত্তাদের নিকট দাঁড়াইয়া থাকি—তবু কর্ত্তাদের চোখ রাঙানীর অন্ত নাই; পান থেকে চুণ খসিলেই একবারে প্রলয় উপস্থিত। সাহিত্য-সম্মিলনে আসিয়া অনেকেই মনে করেন যে অভ্যর্থনা-কারীদের সহিত তাঁহাদের কোনও নিকট সম্বন্ধ আছে। এত অত্যাচার, এত অসুবিধা, এ ও অর্থব্যয় সহ্য করি কেন? কর্ত্তারা হয়ত মনে করিতে পারেন যে, পূর্ব্বজন্মে তাঁহাদের নিকট আমরা ঋণী ছিলাম—ইহজন্মে তাহাই পরিশোধ করিতেছি। আহ্বানকারীদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহারা মনে করেন যে বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝায়, তাঁহাদের একত্র সম্মিলনে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে, তাঁহাদের কথা বার্ত্তায় লোকের হৃদয়ে সাহিত্য পিপাসার উদয় হয়। প্রত্যুত, ইহাও দেখা গিয়াছে যে যেখানেই সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছে, সেখানেই সাহিত্য চর্চ্চার একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, অধিকসংখ্যক লোক সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই লাভটুকু হওয়াতেই সম্মিলনের সার্থকতা—আর আহ্বানকারীদের অর্থব্যয় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সাফল্য। কিন্তু সম্মিলনকে যদি এখন হইতে বিশেষজ্ঞগণের রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয়, তবে আমরা অবিশেষজ্ঞগণ উহার জন্য এত করিব কেন? আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নিজের গ্রামে, এমন কি নিজের বংশে কি ঘটিয়াছে তাহারই কোনও খবর রাখে না—তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে কামস্কাট্‌কা বা হনোলুলু দ্বীপে কি হইয়াছিল তাহার খবরে তাহার প্রয়োজন কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে বাতুলতাই প্রকটিত হয়। মনে রাখা উচিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন কখনই কয়েকজন তথাকথিত বিশেষজ্ঞের হক্ দখলি কায়েমী মৌরসী সম্পত্তি নহে যে তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন, আর আমরা ভেড়ার পালের মত তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া স্ব স্ব অদৃষ্টকে ধিক্কার দিব। সাহিত্য-সম্মিলন দেশের,—সমাজের,—জনসাধারণের,—শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের। সুতরাং যাহাতে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যচর্চ্চা পণ্ডশ্রমেই পরিণত হইবে।

সুরাজ

নবযুগ

"চাহ, চাহ, মতিমান, দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা কত দিকে আবর্ত্তিয়া ধায়!
কত সাধ কত আশা জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ!
মানুষের শক্তি লয়ে কীটসম ব্যর্থ কর তারে?
বিধাতার পুণ্যদানে—দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে, তুমি তার রুধিবে দুয়ার?
একি—একি অপমান মনুষ্যত্বে হান অবিরত!
ভুলে যাও বর্ত্তমানে, ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'। ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়—
দুয়ারে পাখীর মত, আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি?"

সপ্তম খণ্ড সপ্তম বর্ষ	চৈত্র, ১৩২২	ষষ্ঠ সংখ্যা।

আলোচনা

১। জাতীয়তায় বিশ্বাস

আমরা কি সঙ্কটেই এখন পড়িয়াছি। প্রাণ ধরিয়া যে কাহাকে বিশ্বাস করিব, তাহার উপায় পর্য্যন্ত নাই। এখন ছেলে বাপকে, বাপ ছেলেকে, ভাই ভাইকে, বিশ্বাস করে না। প্রতিবাসীরা পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস হারাইয়াছে। এখন এক বর্ণের উপর আর এক বর্ণের বিশ্বাস নাই। এক জাতির উপর আর এক জাতির বিশ্বাস নাই। কি ভয়ানক সন্দেহের যুগই না এখন চলিতেছে!

কোন্ শিক্ষার দোষে, কোন্ অভাবের তাড়নায়, কোন্ আদর্শের পার্থক্যে, কোন্ স্বার্থপরতার বিষে এমন হইল, তাহা বিচার করিবার দরকার নাই। তবে সমাজের কর্ম্মশক্তি যে ইহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ইহা নিশ্চিত।

অনেক সময় দেখা যায় আদর্শ যেখানে এক, স্বার্থের ক্ষেত্র যেখানে এক, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস সেখানে অটল হয়। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে সেরূপ স্থলেও বিশ্বাস বড় একটা দেখা যায় না। যদি যাইত, তবে অনেকগুলি কারবার আজ ফেল মারিত না।

ফল কথা, গৃহেই হৌক, বাহিরেই হৌক, এক আদর্শ অনুসারে দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে গেলে, যতটুকু বুদ্ধি, যতটুকু জ্ঞান, যতটুকু ধীরতা, যতটুকু সাহসিকতা, যতটুকু উদারতা আবশ্যক, ততটুকু আমাদের নাই। তাই আমরা ঘরে বাহিরে সন্দেহের জালে জড়াইয়া মরিতেছি। তাই আমরা এখন মিত্রকে শত্রু মনে করিতেছি—শত্রুকে মিত্র মনে করিতেছি। আমাদের এই দারুণ অবস্থার কতকটা চিত্র ইবসেন তাঁহার An Enemy of society নাটকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি সেখানে দেখাইয়াছেন সমাজের যে প্রকৃত হিতৈষী, সেই-ই অশিক্ষা ও সন্দেহের যুগে সমাজের শত্রু বলিয়াই লাঞ্ছিত হয়।

কথায় কথায় আমরা হীন স্বার্থপরতাকে বড় করিয়া তুলি, কথায় কথায় আমাদের নানা রকমের মারাত্মক খেয়াল জাগিয়া উঠে, কথায় কথায় আমরা নিজের বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া হঠকারিতার পরিচয় দেই।—এত গলদ থাকিলে কি কখনও মঙ্গলের মুখ দেখা যায়? এই সব গলদের জন্যই ত আদর্শের উপরেও আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। কারণ সেরূপ শ্রদ্ধা বিপুল চারিত্র বলেরই পরিচায়ক। সে বল আমাদের নাই।

কিন্তু কোথায় সেই নেতা যিনি তাঁহার চরিত্রের সবলতায় আমাদের চরিত্র সবল করিয়া তুলিবেন, যিনি ত্যাগের ধ্বজা দেখাইয়া হীন স্বার্থের দিক হইতে উদারতার দিকে আমাদের মুখ ফিরাইয়া দিবেন, যিনি আমাদের চাঞ্চল্য দূর করিয়া ধীরতার শান্তি প্রদান করিবেন, যিনি উপায় অপেক্ষা উপেয়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগাইয়া দিবেন, যিনি আমাদের সম্মুখে মঙ্গলময় আদর্শের ঐক্য স্থাপন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রীতির ধারা সঞ্চারিত করিবেন?

যিনি "স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি" ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের জাতিকে, আমাদের সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি এখনও বোধ হয় জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জন্ম ত আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ভাবে হইতে পারে না। মানুষের যুগোপযোগী আকাঙ্ক্ষা এবং সাধন প্রয়াসেই তাঁহার জন্ম প্রদান করিবে। তাই আজ এই সন্দেহের যুগে—এই মায়াকুহেলিকার ভোরে, তাঁহারই জন্মক্ষেত্র রচনায় আমরা যেন ব্যক্তিগত ভাবে যতটুকু সম্ভব ততটুকু প্রয়াস দেখাইতে বিরত না হই। আমরা যেন আমাদের জড়তা, আমাদের ভুলভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়াও তাহা সংশোধনে শৈথিল্য প্রকাশ না করি। প্রেমের পথে, বিশ্বাসের পথে অগ্রসর না হইলে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না, অন্ততঃ পক্ষে এ বোধটাও যেন আমাদের অন্তর হইতে অপসৃত হইয়া না যায়!

* *
*

২। বিদ্যালয়ে বিপ্লব

প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ছাত্র একজন ইংরাজ অধ্যাপককে প্রহার করিয়াছে তজ্জন্য সমগ্র বিদ্যালয় অসময়ে বন্ধ করা হইয়াছে। সংবাদপত্রে

প্রকাশ যে উক্ত অধ্যাপক ছাত্রগণকে নানা-রূপ অপমান করিয়াছিলেন। ঘটনাটী সকলের নিকটই সুপরিচিত। দেশের সংবাদপত্রে, সভাসমিতিতে এই বিষয় লইয়া বহু আলোচনা, বাগবিতণ্ডা চলিয়াছে। কেহ অধ্যাপক মহাশয়কে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিয়া ছাত্রগণের শাসনের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত; কেহ বা ছাত্রগণের দোষ স্খালনে প্রয়াসী। সকলেই স্বীকার করেন যে ঘটনাটী অতিশয় গুরুতর ও ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে এরূপ বিপরীত সম্বন্ধের সংঘটন অতিশয় দুঃখের বিষয়। আমরাও এ বিষয়ে অন্যান্য সহযোগীবৃন্দের সহিত একমত পোষণ করি।

এই ব্যাপারটী কাহার দোষে ঘটিয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য একটী অনুসন্ধান কমিটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে দোষের দায়িত্ব যাহার উপরই পড়ুক না কেন, ছাত্র শিক্ষকের এরূপ সংঘর্ষ যে দৈবাৎ ঘটে নাই তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই বিবাদের মূলে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীর প্রকৃতিগত অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা বিদ্যমান রহিয়াছে। শিক্ষা ব্যাপারটী ব্যক্তিত্বের সামগ্র্য ও বৃদ্ধি সম্পাদনের উপায় মাত্র। যদি জীবনের প্রতি অংশে শিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত না হয়, যদি শিক্ষা over specialisation বা পল্লব গ্রাহিতার জন্য একটী বহিরঙ্গ ব্যাপারে পরিণত হয় তবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই শিক্ষাকে জীবন প্রসারণের পন্থা না মনে করিয়া জীবনধারণের উপায় মনে করেন। জীবন সম্প্রসারণ ও জীবন ধারণের প্রচেষ্টায় একটী মূলগত পার্থক্য আছে। প্রসারণের উপায় culture। cultureএর মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ নাই Culture মানবাত্মার ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের বেদী। পক্ষান্তরে জীবন রক্ষা ও জীবনধারণের মূলেই বিরোধ। এই বিরোধের কথঞ্চিৎ শান্তি না হইলে কখনই culture এর উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি শিক্ষক ও ছাত্র শিক্ষাকে একদেশদর্শী করিয়া তোলেন, বিদ্যালয়কে যদি জীবনোপায়ের সাধন বলিয়া মনে করেন তবে তাঁহাদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। স্বার্থে সঙ্কোচের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেই গুরু শিষ্য পরস্পর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন। ছাত্র জানেন যে শিক্ষক তাহার জীবনের একটী অংশের অভাব পূরণ করিতেছেন। সমগ্র জীবনের উৎকর্ষ সাধনে তাঁহার কোনই হাত নাই। শিক্ষকও জানেন যে তিনি culture এর জন্য খাটিতেছেন না, বেতনের জন্য খাটিতেছেন। কাজেই শিক্ষাকার্য্যের সহিত তাঁহার জীবনের এক অংশের মাত্র সম্বন্ধ। সুতরাং ছাত্র ও শিক্ষক দুই জনেই দুই জনের নিকট হইতে জীবনের একটা অংশ ঢাকিয়া রাখিতে ও রক্ষা করিতে ব্যস্ত। যখনই একজন স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া কক্ষান্তরে পদক্ষেপ করিবেন তখনই বিরোধের ভেরী বাজিয়া উঠিবে। এই বিরোধের নিরাকরণ কেবল একজন ছাত্র বা শিক্ষকের শাস্তি হইলেই হইবে না; সমগ্র শিক্ষা-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনই বিদ্যালয়ের বিপ্লব শান্তির উপায়। শিক্ষাকে যদি জীবনের মূলগত না করা হয় গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ যদি দুই জনের জীবনের অন্তরঙ্গ না হয় তবে এই বিরোধ চিরস্থায়ী হইবে।

৩। বার্গসঁ ও হাস্যতত্ত্ব

ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ হাস্যরসের এক নূতন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এটী তাঁহার দার্শনিক মতবাদের প্রয়োগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বার্গসঁর মতে জগতের সারই হইতেছে জীবন-প্রবাহ। এই স্রোতই বিশ্বের তত্ত্ব বা reality. জীবন কেবল প্রবাহ মাত্র। ইহার মূলে কোনও অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থ নাই; ইহার প্রকৃতিই পরিবর্ত্তন, প্রবাহ বা সৃষ্টি। জীবনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি নাই, অংশ নাই। কারণ প্রবাহের আবার অংশ থাকিবে কি করিয়া? কাজেই জীবনের সহিত যন্ত্রের একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য। যন্ত্রে একই কার্য্য পুনঃ পুনঃ সাধিত হয়, জীবনে কখনই কার্য্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

এই জীবনস্রোত জড়পদার্থের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। জড়পদার্থকে প্রতিনিয়তই প্রতিনিয়ত জীবন-গতির যন্ত্র করিয়া জগতে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিতেছে। অনেক সময়ে আবার প্রবাহের চাঞ্চল্য জড়ের চাপে জমিয়া উঠিতেছে ও জীবন জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে। সে সকল স্থানে জীব ও যন্ত্রের পার্থক্য অল্প হইতে অল্পতর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মানুষের শরীরেই জীবন স্বস্বভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রবাহপ্রবণতা, চাঞ্চল্য, নূতন সৃষ্টি, নিরন্তর পরিবর্ত্তন—এসব মানব জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। একটী পশুর ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত বাহ্য জগতের সংস্পর্শ হইলে পশু প্রায় যন্ত্রের মতনই ব্যবহার করে। বাহ্য অর্থ সমূহ যদি এক প্রকার হয় তবে পশুর প্রতিঘাত (reaction) ও একই প্রকার হইবে। কিন্তু মানুষের পক্ষে একথা খাটে না। বাহ্য অর্থ এক প্রকার হইলেও প্রতিঘাত (reaction) প্রতিবারই নূতন হইবে। এই জন্য মানুষকে একটা Centre indetermination বলা হইয়াছে।

মানুষ যদি স্ব স্বভাব হারাইয়া যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করে তবেই সে বিদ্রূপভাজন হয়। হাস্যসমাজের এই শাসনবাক্য প্রচার করে। কাজেই বার্গসঁর মতে হাস্যের মধ্যে প্রীতিসূচক ভাব অতি অল্পই আছে। ব্যক্তি বিশেষ নিজের প্রকৃতি হারাইয়া বিদঘুটে ব্যবহার করে, দশ জন তাহাতে তাহার জীবন গতির বিফলতা অনুভব করিয়া হাসিয়া ওঠে। এ হাসি ব্যর্থতার উপর বিদ্রূপ এবং অনেক স্থানেই নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। বার্গসঁ বলেন,—"Laughter cannot be absolutely just. Nor should it be kind-hearted either. Its function is to intimidate by humiliating.

* *
*

৪। রঙ্গমঞ্চ ও সামাজিক জীবন

সমাজের সমবেত রসবোধ ব্যক্তিবিশেষের ভাবরাজ্যে তুলিপাত করে বলিয়াই ললিত কলার সহিত সামাজিক জীবনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাহা না হইলে রসসৃষ্টি ব্যক্তিবিশেষের স্বপ্নের মত তুচ্ছ ও অর্থশূন্য হইত। কেবল তাহাই নহে। কলাবিৎ যদি সামাজিক জীবনের রসাধার হইতে তাঁহার কলারস সঞ্চয় না করেন, যদি তিনি নিজেকে তাঁহার চারিধারের জীবনপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন তবে তাঁহার ভাবের ভাণ্ডার অতি শীঘ্রই শূন্য হইয়া যায়। অবশ্য সামাজিক জীবনের সঙ্গে কবি বা

চিত্রকরের এই আদান প্রদান সকলের নিকট পরিস্ফুট না হইতে পারে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির এই সম্বন্ধ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত গূঢ়ভাবে বহিয়া চলিতে পারে, এবং সেজন্য কলাস্রষ্টক সমাজের বোধগম্য হইতে পারেন। কিন্তু সম্বন্ধটী নিত্য ও সততই বিরাজমান থাকা চাই।

যদি কলাসাধারণ সম্বন্ধে এইমত গ্রহণীয় হয় তবে দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে এটী বিশেষরূপে প্রযোজ্য। দৃশ্যকাব্যের বিষয় ও রস সম্ভোগ উভয়ই সামাজিক জীবনের উপর নির্ভর করে। কাব্যের বিষয়টী সামাজিক চরিত্র-চিত্রণ, বা সমাজের আদর্শ ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তোলা। মানব-চরিত্রে যে টুকু বিশ্বজনীনতা আছে তাহাই সামাজিক জীবনের ভাবরাজ্যের উৎস। এই ভাবরাজ্যকে বিশেষের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তোলাই দৃশ্যকাব্যের কাজ। কাজেই যদি নাট্যকার তাঁহার চারিপাশের জীবন-স্রোতের সঙ্গে সম্বন্ধহীন হইয়া পড়েন তবে তাঁহার নাটকের প্রাণের উৎস শুকাইয়া যাইবে। অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে নাটকের রসসম্ভোগ একটা সামাজিক ব্যাপার। একটী জনতার রসবোধ একত্র মিলিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে আনন্দলাভ করে। যদি একটী বিমুখ জনতা দর্শকের পদে উপবিষ্ট থাকে তবে প্রয়োগ বিজ্ঞানের সহস্র চাতুরীও নাটকের মধ্যে জীবন আনয়ন করিতে পারে না। দৃশ্যকাব্য এইরূপে সমবেত ভাবে সম্ভোগ্য বলিয়াই জনতার চিত্তস্রোতের সহিত রঙ্গমঞ্চের লাভালাভের একটা গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে।

দৃশ্যকাব্য ও সমাজ-জীবনের মধ্যে আর একটা সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক নাটকেই একটা বাহ্যিক দৃশ্যের মধ্যে কল্পিত লীলার ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। কিন্তু এই বহিরঙ্গের সহিত লীলার অন্তরঙ্গের উপযুক্ত সম্বন্ধ কখনই সম্ভব নয়। এমন কি বাহ্য দৃশ্যটী পর্য্যন্ত স্বাভাবিক করিয়া তোলা দুঃসাধ্য। কাজেই দর্শক-জনতা যদি কল্পনা বলে প্রয়োগ বিজ্ঞানের এই অভাব পূরণ করিয়া না লয় এবং যদি স্বীয় রসবোধের বলে লীলার প্রাণস্থলে প্রবেশ না করিতে পারে তবে দৃশ্য-কাব্য আনন্দ দানে সমর্থ হয় না। সুতরাং সামাজিক প্রাণের সহিত রঙ্গমঞ্চের আদান প্রদান ও সহানুভূতি না থাকিলে ললিত-কলার অবনতি হয়।

৫। আমাদের দেশের ও পাশ্চাত্যের রঙ্গমঞ্চ

রঙ্গমঞ্চের সহিত সমাজের এই নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমাদের দেশে প্রয়োগ-বিজ্ঞান আজকাল হতাদর হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অভিনয় ব্যাপারটীকে যাহারা সমাজের "একঘরে" তাহাদের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছি। কাজেই যে সকল উচ্চভাব সামাজিক জীবনকে তরঙ্গায়িত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, সেগুলি সহজে এই "একঘরে" রঙ্গমঞ্চকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা যেমন শিল্প গুলিকে অশিক্ষিত শিল্পকারগণের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সে গুলির উৎকর্ষসাধনের পথ বন্ধ করিয়াছি, যেমন নৃত্যকলা ঘৃণিত চরিত্রের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া নৃত্যমাত্রকেই ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছি, অভিনয় বিদ্যাকেও সেইরূপ চরিত্রহীন স্ত্রীপুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। কাজেই এক-

দিকে যেমন অভিনয় বিদ্যার উন্নতির পথ রোধ হইয়াছে, অপর দিকে আবার দৃশ্য-কাব্য মাত্রই সমাজের নীতিপরায়ণ ব্যক্তি-গণের নিকট ঘৃণার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ফল স্বরূপ ললিতকলা আমাদের দেশে কেবল আমোদলিপ্সা পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দেশে সমাজের উপর রঙ্গমঞ্চের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কালিদাসের যুগে যেমন আমাদের দেশে নৃপতি বৃন্দই রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তাহার একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপেও থিয়েটার সেইরূপ অভিজাত সহানুভূতি পরিপুষ্ট ছিল। কিন্তু এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই Royal Theatre People's Theatreএ পরিণত হইয়াছে। আজ ইউরোপের Theatre জনসাধারণের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষণের উপরই নির্ভর করে। অভিনয় বিদ্যা সমাজে একটী আদরণীয় বিদ্যা-রূপে পরিগণিত হয়। অভিনেতা ও অভিনেত্রী বৃন্দ অনেক সময় উচ্চবংশ সম্ভূত ও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত। আমাদের দেশে অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দের যেরূপ বিদদৃশ ও জঘন্য সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চে ইহার বিপরীত ভাবই বিদ্যমান। Sir Johnston Forbes Robertson নিজের পত্নীর সহিত একত্র অভিনয় করেন। Sir Beerbohm Treeর কন্যা আজকাল Londonএর রঙ্গমঞ্চের একজন উদীয়মানা অভিনেত্রী বলিয়া বিবেচিত হন। এইজন্যই Theatreএর জীবনের স্বাধীনতা সত্ত্বেও উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে স্থান পায় না। কাজেই রঙ্গমঞ্চের জীবনের সহিত জনতার জীবনের একটা ব্যবধান নাই। ফলস্বরূপ নাট্যকলা সামাজিক জীবনের অন্তরঙ্গ বলিয়া গণিত হয়।

এই জন্যই দেখিতে পাই যে সমাজে যখনই নূতন ভাব সৃষ্টির দরকার হয় তখনই তাহা মূর্ত্ত হইয়া রঙ্গমঞ্চে স্থান পায়। আমেরিকার আজকালকার রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক নাটকগুলির বিষয় আলোচনা করিলেই এই বিষয় বোধগম্য হয়। ইংলণ্ডে বার্ণার্ডশ নিজের সামাজিক মতগুলি রঙ্গ-মঞ্চেই প্রচার করিতেছেন ও Shavian Scnoolএর প্রচারক অভিনেতা ও অভিনেত্রী-বৃন্দ। জন গলস্‌ওয়ার্দীর দরিদ্র জীবনের করুণ রসাত্মক নাটকগুলি সমাজের দৃষ্টির সমক্ষে হীন দরিদ্রের ভাবের গভীরতা ও হৃদ-য়ের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। সেণ্ড গ্রীমরীর Irish plays একটী অত্যাচার পীড়িত জাতির প্রাণের বেদনা, তাহাদের করুণ রসিকতা এবং শত তুচ্ছতার মধ্যে তাহাদের জাতীয় জীবনের মহত্বের কাহিনী জগতের সমক্ষে বর্ণনা করিয়াছে।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে Stage thought-movement প্রচারের মিশনারী। সমাজ জীবন এই চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়াই বিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। কাজেই রঙ্গমঞ্চ সামাজিক বিবর্ত্তনকে কিরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আজ আমাদের জাতীয় জীবনে ভাব-স্রোত ও চিন্তাস্রোত বহুমুখী হইয়া ছুটিয়াছে। এ সকলকে যদি মূর্ত্তিপ্রদান করিতে হয়, যদি আমাদের জীবনের কাহিনী জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে হয় তবে আমাদিগকে অবশ্যই নাটকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল এই দেশেই নয় পৃথিবীময় আমাদের

বার্ত্তা আমাদের চিত্তাকে অগ্রসর করিয়া রঙ্গমঞ্চকে স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদের দেশে থিয়েটারের সহিত সমাজের যে বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয় তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। তাহার উপায় প্রথমতঃ শিক্ষিত ও চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণের অভিনয়বৃত্তি অবলম্বন; দ্বিতীয়তঃ সমাজের "থিয়েটারাতঙ্ক" গ্রস্ত নীতিবিৎগণের কুসংস্কার মোচন।

৬। চরিত্র গঠনের উপায়

মানব চরিত্র দুইটী চঞ্চল দোলার উপর দুই পা রাখিয়া অনবরত দুলিতেছে। কখন কাহার পতন কোন দিকে হইবে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। আমরা যাহাকে পাপ বলি আমাদের জ্ঞানোন্মেষ হইতে যাহাকে ঘৃণা করি সেই দুশ্চারিত্র্যই যে পতনের একমাত্র কারণ তাহাই নহে। অনেক লোক আছেন যাঁহারা অনায়াসে উক্ত দুশ্চারিত্র্যের হাত এড়াইয়া অতিমাত্রায় যশঃ ও সম্মান লাভের জন্য ঘোর পঙ্কে পতিত হইতেছেন। সাধারণের নিকট তিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বলিয়া পরিচিত কিন্তু অপরিমিত যশঃ, অতুল সম্মানের জন্য নিজ মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিতেছেন, দেব চরিত্রকে কলঙ্কিত করিতেছেন। স্বার্থ, দম্ভ যাহা কিছু নীচ, যাহা পরিত্যাজ্য সকলগুলিই তাঁহার আশ্রয় হয়। চরিত্রবান্ ব্যক্তি একদিকে যেমন কামিনী কাঞ্চনের আসক্তি হইতে দূরে থাকেন, অন্যদিকে সম্মান, যশঃ কেও ঠেলিয়া দেন। মানুষমাত্রেই সম্মান ও যশের জন্য লালায়িত। এই যশঃ অর্জ্জন করিয়া মানুষ দেবত্বের সিংহাসন স্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু নিজের ক্ষমতা, নিজের সামর্থ্য, ধরিয়া রাখিবার শক্তি চাই। একটু টানে পড়িলেই সব চূর্ণ হইয়া যায়। কর্ম্মের প্রারম্ভেই যশের আকাঙ্ক্ষা, তাহে চরিত্রবান্ ব্যক্তি ব্যক্তিগত সমালোচনা বা সামাজিক খ্যাতি অখ্যাতির ধার ধারেন না। যাহাকে কিছু করিতে হইবে, তাঁহার নিকট অনেক সময় এমন সমস্যা দাঁড়ায় যেখানে সম্মান ও যশের পরিবর্ত্তে রাশি রাশি কালিমা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

আদর্শ মানব চরিত্র খোঁজ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় মানব চরিত্রে প্রকৃত দেবত্ব কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে, কোন শক্তিবলে রাশি রাশি সম্মান ও স্তূপীকৃত যশের উপর দৈন্যের ঔজ্জ্বল্য বিকশিত হইতেছে। মানব চরিত্রে নির্লিপ্ততাই সেই দেবত্ব, সেই শক্তি। নির্লিপ্ততাতেই পরম সুখ। যেখানে কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই ফলাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, সেইখানেই চরিত্রের ভেজাল বাহির হইয়া পড়ে। যত দুঃখ, যত দৈন্য, যাহা কিছু মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিকূল তাহাই সেই সময় মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়ায়। কর্ম্মের সম্মান ও যশঃ কর্ম্মীমাত্রেরই প্রাপ্য। প্রকৃত যাহা ত্যাগ, যাহা সন্ন্যাস তাহা গৃহের ভিতরেই বিশেষ পরিস্ফুট হয়। গৃহে বসিয়া আপনার সম্মান ও যশাকাঙ্ক্ষাকে ক্ষুদ্র করিয়া নিজের পথে নিজে চলিতে থাকিয়া যখন আর হীন বাসনার লেশমাত্র থাকে না তখনই আত্মোন্নতি হয়, প্রকৃত সন্ন্যাস চরিত্রবানের চরিত্রবল তখনই বিকশিত হয়।

আমরা সকল সময় নিজেকে ঠিক রাখিতে পারি না, আদর্শ চরিত্রগুলি সময়মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় না তাহার কারণ আমরা সেই সকলকে জীবনের স্তরে স্তরে বিশ্লেষণ করি না, জীবনের সুদীর্ঘ পিচ্ছিল পথের একমাত্র আশ্রয় করিতে পারি না। মানব

জীবনের কর্ম্মের ফলাফলগুলি যতক্ষণ না ভগবানে অর্পিত হয় ততক্ষণ শাশ্বত আনন্দ চির প্রফুল্লতা ও পূর্ণশান্তি হৃদয়ে বিরাজ করে না। মানব চরিত্র যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখনই হীন ও পূজ্য, উচ্চ ও তুচ্ছ, ধনী ও নির্ধনকে একই মুহূর্ত্তে আপনার বাহুযুগল দ্বারা টানিয়া লয়। সমাজের হৈত-কালিমাকে আপনার চরিত্রের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়।

বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে করিতেই চরিত্রের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং বৃদ্ধি পাইলেই কোন রকম বাধা বিঘ্ন আর প্রাহ্য হয় না। আমাদের অসাড় সমাজ এখন নানা রকমে বিড়ম্বিত। তাই তাহার এখন সজীব হইবার বাসনা আসিয়াছে। এখন সে চরিত্রবান পুরুষের আদর্শ দেখিতে চাহে। তাই ছাত্রদিগের চরিত্রগঠনোদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা তাহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়াছে। সেইজন্যই আমরা নানাস্থানে এবম্বিধ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতেছি। সম্প্রতি কাশীধামের অতি নিকটে শিওপুরে "শ্রীঅন্নপূর্ণা ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সাহায্য কল্পে কাশীর শ্রীঅন্নপূর্ণামঠের উদারচরিত্র মোহান্তজী তাঁহার বাগানের অধিকাংশ জমি ছাড়িয়া দিয়াছেন। তারপর অর্থ ও সদুপদেশ প্রভৃতি দানেও এই কার্য্যে বিশেষ রকমে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন।

* *
*

৭। আয়ুর্ব্বেদের সমাদর

অনেকদিন হইতে আমাদের দেশে বিলাতী ঔষধ প্রচলিত হইয়াছে। আমরা ঘরে ঘরে এখন বিলাতী ঔষধের ব্যবহার দেখিতে পাইতেছি। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমাদের রসায়নশাস্ত্র বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে আপনার দাতব্য দান করিতেছিল। তখন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ আমাদের নিজস্ব ছিল। আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ যে সময় তাঁহাদের জ্ঞান ভাণ্ডারের শেষ কণিকা পর্য্যন্ত বিতরণ করিতেছিলেন, ইউরোপে তখনও রসায়ন শাস্ত্র প্রচলিত হয় নাই।

আধুনিক সময়ে ইউরোপীয় রসায়ন খুব উন্নত হউক, তাহা জগতের বিস্ময় উৎপাদন করুক, কিন্তু যাহা আমার নিজের নয় লক্ষাধিক বৎসর যাবৎ যাহার অন্তঃপ্রকৃতি আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তাহাকে আপন করিতে যাইয়া, তাহার ভিতরে নিশ্চয়ই এমন কোন একটা মায়াবিনী শক্তির মোহে মুগ্ধ হইয়াছি, যাহা আমাদের নিজের জিনিষের গৌরব করিবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে। আমরা দুইটী বিষয়ের জন্য বিলাতী ঔষধের পক্ষপাতী।

(১) উহার ব্যবহার প্রণালী সহজ। একবারের তৈয়ারী ঔষধ বারবার ব্যবহার করান যাইতে পারে। অর্থাৎ গৃহস্থকে কোন পরিশ্রম করিতে হয় না।

(২) উহার দ্বারা আশু ফললাভ হয় এবং দুর্ব্বলকে অতি সত্বর সবল করিতে বিলাতী ঔষধ খুবই উপকারী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

কিন্তু এ ধারণাটীর ঠিক পোষকতা করা যায় না। আয়ুর্ব্বেদের ভাণ্ডারে এমন কোন ঔষধ নাই যাহার জন্য চিকিৎসা বিষয়ে তাহাকে মুক হইতে হইবে, এমন অনেক দেশীয় ঔষধ আছে যাহা ব্যবহারে মরণোন্মুখ ব্যক্তি আর একবার জীবনের আশা করিতে পারে। ব্যবহার করিতেই বা কে জানে। আমরা সে সুবিধা পাইয়াছি কৈ।

তারপর জ্বর প্রভৃতি রোগে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ না কি আশু ফলদায়ক নহে। কিন্তু উহারও এমন শক্তি আছে যাহা কুইনাইন মিকশ্চারকেও হারাইতে পারে। রোগী একবার ব্যারামের ঝোঁক সামলাইয়া দাঁড়াইতে পারিলে আয়ুর্ব্বেদ সমস্ত ভার আপন কাঁধে লইতে পারে। সে ঔষধ ব্যবহারে রোগী দীর্ঘকালের নিমিত্ত শান্তিভোগ করিতে পারে, তাহার শরীর অধিক একটা পুষ্টির পরিচয় না দিয়া ধীরে ধীরে আনন্দ লাভ করিতে থাকে।

বৌদ্ধযুগেই রসায়ন বিজ্ঞান চিকিৎসা প্রণালীর ভিতর দিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বিশেষতঃ পণ্ডিত নাগার্জ্জুনের সময়ই রসায়নের প্রকৃত গৌরবময় যুগ। তাঁহার পারদ (Mercury) শোধন প্রণালী আজও কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে ক্রমে ক্রমে অনেকানেক পণ্ডিত চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। পালরাজগণের রাজত্বকালে চক্রপাণি এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাগ্‌ভট, বৃন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অন্যতম পুষ্টিকর্ত্তা। আয়ুর্ব্বেদ যে Perfect Science বা নিখুঁত বিজ্ঞান তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমরা সহজেই দেখিতে পাই বিলাতী ঔষধ বেশীদিনের পুরাতন হইলে অব্যবহার্য্য হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ পুরাতন হইলেই দর বাড়ে। তারল্য এবং কাঠিন্যই যদি উহাদের দোষ গুণের কারণ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দীর্ঘশত বৎসর তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানাগারে বসিয়া পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে যেমন কেমিক্যাল, ইণ্ডিয়ান্ কেমিক্যাল প্রভৃতি ঔষধালয় সমূহ বিলাতী ধরণে দেশীয় উপাদানে, দেশের জলবায়ুর উপযোগী ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। ২১ স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ঔষধ পরীক্ষা হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগৃহ বা Laboratory আবশ্যক। একটী ঔষধ বাজারে বাহির করিতে কতজনের দীর্ঘকালের কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয় তাহা আমরা ভাবিবার কোনই প্রয়োজন বোধ করি না। আমরা পূর্ব্বে একবার হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের অস্ত্র (Surgical instrument) প্রভৃতির বিবরণ দিয়াছিলাম। শারীরবিজ্ঞান, শবব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞানেও যে তাঁহারা সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা আজকার মত দিনে বলাই বাহুল্য।

আমাদের সৌভাগ্য যে ভারতের বহু বহু রাজা মহারাজ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিগণও দানে বিমুখ নহেন। ইহাতে কাহারো আপেক্ষিক গুরুত্ব ওজন করিবার প্রয়োজন হয় না। মান্দ্রাজের বিভিন্ন প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও দাতব্য ঔষধ বিতরণ (চিকিৎসালয়) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কোরের মহারাজগণই ইহার বিশেষ উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। প্রত্যেক স্থানের হাসপাতালে প্রতিমাসে পড়ে ১০০০ হাজার রোগীর চিকিৎসা চলিতেছে। কোন কোন চিকিৎসালয়ে বৎসরে ৬০,৬৫ হাজার রোগী চিকিৎসিত হইতেছে। নিখিল ভারতীয় বৈদ্য-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সফল হউক। তাঁহারা ভারতে আবার আয়ুর্ব্বেদের জীবন দান করুন। নতুবা শুধু যে আমাদের একটী চিকিৎসা বিভাগ ঢাকা পড়িবে এমন নহে আমাদের প্রাণ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে। আমরা পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি

বলিয়াই নিজের জিনিষ ফেলিয়া দিয়া আজ দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্য দিয়াও ঔষধ পাইতেছি না। অনেক ঔষধ বন্ধ হইয়াও গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের প্রচারক এখনও দেশে যথেষ্ট আছেন। দেশের বড় বড় চিকিৎসকগণ দীর্ঘকাল যাবৎ আপনাদের সাধনা দ্বারা যেটুকু গৌরব রাখিয়া গিয়াছেন কবিরাজ গঙ্গাধর দ্বারকানাথ বিজয়রত্ন সেই সাধনার ফলে আবার জন্মাইবেন। অনেকে পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত বলিয়া থাকেন, মনেও করিয়া থাকেন আমাদের কবিরাজগণ বিলাতী ডাক্তারের মত গুণসম্পন্ন নহেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিরাজ-গণের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গেই এক একটী গৌরবময় ইতিহাস জড়িত রহিয়া গিয়াছে। যাহা আমার দেশীয়, আমার পিতার পিতার, মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে তাহাকে দূর করিতে যাওয়া, বাতুলতা, মূর্খতা, নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমাদের শরীর পুষ্টি ও মেধাবৃদ্ধির জন্য বিলাতী ঔষধ ব্যবহার করিলেও কবিরাজদের হাত এড়াইতে পারি না। আমাদের দেশীয় জিনিসে আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও আশু ফললাভের নিমিত্ত এবং একটা চলতি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রথমে বিলাতী ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদ শুধু গাছ গাছড়ার আলোচনা করিয়াই তাহার চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পূর্ণ করে নাই। খনিজ পদার্থের ব্যবহার তাহার বিশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক। আর কোন দেশীয় রাসায়নিক পণ্ডিতগণ তাঁহাদের রসায়ন বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে খনিজ পদার্থের ব্যবহারের ফল কতটা দিতে পারিয়াছেন তাহা জানা আছে কি? ইংলণ্ডের রসায়ন বিজ্ঞানের শৈশবকাল ধাতু পরিবর্ত্তন যুগ বা alchemical period বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। তাহাও ঠিক উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এবং তাহার উদ্দেশ্যও শারীরবিজ্ঞানের মুখী হয় নাই। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের চিকিৎসকগণ জড়জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আমরা অনেকেই ভাবি কবিরাজী ঔষধের মূল্য বেশী তাই ব্যবহার করা দুষ্কর। কিন্তু আমরা একটী রোগেই ক্রমাগত নূতন নূতন ঔষধ যখন ব্যবহার করি, বিলাতী চিকিৎসকগণ অনেক পরিশ্রম করিয়াও সেই সকল ঔষধ যখন আমাদের রক্তমাংসের সঙ্গে মিশাইতে পারেন না, তখন সেই সব বিলাতী ঔষধের সম্মিলিত দামই যে কম হয়, তাহাই বা ভাবি কেন? তারপর বিলাতী ঔষধ ব্যবহার করিতে যাইয়া আমাদের দেশের লোকের খাদ্যাদির পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বার রকমের ঔষধ ব্যবহার এবং তদনুরূপ খাদ্যাদির দ্বারা আমাদের শরীরটা তেরাল মত হইয়া গিয়াছে। আমাদের একটা রোগ আছে নিজের যা কিছু ছোট মনে করা। আয়ুর্ব্বেদকেও এইরূপ দেশীয় লোকের উদ্ভাবিত বলিয়া ছোট মনে করিয়া থাকি। আমরা একটিবারও যেন জোর করিয়া বলিতে পারি না,—"তোমার ভাল তোমাতে থাক।" এখন সময় আসিয়াছে আমরা আবার দেশীয় জিনিসকে আয়ুর্ব্বেদকে আশ্রয় করিতে যাইতেছি। আমাদের আশ্রয় শক্তিশালী হইবে। বৈজ্ঞানসম্মিলন সুসময়ে আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের বাহিরেই রাজগণ ও জনসাধারণ ইহার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশেও অনেকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। আমরা আশা করি

আয়ুর্ব্বেদ আবার চিন্তাশীল ভারতীয় পণ্ডিত কবিরাজগণের সূক্ষ্মচিন্তায় আসিয়া জগতে প্রাচীনের নবীন বার্ত্তা ঘোষণা করিবে।

* *
*

৮। ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষাবিস্তার

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে শিক্ষা আশাতীত প্রসার লাভ করিয়াছে। তাহার তুলনায় ব্রিটিশ ভারত বা অন্যান্য দেশীয় রাজ্যসমূহে শিক্ষা-বিস্তার এখনও তেমন হয় নাই। যদিও সেখানে আইন করিয়া শিক্ষাকে এখনও বাধ্যকরী করা হয় নাই, তথাপি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহে গড়ে শত-করা ১৩·২ জন বালক এবং ২৯ জন বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে বড়োদাই বহু বিষয়ে উন্নত। কিন্তু তথা হইতেও ত্রিবাঙ্কুরের প্রশংসা আসিয়াছে। বড়োদায় বাধ্যকরী শিক্ষা। ত্রিবাঙ্কুরে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শিক্ষা। অতএব ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষা-বিস্তার দেখিয়া বড়োদাকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছে। ইহার একটি তালুকে তিরুবল্লে শতকরা ৯৯৮ জন ছাত্র শিক্ষা পাইতেছে। সারা ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার এরূপ হার দেখা যায় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষাপ্রচলনে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এত অর্থ, এত সামর্থ্য, এত বিশেষজ্ঞ থাকিতেও তাঁহারা এখনও দেশে ত্রিবাঙ্কুরের মত শিক্ষার হার দেখাইতে পারিলেন না, ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়।

ত্রিবাঙ্কুরের সদাশয় মহারাজা, কর্ম্মনিপুণ দেওয়ান বাহাদুর এবং দেশীয় কর্ম্মচারীবৃন্দ যে ভাবে জনসাধারণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া শিক্ষাকার্য্যে অর্থভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন, তাহা দেশের পক্ষে সবিশেষ অনুকরণযোগ্য। আইনের বিভীষিকা না দেখাইয়া শুধু প্রাণের দিক হইতে প্রীতির দিক হইতে দেশের মঙ্গলসাধন করা যায়—ত্রিবাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে তাহাই আমরা বুঝিতে পারি, আর বুঝিতে পারি কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা পাইলেই দেশবাসী তাহার সুপ্ত কার্য্যক্ষমতাকে আশ্চর্য্য-রূপে জাগ্রত করিতে সক্ষম।

* *
*

৯। প্রাচীন আমেরিকায় হিন্দুপ্রভাব

হিন্দুর কাব্য-পুরাণে পাতালপুরীর কথা অনেকবার পাওয়া যায়। সেই পাতালপুরী আমেরিকা কি না বলা কঠিন। তবে এ দেশে এখনও আমেরিকাকে পাতালই বলা হইয়া থাকে। এবং এখনও আমেরিকার সময় সময় এমন এক একটি আবিষ্কার হয়, যাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বর্ণিত পাতাল যে আমেরিকা, এই সম্ভাবনা জাগাইয়া দেয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে নিউইয়র্কের ল্যাটন আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের সভা-পতি আলেকজেণ্ডার দেলমার একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রাচীন আমেরিকায় হিন্দুপ্রভাবের নিদর্শন উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মন্তব্যের কিয়দংশ নিম্নে দিতেছি। প্রাচীন আমেরিকায় প্রাচীন হিন্দুগণ প্রভাব দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে বর্ত্তমান আমেরিকায় বর্ত্তমান হিন্দুগণ কি কোন রকম প্রভাব বিস্তার করিবার আশা ও পোষণ করিতে পারিবেন না?

আমেরিকার সুরক্ষিতস্থান-নির্ম্মাতাগণের (Mound builders) সম্বন্ধে যে রহস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহা সম্প্রতি একখানি পাঞ্জিপাথর (Calender Stone) বলিয়া অনুমোদিত হইয়াছে। যে স্থানে

মাউণ্ডবিল্ডার্স, সিনসিনাটী এবং ওহায়ো মিলিত হইয়াছে, উহারই নিকটবর্ত্তী কোন প্রাচীন সুরক্ষিত স্থান হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পাথরখানি খনিত হয়। মিসিসিপি এবং ইহার শাখানদী সমূহের উপত্যকায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় প্রাপ্ত এই সকল বৃহৎ ও মৃন্ময় সেনাবিভাগের সমাধিস্থান এবং ধর্ম্মমন্দির আবিষ্কৃত হইয়া আমেরিকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দীর্ঘকালের একটা অভাব পূর্ণ করিয়াছে। এই সূত্রে সুরক্ষিতস্থান-নির্ম্মাতাগণের ধর্ম্ম, তাঁহাদের মাতৃভূমির সম্বন্ধে অভ্রান্ত ধারণা এবং আমেরিকায় আগমনের কারণ সম্বন্ধে নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমে স্বতঃই মনে উদিত হয় এবং নিশ্চয় ধারণা জন্মে যে, ঐ সকল সুরক্ষিতস্থান-নির্ম্মাতাগণ খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলিয়া হইতে আমেরিকায় পদার্পণ করেন। তাঁহারাই আমেরিকায় শামনধর্ম্ম বা সর্ব্বশক্তিমানের পূজা প্রচলন করেন। তাঁহারা সূর্য্যকেই সর্ব্বশক্তিমানের—শক্তির আধার জ্ঞান করিতেন। বিন্দুসংযোগে ছবি বুঝাইবার জ্ঞান তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল। পরবর্ত্তী পেরুভিয়ানগণ সংখ্যাপ্রকাশে ঐ প্রকার বিন্দুর ব্যবহার করিতেন এবং হিব্রুগণ এখনও উপাসনাকালীন পরিধেয় শাল, পেপলাম বা তালিতবস্ত্রের মধ্যেও ঐ প্রকার চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

সিনসিনাটী পাথর দৃষ্টে যে সময়ে শামনধর্ম্মের পতন এবং ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উত্থান হয় সেই সময়ের বৎসর বিভাগের একটা নমুনা দেখা যায়। মেক্সিকো এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতে কদাচিৎ বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী পরিবারে বা সমাজে এবং মিসিসিপির উপত্যকায় ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের উত্থানের বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায়। এখন আমরা কথিত বিষয়ের ইতিহাস দেখিতে পাইব। শামনগণ সৌরবৎসরকে ৮ ঋতুতে বিভাগ করেন। প্রত্যেক ঋতুকে ৪৫ দিনে এবং ১৫ দিনে ২৪টী অর্দ্ধচন্দ্র বা (নবমী) ধরা হইত। হিন্দুগণ এখনও শুক্লপক্ষকে যে "Tidis" বলেন রোমান এবং এতদ্দেশবাসিগণ তাহাকে 'ides' বা অর্দ্ধচন্দ্র বলিতেন এবং এই সকল তিথির প্রথম দিনকে প্রিদিম (প্রতিপদ) এবং নবমীর পরিবর্ত্তে 'প্রাইদাস্' ও নোনস বলিতেন তাহা হিন্দুদিগের নিকট হইতে ধার করা।

ইহা স্বিকৃত হইয়াছে যে, উত্তর এসিয়ায় ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ৩৬ দিনে এক-এক অংশ ধরিয়া সৌরবৎসরকে ১০ ভাগে ভাগ করা হইত। তারপর বুদ্ধের পর সৌরবৎসরকে ১২ ভাগে ভাগ করা হয়। বর্ত্তমানে এই রকমেই চলিতেছে। উত্তর এসিয়ার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মতের পাঞ্জি পাথরে সৌরবৎসর বিভাগ সম্বন্ধে দেখা যায়, শামনদিগের ৮ ভাগে, ব্রাহ্মণদিগের ১০ ভাগে এবং কৃষ্ণ বা বুদ্ধের সময়ে ১২ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সুতরাং সিনসিনাটী ও মুস্কা পাথর শামন পূজারই উল্লেখ করিতেছে এবং তাহাদের কাল খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী বা কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে বলিয়াই বুঝাইয়া দিতেছে। মহাভারত যুদ্ধের তরঙ্গ যখন সমগ্র উত্তর এসিয়াতেও আঘাত দিতেছিল এবং উত্তর এসিয়ার বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল সে সময়েই যে, মঙ্গোলিয়ানগণ আমেরিকা যাইয়া থাকিবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তৎপূর্ব্বে মঙ্গোলিয়ানগণ আমেরিকায় যাইতে পারেন না—পারিলে, তাঁহাদের

সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যোপাসনাযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী অসংস্কৃত চান্দ্র বৎসর গণনার মাপকাঠিও যাইত। মহাভারত যুগের বহু পরেও তাঁহারা যান নাই—গেলে, লৌহ আবিষ্কারের ফলও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। ঐ ধাতুর ব্যবহার আমেরিকার সুরক্ষিতস্থান-নির্ম্মাতাগণের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল।

মিসিসিপি প্রদেশের একজন লামার (Lamar) সমাজের শুভ প্রাণ দিবার পূর্ব্বে অধিকাংশ সময়েই জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইত। সে একবার কিছুদিন পর ফিরিয়া আসিয়া তাহার ভ্রমণ স্থানের বিবরণ দিল—ঐ প্রদেশে একটী অতিবিস্তৃত সমাহিত নগরে অনেক কাহিনী খোদিত রহিয়াছে। ঐ সকল স্মৃতি-কাহিনী-খোদিত পাথর এত বেশী যে তাহার বাড়ীখানি তাহাতে প্রায় পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। তাহার কথিত প্রদেশে ঠিক জায়গা মত অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সেই সকল স্মৃতিচিহ্ন কি হইল, সেগুলি কি অক্ষরে খোদিত ছিল তাহার সম্বন্ধে কোন খবরই জানা যায় নাই। এটা ঠিক জানা গিয়াছে, আরকান এবং সুরক্ষিত স্থান নির্ম্মাতাগণও তাহাদের সমাজের আদৃত কোন স্মৃতিস্তম্ভ উত্তোলন করে নাই। অন্ততঃ একটিও দেখা যায় না। ফার্গুসন সাহেব তাঁহার শিল্পেতিহাসে এই মত পোষণ করেন—যে কোন স্মৃতিস্তম্ভ বা দেবমন্দির উত্তোলন না করাই জগতের যে কোন স্থানে টুরানিয়ান্ জাতির বিশেষত্ব। তাহা হইলে এই সুরক্ষিতস্থান-নির্ম্মাতাগণই-টুরানিয়ান ছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে এই সকল সুরক্ষিত স্থান নির্ম্মাতাগণ মঙ্গোলিয়ান ছিলেন এবং এই মঙ্গোলিয়ানগণই টুরানিয়ান জাতি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু মধ্যআমেরিকা বাসিগণও কি টুরানিয়ানছিলেন না? তাঁহারা কি স্মৃতি সৌধ এবং ঐ সকল কারুখচিত মন্দির যাহা আজও হন্দুরাস ও নিকারাগাদের অন্ধকারময় অরণ্যানীতে তাহাদের চির শুভ্র অক্ষরঙ্কিত শীর্ষ উঁচু করিয়া রহিয়াছে, নির্ম্মাণ করেন নাই? সে যাহা হউক ঐ সকল সুরক্ষিত স্থান নির্ম্মাতাগণ টুরানিয়ান্ হউন আর নাই হউন, তাঁহাদের শিল্প ও ধর্ম্মভাব হিন্দুস্থান হইতেই গৃহীত।

ঐ সব সুরক্ষিত স্থানে বুদ্ধ অথবা কৃষ্ণের কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। যদিও মূর্ত্তিগুলির প্রত্যেকটীই বিসদৃশ ও মস্তকহীন তবুও এগুলি অত্যাবশ্যক। কারণ খোদাই কারকের স্বদেশীধরণে কচ্ছপের আবরণের উপর মূর্ত্তি খোদিত। সুতরাং ইহা হিন্দু কারিগরদিগের দ্বারাই আমেরিকায় আনীত হইবার সম্ভাবনা। বাঁকা কোমর, পা দুইটী লম্বা ও আড়া আড়িভাব, অঙ্গুলিগুলির প্রসক্তি, শরীরের সর্ব্বত্রই বিন্দু বা বৃত্ত অঙ্কন এবং পায়ের মলসূচক তিনটী করিয়া লাইন দেওয়া আছে। সেইগুলি উত্তর আমেরিকার মূর্ত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং হিন্দুমূর্ত্তির অনুরূপ।

কোমরে ও কোমরের নীচের দিকের বেষ্টনী, তূণাকার পোষাকে শরীরের নিম্নার্দ্ধ আবরণ। এবং সর্ব্বোপরি একই পদার্থ নির্ম্মিত স্বস্তিকের সঙ্গে প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলি হিন্দু প্রভাবের বলবান নিদর্শন।

* *
*

১০। জালন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়

উত্তর ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে। প্রায় আটাশ বৎসর পূর্ব্বে,

ঐ বিদ্যালয়টি স্থাপিত। এই সময়ের মধ্যে দেশের নানাস্থান হইতে শতশত বালিকা এই বিদ্যালয়ে পাঠার্থে আগমন করিয়াছে। জাতীয়ভাবে এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন। এখানে সংস্কৃতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। হিন্দীর মধ্য দিয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পাঠার্থীর মন যাহাতে বিজাতীয়ভাবে গঠিত না হয়, তজ্জন্য এখানে জাতীয়ভাবে ধর্ম্ম, নীতি, আচার প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

সুখের কথা, এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষয়িত্রী এখানে প্রীতির সহিত কাজ করিতেছেন। বিধবাদিগকেও প্রচার ও শিক্ষাকার্য্যে সুদক্ষ করিবার জন্য রীতিমত শিক্ষিত করা হইতেছে। বিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি কলেজ ও স্কুল বিভাগ আছে।

যেমন হইয়া থাকে—ইহার আর্থিক অবস্থা বড় সুবিধাজনক নহে। দেশের ধনীবৃন্দ ইহার দিকে কৃপাদৃষ্টি না করিলে ইহার বহুদিন স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কম। কলিকাতার মহাকালী পাঠশালা অর্থাভাবে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, আমাদের ভয় হয়, এই মহাবিদ্যালয়ের দশাও সেইরূপ না হইয়া পড়ে। এখনই দেশের ধনবান ও ধনবানদিগের ইহার সাহায্যকল্পে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য।

১১। ভারত ও জাপান

কবি গাহিয়াছেন—

"উদিল যেথানে বুদ্ধ-আত্মা
মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার।
আজিও যুড়িয়া অর্দ্ধ জগত ভক্তি-প্রণত
চরণে-তাঁহার॥"

ভারতবর্ষ মরে নাই। তাহার অতীত বাণী এখনও এশিয়ার নগরে কান্তারে প্রান্তরে গুহায় ধ্বনিত হইতেছে। তাহার বর্ত্তমান বাণীও অচিরেই এশিয়া ছাড়িয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রবেশ করিবে—ইতিমধ্যেই তাহার সূচনা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র এই বর্ত্তমান বাণী প্রচারে কুশীলব। তাঁহাদের একজনের বাণী জাপানে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আজ আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

টোকিওর কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত টি হিরোসে একখানি সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় লিখিয়াছেন, জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে বড় বেশী রকম সম্মোহিত হইতেছিল, তাহার পুরাতন জাতীয় ভাব অনেকটা লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, ঠিক এমনই মারাত্মক যুগে রবীন্দ্রনাথ যেন ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছেন। চিন্তাশীল জাপান তাঁহার কথা কাণ পাতিয়া শুনিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার একান্ত প্রশংসায় সে বিভোর হইয়া যাইতেছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া আবার সে প্রকৃতিস্থ হইতেছে, নিজের দেশেরই পুরাতন আচার ব্যবহারের প্রতি আবার তাহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি ফিরিয়া আসিতেছে। অতএব রবীন্দ্রনাথের কাছে জাপান বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

১২। ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ

বাঙ্গালা দেশে মূল সাহিত্যপরিষৎ তিনটী মাত্র দেখিতে পাই। কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, রঙ্গপুরে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ এবং ঢাকাতে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ।

ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী শাখা সাহিত্য পরিষৎও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ ১৩১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ ইহাকে ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন লইতেছেন। ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ আজপর্য্যন্ত প্রথমোক্ত দুইটী সাহিত্য পরিষদের সম্মিলনে কেবল মাত্র যোগদানই করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালাদেশ এখন সাহিত্যে নবীন ভাবুকতা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। উন্নতিশীল বঙ্গদেশের পক্ষে এই দুইটী মাত্র সাহিত্য পরিষৎই যথেষ্ট নয়। সমগ্র বাঙ্গালাদেশকে ধরিবার জন্য এখন বিভিন্ন সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠাদ্বারা বর্ত্তমান জগতের আশা শিক্ষা, কর্ম্মপ্রণালীকে জন-সাধারণের ভিতর প্রচার করা দরকার। শুনিয়াছিলাম ঢাকা সাহিত্য পরিষদের, সাহিত্য সম্মিলন সহরে যাওয়া ছাড়িয়া পল্লী-কেই তাহার প্রচার ভূমি করিবে। ইহাতে আমরা একটা নূতন ভাব পাইয়াছিলাম এবং সফলতার উজ্জ্বল রেখা আমাদের হৃদয়ে কিরণ দিতেছিল। সাহিত্য সম্মিলনগুলি বিভিন্ন সময়ে হইলেই বিশেষ সুবিধা হয়। প্রথমতঃ বিভিন্ন সময়ে সম্মিলনগুলি সম্পন্ন হইলে দেশের ভিতর একটা স্রোত বহিতে থাকিবে, লোকে সে গুলিকে আপনাদের চিন্তার মধ্যে আনিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকগণ সমবেত হইবার সময় পাইবেন। বিভিন্ন শ্রেণীর লেখক ও বিশেষজ্ঞদিগের চিন্তাশক্তি বিভিন্ন স্থানে ক্রিয়া করিবার অবসর পাইবে। একই সময়ে সম্মিলনগুলি সম্পন্ন হইলে লোকে তাড়াতাড়ি সেগুলিকে ধরিতে পারে না। উহা যেন একটা 'যোগের মানে'র মত হয়। কে কোথায় যাইবেন ঠিক করিতে পারেন না। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে মালদহের এক পল্লীতে মালদহ সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জে বিক্রম-পুর সাহিত্য সম্মিলন নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ পল্লীতে সাহিত্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লী-সাহিত্য সম্মিলনের দ্বারা বঙ্গীয় মাতৃভাষার উন্নতি এবং লোকের ধারণা ও মনোগত ভাব উচ্চাকার ধারণ করিবে, সহরের সংখ্যা করা ২।৪টী সম্মিলনের দ্বারাও দেশের তেমন বিস্তর কাজ হইবে না। আমরা আশা করি ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকগণ শীঘ্রই তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বিপুল বিস্তৃত করিবেন এবং প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পরিষৎ অবিলম্বেই সাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নূতন ভাব ভাষা দান করিবে। পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকগণের এজন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আমরা এই নবীন সাহিত্য পরিষদের প্রবীণ সাহিত্যিক-গণের নিকট অনতিদূর ভবিষ্যতে অনেক বিষয়ের আশা করিতেছি।

* *

১৩। নাট্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

বর্ত্তমান নাট্য সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে আমরা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী স্তর দেখিতে পাই। প্রথম স্তরে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক, দ্বিতীয় স্তরে ক্ষীরোদ প্রসাদের আধুনিক ইতিহাসের প্রথম অভিনয় এবং তৃতীয় স্তরে আধুনিক ঐতিহাসিক নাটকের চূড়ান্তকাল বা দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যযুগ গিরিশচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের যে ভাব পৌরাণিক নাটকের ভিতর দিয়া জনসাধারণে প্রচার করেন তাহা সমাজ গ্রহণ করিয়াও যখন নূতন চাহিতেছিল ঠিক সেই সময়েই ক্ষীরোদপ্রসাদ আপনার সাধনালব্ধ এক নূতন অপূর্ব্বরস

নাট্যরত্ন বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে দান করিয়া নবযুগের বার্ত্তা প্রচার করিলেন। ক্ষীরোদ-প্রসাদ তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে যে সুর ধরিয়াছিলেন তাহা বিভিন্ন তান লয়ে পুষ্ট হইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সিংহলবিজয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার গৌরব গাথা বাঙ্গালীর ইতি কথা ক্ষীরোদপ্রসাদ হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত এক সুরে গীত হইয়াছে। বাঙ্গলার নাট্য মন্দিরে আধুনিক ঐতিহাসিক উপাদানে নাট্যাভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু যেন সেই ধারণাই আমাদের মনে জাগাইয়া দেয়। বাঙ্গালীর চরিত্রে বীররসের অবতারণা করিতে যাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল যে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহা শক্তিমান নবীন লেখকের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। নবীন ঐতিহাসিক নাটক লেখককে এক নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে। তাঁহার ধারণা তাহার সাধনা নূতন ধরণের হইবে। বাঙ্গালী চরিত্রের জন্য বাঙ্গলার নাট্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারের নিমিত্ত নূতন রকমের ঐতিহাসিক নাটকের প্রয়োজন। সমাজ এখন যাহা চায় তাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া কেহ কি তদনুযায়ী নাট্য-সাহিত্যে প্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন না?

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের পর চতুর্থ স্তরে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত মিষ্টিক বা আধ্যাত্মিক নাটকের ধারা দেখিতে পাই। আমাদের আশার কথা—সম্প্রতি নূতন নূতন লেখক নবীনভাবে নব নব চিন্তার অনুশীলনে তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফল দ্বারা সাধ্যমত সমাজে নূতন ভাব দিতে চেষ্টা করিতেছেন। মানবচরিত্রে ভীরুতা ও কাপুরুষতা অর্জ্জিত হইলেও সে বীররসেরই অভিনয় দেখিতে ব্যস্ত। আমাদের সমাজেও সেইরূপ ভাব থাকিলেও সমাজ যেন নূতন কিছু চাহিতেছে। লোকের আকাঙ্ক্ষা যেন বীররসের ভিতর দিয়া আরও কিছু চাহিতেছে, সেইটী সময়োপযোগী প্রয়োজনে, তাহার রক্তমাংসের সংযোগফলে, হৃদয়তন্ত্রীর এক নূতন ঝঙ্কারে। আমরা সাহিত্যে কাঠিন্য ধর্ম্মের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কাঠিন্য ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে গভীর ভাবুকতারও প্রয়োজন। আমাদের সমাজে এখন কাঠিন্য ধর্ম্মের ও গভীর ভাবুকতার নূতন চিত্র যিনি উপস্থাপিত করিতে পারিবেন শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিবে। বাঙ্গল নাট্য সাহিত্যের অনুরাগিগণ ভবিষ্যতে এক নূতন অভিনয় দর্শন জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস অশান্ত মানবহৃদয় শান্তিলাভের জন্যই ব্যগ্র তাই নূতন নাট্য-সাহিত্যের অপেক্ষা করিতেছে। নাট্য-সাহিত্যও সময়োপযোগী এক নূতন পন্থা ধরিবার জন্য অচিরেই তাহার ব্যাকুলতা দেখাইবে।

প্রণাম

অন্তর মাঝে লভিয়াছে যেবা প্রজ্ঞার উন্মেষ,
ধ্যান ধারণায় পাইয়াছে যেবা সত্যের উদ্দেশ,
ভাব-প্রবুদ্ধ পরমাত্মায় পাইয়াছে সাক্ষাৎ,
সকলের আগে তাঁহার চরণে করি আমি প্রণিপাত।

সুন্দরে যেবা মর্ম্মে মর্ম্মে করিয়াছে অনুভব,
নিষ্ঠাশ্রদ্ধা একাগ্রতায় আনন্দ সম্ভব,
শিল্পে, চিত্রে, গীতে, কবিতায়, জাগে মধুমহিমায়,
মূর্খ হলেও জ্ঞানী বলে' তায় প্রণাম করিগো পায়।

যার বাহু দুটী পরশ মাণিক, পরশন-শিহরণে
মঙ্গলহেম জেগে উঠে যা'তে মানবের মনেমনে,
জীবনসমরে ন্যায়ের পক্ষে যুঝে যেবা প্রাণপণে,
বীমান বলিয়া প্রণাম করিগো তাঁর দুটী শ্রীচরণে।

প্রেমে যার চোখে জলধারা বয়, হৃদি যার সিক্ত ননী,
প্রাণ যার ক্ষমাভক্তি করুণাত্যাগ-ধীরতার খনি,
সরল তরল জীবন যাহার অবনত হয়ে চলে,
মহাজ্ঞানী বলি' করি প্রণিপাত তাঁহারো চরণ-তলে।

বয়সে প্রবীণ, জীবন যাহার জীবন্ত-ইতিহাস,
দেখিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া চিত্তের আঁধার করেছে নাশ,
তরুণের পথ সরল করেছে নিজের জীবন ক্ষয়ে,
জ্ঞানী বলি' আমি করিগো প্রণাম তাঁহারো চরণদ্বয়ে।

পাঠে, আহরণে তপশ্চরণে বসি গুরুগৃহতলে,
অপরের জ্ঞান নিজের করেছে যেবা সাধনার ফলে,
জীবনাদর্শ গড়িয়া তুলেছে বিদ্যার মহিমায়,
জ্ঞানী বলি' আমি করিগো প্রণাম তাঁহারো দুইটি পায়।

ইঁহাদের যেবা মর্ম্ম বুঝিয়া ভক্তিতে রয় নত,
নিজে জ্ঞানী নাহি হয়েও যেজন জ্ঞানীর সেবায় রত,
তাঁদের সকাশে কুণ্ঠায় নিজে তৃণ বলি জ্ঞান যার,
শেষ প্রণিপাত তাঁহার চরণে করি আমি বার বার।

শ্রীকালিদাস রায়।

স্ত্রী-জাতির শিক্ষা-সমস্যা

স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে হইলে অগ্রে দেখিতে হইবে পুরুষ-জাতি ও স্ত্রীজাতিতে কিরূপ প্রভেদ? সেই প্রভেদ অনুসারে পুরুষ হইতে স্ত্রীজাতির জীবনের গতি এবং শিক্ষা আর এক হইয়া দাঁড়ায়। আমি সেই প্রভেদগুলি প্রথমে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ, স্ত্রীজাতি পুরুষের অপেক্ষা মৈহিক দুর্ব্বলতাসম্পন্ন জীব। স্বভাবের গণ্ডী ছাড়াইয়া স্ত্রীজাতি যদি মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পুরুষের অপেক্ষা অনেক শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তাঁহাদের সহিষ্ণুতাগুণ সত্ত্বেও মৈহিক দুর্ব্বলতা হেতু অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় তাঁহাদের শরীর ক্ষয়ের সম্ভাবনা অধিক।

দ্বিতীয়তঃ, পুরুষজাতির দেহযন্ত্র অপেক্ষা স্ত্রীজাতির দেহ-যন্ত্র প্রজনন-ক্রিয়ায় অধিকতর সহায়তা করে। সৃষ্টিরক্ষাকারিণী স্ত্রীজাতির দেহ-যন্ত্রের মূল্য অধিক, দায়িত্বও অধিক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অত্যধিক মস্তিষ্ক পরিচালন করিলে স্ত্রীজাতির প্রজনন-ক্রিয়ার অর্থাৎ জননীত্বে ব্যাঘাত পড়ে। পুরুষজাতির অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রম জন্য স্ত্রীজাতির দেহ-যন্ত্রে বহুবিধ উৎকট রোগ ও বৈষম্য দেখা দেয়।

তৃতীয়তঃ, সন্তানসন্ততির মঙ্গলের জন্যও স্ত্রীজাতির অযাচ মানসিক প্রতিযোগিতা একটা সমাজ এবং সভ্যতার পক্ষে তেমন কল্যাণপ্রদ নহে।

জগতের সর্ব্বত্রই এখন একটা প্রতিযোগিতার স্রোত চলিয়াছে। পুরাতন যুগের সে সহযোগিতার প্রচলন যেন উঠিয়া গিয়াছে। যথায় প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান, স্বার্থপরতাও তথায় বিদ্যমান। ফলে এই বিশ্বসংসারের নর-নারীসমাজ তলে তলে দ্বেষহিংসার আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করিয়া যেন একটা মহাপ্রলয়ের দিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছে। পুরাতনের সে সহযোগিতা আর নাই বলিয়াই আজ গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে এত অশান্তি, এত অভাব, এত যথেচ্ছাচারিতা। পরস্পর একটা সহানুভূতি না থাকিলে, অবনমিতা না থাকিলে একটা জাতীয়ত্বের তেমন প্রতিষ্ঠা হয় না। ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি লইয়াই জাতীয়ত্ব, সেই ব্যক্তিত্বই যে সমাজে বিষময় তথায় যথার্থ কল্যাণের আশা কোথায়? বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে কোন অনুষ্ঠান সুফল প্রসব করিতে পারে না। যে পাশ্চাত্য-সভ্যতার জন্য আমরা আজ লোলুপ, তাহা আপাত মনোরম হইলেও তাহার ভিত্তিভূমি ঐ প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষ বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। উপরে উপরে সভ্যতার বহু চাকচিক্য ও জৌলুসের বাহার থাকিলেও অন্তরে অন্তরে তাহার বিষম বাড়বাগ্নি লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ হলাহল আমাদের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে ও দুরবস্থায় কিরূপ সহিবে, তাহাই আমাদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য-জগতের এই দারুণ প্রতিযোগিতার ভাব যদি আমাদিগের স্ত্রীজাতির ভিতরেও দেখা দেয়, তাহা হইলে আমাদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক অবস্থাও অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িবে।

মধুচক্রের ন্যায় পারিবারিক জীবনগঠন আমাদিগের হিন্দুত্বের একটি বিশেষত্ব। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুখ ত আমরা নানা রকমে হারাইতে বসিয়াছি তাহার উপর যদি আমাদিগের জীবন হইতে পারিবারিক সহানুভূতিটুকুও যায়, তাহা হইলে আমাদিগের আর দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না।

এই গার্হস্থ্যধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে অগ্রে আমাদিগকে স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর সতর্ক হইতে হইবে। কিরূপ ভাবে আমাদের স্ত্রীজাতির চরিত্রগঠন করিলে তাঁহাদিগের প্রকৃত উন্নতি ও শিক্ষা বিধান হয়, সব কায ফেলিয়া অগ্রে আমাদিগকে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে কেবলমাত্র স্বামী স্ত্রী লইয়াই হিন্দুর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ নহে, হিন্দুর সংসার পুণ্যের সংসার—সহযোগিতার সংসার, দয়া এবং দানের সংসার। হিন্দুর ধর্ম্ম শোষণ নহে, পোষণ। বিকুর পালনী-শক্তির মহাবিকাশের জন্যই হিন্দু তাহার দয়া দান এবং আতিথেয়তা লইয়া আজিও দরাবকে দণ্ডায়মান—হিন্দুর সহধর্ম্মিণীরা আজিও গৃহে গৃহে অন্নপূর্ণার ন্যায় বিরাজমানা। পঞ্চসূনা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য হিন্দুকে পঞ্চযজ্ঞ করিতে হয়। হিন্দু কেবল ব্যক্তিত্বের বোঝা লইয়াই আসে নাই, প্রত্যেক হিন্দুকে সংসারের অনেক বোঝা বহিতে হয় সমষ্টিতেই প্রকৃত হিন্দুর চরম অভিব্যক্তি!—সে সকলকে জড়াইতে চায়, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে চায়, ঘরের একটি অনিষ্টকারী বিড়ালকেও সে যে নিরস্ত রাখিতে পারে না। এমনি হিন্দুর দয়ার সংসার। সেই দয়া যাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব হইতে চলিয়া না যায় তাহার দিকে আমাদিগকে বিশেষ সচেষ্ট হইতে হইবে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই আমরা সেই দয়ার আধার স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে দেখিতে পাই। সেইদিন হইতেই আমাদিগের শিক্ষা হইতে থাকে।

মাতৃগর্ভ হইতেই আমাদের শিক্ষার সূচনা হয়, আমাদিগের সংসর্গ গঠিত হয়। এমন যে জননী, তাঁহার হৃদয়কে অশিক্ষিত রাখিয়া আমরা কেমন করিয়া অবহেলা করিতে পারি? Coleridge সত্য সত্যই ধরিয়াছিলেন, "The history of a man in the nine months before his birth would probably be more interesting, and would contain events of greater importance than any that may occur in after life"

সৎ-চরিত্র পিতামাতার যে কুচরিত্র পুত্র কন্যা হয়, ইহার কি কোন কারণই নাই? বাহির হইতে আমরা এইরূপ ঘটনা ঘটিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাই, কিন্তু তাহা ঘটিবার যে মাতৃগর্ভ হইতে একটি সুদূর-নিহিত কারণও রহিয়াছে তাহা আজকালকার কয়জন মঙ্গল-কামী পিতা মাতা তলাইয়া দেখেন? মনুষ্যের সন্তানোৎপত্তি ত পশ্বাদির breeding এর ব্যাপার নহে যে কেবল pedigree (বংশ-কৌলিন্য) দেখিলেই চলিবে। ইহা যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, কেবল কাম-পশুর সৃষ্টি করাই ও মানবজীবনের গূঢ় উদ্দেশ্য নহে। একটা উচ্চ আদর্শের উপর মানবসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত; যে সভ্যতায় সে দেবত্বের আদর্শ (divine idea) নাই, সেই সভ্যতার অধীনস্থ মানবসমাজ পশুত্বের গণ্ডীর ভিতরেই সহস্র বাবহারিক উন্নতি সত্ত্বেও আবদ্ধ। দেবভাবই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। মহামতি Fichte তাঁহার

De Moribus Eruditorum অর্থাৎ "ছাত্র-জীবনের স্বধর্ম্ম নামক" বক্তৃতা-পুস্তকের এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে,—

"The whole material world, with all its adaptations and ends, and, in particular, the life of man in this world, are by no means, in themselves and in deed and truth, that which they seem to be to the uncultivated and natural sense of man, but there is something higher, which lies concealed behind all natural appearance. This concealed foundation of all appearance may, in its greatest universality, be aptly named the Divine Idea.

মানবজীবনের গুরুত্বটা আমাদিগের দেশের পিতামাতাদিগকে বুঝাইবার জন্যই আমি এতগুলি কথা বলিলাম। এবং সেই মানব জীবনের মূলাধার হইতেছে মানব-জননী। কারণ, জননীই মানবজাতির পিতা মাতা উভয়কেই প্রসব করেন।

এখন যে জননী-রূপিণী স্ত্রীজাতি—ইহাদের জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই দায়িত্বপূর্ণ। পুরুষের নিশ্বাস ফেলিবার যথেষ্ট অবসর আছে কিন্তু ভাবিতে গেলে স্ত্রীজাতির জীবনব্যাপিনী সাধনা। স্ত্রীজাতির উপর একটা বিরাটজাতির কল্যাণাকল্যাণ নির্ভর করিতেছে। প্রজনন-কার্য্যে নারীজাতির তুলনায় পুরুষজাতির দান অতি সামান্য। গর্ভাধানে, সন্তান প্রসব এবং এমন কি সন্তান পালন কালেও নারীজাতির বিশেষ চরিত্রবল ও অটুটস্বাস্থ্যের প্রয়োজন হয়। মাতা বুদ্ধিমতী হউন আর নাই হউন তাহাতে তত যায় আসে না, কিন্তু মাতার দৈহিক ও মানসিক গতি নির্ম্মল রাখিতেই হইবে। বিদ্যাসাগরের জননীর বিদ্যার আবশ্যকতা তত নাও থাকিতে পারে কিন্তু বিদ্যাসাগরের জননী হইতে হইলে যে পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা চরিত্রবল ও দৈহিকবল একান্ত প্রয়োজন তাহা কে অস্বীকার করিবে? পুত্রের কল্যাণ হেতু পিতার অপেক্ষা যে মাতার স্বাস্থ্যসম্পদ ও চরিত্রবল অধিক প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু যেখানে অত্যধিক মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হয় সেখানে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিকতর হানি হইতে দেখা যায়। Spencer তাঁহার Principles of Biologyতে লিখিয়াছেন যে অস্বাভাবিক মস্তিষ্কের উত্তেজনায় স্ত্রীজাতি বন্ধ্যা হইয়া যায়। দেহতত্ত্ববিদ্‌গণ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, যে স্ত্রীলোক যত অধিক উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন তাহার সন্তান সন্ততিও তদনুরূপ দুর্ব্বল। Spencer আরও বলেন যে, এইসব উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের শিশুসন্তানদিগকে স্তন্যদানেও অপারগ। শিক্ষাদ্বারা তাঁহাদের জীবন এমনই ভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাঁহাদের বক্ষের বর্দ্ধনশক্তিরও হ্রাস হইয়া থাকে এবং সন্তানপালন করিতে তাঁহাদিগকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয় (Vol. ii p. p. 485.—86)। Dr. Hertel, Prof. Bystroff প্রভৃতি অনেক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের এইরূপ প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষামূলক উচ্চশিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে যুবক যুবতীর জীবনে কত যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদিগের ছাত্র-সমাজের অকাল-পক্কতার একটী

প্রধান কারণ এই প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষা-মূলক অনুচিত শিক্ষাবিস্তার। কিন্তু এই পাপ যদি আমাদিগের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করে তাহাহইলে হয়ত আমরা এইরূপ জীবন্মৃত অবস্থাতেও থাকিতে পারিব না। এইরূপ উদ্দেশ্য-বিহীন শিক্ষার জন্য নরনারী উভয়ে মিলিয়া এইরূপভাবে জীবনপাত করিলে, হয়ত দুই তিন পুরুষেই আমরা জাতীয় ধ্বংসের একটা মহা সূচনা দেখিতে পাইব। আমাদিগের স্ত্রীজাতিও তাঁহাদের এক মহাদায়িত্বপূর্ণ মাতৃত্ব হইতেও অবসর লইবেন।

এই উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে পাশ্চাত্য-জগতে স্ত্রীজাতির মধ্যে যে কিরূপ অবনতি ঘটিতেছে আমরা তাহারই কতকগুলা দৃষ্টান্ত দিয়া হিন্দু সমাজকে সাবধান করিয়া দিব।

এইরূপ উৎপীড়ন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়াতে বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাদিগের জীবনের আরও ক্ষতি হইতেছে। কারণ বালিকারা প্রায়ই বালকগণের অপেক্ষা গৃহাবদ্ধ, নির্জ্জন-প্রিয় ও ব্যায়াম-বিমুখ, একবার প্রতিযোগিতামূলক উচ্চশিক্ষার ফাঁদে পড়িলেই তাহারা অত্যধিক পঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে। তাহার উপর এইরূপ ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া ধনবানের কন্যার নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতায় সময় অপব্যয় করে এবং গরীবের কন্যারা সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যায়। পাশ্চাত্য জগতের এইরূপ স্বাস্থ্যহানিকর শিক্ষার ব্যবহার দেখিয়া Clark নামক অনেক মার্কিনবাসী সমাজতত্ত্ববিদ্ বলিতেছেন—"If this goes on for half a century.it needs no prophet to predict, from the laws of heredity, "that the mothers of our future generations will have to be brought from beyond the Atlantic."

এইরূপ সামাজিক অবস্থায় কেবল বংশ-কৌলিন্য দেখিয়া বিবাহ দিলে সুদূর ভবিষ্যতে জাতীয় অধঃপতনের যে ইহাই একটি অব্যবহিত কারণ হইয়া পড়িবে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। কারণ এই সব শিক্ষিত সমাজের নারীগণ অতিরিক্ত শিক্ষা দ্বারা ক্রমশঃই জননীত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং যদিও তাঁহাদের মাতৃত্বে পরিণতি ঘটে, সে সব পুত্রকন্যাদ্বারা সমাজের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না। তদ্পরিবর্ত্তে অল্পশিক্ষিতা গৃহকর্ম্মরতা, অটুট স্বাস্থ্য-সম্পন্না স্ত্রীলোকগণই একটি জাতীয় জীবন-গঠনে বিশেষ সহায়তা করিবেন। স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষাদ্বারা যদি জাতীয় জীবনী-শক্তিরই হ্রাস হয়, তাহা হইলে এমন শিক্ষায় কি লাভ?

একটা জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একমাত্র নিয়মিত শ্রমই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। আমাদিগের অন্তঃপুরে অবরোধ প্রথা সত্ত্বেও শ্রমের অভাব নাই। অবরোধ-প্রথা স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল না হইলেও উদ্দাম প্রবৃত্তি-স্রোত-প্লাবিত জনবহুল সহরে অবরোধপ্রথাভিন্ন উপায় নাই। সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীজাতিকে নৈতিক অবনতি হইতে রক্ষা করা অভিভাবকগণের প্রধান কর্ত্তব্য। কারণ স্বাস্থ্য হারাইলে স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু একবার নৈতিক অবনতি ঘটিলে কি পুরুষ কি স্ত্রীজাতির কিছুতেই নিস্তার

নাই। অবরোধ-প্রথা একটা প্রবর্ত্তিত দেশাচার মাত্র, হিন্দুর নিজস্ব নহে। মুসলমানগণের অত্যাচার হেতু সতীদাহ এবং অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই অবরোধ-প্রথাকে উঠাইতে হইলে আমাদিগের পল্লী-জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। পল্লীকে অবহেলা করিয়াই ত আজ আমরা নানা অভাবগ্রস্ত ও মৃতপ্রায় হইতে বসিয়াছি। পল্লীজীবন-প্রবর্ত্তন ব্যতীত আমাদিগের কি পুরুষ, কি স্ত্রীজাতি কাহারও মঙ্গল নাই। সহরে বাস করিতে হইলে খাঁচের পাখী হইতেই হইবে। শারীরিক দুর্ব্বলতাহেতু আমরা স্ত্রীজাতিকে কোনরূপ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেও একান্ত অক্ষম। অবস্থাসম্পন্ন স্বামীর উপস্থিতি সত্ত্বেও যখন স্ত্রীজাতিকে লাঞ্ছিত হইতে দেখা যায়, তখন একজন সামান্য কেরাণী কেমন করিয়া তাঁহার স্ত্রী কন্যা কন্যাকে অবাধে ট্রাম গাড়ীতে বা সড়ের মাঠে ভ্রমণ করিতে ছাড়িয়া দিবেন? সহরের এই অবরুদ্ধভাব পল্লীগ্রামে অনেকটা শিথিল হইতে পারে। উন্মুক্ত বায়ু এবং তদুপযুক্ত শ্রম আবার বঙ্গীয় মহিলাগণের পূর্ব্বকার স্বাস্থ্য আনয়ন করিতে পারে। তাই বলিয়া আমি স্ত্রীজনোচিত লজ্জাভূষণকে ত্যাগ করিতে বলিতেছি না। লজ্জা স্ত্রীজাতির গৌরব। লজ্জা স্ত্রীজাতির দুর্ব্বলতা নহে। স্ত্রীজাতির লজ্জাই তাঁহার জীবনের সতীত্বকে রক্ষা করে।

রূপ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের আকর্ষণ অধিক। অনেক চশমা-ধারিণী উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গমহিলা দেখিতে পাই, বডিস গাউনে তাঁহারা কম সজ্জিত নহেন মোটর গাড়ীতে চড়িয়া হাওয়াও খান, কিন্তু দেখিলেই মনে হয় তাঁহারা যেন কোন না কোন আভ্যন্তরিক রোগগ্রস্ত, এটুট স্বাস্থ্যের জ্যোতি নাই যেন নির্জ্জীবতার প্রতিমা! ভবিষ্যৎবংশের উন্নতিকল্পে এইরূপ বঙ্গনারীই কি অভিপ্রেত? Spencer তাঁহার Education এর ১৮৭—৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন,—

"Men care little for erudition in woman; but very much for physical beauty, good nature and sound sense. What man ever fell in love with a woman because she understood Italian?"

স্পেন্সার আরও লিখিয়াছেন যে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা দৈহিক উন্নতি এবং নৈতিক মাধুর্য্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক। স্বভাবের একটি সর্ব্বপ্রধান পরিণতি হইতেছে এই যে, ভবিষ্যৎবংশীয়গণের মঙ্গল চেষ্টা। পরন্তু একটা জাতির ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে একমাত্র ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

অপরিণত বয়সে এই উচ্চশিক্ষার বোঝা আমাদিগের নর-নারীজীবনের যে কিরূপ ক্ষতি করিতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। শিক্ষা অপেক্ষা স্বাস্থ্যের দিকটা আমরা বড়ই উপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু, আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে অগ্রে সব কার্য্য ফেলিয়া জীবনের স্বচ্ছলতা ও আহার বিহারের সুবিধা দেখিতে হইবে। Spencer লিখিতেছেন—

"That a good physique however poor the accompanying mental endowments, is worth preserving,

because through future generations the mental endowments may be indefinitely developed,"

স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি মহাপ্রতিভাসম্পন্ন হইলেও তাহার উচ্চ আশার কিছুই মিটাইয়া যাইতে পারে না; কিন্তু পিতা মাতার যদি অটুট স্বাস্থ্য থাকে তাহা হইলে তাঁহারা নিরক্ষর হইলেও কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের বংশধরেরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল স্রোত পাইলে অনায়াসে মানসিক উন্নতি সাধন করিতে পারে।

ফরাসী সমাজদার্শনিক M. Guyau তাঁহার Education and Heredity নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"The mothers of Bacon and Goethe, though both very remarkable women, could not have written either the Novum organum or Faust; but if they had ever so little weakened their generative powers by excessive intellectual expenditure, they would not have had a Bacon or a Goethe as a son."

গায়োর এই কথাগুলির ভিতর প্রবেশ করিলে আমরা আধুনিক বংশোৎকর্ষ বিজ্ঞানের (eugenics) কিঞ্চিৎ রহস্য উদ্ঘাটন করিতেও পারি। গায়োর মতে নৈতিক শিক্ষার পরেই দৈহিক উৎকর্ষ সাধন একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ শক্তি এবং স্বাস্থ্যের উপরেই একটা জাতির যথাসর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছে। কেবল তাহাই নহে ব্যক্তিগত জীবনেও নীতি এবং বুদ্ধি-বৃত্তি দৈহিক সামর্থ্যের উপর দণ্ডায়মান। গরুমারিয়া ছুতা ধান যেমন, স্বাস্থ্যহানি করিয়া উচ্চশিক্ষালাভও তেমনি। বর্ত্তমান ফরাসী চিন্তার ধারা, তাই ব্যক্তি বিশেষ ব্যষ্টিতেই আবদ্ধ নহে, সমষ্টির দৈহিক এবং নৈতিক কল্যাণই নব্য ফরাসীর কাম্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের এই সরল এবং সোজা কথা বিংশ শতাব্দীর ফরাসী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অবস্থা-চক্রে পড়িয়া সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন। কোমতের পর্য্যুদিত বাণী আজ ফরাসীগণের জিহ্বা সাপিতেছে। কর্ত্তব্য এবং দায়িত্বজ্ঞান ব্যতীত কোন জাতিই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। অতীতের প্রতি সম্মান এবং অনাগত ভবিষ্যতের কল্যাণ-চিন্তা ব্যতীত বর্ত্তমানের তথাকথিত উন্নতির কোন সফলতাই নাই। বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে, তবেই তাহার জাতীয় জীবনের সার্থকতা।

আর আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ভ্রান্তিসমূহ ও পাশ্চাত্যজাতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অবনতিগুলাকেই সাদরে উন্নতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। প্রতীচ্য মনীষিগণ ক্রমশঃই আমাদিগের শাস্ত্রবিহিত উপায়ের নিয়মাবলী গ্রহণ করিতেছেন আর আমরা Progressive ideas বলিয়া উহাদের হেয় মনোবৃত্তি গুলিকেই গ্রহণ করিতেছি। এই সব Spencer, Guyau প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কথায় তবে কি বুঝায় স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা আদৌ দিবে না? না, তাহা নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন, স্ত্রীজাতিকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে, তাহাদের জীবনের বিশেষত্বের ভিতর দিয়া। শিক্ষা আর মানসিক অপব্যয় এক নহে। পঠন এবং পীড়ন এক নহে। সকল শিক্ষার মূলেই একই নিয়ম বিরাজ করিতেছে, শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে

হইবে। শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্। শিক্ষা ও স্থূলের কথা শরীর মাটী করিয়া শিব-সংহিতা ধর্মসাধন করিতেও সাবধান করিয়া দিতেছে।

বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির জীবনে এতই কর্ত্তব্য রহিয়াছে যে গৃহধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া উচ্চ-শিক্ষার বিভূষিতা হইতে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। গৃহকর্ম্মের অনুরূপে, নারীধর্ম্মের অনুরূপে সুরক্ষা ও সুশিক্ষিতা হইতে আমরা বঙ্গমহিলাগণকে বাধা দিতেছি না। সন্তানসন্ততির দৈহিক এবং নৈতিক উন্নতির ভার যতটা জননীর, ততটা জনকের নহে। মাতার দৃষ্টান্তেই সন্তান গঠিত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া যেন বঙ্গ-মহিলাগণ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন। অধ্যয়নের অপেক্ষা তাঁহাদের দায়িত্বপূর্ণ জীবনে যে অধ্যাপনা অধিক ইহা যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান।

সুশ্রাধনী পাঁয়ো বলিতেছেন :—

"Practical pedagogy, with domestic hygiene, is almost the only knowledge necessary to woman, and it is literally the only training she does not get."

স্বাস্থ্য-শিক্ষা, সন্তানপালন, পরিচর্য্যা প্রভৃতির দিকে এই সব উচ্চ-শিক্ষিতাগণের আদৌ দৃষ্টি নাই, কেবল বেশভূষা ও সঙ্গীত আলাপন লইয়াই তাঁহারা ব্যাপৃত থাকেন, ইহা কি উচ্চশিক্ষার কুফল নহে? সন্তান সন্ততি যদি আশৈশব হইতে জননীকে অভিনেত্রীরূপেই দর্শন করে তাহা হইলে তাহাদের চরিত্র কি ভাব ধারণ করিবে, তাহা ত অনায়াসেই বুঝা যায়। সন্তানবর্গের নিকট জননীকে একটা নৈতিক আদর্শ ধরিয়া রাখিতে হইবে। বিদ্যাসাগর ভরদাস প্রভৃতির জননী এইরূপই করিয়াছিলেন।

দয়া, স্নেহ, সেবা এবং নিঃস্বার্থপরতাই স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। রাজনীতি কিম্বা কোনরূপ প্রতিযোগিতামূলক পুরুষোচিত শিক্ষা স্ত্রী-জাতির পক্ষে নিতান্ত অবান্তর বিষয়। সংসারে সহৃদয়তা বৃদ্ধি করার ভার একমাত্র স্ত্রী-জাতির উপরই সমর্পিত হইয়াছে। একমাত্র সহৃদয়তার উপরেই মাতৃত্বের বিকাশ নির্ভর করিতেছে। মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয় রাজ্যের বিস্তৃতি অধিক। হৃদয়ের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। হৃদয় হইতেই সহযোগিতার উদ্ভব, মস্তিষ্ক হইতে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত।

বর্ত্তমান শিক্ষার একটি বিশেষ দোষ এই যে, ছাত্র-জীবনের অনুকূল হউক বা নাই হউক স্বাস্থ্য-হানি করিয়াও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। অঙ্কশাস্ত্রের আমি আদৌ অধিকারী নই, সাহিত্য বা ইতিহাসের দিকেই আমার বাল্যাবধি অভিব্যক্তি অথচ পরীক্ষার দায়ে অঙ্কশাস্ত্রের সুগভীর জটিলতার মধ্যে আমাকে নিবদ্ধ থাকিতেই হইবে। এইরূপ শিক্ষায়, আমি কোনরূপে পাশ করিতে পারিলেও জীবনে তাহার আমি কোন সাফল্য লাভ করিতে পারিব না। ইহাতে কোনটাই আমার শিক্ষা হয় না অথচ যাহাতে আমার অধিকার আছে তাহাও আশানুরূপ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। তাই বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে এতাদৃশ অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। একে রাশি রাশি পাঠ্য-পুস্তক তাহার উপর তৎসমুদায় হয় ত কাহারও কাহারও স্বভাবের সম্পূর্ণ প্রতিকূল বিষয়। এইরূপ অবস্থিতি

কয় বিষয়ের আলোচনায় স্বাস্থ্যহানির আরও সম্ভাবনা। সাহিত্যানুরাগ যদি আমার স্বভাবগত হয় তাহা হইলে রাত্রদিন ধরিয়া সাহিত্য লইয়া পড়িয়া থাকিলেও তাহাতে আমার তেমন শারীরিক ক্ষতি করিবে না, যত ক্ষতি করিবে আমার প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা।

গীয়ো ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন যথা,—

Besides, nothing is so fatiguing as the irrational or the fastidious for the mind ceases to feel interest in it ; and when no curiosity is felt effort alone remains, thus doubling the sense of tedium.

এতাদৃশ প্রতিকূলতা ও পাঠ্য-পীড়ন সত্ত্বেও পুরুষের পক্ষে আপনার জীবনের ধারা নির্ণয় করা সম্ভবপর হইলেও স্ত্রীজাতির পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে, কারণ জীবনে একটা বিশিষ্টতা রক্ষার অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মাতৃত্বে পরিণত হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। পরিণীত অবস্থাতেই স্ত্রীজাতির জীবনের আরম্ভ। স্ত্রীজাতির বিশেষত্ব অপেক্ষা সাধারণত্ব অধিকতর বাঞ্ছনীয়। অতএব বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির সাধারণ শিক্ষাই ন্যায়সঙ্গত, বিবাহের পর পত্নী না হয় স্বামীর অবস্থা বুঝিয়া জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কারণ, স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও স্ত্রীজাতির ঠিক মনের মত পতিলাভ দুর্লভ। রোমিও জুলিয়েটের ভিতর অগাধ প্রণয় এবং রূপ লিপ্সা ছিল কিন্তু উহাদের উন্মাদনা এত অধিক ছিল যে হয় ত বিবাহ হইলে তাহার অব্যবহিত পরেই ডাইভোর্স ব্যাপারও ঘটিয়া যাইত। Conventional ilss of our civilizationএর রচয়িতা Max Nordau ও ইহার সমর্থন করেন। যেখানে যত রূপজ ঘনিষ্ঠতা, সেখানে তত বিচ্ছেদ ;—পাশ্চাত্য জগতে এইরূপ ঘটনা প্রত্যহ ঘটিতেছে। যাহা হউক, প্রথম হইতে স্ত্রীজাতির সংসারোপযোগী সাধারণ বিষয়গুলি শিখিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর সহধর্ম্মিনী হওয়াই স্ত্রীজাতির অভিপ্রেত। সহধর্ম্মিনী হওয়া অধীনতা নহে, সহযোগিতা—কর্ত্তব্যে সহায়তা। যেখানে একটা কর্ত্তব্যের উপর জাতীয় কল্যাণ এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে সেখানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই একটু মস্তক অবনত করিয়া চলিতে হয়—বর্ত্তমান হইলে পরস্পর নির্ভরতা বিশেষ প্রয়োজন—স্বামী স্ত্রীকে নির্ভর করিয়া জাতীয় কল্যাণ বিধান করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। Stendhal বলেন,—

"What an excellent adviser a man would find in his wife if she knew how think ! The ignorant are the enemies of the education of women."

কিন্তু এই চিন্তাশীলতা ও শিক্ষাকে সুপথে না চালাইলে, শিক্ষা দ্বারা যেমন সুধা উত্থিত হয়, তেমনি গরলেরও উদ্গীরণ বড় কম হয় না। আমরা চাহি সুশিক্ষা, কেবল উচ্চ শিক্ষা নহে। এমন শিক্ষা আবশ্যক যাহাতে স্ত্রীজাতির অহমিকা বৃদ্ধি না পায়, অথচ স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণকে মার্জ্জিত করিয়া যথার্থ কল্যাণের দিকে প্রধাবিত করে। আমাদের উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গমহিলাগণ কেবল অভিমান এবং অহঙ্কারেই স্ফীতা হইতেছেন উচ্চশিক্ষিতা হইয়া তাঁহারা কেবল fashion এবং fancyর ক্রীতদাসী হইয়া উঠিতেছেন। এইরূপ শিক্ষায় নারীজীবনের সফলতা

কোথায়? পাশ্চাত্য জগতে ত উচ্চশিক্ষিতাগণের সন্তানোৎপত্তি একটা আকস্মিক (accidental) ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। যে উচ্চশিক্ষা জীবনে কেবল কৃত্রিমতারই পোষক, আমরা তাহার একান্ত বিরোধী। যে অনুশীলনে একটা উপকারিতা বা সহযোগিতা নাই, আমরা তাহারও বিরোধী। আত্ম-তৃপ্তি এবং বিদ্বেষ-বুদ্ধিই জগতের এখন নিয়ামক হইয়াছে আন্তরিকতার অভাবে কি সমাজক্ষেত্রে কি শিক্ষাক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে।

গ্যাঁরো স্ত্রীজাতির শিক্ষার একটি সুন্দর পথ বলিয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,

"But it should be clearly understood that we have not to teach her everything, but to fit her to learn everything, by giving her a taste for study and an interest in every subject."

কেবল স্ত্রীজাতি কেন? গ্যাঁরোর এই উপদেশটি আমাদের সুকুমারমতি যুবকদিগেরও অনুধাবনের বিষয়। আশা করি বঙ্গীয় অভিভাবকগণও গ্যাঁরোর এই উক্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন।

কেবল ভারতবর্ষই নহে, জগতের সর্ব্বত্রই এখন শিক্ষা-সমস্যার যুগ। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ কেবল পরীক্ষা লইয়া, এবং পাশ করাইয়াই খালাস, কিন্তু পড়ুয়ার জীবনে যে কি অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে তাহার সমাধানে একান্ত বিমুখ। অর্থকরী বিদ্যার বিষময় ফল আজ জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাশ করিয়া কোন বিভাগেই আর চাকুরী মিলিতেছে না, জীবনের লক্ষ্য স্থির হইতেছে না, জীবিকার্জ্জন ঘটিয়া উঠিতেছে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে কি করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। অন্যোপায় না দেখিয়া তাঁহারা পাঠ্যপুস্তকের ভারই বৃদ্ধি করিতেছেন এবং পরীক্ষা কঠোর করিয়া তুলিতেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ একটা জাতীয় ধ্বংসের সর্ব্বপ্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। পাশ্চাত্য-জগৎ একে উচ্চশিক্ষিত পুরুষদিগের দাবীই মিটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না তাহার উপর সহস্র সহস্র পাশ করা নারীর আবেদন। এই পাশ্চাত্য মোহকে পড়িয়া আমরাও মজিতে বসিয়াছি।

বার্লিন "Gegenwart" শিক্ষিতা মহিলাগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

They are taught far too many useless things, dates, names and rules, which will be of no use to them later, while we neglect what is of incomparably geater inportance to form and develop the future mother." স্ত্রীজাতিকে "Walking encyclopaedias" সৃষ্টি করিয়া ইউরোপ আজ যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও অনুতপ্ত; আর আমরা এমনি অন্ধ সেই অনুতপ্ত ইউরোপেরই সভ্যতার ক্রীতদাস ও নকলনবীশ হইবার জন্য লালায়িত। ঠিক আমাদিগের নীচাশয়তাপূর্ণ জীবনে ইউরোপ আজ ভবিষ্যতের চিন্তায় জাগরিত এবং আপনার কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায় ম্রিয়মান আর আমরা তাহারই আবর্জ্জনারাশির অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত!

শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা এখনও ধরিতে পারি নাই। অর্থকরী এবং প্রতিযোগিতামূলক বিদ্যার এতাদৃশ বৈষম্য এবং

বিপ্লব আসিবেই। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে যত-দিন না সহযোগিতার ভাব প্রবর্ত্তিত হইতেছে ততদিন হাহাকার উঠিবেই বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে নাই কেবল কঠোর পরীক্ষা এবং গণ্ডীদ্বারা প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্র উত্তরোত্তর আবদ্ধ ও দুর্গম করিয়াই তুলিতেছে। পাশ করিতে পারিলেই ছাত্রবৃন্দ আপনাদের জীবনের খেলা সাঙ্গ বলিয়া মনে করে, আর যেন তাহাদের জীবনের কোন উচ্চাভিলাষ নাই। ইহাই কি যথার্থ ছাত্র-জীবনের লক্ষণ? শিক্ষার শেষ কোথায়? শিক্ষা যে জীবনব্যাপী সাধনা। অর্থের সঙ্গে, পদমর্য্যাদার সঙ্গে প্রকৃত সরস্বতীর বরপুত্রগণের যে কোন সম্বন্ধ নাই।

"Lawyears and Doctors ride
And scholars foot it by their side"

(Barton's Anatomy of Meloncholy.)

কি পুরুষজাতিতে, কি স্ত্রীজাতিতে শিক্ষার একটি ঝোঁক ধরাইয়া দিতে হইবে; তাহাই প্রকৃত শিক্ষাদান। এই শিক্ষার অগ্নি একবার জ্বলিতে আরম্ভ করিলে তাহার আর নির্ব্বাণ নাই। একমাত্র এইরূপ আগ্রহ-সৃষ্টি দ্বারা জীবন সংগঠিত ও পরিমার্জ্জিত হওয়া সম্ভব নহেৎ কেবল পাশ করা শিক্ষার কোন ফলোদয়ই হইবে না। যে ছাত্রজীবন আপনার আগ্রহে আপনি পুষ্ট তাহাতে শিক্ষার ক্লান্তিবোধ হইবে না—অভিনিবেশ আপনা হইতেই আসিবে। কর্ম্ম যেমন কাহারও পক্ষে পাশ, কাহারও পক্ষে নীলা—শিক্ষাও তেমনি কাহারও পক্ষে বন্ধন, কাহারও পক্ষে আনন্দের প্রস্রবন বা স্বাধীনতার আকাশ। কোন বিষয়ে জ্ঞানের বিস্তার অপেক্ষা আগ্রহের সৃষ্টি (to create a taste) করাই প্রকৃত শিক্ষা। এই জন্যই জ্ঞানের অপেক্ষা ভক্তি বড়। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের শিক্ষার স্বধর্ম্ম ও তাহাই ছিল। গুরুগৃহে অগ্রে ভক্তি শিক্ষা করিতে হইত। প্রত্যেক ছাত্র-জীবনে এই ভক্তিধর্ম্মের পুনরুদ্রেক করিতে হইবে তবে প্রকৃত শিক্ষার আমরা প্রবর্ত্তন করিতে পারিব। দৈহিক বৃদ্ধির একটা গণ্ডী (age limit) আছে কিন্তু আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কোন গণ্ডী নাই—মানসিক শিক্ষা আজীবনব্যাপী। অগ্রে দৈহিকবল, নৈতিক বল বিধিমত অর্জ্জন কর। সেই হিন্দুর স্বধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য, আচার, বিনয়—শিক্ষাকর, ভক্তি জাগাও, জীবনের গতি স্থির কর তবে যথার্থ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইও। শিক্ষা ছেলেখেলার সামগ্রী নহে—শিক্ষা যে যোগ—চিত্তচাঞ্চল্য—জীবনের স্থিরতাই হয় না—শিক্ষা কেমন করিয়া হইবে? যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ শিক্ষাও তাহাই। বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রীগণ কি তদনুরূপ জীবন গঠিত করিতেছেন?

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং তাঁহাদের উচ্চ ভাবাপন্ন অভিভাবকগণ গাঁয়োর নিম্নলিখিত মন্তব্যটি কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন? প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ কি? গ্যাঁয়ো বলিতেছেন,—

"Less refinement in the ideas is needed, less erudition in the memory less history and literary theories, more moral and aesthetic ideas, more manual training, more energy in the will, more practical worldly wisdom, more talent for invention."

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা

দেওয়া হইতেছে তাহা গ্যাথোর এই সারগর্ভ উক্তিগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যে রূপ আদর্শে পরিচালিত হইতেছি তাহা আমাদিগের সমাজের ভবিষ্যতের পক্ষে বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর নহে। ইহা যেন আমরা মনে রাখি, সর্ব্ববিষয়ে উদ্দাম স্বাধীনতা-দানের অপেক্ষা, জীবনে সংযম (discipline) ও সুনিয়মের প্রতিষ্ঠা অধিকতর সমাজহিতকর। এই সংযমই হইতেছে জীবনের আসল শিক্ষা। ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদের প্রবর্ত্তক মহামতি Kant ও তাঁহার Ueber Lädagogik এ এই discipline এর দিকেই সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন। আমাদিগের শাস্ত্র বলিয়াছে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। অধ্যয়নকে তপস্যা বলা হইয়াছে, অধ্যয়ন কেবল পাশ করিয়া ডিগ্রোমা-প্রাপ্তি নহে, অধ্যয়নকে কার্য্যে পরিণত করাই ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য তজ্জন্যই গ্যাথো বলিয়াছেন, less history and literary theories, more practical worldlly wisdom. সকল বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া ছাত্রজীবনের এই তপস্যাকে সবল করিতে হইবে। তপঃ দ্বন্দ্ব সহনম্। কিন্তু আমরা কি করিতেছি? সহিষ্ণুতা-শিক্ষার পরিবর্ত্তে আমরা জীবন-প্রারম্ভেই বিলাসিতা ও বাবু গিরির উপকরণ লইয়াই ছাত্র-ছাত্রীর সমক্ষে ধরিতেছি! ইহাই কি আমাদিগের সন্তানসন্ততির উপর কর্ত্তব্যপালন হইতেছে? স্ত্রীস্বাধীনতার দোহাই দিয়া আমরা আমাদিগের অন্তঃপুরে অবাধ বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেছি। ইহাতেই কি মাতৃস্বরূপা সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা নারীজাতির প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করা হইতেছে? নারীজাতির দায়িত্ব কিরূপ? এবং নারীজাতির উপর আমাদিগের কর্ত্তব্যই বা কিরূপ? তাহা অগ্রে ভাল করিয়া বুঝিয়া যেন আমরা নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করি। বোধ করি, জগতে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্র স্ত্রীজাতির প্রাপ্য ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যতটা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াছে, এই বিংশশতাব্দীতেও জগতের সভ্যতা-গর্ব্বিত অপর কোন জাতিই তদনুরূপ উদার ভাব দেখাইতে সক্ষম হয় নাই। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী," ইহাই হিন্দুর সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান বাণী। "জননীর পদতলেই স্বর্গরাজ্য অবস্থান করিতেছে" মুসলমানের কোরাণ ইহাই কহিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জগৎ নারীজাতিকে প্রাচ্য-জগৎ অপেক্ষা কিরূপ অধিকতর মর্য্যাদা দান করিয়াছে তাহাই বিবেচ্য। স্বাধীনতা দান এবং মর্য্যাদা রক্ষণ এক কথা নহে। স্বাধীনতা দ্বারা কতকটা স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রক্ষা হয়, তাহাও বিবেচ্য। তুলনা এবং বিচার করিয়া দেখিলে স্ত্রী-স্বাধীনতার অপেক্ষা স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার মূল্য অধিক বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য আমরা বলিতেছি না যে আমাদিগের নারীবিষয়ক রীতি নীতিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। প্রয়োজন এবং অবস্থানুসারে আমাদিগের নারীজাতির বিধিনিষেধের পরিবর্ত্তন আবশ্যক, কিন্তু তজ্জন্য আমরা পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষা-দীক্ষাকেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে একান্ত নারাজ।

নারীজীবনের প্রকৃত সার্থকতা অন্তঃপুরের শান্তি-স্থাপনে ও গৃহ-কর্ম্মে, নারীজীবনের প্রকৃত স্বাধীনতা সন্তান-পালনে। নারীর ষোলআনা প্রভুত্ব তাঁহার পুত্র কন্যার উপর, নারীর প্রভুত্ব তাঁহার স্বামীর উপর নহে। নারীজাতিই মনুষ্যসমাজের ভাগ্য-বিধাত্রী,

তাঁহার চরিত্রবলের দ্বারাই মানবজীবনের চরিত্র গঠিত হয়, তাঁহার সহৃদয়তার দ্বারাই মনুষ্যজীবনের যাহাকিছু সদ্‌গুণ বিকসিত হয়। আশৈশব স্ত্রীজাতি যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে গঠিত ও বর্দ্ধিত হন, উত্তর-কালে অবশ্যম্ভাবীরূপে নারী-অঙ্ক-বর্দ্ধিত সমাজ ও সেই শিক্ষা দীক্ষার ফলভোগ করে। বয়োপ্রাপ্ত অবস্থায় স্ত্রীজাতি যদি সমাজকে মহনীয় আদর্শে চালিত করিতে চাহেন তবে বাল্যকাল হইতেই নারীজাতিকে তাঁহাদের স্বভাবোচিত উচ্চ লক্ষ্য বক্ষে ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে হইবে। ভোগের অপেক্ষা ত্যাগের দিকটা, আত্মসুখ অপেক্ষা পরার্থের দিকটা যেন তাঁহার খুলিয়া যায়। বাহিরের স্বাধীনতার অপেক্ষা তাঁহাদের অন্তরের স্বাধীনতা যে আরও অধিক তাহা যেন নারীজাতি ভুলিয়া না যান এবং তাঁহা-দের স্বাধীনতার লীলাভূমি যে অন্তঃপুর, ইহাও যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান। অন্তঃপুরের স্বাধীনতাই স্ত্রীজাতির বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিধান। কারণ, গৃহকর্ম্মেই নারীর অপূর্ব্ব অধিকার—গৃহকর্ত্রীরূপেই সমগ্র বিশ্ব-কল্যাণের মাঝেই তাঁহাদিগের চিরকালের অধিষ্ঠান। নারীই সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। একমাত্র নারীই এই সংসার-ভাণ্ডারের অধিকারিণী—নারীর এই গুরুতর দাবিদের কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। একমাত্র সহৃদয়তা এবং সতীত্বের দ্বারাই নারী এই বিশ্বসংসার শাসন করিতে পারেন। হৃদয়ের স্বাধীনতাই জগতে প্রকৃত স্বাধীনতা। সতীত্ব এবং লজ্জাই সেই স্বাধীনতা রক্ষার অমোঘ অস্ত্রদ্বয়। যে নারীর হৃদয়ে তেজ এবং চক্ষুলজ্জা বর্ত্তমান, তিনি নিজের স্বাধীনতা নিজেই রক্ষা করিতে পারেন, তাহাতে পুরুষের সহায়তার আবশ্যক হয় না। স্বামীহীনা বিধবা এই হৃদয়ের তেজ এবং চক্ষুলজ্জা দ্বারাই আপনাকে আপনি রক্ষা করিয়া যান। এই হৃদয়ের তেজ এবং চক্ষুলজ্জার অনুকূল করিয়া হিন্দু নারীর যথার্থ সুশিক্ষার পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। সংসারে এইরূপ পবিত্র স্বভাবা নারীজাতির অনুশাসন দ্বারা যে সমাজশিশু পরিবর্দ্ধিত ও সুগঠিত হইবে তাহা একদিন যে জাতীয় কল্যাণে সিংহ-বিক্রম প্রকাশ করিবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, দুঃখ এবং সেবাই হইতেছে জাতীয় জীবন গঠনের কয়েকটি উপাদান—এই সব সমবেদনার দ্বারা যে মনুষ্যত্বের সৃষ্টি হইবে, এ জগতে তাহার তুলনা কোথায়? স্বাধীনতা এবং উচ্চশিক্ষার নামে আমরা স্ত্রীজাতির অবমাননা যেন আর নীরবে সহ্য না করি এবং যাহাতে আমাদিগের অন্তঃপুরে প্রকৃত শিক্ষার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হয় তদ্বিষয়ে যেন আর আমরা নিশ্চেষ্ট না থাকি। স্ত্রীজাতির প্রকৃত শিক্ষা এবং সম্মানরক্ষা ব্যতীত আমাদিগের হৃত-সর্ব্বস্ব সমাজের আর কল্যাণ নাই।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

পরমাণুবাদ

(Atomic theory).

ডিমক্রিটাস প্রমুখ কতিপয় গ্রীক পণ্ডিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদের অগ্রনেতা। ইহাঁরা জগৎ ব্যাপারটাকে দেশ (space) ও পরমাণু দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অসংখ্য পরমাণু অনন্ত শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে অনন্ত বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই পরমাণুগুলি নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় নহে; ইহারা শাশ্বত, নিত্যবস্তু। প্রকৃত প্রস্তাবে সৃষ্টি বা বিনাশ বলিয়া জগতে কোন পদার্থ নাই; সৃষ্টি কেবল অবয়বের ঘনসন্নিবেশ, সংযোগ মাত্র; ধ্বংস কেবল এই অবয়ব সংযোগের বিয়োগ মাত্র। বিশ্বজগতে জড় ও শক্তির পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয়, হ্রাসবৃদ্ধি রহিত। এই পরমাণুনিচয় সমজাতীয় (homogeneou's), কেবল আকৃতি, বিন্যাস ও সংস্থান সম্বন্ধে পরস্পর বিভিন্ন। ইহারা চলিষ্ণু হইয়া সকল বস্তু আরম্ভ করে। ইহাদিগকে চলিষ্ণু করে কে? ইহার উত্তরে ইহাঁরা বলেন,—পরমাণু স্বতঃই চলিষ্ণু। অনন্ত শূন্যে পড়িতে পড়িতে অপেক্ষাকৃত ভারি পরমাণুগুলি দ্রুততর বেগে পড়িতে থাকায় অপেক্ষাকৃত লঘু পরমাণুগুলির গায়ে ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কা পার্শ্বদেশে লাগিয়া উহাদের ঘূর্ণগতি উৎপন্ন করে;—এই গতিই জগৎ রচনার প্রারম্ভ। (১)

এই প্রকারে পুরাকালে ভারতের বাহিরে কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি নাস্তিক্য ও পরমাণুবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং সেই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদের উৎপত্তি।

আমাদের দেশে চার্ব্বাক, গোতম ও কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকেরাও পরমাণুবাদের প্রচারক। তবে ডিমক্রিটাস ও চার্ব্বাক যেমন তাঁহাদের পরমাণুবাদকে নাস্তিক্যে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, গোতম কণাদ সে প্রকার করেন নাই; ইহারা পরমাণু স্বীকার করিলেও তাহাদিগকে স্বতন্ত্র, স্বতঃপ্রবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু তাহাদের ক্রিয়া ঈশ্বরেচ্ছা পরতন্ত্র, ইহা তাঁহারা প্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাঁদের পরমাণু দার্শনিক তত্ত্ব (metaphysical in their nature), আর ডিমক্রিটাসের পরমাণু অনেকটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (scientific in their nature)। ইহাঁদের পরমাণুবাদ আলোচনার পূর্ব্বে ডিমক্রিটাস প্রভৃতির পরমাণুবাদটি বিচার করিয়া দেখা যাউক।

১। বলা হইয়াছে পরমাণুগুলি অনন্তশূন্যে অনাদিকাল হইতে পড়িতে পড়িতে পরিশেষে দলবদ্ধ হইয়াছে। এখানে জিজ্ঞাস্য, পতন শব্দের অর্থ কি? নিম্নাভিমুখী গতিই পতন-শব্দবাচ্য। কিন্তু অনন্তশূন্যে ঊর্দ্ধাধঃ বিভাগ নিষ্পত্তির উপায় কি? কোন একটা বিশেষ অবস্থান আশ্রয়পূর্ব্বক দিক বিভাগ সিদ্ধ হয়। অনন্তশূন্যে সে অবস্থানটি কি? ইহা নির্ণয়

1. In the eternal fall through infinite space, the greater which fall more quickly, strike against the lesser, and lateral movements and vortices that thus arise are the commencement of the formation of words. [Lange's History of Materialism.]

করিতে না পারিলে দিক-বিভাগই সপ্রমাণ হয় না। দিকবিভাগ অবধারিত না হইলে, পতন, উৎপতন প্রভৃতি ক্রিয়ার কোন অর্থ প্রতীত হয় না।

২। বলা হইয়াছে পরমাণুগুলি সমজাতীয়; কিন্তু তাহা নহে, উহারা বিভিন্ন জাতীয়। অক্সিজেনের পরমাণু ও হাইড্রজেনের পরমাণু এক জাতীয় নহে, ইহা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

৩। বলা হইয়াছে পরমাণুগুলির মধ্যে ছোট বড়, লঘু গুরু ভেদ আছে। কিন্তু পরিমাণ-বৈষম্য ব্যতীত এ প্রকার হইতে পারে না। পরিমাণবৈষম্য স্বীকার করিলে উহাদের বিভাগাভাবও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হয়। কেন না পরিমাণ স্থানব্যাপ্তির পরিচায়ক। পক্ষান্তরে যদি উহাদের বিভাজ্যতা স্বীকার্য্য হয়, তবে উহাদের মৌলিকতার ব্যাঘাত হয়—ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে।

৪। গুরু পরমাণুগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুত-বেগে পতিত হয় ও লঘু পরমাণুগুলি অপেক্ষাকৃত ধীরবেগে পতিত হয়; সুতরাং বুঝা যাইতেছে গুরু পরমাণুগুলি উর্দ্ধ দেশে ও লঘু পরমাণুগুলি অধোদেশে অবস্থিত। কেন না উহার বিপরীত অবস্থায়, গুরু পরমাণুগুলি পতনকালে লঘু পরমাণুগুলির গায়ে ধাক্কা দিতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, সমস্ত শূন্যের উর্দ্ধাধঃ বিভাগ সপ্রমাণ নহে। অতএব গুরু লঘু পরমাণু-গুলির পতনাদি অব্যাখ্যাত রহিয়া যাইতেছে। আরও দ্রষ্টব্য। প্রকৃত প্রস্তাবে লঘু পরমাণু-গুলিই উর্দ্ধদেশে এবং গুরুপরমাণুগুলি অধোদেশে থাকে, ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। এ নিয়ম লঙ্ঘন না করিলে গুরু লঘু পরমাণুর ঐ প্রকার সংস্থান নির্দ্দেশ অসম্ভব।

৫। নির্ব্বিশেষ-শূন্যের বাধা দিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং পরিমাণগত তারতম্য সত্ত্বেও এবম্বিধ শূন্যের মধ্য দিয়া পরমাণুগুলি সমান বেগেই পড়িবে। পতন বেগের তারতম্য পরিবাহনের (medium) ঘনত্বের তারতম্যের উপর নির্ভর করে; কিন্তু আকাশ যখন সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষ বা সমঘন, তখন পড়ন্ত পরমাণুগুলি সমান বেগেই পড়িবে। আর পড়ন্ত পরমাণুর গতি সরল রেখানুগামী। সুতরাং সরল রেখায় ও সমান বেগে পড়িতে থাকিলে পরমাণুগুলি, লঘু গুরু হইলেও কদাচ পরস্পর সংঘাত বা সম্বন্ধ হইতে পারে না। সরল রেখা হইতে কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক না সরিলে তাহাদের পারস্পরিক সংঘর্ষই অসম্ভব। কোন একটা বাহ্য শক্তিও স্বীকার করিতে ইহাঁরা অনিচ্ছুক। সুতরাং কোন মতেই কেবল পরমাণু দ্বারা জগৎ রচনা সপ্রমাণ হইতেছে না।

এক্ষণে অস্মদ্দেশীয় পরমাণুবাদের আলো-চনা করা যাউক। আমাদের দেশে গৌতম ও কণাদ পরমাণুবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তবে তাঁহারা তদতিরিক্ত আরও একটা শক্তি স্বীকার করেন। কেবল পরমাণু দ্বারা সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহাদের পরমাণু সিদ্ধির যুক্তি এই প্রকার "যৎসাবয়বং তৎ স্বপরিমাণাদণুত্তরপরিমাণসংযোগসচিব স্বসমাণজাতীয়ানেকদ্রব্যারব্ধং দৃষ্টং। যথা তন্ত্বারব্ধ পট ইতি। এবং যৎকিঞ্চিৎ সাবয়বং দ্ব্যণুকাদি কার্য্যং তৎসর্ব্বমেবম্বিধদ্রব্যারব্ধং ইতি। অতোঽত্যন্তাণুপরিমাণা নিরবয়বাঃ সংযোগসচিবাঃ কার্য্যেন পার্থিবত্বাদিনা সমানজাতীয়া নিত্যা বহবশ্চ পরমাণবঃ সাবয়ব দ্রব্যানামারম্ভকাঃ সিদ্ধাঃ।" পুনশ্চ—"অণুপরিমাণুত্তারতম্যং ক্বচিদ্বিশ্রান্তং পরিমাণ-তারতম্যত্বাৎ মহৎপরিমাণতারতম্যবৎ।

ইত্যনুমানাগ্রহণেপকর্ষ বিশ্রান্তিভূমিত্বেনাণূনাং পরতো বিভাগাসম্ভবাৎ।" ৫

কেহ কেহ বলেন, "যতঃ পরং ন বিভাগঃ স এব নিরবয়বঃ পরমাণুঃ।" দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ন্যায় বৈশেষিকের পরমাণু ন্যূনাধিক বিন্দুর সহিত সমধর্ম্মাক্রান্ত। ইহাদের অবস্থিতি আছে কিন্তু অবয়ব অর্থাৎ অংশ নাই। ইহারা বলেন বিভাগের যদি একটা বিশ্রান্তিস্থল স্বীকার না করা যায়, তবে অনবস্থা-প্রসঙ্গ হয়। এবং সুমেরু সর্ষপের তুল্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। একটি মাত্র সর্ষপকে যদি অনন্তকাল বিভাগ করা সম্ভব হয়, তবে বুঝিতে হইবে উহা অনন্ত অবয়ব-যুক্ত। সেই প্রকারে সুমেরু শৈলকেও অনন্তকাল বিভাগ করা যাইবে; অতএব তাহাও অনন্তাবয়ব আরব্ধ, ইহাও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং সর্ষপ ও সুমেরু—এই উভয় দ্রব্যেই অনন্ত অবয়ব স্বীকার্য্য হইতেছে। যদি তাহাই স্বীকার্য্য হয়, তবে উভয়ই তুল্য হউক। কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ বাধিত। এই সকল কারণে পরিমাণ বিভাগের একটা বিশ্রান্তিস্থল অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; সেই বিশ্রান্তিস্থলই পরমাণু।

দেখিতে পাওয়া যায় সাংখ্যকার ও বৈদান্তিকগণ এই পরমাণুবাদ গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। সাংখ্যকারের মতে পরমাণু নিত্য দ্রব্য নহে; উহা প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতি ও পুরুষ—সাংখ্যকারের মতে এই দুই মূলতত্ত্ব। ইহার মধ্যে জাগতিক সর্ব্বপ্রকার বিকারই প্রকৃতির পরিণাম। পরমাণু প্রভৃতি মৌলিক তত্ত্ব নহে।

বৈদান্তিকগণ আরও তীব্রভাবে পরমাণুবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিগুলিই প্রদর্শিত হইতেছে। শঙ্কর বলেন ন্যায় বৈশেষিকের স্বীকৃত পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হইবার যোগ্য নহে; অতএব নিরর্থক। এতাদৃশ পরমাণু স্বীকারে লাভ কি? যদি উহারা পরস্পর মিলিয়া দ্রব্যের আরম্ভকই না হইতে পারিল, তবে মিছামিছি তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিব কেন? কেন তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না, তাহা বলা হইতেছে।

"সংযোগশ্চাণোরয়ন্তরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্যাদেকদেশেন বা, সর্ব্বাত্মনা চেদ্বপচয়াণুপত্তেরণুমাত্রত্ব প্রসঙ্গো দৃষ্টবিপর্য্যয় প্রসঙ্গশ্চ। প্রদেশবতো দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস্য দৃষ্টত্বাৎ। একদেশেন চেৎ সাবয়বত্ব প্রসঙ্গঃ। পরমাণূনাং কল্পিতাঃ প্রদেশাঃ স্যুরিতি চেৎ কল্পিতানামবস্তুত্বাৎ, অবস্তুনশ্চ সংযোগ ইতি বস্তুনঃ কার্য্যান্তাসমবায়িকারণং ন স্যাৎ, অসতি চাসমবায়ি কারণে ন্যায়কাদি কার্য্য দ্রব্যং নোৎপদ্যতে।" ১।

আপত্তিটি একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি। বলা হইয়াছে পরমাণুর অবস্থিতি (position) আছে, কিন্তু অবয়ব (parts) নাই। এখানে অবস্থিতি অর্থে অবশ্যই দৈশিক অবস্থিতি (spatial position) বুঝিতে হইবে। একণে দৈশিক অবস্থিতির অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করিলে বলা যাইতে পারে, দৈশিক ব্যাপ্তিই (extension) উহার অর্থ। কিন্তু ব্যাপ্তিত্ব বলিতেই বিভাগশীলত্ব পাওয়া যায়। সুতরাং যাহা বিভাজ্য তাহা পরমাণু শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কেন না তাহা অবয়ব-

৫। শ্রীমৎ ব্রহ্মসিদ্ধি—প্রথম মূলের প্রহারঃ।

১। বেদান্তদর্শনভাষ্য—২য় পাঃ অঃ, ১২।

সমষ্টি হইয়া পড়ে, মৌলিক তত্ত্ব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি এই ব্যাপ্তিত্ব নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বহু ব্যাপ্তিহীন পরমাণুর সংযোগে কোন প্রকার ব্যাপ্তি বা বৈষিক কারণে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক পরমাণুই—ব্যাপ্তি-হীন, সুতরাং তাহাদের বহুর সংযোগও ব্যাপ্তিহীন হইবে। একটি শূন্যও যদি সংখ্যা-বাচক না হয়, তবে শত সহস্র শূন্য সংযোগেও সংখ্যার উৎপত্তি হইবে না, ইহা বুঝা যাইতেছে।

বৈদেশিক কোন দার্শনিকও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন; তাহা পাঠকের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম। ২।

"The assumption of a plurality of extended elements—even if they are conceived as infinitely small—can never be a final assumption for thought. We must give up either the unity of the atoms or their extension; in an extended atom every effect requires time, and is propagated from part to part; hence these parts would be more fundamental unities than the atoms themselves. If the atomic concept is to be a final one we must exclude all extension and conceive atoms as centres of force, each of which..... are starting points for the working of the original substance."

শঙ্করের অন্য আপত্তি পরমাণুর স্বভাব লইয়া। অপিচাণবঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা বা নিবৃত্তি স্বভাবা বা উভয়স্বভাবা বা অনুভয়স্বভাবা বাভ্যুপগম্যেরন্ গত্যন্তরাভাবাৎ চতুর্ষ্বপি নোপপদ্যতে। প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে নিত্যমেব-প্রবৃত্তের্ভাবাৎ প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গঃ। নিবৃত্তি-স্বভাবত্বেঽপি নিত্যমেব নিবৃত্তের্ভাবাৎ সর্গাভাব প্রসঙ্গঃ। উভয় স্বভাবত্বঞ্চ বিরোধাৎ অসম্ভবদ্দোষং, অনুভয় স্বভাবত্বে তু নিমিত্তবশাৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যোরভ্যুপগম্যমানয়োরদৃষ্টাদে-র্নিমত্তস্য নিত্যসন্নিধানান্নিত্যা প্রবৃত্তি প্রসঙ্গঃ, অতন্ত্রত্বেঽপ্যদৃষ্টাদের্নিত্যপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গঃ, তস্মাদনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ। †

অর্থাৎ পরমাণুর চারি প্রকার স্বভাব কল্পনা করা যাইতে পারে কিন্তু সেই চারি প্রকারের কোন প্রকারই যুক্তিসহ বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ যদি পরমাণু প্রবৃত্তি-স্বভাব হয়, তবে কি হয়? প্রবৃত্তি স্বভাব শব্দের অর্থ কি দেখা যাউক। প্রবৃত্তি অর্থে গতিপ্রবণতা (tendency বা movement)। স্বভাব অর্থে স্বভাব (essence, nature)। কিন্তু প্রবৃত্তি কোন দিকে? সংহতি,-সমবায়,-সংযোগের দিকে। সুতরাং প্রবৃত্তিস্বভাব অর্থে—সমবায় অভিমুখী গতি যাহার স্বভাব (whose essence it is to tend towards integration) ইহাই প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে যে বস্তুর স্বভাব কেবল সংযোগের দিকে, তাহাদের সংযোগ সুতরাং অনিবার্য্য। কিন্তু পরমাণুর এবম্বিধ স্বভাব স্বীকার করিলে প্রলয় (disintegration) অসম্ভব হইয়া উঠে। বস্তুর ধ্বংস সিদ্ধ হয় না। অথচ জগতে বস্তুর সংযোগ বিয়োগ, সৃষ্টি ধ্বংস নিয়ত প্রত্যক্ষের বিষয়।

2. Hoffding's History of Philosophy—p. 515, Vol. II.

† বেদান্ত দর্শনভাষ্য—২য় অঃ ২য় পাঃ ১৮

দ্বিতীয়তঃ পরমাণু যদি নিবৃত্তিস্বভাব হয় অর্থাৎ যদি কেবল বিচ্ছিন্ন হওয়াই ইহাদের স্বভাব হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির পরিবর্ত্তে কেবল নিয়ত ধ্বংসই দৃষ্ট হইবে। কিন্তু জগতে সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়ই নিয়ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ যদি পরমাণুতে যুগপৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি স্বীকার করা যায় তাহা স্ববিরোধী। বিরোধী ধর্ম্মের একত্র সন্নিবেশ অসম্ভব। চতুর্থতঃ যদি পরমাণুতে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অভাবই স্বীকার করা যায় অর্থাৎ যদি পরমাণু জড়স্বভাব (absolutely inert) হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংযোগের জন্য অবশ্যই নিমিত্তান্তর স্বীকার করিতে হয়। যাহা স্বয়ং নিশ্চল, তাহার চাঞ্চল্য পরতন্ত্র, এ সিদ্ধান্ত দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। এবং যাঁহারা জড়াতিরিক্ত সত্তায় সন্দিহান, তাঁহারা কদাচ পরমাণুর পারস্পরিক সম্বন্ধ বা মিলন ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না।

অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুতে যুগপৎ আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সন্নিবেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত কতদূর বিচারসহ তাহা ক্রমশঃ পরিদৃষ্ট হইবে।

পরমাণুর অবস্থিতি আছে কিন্তু পৃথুতা (extension) নাই, ইহা স্বীকার করিলে অন্য আর এক প্রকার আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। তাহা এই :—ইহা প্রথমতঃ স্ববিরোধী; দৈশিক অবস্থিতির অর্থই পৃথুতা, দ্বিতীয়তঃ, যদি পরমাণুর পৃথুতা বা ব্যাপ্তি না থাকে, তাহা হইলে, পরমাণুও আকাশের তুল্যত্ব প্রসক্ত হয়। কেন না আকাশের যেমন দিক্‌দেশকালাবচ্ছেদ নাই, পরমাণুরও তেমনি দিক্‌দেশকালাবচ্ছেদ নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। পক্ষান্তরে, এবম্প্রকার পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে, পরমাণুর নিরবয়বত্বের ব্যাঘাত ঘটে।

অন্য আপত্তি "রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।" অর্থাৎ পরমাণুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ থাকায় উহা পরমকারণাপেক্ষা স্থূলতর, সুতরাং বিনাশশীল। আর যদি উহারা অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অগন্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে উহাদের ভৌতিকত্বের হানি হয়।

উপরি উক্ত যুক্তি বলে শঙ্করপ্রমুখ বৈদান্তিকবৃন্দ পরমাণুবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

অধুনা বৈজ্ঞানিকগণের পরমাণুবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকের পরমাণুও আনুমানিক পদার্থ,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে। এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় পরমাণুবাদ একপ্রকার পরিত্যাগই করিয়াছেন। আমি নিজে বৈজ্ঞানিক নহি, বিজ্ঞানের কোন প্রামাণিক গ্রন্থও অধ্যয়ন করি নাই; সুতরাং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বিষয়ে আলোচনা করা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা James Ward-কৃত Naturalism and Agnosticism নামক উপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইতে পারেন। আমি যাহা কিছু বলিব তাহা প্রধানতঃ সেই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াই বলিব।

প্রথমতঃ পরমাণুগুলি যদি কঠিন বস্তু হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংঘর্ষজনিত শক্তির কি ফল হয় দেখা যাউক। পরমাণুগুলি যখন কঠিন, তখন তাহাদের আকৃতি অচ্যুত; তাহারা স্থিতিস্থাপকও নহে, অস্থিতিস্থাপকও

[1] বেদান্তদর্শন ভাষ্য—২য় অঃ ২য় পাঃ ১৭।

নহে। যাহাদের আকৃতির বিচ্যুতি ঘটে না, তাহারা কখনো ঐ দুই ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব যদি পরমাণুগুলি কঠিন বলিয়াই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে একাধিক পরমাণুদ্বয়ের যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন তাহার ফল কি দাঁড়ায়? দুই পিণ্ডদ্বয়ের সংঘর্ষে, সংঘর্ষজনিত শক্তি পিণ্ডদ্বয়ের বহিরাকৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক উহাদের অবয়বের কম্পনরূপে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সংঘর্ষে দৃশ্য গতিশক্তি (kinetic energy) গূঢ় শক্তিরূপে পর্য্যবসিত হয় (converted into potential energy)। এক্ষণে পরমাণু যখন নিরবয়ব, তখন তাহাদের সংঘর্ষজনিত গতিশক্তির দশা কি হইবে? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এই গতিশক্তি (kinetic energy) তুল্য পরিমাণ প্রচ্ছন্নশক্তি উৎপন্ন না করিয়াই বিলুপ্ত হইয়াছে। (?)

দ্বিতীয়তঃ। যদি পরমাণুগুলি স্থিতিস্থাপক না হয়, তাহা হইলেও ঐ প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। Ward বলেন—

"If we decide to regard the atoms as non-elastic, then, when two collide, we must conclude that kinetic energy disappears without an equivalent amount of potential energy taking its place."

তৃতীয়তঃ। পরমাণু যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে তিনি বলেন—" If we prefer to regard them as elastic, we are then compelled to infer that their motions are instantaneously reversed, in other words, a finite momentum is produced in no time; And if we combine two, we combine these consequences both of which contradict our fundamental axioms."

প্রকৃত কথা এই যে পরমাণুর কাঠিন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম বস্তুমাত্রের পারস্পরিক শক্তির আদান-প্রদান জনিত (due to dynamical transactions between masses)। ভৌতিক বস্তুর গুণাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, তাহারা সমস্তই শক্তিবাচক। যাহাকে স্থানব্যাপ্তিত্ব বলা যায়, তাহাও শক্তির বোধক। তাই বৈজ্ঞানিক মনস্বীবৃন্দ অধুনা জড়তত্ত্বকে শক্তিতত্ত্বে বিলীন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। রসায়নবিদেরা এতকাল সন্তর হইতে আশিটি বিভিন্ন জাতীয় ভূতের মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। যথাসম্ভব উত্তাপ প্রয়োগে যে সকল ভূতকে বিচ্ছিন্ন করা যায় নাই, রাসায়নিকেরা তাহাদিগকেই মৌলিক ভূত (element) নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষায় জানা গিয়াছে উত্তাপের আতিশয্যে তথাকথিত অনেক মৌলিক ভূতই স্বকীয় উপাদানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরীক্ষকদিগের পরীক্ষাপ্রণালী বর্ত্তমান স্থলে লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন।—তবে এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রধান প্রধান মনস্বীর সুচিন্তিত অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রসিদ্ধ ভূতবিদ্যাবিৎ Sir Oliver Lodge বলেন :—

"For although it is now pretty well-known that atoms of matter are not the indestructible and immutable things they were once thought (seeing that, although we do not know how to break them

up, they are liable every now and then themselves to break up or explode, and so resolve themselves into simpler forms), yet it can be granted that these simpler forms are likewise themselves atoms, in the same sense, and that if they break up they will break up likewise into atoms: or ultimately, it may be, into these corpuscles or electrons or electric charges, of which one plausible theory conjectures that the atoms of matter are really composed." *

মহামতি Sir William Crookesএর মতে—In the centres of the hottest stars all elements are dissociated. But dissociated into what? Into that out of which they were all evolved, i.e. into prothyle—the undifferentiated basis of chemical evolution, the formless staff which is the origin of all substances. † বিজ্ঞানবিশারদ Lord Kelvin'sএর মতে বিশ্বব্যাপী সমঘন একটা দ্রব পদার্থের ঘূর্ণাই পরমাণু (the vertex motion of an ultimate homogeneous fluid). ‡

ধীমান Boscovichএর মতে—atoms were strictly masspoints; occupation of space with him was due entirely to substantial forces, not to the absolute hardness of primitive particles; and all strictly mechanical action of the push and press kind was replaced by attractions or repulsions acting at a distance." তাঁহার মতে পরমাণু শক্তির কেন্দ্রস্থল (centres of force) ব্যতীত আর কিছুই নহে। §

যাহা হউক Clerk Maxwell প্রমুখ কতিপয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কিন্তু পরমাণু বা ত্রাসরেণুকে মৌলিক তত্ত্ব ও অবিনশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। Maxwell বলেন—"The same kind of molecule, say that of hydrogen, has the same set of periods of vibrations, whether we procure the hydrogen from water, from coal, or from meteoric iron..... whether in Sirius or in Arcturus (it) executes its vibrations precisely the same time." "Though in the course of ages catastrophes have occured, and may yet occur in the heavens, though ancient systems may be dissolved and new systems evolved out of their ruins; the molecules out of which these systems are built—the foundation stones of the material universe—remain unbroken and unworn" ¶

অর্থাৎ বিশ্বান্তর্গত যাবতীয় দ্রব্যোৎপত্তির উপাদানীকৃত ত্রাসরেণুগুলি (molecules)

* Life and Matter. † Schiller's Riddle of the sphinx.
‡ Naturalism and Agnosticism.
§ Collected Papers of Clerk Maxwell Vol II.—pp. 361 ff.
¶ Collected Essayes—vol. I. pp. 79 f.

অবিনশ্বর। সকল দ্রব্য বিশ্লিষ্ট হইয়া গেলেও ইহাদের স্বরূপের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না। অন্যকথায় ইহারা "সহকারণবৎ নিত্যং।"

পাঠক Maxwell এর মত অবগত হইলেন, এখন এ সম্বন্ধে Huxleyর মত গ্রহণ করুন। Huxley বলেন—The idea that atoms are absolutely ingenerable and immutable "manufactured articles" stands on the same sort of foundation as the idea that biological species are "manufactured articles" stood thirty years ago; and the supposed constancy of the elementary atoms, during the enormous lapse of time measured by the existence of our universe, is of no more weight against the possibility of change in them...than the constancy of species in Egypt since the days of Rameses or of Cheops is evidence of their immutability during all past epochs of the earth's history. It seems safe to prophesy that the hypothesis of the evolution of the elements from a primitive matter will, in future, play no less a part in the history of science than the atomic hypothesis, which, to begin with, had no greater, if as great, an emperical foundation."*

বৃহস্পতিকল্প Herbert Spencer বলেন:—

"We come down there finally to force, as the ultimate of ultimates.*.....Matter and Motion, as we know them, are differently conditioned manifestations of force.....Matter as opposing our muscular energies being immediately present to conciousness in terms of force; and its occupancy of space being known by an abstraction of experiences originally given in terms of force it follows that forces standing in certain correlations, form the whole content of our idea of Matter." †

উপরি উদ্ধৃত প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত হইতে বুঝা যায়, জড় ও পরমাণুর ধারণা এমনই পরিবর্ত্তিত হইয়া সাংখ্যের প্রকৃতির সন্নিহিত হইতে বসিয়াছে।

স্থানান্তরে মহামতি Maxwell নিজেও অ্যাভোগ্রোর নশ্বরতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিতেছেন—

"On the other hand, the exact equality of each molecule to all others of the same kind gives it, as Sir John Herschel has well said, the essential character of a manufactured article, and precludes the idea of its being eternal and self-existent."

মহামতি আর্শেই হিকেলের শিষ্য Mecabe বলেন —

* Collected Essays—vol. I. p.p. 79.
† First Principles—pp. 167, 169.

"The astro-physicist finds a transitional matter in the heavenly bodies and now the terrestrial physicist announces that in his experiments with the new element, radium, he witnesses the actual breakdown of the ponderable atom into a form of matter he associates with electricity. In fact every modern theory of the atom implies its origin from ether or their common origin."

যাহা হউক এতকাল অণু পরমাণুগুলি যে মৌলিকত্বের আসন পাইয়া আসিতেছিল, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সেই আসন হইতে ভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছে। অম্বকেশীয় পূর্ব্বাচার্য্যেরা ভূতরাশিকে মাত্র পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এবং সেই পাঁচ জাতীয় ভূতই যোগ বিয়োগে এই বিশ্ববৈচিত্র্য গঠন করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ভৌতিক জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে, তাহার উপাদানীভূত এই পাঁচ জাতীয় ভূতই পাওয়া যায়। এবং সেই পঞ্চভূতের নাম—ক্ষিত্যপতেজ মরুৎব্যোম। বৈজ্ঞানিকবৃন্দের গবেষণায় সেই পঞ্চভূতের স্থলে প্রায় আশীটি প্রকার মৌলিক ভূত আবিষ্কৃত হইল। কালবশাৎ জগতে কতই না পরিবর্ত্তন ঘটে! অধুনাতন ভূতবিজ্ঞানবিদ্গণ, সাংখ্যাচার্য্যের ন্যায়, এই আশীটি জাতীয় ভূতকে একমাত্র মৌলিক অব্যক্ত পদার্থের পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে রাসায়নিকেরা যে অণু লইয়া লীলাখেলা করেন সেগুলি কি? এবং পারমাণবিক গুরুত্ব বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই বা কি?

রাসায়নিকের অণু (molecule) সম্বন্ধে James Ward কি বলেন শ্রবণ করুন। তিনি বলেন :—

Chemical molecules are not presented realities : in other words, a molecule—say of oxygen—is not a small body which is known to exist as an individual nitrogen, an individual of another definite species of small body. Individual chemical molecules are not known as rubies or palms are known, i.e., as instances of species and distinct from diamonds or cedars, instances of other species. The chemical molecute is a hypothetical conception. Such things may exist or the hypothesis would not be ligitimate. Whether they actually exist or not they, at any rate, serve, like certain legal and commercial fictions, to facilitate the business of scientific description. 1

If we ask for the evidence on which this generalisation (viz. conservation of matter) is founded we have to appeal to various delicate weighings, conducted chiefly by chemists for practical purposes, and very few of them really direct-

1. Naturalism and Agnosticism—vol. I. p. 109.

ed to ascertain whether the law is true or not. A few such direct experiments are now, indeed, being conducted with the hope of finding that the weight of a body does depend slightly on its state of aggregation or on some other physical property." 2

পুনশ্চ :—Supposing an atom thus broken up into electrons, its weight may possibly have disappeared. We simply do not know whether weight is a property of the grouping called an atom, or whether it belongs also to the individual ingredients or corpuscles of that atom. There is at present no evidence."3

এতাবতা আমরা দেখিতে পাইলাম পরমাণুবাদ কি দার্শনিক যুক্তি, কি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—কোনটির দ্বারাই সমর্থিত নহে।

এক্ষণে পরমাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণ সম্বন্ধে একটু কথা বলা যাউক। ভূতবিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে অনেকে এক বিশ্বব্যাপী দ্রব পদার্থের কল্পনা করিয়া পরমাণুকে তাহার ঘূর্ণাবর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। অন্যথা পরমাণুর আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হয় না। এক বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ নিত্য চিন্তাবিরুদ্ধ কি না তাহাও ভাবিবার বিষয়। Spencer এর শিষ্য Fisk বলেন :—

"Nevertheless, however verbally intellegible may be the proposition that pressure and tension everywhere co-exist, yet we cannot truly represent to ourselves one ultimate unit of matter as drawing another while resisting it." •

বাস্তবিক, বিজ্ঞানজগতে অনেক সময়ে চিন্তা-বিরোধী ব্যাপারকেও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। জগৎকার্য্য ব্যাখ্যা করিবার জন্যই মতবাদের প্রয়োজন; কিন্তু যখন সে মতবাদ চিন্তা অবিরোধী হইয়া উঠে, তখন কোন যুক্তি বলে, কাহার আদেশে, তাহাকে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বুঝা সহজ নহে। ধন্য মনুষ্যের পক্ষপাতিত্ব! ধন্য বিজ্ঞানের সম্মোহনী শক্তি!

শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী।

2, 3. Life and matter—p.

• Cosmic Philosophy—vol. I.

জড়জগতের জাতিভেদ

বা

ভাঙ্গা গড়ার বিচিত্র খেলা *

জগৎজুড়ে, জন্ম মরণের বা ভাঙ্গাগড়ার বিচিত্র অভিনয় অবিশ্রাম চলিতেছে। স্রোতোবেগে নদীর এক তট যখন ভগ্ন হয়, অপর অংশ তখন ঠিক সেইভাবে পূর্ণ হইতে থাকে এবং এইরূপে জন্ম মরণ প্রবাহটী অক্ষুণ্ণ রহে। ভাবিয়া দেখিলে, এই ভাঙ্গাগড়া-রূপ বিচিত্র ব্যাপারটিকে আমরা জাতিভেদ ও জাতিগঠন প্রক্রিয়া নামে অনায়াসে অভিহিত করিতে পারি। জাতিভেদ ও জাতি গঠনের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে ইহার ফলে, ভিন্ন জাতি সমূহ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বজাতীয় সকলে একত্র বা ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। জগৎ জোড়া ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারটির ভিতরেও এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া আমরা স্তম্ভিত হই। জীবজগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা কর, দেখিবে স্বজাতীয় সকলে একত্র অবস্থানে প্রয়াস পাওয়ায় ক্রমশঃ জনপূর্ণ বড় বড় নগরের সৃষ্টি হইতেছে; নগর মধ্যে আবার ব্যবসায়াদিভেদে বিভিন্ন পল্লী সমূহের উৎপত্তি হইতেছে। সমাজমধ্যেও এইরূপ গুণকর্ম্মানুযায়ী সমজাতিত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সমতা, দারিদ্র্য, ধনবত্তা, বিদ্যা, বয়ঃক্রম, স্বার্থ, কর্ম্মক্ষেত্র, বিভিন্ন দেশকাল ও কুলে জন্ম, ইত্যাদি বিষয়ে অবস্থার সমতা অনুসারে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে নানা-জাতি সমূহের সৃষ্টি পুষ্টি (এবং ক্ষয়ও) অহর্নিশ সাধিত হইতেছে। জগতে সর্ব্বত্র স্বজাতীয় সকলে, একটা অচিন্ত্য আকর্ষণ-শক্তি বলে পরস্পরাভিমুখে আকৃষ্ট এবং বিশ্লেষণ শক্তিপ্রভাবে ভিন্নজাতিসমূহ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেহগঠন, বংশবিস্তার প্রকৃতি ব্যাপারে অবধি এই নিয়মটি লক্ষিত হয়। দেখনা কেন কি অচিন্ত্য প্রক্রিয়ায় একই আহার্য্য-মধ্য হইতে বিভিন্ন জীবদেহের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথভাবে পুষ্টি সাধিত হইতেছে; তিক্তরসের উপাদান সমূহ নিম্ববৃক্ষে এবং মিষ্টরসের উপাদান সমূহ ইক্ষুদণ্ডে সঞ্চিত হইতেছে; এক এক জাতীয় বীজ হইতে সেই সেই জাতির বিকাশ হইতেছে। এসমস্তই, জীব ও উদ্ভিজ্জগতে জাতিভেদ ও জাতিগঠন ক্রিয়ার প্রমাণ। স্বাতন্ত্র্য সাধারণের বিরোধী ও অবাধ মিশ্রণের পক্ষপাতী হইয়া এই জাতিভেদ ও জাতিগঠন ব্যাপারটির বিলোপসাধন জন্য সময় সময় কত চেষ্টা হয় কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম উহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। দেখনা কেন, কেমন অজ্ঞাতসারে সেফিল্ড সহরটি একটি কামারপাড়া রূপে ল্যাঙ্কাশায়র একটি প্রকাণ্ড তাঁতিপাড়ায় পরিণত হইতেছে।

জড়জগৎ অবধি এই জাতিভেদ ও জাতি-

* The Making of the Earth নামক পুস্তক অবলম্বনে বিরচিত "ধরিত্রীর জন্মকথা" পুস্তকের এক অধ্যায়।

গঠন নিয়মের প্রভাব পরিমুক্ত নহে, বরং তথায় ইহা স্পষ্টতর। জড়জগতে জাতি-ভেদ আছে বলেই জল ও স্থল আজ এইরূপ পৃথক্। জড়ের মধ্যেও সমাবয় বা স্বজাতীয় সকলে একত্র থাকে বলেই, আমরা আমাদের প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যসমূহ এক এক স্থান হইতে বহুপরিমাণে সংগ্রহে সমর্থ হই। প্রস্তররাশি পর্ব্বতাকারে একত্র সঞ্চিত না রহিলে এক টুকরা পাথরের সন্ধানে যে সকলকে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইত, এত বড় বড় পাথরের বাড়ীগুলিই বা কিরূপে নির্ম্মিত হইত? ধাতু সমূহের ভাণ্ডার বা খনিগুলি বিদ্যমান না থাকিলে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ কিরূপে সম্ভবপর হইত? চূণ, করলা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ যদি নানাস্থানে হইতে তিল তিল পরিমাণে খুঁজিয়া সংগ্রহ করিতে হইত তাহা হইলে সর্ব্ববিধ সাংসারিক উন্নতি সাধন একটা ভয়ানক কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার বা সুদূরপরাহত হইত। জড়জগতেও জাতিভেদ থাকায় এরূপ হয় নাই।

জড়জগতের এই জাতিভেদ ও জাতি-গঠন পদ্ধতিটা আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি উহা সত্ত্ব রজ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ এই ভাঙ্গা গড়া ব্যাপারটির ভিতর নিম্নোক্তরূপ তিনটি প্রক্রিয়া লক্ষিত হয়। প্রথম বিনাশ বা তমোগুণের কার্য্য প্রস্তরের সুকঠিন দেহও অজরামরত্বের অতীত নহে, প্রকৃতির তমোগুণ বা বিশ্লেষণ শক্তি প্রভাবে ধীরে ধীরে নিয়তই ক্ষয় পাইতেছে। ভাঙ্গাগড়া ব্যাপারের দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিতে রজোগুণের বিকাশ; ইহার প্রভাবে ক্ষয়িত অংশসমূহ স্থানান্তরে নীত হয়। তৃতীয় অবস্থাটি সত্ত্বগুণের ক্রিয়া, ইহার প্রভাবে স্থানান্তরিত ঐ সব অংশ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নভাবে সঞ্চিত ও সজ্জিত হইয়া নূতনের সৃষ্টি পুষ্টি করিতেছে।

ভূপৃষ্ঠের যে সমুদয় অংশ প্রথমে গলিয়া গিয়া ও পরে জমাট খাইয়া প্রস্তররূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহাদের নাম primary rocks বা প্রথম জাত পর্ব্বত। এই গুলির উপরিভাগ কালসহকারে ক্ষয়িত এবং অন্যত্র পুনরায় সঞ্চিত হইয়া যে সমুদয় স্তরের বা পর্ব্বতের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের নাম secondary rocks বা পশ্চাজ্জাত পর্ব্বত।

প্রথমজাত পর্ব্বতসমূহের বিনাশ বা ক্ষয় নানারূপে সংঘটিত হয়। অম্লজান (oxygen) এবং একভাগ অঙ্গার ও দুইভাগ অম্লজান সহযোগে সমুৎপন্ন অঙ্গারাম্ল (carbon dioxide) নামক বাষ্প ও জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিলে প্রস্তর ক্ষয় পায়। বায়ুতে এই সমস্ত পদার্থই বিদ্যমান আছে। অবিরাম বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া পর্ব্বতগাত্রে লোণধরা বা মড়িচা পড়ার মত হইয়া উহা ধীরে ধীরে নিয়তই ক্ষয়িয়া যাইতেছে। বায়ুস্থিত পূর্ব্বোক্ত অঙ্গারাম্ল বাষ্প বর্ষার জলে বহু পরিমাণে দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হইয়া যায়, সুতরাং বর্ষাবারিও প্রস্তরগাত্র পচাইবার একটি কারণ। বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প প্রভাবেও পর্ব্বতগাত্র ভিজিয়া উঠে; কোথাও কোন ছিদ্র বা ফাটল থাকিলে তন্মধ্যে একটু আধটু জলকণা সঞ্চিত হয়; এই সব জলকণা আবার শীতে জমিয়া তুষাররূপে পরিণত হইবার সময় আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রস্তরগাত্রস্থ ঐ সব ছিদ্রাদি ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বড় হইতে থাকে; তা ছাড়া পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,

জলে দ্রবীভূত অম্লজান প্রভাবেও প্রস্তর পচিয়া উঠে।

জলস্রোত ও বায়ু প্রবাহে এই সব ক্ষয়িত অংশ নিয়তই স্থানান্তরিত হইতেছে, পর্ব্বতের ভিতরের অংশ বাহির হইয়া পড়িতেছে ও পুনরায় ঐ রূপে ক্ষয়িত স্থানান্তরিত ও অন্যত্র সঞ্চিত হইতেছে। এই প্রকারে প্রথম জাত পর্ব্বতসমূহের পরিণামরূপে পশ্চাজ্জাত পর্ব্বত বা স্তর সমূহের উদ্ভব হইয়াছে।

ভূগর্ভের তাপ প্রভাবে সমুৎপন্ন বলিয়া প্রথমজাত পর্ব্বতগুলি igneous বা অগ্নি সমুদ্ভূত নামেও অভিহিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণ, আমাদের যমরাজের ন্যায় পরলোকের অধিপতি একটি দেবতা আছেন বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাকে প্লুটো নামে অভিহিত করিতেন। ভূগর্ভে প্লুটোর রাজ্য ছিল। এই কারণে অগ্নি সম্ভূত পর্ব্বতগুলির আর এক নাম প্লুটোনিক্ পর্ব্বত। ঐ রূপ পশ্চাজ্জাত পর্ব্বতসমূহের মধ্যে যেগুলি প্রধানতঃ জলস্রোতে চালিত হইয়া সমুৎপন্ন তাহাদের নাম জলীয় বা aqueous পর্ব্বত এবং যেগুলি প্রধানতঃ বায়ু প্রভাবে সঞ্চিত তাহাদের নাম aeolian বা বায়বা পর্ব্বত। আকৃতি দেখিয়াই কোন স্তর বা পর্ব্বত কি ভাবে সমুৎপন্ন অনেকটা ধরিতে পারা যায়।

প্রথম ও পশ্চাজ্জাত পর্ব্বতসমূহ মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কতকগুলি পার্থক্য বিদ্যমান থাকে।

(ক) প্রথমজাত প্রস্তরগুলি দানা বাঁধিয়া সমুৎপন্ন এবং উহাতে স্বভাবজ কাচের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। দ্রবীভূত অবস্থার পর জমাট্ বাঁধিয়া উহারা এইরূপ হইয়াছে। পশ্চাজ্জাত প্রথমজাত প্রস্তরের সূক্ষ্ম ভগ্নাংশগুলি একত্র জমাট খাইয়া পশ্চাজ্জাত প্রস্তরের উৎপত্তি। এই হেতু ইহার এক নাম ক্লাষ্টিক (গ্রীক ভাষায় ক্লাষ্টস্ শব্দের অর্থ ভগ্ন)। কোন কোন বেলে পাথর প্রথমজাত প্রস্তরগুলির ন্যায় দানাদার দেখিতে হয়, কিন্তু ঐ দানাগুলি প্রথম হইতেই সমুৎপন্ন নহে, প্রথমজাত প্রস্তরের ভগ্ন দানাগুলি জমাট খাইয়া ইহারা উৎপন্ন এই হেতু বেলে পাথর গুলি পশ্চাজ্জাত প্রস্তরের অন্তর্ভূক্ত।

(খ) জলস্রোতে এবং বায়ু প্রবাহে চালিত হইয়া সমুৎপন্ন হওয়ায় secondary rock গুলি প্রায়ই চাদরের ন্যায় বিস্তৃত ও স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। Primary rock গুলি এরূপ স্তরবিশিষ্ট নহে। উহারা কখন কখন লাভা বা আগ্নেয় পর্ব্বত-নিঃসৃত দ্রবীভূত পদার্থরাশির আকারে পৃথিবীর উপরিভাগে জমাট খাইয়া বিস্তীর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে; কখন বা dykes বা sills নামে পরিচিত হইয়া ভূপৃষ্ঠের সামান্য নিম্নভাগে ঐরূপভাবে অবস্থিত রহে; আবার কখন কখন "massifs" নামে অভিহিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁইয়ের আকারে ভূগর্ভের গভীরতর প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয়।

(গ) দ্রবীভূত অবস্থায় সমুৎপন্ন হওয়ায় primary rock গুলি জীবচিহ্ন বিহীন কিন্তু secondary rock সমূহে অনেক জীব ও উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সব দেহাবশেষের ইংরাজি নাম "ফসিল"। ফসিলগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, স্তরগুলি স্থলে অথবা জলে কিম্বা নদী হ্রদ বা সমুদ্র গর্ভে সঞ্জাত জানিতে পারা যায়।

কোনরূপ ফসিল পাওয়া না গেলে পশ্চাজ্জাত প্রস্তরগুলির অণুসমূহের গঠন ও সংস্থান আলোচনা করিয়াও উহারা গভীর সমুদ্রগর্ভে, খরস্রোতবিশিষ্ট নদীতটে, অথবা বায়ু

পরিচালিত বালুকণা সমবায়ে সমুৎপন্ন ইত্যাদি অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশই বিশেষতঃ বনে জনে সমৃদ্ধিশালী উৎকৃষ্ট অংশসমূহ, এই পশ্চাজ্জাত স্তরাবলির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই হেতু ইহাদের বিষয় একটু বিশেষ ভাবে জানিয়া রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পশ্চাজ্জাত স্তরাবলি চতুর্ব্বর্ণাত্মক বা এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—বেলে পাথর, কর্দ্দম, চূণা পাথর ও কয়লা।

গৃহ-নির্ম্মাণ জন্য বেলে পাথর বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এইগুলি প্রথম অবস্থায় বালুকারাশির আকারে চূর্ণাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যে যে স্থলে কণাগুলি একটু জমাট বাঁধিয়াছে সে গুলির নাম বালির পাহাড়। কণাগুলি দৃঢ়তর ভাবে সংশ্লিষ্ট হইলে বেলে পাথর নামে অভিহিত হয়। বেলে পাথরের কণাগুলি যদি এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায় যে পাথরগুলি ভাঙ্গিবার সময় কণাগুলি জোড়ের মুখে পৃথক্ না হইয়া নিজেরা অধিক ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে ঐরূপ প্রস্তরের নাম quartzite।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বেলেপাথরের কণাগুলি quartz প্রস্তরের সূক্ষ্ম অংশ মাত্র কিন্তু অন্যান্য দেশে ভিন্ন পদার্থের কণাসমূহও দৃষ্টি-গোচর হয়। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ প্রবাল দ্বীপসমূহে কণাগুলি carbonate of lime নামক পদার্থে নির্ম্মিত; কোন কোন বেলে পাথরের কণাগুলি আবার felspar নামক পদার্থের কণাসমূহ মাত্র।

কণাগুলি এইরূপ বিভিন্ন পদার্থে রচিত হইতে পারে বলিয়া, কোন স্তর বেলে পাথর কি না নির্ণয় করিবার কালে কণাগুলির আয়তন দেখিয়া নির্ণয় করাই সুবিধা। ক্ষুদ্রতম বালুকণাগুলির ব্যাস এক ইঞ্চির পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আয়তনের হইলে, সেগুলি কর্দ্দমকণা-রূপে পরিগণিত।

কণাগুলির আয়তন একটু বড় বড় হইলে নুড়ি বা কঙ্কর নামে অভিহিত হয়। এই-গুলি কোন কোন স্থলে বালুকারাশির ন্যায় বিশ্লিষ্টভাবে পড়িয়া থাকে, অনেক সময় আবার পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রস্তর-খণ্ডে পরিণত হয়। নুড়িগুলির আকার গোল গোল হইলে ঐরূপ প্রস্তরের নাম conglomerate এবং বক্কর ও কোণবিশিষ্ট হইলে উহাদের নাম brecia। ইহাদিগকে বেলে পাথরেরই প্রকারভেদ বলা চলে।

কর্দ্দম স্তরগুলির মূল্য সহজেই বুঝা যায়। এইরূপ ভূমিই কৃষিকার্য্যের উপযোগী ও উর্ব্বর এবং জল বায়ু প্রভাবে সহজেই সমতলক্ষেত্রে পরিণত হয়। কর্দ্দম স্তর থাকিলে, জল উহা ভেদ করিয়া ভূগর্ভের ভিতর অনাবশ্যকভাবে অধিকদূর প্রবেশ করিতে পারে না, ভূমি সহজে জলহীন হয় না এবং নদী, তড়াগ, কূপ, উৎস প্রভৃতি সহসা শুষ্ক হয় না।

Carbonate of lime নামক পদার্থ চূণা পাথরগুলির মুখ্য উপাদান। এই পদার্থটি জলে bicarbonate রূপে দ্রবীভূত থাকে এবং গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে আমরা যেমন বালু কর্দ্দম প্রভৃতি ব্যবহার করি, কাঁকড়া শামুক গুগ্‌লি ঝিনুক কড়িশাঁখ প্রভৃতি অনেক জীব ও কোন কোন উদ্ভিদ সেইরূপ নিজ নিজ দেহের খোলা ও অন্যান্য অংশ নির্ম্মাণ জন্য জলমধ্য হইতে উহা সংগ্রহ করে। ইহাদের মৃত্যু হইলে এই সব অংশ ক্রমাগত সঞ্চিত এবং কালসহকারে জমাট বাঁধিয়া চূণা পাথরের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক রাসায়নিক

প্রক্রিয়া ফলেও, জল হইতে Carbonate of lime বিশ্লিষ্ট হইয়া, বহুস্থলে চুণাপাথরের উৎপত্তি হয়। চুণাপাথরগুলিদ্বারা আমাদের বহু প্রয়োজন নিত্য সিদ্ধ হইতেছে। গৃহনির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর, সিমেণ্ট, সলিলরোধক উপাদানরূপে এবং ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধিজন্য—বিশেষতঃ দাইল শ্রেণীভুক্ত খাদ্যসমূহের উৎকর্ষসাধক সাররূপে ইহা ভূরি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

পশ্চাজ্জাত পর্ব্বত বা প্রস্তর স্তরসমূহের চতুর্থ প্রকার ভেদের নাম অঙ্গারক কুল। ইহারাই আমাদের ইন্ধন ও তৈল যোগাইয়া থাকেন। উদ্ভিদ্‌কুল জীবদ্দশায় প্রধানতঃ অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট হয়; জীবনান্তে উহাদের ঐ অঙ্গারপূর্ণ দেহ স্থানে স্থানে প্রস্তরীভূত হইয়া কোল কয়লারূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মৃত্তিকা বালুকা প্রভৃতি প্রবলচাপে কালসহকারে প্রস্তররূপে পরিণত হয়; কাদা জমিয়া শ্লেট পাথর এবং বালি জমিয়া বেলে পাথরের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীনকালের উদ্ভিদ্‌পূর্ণ অরণ্যসমূহও এইরূপ পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে স্থানে স্থানে মাটি চাপা পড়িয়া প্রবলচাপে দীর্ঘকালে কয়লার খনিরূপে রূপান্তরিত হইয়াগিয়াছে।

কোল কয়লা গুলি এই পাঁচটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(১) ধূসরবর্ণের কোল বা lignite; ইহারা বনিষ্ঠাদি বংশের নহে, অন্যের তুলনায় অনেকটা আধুনিক কালে সঞ্জাত এবং দেহও বহুপরিমাণে কোমল।

(২) গৃহস্থ-সংসারে সাধারণতঃ ব্যবহৃত কঠিন ভঙ্গপ্রবণ ও কৃষ্ণবর্ণ কোল বা পাথুরে কয়লা।

(৩) গ্যাস কোল; এই জাতীয় কোল হইতে গ্যাসের আলোর উপযোগী শুভ্র উজ্জ্বল আলোক উৎপাদক ভাল গ্যাস বাহির হয়।

(৪) তৈলোৎপাদক কোল, এইগুলি মৃদুতাপে উত্তপ্ত করিয়া চুয়াইলে তৈল বাহির হয়।

(৫) (Anthracite) আন্থ্রাসাইট্ নামীয় কোল; মুদ্দার বংশে ইহারা কুলীনস্বরূপ। এবং বহু আদৃত। প্রচুর তাপ বাহির হয়, শিখা বাহির করিয়া জ্বলে না এবং ধূমের উৎপাত নাই। জাহাজ চালাইতে এই কয়লাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

Basalt এবং Granite নামক প্রস্তর, প্রথমজাত প্রস্তরের অন্তর্নিবিষ্ট। মনে কর কোন দেশে এই দুই পাথরের পাহাড় আছে। কালসহকারে এই পাহাড় ক্ষয় পাইয়া কিরূপ পশ্চাজ্জাত স্তরসমূহের সৃষ্টি করিবে বা করিয়াছে, Basalt এবং Granite এর উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া আমরা আগে হইতে জানিতে পারি। যথা———

প্রস্তরের	প্রস্তরে দৃষ্ট খনিজ সমূহের নাম	খনিজ গুলির উপাদান	পশ্চাজ্জাত স্তর সমূহের প্রকৃতি।
Granite	Basic Felspar	Silica Alumina.	কর্দ্দম।
		চূণ সোডা	চূণা পাথর। লবণ।
		Silica লৌহ Magnesia	কর্দ্দম। মণ্ডুর বা আকরিক লৌহ
	Olivine Magnetile		কর্দ্দম ও চূর্ণ পাথর। মণ্ডুর।
	Quartz	Silica	কাদা, বালি, বেলে পাথর। কর্দ্দম।
	Acid Felspar.	Silica Alumina Potash সোডা	পটাশজাত লবণসমূহ।
	শ্বেত অভ্র	Silica Alumina Potash	অভ্র কণা।

প্রথমজাত পর্ব্বতগুলি ক্ষয় পাইয়া স্থানান্তরিত হইবার প্রক্রিয়া পূর্ব্বেই একরূপ উক্ত হইয়াছে। বায়ুপ্রবাহে প্রস্তরচ্যুত সূক্ষ্ম কণাগুলি সহজে নিয়তই স্থানান্তরিত হইতেছে; জলস্রোতে বড় বড় পাষাণখণ্ড পর্ব্বতগাত্র হইতে স্খলিত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে বহু দূরে নীত হয়; ছোট ছোট নুড়িগুলির নিস্তার নাই, স্রোতের সঙ্গে চলিতে চলিতে অনবরত ঘৃষ্ট হইয়া অবশেষে চূর্ণ হইয়া যায়; স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমতঃ স্থূলতর কণাগুলি বালুকার আকারে অনন্তর সূক্ষ্মতর কণাগুলি কর্দ্দমের আকারে ক্রমশঃ বিস্তারিয়া পড়ে। নদীতে বানকালে এই অঙ্ক দেখা যায় স্রোত

যেখানে প্রস্তর সে স্থানের তলভূমি বালুকা বা কঙ্করময় এবং স্রোতোবেগ যেখানে দুর্ব্বল তথাকার তলভূমি কর্দ্দমাক্ত।

নদীর ন্যায় সমুদ্রের স্রোত ও তরঙ্গ প্রভাবেও তটভূমি ভগ্ন হইয়া প্রথমজাত পর্ব্বতসমূহের দেহাবশেষ ঐভাবে স্থানান্তরিত হয়।

জলে নানা পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, সে গুলির কি হয়? স্থলের ন্যায় জলও নানারূপ জীব উদ্ভিদে পূর্ণ। ইহারা জল হইতে বহু দ্রব্য বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া নিজ দেহ পুষ্ট করে। মৃত্যুর পর ইহাদের দেহের কঠিন অংশসমূহ সঞ্চিত হইয়া নানা দ্রব্যের ভাণ্ডার স্বরূপ হয়। শামুক, গুগ্‌লি, ঝিনুক প্রভৃতি অনেক জীবের খোলা Carbonate of lime নামক পদার্থে গঠিত; স্পঞ্জ, radiolaria, diatoms প্রভৃতি জীব-দেহের কঠিনাংশ সমূহ সঞ্চিত হইয়া একরূপ সিলিকাময় স্তরের সৃষ্টি করে। এইরূপ অস্থিসমূহের phosphate of lime নামক পদার্থে ফস্ফেট স্তর সমূহ সৃষ্ট হয়।

জলের ন্যায় বায়ুস্থিত নানা পদার্থও এইরূপে বিশ্লিষ্ট ও স্থানান্তরিত হইতেছে। আমরা নিশ্বাসের সহিত (Carbon dioxide) কার্ব্বণ নামক বিষাক্ত বাষ্প পরিত্যাগ করি; উদ্ভিদকুল কিন্তু এই পদার্থ যতক্ষণ পারে সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট হয় ও জীবনান্তে অঙ্গারস্তর সমূহের জন্ম দেয়।

অন্যান্য উপায়েও পঞ্চভূত সমূহের এইরূপ নিয়ত বিশ্লেষণ ও স্থানান্তরে আহরণ প্রক্রিয়া সিদ্ধ হইতেছে। এবং ইহাই জন্ম, মৃত্যু ও জন্মান্তর প্রাপ্তি নামে অভিহিত হয়।

রৌদ্রতাপে সাগরবারি শুষ্ক হইয়া বিস্তীর্ণ লবণস্তরসমূহ সঞ্চিত হয়; প্রাকৃতিক নিয়মেই অনেক উৎস ও জলস্রোত হইতে Carbonate of lime বিশ্লিষ্ট হইয়া অনেক চূণাপাথর উৎপন্ন হইয়াছে; সমুদ্রজলস্থিত ফস্ফরিক এসিড ও কার্ব্বণেট অফ লাইম নামক পদার্থ-দ্বয়ের সহযোগেও অনেক ফস্ফেট্ স্তর উৎপন্ন হইতেছে।

ভূপৃষ্ঠের প্রথমজাত পর্ব্বতসমূহ এই ভাবে নিঃশেষিত হইয়া গেলে কি হইবে? উপরের অংশ ক্ষয় হইয়া গেলে নীচেকার অংশ বাহির হইয়া পড়ে এবং ভূগর্ভস্থ পদার্থ প্রভাবে বহুস্থলে পুনরায় উপরে ঠেলিয়া উঠে। পৃথিবী এখনও ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইতেছে, ভূপৃষ্ঠ সুতরাং ক্রমশঃ বসিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে ভূগর্ভস্থ পদার্থরাশির উপর নানাস্থলে অসমভাবে চাপ পড়িতেছে। ভূগর্ভস্থ দ্রবী-ভূত প্রস্তরসমূহও যেখানে সুবিধা পাইতেছে উপরে উঠিয়া পড়িতেছে কিম্বা ভূপৃষ্ঠের অকঠিন অংশ সমূহকে ঠেলিয়া তুলিতেছে এবং নিজেরা জমিয়া গিয়া ও কঠিন হইয়া প্রথমজাত প্রস্তরের আকারে পরিণত হই-তেছে। গাছ পালার ন্যায় অনেক পাহাড়ও এইরূপে তিল তিল করিয়া বৃদ্ধি পায়।

ঐরূপ দ্রবীভূত প্রস্তর নিতান্ত উপরে উঠিয়া পড়িলে গৈরিকস্রাবরূপে বাহির হয় ও আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হয়। দ্রবীভূত অবস্থায় বাহির হইবার সময় জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকিলে তাহা উপরে আসিতে আসিতে বাষ্পে পরিণত হইয়া ভূপৃষ্ঠকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ছড়াইয়া ফেলে। নিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলি নির্গমপথের চতুর্দ্দিকে পতিত ও পর্ব্বতাকারে সঞ্চিত হয়। এইরূপে আগ্নেয় গিরিগুলি, মধ্যে গহ্বরবিশিষ্ট পর্ব্বতরূপে পরিণত হয়।

শীতল হইবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রবীভূত অবস্থা কাটিয়া যাইতে থাকে। প্রথমজাত পর্ব্বত-

সমূহের উৎপত্তি আরম্ভ হয়, বাষ্পের পরিবর্ত্তে উত্তপ্ত জলরাশি ঊর্দ্ধে চালিত হইতে থাকে। অত্যুষ্ণ জলরাশির এইরূপ ঊর্দ্ধগতির সময় উহার সহিত অনেক ধাতুর কণা দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হইয়া যায়। এই সব ধাতুকণা খিতাইয়া পড়িবার কালে খনি সমূহের উৎপত্তি হয়।

জগৎজুড়ে এইরূপ ভাঙ্গা গড়ার বিচিত্র খেলা অহরহঃ চলিতেছে, জাতিভেদ ও জাতি গঠনের বিচিত্র লীলা নিত্য অভিনীত হইতেছে। ইহারই প্রকারভেদকে আমরা জীবের জন্ম, মৃত্যু ও জন্মান্তর প্রাপ্তি নামে অভিহিত করি।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গে বাল্যজীবন

ভাগবত বলিয়াছেন 'বালেব চিন্তয়া মুক্তো পরমানন্দেনাপ্লুতো যো বিমুক্তো জড়োবালো যো গুণেভ্যঃ পরংগতঃ' বালক এবং গুণাতীত মহাপুরুষ উভয়েই চিন্তা হইতে মুক্ত ও পরমানন্দে আপ্লুত। মহাত্মা যীশু একদিন তাঁহার শিষ্যবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'স্বচ্ছ সরল বালকের মত হইলে মানুষ ভগবদ্ভক্তি লাভ করে।'

বঙ্গে বাল্য-জীবনের স্বচ্ছ সরল স্বচ্ছন্দতা, মন্দাকিনীর সুদূর প্রসৃত তরঙ্গস্পন্দনানুভূতি, সমগ্র হৃদয়-বৃত্তির নবীনোন্মেষ পুলকোদ্গম দিন দিন ক্ষয়িত হইয়া যাইতেছে। এবং তৎসহিত বাঙ্গালার স্বাস্থ্য, সাহস, পৌর্য্য এবং আর্জ্জবের নবাঙ্কুর বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। বঙ্গবালকের বিষাদচ্ছায়া বিমলিন মুখমণ্ডল দেখিলে হৃদয়ের সমস্ত আশা ভরসা মুহূর্ত্তে ভয়িত হইয়া যায়। তখন মনে হয়, জগতের অন্যান্য জাতি হইতে আমরা কত বিষয়ে আজও কত পশ্চাৎবর্ত্তী। পঞ্চাশজন ইংরাজবালকের সহিত সমসংখ্যক বঙ্গবালকের তুলনা করিলে কি বিষাদময় পার্থক্য অনুভূত হয়। নৈরাশ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে, বুক বাঁধিয়া জগতের জীবনসংগ্রামে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে, জ্ঞানালোক দানে দেশব্যাপী গাঢ়তমিস্রার অপনয়ন করিতে একমাত্র নির্ভর স্থল যাহারা তাহাদিগকে এমন দেখিলে কাহার প্রাণ অবসন্ন না হইয়া যায়?

বঙ্গবালকের হৃদয়ে এই অকাল বিষণ্ণতার মসী-মলিন প্রভাব কোথা হইতে আসিল এবং কিসে তাহার নিরাকরণ করা যাইতে পারে এ সম্বন্ধে কয়জন গার্হস্থরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন জানিনা, কিন্তু যাহাদের উপর আমাদের সমগ্র কর্ম্ম প্রচেষ্টার ফলাফল অপেক্ষা করে, সমগ্র উদ্বোধন আবাহনের মর্ম্মবাণী যাহাদের হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার আকাঙ্ক্ষা স্বদেশ-সেবক মাত্রেরই হৃদয়ে স্বতঃ স্ফূরিত হওয়া স্বাভাবিক।

আনন্দই জীবনের মূল; মৃত্তিকার আর্দ্রতা উদ্ভিদের বর্দ্ধনসাধনহেতু যদ্রূপ অত্যাবশ্যক মানব এবং মানবেতর প্রাণীবর্গের জীবন

মূলে এই জীবনীরস আনন্দধারার ও তদ্রূপ একান্ত প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকৃতির মানবহৃদয়ে দেশ-কাল-জ্ঞানকর্ম্ম বিভাগানুযায়ী বিভিন্নরূপ এই আনন্দ-রস-ধারার বিচ্ছুরণ হয়, এবং যে পন্থায় তাহার গতি স্বচ্ছন্দে মানবহৃদয়ের সমগ্র প্রদেশ ব্যাপিয়া তাহার শরীর ও মনে সমভাবে সাড়া দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে তাহাই তাহার স্বধর্ম্মানুমোদিত। এ পথে বাধা বিঘ্ন জুটিল, স্নিগ্ধতার অভাবে বৃক্ষদেহে যদ্রূপ শ্যামলতার সজীবতার হীনতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেমন একটা শুষ্কতার এবং শীর্ণতার ছায়া পড়িয়া আসে, মানবের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর তদ্রূপ কালিমালেপ, নির্জ্জীবতার মালিন্য আপতিত হয়। ভগবান বলিয়াছেন—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

সরলতা স্বচ্ছন্দতা এবং বিষয় চিন্তা—নিশ্চিন্ততা বালক ধর্ম্ম। বর্ত্তমান শিক্ষা, বর্ত্তমান বাল্যজীবন পরিচালন পদ্ধতি, এই বালকধর্ম্মানুযায়ী হইয়া উঠিতেছে না। নানারূপে পরধর্ম্মের পঙ্কীয় তৎসহ বিমিশ্রিত হইয়া বালকহৃদয়ে উপ্ত হওয়াতে তাহা আবর্জ্জনাদুষ্ট হইয়া পড়িতেছে। বাল্যের শান্তি-সুমধুর লীলাময় জীবন, কৈশোরের হৃদয়বৃত্তি সমূহের আত্মতৃপ্তি আসে অধমা আবেগাকুলিত স্পন্দন-তরঙ্গ নৈশ বাতাহত সান্ধ্যাম্বিসশ্রীর ন্যায় বাঙ্গালীর জীবনের উপর দিয়া নীরব ও স্তম্ভিত প্রবাহে কখন যে বহিয়া যাইতেছে তাহাই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা যেন পক্ক কেশ, ঝুঞ্জনত দেহযষ্টি লইয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেছি।

বিগত প্রাদেশিক সম্মিলনে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় বালক-জীবনের উপর Discipline এর কুফল প্রভাবের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই Dicsipline বা শৃঙ্খলার এবং Moralityর বা নীতির এতদ্দেশীয় বিভাগের সমূহে অপপ্রয়োগ মাত্রা এত চড়িয়া গিয়াছে যে তাহাতে বাল্যজীবনের স্বচ্ছন্দতার লেশটুকুও ক্ষয়িত হইয়া যাইতে বসিয়াছে। বালকের পোষণহেতু যে উপাদান সর্ব্বপ্রধান, তাহারই উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, তাহার পুষ্টি এবং বৃদ্ধি হইবে কিসে?

অনেকে মনে করেন শৃঙ্খলার চরমতা, Law and regulation এর নাগপাশ বন্ধন, কড়াকড়ি, বালকের নৈতিকজীবনের নিয়ামক; ইহা একান্ত ভ্রান্ত ধারণা। স্বধর্ম্ম যদি বিগুণ বলিয়াও অপরের চক্ষে প্রতীত হয় তথাপি তাহা কষ্টসৃষ্ট পরধর্ম্মানুগমন অপেক্ষা প্রকৃষ্ট। উন্নতির ক্রমিক স্তর অতিক্রমিত না করিয়া কেহ সুপ্রতিষ্ঠার সৌধচূড়ে অধিরূঢ় হইতে পারে না।

যখন শৃঙ্খলার এত বন্ধন ছিল না, যখন বাঙ্গালীর ছেলে দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি করিয়াও উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিত, ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্র এবং কাব্যের সূত্রগুলি আজন্ত কণ্ঠস্থ করিত, সুদূর মিথিলা হইতে স্মৃতিশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া আসিয়া মেধাশক্তির পরিচয় দিত, তখন কি তাহারা বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা নৈতিক বলে হীন ছিল? ঐতিহাসিক বলিবেন বর্ত্তমান অপেক্ষা বিগত বঙ্গেতিহাস সমধিক উজ্জ্বল। খুঁজিতে গেলে দেখা যাইবে পূর্ব্বকার বাঙ্গালীর ছেলে আধুনিক বয়বালক অপেক্ষা

সাহসী ছিল। অমানিশার ঘোরান্ধকারে, চিতাজ্বালালোক-ভৈরব শ্মশানে বালকের হৃদয়ে নবারাগের সন্ধান-সূত্র জাগিয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে বাল্য-জীবনের সার্থকতা থাকিতে পারে না। ব্রহ্মচারী না হইলে বিগতভীঃ হওয়া যায় না আবার ভয়কে জয় করিতে না পারিলে মানবত্ব লাভ অসম্ভব। Disciplineর অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মচর্য্যের নীতিগুলি শুষ্কতর হইয়া এখন যেরূপে বালকদিগের সম্মুখে ধরা যাইতেছে, তাহার তিক্ততায় তাহারা জিহ্বা সরাইয়া লইয়া যাইতেছে। আমাদের বালকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য স্থান বিশেষে যেমনই ভাবে থাকিলেও তাহাতে তাহাদের হৃদয়বৃত্তির পরিতৃপ্তি হইতেছে না সুতরাং তাহা প্রতিষ্ঠাহীন।

জার্ম্মাণী, আমেরিকাদি সভ্যজগতের বিদ্যালয়গুলিতে আমাদের বিদ্যালয়গুলির অপেক্ষা নীতির বাঁধন কম, তাহাতেও সে দেশে আমাদের দেশের অনুপাতে শিক্ষিত বালকের সংখ্যা সমধিক এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে আমাদের বিদ্যার্থীদের স্বাস্থ্যের আকাশ পাতাল প্রভেদ। ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাপ-ব্যানাদী বাঙ্গলার হাটে, পথে, ঘাটে, মাঠে চলিতেছে; তাহা সত্ত্বেও বালকদের মধ্যে যে সমস্ত কদর্য্য ব্যাধির সঞ্চার হইতেছে তাহা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ইউরোপের ছেলে ব্রহ্মচর্য্যের কিছু জানে না তবুও তাহারা এত ব্যাধি ও জড়তার আধার নহে।

এতদ্দেশীয় বালকদের নৈতিক অবস্থা বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা পূর্ব্বে সমধিক উন্নত ছিল তাহার একটী প্রধান কারণ তাহাদের কর্ম্মজীবনের বিভিন্নতা। তাহাদিগকে এমন সমস্ত দৈনিক কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া বর্দ্ধিত হইতে হইত যাহাতে তাহাদের হৃদয়ের স্বচ্ছন্দতার বিকাশসাধন হইত, হৃদয়ক্ষেত্রে আনন্দরসের সঞ্জীবনী ধারার সুসঞ্চার সম্ভব হইত। ইউরোপীয় ছাত্রদিগকে তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তির তৃপ্তিজনক কর্ম্মজীবনের ভিতর দিয়াই গড়িয়া উঠান হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই এই নীতি শ্রেয়ঃ। ইহার অভাবে ব্রহ্মচর্য্যের বিধিবন্ধন কেবল পুস্তকগত থাকিবে এবং তাহার অভাবে বাল্যজীবনে বার্দ্ধক্যের ছায়া আসিয়া পড়িবে।

যে দিক হইতেই দেখিতে যাই না কেন আমরা অন্যান্য দেশ হইতে বাল্যশিক্ষার একটা স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া চলিয়াছি। স্বাধীন-চিন্ততা, আত্মনির্ভরতা, দৃঢ়তা ও তেজস্বীতার যাহাতে প্রতিষ্ঠা হয় তাহা না করিয়া নারী-সুলভ কোমলতা (Effiminateness) বালকহৃদয়ে ঢুকাইয়া দিবার উপরই আমাদের বেশী রোখ। ত্যাগ, সত্য আত্মদানের সাড়ায় পিতা মাতা শিহরিয়া উঠিতেছেন। তাহাদের সকলেরই যেন ইচ্ছা সন্তান বিষয়ের ক্ষুদ্র কীট হইয়া থাকুক, প্রতিবেশ প্রভাবের বন্যার সহিত যাহাতে যুদ্ধ করিতে না হয় এজন্য সে মাথা নোয়াইয়া রাখিয়াই স্ফূরণোন্মুখ মনোবৃত্তি খাট করিয়া আনিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুক। বঙ্গ কবি আক্ষেপের সুরে গাহিয়াছিলেন—

বীরের স্বভাব যার
গোঁয়ার বদ্‌নাম তার
বীর যিনি ভীরুতায় রত!

হৃদয়বৃত্তির স্বচ্ছন্দসঞ্চার ক্ষেত্র না পাইয়া বালকেরা নানাপ্রকার ঘৃণিত আমোদ প্রমোদে রত হইতেছে। এক একটী বিদ্যালয়ের প্রকৃত হৃদয় যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন

তাহা কত অন্ধকারময়। বঙ্গের এই বালক-বৈধব্য নিরাকরণ করিতে হইলে বালকদিগের স্বতন্ত্রতা ও স্বচ্ছন্দতার দিকটা প্রশস্ততর করিয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে প্রকৃত বীরত্ব, শূরত্ব এবং তেজের আদর্শ দেখাইয়া স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে উন্নতির শিখর-যাত্রীপদে বরণ করিতে হইবে।

অপরাপর দেশে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও গল্পকৌতুকের আশ্রয় সহকারে বালকচরিত্রের সহজ বিকাশ সাধন করা হইয়া থাকে। এদেশে সে পথে বড় উত্তম দেখা যায় না। উঠিয়া পড়িয়া এ কাজে লাগিতে হইবে। বালকদের উপযোগী সরল ও সুলভ পুস্তকের প্রচার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহার সাহায্যে বালক-হৃদয়ে মানবত্বের সবল অঙ্কুর রোপণ করিতে হইবে। বালকের উদ্দামতা, তরীর জীবনের ঔদ্ধত্য ও শৃঙ্খলাবর্জ্জনোন্মুখতা যাহাতে প্রকৃত স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া তাহার জীবন-সংস্থান গঠনের সহায়করূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তজ্জন্যে আমাদিগকে আপ্রাণ চেষ্টায় রত হইতে হইবে। সংবাদপত্র, মাসিকপত্র এবং সাময়িকপত্রের সাহায্যে তাহাদিগকে দৈহিক বলের মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিতে হইবে। তবে শিশুর মুখের হাসাচ্ছটা ভবিষ্যতের সুতীব্র নিরাশার তামসবক্ষঃ উজ্জ্বল করিয়া আমাদের হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার সাধনে দৃঢ়তা আনিয়া দিবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

ক্ষুদ্র-পূজা

নূতন যুগের মহতী নবীন শিক্ষা এই, ক্ষুদ্রকে অবজ্ঞা করিও না, ক্ষুদ্রের মহিমা অবগত হও, ও ক্ষুদ্রকে আদর করিতে শিখ। Hero worship বা বীরপূজা, সমাজের আদিকাল হইতে প্রচলিত আছে। ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর প্রভৃতি মহাজনগণ চিরদিনই সকলের সংপূজ্য। "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"। মহাজনের পদাঙ্কানুসরণই সমাজের ধর্ম্ম। বীরপূজাটা মন্দ কর্ম্ম নহে, এবং উহা পরিত্যাগ করিতেও কেহ বলিতেছে না, কিন্তু ক্ষুদ্র-পূজা ক্ষুদ্রের মাহাত্ম্যবোধ বীরপূজার তুলনায় অনেকের নিকট এখনও একটা অপরিচিত সুতরাং নূতন ব্যাপার এবং এই ব্যাপারে অভ্যস্ত হওয়াই নূতন যুগের বিশেষত্বজ্ঞাপক নূতন শিক্ষা দীক্ষা।

শূদ্রবর্ণ সমাজের পাদস্বরূপ এবং ব্রাহ্মণ উহার মস্তক কিন্তু পাদস্থানীয় বলিয়া শূদ্র নিশ্চিতই হেয় বা নগণ্য নহেন, প্রত্যুত নূতন যুগের নূতন শিক্ষা এই, শূদ্রকে লইয়াই সমাজ; সমাজের সভ্যতা অসভ্যতা উন্নতি অবনতি প্রভৃতি নির্ণয়ের মাপকাঠি এই সংখ্যাবহুল শূদ্রজাতি। দুষ্ট যে, সে চিরকালই হেয়, পরিত্যাজ্য ও দণ্ডনীয়; কিন্তু নূতন যুগের নূতন শিক্ষা দীক্ষা এই, শাসনের সার্থকতা দুষ্টের দণ্ডবিধানে নহে পরন্তু সংশোধনে। যেমে কবেদীর বুকে জগদ্দল পাথর চাপনের দিন এখন আর নাই, মূল্য চোরকে শূলে চড়ানই সমাজ রক্ষার সুব্যবস্থা বলিয়া এখন আর কেহ মনে করেন না। প্রাচীন যুগের প্রাচীন শিক্ষা এই, অবশিষ্ট দেহের কল্যাণার্থ উন্নত-

ক্ষত অঙ্গুলিটিকে নির্ম্মমভাবে ছেদন করিয়া ফেলিতে হয় কিন্তু নূতন যুগের নূতন শিক্ষা-দীক্ষা এই, পতিতের বর্জ্জনে বা দলনে ততটা কৃতিত্ব নাই, যতটা তাহার প্রায়শ্চিত্ত ও প্রত্যাগমন সাধনে। প্রজার তুলনায় রাজার তুল্য বড় লোক এবং রাজার তুলনায় প্রজার তুল্য ক্ষুদ্র আর কে? রাজা নরেন্দ্র ও দেবাংশসম্ভূত। নূতন যুগের নূতন শিক্ষা ইহা অস্বীকার না করিলেও নূতন করিয়া শিক্ষা দেয় প্রজাশক্তিই প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি। ক্ষুদ্র এইরূপ পরিত্যাজ্য নহেন, নগণ্য নহেন, ক্ষুদ্রকে পাইলেই বৃহতের অধিষ্ঠান সম্ভবপর—নতুবা নহে। ক্ষুদ্রই মহতের জন্মদাতা। নিদান ধরিয়া চিকিৎসার ন্যায়, ক্ষুদ্রের উৎকর্ষ সাধনই মহত্বলাভের সদুপায়। এই যে প্রাসাদনগরী ভূতপূর্ব রাজধানী কলিকাতার রাজপথের দুইধারে অভ্রংলিহ পর্ব্বতাকার সৌধসমূহ বিরাজিত, ভাবিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে, উহাদের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ, ঐ ইট কাঠ লোহা লক্কড় চূণ মশলা প্রভৃতিই উহাদের প্রাণ। এই গুলি উৎকৃষ্ট না হইলে, উৎকৃষ্ট সৌধ নির্ম্মাণ অসম্ভব নহে কি? কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবালকীটের পুঞ্জীকৃত দেহাবশেষই শেষে প্রবালদ্বীপরূপে পরিণত হয়। চারিদিকে উত্তাল-তরঙ্গসঙ্কুল-লবণাম্বুধি মাঝে স্থির স্বচ্ছ স্বাদু বারি রাশির মুকুর হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও নারিকেলকুঞ্জকূবণে ভূষিত হইয়া এই সমস্ত দ্বীপ রত্নাকর-বক্ষে যেন বসুধার রূপে শোভা পাইতে থাকে। ক্ষুদ্রই এক্ষেত্রে এইরূপ মহতের জন্মদাতা।

ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, ক্ষুদ্র পূজাটা প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য হইতে আমদানী একটা নূতন ভাব নহে। বীরপূজার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চিরকাল প্রচারিত। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পূজা, এই ক্ষুদ্র পূজারই রূপান্তর নহে কি? বৃদ্ধ পিতা মাতা গুরুজন প্রভৃতিকে ভক্তি শ্রদ্ধা, ক্ষুদ্র পূজা ব্যতীত আর কি নামে অভিধেয়? সাধনমার্গের নিম্নতর সোপানগুলিও যে হেয় বা পরিত্যাজ্য বিবেচিত হয় না, এই ক্ষুদ্র পূজাই তাহার কারণ। দয়া প্রেমাদিমূলক যে আকর্ষণ তাহাই ক্ষুদ্র পূজা। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমে পূজা শিক্ষা দিয়া এই ক্ষুদ্র পূজাই প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। বিরাট্‌কে ক্ষুদ্রভাবে, বা ক্ষুদ্রের মধ্যে দেখিয়াই বৈষ্ণব সুখী; শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু অপেক্ষা বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মনঃঅলি মুগ্ধ। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের প্রকৃতি পরীক্ষার্থ, ত্রেতাযুগের কর্ম্মবীর মহাবীর মারুতি যখন সামান্য মর্কটাকার ধারণ করিয়া পথের উপর পড়িয়া রহিলেন, এদিকে তাঁহার সেই এক যুগ ব্যবধানের অনুজটি শক্তিস্ফূর্ত্তি হেতু মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, সীতাদেবী প্রদত্ত হনুমানের সেই সাধের কদলিকানন নষ্ট করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন হনুমান্‌কে দেখিয়া, তৎকর্ত্তৃক উপরুদ্ধ হইলেও ক্ষুদ্র এক মর্কটজ্ঞানে তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে ভীমসেনের প্রবৃত্তি হইল না। সেই বলোন্মত্ত অবস্থাতেও ভীমসেন এ জ্ঞান হারান নাই, "যত্র জীব তত্র শিব রূপে নারায়ণ"। ইহা ক্ষুদ্র পূজা নহে যদি তা'হলে কি? এই ক্ষুদ্র পূজার ফলেই "বসুধৈব কুটুম্বকম্" নীতির অভ্যুদয়। গুরুকে দেবতা জ্ঞানও এই ক্ষুদ্র পূজারই রূপান্তর বলা যায়। আবার, কর্ণের হৃদয়ে "সূতো বা সূত পুত্রো বা, যো বা সো বা ভবাম্যহম্, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তন্তু পৌরুষম্" এই শ্রেণীর যে মনোভাব, অথবা, গুরুর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াও একলব্যের উৎসাহপূর্ণ

ক্ষুদ্র ও অদম্য সাধনা, এই ক্ষুদ্র পূজারই পরিণতি মাত্র। বীর পূজার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র পূজাটাও এইরূপ চিরকাল প্রচারিত। তথাপি, যে কারণেই হউক, সমাজে মাঝে মাঝে এই ক্ষুদ্র পূজার ভাবটা ক্ষীণ আকার ধারণ করে, তখন উহার নূতন করিয়া উদ্বোধন আবশ্যক হয়।

নবীন যুগের তাই এই মহতী নূতন শিক্ষা, আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া কখন অবজ্ঞা করিতে নাই, বা, উৎসাহহীন হইতে নাই। ক্ষুদ্রের মাহাত্ম্যবোধ, শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তির এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা দীক্ষার পরিচায়ক। জাতীয় উন্নতি সাধনে ইচ্ছা থাকিলে, ক্ষুদ্রের মহত্ত্ব ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্রের হৃদয়ে আত্মসম্মান বোধ জন্মাইতে, ক্ষুদ্রের সমাদর ও পূজা করিতে এবং ক্ষুদ্রের উৎকর্ষ সাধনে আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে।

এইখানে একটু ভাবিবার ও বুঝিবার কথা আছে। ক্ষুদ্র পূজার ঝোঁকে পড়িয়া বীরপূজাটা ভুলিয়া গেলে, সেটাও ঠিক কাজ হইবে না। আদর্শ হারাইয়া ফেলার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর নাই, লক্ষ্যহীন জীবন যেন কর্ণধারহীন তরণী। বীরপূজাটা আদর্শ পূজারই নামান্তর মাত্র। ব্রাহ্মণের জীবনে, হিন্দুর আদর্শ ব্রহ্মণ্যদেবের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ। ব্রাহ্মণ এই জন্য মূর্তিমান্ ভূদেব। ব্রাহ্মণপূজায় বীরপূজা ও ক্ষুদ্রপূজা উভয় ভাবমিলিত, ব্রাহ্মণ পূজা এই জন্য পতিতের উদ্ধারসাধক। দেখা যায়, কোন এক আদর্শের উপর অনুরাগ বাড়িলে, সাবধান না হইলে অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে আর কোন আদর্শের উপর বিরাগ বাড়ে। প্রজাশক্তির আদর করিতে গিয়া কেহ কেহ এইরূপ রাজশক্তির উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া বসেন, মূলে কিন্তু ঐ উভয় শক্তিই এক। শূদ্রপ্রীতি দেখাইতে গিয়া অনেকে এইরূপ ব্রাহ্মণের মানহানি, বা, ব্রাহ্মণবিদ্বেষ প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না। শূদ্র প্রেমের পাত্র, তাই বলিয়া ব্রাহ্মণ কখন অবজ্ঞা বা অনাদরের পাত্র নহেন। দুষ্ট, পতিত প্রভৃতি যদি প্রেমের পাত্র হইতে পারে, তা হ'লে হীন ব্রাহ্মণকেই বা সে প্রেমের অংশ থেকে বাদ দেওয়া হবে কেন? কার্য্যক্ষেত্রে, ভাবের খেলায় সর্বদিক বজায় রাখিয়া চলাকেরা করা এইরূপ কিছু কঠিন। যিনি যে পরিমাণে উহা করিতে সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে সমদর্শী, প্রকৃত শিক্ষিত ও মহৎপদবাচ্য।

সন্তানবৎসল পিতামাতার ন্যায়, ক্ষুদ্রপালনতৎপর, দরিদ্রবৎসল সমাজ, সমাজসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বিবেচিত হয়। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, আমাদের প্রাচীন সমাজ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। এখানে উচ্চতমবর্ণ ব্রাহ্মণ, আত্মসুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য আত্মশক্তি প্রয়োগে ব্যস্ত নহেন। কৃষিগ্রন্থ তিনি রচনা করেন কৃষকের হিতার্থ, নিজে কৃষিব্যবসায়ে লাভবান্ হইবার জন্য নহে; ধনুর্ব্বেদে দক্ষতা লাভ করেন, ক্ষত্রিয়ের বলাধান জন্য, নিজে পরপীড়ক হইতে সুবিধা হইবে বলিয়া নহে; ক্ষত্রিয়কে তিনি শিক্ষা দেন "ক্ষতঃ ত্রায়তে ইতি ক্ষত্রিয়ঃ" বৈশ্যকে শিক্ষা দেন, "ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ, সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি", শূদ্রকে শিক্ষা দেন, নিহিলিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মহতের উচ্ছেদে নহে, পরন্তু মহতের রক্ষা ও পুষ্টিসাধনে বা বিশ্ব শুশ্রূষায় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ, হিমালয় শিখরে মেডিক্যাল কংগ্রেস বসাইয়া, বহুজনে বহু আয়াস সহিয়া চরকের ন্যায়

মহা গ্রন্থের প্রচার করেন, যথার্থচিত্তে জগতের রোগ শোকে বাধা দিবার জন্য, পেটেণ্ট বেচিয়া নিজেরা লক্ষপতি হইবার জন্য নহে; নিজের জন্য তাঁহার বিধান আছে, চিকিৎসা ব্যবসায়ী অর্থাৎ অর্থ লইয়া ঔষধ বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণের মুখদর্শন করিতে নাই। দুগ্ধের ন্যায় পরম কল্যাণকর সুতরাং বহু লাভজনক দ্রব্যের ব্যবসায় ব্রাহ্মণের পক্ষে পাতিত্যসাধক—পাছে অর্থাভাবে দুগ্ধ লাভ হইতে কেহ বঞ্চিত হয়। অথচ গোপালন ও গো সেবা নিষিদ্ধ নহে, সেটা সকলের পক্ষেই মহাফলদায়ক। গো সেবাকে ভিত্তি করিয়া যেন হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত। ঔষধ প্রস্তুত করিতে, ধর্ম্মকার্য্যে, দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজ বিবিধ পদার্থের প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠা ও শক্তিলাভ পক্ষে বিদ্যা পরম সহায় স্বরূপ; ব্রাহ্মণ নিত্য বিদ্যাচর্চ্চারত রহিবেন কিন্তু বিদ্যা বিক্রয় তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। একদিকে এইরূপ সব ক্ষুদ্রের পালন ব্যবস্থা, অন্যদিকে সাংসারিক দুঃখ অভাবাদির অংশ লইবার কালে ব্রাহ্মণ যাচিয়া অগ্রসর। এ হেন সমাজ যদি আদর্শ সমাজ বিবেচিত না হয়, তবে আদর্শ সমাজ আর কোথায় আছে আমাদের জানা নাই। পিতৃমাতৃবৎসল পুত্র যেরূপ বংশের গৌরব, আমাদের প্রাচীন সমাজ তদ্রূপ ব্রাহ্মণের গৌরব বাড়াইয়া নিজে গৌরবান্বিত। প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত, কখন ঐশ্বর্য্য জন্য লালায়িত বা প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহেন। তিনি ঐ ব্রহ্মণ্য আদর্শরূপ ভৃগুপদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের ন্যায়ই, ধন মান তুচ্ছ জ্ঞান করেন, অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য এবং দেবগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া স্বর্গবাসের গৌরব তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, প্রেমের বৈকুণ্ঠপুরী তাঁহার লক্ষ্য, "গো ব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায়" জীবন ব্যয়িত হইলেই জীবন সার্থক হইল বলিয়া তিনি মনে করেন। এইভাবে ক্ষুদ্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি এবং বৈষ্ণবী প্রকৃতি অর্জ্জন, আমাদের সমাজের রক্ষা সাধনের শ্রেষ্ঠ সদুপায়।

"একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি" কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নহে। দু একজন রথচাইল্ড বা জগৎশেঠে দেশের দুঃখ ঘুচে না, দু একজন কোটিপতির অস্তিত্বে দেশের সমৃদ্ধি সূচিত হয় না। অধিকাংশকে বাদ দিয়া নহে অধিকাংশকে লইয়াই দেশ। অভাবমুক্ত ক্ষুদ্রের দল বা শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্তকুলই সমাজের মেরুদণ্ড বা গৃহস্থাশ্রম স্বরূপ এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল। অভাব গ্রস্ত ক্ষুদ্র দরিদ্র বিদ্যমান থাকিতে সমাজের মুক্তি সাধন অসম্ভব। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন-নীতি বা জীবনসংগ্রামের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে এ রোগের প্রতীকার হইবার নহে। একদল দরিদ্র ধ্বংস পাইলে, নূতন নূতন আর্ত্তের দল দেখা দিবে মাত্র। স্বার্থপরতারূপ প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ, ক্ষুদ্রের দলন, ক্ষুদ্র প্রতি ঔদাসীন্য ইত্যাদি এ রোগের ঔষধ নহে। সংযম, স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরতা প্রভৃতি নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয় লইলে এবং দয়া প্রেম প্রভৃতি দেবী শক্তির শরণ লইলেই বুঝি এই অভাব ও শক্তি হীনতারূপ রক্তবীজের আক্রমণ কথঞ্চিৎ প্রতিহত হইতে পারে। ক্ষুদ্রপ্রীতি বা ক্ষুদ্র-পূজাই এই ভাব বর্দ্ধনে সাহায্য করে।

ক্ষুদ্র মিলিত হইলে মহাবল ধারণ করে। ক্ষুদ্র তৃণ, গুচ্ছাকার প্রাপ্ত হইলে মত্ত হস্তীকেও বাঁধিবার বল পায়। ক্ষুদ্রের সম্মিলিত শক্তি যৌথ কারবারগুলি, ব্যক্তিগত কোটিপতির শক্তিকেও অতিক্রম করিয়া যায়।

ক্ষুদ্র প্রকৃত ক্ষুদ্র নহে—এইরূপ মহাশক্তির আধার এবং প্রেমই মিলন ও পূজার সদুপায়।

ব্যক্তিগত হিসাবেও ক্ষুদ্রের মান কি কিছু কম? দেবতার কাছে ছোট বড় ভেদ নাই। সচ্চেষ্টার মূল্য শুধু সাফল্য দেখিয়াই সকল সময় নির্দ্ধারিত হয় না। শক্তির স্বল্পতা বা আধিক্য সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট কিছুই নহে। থিয়েটার সার্কাসে টাকা হিসাবে আসনের মান আছে কিন্তু দু পয়সা দানের অধিক যাহার শক্তি নাই সে কি সেই অপরাধে ভগবানের রাজ্যেও দুই টাকা দানকারীর নিম্নে আসন পায়? ভাবের বিকাশ কর্ম্মে, ভাবহীন কর্ম্ম যেন প্রাণহীন জড়পিণ্ডের ব্যাপার। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভাবের আদর জানেন। সদ্ভাব মূলক ক্ষুদ্র কর্ম্মও ভাবের গুণে মহৎ এবং তামসিক ভাব মিশ্রিত বৃহদনুষ্ঠানও ভাবের দোষে কলুষিতবৎ হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান এইরূপ অনেক সময় অনেক বৃহদনুষ্ঠান অপেক্ষাও মহত্তর হয়।

লোচনা বেণের নিবাস, দক্ষিণে অহনপর মল্লিকপুর গ্রামের নিকট ছিল। লোচনের নাম ইতিহাসে বা সাহিত্যে রক্ষিত নাই; "কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি" মিসরের পিরামিডের ন্যায় কোন স্থায়ী কীর্ত্তি লোচন রচনা করিয়া যান নাই; কোন কোন বর্ষিয়সী মহিলার মুখে লোচনের ক্ষুদ্র কীর্ত্তিকাহিনী এখনও এক আধটু শুনা যায়, সে কীর্ত্তি কথা ক্ষুদ্র হইলেও গরীমার ক্ষুদ্র নহে।

লোচনের একটি কন্যা ছিল। একদিন সে খেলাতে খেলাতে সহসা গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া সঙ্গিনীদের বলিল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সে একাধিকবার আগুন খাইয়াছে অর্থাৎ সহমৃতা হইয়াছে এবং এ জন্মে তাহার চলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। সহচরীরা এ কথায় বিস্মিতা হইলে, বালিকা একটি কিন্নুক বা খোলায় কুচি দিয়া নিজের অঙ্গুলি চিরিয়া দেখাইল, আঙ্গুলের ভিতর একাধিক খণ্ড কদলী রহিয়াছে। ইহার পরই বালিকা অসুস্থ হইয়া পড়িল ও গৃহে গিয়াই যেমন বলিয়াছিল অমর ধামে চলিয়া গেল। ইহ জন্মে তাহার ভাবী পতির অকাল অন্তর্দ্ধান হেতুই এরূপ ঘটিল কি না কে জানে? এই সতী কাহিনীটি একটু বিচিত্র বটে। বস্তুতঃ বর্ত্তমানেও সতী তাহার পতির সহিত কি সূক্ষ্মভাবে মিলিত থাকে? হিন্দুর দাম্পত্য বন্ধন কোর্টশিপ বা পূর্ব্বরাগের অপেক্ষা রাখে না, পাছে ফুল ফল ধরার মত সময় এলে রতি ও বসন্ত সহচর মদন ফুলধনু হস্তে দেখা দেন, কিন্তু "কাম" টা সতী প্রেমের একটু অতি সামান্য মূর্ত্তি মাত্র।

পতি-পত্নী সম্বন্ধ যত পবিত্রই হউক, সেই দক্ষ প্রজাপতির সময় হইতে, পতির জন্যই পিতাকে কন্যাহারা হইতে হয়। এ "হারান"র অর্থ অবশ্য চিরবিয়োগ বা জীবনাশ না হইতেও পারে কিন্তু পতি-পার্শ্বই রমণীর প্রকৃত অবস্থান স্থান। যাহা হউক কন্যাশোককাতর লোচন বণিকের মন, প্রেমের সূক্ষ্মগতি আলোচনা করিয়া তাঁহার সতী তনয়ার শোক ভুলিতে পারিল না, তাঁহার বহু আদরের বালিকার কোনরূপ স্মৃতি রক্ষার্থ তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

গঞ্জ অর্থাৎ হাটের পথে যাইতে, "বাধা"র (মাঠের) মাঝে, চারিদিকে নারিকেল গাছে ঘেরা "লোচনা" বেণের পুকুর, বহুকাল পথশ্রান্ত পথিকের পিপাসা ও শ্রান্তি দূর করিত। এই শ্রেণীর সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানগুলি পূর্ব্বে এদেশের লোকের প্রিয় ছিল।

ইহাদিগকে সজীব রাখিবার জন্য বড় বড় Organisaton বা সমিতি, বহু কর্ম্মচারী প্রভৃতি বহ্বাড়ম্বর সমূহের প্রয়োজন হয় না। কাহারও বিনা যত্নে, শুধু প্রকৃতিমাতার প্রসাদেই, ঐ সব অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল সজীব রহিতে সমর্থ। নিজেরা কলুষিত করিয়া না ফেলিলে কোন জলাশয়ের জল নীচ নষ্ট হয় না; ফলবৃক্ষগুলি নিজের চেষ্টায় বাঁচিয়া থাকিয়া জনহিতে রত থাকে; ইহারা যেন সব শান্তিধামের অবৈতনিক দিব্য কর্ম্মচারী-কুল। লোভ, স্বার্থপরতা, বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি দোষ ছুটিয়া বিপদের নিকেতন করিয়া না তুলিলে এই শ্রেণীর সদনুষ্ঠান সমূহ দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ এবং আত্মবশ ভাব বজায় রাখিয়া উপকার সাধন সম্ভবপর হয়। এই শ্রেণীর সদনুষ্ঠান সমূহ সাত্ত্বিক দানের ফল এবং সাত্ত্বিকভাবের অস্তিত্ব বা বৃদ্ধি বিনা উহারা রক্ষা পায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাধা দিবার কেহ নাই দেখিয়া, কেহ যদি অসাবধানে যদৃচ্ছামত ব্যবহারে পুকুরের জলটি নষ্ট করিয়া দেয়, গাছের ফল-গুলি পাড়িয়া বেচিয়া ফেলে, অন্যের ভোগের হন্তারক হয়, স্থানটিকে দস্যু তস্করের নিবাস-ভূমি করিয়া তুলে, তাহা হইলে ঐসব সদনুষ্ঠান আর কতদিন টিকে? এই হিসাবে এগুলি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান; তা ছাড়া বহুজনের মিলিত চেষ্টায় এতদপেক্ষা মহত্তর বহুবিধ অনুষ্ঠান-সমূহ নিশ্চিতই অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তথাপি ক্ষুদ্র বলিয়া ঐগুলি নিশ্চিতই উপেক্ষণীয় নহে, উহাদের ফলে দেশে সাত্ত্বিক ভাব বৃদ্ধি পায়, উহাদের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ পল্লীগ্রামসমূহে এবংবিধ জলকষ্ট; "হেলক, কলমি লকলক করে, তার উপর পক্ষী চরে," এ সব ক্রমশঃ গল্পকথা হইয়া দাঁড়াইতেছে, শাকান্নে উদরপূর্ত্তি কথা অবধি দিন দিন অসম্ভব প্রায় হইয়া উঠিতেছে। ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানসমূহের মান বাড়ান ও ক্ষুদ্র পূজার প্রচলনই এ ব্যাধির প্রশমনের সদুপায়। "লোচনা" বেণের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাত্ত্বিক কর্ম্মীকুলই সকল দেশের সকল সমাজের চিরভূষণ।

লোচনের ন্যায় অতটা করিতেও যদি শক্তি না থাকে, দেবতাকে স্মরণ করে ও দেশের কল্যাণ কামনা করে, যদি দুটা ভাল ফল ফুলের গাছও আমরা বসাইয়া যাই দেশের এমন কি বিশ্বমানবের কত কল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক সেতুবন্ধন কালে কাঠবিড়ালী তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। দরিদ্র-বন্ধু শ্রীরামচন্দ্র সেই ক্ষুদ্র প্রাণীর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা উপহাসে উড়াইয়া দেন নাই। তাহার অঙ্গে শ্রীকর বুলাইয়া আদর করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কাঠবিড়ালী সেই অঙ্গুলীস্পর্শচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া গৌরবে ও আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়ায় ও সেই দীনবন্ধুর মহিমা প্রচার করে। আমাদের দেশের এই ক্ষুদ্র বিষদন্তিটি, একটু সুভাবের নজরে দেখিলে, অবিশ্বাস্য বা সামান্য জ্ঞানে উপহাস করিতে আর প্রবৃত্তি হইবে না। অপরের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে বহু দেশ বহু কল্যাণকর জীব উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, পেপে, কপি, গোলআলু প্রভৃতি পূর্ব্বে এদেশে ছিল না; তেঁতুল গাছটা আফ্রিকা হইতে আমদানী; তামাক ও কুইনাইনের (সিন্‌কোনা) আদি নিবাস আমেরিকা। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বে ঘোটক ছিল না, এখন তথা হইতে অন্য দেশে অশ্ব চালান যায়।

"চা" এদেশে বরাবরই জন্মাইত, কিন্তু উহার ব্যবহার বড় কেহ জানিত না। এই

অজ্ঞাত ক্ষুদ্র পত্র প্রভাবে এখন কত লোক বড় লোক। নূতন নূতন আবিষ্কারের ন্যায় পুরাতনের পুনঃ প্রবর্ত্তনেও অনেক সময় কত কল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, "চা" পানের ন্যায় বিবিধ পাতন সমূহের প্রচলন বাড়িলে মন্দ হয় কি? প্রবোধ বাবুর উপদিষ্ট "অশ্বগন্ধা" ব্যবহারে "চা" অপেক্ষাও সুফল লাভ সম্ভবপর নহে কি? তেজপাতা, ধুলকুড়ি, তুলরাজ, যষ্টিমধু প্রভৃতি জরা ব্যাধি প্রশমক রসায়ন ও জীবনীয় শ্রেণীর কত ভেষজ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ক্ষুদ্র জ্ঞানে সেগুলি উপেক্ষা না করিলে আমাদেরই কল্যাণ বৃদ্ধি হয়।

প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ মহামতি বর্ব্বাঙ্ক স্বীয় মনীষা বলে অনেক অপকৃষ্ট উদ্ভিদের উৎকর্ষ বিধান এবং বহু নূতন নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি করিতেছেন। এই শ্রেণীর মহৎ অনুষ্ঠান সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহার তুলনায় উপকারী উদ্ভিদ্ সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি সাধন, একস্থান হইতে স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি অনেকটা সহজসাধ্য ব্যাপার। হায়, আমাদের সেই প্রাচীন বৃক্ষপ্রতিষ্ঠারূপ ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান—যাহার ফলে ৺পুরীধামের পথে শুনা যায় লক্ষ আম্রবৃক্ষ সমন্বিত "একাম্র কাননে"র প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—ক্ষুদ্র জ্ঞানে দিন দিন উপেক্ষিত হইতেছে কেন? বৃষোৎসর্গের উৎসৃষ্ট বৃষগুলির স্বাধীনতা আর সম্মানিত হয় না; নারিকেল, অশ্বত্থ, বট, নিম্ব, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহের উচ্ছেদ-সাধনে অনেকে আর সঙ্কুচিত হয় না; প্রয়োজনানুরোধে কোন স্থানে এই গুলির উচ্ছেদ আবশ্যক হইলে দেশের অহিত নিবারণার্থ অন্য কোন স্থলে নূতন গাছ বসান উচিত নহে কি? নানা কারণে দেশে গো হত্যা নিবারণ সহজসাধ্য নহে কিন্তু গোবংশের রক্ষা বৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন সম্বন্ধে আমরা করিতেছি কি? ছাগের সংখ্যা অল্প হইলেও যদি ছাগীর সংখ্যা অধিক থাকে, ছাগকুলের সংখ্যা হ্রাস সহজে ঘটিতে পারে না, বাজারে ছাগীমাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ হয় না কেন? ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকিলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাদি পালনকালে মৎস্যাদি বহুবিধ জীব বংশবৃদ্ধির সুবিধা পায়। দিন দিন যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইতেছে তাহাতে হয়ত দুদিন বাদে আইন করিয়া ডিম ছাড়িবার সময় মাছ খাওয়া বা চারামাছ খাওয়া, আমাদিগকে বন্ধ রাখিতে হইবে। এইরূপ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে আমরা অমনোযোগী বলিয়াই বনরক্ষার আইন, শিকারের আইন প্রভৃতি বিবিধ আইন কানুন সমূহের প্রবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। ক্ষুদ্রের ভীমবল উপলব্ধি চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন কত নূতন নূতন তথ্য আমরা অবগত হইতেছি। রোগ বিস্তারে মশা মাছি "ব্যাসিলিস্", ইঁদুর প্রভৃতির কার্য্য, শস্যকীটের উৎপাত নিবারণে পক্ষীকুলের সাহায্য, কাক, কুকুর, মোরগ প্রভৃতির জন্য সহরের স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত।

ক্ষুদ্রের কথা ভুলে গেলেই, সমাজের হৃদয়হীনতা ও অকর্ম্মণ্যতা ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে। স্বায়ত্তশাসনে অধিকার পেলেও সে কলঙ্ক মুছিবার নহে। স্বায়ত্তশাসনকামী উন্নতি অভিমানী হিন্দু, তুমি স্বসমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা দুঃখ অভাব সম্বন্ধে কতদিন আর হৃদয়হীন বা অন্ধের ন্যায় অবস্থান করিবে? স্বসমাজের প্রয়োজনানুরূপ অনুষ্ঠান সাধনে তুমি কি এতই অক্ষম! একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বিশদ করিব। সহরের নানাস্থানে

নানা পার্ক (উদ্যান) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ফুল তুলিবার বা পাতা ছিঁড়িবার হুকুম নাই। এই উপলক্ষে যে সব শোচনীয় ব্যাপার সময় সময় সংঘটিত হয়, হৃদয়বান্ ব্যক্তি জীবনে বোধ হয় তাহা ভুলিতে পারেন না। লোকের এখন রুচিবিকার ঘটিয়াছে, ফুল তুলসীর পরিবর্ত্তে গৃহস্থ গৃহে এখন ক্রোটন গাছের সমাদর, সখের জন্য যে ফুল গাছ পুষিয়াছে দেবপূজার খাতিরে, সে তাহাতে হাত দিতে দেয় না, প্রভাতে, ঘরে ব্রাহ্মণ কুমারের পদরেণু লাভ, হিন্দু হয়ে হিন্দুর দেবপূজায় সাহায্য, এ সব চিন্তায় এখন আর কেহ মুগ্ধ হয় না। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই, দেবতার জন্য ফুল দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্রাদি সংগ্রহ দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে দুঃস্বপ্নদর্শনের ন্যায় দিন দিন একটা বিভীষিকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার জন্য মিউনিসিপাল পার্কে ঢুকিয়া অনেক ব্রাহ্মণ কুমার ও প্রাচীনা মহিলা প্রভৃতিকে বিপন্ন ও অপমানিত হইতে স্বচক্ষে দেখা গিয়াছে; অনেক স্থলে উপায়ান্তরাভাবে উদ্যানরক্ষককে নিয়মিত ভাবে কিছু কিছু উৎকোচ দিতে অনেকে বাধ্য হইয়া থাকেন। দেবতার জন্য এ নিগ্রহ ও অপমান ভোগের কথা শুনিয়া স্বধর্ম্মে মতিমান্ হিন্দু তোমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবে না কি? উন্নতি অভিমানী তুমি, স্বায়ত্ত শাসনের আদর ও বড়াই করিতে শিখিয়াছ, হিন্দু সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া হিন্দুর দেবপূজার সুবিধার জন্য পুরাতন তপোবন সমূহের আদর্শে স্থানে স্থানে পুষ্পোদ্যান সমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে পার না? এ উদ্যম এ প্রবৃত্তি হয় না, শুধু ক্ষুদ্রের বেদনা ও অভাব বুঝিতে তুমি উদাসীন বা অক্ষম সেই জন্য। সমাজের প্রয়োজনানুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে কতদিন আমরা আর এভাবে উদাসীন রহিব। আবার পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে, রুচিবিকারগ্রস্ত বড় লোকদের ঔদাসীন্য ঘুচাইতে অক্ষম হইলে, স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুস্থান মাত্রই যদি স্ব স্ব গৃহে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রশক্তির অনুরূপ ফুল দূর্ব্বাদি প্রাপ্তির যথাসম্ভব এক আধটু ব্যবস্থা করেন, ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের ও স্বধর্ম্মরক্ষার কত সাহায্য হইতে পারে। ইহাও ক্ষুদ্রের মহিমা-জ্ঞাপক।

কত আর দৃষ্টান্ত দিব। একটুখানি সহানুভূতির ভাবে সামান্য একটু মনশ্চক্ষু খুলিলেই চারিদিকে ক্ষুদ্র পূজার মহিমা ও আবশ্যকতার শত দৃষ্টান্ত নয়নে পড়িতে থাকে।

ধর্ম্মচর্চ্চাজন্য বড় বড় দেব-মন্দির নিশ্চিতই বড় শোভাময়, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের গ্রাম্য দেবালয় পুরাতন বৃক্ষতলগুলিও কি অল্প সুন্দর বা লোক সমাগম পক্ষে অল্প অনুপযোগী? বড় বড় বাগ্মী, গায়ক, সাধক প্রভৃতির সমাবেশ নিশ্চিতই বড় স্পৃহনীয় কিন্তু সাধারণের সমাবেশে হরি কথা কীর্ত্তনও কি অল্প মনোহর? রোগ শোকে দেশবাসী আজ জর্জ্জর, মেডিকাল কলেজের পাশ করা ডাক্তারের বহু পরীক্ষিত চিকিৎসার সুযোগ ঘটিলে ত বহু ভাগ্য, কিন্তু সেকালের ন্যায় ঘরে ঘরে রমণীকুলকে অবধি ক্ষুদ্র মুষ্টিযোগ চিকিৎসাটা শিখাইয়া লইলে, যম দেবতার কোপ প্রশমনের সহজ পথটাই ধরা হয় না কি? রমণী, পুরুষের দাসী নহেন, পুরুষের ন্যায় সর্ব্ববিধ ভোগ সুখে তাঁহারও অধিকার আছে, ভার্য্যার ভার বহনে, ভার্য্যাকে সুখে রাখিতে অক্ষম পতি পতিপদের অযোগ্য ইত্যাদি মন্ত্রে দীক্ষিতা না হইয়া আমাদের শিক্ষিতা মহিলাকুল যদি

সেই গান্ধারীর ন্যায় অন্ধ অর্থাৎ ক্ষুদ্র পতিকেও পূজা করিতে সমর্থা হইবেন, সংসার তাহা হইলে বড় সুখের হয় না কি? এরূপে ক্ষুদ্র পূজা সার্বথ্যের পরিচয় দিতে না পারিলে, বিলাসের মোহ কাটাইয়া, দরিদ্র (ক্ষুদ্র) পতিগৃহের নানা অভাব নানা দুঃখ সহিতে অরুচি দেখাইলে, ছেলেরাও সেয়ানা হইয়া সহজে আর বিবাহ করিতে চাহিবে না, কন্যাদায়ও নেত্র ঘুচিবে না এবং স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে লোকের আতঙ্ক ও বিতৃষ্ণা সহজে বিদূরিত হইবে না। তীব্র জীবন-সংগ্রামে দেশবাসী দিন দিন অবসন্ন প্রায় হইয়া পড়িতেছেন। এ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের ও পুরাতন কোন ক্ষুদ্র উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না কি?

হিন্দু অতি প্রাচীন জাতি, নানা ঝড় সহিয়া ও নানা বিপদ কাটাইয়া বাঁচিয়া আছে। কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে এতদিন সে টিকিয়া আছে, ভাবিয়া দেখিলে আমাদের লাভ ব্যতীত অলাভ নাই। এ ভাবে জাতীয় ইতিহাস আলোচনার চেষ্টা পাইলে ইতিহাস রচনার হয় ত এক নূতন ধারা বাহির হইবে এবং জাতিটাকে জানিতে সুবিধা হইবে। আত্মতত্ত্বজ্ঞান যেমন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, স্বজাতি সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই ইতিহাস সেইরূপ শ্রেষ্ঠ ইতিহাস। বর্ত্তমান ক্রমোন্নতিবাদের হজুকে পড়িয়া আমাদের সমস্ত প্রাচীন প্রথাই নিকৃষ্ট বা ক্ষুদ্রজ্ঞানে উড়াইয়া দিলে, আমরা শুধু বঞ্চিত হইব মাত্র।

কালের অমোঘ নিকষ প্রস্তরে পরীক্ষিত হইয়া যে জাতি রক্ষা পাইয়াছে, তাহাকে ও তাহার অনুসৃত প্রথাসমূহকে ক্ষুদ্র জ্ঞানে উপেক্ষা করার তুল্য মহাভ্রম আর কি আছে? দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজকাল সভ্যসমাজে প্রাসেক্ষত্র, অর্থই পরমার্থ, সর্ব্ববিধ সামর্থ্যমূল এবং শ্রেষ্ঠ নিকষ নিরূপণের একমাত্র পরশপাথর-রূপে বিবেচিত হইতে বসিয়াছে। আমাদের দেশে সাধুগণ শিক্ষা দেন "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্"—অর্থকে অনর্থমূল ভাবিতে শিখ, "কামিনী কাঞ্চনের মোহ কাটাও," ইত্যাদি এবং অর্থের অতি প্রতাপ বা কুফল নিবারণ জন্য নানা চেষ্টা ও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ জীবন রক্ষা জন্যই অর্থের প্রয়োজন। আমাদের দেশে বিত্তার্জ্জন অপেক্ষা ঘরে ঘরে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান চেষ্টাটা সমধিক পরিস্ফুট। প্রাচীন সিধা দান প্রথার এ হিসাবে বুঝি তুলনা নাই। মুষ্টিভিক্ষা ও সিধা দান ফলে, দেশবাসীর ঘরে ঘরে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থানটা সুকৌশলে করিয়া দেওয়া যায়, দেশে সর্ব্বদা যথেষ্ট অন্ন সঞ্চিত রাখা আবশ্যক হয়, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তিরোহিত হয়, চাউলের দর দুই টাকা স্থলে দুই শত টাকা মণ হইলেও উদ্বেগের কারণ থাকে না। ফলতঃ বাঁচিয়া থাকিতে বাসনা থাকিলে এই একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাচীন প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনে হয়ত আমাদিগকে অল্পে অল্পে পুনরায় সচেষ্ট হইতে হইবে।

শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি পুষ্টি করিতে হইলে, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হইলেই যথেষ্ট হইল না, সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব বিদ্যা চর্চ্চারও ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। উহার জন্য কি কি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইতে পারে ভাবিয়া দেখা যাউক। লোকশিক্ষা বিস্তার বিনা দেশোন্নতির আশা বৃথা। অন্য দেশে মুটে, মজুরেও লেখাপড়া শিখিতেছে, আমাদের দেশে যাহা ছিল তাহাও যাইতেছে। বাল্যকালে যে দৃশ্য দেখিয়াছি

এখন তাহা আর দেখিতে পাই না। দশভাব যখন প্রবল ছিল, "হাতে খড়ি" সংস্কারের কল্যাণে নিরক্ষর ভদ্রবংশীয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব ছিল; এখন সেন্‌সাস্ রিপোর্টে ত দেখিতে পাই, নিরক্ষর ব্রাহ্মণের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যে উপায়ে হউক অচিরে এই অধোগতির প্রতিকার চেষ্টা না করিলে ব্রাহ্মণের রক্ষা নাই এবং ব্রাহ্মণপ্রিয় হিন্দু-সমাজেরও গৌরব বা শান্তি নাই। প্রধানতঃ দারিদ্র্য হেতুই ব্রাহ্মণনন্দনগণের পক্ষে কালোচিত ব্যয়বহুল উচ্চ শিক্ষা লাভ দিন দিন অসম্ভব প্রায় হইয়া উঠিতেছে. উহার উপর সাধারণ ভাবের সামান্য শিক্ষাও বজায় না রাখিলে উপায় কি? সেখার স্থায় পড়াও বিদ্যাবিস্তারের সদুপায়, নিরক্ষর ব্যক্তিও শিক্ষিত ও ভদ্র হইতে পারেন। আমাদের প্রাচীন সমাজে এ তত্ত্ব সুবিদিত ছিল। আদিকাল হইতে বেদ বেদাঙ্গাদি বিবিধ বিদ্যা মুখে মুখে রক্ষিত ও প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে দোকানী পসারীকে অবধি বৈকালে সুর করিয়া রামায়ণ, মহাভারত কাব্য গল্প পুস্তক প্রভৃতি পাঠ করিতে রত দেখিতাম; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতার দল তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে সেই সব শুনিত। এখন এসব দৃশ্য দিন দিন অদৃশ্য প্রায় হইতেছে কেন? দেশে বিদ্যা বিস্তারের বাসনা থাকিলে, অক্ষর পরিচয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক ও কথককুলের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। ইহাদের গুণেই আমাদের স্ত্রীশূদ্র প্রভৃতি নিরক্ষর রহিয়াও শিক্ষিত ভদ্র সচ্চরিত্র ও নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থাদির সঙ্গে সঙ্গে মাসিক পত্র ও সংবাদ পত্রগুলি নানাস্থানে নিয়মিত ভাবে পাঠের ব্যবস্থা করিলে দেশে কালোচিত শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য হইবে। পূর্ব্বোক্ত মুষ্টিভিক্ষা, সিধাদান প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলে, আমাদের মনে হয় এই শ্রেণীর পাঠকের অসদ্ভাব ঘটিবে না। ক্ষুদ্র পূজার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশে শিক্ষা বিস্তারের পথ এইরূপে সুগম করা যায়।

শুধু সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রগুলি লইয়াই দেশময় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীপাঠাগার সমূহ বিরচিত হইতে পারে। শিক্ষা বিস্তার পক্ষে ইহাতেও দেশের পরম লাভ। এই লোক শিক্ষা ব্যাপারেও ক্ষুদ্রের মান দেখ। অঙ্গুলী-পর্ব্বাগ্রে গণনীয় জনকত সাহিত্যরথী বা সাহিত্য সম্রাটের পরিবর্ত্তে দেশের জনসাধারণকে যেদিন আমরা সাহিত্য-সেবারত দেখিব, সেইদিন বুঝিব দেশে বাগ্দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন আসিয়াছে।

আধুনিক ব্রাহ্মণ রক্ষা ও ব্রাহ্মণের উন্নতি সাধন চেষ্টায় স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ সভাদির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। অধ্যয়ন অধ্যাপন ব্রাহ্মণের জাতীয় বৃত্তি; ব্রাহ্মণ সন্তান মাত্রই যদি কর্ত্তব্যানুরোধে যথাশক্তি সাহিত্য চর্চ্চারত রহেন, ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণ-রক্ষিত সমাজের উন্নতি রোধ করে কে? এমন একদিন ছিল, যখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয় নাই, তখনও কি প্রতি ব্রাহ্মণের গৃহে স্বলিখিত বা অন্য লিখিত দু-একখানি হাতের লেখা পুঁথির ছোট খাট লাইব্রেরী থাকিত না? তখন যাহা সম্ভবপর ছিল, এখনই বা তাহা হইবে না কেন? অর্থের অভাবে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে হাতের লেখা সকলের গোচরে নাই বা আসিল, নাই বা নাম প্রচার হ'ল, নিজে লিখিয়া অন্যের নামে প্রচার এদেশেই দেখা যাইত না কি? বাঙ্গলার শ্রীচৈতন্য আজ একজন বাঙ্গালীর মান বৃদ্ধি অন্য বহুজনের লেখা অনায়াসে জলে ফেলিয়া দেন নাই কি?

কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মানুষ্ঠান, কর্ম্মজনিত আনন্দের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান, এদেশেরই শিক্ষা দীক্ষা নহে কি? আমাদের বাসনা, ব্রাহ্মণ সন্তান মাত্রই লেখক ও পাঠক হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন রূপ জাতীয় বৃত্তিটি যথাসম্ভব পুনঃ গ্রহণ করুন। অন্যে অনুবর্ত্তী হও, আরও সুখের কথা; যাজন যজনাদিরূপ শাস্ত্রীয় ব্যাপারে ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে অন্য বর্ণের অধিকার থাকুক বা নাই থাকুক, ব্রাহ্মণ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলে, স্ববৃত্তি ত্যাগ না করিলে, তাঁহার অধঃপতন না ঘটিলে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই উন্নত হইলে, তত্তুল্য সুখের বিষয় আর কি আছে? পূর্ব্বে যাহা সম্ভবপর ছিল এখনই বা তাহা হইবে না কেন? নিশ্চিতই সে দিন আসিবে অথবা সমাগতপ্রায়। নবীন যুগের নূতন শিক্ষা এই ক্ষুদ্র পূজা প্রভাবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মীকুলে দেশ ভরিয়া যাউক, ইহাঁরাই সমাজের উপাদানকারণ-স্বরূপ এবং দেশের প্রকৃত আশা ভরসার স্থল।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

বীরভূমের বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

৺বক্রেশ্বর শ্রীশ্রীমহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি

প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল আমাদের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতা ও সম্পাদকতায় "বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির এই এক বৎসরের যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রমে সংগৃহীত তথ্যাবলি সমিতি সঙ্কলিত "বীরভূম বিবরণ" নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। বীরভূম বিবরণের উপকরণাদি সংগ্রহের জন্য আর একবার ৺বক্রেশ্বরাদি তীর্থ পরিদর্শন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। মহারাজ কুমার বাহাদুরের নিকট প্রস্তাবটী উত্থাপন করিবামাত্র তিনি সাগ্রহে সম্মতি দান করিলেন। স্থির হইয়া গেল আগামী কল্যই যাত্রা করিতে হইবে। ২রা শ্রাবণ রাত্রি প্রভাত হইল। আমরাও সুপ্রভাত সুপ্রভাত বলিতে বলিতে প্রাত্যুত্থান করিয়া শ্রীহরি স্মরণে বাহির হইয়া পড়িলাম। যানের মধ্যে একখানি 'মোটার'; আর যাত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার বাহাদুর ও এই অধম লেখক এবং একজনা মোটার চালক, মহারাজ কুমার বাহাদুরের একজন আরদালী ও একজন চাকর। হেতমপুর রাজবাটী হইতে বক্রেশ্বরের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল হইবে। কয়েক মিনিটেই বক্রেশ্বরে গিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু পথের দৃশ্য যাহা দেখিলাম তাহাতে শরীর শিহরিয়া উঠিল। বর্ষাকাল হইলেও এখনো এতদঞ্চলে বিন্দুপাত হয় নাই। চারি পাশের মাঠ মরুভূমির মত ধূধূ করিতেছে। মাঠে জনপ্রাণীও নাই। আমিনা

মঙ্গলময়ের মনে কি আছে। ৺বক্রেশ্বরে পৌঁছিবামাত্র পাণ্ডার দল আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। দাইহাট নিবাসি সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীর অধ্যক্ষ কামাক্ষ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। আমাদের স্নান পূজাদি শেষ হইল। তারপর বৈতরণীকুণ্ড, পাপহরা নদী ও অপর (উষ্ণ প্রস্রবন) কুণ্ডাদি দেখিয়া শ্বেতগঙ্গার উত্তরতটে বটবৃক্ষমূলে যথায় গৌর নিতাইয়ের শ্রীচরণ চিহ্ন বিদ্যমান, তথায় উপস্থিত হইলাম। অদূরে একটী বহুদিনের পরিচিত (ভগ্ন) হরগৌরির যুগল-মূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি, আই, ই ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন—ইহা একটী 'যুগলদ্ধ' মূর্ত্তি ও মূর্ত্তিটী প্রায় হাজার বৎসরের পুরাতন।" (১) কিন্তু এরূপ মূর্ত্তির সার্থকতা কি, এতদিন তাহার কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। মূর্ত্তিটী উঠাইয়া বিশেষ করিয়া দেখিতেই হঠাৎ একজন পাণ্ডা বলিয়া উঠিলেন "আজ কিছু দিন হইল আমাদের বাড়ীর সমীপস্থ এক পুষ্করিণী গর্ভে একটী মূর্ত্তি কুড়াইয়া পাইয়াছি, মূর্ত্তিটী অবিকৃত আছে। শুনিয়াই তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হওয়ায় দুই একজন পাণ্ডা আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। গিয়া দেখি এক অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্ত্তি? অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তির পরিকল্পনা! একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরে মূর্ত্তিটী নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটীকে বেড়িয়া কৌমারী বারাহী বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তি চালচিত্রের মত শোভা পাইতেছেন।

"বক্রেশ্বরে মনঃ পাতঃ দেবী মহিষ মর্দ্দিনী
ভৈরবো বক্রনাথশ্চ নদী তত্র পাপহরা"

এই 'মহিষমর্দ্দিনী' এতদিন কেহ দেখিতে পাইত না। এইবার তিনি লোকলোচনের গোচরীভূতা হইয়াছেন। প্রাগুক্ত মূর্ত্তিটীই যে ৺বক্রেশ্বর মহাপীঠাধিষ্ঠাত্রী মহিষমর্দ্দিনী দেবী, তদ্বিষয়ে আমাদের আর কোনও সংশয় রহিল না। এতদিনে হরগৌরির ভগ্ন মূর্ত্তিটীর আবশ্যকতা বুঝিতে পারা গেল।

আমরা "বোম্বাই নির্ণয় সাগর যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, হরিকৃষ্ণ শর্ম্মণা সম্পাদিত দুর্গা সপ্তশতী" গ্রন্থ হইতে নিম্নে মূর্ত্তি পরিচয় বিবৃত করিতেছি।

'দুর্গা সপ্তশতী বৈকৃতিক রহস্যে' প্রথমে মধুকৈটভ বধাধিষ্ঠাত্রি যোগনিদ্রা মহাকালী দেবী বর্ণিত হইয়াছেন। তৎপরে-মহিষাসুর বধাধিষ্ঠাত্রি মহালক্ষ্মী মহিষমর্দ্দিনীর বর্ণনা আছে। যথা—

ঋষিরুবাচ—

সর্ব্বদেব শরীরেভ্য আবির্ভূতা মিতপ্রভা।
ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মী সাক্ষান্মহিষমর্দ্দিনী॥
শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেত স্তনমণ্ডলা।
রক্ত মধ্যা রক্তপাদা নীল জঙ্ঘোরু রুন্মদা॥
সুচিত্র-জঘনাচিত্র মাল্যাম্বর বিভূষণা।
চিত্রানুলেপনা কান্তি রূপ সৌভাগ্যশালিনী॥

(১) দুর্গাসপ্তশতী গ্রন্থে বৈকৃতিক রহস্যে মহিষমর্দ্দিনী পূজা প্রসঙ্গে দেবতা স্থাপন ক্রমাদি আলোচনা করিয়া অনুমিত হয় যে মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ প্রাবনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্বেতনামক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকর্ত্তৃক লুপ্তপ্রায় বক্রেশ্বর তীর্থ পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। অনেকে বলেন তিনি খৃঃ ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের অনুমান তিনি বুদ্ধের অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ময়নাকোটে রাজত্ব করিতেন। এবং মূর্ত্তিগুলি তৎসমসাময়িক। বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজনীয়।

অষ্টাদশ ভুজা পূজ্যা সা সহস্র ভুজা সতী।
আয়ুধা শুভ্র বক্ষান্তে দক্ষিণাধঃ করঃ ক্রমাৎ॥
অক্ষমালাভ কমলং বামেঽসি কুলীশং গদা।
চক্রং ত্রিশুলং পরশুঃ শঙ্খো ঘণ্টা চ পাশকঃ॥
শক্তির্দণ্ডশ্চর্ম্ম চাপং পান পাত্রং কমণ্ডলু।
অলঙ্কৃত ভুজা নেত্রী বাহুধৈ কমলাসনাং॥
সর্ব্বদেব ময়ী মীশাং মহালক্ষ্মী মিমাং নৃপ।
পূজয়েৎসর্ব্ব দেবানাং স লোকানাং প্রভুর্ভবেৎ॥

বলাবাহুল্য যে আমাদের পরিদৃষ্ট মূর্ত্তিটীর অষ্টাদশভুজে এই অষ্টাদশ প্রকার আয়ুধাদি বিদ্যমান আছে। তবে বহুদিনের পুরাতন ও বহুদিন মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত থাকায় মূর্ত্তিটী অনেকাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অধুনা চিত্র বর্ণাদি বুঝিবার উপায় নাই।

বৈকৃতিক রহস্যে অতঃপর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধাধিষ্ঠাত্রী মহা সরস্বতীর রূপ বর্ণনা করিয়া ইহাদের পূজা করিতে হইলে কোথায় কোন্ মূর্ত্তির স্থাপনা করিতে হইবে তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

মহালক্ষ্মী র্যদা পূজ্যা মহাকালী সরস্বতী।
দক্ষিণোত্তরতঃ পূজ্যে পৃষ্ঠতো মিথুন ত্রয়ং॥(২)
বিধিকী স্বরয়া মধ্যে রুদ্র গৌর্য্যাচ দক্ষিণে।
বামে লক্ষ্ম্যা হৃষিকেশ পুরতো দেবতাত্রয়ং॥
অষ্টাদশ ভুজা মধ্যে বামে চাদ্যা দশাননা।
দক্ষিণেঽষ্ট ভুজা লক্ষ্মী মহতীতি সমর্চ্চয়েৎ॥
অষ্টাদশভুজা চৈন্দ্রা যদা পূজ্যা নরাধিপ।
দশাননা চাষ্ট ভুজাং দক্ষিণোত্তরয় স্তথা॥
কাল মৃত্যুশ্চ সংপূজ্যৌ সর্ব্বারিষ্ট প্রশান্তয়ে।
নবাদ্যা শক্তয়ঃ পূজ্যা(৩)স্তথা রুদ্রো বিনায়কৌ॥

মহালক্ষ্মীর পূজা করিতে হইলে দক্ষিণে মহাকালী ও বামে মহাসরস্বতী মূর্ত্তির স্থাপনা করিবে। (বলাবাহুল্য যে এই মহালক্ষ্মীই প্রাধানিক রহস্যের "সর্ব্বাদ্যা মহালক্ষ্মী ত্রিগুণা, পরমেশ্বরী"। এবং এই মহাকালীও মহাসরস্বতী ইহারই অংশোদ্ভবা। ইহাদের প্রত্যেক হইতে আবার যে মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছিল সেই মহালক্ষ্মী মহাকালী ও মহাসরস্বতী দেবীই অসুরনাশিনী। এক কথায় ইহারা 'অবতারি' তাঁহারা 'অবতার'।) মহালক্ষ্মীর পৃষ্ঠদেশে মিথুনত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মা ও বাণী, মহাকালীর পশ্চাতে রুদ্র ও গৌরী এবং মহাসরস্বতীর পশ্চাতে লক্ষ্মী ও হৃষিকেশ থাকিবেন। সম্মুখভাগে দেবতাত্রয়ের মধ্যে মহালক্ষ্মীর সম্মুখে অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মহাকালীর সম্মুখে দশাননা মহাকালী ও মহাসরস্বতীর সম্মুখে অষ্টভুজা মহাসরস্বতী। ইহাই সাধারণ ক্রম। তবে যেখানে অষ্টাদশ-ভুজা মহিষমর্দ্দিনীই বিশেষরূপে পূজিতা হইবেন তথায় একটু ব্যতিক্রম হইয়া তাঁহার দক্ষিণে দশাননা ও বামে অষ্টভুজা স্থাপিতা হইবেন। এবং তথায় কাল ও মৃত্যু, রুদ্র ও বিনায়ক এবং নব শক্তি পূজিতা হইবেন। বক্ষেশ্বরে এই সমস্ত মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় এই সমস্ত দেবতারই পূজা হইত।

কি অপূর্ব্ব এই পরিকল্পনা! কি মহান চিত্র! 'অনাদি মধ্যান্ত মনন্তবীর্য্য' বিরাটের কি সুন্দ্ব অথচ মহান বিকাশ! জানিনা কোন্ পরমুদার হৃদয়ে এই ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের

---

(২) মিথুনত্রয়ের মধ্যে রুদ্র ও গৌরীর মূর্ত্তি পাওয়া যায় মাত্র। আমাদের পরিচিত যে হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি তাহা মিথুনত্রয়েরই একতম। এই মূর্ত্তিটী ও মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি ভিন্ন আর কোনো মূর্ত্তিই পাওয়া যায় না।

(৩) * 'গুপ্তবতী' টীকাকার বলেন "নব শক্তয়ঃ ব্রহ্মাণী। শৈলপুত্র্যাদয়ঃ পঞ্চ শক্তয়ো বা"। মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তিসহ যে কৌমারি ইন্দ্রাণী প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্যোতনা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কে সেই শিল্পী—কে সেই শক্তিমান সাধক—যাঁহার সার্থক হস্ত এই মূর্ত্তি সমূহ পরিনির্ম্মাণ করিয়াছিল। জানিনা এদেশ ভাস্কর্য্যের সন্ধান এই ভারতবর্ষ ছাড়া অপর কোথাও মিলে কি না। হায় একালের দুর্ব্বল মানব! কল্পনায় একবার এ দৃশ্যের ধারণা করিতে পার? সে ধ্যান ধারণার সামর্থ্য কি আর তোমার আছে? থাকিলে কিন্তু ভাল হইত। শুদ্ধ কল্পনার চক্ষে—একবার মাত্র এদৃশ্য দর্শন করিতে পারিলে তুমি কৃতার্থ হইতে। তুমি অক্ষয় শক্তির অধিকারী হইতে পারিতে। হিন্দু! শারদীয়া দশভুজা প্রতিমার পাশে কি একবার এই অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনীর আবাহন করিতে পার না? একদিন ছিল, যখন তুমিই এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলে, তুমিই এ মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলে। হায়! কবে তাহার বিজয়া হইয়া গিয়াছে, বোধনের দিন আর আসিল না!

কিরূপে 'মহাকালী' ও 'মহাসরস্বতীর' সৃষ্টি হইল কিরূপে মিথুন ত্রয় সৃজিত হইলেন দুর্গাসপ্তশতীতে রহস্যত্রয়ের প্রথমেই প্রাধানিক রহস্যে' তাহা বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

রাজোবাচ।

ভগবন্নবতারাস্তে চণ্ডিকায়াস্ত্বয়োদিতা।
এতেষাং প্রকৃতিং ব্রহ্মন্ প্রধানং বক্তুমর্হসি॥
আরাধ্য যন্মহা দেব্যা স্বরূপং যেন তদ্বিদঃ।
বিধিনা ব্রূহি সকলং যথাবৎ প্রণতস্যমে॥

ঋষিরুবাচ—

ইদং রহস্যং পরম মনাখ্যেয়ং প্রচক্ষতে।
ভক্তোঽসীতি নমে কিঞ্চিৎ তব যাচ্যং নরাধিপ॥
"সর্ব্বাসাদ্যা মহালক্ষ্মী স্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।
লক্ষ্যা লক্ষ্য স্বরূপাসা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা॥
মাতুলিঙ্গং গদাংক্ষেটং পান পাত্রক বিভ্রতি।
নাগং লিঙ্গং চ যোনীঞ্চ বিভ্রতি নৃপ মূর্দ্ধনী॥
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা তপ্ত কাঞ্চন ভূষণা।
শুদ্ধং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা॥
শুদ্ধং তদখিলং লোকং বিলোক্য পরমেশ্বরী।
বভার রূপ মপরং তমসং কেবলেমহি"॥

প্রথমেই তাঁহা হইতে এক ঘোরা কৃষ্ণবর্ণা দশন দংশিত বদনাবিশাল নয়না কীণ মধ্যা নারীর" উদ্ভব হইল। "খড়্গ, পাত্র, শিরঃ ক্ষেটকালঙ্কৃত চতুর্ভুজা:—

সেই নারীর মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষ্ণা কালরাত্রি ইত্যাদি নামকরণ করিয়া মহালক্ষ্মী তাঁহাকে বলিলেন—

"ইমানি তবনামানি প্রতিপাদ্যানি কর্ম্মভিঃ।
এভি কর্ম্মাণি তে জ্ঞাত্যা মোক্ষিষ্যসে
শোণিতে মুখং"॥ (৪)

অতঃপর—"সত্ত্বাখ্যো নাতি শুদ্ধেন
গুণে নেন্দু প্রভং দধৌ।
অক্ষ মালাং কুশধরা বীণা পুস্তক
ধারিণী"॥ (৫)

নারীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে মহাবিদ্যা, মহাবাণী, ভারতী, বাক্, সরস্বতী, আর্য্যা, ব্রাহ্মী ইত্যাদি নাম অর্পণ করিয়া

অবোচাচ মহালক্ষ্মী র্মহাকালীং সরস্বতীং।
যুবাং জনয়তাং দিব্যৌ মিথুনে স্বাণুরূপতঃ॥

এই বলিয়া মহালক্ষ্মী স্বয়ং ব্রহ্মা ও লক্ষ্মীর সৃষ্টি করিলেন। মহাকালী হইতে রুদ্র ও বাণীর সৃষ্টি

(৪) এই মহাকালী হইতে মধুকৈটভ বধাধিষ্ঠাত্রী দশাননা মহাকালীর উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার দশভুজ ও দশ চরণ।

(৫) ইনি শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় অষ্টভুজারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধাধিষ্ঠাত্রী অষ্টভুজা মহাসরস্বতী ইহারই অংশরূপিণী।

হইল এবং মহাসরস্বতীদেবী শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরীর সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মার অপর নাম বিরিঞ্চী ধাতা ইত্যাদি। শ্রী কমলা ইত্যাদি লক্ষ্মীর উপনাম। রুদ্র,—নীলকণ্ঠ, রক্তবাহু, কপর্দ্দী, স্থাণু ইত্যাদি নামে; সরস্বতী—ব্রহ্মবিদ্যা, কামধেনু, ভাষা অক্ষরা ইত্যাদি নামে; শ্রীকৃষ্ণ—বাসুদেব, জনার্দ্দন, বিষ্ণু ও হৃষিকেশ নামে, এবং গৌরী—সতী, চণ্ডী, সুভগা, সুন্দরী নামে অভিহিত ও অভিহিতা হইয়াছেন। মহালক্ষ্মী দেবী, রুদ্রকে গৌরী, বাসুদেবকে লক্ষ্মী, ও ব্রহ্মাকে সরস্বতী সমর্পণ করিলেন।

"স্বরয়া সহ সম্ভূয়ঃ বিরিঞ্চোঽপ মজীজনৎ।
বিভেদ ভগবান রুদ্র স্তথা গৌর্য্যা সহ বীর্য্যবান॥
অণ্ড মধ্যে প্রধানাদি কার্য্যজাত মভূদ্নৃপঃ।
মহাভূতা অকৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমং॥
পুপোষ পালয়ামাস তল্লক্ষ্মা সহ কেশব।
মহালক্ষ্মী রেবমতা রাজন্! সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী (৬)॥
নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানা বিধানভৃৎ।
নামান্তর নিরূপ্যৈসা নাম্না নাস্তেন কেনচিৎ॥"
ইতি প্রাধানিক রহস্যং।

যে পুষ্করিণীর কোনাংশে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তথায় গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী রাশীকৃত পুরাতন প্রস্তর পতিত ছিল। তাহার অধিকাংশ ৺বক্রেশ্বর শিবমন্দিরের পার্শ্বদেশস্থিত শ্বেতগঙ্গাকুণ্ড বাঁধাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি পাণ্ডা,—মহাশয়দিগের গৃহ সোপানাদির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। দুই—একটী এখনও পড়িয়া আছে। স্থানটী এবং প্রস্তরগুলি দেখিলে তথায় যে একটী প্রস্তর মন্দির ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। অনুমান হয় সেই প্রস্তর মন্দিরেই মহিষমর্দ্দিনী দেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। কালের দুরতিক্রম্য প্রভাব, ভূমিকম্পাদি প্রাকৃতিক বিপ্লবে, অথবা বিধর্ম্মীর অত্যাচারে তাহাকে লোকলোচনের অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। আবার কালই তাহাকে প্রকাশিত করিয়াছে। বক্রেশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন—(দক্ষিণদিকে) যে মহিষমর্দ্দিনীর মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা অধুনাতন কালে নির্ম্মিত। পূর্ব্বকালে পীঠাধিষ্ঠাত্রীর মন্দির, ভৈরবের সান্নিধ্য হইতে দূরে অবস্থিত ছিল। পুরাতন প্রস্তর মন্দিরের যে অবস্থিত স্থান, আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি; ৺বক্রেশ্বরের মন্দির হইতে তাহার দূরত্ব প্রায় তিন শত হস্ত হইবে। বর্ত্তমান মহিষমর্দ্দিনীর মন্দিরে, মর্ম্মর বেদীতে একটী পিত্তল নির্ম্মিত দশভুজা—মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি, পীঠাধিষ্ঠাত্রীর অভাব পূর্ণ করিতেছেন। প্রাপ্ত মূর্ত্তিটী যে সাধারণের সম্পত্তি, উহা বর্ত্তমান মন্দিরে রক্ষিত হওয়াই যে উচিত, পাণ্ডা মহাশয়দের ইহা কোনক্রমেই বুঝাইতে পারা গেল না। প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়ায় মূর্ত্তিটী যেন তাহাদের অধিকতর অন্তরঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। ভাবে বুঝা গেল মূর্ত্তিটী তাঁহারা নিজ বাড়ীতেই রাখিবেন। বলা বাহুল্য যে, তাহা হইলে মূর্ত্তিটী দেখাইয়া যাত্রীদের নিকট হইতে যে দর্শনী আদায় হইবে, তাহার আর কাহাকেও অংশ দিতে হইবে না। হায় তীর্থক্ষেত্র! পাণ্ডাগণকে ধন্যবাদ (প্রণামী ও লইয়াছিলেন) দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে আমরা—হেতমপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

(৬) মহিষাসুর বধাধিষ্ঠাত্রী মহিষমর্দ্দিনী অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মী ইঁহারই অংশ সম্ভূতা।

শিক্ষার মোহ ও ব্যবসার বিভীষিকা

[দেশে প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দের মনে আজকাল কি ধারণা ও বিভীষিকা বিরাজ করিতেছে তাহার একটী যথাযথ ছবি উপস্থাপিত করিলাম। আশাকরি ইহাতে দেশনায়কের মনে অন্ততঃ যৎকিঞ্চিৎ সুবিবেচনা জাগিবে।

একজন কলেজের ছাত্র সেই দিন কথায় কথায় আমায় বলিতেছিল, "আমাদের আজকাল এমন কেন হইল? নিজেদের মনের উপর এমন কি এক রকমের মোহ আধিপত্য করিতেছে, যাহার ফলে আমরা ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারি না; বর্ত্তমানের আমোদ আহ্লাদেই ডুবিয়া থাকি।" আধুনিক শিক্ষার প্রবল মোহের সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা চলিতেছিল ইহা উদ্ধৃত কথাংশ হইতে বুঝা যায়। আমরা প্রত্যহ চক্ষের সম্মুখে কত শত দৃষ্টান্ত দেখিতেছি তবুও আমাদের শিক্ষার মায়া কাটে না (অবশ্য আমি এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি)। কথায় বলে উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্তে অনেক কাজ করে; কিন্তু আমাদের বেলা দেখি, উপদেশে ত কোনও কাজ হয়ই না, উহাতে কর্ণতৃপ্তিই হয় মাত্র—তা ছাড়া দৃষ্টান্তও আমাদিগকে কোনও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইতে পারে না। কেমন এক মোহের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, অবলম্বন কি গন্তব্য কোথায়, উদ্দেশ্যই বা কি, তাহার কোনও খবর রাখি না। শুধু মনে হয় এই মাত্র যে, এই স্রোতে ভাসিয়া চলিতেই হইবে। অথচ যাঁহারা চলিয়াছেন এবং পরিশেষে নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

এই মোহ কি ইন্দ্রজালের প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে? দেশের যুবকগণ উহার প্রভাব এড়াইতেই পারিতেছেন না? কেহ কেহ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অস্তিত্ব লোপের পথে দাঁড়াইয়া আছেন তবুও ঐদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই,—শুধু ঐ স্রোতেই ভাসমান।

দরিদ্র যুবকবৃন্দ পড়ার খরচ চালাইতে পারেন না কাজেই ঐ খরচ বহনার্থ পৈত্রিক-সম্পত্তি যাহা কিছু থাকে তাহা বিক্রয় বন্ধকে অকুণ্ঠিতচিত্ত! পরে আবশ্যক হইলে ধার কর্জ্জ করিতেও ব্যগ্র তবুও কিন্তু পড়া চালাইতেই হইবে, যেন ভিতরের কোন এক তীব্র কার্য্যকরী শক্তি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই এই বলিয়া উত্তাক্ত করিতেছে "যেমন করিয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জ্জন কর"। ইহাই যেন মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এতদ্ব্যতীত মনুষ্যত্ব-অর্জ্জনের দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমার বিবেচনায় ইহাই মোহ।

মদীয় একজন পরিচিত বন্ধু ধার কর্জ্জ করিয়া বাস্তভিটা বন্ধক দিয়া অতি কষ্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কিনিয়াছিলেন;—English (ইংরেজী ভাষা)এ Honours

(বিশেষ সম্মান)ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; যদিও ঐ সম্মান যোগ্যতানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। শুধু তা নয় ওকালতীর দিকে (B. L.)ও অনেকদূর অগ্রসর হইয়া মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন (Intermediate B.L.)। অবস্থার বিপাকে নিজে এখন ফকির। এই সব ডিগ্রি কিনিতে কিনিতে নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষ উন্নতি দূরে থাক ১০। ১৫ বৎসরের মধ্যে যার পরিশোধনান্তর যে নিজের বাস্তভিটা উদ্ধার করিয়া স্বীয় গৃহের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন তাহার আশাও দুরূহ, কারণ সবে এক ভাই মাত্র এবং বৃদ্ধা জননী বর্ত্তমান।*

অপর একজন পরিচিত ছাত্র (নাম লিখিতেও আপত্তি নাই—৺অক্ষয়কুমার দাস ; চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র) ঠিক সমভাবে দারিদ্র্যের প্রকোপে পড়িয়াও অতিকষ্টে ডিগ্রি অর্জ্জনের নিমিত্ত তৎপরীক্ষায় প্রস্তুত হইতেছিলেন, ভগবানের নিগূঢ় বিধানে উহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁর ভবলীলার অবসান হইয়াছে। বৃদ্ধ পিতামাতার অতি শোচনীয় অবস্থা। কলেজের অধ্যাপকবর্গ ও সহাধ্যায়ী ছাত্রমণ্ডলী সাধ্যমত বৃদ্ধকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

এই সব অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মনে হয় চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য অধ্যক্ষ মিঃ Turner (সাহেব) মহোদয় একদিন এক গরীব ছাত্র প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন "Remember that, the higher University Education is not intended for the poor.—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দরিদ্রের জন্য নয় ইহা স্মরণ রাখিও।" বাস্তবিক তথা কথিত উচ্চশিক্ষার লোভে পড়িয়া বঙ্গীয় যুবকের যে আজ কি শোচনীয় অবস্থা হইতেছে তাহা ভাবিতেও হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

ইউরোপে ও আমেরিকায় যে ছাত্র লেখা পড়ার খরচ চালাইতে পারেন; বা সে দিকে তার তেমন ঝোঁক নাই সে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ভিন্ন পথে চলিয়া যায় এবং তদবলম্বনে আপন প্রতিভার পরিচয় দেয়। এ দেশে সেই স্রোত এখনও বহিতে আরম্ভ করে নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য কাহারও লক্ষ্য নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত উন্নতির অন্যোপায় নাই। হায়! আমাদের এই বোধ ভ্রান্তি আর কতদিনে ঘুচিবে? সংবাদপত্রে পড়িতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া কত যুবক আত্মহত্যায় জীবনলীলা শেষ করেন। তাঁহারা যদি এই সর্ব্বনাশক মোহে আক্রান্ত না হইয়া নিজেদের প্রবৃত্ত্যনুসারে (according to their respective tendency) ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই জীবনে সফলতা আনয়ন করিতে পারেন সন্দেহ নাই! কারণ পৃথিবীতে মানুষের উন্নতি করিবার একদিকে না একদিকে পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে।

ইদানীং দেশের শুভাকাঙ্ক্ষিগণ দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িয়া-

---

* লিখিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে যে এই মহান্ পুরুষের জীবনলীলা ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া গেল। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুঝিতে যুঝিতে সম্পূর্ণ শক্তি সামর্থ্য হীন হইয়া রোগ জীর্ণ দেহে বৃদ্ধা জননীকেও অকূল দুঃখে ভাসাইয়া আজ কয়েক দিন হইল আমার এ বন্ধুবরও স্বর্গলাভ করিয়াছেন। পাঠকবর্গ অবহা বুঝিয়া নিন্।

লেখক।

ছেন। কেহ বলেন বাণিজ্যে মন দাও, কেহ উপদেশ দেন সমাজের সংস্কার কর, আর কেহ বলিতেছেন শিক্ষার উন্নতি কর। এখন তাঁহাদেরই সম্মুখে আমার একটী অনুরোধ উত্থাপনের ইচ্ছা। **উপদেশের সময় আর নাই; ইহা উদাহরণের যুগ।** নিজে উদাহরণ দেখাইয়া দশের উন্নতির পথ করিয়া দিন। সহৃদয় দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা নিজেদের সন্তানের Tendency বা প্রবৃত্তি বুঝিয়া তদনুসারে তাহাদিগকে জীবন সংগ্রামে ঢুকাইয়া দিন। নিজেদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধপথে চলিয়া চলিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িলে পরিশেষে জীবনসংগ্রামে দাঁড়ান অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আপনারা যদি মোহের পাশ কাটাইতে না পারেন তবে নবযৌবনোদ্ভাসিত অপুষ্ট-চিত্ত যুবকদলের সম্মুখে ব্যবসা বাণিজ্যের আদর্শ-নিধা উচ্চ চীৎকার করিলে কি ফল লাভ হইবে? দেশের চিন্তাশীল মনীষিবর্গ এই দিকে ভাবিয়া থাকিলেও কার্য্যে পরিণত খুব কমই করিয়াছেন যাহা নগণ্য ধরা যাইতে পারে। সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা আমায় বলিতেই হইবে; আশা করি তাঁহারা আমার ধৃষ্টতা মনে করিলে উহা মার্জ্জনা করিবেন। এই অভাবেই "বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (Bengal National Council of Education) এখন যেন একটা খেলায় পরিণত। তাহা ত হইবেই। আপনিও ভ্রান্তমতে ডুবিয়া আছেন আমিও আছি এক আধজন মোহমুক্ত ত্যাগী মহাপুরুষের ঘাড়ে সমস্ত ভার চাপাইয়া নিজেদের সন্তান সহ দূরে থাকিয়া শুধু তামাসা দেখিতেছি আর "কাজ কিছু হইতেছে না; সবই সার হইল" ইত্যাদি চিট্‌কারী দিয়া দূরে সরিতেছি। এইরূপে কি কোনও কাজ হয়? দেশের অনেক জ্ঞানী ও বয়োবৃদ্ধ এই মোহে অন্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় সন্তানের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন; শুধু তাহা নয় তাঁহারা দেশেরও মহা অনিষ্ট করিতেছেন!

এই মোহ দুশ্চিকিৎস্য। ইহার কবিরাজ বাহিরে খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা বৃথা। নিজে মনের বল আশ্রয় করুন তাহাই যথেষ্ট। মনোবলই এখন আমাদের সর্ব্ববিধ ব্যাধির অমোঘ চিকিৎসক। আমাদের মনে সাহস নাই, আমরা কি মানুষ? স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন "কাপুরুষতা মহাপাপ, দুর্ব্বলতা মহাপাপ উহা ত্যাগ কর তবেই মানুষ হইতে পারিবে।" মনের বল, হৃদয়ের দুর্জ্জয় সাহস, তীব্র সংযম এদেশেরই চির সম্পত্তি—ইহা ঋষির দেশ। আমরাই ত "ধ্রুবের" দেশবাসী!

আমি অনেক দরিদ্র যুবককে আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি তাঁহারা মূলধন (capital) অভাবেই ব্যবসার দিকে যাইতে চাহেন না। একথার মূলে কিছু সত্য আছে কি? জিজ্ঞাসা করি মূলধন কি কখনও বাতাসে আনিয়া দিতে শুনিয়াছ? নিজেকেই মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবসা চালাইতে মূলধন কোথায় পাওয়া যায়? তখন ত ধার কর্জ্জ করিতে বা জমি বিক্রয় করিতে মনে দ্বিধা জন্মে না! সব দ্বিধা সব নিরাশা যুগপৎ জড়াইয়া ধরে, ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার বেলা। ভাবিয়াও যে হাসি পায়। যাহা লইয়া জীবন চলিবে, যাহাতে নিজের, দেশের ও দশের উপকার হইবে তাহা লইয়াই আমাদের যত দ্বিধা ও কুণ্ঠা। ইচ্ছা করিয়া নিজের জীবনটা মাটি করিতে ত কোনও কষ্ট বা দ্বিধা হয় না!"

বাস্তবিক এই ডিগ্রি বা শিক্ষামোহ আমাদিগকে সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এমনতর আত্মবিস্মৃতিভাব পৃথিবীর আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় কি না জানি না।

আমাদের মূলধন লাভ হইবে কি করিয়া? মনে করি যে, এ প্রভৃতি পাশ করিতে না পারিলে জীবনটা মাটিই হইল; ব্যবসা বাণিজ্য করিতে হইলেও যে এ ইত্যাদি পাশ করা প্রয়োজনীয়। ফলে যে, এ প্রভৃতি পাশ করিতেই ঋণের ভারে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ি; তখন মূলধন (capital) সংগ্রহের কথা দূরে থাক্ হৃত-সর্ব্বস্বের পুনরুদ্ধারেই গলদ্ঘর্ম্মহয়। পরে জীবনে নিরাশা ঢুকে, ব্যবসা বা অন্য উন্নতির সাধ মনেই লয় পায়। বাস্তবিক যদি সময় থাকিতে নিজেরা সাবধান হই, ব্যবসায় ঢুকিয়া অধ্যবসায়ের সহিত নিজেকে খাটাইয়া নিই তবে যথাসময়ে মূলধন হস্তগত করিতে তত বেগ পাইতে হইবে না। আমরা কি তাহা করিব? ডিগ্রি অর্জ্জনের পর সব আপনা আপনি হাতে আসিয়া পড়িবে এই মধুর স্বপ্নে বিভোর! ইহাতে যে কত যুবকেরই নিত্য সর্ব্বস্ব নাশ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

অবশ্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে একেবারে অপ্রয়োজনীয় একথা মনে করিতে পারি না, মনে করাও মূর্খতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অর্জ্জন করিতেই যখন দরিদ্র যুবকের সর্ব্বস্বপণ করিতে হয় তখন জীবনের অন্যবিধ উন্নতির উপায় কোথায় রহিল? যাঁহারা চালাইতে পারেন তাঁহাদিগের পক্ষে সবই ভাল; তবে দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যেও অতি অল্পই এপথে উন্নতি করিয়াছেন যদিও তাঁহাদের ডিগ্রি অর্জ্জন বা মূলধন লাভ কোনটারই অভাব নাই। এই ভাবে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার চেয়ে দরিদ্র যুবকের সময় থাকিতেই সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরমণীরঞ্জন চৌধুরী।

বিবাহ

বিবাহ সভ্য সমাজের মধ্যগ্রন্থি। জাতীয় জীবনের আশ্রয়। যে সমাজের বিবাহ বন্ধন যত দৃঢ় সে সমাজের তদনুপাতে স্থায়িত্বাধিক্য। ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতায় কত শত জাতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া বলগর্ব্বে জগৎ প্রকম্পিত করিয়া সর্ব্বগ্রাসী কাল কবলে নিপতিত হইয়া চির বিলুপ্ত লাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ধর্ম্মের অক্ষয় ভিত্তির উপর বিবাহ পদ্ধতির সংস্থিতিহেতু জগতের আদি সভ্য হিন্দু ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্তর্ধানেও স্মৃতি বিলুপ্ত না হইয়া এখনও বিদ্যমান। যে জাতি রোডস্ দ্বীপে কলোসাস্, মিসরে পিরামিড, বাবিলনে ঝুলান বাগান, চীনে অভেদ্য প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারা যে বর্ত্তমান লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতিবর্গ হইতে বল বিক্রমে জ্ঞান বিজ্ঞানে ন্যূন ছিল তাহা

মনে হয় না অথচ এখন তাহাদিগের জাতীয়তার চিহ্নমাত্রও নাই। হিন্দুর সৌভাগ্যসূর্য্য বহুকাল অস্তমিত, পরধর্ম্ম যে কত সহ্য করিয়াছি তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না তথাপি হিন্দুর অতীত জীবন যে কালের প্রবল প্রতিকূল প্রবাহ তুচ্ছ করিয়া এখনও স্বীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে সমর্থ হইতেছে বিবাহ বন্ধনের সুব্যবস্থাই তাহার মৌলিক হেতু।

একমাত্র ধর্ম্ম ভিন্ন এই নশ্বর জগতে আর কিছুই চিরস্থায়ী নহে। হিন্দুর বিবাহ, ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই আমরা মরজগতে অমর। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু যে অনুপাতে স্বধর্ম্মচ্যুত হইতেছে মৃত্যু তদনুপাতে হিন্দুর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণ প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বধর্ম্ম বিচ্যুত। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সন্তান কিন্তু শিক্ষাদোষে অহিন্দু। তুচ্ছ জ্ঞানে সনাতন ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক বৈষয়িক বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত। তাঁহাদিগের তাদৃশ কুদৃষ্টান্তে কুভাব ও ভেদবুদ্ধি সমাজময় বিকীর্ণ। পাশ্চাত্য শিক্ষাবশে তাঁহারা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় হিন্দুসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে নাই। জনসাধারণমধ্যে ভেদ বুদ্ধিও পরাক্ত সংস্থাপনে সাহসী হয় নাই। তাঁহারা নিজেই অহিন্দুত্বের গৌরব ভোগ করিতেন সমাজ তৎপ্রতি দৃক্‌পাতও করিত না অথচ ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এখন তাঁহারা সমাজের অন্তরঙ্গ গৃহভেদী শত্রু। অহিন্দু অন্তর লইয়া বাহিরে হিন্দু। ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই, সমাজে অনুরাগ নাই, সর্ব্ববিধ স্বজাতি স্নেহ পরিপূর্ণ, হইয়া মূল স্বার্থপরতার পূর্ণাবতার। মুখে যিনি যতই সৌজন্য প্রকাশ করুন না কেন কার্য্যতঃ কিন্তু তাঁহারা স্বদেহের আপাদমস্তকাধিক কিছুই দেখিতে পান না। কর্ত্তব্য জ্ঞানও তদতিক্রম করে না। তজ্জন্য বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের ঘোর অরাজকাবস্থা।

আজকাল ইউরোপে মহাযুদ্ধ উপস্থিত। কল্পনাতেও যাহা স্থান পায় নাই বিজ্ঞানবলে তাহাই প্রত্যক্ষীভূত। কত বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ জলমগ্ন হইতেছে, কত শত গ্রাম নগর ভস্মীভূত বা জনশূন্য হইতেছে। শিক্ষিত বিজ্ঞসমাজ মধ্যে তদালোচনা লইয়া কত আন্দোলন কত উৎসাহ। সত্য মিথ্যা সংবাদ সংযুক্ত দৈনিক পাঠার্থে কত উৎকণ্ঠা কত ব্যাকুলতা। সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকা সমূহে কত বড় বড় জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা, ঐতিহাসিক পৌরাণিক প্রবন্ধই বা কত, নানা দেশের নানা কথা। পাঠ করিলে মনে হয় দেশ যেন কতই উন্নত হইয়াছে জাতীয় অভ্যুদয় বুঝি চরম সীমায় উত্তীর্ণ। কিন্তু অদৃষ্টদোষে উহা কিছুই কিছু নহে, সকলই বাহ্যিক সকলই অসার।

ধর্ম্ম গিয়াছে, কর্ম্ম গিয়াছে, সমাজ উৎসন্নপ্রায় তৎপ্রতি দৃক্‌পাত নাই। জীর্ণ শীর্ণ বাসগৃহে আগুন লাগিয়া হুহু করিয়া জ্বলিতেছে, বিলাতি পরিচ্ছদে যে যত অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছ তাহাতেও বড় বড় ফোস্‌কা দেখা দিয়াছে তথাপি মুখে হাসি, জ্ঞানের অহঙ্কার গ্রামোফনের গান শুনিতে, বায়স্কোপের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে উৎসাহ। চিন্তা করিলে হাসি পায় দুঃখও ধরে, লজ্জায়ও মুখ আরক্তিম হয়। তোমরাই না কি আপনাদের কুলের মুখটি, সমাজের আশা ভরসার স্থান। যাহাদের সমাজের এমন হীনাবস্থা তাহাদিগের জ্ঞানাভিমান বা অসার আমোদ প্রমোদ কি কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা বা কর্ত্তব্য জ্ঞানপরিশূন্যতার

পরিচায়ক নয়? কেবল উদরান্নই নহে বিকৃত চেষ্টাও যথেষ্ট আছে।

হিন্দুর বিবাহ পূর্ব্বে যেমন ধর্ম্ম ছিল এখন আর তেমন নাই। ধর্ম্মবুদ্ধির পরিবর্ত্তে বৈষয়িক বুদ্ধি ইহার প্রবর্ত্তক হওয়ায় বর্ত্তমান হিন্দু বিবাহের আর হিন্দুত্ব নাই। উহা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বৈদেশিক ভাবাপন্ন হইয়াছে বিবাহে স্ত্রীরও স্বামী লাভ হয় না, পুরুষও ধর্ম্মপত্নী প্রাপ্ত হন না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল বর্ত্তমান পদ্ধতির বিবাহ সে সম্বন্ধ সংঘটন করে না। পুরুষের লক্ষ্য অর্থ লাভ, স্ত্রীর লক্ষ্য বিলাসিতা। পুরুষ মনুষ্যত্ব অপেক্ষা পশুত্বকে পৌরুষাত্মক মনে করেন এবং স্ত্রীকে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী করিয়া তাহাকেও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিমুখ করেন। কুসংস্রবে কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ সন্তান পাপস্রোতে প্রবর্দ্ধিত করে।

পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে যখন ধর্ম্মের আদর ছিল, লোকে যখন ধর্ম্মকে ঐহিক পারত্রিক সম্বল মনে করিত তখন বিবাহে সৎবংশ অগ্রগণ্য ছিল।

হীনতে হি মতিস্তাত!
হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতা যেতি
বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্।

হীন সংস্রবে হীনতা সম সংস্রবে সমতা এবং বিশিষ্টের সংস্রবে বিশিষ্টতা লাভ হয় বলিয়া কন্যা পক্ষ উচ্চবংশে কন্যাদান করিতে প্রয়াস পাইত এবং পাত্রপক্ষ উচ্চকুলের কন্যা পাইলে সাদরে গ্রহণ করিত। এখন কুশিক্ষা দোষে কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া পুরুষ পশুত্বে পরিণত হইয়াছে তজ্জন্য তাহারা আত্ম বিক্রয় দ্বারা লাভবান্ হইতে সচেষ্ট। পুরুষ এখন আর কুল শীল চায় না, কুল শীলের আদরও করে না তাহারা চায় টাকা। যে নিজে হীন ও হীনবুদ্ধিপরায়ণ তাহার নিকট বিশিষ্টতা আদরের সামগ্রী নহে সুতরাং সে বিশিষ্টতার আদরও করে না। তাহার উদার প্রাণ উচ্চ নীচ সকলকেই সমান দেখে। টাকা অধিক পাইলে সে উচ্চকুল তুচ্ছ করিয়া সাগ্রহে নীচকুলজাত কন্যা গ্রহণ করে। এ দিকে কন্যাপক্ষও সর্ব্বত্র বংশমর্য্যাদা উপেক্ষিত দেখিয়া কুলাকুল বিচার করেন না। শিক্ষিত বা সুসম্পন্ন পাত্র নীচ কুলোৎপন্ন হইলেও কন্যা সুখে থাকিবে মনে করিয়া তাহাকেই সাগ্রহে কন্যা দান করেন। এইরূপ বিষম সংস্রবে সকল ভাবাপন্ন দূষিত সন্তান সমুদ্ভূত হইয়া হিন্দুসমাজকে পাপাশ্রিত ও মলিন করিয়া ফেলিতেছে।

পূর্ব্বে ধনের এত আদর ছিল না। সৎ সংস্রবে যাহাতে সদ্বুদ্ধিপরায়ণ ধর্ম্মিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয় তৎপ্রতিই সকলের সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তজ্জন্য তাহারা নীচ কুলোদ্ভূত বিদ্বান্ বা আচার্য্যপাত্র উপেক্ষা করিয়া সমান বা উচ্চতর কুলে কন্যা দান সঙ্গত মনে করিত। উচ্চতর বংশের কন্যা তৎকালে সাদরে গৃহীত হইত।

এখন আমরা যাঁহাদিগকে শিক্ষিত বোধে আদর করি তাঁহাদিগের অধিকাংশই নীচকুলজাত সুতরাং দুর্ব্বুদ্ধি যুক্ত। হয় তো তাঁহাদিগের অনেকেরই পিতৃপুরুষগণ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি বলিয়া কোন না কোন ক্রমে বংশ রক্ষা করিয়াছেন কাজেই "অবনের ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ" বলিয়া তাঁহারা কন্যাদানেচ্ছুর সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না। যদিও ম্যালেরিয়ার ন্যায় সংক্রামক দোষে সদসৎ উচ্চনিম্নবংশজ সকলই প্রায় একাকার তথাপি নীচকুলোদ্ভূতদিগেরই

বাড়াবাড়ি অত্যন্ত অধিক। পূর্ব্বে যাহাদিগের সহিত কন্যা বিবাহ দিতে ঘৃণা ও অপমান বোধ হইত, পাশ্চাত্যদেশে কেহ যাহাদিগকে কন্যা দিত না সুতরাং কন্যাপ্রাপ্তি যাহারা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলিয়া মনে করিত এখন তাদৃশ লোকের সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিতে গেলে যে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যদিও অসৎ প্রবৃত্তিপরায়ণ, হৃদয়হীন বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সজ্জন অতীব দুর্লভ তথাপি সৎলোক একবারে অগ্রাহ্য নহে।

বর্ত্তমান শিক্ষায় আমরা যেরূপ কর্ত্তব্যবিমুখ ও কর্ত্তব্যবোধ পরিশূন্য হইয়া পড়িয়াছি তেমন নিকৃষ্ট অবস্থা ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের আর কখনও হয় নাই। আমরা শিক্ষিত মানুষ না হইয়া শিক্ষিত পশুত্বে পরিণত হইয়াছি। তাই "ধর্ম্মের খাতায় জমাশূন্য ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া" পরিলক্ষিত।

পূর্ব্বে কৌলীন্য প্রথায় কুলমর্য্যাদাকারে পাত্রগণ গৃহীত হইত এবং তাহার একটা সীমা ছিল। এখন সসীম পণ অসীম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে কুলজের ব্যবস্থা অগ্রগণ্য ছিল এখন তাহা নগণ্য। স্বেচ্ছাচারিতার মূর্ত্তিমান দৃশ্য। তখন অক্ষমাবস্থায় আত্মমর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়া নীচকুলে কন্যা দিলে ব্যয়ভার কিছুই বহন করিতে হইত না এখন আর সে সুবিধা নাই, যাহার তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতেও যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিতে হয় কাজেই যাঁহার বৈষয়িক অবস্থা সুসম্পন্ন নহে তাঁহার সামাজিক গৌরব যেরূপই হউক না কেন, বংশ যতই উচ্চ হউক না কেন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কন্যা বিবাহে নিরস্ত থাকিতে হয়। পূর্ব্বে লোকের মন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল। গরীব বলিয়া অনেকে ঘৃণাও করিত এখন শিক্ষা-সংকীর্ণ চিত্তে দয়ার লেশ নাই মহত্বের চিহ্ন নাই। সমাজের আপাদ মস্তকে পাষাণে লাঞ্ছিত কর্দ্দম অবস্থা। যিনি যত উচ্চপদস্থ তিনি তদনুপাতে দুর্বিসহ্য। শান্তিময় হিন্দু সমাজ মহাশ্মশানে বা সাহারা মরুতে পরিণত। কোথা বা হু হু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে কোথা বা হতাশার মরুময় দৃশ্য ধূ ধূ করিতেছে। যে পর্য্যন্ত দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের এইরূপ কপট বাহ্যিকতা দূর না হইবে সে পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ কোন ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী সমাজের নায়ক ছিলেন, তাঁহাদিগের আদর্শে, তাঁহাদিগের পরামর্শে তাঁহাদিগের মতানুসারে সমাজ পরিচালিত হইত। এখনও অনেকে কোন কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে নানাস্থানীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সভা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভেদবুদ্ধির প্রাবল্যে লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় এবং কাল দোষে পণ্ডিতগণও নানাবিধ অপণ্ডিত বৃত্তি অবলম্বন করায়, পণ্ডিত মণ্ডলী এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্মানিত নহেন। এখন শিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণই সাধারণতঃ সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য কিন্তু তাঁহাদিগের মন বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি বৈদেশিক ভাবাপন্ন সুতরাং অনেকে হিন্দুসমাজের সহিত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। এ নিমিত্ত তাঁহারাও সমাজের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ দেখান না, সমাজও তাঁহাদিগকে আত্মীয় মনে করে না। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যদি তাঁহাদিগের হৃদ্‌গত বৈদেশিক ভাব পরিহার পূর্ব্বক দেশের প্রকৃত সুসন্তান হইয়া আত্মসমাজের প্রতি স্নেহ শ্রদ্ধা ভক্তি

প্রেম যুক্ত হন তাহা হইলে সামাজিক দোষ সমূহ বিদূরিত হইয়া হিন্দু সমাজ নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারে। যাহারা বুঝে না বুঝিবার শক্তিও যাহাদের নাই তাহাদিগকে বলা বৃথা কিন্তু যাহারা বুঝিয়াও বুঝে না, বুদ্ধির বিকার হেতু যাহারা বিপরীত বুঝে বৈদেশিক মোহে সমাচ্ছন্ন বলিয়া যাহাদের বোধশক্তি প্রচ্ছন্ন বা জড়তাপন্ন চেষ্টা করিলে তাহারা তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্রের গূঢ়তম প্রদেশে লুক্কায়িত স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম পুনরায় জাগাইতে পারে। শাস্ত্র ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও আন্তরিক অনুরাগী হইয়া মহোপকার সাধন করিতে পারে। যে হীন স্বার্থপরতা তাহাদিগকে স্বদেশ, স্বজাতি, স্বসমাজ ও স্বধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, কপটাচারী করিয়াছে সে স্বার্থতৃষ্ণা কতক পরিমাণে সংযত করিলেই আশানুরূপ সুফল লাভ হইতে পারে। এখন তাহারা যে তৃষ্ণায় মতিচ্ছন্ন সে তৃষ্ণায় সুখ নাই শান্তি নাই, সে তৃষ্ণার তৃপ্তি অসম্ভব।

ন জাতু কামঃ কামিনা
মুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব
ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে॥

কার্য্যভোগে কামীর কামনা প্রশমিত হয় না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ভোগে ভোগতৃষ্ণা উত্তরোত্তর সমধিক প্রবর্দ্ধিত করে মাত্র এই নিমিত্তই বিজ্ঞেরা তৃষ্ণা পরিহারার্থে উপদেশ দিয়াছেন।

যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভি র্যাঁন
জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যা সৌ প্রাণান্তিকো রোগ স্তাং
তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখং॥

দুর্ম্মেধা যে তৃষ্ণা পরিহার করিতে পারে না, বার্দ্ধক্যে দেহ জীর্ণ হইলেও যে তৃষ্ণার বেগ মন্দীভূত হয় না, যে তৃষ্ণা লোকের প্রাণান্তিক রোগ স্বরূপ তিনি সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারেন প্রকৃত সুখাস্বাদনে তিনিই অধিকারী।

তৃষ্ণাতেও সুখ আছে তজ্জন্য প্রলোভন ছাড়ান দুঃসাধ্য। যাহা ধর্ম্ম বিগর্হিত সুতরাং অকর্ত্তব্য তৃষ্ণাবিশেষ তাহাও করিতে ইচ্ছা হয় এবং সেই ইচ্ছা বিবেক অভিভূত করিলে লোকে তাহা করিয়া বিপন্ন বা পাপী হয়। অনুচিত তৃষ্ণায় যে সুখ প্রদান করে তাহা অচিরস্থায়ী ও অশান্তিপ্রদ। অতএবে দুষ্ক্রিয়াজনিত অপবাদ বুঝিতে পারা যায় না তজ্জন্য অনেক স্থলে দুষ্কার্য্যও শ্লাঘনীয় বলে হয় কিন্তু কর্ম্মফল অপ্রতিহত ও অনিবার্য্য। এ নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল দুষ্কার্য্য সুকার্য্য জ্ঞানে শ্লাঘান্বিত তৎ প্রভাবে দিন দিন আমরা যে অপবাদগ্রস্ত, মাধ্যাবিনী পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে আমরা আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত বা সমুন্নত মনে করিতেছি কিন্তু তাহা ভ্রম। পূর্ব্বে রাজপুরুষগণ আমাদিগকে মানুষ বলিয়া আদর করিতেন বিদেশীয়েরা ভারতকে জ্ঞানভাণ্ডার ও ধনভাণ্ডার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এখন আমাদিগের সে গৌরবের সে সম্মানের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বিদ্যাসাগর যখন হিন্দুস্কুলে পণ্ডিত ছিলেন তৎকালে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর তাঁহার সহিত তদ্রোচিত ব্যবহার না করায় তিনি যথা সময়ে ডাইরেক্টর সাহেবের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করেন। তাহাতে ডিরেক্টর সাহেব আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের নিকট পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব নিজে সেই অভিযোগের বিচারে সাহসী না হইয়া

কর্ত্তৃপক্ষকে সেই অভিযোগের বিচার জন্য আহ্বান করেন। তাহাতে বাঙ্গালার লেফ্‌টনাণ্ট গভর্ণর হ্যালিডে সাহেব স্বয়ং বিচারের ভার গ্রহণ করেন এবং বিচারে ডিরেক্টর সাহেবকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে পত্রিতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করেন।

এই ঘটনা লইয়া চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি তখন আমাদিগের কেমন উচ্চ সম্মান ছিল তত্তুলনায় এখন আমরা কিরূপ নগণ্য ঘৃণিত ও হেয় হইয়াছি। এখন ডাইরেক্টর সাহেব কেন নিতান্ত হীনপদস্থ কোন শ্বেতবর্ণের দ্বারা গুরুতররূপে লাঞ্ছিত হইয়াও আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে আমাদিগের অত্যুচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিকেও পদাঘাতে বিচ্ছিন্নশ্রীহ হইতে হয়।

হিন্দু পেট্রিয়টের এডিটর হরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় নীলকর সাহেবদিগের বিরুদ্ধে যে সমুদায় কথা লিখিতেন তাহাতে সাহেবদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল এখন তেমন ভাষা কোন পত্রিকায় ছাপা হইলে লেখক নির্ব্বাসিত হন, প্রেস সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ রচনা করিলেন কিন্তু তিনি উহা ছাপাইতে সাহসী না হইয়া লং সাহেবকে দেখাইলেন। লং সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া নিজেই গ্রন্থকার বলিয়া প্রকাশ করিলেন। বাঙ্গালা নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হইল না। তাহাতে নীলকর সাহেবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া লং সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন তাহাতে লং সাহেবের ১০০০৲ জরিমানা ও এক মাস কারাদণ্ড হইল। বাঙ্গালীর কষ্টে ইংরেজের তাদৃশ সহানুভূতি এখন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

লেপ্টনাণ্ট গভর্ণর বা গভর্ণর জেনারলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুমতির অপেক্ষা করিতে হইত না। পায়ে চটি জুতা, গায়ে সাদা জামা, ও সংস্কৃতের চাদর তাঁহার পোষাক ছিল, ছোট লাট বড় লাট সকলের সহিতই তিনি ঐ বেশে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। বাঙ্গালীর তেমন সম্মান এখন আর বড় কাহারও নাই।

পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হাকিমদিগের বিশেষ সম্মান ছিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের নিকট অনেক বিষয়ে পরামর্শ লইতেন এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ মতে অনেক কাজ করিতেন।

আধুনিক দেশীয় হাকিমদিগের সে সম্মান নাই, তাঁহারা এখন আদেশপালক ভৃত্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার না করিয়া যথাদিষ্ট কার্য্য সুসম্পাদন দ্বারা চাকরী রক্ষার্থে ব্যাকুল এবং গভর্ণমেণ্টের আদেশাধিক দুষ্কার্য্য দ্বারা অনেকে অনেক সময় উন্নতি লাভের প্রত্যাশী।

যে বিদ্যাবলে আত্মসম্মান রক্ষা করা যায় না, হীনতা বৃদ্ধি যে বিদ্যার পরিণাম তাহা লইয়া আবার গৌরব কেন? এই রকম বিদ্যালাভ করিয়াইত আমরা ধর্ম্ম ও সমাজের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া অথবা গুণে দোষ আরোপ করিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজের বিরুদ্ধাচরণদ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করিতেছি অন্যের উপর বৃথা দোষারোপ না করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মশোধনই বিধেয়। কর্ম্মফল যখন আমাদিগকেই ভোগ করিতে হইতেছে তখন মিথ্যা ও অসার আত্মশ্লাঘা পরিহার পূর্ব্বক যাহাতে দোষ প্রশমিত হইতে পারে তাহার জন্যই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। যে ভাঙ্গা ঘরে বাস করিতেছ যাহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই সে গৃহ ভস্মসাৎ করিয়া একবার নিরাশ্রয় হইবার

দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া যাহাতে জীর্ণ গৃহ বাসোপযোগী হয় তাহার চেষ্টা কর। পণের উপদ্রব আর বাড়িতে দিও না। যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহা উঠাইয়া দিয়া গৃহশান্তি সংস্থাপন কর। শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহপদ্ধতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা কুলে সুপুত্র সমুৎপত্তির বন্দোবস্ত করিয়া নষ্টগৌরব পুনঃপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কার কর। মোহ বশতঃ কুবুদ্ধিপরায়ণ হইয়া আর বিভ্রাট জন্মাইও না।

শ্রীমাধবচন্দ্র সান্যাল।

জয়মল্ল ও পুত্তের বীরত্ব

(১)

চিতোররাজ উদয়সিংহ তদীয় উপপত্নী বীরার অপূর্ব্ব রণকৌশলে ও বুদ্ধিচাতুর্য্যে আকবরের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বীরাঙ্গনা বীরার অপূর্ব্ব উদ্দীপনা ও সুকৌশল বচনবিন্যাসে সামন্ত ও সর্দ্দারগণ উদ্দীপ্ত হইয়া নৈশযুদ্ধে দিল্লীশ্বরকে পরাজিত করিয়া মহারাণা উদয় সিংহকে শত্রুশিবির হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আকবর বীরাঙ্গনা বীরার ও তদীয় সৈন্যের প্রবল শক্তির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সমর-সম্ভারাদি পরিত্যাগ করতঃ চিতোর হইতে পলায়ন করিয়া নিজ জীবন রক্ষা করেন, এই প্রকার লজ্জাজনক পরাভব তাঁহার জীবনে আর কখন ঘটে নাই। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর আকবর আবার চিতোর নগর আক্রমণ করিলেন। কারণ তিনি সেই ঘৃণাজনক পরাভবের অসীম যন্ত্রণা ও অপমান ভুলিতে পারেন নাই। মিবার রাজ্যের সর্ব্বোন্নত মস্তক নত করাও তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল। তজ্জন্য আবার প্রবল সেনাদল সহ চিতোর নগর আক্রমণ জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবং শীঘ্রই বিপুলবাহিনী সহ প্রবল ঝটিকাকারে মিবার রাজ্যে আপতিত হইয়া তদীয় পর্ব্বত, কানন, নগর, দুর্গ, বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। আবার অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকাশ্রেণী ভারতাকাশ আবৃত করিয়া বীর সমীরণে উড্ডীয়মান হইল। যেরূপেই হউক এইবার তিনি চিতোর নগর ধ্বংস করিয়া পবিত্র শিশোদীয় বংশে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিবেন নতুবা সম্মুখ সমরে নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন এই তাঁহার প্রবল প্রতিজ্ঞা। তজ্জন্যই তাঁহার এই বিরাট অভিযান। চিতোরের পথ-ঘাট, পর্ব্বত-কানন মোগলসৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে। দুর্ব্বলচেতা রাণা উদয়সিংহ আকবরের অগ্রগতি রোধ করিতে পারেন নাই। কারণ নানা কারণে তাঁহার সামন্তশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের উগ্রবিষ বিসর্পিত হইয়াছে। কেহই রাজার ব্যবহারে সন্তুষ্ট নহেন। রাজভক্তি যাহা হিন্দুজাতির প্রাণ সেই অপূর্ব্ব বস্তু উদয়সিংহের কুব্যবহারে সৈনিকগণ হারাইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং উদয়সিংহের পক্ষে এক্ষণে চিতোর রক্ষা অসম্ভব। চিতোরে থাকিলে পাছে আবার মুসলমানসম্রাট কর্ত্তৃক পূর্ব্বের ন্যায় ধৃত হইতে হয় এই বিবেচনা করিয়া কাপুরুষ রাণা চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। পরিত্র

সূর্য্যবংশে গাঢ় কলঙ্ক-কালিমা ঢালিয়া দিতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। তিনি মোগলসম্রাটের অসীম বল ও সৈন্যসম্ভারাদি পরিদর্শন করিয়া আপনার অকিঞ্চিৎকর জীবনরক্ষার জন্য চিতোর নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন। কুলনারীগণের সতীত্ব রক্ষা কে করিবে? নগরবাসী স্ত্রীলোক ও বালকগণকে কে এই মহা আহব হইতে রক্ষা করিবে, আর সেই সুপবিত্র বাপ্পার বংশ-গৌরব পরিরক্ষণের জন্য কে দায়ী তাহা তিনি একবারও ভাবিবার অবকাশ পান নাই। ভীরু ফেরুপাল সম নিজ জীবন রক্ষার জন্য চিতোর নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে কি চিতোর নগর রক্ষা হইবে না? তবে কি সেই স্বর্গভূমি যবনকর্ত্তৃক অধিকৃত, ধ্বংসীকৃত ও চিরকলঙ্কিত হইবে? তবে কি সেই সিংহের আসনে ধূর্ত্ত মুসলমান নরপতি সমাসীন হইবেন? তবে কি হিন্দু কুলাঙ্গনাগণের পবিত্র সতীত্বরত্ন যবনকর্ত্তৃক অপহৃত ও বিলুণ্ঠিত হইবে? না না তাহা কখনই হইতে পারে না। যদিচ ক্ষুদ্রহৃদয় উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় হৃদয়ের লঘুতার ও নীচতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তথাপি চিতোর এখনও বীরশূন্য ও হৃদয়শূন্য হয় নাই। আজও সেই বীরমাতার শ্রীচরণরক্তোৎপল দ্বারা পূজা করিবার জন্য অনেক উদারহৃদয় রাজপুতবীর বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই হৃদয়শোণিতের শেষবিন্দু পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিতোরের শুভচিন্তা করিয়া অন্তিমকালে তদীয় পবিত্র মৃত্তিকা চুম্বন করতঃ আপন আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। তথাপি বিনাযুদ্ধে আকবরের হস্তে চিতোরের স্বাধীনতা তুলিয়া দিবেন না। আজ যেন মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে চিতোরের সেই ভস্মস্তূপ হইতে আবার অসংখ্য বীরের সৃষ্টি হইল। রাজস্থানের বিভিন্ন জনপদ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় বীরগণ আপনাদের সৈন্য সামন্ত লইয়া চিতোরের প্রাকার দ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। বীরবর শক্তীদাস চন্দাবৎবংশীয় অনেক বীর সৈন্য লইয়া চিতোরের প্রধানতম তোরণ দ্বার "সূর্য্যদ্বারে" স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুগণের অগ্রগতি রোধ করিলেন। মাদেরিয়া, বৈদলা, কোটারিয়া বিজোলি, সন্নিহিত প্রদেশের সামন্তরাজগণ আপন আপন বীর সৈন্যসহ প্রবল মোগল-অনীকিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জন্য দণ্ডায়মান হইলেন ইহারা সকলেই চিতোরের সামন্তরাজা। তদ্ভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দেবলপতি রাঘবজীর বংশ, কালোর পতি শনি গুরুরায়, ঈশ্বর দাস রাঠোর, করম চাঁদ, কন্দাবহ ও তুয়াররাজ সকলেই এই মহান যুদ্ধে যোগদান করিলেন। সকলেই সূর্য্য সমক্ষে এক বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিলেন কিছুতেই যবন হস্তে চিতোরের স্বাধীনতা অর্পণ করিবেন না। শরীরে এক-বিন্দু রক্ত থাকিতে মুসলমানগণের হস্তে চিতোরের স্বাধীনতা তুলিয়া দিবেন না। জীবনের, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবেন। তাঁহাদের জীবন থাকিতে চিতোরের পবিত্র অঙ্গে যেন তিলমাত্র কলঙ্ক-কালিমা স্পর্শ না করে। বীরগণ প্রাণপণে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সকলে একপ্রাণে সমরক্ষেত্রাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। অচিরে হিন্দুমুসলমানে প্রবল সমরাভিনয় আরম্ভ হইল। মৃত্যু চতুর্দ্দিকে আপনার করাল বদন বিস্তার করিল। পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

হইয়া উভয় পক্ষের অনেক বীর ভূপতিত হইলেন। চারি দিক বিকট সিংহনাদ ও রণবাদ্যে পরিপূরিত হইল। মোগল কামানশ্রেণী গুড়ুম গুড়ুম শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তুলিল। সেই যুদ্ধে চন্দ্রাবৎবংশীয় বীরতিলক শহীদাস চিতোরের সেনাপতিপদে বৃত হইয়া যবনসেনার প্রতি অবিশ্রান্ত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদীয় শরাঘাতে চতুর্দ্দিকে মৃত্যুবৃষ্টি হইল। অসংখ্য মুসলমানসৈন্য বাণাহত হইয়া জর্জ্জরিত কলেবরে ভূপতিত হইল। তদ্দৃষ্টে মোগল সেনাপতি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। যবন সেনা তদীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া "সূর্য্যদ্বার" অভিমুখে ধাবিত হইল। অসংখ্য ক্ষত্রিয় বীর যবনের আগ্নেয়াস্ত্র প্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তথাপি ক্ষত্রিয় বীরকুলতিলক শহীদাস পদমাত্র অপসৃত হইলেন না। তিনি সেই মৃত্যুতরঙ্গের ভিতর নির্ভয়ে দণ্ডায়মান রহিয়া সূর্য্যদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ তাঁহার দেহে প্রাণ ছিল, ধমনীতে রক্ত ছিল, বজ্র মুষ্টির দৃঢ়তা ছিল ততক্ষণ শত্রুগণ কিছুতেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। শহীদাস এইরূপ আত্মোৎসর্গ দ্বারা সেইদিন চিতোরের সিংহদ্বার রক্ষা করিয়া অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করতঃ রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। তখন সূর্য্যাস্তের আর বিলম্ব নাই। যবন সেনাও ক্লান্ত হইয়াছে। রাজপুতেরা বীরবর শহীদাসকে হারাইয়া ক্ষুণ্নমনে সূর্য্যদ্বারের সুদৃঢ় কপাট অর্গলবদ্ধ করিয়া নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মুসলমানগণও স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগত হইল।

(২)

রজনীদেবী ধীরে ধীরে চিতোর নগরে আগমন করিলেন। আজ তদীয় অন্ধকার রাশির মত চিতোরবাসী নরনারীর হৃদয়ও গভীর নৈরাশ্যের আঁধারে সমাবৃত। মহারাণা নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন, চন্দ্রাবৎকুলপ্রদীপ শহীদাস সম্মুখ যুদ্ধে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শনকরতঃ সংগ্রামক্ষেত্রে স্বীয় অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, কে আজ চিতোরকে শত্রুকবল হইতে উদ্ধার করিবে? কে আজ সাগর সদৃশ উদ্বেলিত যবন সেনার হাত হইতে চিতোরকে রক্ষা করিবে চিতোরের অধিবাসী এই গুরু ভাবনায় অতি চিন্তিত! সকলেরই মুখে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার ছায়া পরিস্ফুট। আজ কোন স্থানেই আনন্দের চিহ্নমাত্র নাই। শত শত সাহসী বীরগণ দুর্গ প্রাকারের স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুর গমনাগমন লক্ষ্য করিতেছে। রাজধানী গভীর চিন্তায় আত্মহারা!! ভবিষ্যতের ঘোর বিপদপাতের আশঙ্কায় যেন মুহ্যমান। মহাশক্তি চতুর্ভুজাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে আজ প্রধান প্রধান রাজপুত সেনানী, সর্দ্দার ও সামন্তগণ এবং শ্রেষ্ঠ নাগরিকেরা সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবীযুদ্ধের বিষয় একমনে আলোচনা করিতেছেন। শহীদাসের বীরত্বের বিষয় শত শত মুখে সহস্র ভাষায় পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। এমন সময় যেসোনোরের অধিপতি সামন্তরাজ জয়মল্ল ধীরে ধীরে সভার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া দিব্য বাহুদণ্ড আস্ফোলন করিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন—"উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীকে আমি যথাযোগ্য নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ও প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া আমার হৃদয়ের বাসনা পরিজ্ঞাত করিতেছি। অদ্য চন্দ্রাবৎ

বংশীয় বীরপ্রবর শহীদাস প্রবল যুদ্ধে সূর্য্যদ্বার রক্ষা করিয়া যে মহাবীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা জগতে অতুল্য। তাঁহার আত্মত্যাগ ও মহান বীরত্বে অদ্য চিতোর গৌরবান্বিত হইয়াছে, যবনেরা প্রতিহত ও বারম্বার পরাভূত হইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে পলায়ন করিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্রচেতা বীর শহীদাসের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া কল্যকার যুদ্ধে কোন বীর, জাতীয়সেনাপতিরূপে যুদ্ধ-গমনকরতঃ চিতোরের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবেন? রাণা উদয়সিংহ নগর পরিত্যাগ সময় আমার হস্তে চিতোর রক্ষার ভার দিয়া নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন। যদিচ অনেক বিষয়ে রাজা আমাদিগের মনোমত প্রার্থনা পূরণ না করিয়া নানা বিষয়ে আমাদিগকে অপমানিত ও বিরক্ত করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে চিতোরের কোন অপরাধ নাই। চিতোরের পবিত্রা উচ্চবংশীয়া রাজপুত রমণীগণ আমাদিগের নিকট কোন প্রকারে অপরাধিনী নহেন। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ কুশের বংশধরগণ জগতে চিরসম্মানিত। তদীয় সিংহাসন সকলেরই নিকট সম্মান ও পূজা পাইবার বস্তু। তজ্জন্য চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষা করা সকলেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং বাঞ্ছনীয়। আজ সেই চিতোর নগরী ঘোর বিপন্না। কল্য দুরাচার যবনেরা উহার স্বাধীনতা নষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবে। আকবর সাহার দুই লক্ষ সেনা প্রাণপণে নগর প্রাকার ভেদ করিবার প্রবল চেষ্টা করিবে। সেই ঘোর বিপদে কোন্ বীরবর চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র। অদ্য এই সভায় স্থিরীকৃত হউক কোন্ বীরযোদ্ধার উচ্চ মস্তকে সেই বিজয় মুকুট পরিশোভিত হইবে? বর্ত্তমানে চিতোরের ভিতর কোন্ ব্যক্তি উক্ত কঠিন কার্য্যোদ্ধারের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র। সামন্তরাজগণ, সেনাপতিবর্গ, ও প্রধান প্রধান নাগরিক সকল আমি আপনাদের নিকট এই বিষয়ের প্রশ্ন করিতেছি। কল্য-কার অসাধ্য সাধন কোন্ বীরপ্রবর উচ্চ হৃদয়বান সেনাপতি দ্বারা সম্পাদিত হইবে? অদ্যই সেই বীররত্নকে এই সভার ভিতর সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিতে হইবে। অদ্যই তাঁহার সিংহগ্রীবা চতুর্ভুজার শ্রীচরণ-লিপ্ত চন্দনে অনুলেপিত কুসুমমালিকা দ্বারা পরিশোভিত করিতে হইবে। তদীয় বিস্তৃত ললাট বরণতিলক দ্বারা সমুজ্জ্বল করিতে হইবে। আপনারা কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তিকে এই দেবদুর্ল্লভ পদে বরণ করিতে চাহেন? জয়মল্লের বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই চতুর্দ্দিকে একস্বরে উচ্চারিত হইল—"কৈলবার অধিপতি ষোড়শবর্ষীয় নবীন বীরযুবক পুত্তকে." তিনিই বর্ত্তমানে এই যুদ্ধের উপযুক্ত সেনা-পতি। উপস্থিত রাজপুত সেনানীর ভিতর তিনিই প্রধান বীর এবং সেনাপতি হইবার উপযুক্ত পাত্র। শীঘ্রই তাঁহার গলদেশে অভিষেকমাল্য অর্পণ করুন। ইহাই আমা-দের সকলের অভিমত। জয়মল্ল ধীরে ধীরে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মহোদয়গণ সেনাপতি নিয়োগ সম্বন্ধে আমারও সেইমত। আমি পুত্তের উদারতা, বীরত্ব ও অসাধারণ যুদ্ধচাতুর্য্যের বিষয় অব-গত আছি। আনন্দের বিষয় আপনারাও আমার মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। এই কথার পর তিনি পুত্তকে সম্বোধন করিয়া মিষ্ট বাক্যে বলিতে লাগিলেন প্রাণাধিক পুত্ত আমরা আজ অতি আহ্লাদের সহিত এই মহনীয় পদে তোমাকেই বরণ করিবার ইচ্ছা,

প্রকাশ করিয়াছি, বৎস তুমি ভিন্ন কাহারও চিতোর রক্ষার শক্তি নাই। তুমিই জাতীয় তরণীর একমাত্র কর্ণধারের উপযুক্ত। তুমিই আমাদের একমাত্র আশা ভরসার স্থল। বৎস আশীর্ব্বাদ করি হেলায় যবনসিন্ধু মন্থন করিয়া বিজয়কিরীট দ্বারা স্বীয় মস্তক উজ্জ্বল করতঃ বিজয়ী বেশে হাসিতে হাসিতে আবার জন্মভূমির পবিত্র ক্রোড়ে ফিরিয়া আইস। চতুর্ভুজা অবশ্যই তোমার সহায় হইবেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার করযুগল সহস্র ভুজের ন্যায় যবনবিনাশে বলদৃপ্ত হইবে। আমরা সকলেই এক প্রাণে আজ তোমাকে চিতোরের সেনাপতিপদে বরণ করিলাম। তোমার আদেশে চালিত হইব। আপনাদিগকে বিশেষরূপে গৌরবান্বিত মনে করিব। জয়মল্লের বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে বীরবর পুত্র সভাস্থলে বর্ত্তমান হইলেন। তাঁহার কপাট সদৃশ বিশাল বক্ষঃস্থল, শালতরুসম সবল হস্ত ও পদযুগল, জ্যোতিঃ পূর্ণ আকর্ণ প্রসারিত সুনীল নয়নযুগল, এবং সরলা মাধা উজ্জ্বল বদনকান্তি পরিদর্শন করিয়া সভাস্থ সকলেই উৎফুল্ল হইলেন। সেই বিরাট জনমণ্ডলীর ভিতর অজ্ঞাতে যেন একটা আনন্দের প্রবল তরঙ্গ উদ্বেলিত হইল। পুত্র ধীরে ধীরে প্রণত মস্তকে অতি সুমিষ্ট বাক্যে উত্তর করিলেন এই মহতী সভার ভিতর যে সকল মহাত্মাগণ উপস্থিত আছেন তাহার মধ্যে অনেকেই আমার প্রণম্য এবং গুরুস্থানীয়। আমি অনেকেরই নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। তজ্জন্য আমি উপরোক্ত মহাত্মাগণের শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছি। আর চিতোরের নাগরিকগণ যে উচ্চতম আশাস সাধ্য কার্য্য উদ্ধারের উপযুক্ত মনে করিয়া আমাকে চিতোরের সৈনাপতি পদে নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এই গুরুতর কার্য্যসম্পাদনে আমার কিরূপ যোগ্যতা আছে তাহা ভগবানই জানেন। এই বীর বালক আপনাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছে সে তাহার অসির সম্মান অবশ্যই রক্ষা করিবে। শরীরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দু রক্ত থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যবন বিনাশ করিবে। ভগবানই জানেন এই গৌরবময় যুদ্ধে কাহার জয় পরাজয়। বহু পুণ্য ও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে আমি আজ এই মহান ও উচ্চ পদে বৃত হইয়া আপনাকে ও আমার বংশকে ধন্য মনে করিতেছি। আর মনে করিতেছি আমার বীরমাতার স্তন্যপান বৃথা হয় নাই। সেনা ও সেনাপতিগণ আপনারা আমার অনুবর্ত্তন করিবেন। সম্রাট আকবরকে দেখাইব এই সিংহশিশু বাহুতে কিরূপ বিপুলশক্তি ধারণ করে। তাহার সমরপিপাসা কল্য জয়োৎসব পরিসমাপ্ত হইবে আমি এইরূপই আশা করি। শুনিয়াছি যবন সৈন্য দুই লক্ষের ন্যূন হইবে না। আমাদের সৈন্য সংখ্যা ত্রিংশৎসহস্রেরও কম হইবে। জগৎ দেখিবে আমার এই বীর ভ্রাতাগণ যবনসেনা-সমুদ্র কেমন করিয়া মন্থন করেন। এবং তাহা কিরূপ পুরুষার্থ পূর্ণ! তাঁহারা কিরূপ অদ্ভুত বীর!! রাজপুরোহিত ইত্যবসরে চতুর্ভুজার চরণোদক পুত্রকে পান করাইলেন। তাঁহার পদদেশে দেবী নিবেদিত চন্দনচর্চ্চিত ফুল মালা অর্পিত ও প্রণত ললাটে বরণ তিলক শোভিত হইল। এইরূপে অভিষেক কার্য্য যথারীতি সম্পাদিত হইল, অমনি চারিদিক হইতে তুরি, ভেরী, দামামা, দগড় প্রভৃতি রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, পুত্র ধীরে ধীরে সভাস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে

প্রণাম করিলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরে সভা ভঙ্গ হইল। সকলেরই মুখে ধ্বনিত হইল বীরবর পুত্ত কলাকার যুদ্ধের সেনাপতি! তিনিই চিতোর রক্ষার উপযুক্ত পাত্র।

(৩)

রজনী দ্বিতীয় প্রহর। নক্ষত্ররাজি নীল আকাশপটে প্রজ্জলিত হইতেছে। নৈশ সমীরণ ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িত হইয়া আহত সৈন্য সকলের স্বেদসিক্ত যন্ত্রণাক্লিষ্ট বদন-মণ্ডলের ঘর্ম্মবিন্দু অপনোদন করিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মাংসাহারী শ্বাপদেরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া মনের আনন্দে শব ভক্ষণ করিতেছে। দূরে যবন শিবিরে আলোকরাশি প্রজ্জলিত। তথায় স্থানে স্থানে সৈন্যগণ অনিদ্রায় আপন আপন সেনা-পতির আদেশ পালন জন্য চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। এমন সময় পুত্ত ধীরে ধীরে আপন মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিলেন। তাঁহার মস্তকে স্বর্ণ কিরীট, কপালে বরণ-তিলক, গলদেশে পুষ্পমালা, সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মাবৃত, কটিদেশে দোদুল্যমান তর-বারি, হস্তে সুদৃঢ়শূল, পৃষ্ঠে বৃহৎ ধনু ও নিষঙ্গ। বীরবর ধীরে ধীরে আসিয়া মাতৃ-চরণ বন্দনা করিলেন। পুত্রকে এইরূপ অপূর্ব্ব বীরসাজে সমাগত দেখিয়া বীরমাতার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি অপলক নেত্রে পুত্রের এই অপূর্ব্ব বীরকান্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন। তৎপরে বীর-জননী পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তদীয় বদন-কমল বারম্বার চুম্বন করত বলিতে লাগিলেন পুত্ত এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। জন্মদান সার্থক হইল। পুত্ত আজ তুমি চিতোরের সেনাপতি পদে বৃত হইয়া যবন বিনাশের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিতেছ। তোমার কপালে বরণ তিলক দৃষ্ট করিয়া অদ্য আমার হৃদয় কিরূপ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি-তেছি না। এই মহান উদ্দেশ্য সম্পাদন জন্য তোমাকে আমি এত বড় করিয়াছি। তোমার পিতা বিগত যবনযুদ্ধে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। দুরাত্মা আকবর স্বহস্তে তোমার পিতাকে নিধন করিয়াছিল। তাহার প্রতিশোধ কামনায় আমি স্বামীর প্রজ্জলিত চিতানলে এই অসার দেহ সমর্পণ করিয়া সহমৃতা হই নাই। তুমি শিশু তোমাকে লালন পালন করিয়া তজ্জন্য এত-দিন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাইলাম। চল আজ উভয়ে সেই স্বামীহন্তা পিতৃহন্তাকে বিনাশ করিব। উভয়ে আজ জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিব। পুত্ত দেখিলেন তদীয় বীরজননী বর্ম্ম পরিহিতা ও নানাপ্রকার যুদ্ধাস্ত্রে বিভূষিতা। তিনি যুদ্ধ গমন জন্য নিতান্তই ব্যাকুলা। আকবরের শিরশ্ছেদ করতঃ স্বামী-নিধন-যন্ত্রণার নিবারণকল্পে অতি অস্থিরা। পুত্ত ধীরভাবে এই রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিলেন। এই স্থিরা বিদ্যুদ্দামময়ী অনল প্রতিমার প্রতিমূর্ত্তির প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার একটী কথা কহিবারও শক্তি রহিল না। জননী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—"পুত্ত তুমি কৈলবার বংশের একটী মাত্র কুলপ্রদীপ। তোমার অভাবে উক্ত রাজবংশে আর কেহ বংশধর রহিবে না। পিতৃপুরুষগণ জলপিণ্ড পাইবেন না। তথাপি জন্মভূমি রক্ষার গুরুত্ব ও পুণ্যের নিকট এই স্বার্থময় বাসনার বলিদান দিয়া তোমাকে ধর্ম্মযুদ্ধে, জাতীয় যুদ্ধে গমন করিবার জন্য প্রসন্ন মনে অনুমতি প্রদান করিলাম। যাঁহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের নিকট জন্ম-

ভূমির কল্যাণ-কামনাকে বলিদান দেয় তাহারা মহাপাপী। নরকেও তাহাদের স্থান নাই। যাও পুত্র জাতীয় সংগ্রামে অগ্রসর হও। স্বীয় বাহুবলে যবন সৈন্য বিধ্বস্তিত করিয়া বিজয়ের রথে আরোহণ করতঃ পুনর্ব্বার চিতোর দুর্গে প্রবেশ কর। মাতার আর একটী অনুরোধ তোমাকে পালন করিতে হইবে। বধূ সুকুমারী অল্প বয়স্কা। তাহাকে একাকী গৃহে রাখিয়া যুদ্ধে যাইতে আর ইচ্ছা নাই। ভবিতব্যতার কথা বলা যায় না। যদি যবনেরা যুদ্ধে বিজয়ী হয় তবে উহারা কাহারও জাতিকুল রাখিবে না। চিরপবিত্র বংশে নিশ্চয়ই কলঙ্ককালিমা লেপন করিবে। তজ্জন্য সুকুমারীকে যুদ্ধের সঙ্গিনী করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সে রাজপুতকন্যা। বাল্যকাল হইতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। পুত্র তোমাকে আমার এই আদেশ পালন করিতে হইবে। পুত্র আহ্লাদে মাতৃপদে প্রণাম করিলেন। এবং স্বীয় জননীর হৃদয়ের উচ্চতা ও মহামহিমাময়ী দেবীত্বের নিকট নতমস্তক হইলেন। ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন মাতঃ পুত্র এ জীবনে তোমার পবিত্র আদেশ পালন জন্য চিরপ্রস্তুত। পুত্র মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে নিজ শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন অস্ত্র শস্ত্র ভূষিতা এক দেবীমূর্ত্তি সুতীক্ষ্ণ শূলহস্তে তাঁহার অপেক্ষায় দণ্ডায়মানা। ধর্ম্মপত্নী সুকুমারী শরীরের সমস্ত অলঙ্কার রাশি পরিত্যাগ করত রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া ও সন্নাহভূষিতা হইয়া জগদ্ধাত্রীর বেশে যুদ্ধ যাইবার জন্য প্রস্তুত। তিনি স্বামী চরণে প্রণতা হইলেন এবং বলিলেন নাথ আমি যদিও তোমার সহিত যুদ্ধ গমনের নিতান্ত অনুপযুক্তা তথাপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দাসীকে সমরসঙ্গিনী করিয়া লইতে হইবে। দাসীর ক্ষীণকর অস্ত্রের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের জন্য নহে। যবন বিনাশের শাণিতাস্ত্ররূপে ভগবান উহা প্রদান করিয়াছেন। এই সুতীক্ষ্ণ শূলাঘাতে শত্রুদেহ বিদীর্ণ করিয়া নাথ তোমার সহিত আবার রণবিজয়িনী বেশে চিতোরে প্রবেশ লাভ করিব। পুত্র আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি পত্নীনেত্র প্রিয়াকে করে ধরিয়া যত্নের সহিত উঠাইলেন এবং প্রেমগদগদ চিত্তে বলিতে লাগিলেন সুকুমারী তুমি ধন্যা! তুমিই যথার্থ বীরপ্রসবিনী, চিতোরের স্বাধীনতাদেবী বুঝি মানবী বেশে ভূতীয় আকারে অবতীর্ণা। তোমাকে যুদ্ধে যাইবার জন্য আমি প্রসন্ন মনে অনুমতি দান করিলাম। তোমার এই মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া চিতোরের কুলাঙ্গনা ও কুলবধূগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধাবিত হইবে। জহর ব্রত * গ্রহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করাপেক্ষা এইরূপে বীরত্ব প্রদর্শনকরত শত্রুসৈন্য বিদলনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে দেশের শত গুণ উপকার করা হয়। তোমার শুভাগমনে চিতোর ধন্য হইয়াছে। আমার বংশ ধন্য হইয়াছে। রাজপুত জাতির মহিমা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যবনকুল দেখুক এই রাজপুত কুলকামিনীরা তাহাদের পতির একমাত্র প্রেমপিপাসা নিবৃত্তির উপাধান নহে। উহারা প্রদীপ্ত

* চিতোরপুত যবনীগণের স্বামী পুত্রেরা শেষ যুদ্ধ যাত্রায় গমন করিলে ইহারা তাঁহাদের জীবনে হতাশ হইয়া প্রজ্বলিত অনলে স্বীয় স্বীয় জীবন-বিসর্জ্জন করিতেন। উহাকে জহর ব্রত বলে।

আলোময়ী বিদ্যুৎরূপিণী। স্বামীশত্রুর প্রাণ-ঘাতিনী!! এই বলিয়া বীরবর বাহু-পাশে বদ্ধ করিয়া সেই নবীন পুষ্পকোরক বারম্বার চুম্বন করিলেন, সে চুম্বন কত মধুর। কত স্বর্গীয়! সেথ বিদায়ের কত অস্ফুট মর্ম্মবেদনায় পরিষিক্ত!! উভয় হৃদয়ের অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক সংঘর্ষণে উত্তপ্ত!! পুত্র প্রেমগদগদ চিত্তে মনে মনে ভাবিলেন আমার অস্ত্রগ্রহণ ধন্য। মাতা বীর রমণী। প্রাণাধিকা পত্নী স্বদেশ উদ্ধারে উৎসর্গীকৃত-প্রাণা। উভয়ের মধ্যে একজনও আমার যুদ্ধ যাত্রার পরিপন্থি নহে। বরং প্রাণপণে উৎসাহ দান করিয়া আমার চিত্তকে পরি-স্ফুট করিতেছে। কাহার ভাগ্যে এইরূপ শুভযোগ উপস্থিত হয়? আমি বড় ধন্যবান!!

(৪)

নিদ্রাদেবী অদ্য চিতোর নগরে কাহারও হৃদয়ে স্বীয় সিংহাসন পাতিতে পারেন নাই। আজ ধনী গৃহস্থ দরিদ্র সকলের গৃহেই এক-রূপ বীরাভিনয় চলিতেছে। সকল রাজ-পুত রমণীগণই তাহাদের পতি পুত্র ভ্রাতা-গণকে যুদ্ধের জন্য উদ্দীপ্ত করিতেছে। সকলের মুখেই সেই এক ভাষা। সকলেই বলিতেছে—"যাও বীরগণ চিতোর উদ্ধার জন্য আপন আপন অমূল্য জীবন উৎসর্গ কর। শত্রুর করে আত্মসমর্পণ করিও না। যুদ্ধ স্থান হইতে পলায়ন করিও না। রণ-জয়ী হইয়া বিজয়ীর বেশে জাতীয় ধ্বজা উড্ডীন করিয়া পুনর্ব্বার চিতোরে প্রবেশ লাভ কর। নতুবা শত্রুশরে বিদীর্ণ হইয়া চিতোরের পবিত্র মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া অমরধামে গমন কর। জীবন চিরস্থায়ী নহে। কীর্ত্তিই চিরস্থায়ী। রাজপুত কুলকামিনীরাও মরিতে জানে। তোমাদের মৃত্যু ঘটিলে নিশ্চয়ই তাঁহারা পবিত্র অনলের ব্রতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তোমাদের সহিত স্বর্গরাজ্যে মিলিত হইবে। এই অত্যল্পকাল বিচ্ছেদ জন্য ভীরুর মত প্রাণভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বংশে কলঙ্ককালিমা লেপন করিও না। প্রতিগৃহে প্রত্যেক পুরুষের কর্ণে কর্ণে উচ্চমনা রাজপুত কুলকামিনীগণ এই মহামন্ত্র প্রদান করিতেছেন। উঁহাদের চক্ষে একবিন্দু অশ্রু নাই। হৃদয়ে একটী শোকের উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয় না। সকলের মুখেই ঐরূপ বজ্রবাহী উদ্দীপনা প্রবাহ। পত্নী চুম্বন করিতে করিতে স্বামীকে সমর সজ্জায় সজ্জিত করিতেছেন। মাতা তাঁহার প্রাণের নন্দনকে আহ্লাদে বীরবেশে বিভূষিত করিতেছেন। ভগ্নী ভ্রাতার অঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র বাঁধিয়া দিতেছেন। সমস্ত চিতোর নগর আজ জাতীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত। তথায় আজ স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম মানুষকে বাঁধিয়া রাখিতে অক্ষম। এক উচ্চ মহান্ বিশ্বজনীন মানবহিতৈষণায় আজ চিতোরের নরনারী সমভাবে উদ্দীপ্ত। রাজ অস্ত্রাগার উন্মুক্ত রহিয়াছে। দলে দলে বীরগণ তথায় প্রবেশ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র বাছিয়া লইতেছেন। সকলেই পীতবসনে সজ্জিত। সকলেই যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। চারণেরা দলে দলে রাজপথে বিজয় গান গাহিতেছে। বাপ্পা, সমরসিংহ, ভীমসিংহ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বীরগণ যে যে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন সেই সকল যুদ্ধের বিজয় গান তাহারা তালমান সহ গান করিয়া রাজপুত হৃদয়ে বীরত্ব সুধা ঢালিয়া দিতেছে। উহাদের প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় চিতোর আজ যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। অবস্থা দৃষ্টে অনুমিত হইতেছে, হয় তাহারা বিজয়ী

হইবে নতুবা সমস্ত চিতোরবাসী জাতীয় স্বাধীনতার শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিবে। দেখিতে দেখিতে রজনীর তৃতীয় যাম অতীত হইল। অকস্মাৎ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। নৈশ সমীরণে সেই সুমধুর বাদ্যধ্বনি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। উক্ত মধুর শব্দে বীরগণের হৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠিল। রণসজ্জিত বেশে সকলে দলে দলে তোরণ দ্বারের অভিমুখে ধাবিত হইল। সুশিক্ষিত অশ্বাবলী ক্রেষারব করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় প্রভুকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিল। উহারাও যেন আজ মহাসমরে জীবনদান জন্য প্রস্তুত। সকলের অগ্রেই জয়মল্ল ও পুত্ত উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য দুই রণতুরঙ্গে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অসি খুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিলেন। পরস্পর পরস্পরের মনোভাব বুঝিলেন। পরস্পর পরস্পরের নিকট নীরবে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই নীরবতা কত মধুর স্বর্গীয় ও প্রাণস্পর্শী। চিতোরের দুইটী মহাপ্রাণ এইরূপে কাল-সমরে ঝম্প প্রদান করিলেন। কড়কড় বজ্র নাদে চিতোরের তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইল। উভয় সেনাপতি সর্ব্বাগ্রে বহির্গত হইলেন। সকল সেনার মুখেই জাতীয় সঙ্গীত, মধ্যে মধ্যে রণশঙ্খের গম্ভীর শব্দ, ধ্বজবাহিগণ সূর্য্যচিহ্নিত জাতীয় ধ্বজা স্কন্ধে করিয়া বহির্গত হইতেছে। চারণেরা নাচিয়া নাচিয়া যুদ্ধের বিজয় গান গাহিতে লাগিল। এইরূপ এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় ও মনোমোহিনী স্বদেশ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া রাজপুত সেনা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করতঃ নিজস্ব কেবল লাভ করিবার জন্য দলে দলে সজ্ঞ শিবিরাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। ভবিতব্যতাই জানেন ইহার পরিণাম কি!! উষার কনক-কিরণরেখা পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ আলোকিত করিয়াছে এমন সময় চিতোরবাসী দর্শন করিল পর্ব্বতের উপর হইতে এক-রক্ত-স্রোত ধীরে ধীরে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। যুদ্ধাবরোহণে পুত্তের বীর জননী নিজ পুত্রবধূ ও অন্যান্য উচ্চবংশীয়া ক্ষত্রিয় কুলকামিনীগণে পরিবৃতা ও যুদ্ধ সাজে সজ্জিতা হইয়া রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিতা হইতেছেন। যাঁহারা জীবনে কখন গৃহের বাহির হন নাই, যাঁহাদের মুখচন্দ্র বিমলিন হইবে বলিয়া সূর্য্যদেবও সভয়ে কিরণ বিতরণ করিতেন, সমীরণ ঘর্ম্মবিন্দু ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিতেন, তাঁহারা আজ কি এক আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল বলে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া লজ্জা ও স্ত্রীসুলভ কোমলতাকে বিসর্জ্জন দিয়া শিরিষকুসুমনিন্দ সুকুমার দেহ লৌহবর্ম্মাবৃত করিয়া মুখে রণগীত গাহিয়া যবনশিবিরের অভিমুখে ছুটিতেছেন। তাঁহাদের মহৎ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত অনেক কুলবালা রাজপুত মহিলা অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিতা হইয়া অশ্বারোহণে এই নারীসেনার সহিত যোগদান করিলেন। নিতান্ত ভীরু যাহারা তাহারাও এই সকল বীর রমণীর অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও বীরত্বের মহিমাময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া লজ্জাজনক নির্জ্জন বাস পরিত্যাগ করতঃ উদ্দীপ্ত হৃদয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছুটিয়া চলিল। বলিতে গেলে স্ত্রীপুরুষের এইরূপ একত্র অভিযানহেতু চিতোর একরূপ জনশূন্য হইয়া পড়িল। সকলেই স্বীয় হৃদপিণ্ড ছেদন করিয়া রক্তরাশি প্রদানে জন্মভূমি চিতোরের কল্যাণ কামনায় বদ্ধপরিকর হইল। এই মহৎভাব উচ্চ স্বদেশহিতৈষণা

বাস্তবিকই একদিন ভারতভূমির মহান গৌরব স্বরূপ ছিল। উহা একদিন জগতের আদর্শরূপে লোকনয়নে প্রতিভাত হইত।

(৫)

সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ প্রাচীগগনে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। এমন সময় দুইটী বিরাট মহাসিন্ধুর সংঘর্ষণ হইল। দুই প্রমত্ত সেনাদল পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য সংমিশ্রিত হইল। অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর অসিক্রীড়া আরম্ভ হইল। পদাতিকের সহিত পদাতিকের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষের বৈজয়ন্তীমালা প্রাতঃসমীরণে দুলিয়া দুলিয়া যেন ইঙ্গিতে বীরদিগকে যুদ্ধোৎসাহিত করিতে লাগিল। রণবাদ্য বীরগণের হৃদয়কে যেন মন্দিরোন্মত্ত করিল। সংসার ও আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া বীরগণ ঘোরযুদ্ধে মাতিয়া উঠিল। বীরবর পুত্ত সকলের অগ্রে যবন বিনাশে নিযুক্ত। তাহার সন্ধান অব্যর্থ। কখন ধনুর্ব্বাণ, কখন খড়্গ চর্ম্ম কখন শেলশূল লইয়া বীরবর অসংখ্য যবন বিনাশ করিতেছেন। অসংখ্য আঘাত প্রতিহত করিতেছেন। তাঁহার শিক্ষিত অশ্ব রণস্থল আলোড়িত করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে। তিনি যে ধীরে গমন করিতেছেন অসংখ্য যবন তদীয় অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন মুণ্ড হইয়া তথায় দলে দলে পতিত হইতেছে। রক্তের নদী বহিতেছে। ক্রমে ক্রমে বীরবর পুত্ত ভীষণ মূর্ত্তিধারণ করিলেন। তদীয় নয়নযুগল যেন অনন্ত-অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইল। যুগলহস্ত যেন মৃত্যুর নিগড়ের ন্যায় সংহার কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। তাঁহার সিংহনাদ যেন প্রলয়কালের বিষাণ ধ্বনির ন্যায় যবনসৈন্যের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। ক্রমে ক্রমে পুত্তের সহিত যুদ্ধ করিয়া যবন সৈন্য অস্থির হইল। সেনাপতিগণ চঞ্চল হইয়া প্রমাদ গণিলেন। আকবর সাহও এই সিংহকুমারের অসি ক্রীড়া পরিদর্শন করিয়া স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। তাঁহার যুদ্ধ আশা হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল। পুত্তের জননীপ্রমুখ ক্ষত্রিয় নারীগণ একত্রে অশ্বারোহণে যবনসেনা বিদলন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের আর নারীসুলভ কোমলতা নাই। ঘন ঘন সিংহনাদ ধনুষ্টঙ্কারে ও শঙ্খধ্বনিতে যবন বীরগণ কম্পিত কলেবর হইলেন। অব্যর্থ অস্ত্রাঘাতে শত শত যবন ছিন্নগ্রীব হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল, পুত্রজননী ভীমা ভগবতীর বেশে রণস্থল আলোড়িত ও দশদিক কম্পিত করিয়া বিদ্যুৎবেগে সমরাঙ্গন প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। তিনি যবনসৈন্যের ভিতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাহারও যেন অনুসন্ধান করিতেছেন বোধ হইল। বহু অনুসন্ধান পর তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি কিছু দূরে আকবর সাহাকে দর্শন করিয়া অতীব প্রীত হইলেন। এবং এক শ্রবণভৈরব শব্দে উচ্চচীৎকার করিয়া পুত্তকে বলিলেন পুত্ত ঐ দেখ সম্মুখে তোমার পিতৃহন্তা। শীঘ্র এস, শীঘ্র এস ঐ সম্মুখে তোমার পিতৃঘাতক!! মাতার কথায় পুত্তের হৃদয়,চমক ভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন এক প্রকাণ্ড হস্তী পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া আকবর নিজেই সৈন্যপরিচালন ও তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। ক্ষত্রিয় বীরগণের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া যবনসেনা বাণাঘাতে জর্জ্জরিত

কলেবরে দলে দলে পলায়ন করিতেছে। এমন সময় পুত্র সদলে আকবর সাহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নারীসেনাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। পুত্রের বীরজননী সকলের অগ্রে নিষ্কোষিত কৃপাণ হস্তে হুহুঙ্কার শব্দে রণচামুণ্ডাবেশে ধাবিতা হইলেন। যবনসেনাপতি এই ভয়ঙ্কর বিপদ অবলোকন করিলেন। এবং বুঝিলেন পুত্রও এই রণভীমা রাক্ষসীদিগের হস্তে আর সম্রাটের রক্ষা নাই। তৎক্ষণে তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া বহু শত সাহসী সেনা লইয়া আকবরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সম্রাটকে রক্ষা করিবার জন্য অসংখ্য মুসলমান সেনা তদীয় সঙ্কেতে স্তরে স্তরে সৌধপ্রাচীরের ন্যায় পথ আগুলিয়া দণ্ডায়মান হইল। যবনসেনাপতি আকবর সাহকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন আপনি শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ করুন। ঐ দেখুন প্রতিশোধ-পিপাসু রাজপুতসেনা ও পুত্রজননী আপনাকে সংহার করিবার জন্য সমুপস্থিত। এই সময় আপনি পলায়ন করুন। নতুবা আপনাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিব না। সৈন্যগণ নিজ নিজ জীবন দিয়া ততক্ষণ বিপক্ষের অগ্রগতি রোধ করুক। সম্রাট সেনাপতির কথা শুনিলেন। সেই কাল বৈশ্বানররূপিণী, রণোন্মাদিনী, ভৈরবীবেশ-ধারিণী, বর্ম্মপরিহিতা, অসিভল্লে সুসজ্জিতা, অশ্বারূঢ়া পুত্রজননীর সেই রণরঙ্গিনীরূপ পরিদর্শন করিলেন। সেই ঘোর অট্টহাস্য শ্রবণ করিলেন। প্রতিহিংসার ভীষণ দৃশ্য তাঁহার নয়ন ও বদনে যেন পরিস্ফুট। সেই ভীষণমূর্ত্তির প্রতি তাঁহার চাহিবার আর শক্তি রহিল না। এই বীর রমণীর অবস্থাদৃষ্টে আর একটী রাজপুত বীরাঙ্গনাকে তাঁহার মনে পড়িল। সেই নৈশ যুদ্ধের কথা মনে পড়িল। সেই উদয় সিংহের প্রাণপ্রতিমা জীবনের সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম বীরাঙ্গনা বীরাকে * মনে পড়িল। তাঁহারও এইরূপ রণচামুণ্ডার ন্যায় ভীষণমূর্ত্তি ছিল। সেই মূর্ত্তির নিকট আকবর পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই ভয়ঙ্করী পুত্রজননী বুঝি তাহাপেক্ষাও বিভীষণা। ঘোর প্রতিহিংসা পরায়ণা! আরও অনেক বীর রমণী এই বীরাঙ্গনার সহচরী। আকবর এইরূপ ভীষণ যুদ্ধাবস্থা পরিদর্শন করিয়া কম্পিত কলেবর হইলেন। তাঁহার বীর হৃদয়ে দারুণ ভীতির সঞ্চার হইল, বদন কালিমারাগে রঞ্জিত হইল। হস্তীচালক ইত্যবসরে সেনাপতির ইঙ্গিত পাইয়া অন্যদিকে হস্তী চালাইয়া সম্রাটের প্রাণরক্ষা করিল। অসংখ্য যবন সৈন্য প্রভুর প্রাণ রক্ষায় নিজ নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সেইদিনকার ভীষণাহবে সম্রাটের জীবন রক্ষা করিল, পুত্রের ও তদীয় জননীর অস্ত্রাঘাতে যবনসৈন্য ছিন্নমুণ্ড হইয়া পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত হইল। কিছুতেই পুত্র ও তদীয় জননী যবনব্যূহ ভেদ করিতে পারিলেন না। ভীষণ যন্ত্রনাদী অনেকগুলি কামান সেই যবনব্যূহের অগ্রভাগে অনলরাশি উদ্গীরণ করিতে লাগিল।

অন্য পার্শ্বে অয়মল্ল প্রমত্তভাবে যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি দুর্গপ্রাকার রক্ষার জন্য বহুতর রাজপুত সেনাসহ যুদ্ধ করিতেছেন। যবনের অনলস্রিপূর্ণ ভীষণ গোলকবাজি দুর্গপ্রাকার ধূলিসাৎ করিবার জন্য শিলাবৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতেছে। অয়মল্লের বীর সৈন্যেরা উক্ত রক্তগোলক বক্ষপাতিয়া লইতেছে।

* রাণা উদয় সিংহের প্রাণরক্ষিত্রী।

তদীয় বীর সৈন্যগণ লৌহাস্ত্র প্রহারে উক্ত অগ্নি গোলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু কতক্ষণ এরূপ যুদ্ধ চলিবে। যবনের প্রক্ষিপ্ত অনেক গোলা কাটিয়া গিয়া রাজপুত সেনাগণকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিতেছে। প্রাচীরের ইষ্টক প্রস্তরাবলীকে রেণু রেণু চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিতেছে। জয়মল্ল এইরূপ ভীষণ সংহার ক্রীড়া দর্শন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে অতি ক্রোধ উপস্থিত হইল। যখন ক্ষত্রিয়গণ এইরূপ অগ্নিগোলক প্রহার করেন না লৌহ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের যখন একবারেই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার নাই তখন তাহাদের বিরুদ্ধে কামান ও বন্দুক প্রয়োগ করা একবারেই সমরনীতির বিরোধী; এবং ঘোরতর অধর্ম্মের কার্য্য। কিন্তু জয়মল্ল ভ্রান্ত, যবনেরা হিন্দু নহে, তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ অতি অল্প, যে উপায়ে পারে শত্রু নাশ করা তাহাদের একমাত্র ইচ্ছা। চিতোর ধ্বংস করা তাহাদের কঠিন পণ। জয়মল্ল এইবার গোলক প্রহারী যবন সেনাদলকে আক্রমণ করিবার জন্য রাজপুত যোদ্ধাগণকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র অসংখ্য রাজপুত সেনা নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া কামান অধিকারে ধাবিত হইল। তাহারা হর হর বম বম শব্দ করিয়া কামান লইবার জন্য ছুটিল। জয়মল্লও অশ্বারোহণে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এমন সময় অকস্মাৎ একটী গুলি তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। বীরবর অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। এবং মহা ক্রোধে দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন নারকী যবন তোমার কি ইহাই বীরজনোচিত ধর্ম্ম। এইরূপ গুপ্তহত্যা কি মুসলমান ধর্ম্মের অনুমোদিত? ধিক্ তোদিকে! ধিক্ তোদের পুরুষার্থে! ধিক্ তোদের বীরত্বে!! বীর জয়মল্লের দেহ হইতে তখন প্রবলবেগে রুধিরস্রোত পতিত হইতেছিল। বীরবর ক্রমশঃই ক্লান্ত হইতে লাগিলেন। এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন চিতোরের শেষ। রাজপুতগণ আর কামানের নিকট কিছুতেই চিতোর রাখিতে পারিবে না। কিছুতেই বংশগৌরব আর রক্ষা হইবে না। বিধর্ম্মী যবনেরা ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানে না। মাতঃ চিতোর এ অধম সন্তান অকিঞ্চিৎকর জীবন বিনিময় দ্বারা তোমার কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিল না। মরিবার সময় এই গভীর দুঃখেই মা হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। মাতঃ জন্মভূমি বিদায়! বিদায়!! এই বলিয়া বীরবর দারুণ অভিমানে ক্রোধজর্জ্জরিত হৃদয়ে যবনকুলকে অভিসম্পাত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। যবনসেনা আল্লাহো আকবর শব্দে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া এই বিজয় ঘোষণা করিল। তাহাদের রণবাদ্য, গোলার গুড়ুম গুড়ুম বজ্রনাদ রণস্থল কম্পিত করিয়া জয়মল্লের নিধনবার্ত্তা বিঘোষিত করিল। রাজপুত সেনা দেখিল বীরবর জয়মল্ল নিহত হইয়াছে। যবন সেনাগণ বিজয়ের আস্বাদ পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ক্ষত্রিয়গণকে আক্রমণ করিতেছে। আর বুঝি রক্ষার উপায় নাই। গুড়ুম গুড়ুম করিয়া কামান বজ্রশব্দে অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। ক্ষত্রিয় সেনা এইসকল অবস্থা পরিদর্শন করিয়া ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল। আর শারীরিক বলের যুদ্ধনাই। শুধু অস্ত্র শস্ত্রের যুদ্ধ নাই। সেই বীরত্বের

যুগ, সেই সম্মুখ যুদ্ধে বল পরীক্ষার কাল অতীত হইয়াছে। নবা বিজ্ঞানমূলক কামান যুদ্ধ মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক চালিত হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষত্রিয় বীরধুরন্ধরেরা সিংহসম বলশালী ও যুদ্ধনিপুণ হইলেও কামানের মুখে কিছু করিতে পারিলেন না। দলে দলে নিধনপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পুত্র দূর হইতে জয়মল্লের মৃত্যু দর্শন করিলেন। তাঁহার অমানুষিক বীরত্ব দর্শন করিয়া এতক্ষণ তাঁহাকে মনে মনে শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছিলেন। অধর্ম্ম যুদ্ধে জয়মল্লকে এইরূপে নিহত হইতে দেখিয়া বীরবর অতিশয় ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তদীয় মুষ্টিবল যেন আরও ভীমবলে দৃঢ় হইল! তিনি আরও ভীমবলে যবনসেনা-সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একদল যখন মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে অপরদল তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। যবন সৈন্যসাগর কিছুতেই নিস্তরঙ্গ হইবার নহে। উহা অনন্ত, অসীম এবং কল্লোলময়। যবনেরা ঘন ঘন কামান গর্জ্জনদ্বারা শত্রুবিদলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক এক গোলার আঘাতে বহুতর ক্ষত্রিয় সেনা বিচূর্ণিত হইতেছে। যবনের সিংহনাদ ক্রমশঃই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। তাহারা সেনাপতির আদেশে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নারীসেনা বেষ্টনের চেষ্টা করিতে লাগিল। পুত্তের জননী ও তদীয় সঙ্গিনীগণ এক্ষণে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভিতরও রক্তবর্ণ অগ্নি গোলক পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আর রক্ষা নাই। এই আগ্নেয় যুদ্ধে জয়লাভ করা একবারেই অসম্ভব। কিছুকাল এইরূপ ভাবে যুদ্ধ চালাতে থাকিলে অবশ্যই যবনকর্ত্তৃক হত হইতে হইবে। যবন কবলিত হইলে বংশগৌরব বিলুপ্ত হইবে এই চিন্তা করিয়া পুত্তজননী স্বীয় সঙ্গিনীগণের নিকট আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কোনও বীর রমণীর হৃদয় কম্পিত হইল না। কেহই তাঁহার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। সকলে একবার প্রফুল্ল মুখে চিতোরের উচ্চ প্রাসাদচূড়া, কীর্ত্তিস্তম্ভ ও প্রাকারের প্রতি শেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সকলে একবার রণস্থলে জীবিত স্বামী ভ্রাতাগণের মুখ চাহিয়া লইলেন। সকলে একবার জগৎকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন। পরক্ষণেই সকলে স্বীয় স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন। সকলেই একবার ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যপানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মনে মনে তাঁহার স্তুতি করিলেন। তৎপর উক্ত ছুরিকা আপন আপন হৃদপিণ্ডে আমূল বসাইয়া দিয়া জীবনের শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। উঁহাদের রুধিরাক্ত দেহাবলী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইল। লোহিত জলে সোণার মৃণাল ভাসিতে লাগিল। ভীরু যবনেরা এইরূপে রাজপুত রমনীকুলকে নিহত হইতে দেখিয়া হুঙ্কার শব্দে বিজয়োল্লাসে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। আকবর সাহ এই বীরাঙ্গনাদিগের এইরূপ অদ্ভুত হৃদয়বলের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন। পুত্ত নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন তাঁহার বীরমাতা প্রাণাধিকা পত্নী সুকুমারী ও উঁহাদের সহ গামিনী রাজপুত বীর নারীগণ স্বর্গ গমন করিলেন। তাঁহারা চিতোরের লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। বীরাঙ্গনারা জন্মের মত চিতোর

পরিত্যাগ করিলেন। এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে শুরুশোকশেল বিদ্ধ হইল। মুহূর্ত্তে সেই বীরহৃদয় শোকের বজ্রাঘাতে যেন কম্পিত হইল। ধীরে ধীরে চিতোর রক্ষার আশা তাঁহার বীর হৃদয় হইতে অপনীত হইতে লাগিল। সেই সময় তিনি পশ্চাৎ ভাগে নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন বিজয় গান গাহিতে গাহিতে এক বীরসেনাস্রোত সহসা আসিয়া রণস্থল আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা সকলেই রাজপুত সেনা। তাঁহারা জয়মল্ল ও রাজপুতকুল উজ্জ্বলকারিণী যুদ্ধসাজে সজ্জিতা সমর নিপুণা সেই বীরাঙ্গনাগণকে সম্মুখ সমরে নিহত হইতে দেখিয়া "বীরা"* গ্রহণ পূর্ব্বক পীত বসন পরিধান করিয়া জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া শেষ যুদ্ধে সমুপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রাণের কামনা এই অদ্য সুতীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে অসংখ্য যবন সেনা নিপাত করিয়া শেষ শয্যায় শয়ন করিবেন। তথাপি জীবন থাকিতে যবন-করে আত্মসমর্পণ করিবেন না। ধিক আত্মসমর্পণ! যবনের করে আত্মসমর্পণ! আত্মসমর্পণ পরাধীনতার একটী সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল। মৃত্যু অপেক্ষাও মর্ম্মঘাতী। নীচত্বের একটী পরিষ্কার প্রতিমূর্ত্তি! নরকের একটী প্রশস্ত পথ। হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের একটী পরিস্ফুট পাপচিত্র। চিরস্বাধীন বীর রাজপুত জাতিরা প্রাণ থাকিতে তাহা কখনই পারিবে না। তাহার পরিবর্ত্তে শত্রু অস্ত্রে বিদীর্ণ হইয়া রক্তাক্ত দেহে ভূমিতলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিবে। তথাপি যবন করে আত্মসমর্পণ করিবে না।

পুত্ত নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন অবশিষ্ট নগরবাসী রাজপুত বীরগণ "বীরা" গ্রহণ করিয়া নিষ্কোষিত কৃপাণহস্তে জীবনের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া শেষ যুদ্ধে আগমন করিয়াছে। এবং অমিতবিক্রমে যবনসেনা উন্মূলিত করিতেছে। তিনি বুঝিলেন চিতোর রক্ষার আশা নাই। তোপের মুখে অস্ত্রবল বৃথা। তথাপি যত পারি যবনসেনা সংহারপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিব। পুত্তের মনে আবার দৃঢ়তা আসিল। যুগল নয়নে আবার অগ্নি বহির্গত হইল। আবার হস্তের মুষ্টি দৃঢ় হইল। আবার জয় হর হর বম বম শব্দে যবনসেনা মথিত করিতে লাগিলেন। আবার সিংহগর্জ্জনে শত্রুসেনা বিদলন করিলেন। তাঁহার ও তদীয় সহযোগীগণের হস্তে যতই যবনসেনা নির্ম্মূল হইতে লাগিল ততই নূতন নূতন সেনা আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিতে লাগিল। যবনের কামানবিনির্গত রক্তবর্ণ গোলাঘাতে আহত হইয়া শত শত রাজপুত সেনা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া আকাশ পথে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে পুত্তের অশ্ববর গোলাঘাতে ভূপতিত হইল। পুত্ত মৃত্তিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া খড়্গ চর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দেখিয়া অসংখ্য যবনসেনা "আল্লা হো আকবর" শব্দে সমরস্থল কম্পিত করিয়া তদীয় অভিমুখে ধাবিত হইল। অসংখ্য যবনসেনা একেবারে শত শত অস্ত্র তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। আশ্চর্য্য শিক্ষাবলে বীরবর তৎসমুদয় প্রতিহত করিতে লাগিলেন। বীর অভিমন্যুর ন্যায় সংগ্রামস্থল আলোড়িত করিয়া শত্রু বিদলন করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু কেবল মাত্র সপ্তরথী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল।

* সেবিদায় লইবার সময় রাজপুতগণ "বীরা" বা তাম্বূল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বীরবর পুত্র শত সংস্র যবনসেনা কর্তৃক প্রবলভাবে আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ। যতক্ষণ তাঁহার শক্তি ছিল। অস্ত্রমুষ্টি দৃঢ় ছিল ততক্ষণ কোনও যবনসেনা তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারে নাই। অবিরত রক্তস্রোতে বীরবর ক্রমশঃ হতবল হইয়া তদীয় হস্তে নিহত অসংখ্য যবন সেনার উপর পতিত হইলেন। সেই মৃত সৈন্য স্তূপের উপর যেন সুমেরুর স্বর্ণচূড়া খসিয়া পড়িল। সেই রক্ততরঙ্গের উপর যে মন্দারকুসুম ভাসিতে লাগিল। চিতোরের আশা ভরসা সমস্তই ফুরাইল। বীরবরের শেষ নিশ্বাস বায়ুসাগরে মিশাইয়া গেল। যবনসেনা বিজয়োন্মত্ত। উহাদের রণবাদ্য বিজয়গান গাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে বাজিয়া উঠিল। এক ভ্রবণ ভৈরব উন্মত্ত পাশবিক শব্দে যবনেরা রণস্থল কম্পিত করিল। দেখিতে দেখিতে অবশিষ্ট রাজপুত সেনাকুলও যবনসেনা-সমুদ্রে মিলাইয়া গেল। সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্তব্য পরিসমাপ্তির পর রক্তাক্ত কলেবরে বীর শয্যায় শয়ন করিল। বীরগণ চিরদিন এইরূপ মহাশয্যায় শয়নেরই পক্ষপাতী।

(৬)

আকবর সাহের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল। তিনি বিপুল মোগলকটক সহ সেই মৃত রাজপুতদিগের রক্তমাখা অসংখ্য দেহকে পদবিদলিত করিয়া চিতোর দুর্গে প্রবেশ করিলেন। কামান দ্বারা উহার দুর্গপ্রাকার, বিজয়স্তম্ভ ও প্রাসাদাবলি বিচূর্ণ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। তদীয় আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল। নগরের বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রীলোক সকলেই তদীয় অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন করিল। এইরূপ ধ্বংস কার্য্য তিনদিন তিনরাত্রি অবাধে চলিয়াছিল। ইন্দ্রের অমরাবতী তুল্য চিতোর নগরী গোলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও ধ্বংসীভূত হইল। সেদিনকার মহাযুদ্ধে ত্রিংশৎ সহস্র রাজপুত সেনা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরগণ দ্বারা পীত বসনের সম্মান উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল প্রকার রাজদূত, সমস্ত সমিতির অধিনায়ক এবং রাণার সপ্তদশ শত নিকটস্থ কুটুম্ব সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। নয়জন রাজমহিষী, পাঁচজন রাজকুমারী, দুইটী অল্পবয়স্ক রাজশিশু, এবং সমস্ত সর্দ্দারকুলের মহিলাগণ সুকঠোর জহোর ব্রত সমাপনে অথবা সম্মুখ সংগ্রামে স্বীয় স্বীয় জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছিল। সেই দিন হিন্দুর পক্ষে ভীষণ দুর্দ্দিন। উক্ত যুদ্ধ সংবৎ ১৬২৪ রবিবার ১১ই চৈত্র (খৃঃ ১৫৬৮) সালে সংঘটিত হইয়াছিল। সেই দিন রাজপুত স্বাধীনতাদেবীর প্রাণপ্রদায়িনী মহাশক্তি ভগবতী আদ্যাশক্তি চিরদিনের জন্য চিতোরনগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চিতোরের স্বাধীনতার অবসান হইল। এই কাল যুদ্ধে কেবলমাত্র তুমার নৃপতি ভবিষ্যতের কোন গুরুতর কার্য্য উদ্ধার জন্য জীবিত ছিলেন। আকবর তুমি না জগৎগুরুরূপে আপনার পরিচয় প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হও না। তুমি না সমদর্শী! তুমি না শিল্প কলার প্রধান সহায়? এই চিতোর ধ্বংসই তাহার কি সুন্দর উদাহরণ? ইহাদ্বারা তোমার হৃদয়ের কঠোর হিন্দু বিদ্বেষের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আলাউদ্দিন বা কঠিন হৃদয় রাজ বাহাদুরের প্রচণ্ড বিদ্বেষানল হইতে চিতোরে যে সকল মন্দির, শোভনীয় প্রাসাদাবলী এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষা পাইয়াছিল তৎসমুদায়ই তুমি ধ্বংস

করিয়া প্রাণের আলা জুড়াইয়াছিলে! ইহা কি তোমার প্রবল হিন্দু বিদ্বেষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে? তোমার পাশবিক অত্যাচারে চিতোর জনশূন্য হইয়াছিল তুমি চিতোরের নাকরাসমূহ, চতুর্ভুজা দেবীর গৃহস্থিত দীপবৃক্ষ এবং চিতোরের সিংহদ্বারের সুদৃঢ় কপাট অপহরণ করিতে লজ্জা বোধ কর নাই। তোমার রাজনীতি উপরে বেশ মসৃণ ও মানব হিতৈষণায় পরিপূর্ণ হইলেও ভিতর কিন্তু গলাহলপূর্ণ। এই কূটনীতি কর্তৃক হিন্দুর যে প্রকার গুরুতর ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে অপর কোন মুসলমান সম্রাটগণ কর্তৃক কখনই তাহা সংঘটিত হয় নাই! তুমি মোহনীয় প্রলোভনের বাগুরাজাল বিস্তৃত করিয়া রাজপুতগণকে বশীভূত করতঃ তাহাদের কুলকন্যাদিগকে—স্বর্গের দেববালাগণকে বিবাহ করিয়া উহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলে! তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া "নরোজা মেলা" বসাইয়া অসংখ্য রাজপুত মহিলার সতীত্বরত্ন অপহরণ করিয়া মনের আলা জুড়াইয়াছিলে!! ইহা কি তোমার হিন্দু-বিদ্বেষবহ্নির জ্বালাময়ী শিখারাশি নহে? ইংরাজকুলতিলক মহামতি টড সাহেব স্বীয় ইতিহাসে তোমার যে দানবমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কাল সলিলে কখনই ভাসিয়া যাইবে না। চিরদিনই তোমার পাপের হলাহল মাখা সেই বিকৃতচিত্র জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত রহিবে। পাপ কখন প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবার বস্তু নয়। সে কোন কালে আপনার বীভৎসমূর্ত্তি জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিবেই করিবে! তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকে তোমাকে বীর বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। গুপ্তভাবে রাজপুত কুলতিলক জয়মল্লকে নিধন করা কি তোমার বীরত্বের উজ্জ্বল পরিচয়? এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা তোমার হীন চরিত্রতারই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট তোমার আদর অতি নিম্নে।

এই প্রবল ধ্বংসের পর চিতোর নগরী আর কখন উত্থানের সময় প্রাপ্ত হয় নাই। কারণ পরবর্ত্তী মহারাণা প্রতাপসিংহের সময়ও চিতোর মুসলমানাধিকৃত ছিল, এক কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয় সুত দ্বারা চিতোরের শাসনকার্য্য সম্পাদিত হইত। প্রতাপসিংহ তাঁহার জীবনব্যাপী বহু চেষ্টা দ্বারা চিতোর নগর উদ্ধার করিতে পারেন নাই। সুতরাং যবনদিগের দারুণ আগ্নেয় অস্ত্রাঘাতে চিতোরের যে সমস্ত অংশ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার গঠিত হয় নাই। তৎপরবর্ত্তীকালও শান্তির যুগ নহে। পরবর্ত্তী রাণাগণ যবনের আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। নবনগরী উদয়পুর মিবার রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় পরবর্ত্তী রাণাগণ আর চিতোর ধ্বংসাবশেষের গঠনকার্য্যে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তজ্জন্য ক্রমে ক্রমে চিতোর নগরী ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছিল। উহা আজ সিংহ ব্যাঘ্র ও বিষধর সর্পের আবাসভূমি। প্রাচীন কীর্ত্তির সমাধি মন্দির!

এই ভীষণ যুদ্ধের গুরুত্ব ও লোক ক্ষয়ের ইহাই যথেষ্ট পরিচয় যে, যেসকল রাজপুতগণ সম্মুখসমরে নিহত হইয়াছিলেন উহাদের যজ্ঞোপবীতের ওজন ৭৪৪০ মণ হইয়াছিল †। সেইদিন হইতে উক্ত ৭৪৪০ মণ অঙ্ক তিনক বা দিব্যরূপে কি সকল প্রকার পত্রে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই চিহ্নের ভিতর কি এক গুরুতর উদ্বেগরাশি নিহিত রহিয়াছে। উহা উক্ত মহাযুদ্ধেনিহত বীরগণের রক্তের ছাপ। যে এই পত্র খুলিবে সেই উক্ত হিন্দু হত্যার পাতকী হইবে। কার্থেজ বীর হানিবাল কানিনগরের প্রসিদ্ধ সমরে যে সকল রোমীয় অশ্বারোহী বীরগণকে নিহত করিয়াছিলেন উহাদের অঙ্গুরীয়কের ওজন করিয়া আপনার জয় পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেন। চিতোরের যুদ্ধে অনেক উপবীত বিহীন ক্ষত্রিয় শিশু অনেক বীরাঙ্গনা ও বহুতর নিম্ন হিন্দু প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, উহাদের উপবীত ছিল না। সুতরাং উপরোক্ত যজ্ঞোপবীতের ওজনে মৃতব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত হয় না।

† এই মণ পাকা চারি সের। কিন্তু টড সাহেব ইহাকে ৪০ সেরে মণ ধরিয়াছেন।

যজ্ঞোপবীত দৃষ্টে যেরূপ মৃত্যু সংখ্যা অনুমিত হয় প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে তদপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক লোকের উক্ত সংহারে মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

আকবর আপনার বীরকীর্ত্তি সংরক্ষণের জন্যই হউক বা বীরপ্রবর জয়মল্ল ও বীর শিশু পুত্রের বিস্ময়জনক বীরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশেই হউক বীরত্বে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের সিংহদ্বারে অতি উচ্চ প্রস্তর বেদীর উপর তাঁহাদের উভয়েরই পাষাণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। দুই শত বৎসর হইল ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়র সাহেব তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে (১৬৬৫।৬৬শা জুলাই তারিখের পত্রে) তিনি পুত্রজয়মল্লের এই মূর্ত্তিদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন জয়মল্ল চিতোরের রাজা। পুত্র তাঁহার ভ্রাতা। এই দুই মূর্ত্তি গজের উপর আরূঢ় ছিল। আমি উহাদের বীরত্বের বিষয় অবগত হইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। পুত্র তদীয় জননী ও স্ত্রীর সহিত এই যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। বার্ণিয়র সাহেব জয়মল্লকে চিতোরের রাজা ও পুত্রকে তদীয় ভ্রাতা বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নিতান্তই ভুল। তিনি বোধ হয় কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উহাদের ভুল পরিচয় পাইয়াছিলেন। মহাত্মা টড সাহেবের ইতিহাসই রাজস্থানের যথার্থ ও সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস। তিনি বহু অনুসন্ধানে রাজস্থানের রাজাদিগের দপ্তরের বহু কাগজ পত্র দৃষ্টে উহা প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীকে চিরকৃতজ্ঞতার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে চির আবদ্ধ করিয়াছেন।

মহাবীর স্বদেশপ্রাণ জয়মল্ল ও পুত্র রাজস্থানে আজও দেবতার মত পূজিত। ভট্টকবিগণ তাঁহাদের বীরত্বের শত চিত্র কবিতাকারে প্রকাশ করিয়া এখনও রাজপুত বীরগণের হৃদয়ে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। এখনও রাজপুত মহিলাগণ দেবতাদিগকে সান্ধ্য প্রদীপ প্রদর্শন করিয়া নত মস্তকে পুত্র ও জয়মল্লের ন্যায় বীরপুত্র লাভের প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যব গোধূম চূর্ণ করিবার সময় রাজপুত মহিলাগণ এখনও পুত্র-জয়মল্লসম্বন্ধীয় বীরগাথা গান করিয়া আপনাদিগকে সুখী ও গৌরবান্বিত মনে করেন। পুত্র ও জয়মল্ল তোমরা রাজস্থানে জন্ম গ্রহণ করিলেও জগতের অলঙ্কার। জগতে যত দিন স্বাধীনতার সম্মান রহিবে যতদিন বীরত্বের পূজা রহিবে ততদিন পৃথিবীর নরনারীগণ তোমাদের উদ্দেশে ভক্তিপুষ্প বর্ষণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবেন। ভারতকে বীরমাতা বলিয়া পূজা করিবেন।

শ্রীরামতারণ রায়।

ক্ষয়রোগ নিবারণ সম্বন্ধে দু'একটী কথা

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আজ কয় মাস ধরিয়া "গৃহস্থে" ক্ষয়রোগের নানা কথা আলোচনা করিতেছেন। সহজে যাহাতে ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়, তাহার জন্য অনেক উপদেশ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমার বহু আত্মীয়-আত্মীয়া ক্ষয়রোগে মারা গিয়াছেন সুতরাং ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধই বিশেষ মন দিয়া পড়িয়াছি। তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে, ক্ষয়রোগ যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে, তাহার উপায় ঠিক করিয়া দিতেই তিনি বড় ব্যস্ত। যাহার রোগ হইয়াছে, তাহার মুক্তি কিসে হইবে, তাহা কিন্তু কোথাও বলিতেছেন না। রোগটা বেশী না ছড়াইয়া পড়ে, তাহার তিনি নানা উপায় দেখাইয়াছেন। সে সকল পড়িলে মোটের উপর মনে হয়, আগুনই সকলের চেয়ে ভাল ঔষধ। তাহাই যদি হয়, তবে সেই কথাটা কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন

না কেন? ক্ষয়রোগীর গয়ার (কাস), থুথু ইত্যাদি যক্ষা রোগীর হাসপাতালের ব্যবস্থার মত পুড়াইয়া ফেলিবার জন্য বাড়ী হইতে দূরে স্থানও সকলের নাই বা কোনও বন্দোবস্ত নাই,—গৃহস্থে সে সকল করিবেই বা কিরূপে? একবার একটি কাস উঠিল, অমনি সেটি আগুনে ফেলা হইল—এ রকম করা অসাধ্য আর তাহা না হইলে কাস দুএক ঘণ্টা জমিতে দিলেই শুকাইয়া যাইবে, আর উপেন্দ্রবাবুর কথা মত ব্যাসিলিগুলি উড়িয়া বাড়ী শুদ্ধ সকলকে ছাইয়া ফেলিবে! ইহা হইলে ত নাচোর! তাহার চেয়ে আমার মনে হয়, ভিজা রুমালে বা ছেঁড়া কাপড়ের টুকুরায় কাস ফেলিয়া, সেই রুমাল বা কাপড়ের টুকুরা আর রোগীর জামা, কাপড়, বিছানার চাদর বালিশের খোল, এই সমস্ত, সারাদিনের মধ্যে এক সময় গরম জলে কাচিয়া লইলেই ব্যাসিলির ঝাঁককে ঝাঁক মরিয়া যাইবে, বাবাজীরা আর উড়িতে পারিবেন না!

তারপর ক্ষয়রোগীর মুক্তির উপায় কি?—ডাক্তার বাবু বিশ্বাস করেন, একাল পর্য্যন্ত অনেক ব্যাকৃট্রিসাইড বা জারমিসাইড ঔষধ বাহির হইয়াছে আর ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন, কোথায় ব্যাকৃট্রিয়া বা জারম্‌স্ জমিয়া আছে,—তা যদি হয়, তবে সেই সকল জায়গায় ঐ সকল জারমিসাইড ঔষধ ঢালিয়া দিবার উপায় করেন না কেন? বুকে যাহাদের রোগ জমে তাহাদের তবু "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল"-র মত একটু উপায় করা হইয়াছে—নাকে সোঁকা, আর কোথাও হইলে, তাহাদের কোন উপায়ই করা হয় নাই। নাকে সোঁকার ব্যবস্থাতেও যে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাইতেছে, তাহা মনে হয় না। অনেকে বলেন—জ্বর না থাকিলেই টিবার্কিউলিন ইন্‌জেক্‌ট করিলেই আরাম হওয়া—একবারে বাঁধাবাঁধির মধ্যে, কিন্তু অনেক স্থলেই ইন্‌জেক্‌শানের ফল হয় না আর অনেক স্থলে জ্বর ছাড়েও না—ছাড়িবার কথাও নহে,—রোগ থাকিতে ছাড়িবেই বা কেন? অথচ জ্বরের জন্য রোগী দিন দিন জীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহার দেহের তার কমিয়া যায়, মাংস শুকাইয়া যায়, রক্ত কমিয়া যায়, তাহার যে উপায় কি, তাহা আজিও কেহ ভাবিতেছে না। রোগী এভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, 'টিবার্কিউলিন' দিবার সময় আপনিই চলিয়া যায়, রোগীও চলিয়া যায়।

ইহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে জারমিসাইড ঔষধ পঁচিশ গণ্ডা বাহির হইল অথচ জারম্‌ যেখানে জমিয়া আছে, সেখানে সেগুলি ঢালিয়া দিবার পথ করা হইল না। আমাদের দেশে যাঁহারা 'প্যাথলজিষ্ট' হইয়াছেন বলিয়া আপনা আপনি গুমোর করেন, তাঁহারাও তাহার জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহারাও আশায় আশায় বসিয়া আছেন, কবে কোন ডাক্তার সাহেব তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিবেন?

আর একটা কথা,—দেশের রিনিমত্তার উপর দেশের ডাক্তারদের নজর পড়ে না কেন, বলিতে পারি না। এই যে চন্দ্র সূর্য্য যতদিন, ততদিন থেকে সকল প্রকার সর্দ্দি কাসিতে পুরাতন মি মালিসের ব্যবস্থা আছে, তার কারণ কি? এটা জারমিসাইড কি না, তাহা কেউ পরীক্ষা করিয়া দেখেন না কেন? কেবল যে কাসি সর্দ্দিতেই ইহা ব্যবহার হয়, তাহা নহে,—আমাশয়ে যখন মাংস পচিয়া বাহির হয় (অর্থাৎ এখনকার মতে ইন্‌টেষ্টিনাল ঘাইসিস), জরাতিসারে উহা মালিসের নিয়ম ছিল। সাহেব ডাক্তারেরা বোধ হয় উহার খবর পায় নাই, নতুবা এতদিন উহার পরীক্ষা হইয়া যাইত।

আক্, আর বেশী কিছু বলিবার নাই,—ফল কথা রোগীর মুক্তির উপায় কিছুই হয় নাই। দেশী "প্যাথলজিষ্টরা" সাহেব প্রভুর মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন,—ততদিনে রোগীর দল নির্ম্মূল হউক।

জনৈক ভুক্তভোগী।

মফঃস্বলের বাণী

১। স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার আদর্শ

ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রথম প্লাবনে যখন বঙ্গদেশ ডুবু ডুবু হইতে আরম্ভ হয়, তখন আমরা আমাদের গৃহলক্ষ্মী সম্পত্তি সমুদায়ের প্রতি দৃকপাতশূন্য হইয়া সেই বারিরাশিতে দেহ ভাসাইয়া দিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম এই স্রোতের সাহায্যেই তীরে উত্তীর্ণ হইব। প্রথমতঃ আমরা ইংরাজী না শিখিলে সাহেবদের কাছে আদর ও সম্মান পাওয়া যায় না দেখিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলাম—পরে সেই স্রোতোবেগে আমরা গৃহ ছাড়িয়া, স্বদেশ স্বজাতীয় ভাব হইতে দূর হইতে দূরতর স্থানে ভাসিয়া যাইয়া, ক্রমশঃ বিজাতীয় বিদেশীয় দৃশ্যের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নব তেজ, নব ভাব, নব বলে দৃপ্ত, পাশ্চাত্য জাতির কুলবালাগণও পুরুষেরই মত একই ধরণে পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতেছে, পুরুষেরই মত, পুরুষের সহিত নানা জ্ঞানগর্ভ কথা বলিতেছে, অমনই আমরা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া উঠিলাম, শাস্ত্র হইতে প্রমাণ তুলিলাম "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—যেন এত দিন, যে দেশে এই সত্য প্রচারিত হইয়াছিল, সেদেশ হইতে এই ভাব মুছিয়া গিয়াছিল। তখন আমরা একবার দেখিয়াও দেখি নাই "এবং" শব্দের অর্থ কি, আমাদের "কন্যা" বাস্তবিকই ছিল না, তাহা প্রকৃতই অপহৃত হইয়াছিল। আজ, নগরে নগরে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বহু ছাত্রী, ছাত্রবৃত্তি, ম্যাট্রিকুলেশন প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, কিন্তু এই জীবনমরণসমস্যার দিনে আমরা দেখিতেছি এ শিক্ষা নহে কুশিক্ষা, এ জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ নহে শুধু চোখের ধাঁধা মাত্র। আমাদের বালিকাগণ কাব্য পড়িয়া, শুধু ভাব লইয়া খেলা করিতেছে; শুধু সুখস্বপ্নিনী ও স্নেহলতার অভিনয় করিতেছে, শুধু কল্পনার তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে। পতিসেবা, সন্তানপালন, গৃহিণীপনায় এইগুলি শিক্ষা, অকর্মণ্য, অসহায়। ইহাদিগকে দেখিয়া মনে পড়ে সেই মাতা ও মাতামহীর যুগের কথা, সেই উপন্যাস বর্ণিত প্রফুল্লের শাশুড়ীর কথা, সেই পতির ভোজনের সময়ে বৃত্তনকালন, শিশু চিকিৎসায় শিশুপালনে অপূর্ব্বজ্ঞান, অপূর্ব্বরন্ধন শিক্ষা, অপূর্ব্ব কর্ম্মনিপুণতা। আজ মনে হইতেছে শিক্ষা আক্ষরিক জ্ঞানে নহে—বর্ণ পরিচয় না থাকিলেও লোকে মহাপণ্ডিত হইতে পারে। এদেশের নারীগণ এইরূপ শিক্ষাতেই বংশপরম্পরা শিক্ষিতা হইয়া আসিয়াছেন, এ দেশের সীতা সাবিত্রী এ দেশের আর্য্যরমণী এইরূপ শিক্ষাতেই মহাপণ্ডিত ছিলেন। অবশ্য খনা গার্গী না জন্মিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু রমণী যাহাতে রমণীর ধর্ম্মে ভূষিতা হয়, তাহাই এদেশের চিরন্তন লক্ষ্য ছিল।

আজ আমাদের চোখের ঘোর অনেকটা অপনীত হইয়াছে, আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি, পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীশিক্ষার গতিও এই উদ্দেশ্যের দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। আমাদের দেশেও যেমন লোকে খনা গার্গীর আদর্শ বিস্মৃত হইয়া ক্রমশঃ সীতা সাবিত্রী অরুন্ধতীর আদর্শেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল, এই সমুদয় দেশের তীব্র-বাসনার স্রোতোধারা ঠিক সেইরূপ বিজ্ঞান ও দর্শনের রাজ্য হইতে গতি ফিরাইয়া মাতৃত্ব ও পত্নীত্বের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে! প্রবাসীর বর্ত্তমান মাঘ সংখ্যায় স্বর্গীয় ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কিন্ মেয়েদের যে একটি আলেখ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা এই আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শেরই উজ্জ্বল চিত্র। একটী মার্কিন্ কুমারী ইন্দুপ্রকাশ বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "আমার মনে হয়, আমেরিকার মেয়েরা আসলে কেমনতর তা আপনার বুঝতে অসুবিধা হয়। বস্তুতঃ

আমার নিজের মনের ভাব যা তা' এই—নারীর পক্ষে মা হওয়ার বাড়া আর কোনো সৌভাগ্য নেই। এ পৃথিবীতে ভালো স্ত্রী ও ভালো মায়ের বড় প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে আমার একান্ত কামনা যেন মিসেস ● ● র মত আদর্শ মা হতে পারি। যদি মা হওয়ার দুর্লভ অধিকার হতে বঞ্চিত হই, তবে এমন কোনো শিক্ষাসাক্রান্ত অথবা প্রচার সম্পর্কীয় কাজ নেব যাতে অন্যান্য জননীরা যে সকল সন্তানের ভার নিতে পারেন না তাদের সামান্য সেবাতেও লাগতে পারি"। কি করুণ, কি মর্ম্মস্পর্শিনী উক্তি! আর একটী কুমারী লিখিয়াছেন "আমি সেই সকল গুণ কামনা করি যাহাতে আমি স্ত্রী ও মাতৃরূপে আমার সকল কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে পারিব, ও গৃহের সকল অনুষ্ঠানে উদ্দীপনা আনিয়া দিতে সমর্থ হইব ..... যদি স্বামী ও সন্তান লাভ আমার ভাগ্যে না থাকে তবে ভবিষ্যতে যে ভাবেই হউক অল্পবয়স্ক বালক বালিকার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতে আমার একান্ত কামনা।" রামের বনগমন সময়ে সীতাদেবীও যেন কতকটা এই ভাবেরই কথা বলিয়াছিলেন—তুমি বনে যাইবে, আর আমি সুখে রাজপ্রাসাদ ভোগ করিব? তুমি বনে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িবে আমি তখন তোমার শুশ্রূষা করিব, পায়ে কাঁটা ফুটিলে তাহা তুলিয়া দিব; তোমার সুখের জন্য আমার সকল শক্তি নিয়োগ করিব, তোমার দুঃখের পসরাও মাথা পাতিয়া লইব—ঠিক যেন বনভূমিতেও মূর্ত্তিমতী inspiration as wife. আজ সমুদয় পাশ্চাত্য জগতে স্ত্রী আর বিলাস সামগ্রী নহে, পাণ্ডিত্যের আদর্শকাঙ্ক্ষিণী নহে আজ স্ত্রীজাতির আদর্শ ঘটের ministering angel. এই ভাব এই আদর্শে পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়াই একদিন আমরা আমাদের মাতৃজাতিকে দাসীপর্য্যায় নিয়োজিত বলিয়া আক্ষেপ করিতাম—একমাত্র রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কারকদের প্রবল জুতা মোজা বাঁশী হার্ম্মোনিয়াম কাড়িয়া লইয়া, দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া দেবী চৌধুরাণীর দ্বারাও বাসন মাজাইয়াছিলেন। কিন্তু সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এদেশের সূর্য্য আবার সে দেশেও উদিত হইয়াছে। এদেশের ভাগীরথী শুষ্ক হইয়া পাশ্চাত্যদেশে পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কবি গাহিয়াছিলেন "ভাইয়ের মায়ের এমন স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ"—পাশ্চাত্যদেশও আজ এই সুরে মুগ্ধ; ভারতের প্রাচীন আদর্শ এ দেশে অবজ্ঞাত হইলেও নূতন জগৎ আবার প্রাচীন আদর্শের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আমরা আমাদের বালিকাদিগকে কাব্য, গণিত, দর্শনবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া প্রকৃত শিক্ষা দিলাম বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি, আর "আমেরিকার কোন কোন নগরে বালিকা-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে প্রত্যেক বালিকাকে মাতার কর্ত্তব্য ও শিশুপালন শিখিতে বাধ্য করা হয়।" সেই প্রাচীন গৃহিণীপণা ও সন্তানপালন, সেই প্রাচীনাদের শিশুচিকিৎসা, সেই আদর, সেই যত্ন—সেই "ভাইয়ের মায়ের এমন স্নেহ!" মানুষ হইতে হইলে প্রকৃত নারীত্ব ফুটাইয়া তুলিতে হইলে অতীতের সুন্দর সুন্দর আদর্শ ও ভিত্তিগুলিকে পদাঘাতে চূর্ণ করিলে চলিবে না। পিতৃপিতামহের কীর্ত্তিকলাপের স্বপ্নে, অতীতের আলোচনায় আমরা কি ছিলাম কি হইতেছি, আমাদের কি লাভ কি ক্ষতি বুঝিতে পারিব। অতীতকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান দাঁড়াইতে পারে নাই পারিবেও না। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগসাধন করিয়া আমাদিগকে ভবিষ্যতের সৌধ রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মানুষ মানুষ না হইলে, রমণী রমণীত্বের উৎস প্রকৃত রমণীতে পরিণত না হইলে আমাদের সকল আয়োজন বৃথা।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

২। ম্যালেরিয়া

প্রতি বৎসরই মনে হয়, এবার বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যেরূপ হইয়াছে, বুঝি বা এরূপ প্রকোপ পূর্ব্বে কোন বৎসর হয় নাই। বাস্তবিক দিন দিন ম্যালেরিয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

বঙ্গব্যাপী এই মহাব্যাধি বিকট বদন ব্যাদান করিয়া লোক গ্রাসের জন্য সদাই যেন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কত কত বিশেষজ্ঞ কত মতই জাহির করিতেছেন; কুইনাইন বিক্রয় ও বিতরণ, মশকবংশের ধ্বংসের আয়োজন, বক্তৃতা প্রদান, কন্‌ফারেন্স, ম্যালেরিয়া কমিটীর অধিবেশন, এ সবের ত অভাব নাই, তবু ম্যালেরিয়ায় লোকক্ষয় নিবারিত হইতেছে কই? তাহা হইলেই মনে এই ধারণা আসে যে চেষ্টা খুবই হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা সম্যক্ নয়; বোধ হয় আসল জিনিসে হাত পড়িতেছে না; গলদ থাকিয়া যাইতেছে। যাহা করিলে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার হয়, তাহা করা হয় ত হইতেছে না। অদৃষ্টের উপহাস!

আমরা ইউরোপীয় মহাসমরে লোকক্ষয়ের সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইতেছি কিন্তু একবার ভাবি না যে প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়ায় বঙ্গের কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ১৯১৪ সালে ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে প্রায় এগার লক্ষ। বঙ্গে উক্ত বর্ষে সর্ব্বসমেত চৌদ্দ লক্ষ জনের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে কেবল ম্যালেরিয়া জ্বরে বার লক্ষের উপর লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে—ব্যাপার কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা বুঝুন! কোন বৎসর কিছু কম, কোন বৎসর কিছু বেশী, প্রতি বর্ষে বর্ষে বঙ্গে কেবল ম্যালেরিয়ায় বার লক্ষ লোকের ভবলীলা সাঙ্গ হইতেছে, ইহা বলা যাইতে পারে। এই রোগে ভুগিয়া যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে না, অর্থাৎ আরোগ্য লাভ করিতেছে, তাহারাও আজীবন ব্যাধিমন্দির হইয়া থাকিতেছে; এরূপ লোকের সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে; আবার ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া পরে উদরাময় আদি অন্য উপসর্গ উপস্থিত হওয়াতে, অনেক রোগী মারা যায়; তাহাদের সংখ্যাও কম নহে। ফলে ম্যালেরিয়ায় বঙ্গের যে ভীষণ লোকক্ষয় হইতেছে, ইহা হিসাব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। ম্যালেরিয়া বিষে বঙ্গ জর্জ্জরিভূত, ইহা সকলেই জানেন, সকলেই বুঝেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিষ দেশ হইতে বিদূরিত যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে দেশের লোকে তত যত্নবান্ বা উদ্যোগী না হইলেও প্রজার হিতৈষী আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট উদাসীন নহেন। গভর্ণমেণ্টও চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু চেষ্টায় তত ফল হইতেছে না; এখন প্রতিকারের অন্য উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কুইনাইনের প্রচলন যাহাতে বৃদ্ধি পায়, গভর্ণমেণ্ট তাহা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সংবাদপত্রে বা প্রাদেশিক সমিতিতে প্রতিকারের নানাবিধ উপায়ের কথা আলোচিত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে প্রভূত কুইনাইন খাওয়াইলে রোগ চাপা থাকে সত্য, কিন্তু দেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিষ তাড়াইবার তাহাই কি সম্যক্ উপায়? যাহাতে ম্যালেরিয়া ব্যাধির মূলোৎপাটন হয়, তাহাই করা বাঞ্ছনীয়। সংবাদপত্রের স্তম্ভে যে সকল উপায়ের কথা লিখিত হয়, কিংবা প্রাদেশিক সমিতিতে দেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া যে উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত বলেন, সেই উপায়গুলি অবলম্বনের যোগ্য কি না গভর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। আমরা মোটামুটী বুঝি নদ নদীর সংস্কার; জল নিঃসরণের ব্যবস্থা, বনজঙ্গলের অপসারণ; সুপেয় পানীয় জলের সংস্থান; রেলের বাঁধে জল নিকাশের বাধা না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ, এই উপায়গুলি সর্ব্বাগ্রে অবলম্বিত হওয়া উচিত। অবশ্য এগুলি ব্যয়সাধ্য; কিন্তু ম্যালেরিয়া-বিষ-জর্জ্জরিত বঙ্গের প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য প্রজাবৎসল গভর্ণমেণ্ট এ কাজে ব্যয়কুণ্ঠ হইবেন, আমরা এরূপ মনে করি না।

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

৩। "তথাপি গাহিব আশার গান।"

চারিদিকে অবসাদ, নিষ্ক্রিয়তা, ভাবকতা দর্শনে প্রাণে সময় সময় হতাশ আসে, হায় তবে কি আমরা ক্রমশঃ মনুষ্যত্বের নিম্নস্তরে অবনত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব। কিন্তু

আবার মনে হয়, না, না, তাহা হইতে পারে না। এমন ভগবৎগৃহীত দেশ, এমন ত্যাগের দেশ একবারে ধ্বংস হইতে পারে না। এই অবসাদের মধ্যে এই স্বার্থান্ধতার মধ্যে এই বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে আবার সাধুতার ত্যাগের, বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। চাই কর্ম্মস্পৃহা, চাই একান্তিকতা, চাই ভগবানে অটল বিশ্বাস। তারপর সব ঠিক হইয়া যাইবে। আজিকার ভুল কার্য্যের ভ্রান্তি সব সংশোধিত হইবে। মাতৃঃ যেখানে কর্ম্ম পাও সেখানে ছুটিয়া যাও, লোক সেবা—দেশ সেবা—শিক্ষা দান কর। যেখানে দেখিবে লোক বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগ করিতেছে সেখানে যাও তাহাকে আলিঙ্গন কর। তাহার স্পর্শে তোমার প্রাণে দ্বিগুণ বল আসিবে। বিজ্ঞানের চর্চ্চার বাবহারিক আবিষ্কারে নিজোন্নতির প্রয়াস দেখিলে নমস্কার কর। দেখিতেছ তোমার কোনও চেষ্টা সফলতা আনয়ন করিতেছে না? তথাপি বিশ্বাসের বলে দৃঢ় হও এ জগতে কোনও চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই—হইবে না। আজ যাহা ব্যর্থ কালই তাহা সফলতা আনিয়ন করিবে। যে পথে নদী একবার বহিয়া গিয়াছে সেই পথে আবার নদী বহিবে—কোনও ভয় নাই।

কেন্দ্রীকৃত শক্তির সমক্ষে হিম হইও না। ধর্ম্ম নিষ্ঠা, ন্যায় নিষ্ঠা, কর্ম্ম নিষ্ঠার নিকটে সব বাধা দূরীভূত হইবে। শক্তিমান ক্রমে তোমার আদর বুঝিবে—আজ যাহা স্বপন কাল তাহা বাস্তব মনে করিবে।

বিক্রমপুর সম্মিলনীতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন "যিনি ফরিদপুরে সর্ব্ব প্রথম লোন কোম্পানী করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন—যিনি সর্ব্ব প্রথমে চা বাগান করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন—তিনি আমার স্বর্গীয় পিতা ভগবান চন্দ্র বসু—কিন্তু তাঁহার চেষ্টার ব্যর্থতার মধ্যে দেশের কর্ম্ম সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই বলি মাতৃঃ চারিদিকে চিত্তদৌর্ব্বল্য, স্বার্থপরতার বিকট আয়োজনে ভয় পাইও না।

নির্ম্মল শুচিস্নাত সাধকের ন্যায় নিরলসভাবে নিজ কর্ম্ম করিয়া যাও—এ জাতির ধ্বংস নাই, সাধনার ব্যর্থতা নাই। ভগবানের আইন রাজার আইন সমাজের আইন মানিয়া চলিও সর্ব্বনিয়ন্তা তোমাকে সফলতা দান করিবেন।

বরিশাল হিতৈষী।

৬। দেশীয় সংবাদপত্র ও গবর্ণমেণ্ট।

আধুনিক সভ্যতালোকপ্রাপ্ত দেশমাত্রেই সংবাদপত্র যে একটী অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ যেমন একদিকে জনসাধারণের কেন্দ্রীভূত মত গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে উপস্থিত করে, সেইরূপ শাসকসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপদ্ধতিও জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়া উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনে সহায়তা করিয়া থাকে আমেরিকার সর্ব্বত্রই সংবাদপত্রের গতিবিধি অবারিত। খানা, কাচারী প্রভৃতি যে কোনও স্থানেই হউক না কেন, সংবাদপত্রের লোক সাদরে গৃহীত হয় এবং তাঁহারা যাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা জানান হয়। এমন কি, রাজপুরুষগণও আবশ্যকীয় সংবাদাদি নিজেরাই সংবাদ পত্রের আফিসে অনেক সময়ে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে আমেরিকার শাসনকার্য্য যে অতি সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় গবর্ণমেণ্টও যে অনেক পরিমাণে এই প্রথার অনুসরণ না করেন তাহা নহে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইব যে গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে আমরা যতটা আশা করি, তাহা পাই না। আশার কথা দূরে থাকুক, আফিস আদালতের কর্ম্মচারীবৃন্দের নিকটও আমরা আশানুরূপ সাহায্য পাই না। শুধু তাহাই নহে। আমরা যাহাকে স্বায়ত্বশাসন বলিয়া গর্ব্বানুভব করি, সেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীতেও আমাদের প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই হয়। বাহিরে সদস্যগণের নিকট হইতে ব্যক্তিগত ভাবে সংবাদ সংগ্রহ ব্যতীত অন্য উপায়ে আমরা কোনও সংবাদ পাই না। আমাদের মতে জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর

আবশ্যক কার্য্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণই কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা এ বিষয়ে বহুবার পাবনার জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। বলাই বাহুল্য কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কথায় কর্ণপাত করা সঙ্গত মনে করেন নাই।

গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষাও আমাদের গুরুতর অভিযোগের কারণ আছে। ইংরাজী সংবাদপত্র মাত্রই একখানি কলিকাতা গেজেট বিনিময় স্বরূপ পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে শাসন ও অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত যে সমস্ত মন্তব্যাদি প্রকাশিত করেন, তৎসমুদয়েরও এক এক কপি ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রদত্ত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রতি, বিশেষতঃ মফঃস্বলের কোনও সংবাদপত্রের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয় বলিয়া আমরা জানি না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা যে সাক্ষাৎভাবে নিতান্ত অজ্ঞ থাকি, ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। দেশের সুশাসনের পক্ষে ইংরাজী সংবাদপত্র অপেক্ষা দেশীয় সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা কম, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সুতরাং আমরা এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অনেকেই বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহকে একদেশদর্শী বলেন। কিন্তু যখনই তাঁহাদিগকে অন্য দিক দেখিবার আবশ্যকমত সুযোগ দেওয়া হয় না তখন তাহারা একদেশদর্শী হইলে তাহাদিগকে তজ্জন্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস লর্ড কারমাইকেলের গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র সুবিচার করিবেন।

সুরাজ।